কোমল ও কমনীয়

ছটফটে সুন্দরী রমণীর পরিচ্ছন্ন রূপটি তার ব্যক্তিত্বকে মাধুর্য্য দান করে। তার কোমল কমনীয়তায় সবাই হয় মুগ্ধ। আর তার সৌন্দর্য্যকে সম্পূর্ণ করে তার মনোহর কালো কেশ। তাই যে সকল মহিলা চুলের খোঁজা সম্পর্কে সচেতন তারা চর্চ্চায় অনিবার্য্য ভাবেই ব্যবহার রে থাকেন ভারতের অনবদ্য কেশ তৈল কোকোলা।

কোকোলা

অতুলনীয় কেশ তৈল

চুল উৎপাদনে এবং সংরক্ষণে অপ্রতিদ্বন্দ্বী কেশ তৈল

কুন্তলীন অফ্ ইণ্ডিয়া পারফিউমস কোং, প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৩৪

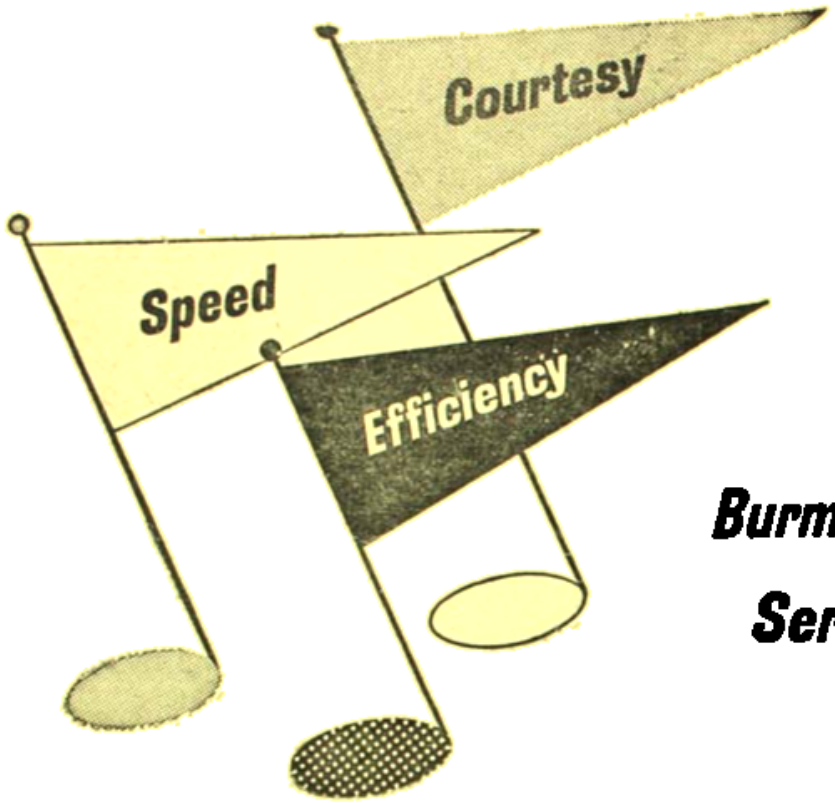

that's

Burmah-Shell

Service!

SC-P 1.

উপহার

যে কোন উপলক্ষ্যে
সকলেই যা কিনে
দিতে পারেন

ডানলপিলো

DPC-99 BEN

The Print-Mark of Quality Printing

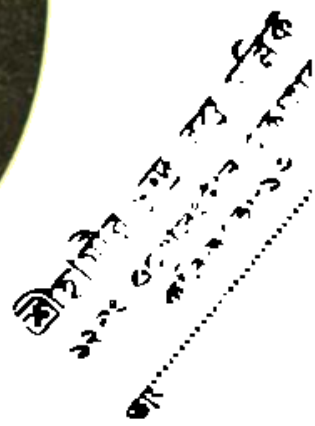

If, over the last thirty-eight years, we have built up a reputation in the world of printing, it is only because we are constantly striving for printing perfection

SREE SARASWATY PRESS LTD

PHOTO-OFFSET & LETTERPRESS PRINTING, PROCESS ENGRAVING, BOOK BINDING AND TYPECASTING

32 ACHARYA PROFULLA CHANDRA ROAD
CALCUTTA 9

FACTORY :
1749 BARRACKPORE TRUNK ROAD
BEGHORIA (24 PARGANAS)

GOOD PRINTING TELLS A BETTER STORY

ক্লিওপেট্রা ও কেতকী

ক্লিওপেট্রার মত চিকন কেশগুচ্ছের মূলে ছিল **অলিভ** অয়েলের নিত্য ব্যবহার। [illegible] কেতকীও জানেন যে, কেশবর্ধনে সহায়ক রূপে সুপরিচিত **অলিভ অয়েল** এবং অন্যান্য উপাদান মিশ্রণের সম্মিশ্রণে আধুনিক ফর্মুলায় **ক্যাম্বারল** কেশতৈল প্রস্তুত করা হয়েছে।

ক্যাম্বারল

অলিভ অয়েল সংমিশ্রণে প্রস্তুত

একমাত্র সুগন্ধি ক্যাম্বারাইডিন কেশ তৈল

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী লিমিটেড কলিকাতা-২৯

Support your National Industry...

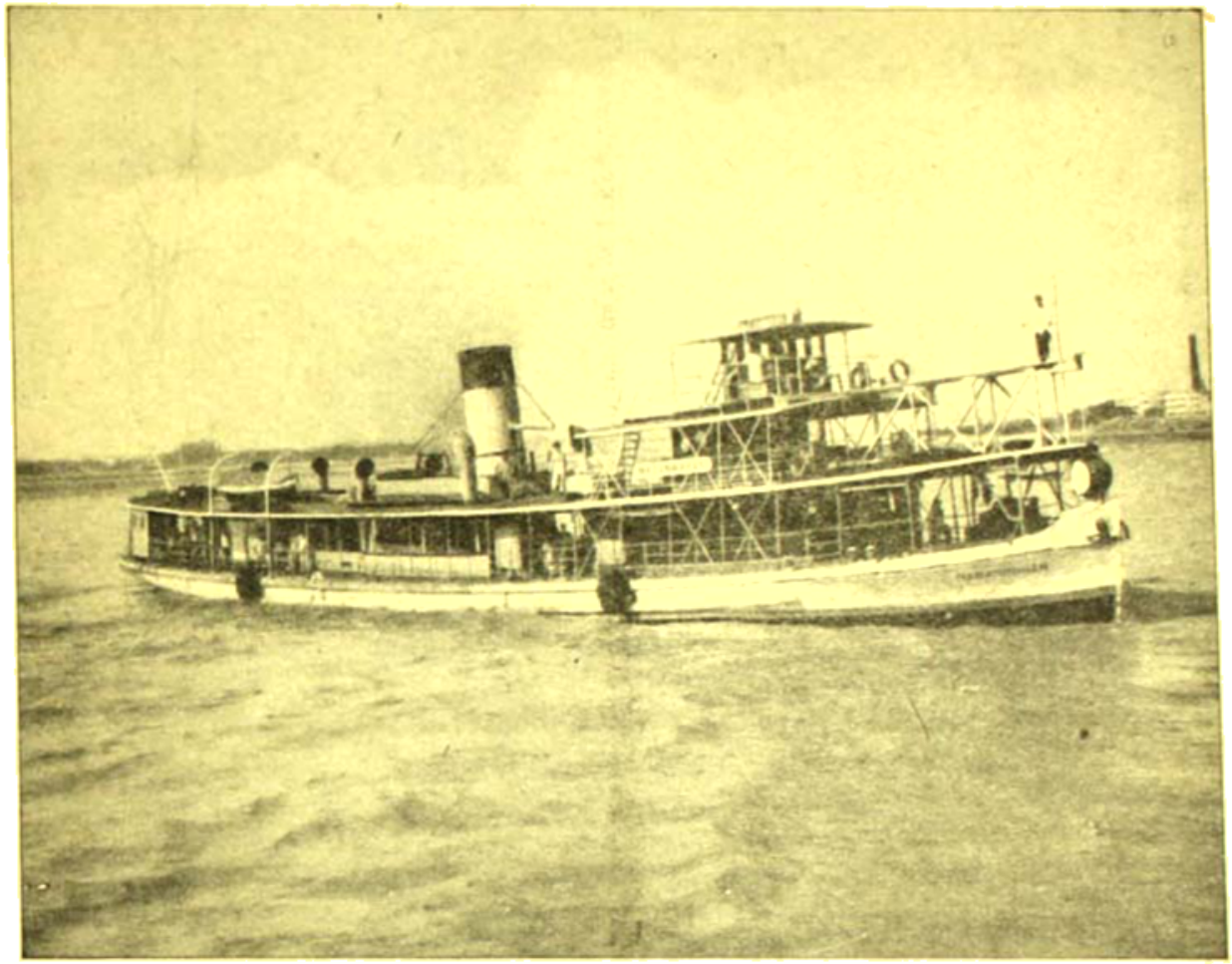

An Inland Steamship Company, owned and managed by Indians, engaged in carrying general merchandise from Calcutta to East Bengal and Dhubri and Gauhati in Assam, and mainly Jute from East Bengal and Jute and Tea from Assam to Calcutta.

We also own a shipbuilding yard at No. 2, Rustomjee Parsee Road, Cossipore, Calcutta-2 ('phone 56-2674) known as EAST BENGAL ENGINEERING WORKS where vessels of all descriptions are built and repaired under European supervision.

The East Bengal River Steam Service Ltd.

(Incorporated in India in 1906)

MANAGING AGENTS

RAJA SREENATH ROY & BROS. PRIVATE LTD.

87, SOVABAZAR STREET CALCUTTA-5

Phone : 55-1138 & 55-1019 (3 lines) Tele : "INDOSTEAM" CALCUTTA

পূর্বপুরুষদের দান

উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা হয়নি। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে মানুষ যে ফসল প্রথম ফলাতে শুরু করেছিল তা হচ্ছে ধান। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। খৃষ্টজন্মের তিন হাজার বছর আগেকার মিশরের মমির সঙ্গে এত বেশী পরিমাণ ধানের শস্যদানা আবিষ্কৃত হয়েছে যাতে যে শবের সঙ্গে নিহিত রয়েছে তা বালি ব'লেই পণ্ডিতেরা বলেন। এছাড়া, মেসোপটেমিয়া, ইতালী ও স্পেনের প্রাচীন সভ্যতার যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতেও বালির প্রাচীনত্বের প্রমাণ মেলে। খৃষ্টজন্মের ২১০০ বছর আগে সম্রাট সেন্নুঙ্ এর চাষ শুরু করেছিলেন চীনে।

আমাদের সংস্কৃত পুরাণ ও শাস্ত্রাদিতে ধানের উল্লেখ রয়েছে। মহেঞ্জোদড়োর সিন্ধু-সভ্যতা আবিষ্কারের মধ্যেও জানা গেছে যে বালির তখন খৃষ্টজন্মের ৩০০০ বছর আগে ভারতবর্ষে ছিল। বেদে ধানের উল্লেখ থেকে আরো মনে হয় ধান বা বন চাষের অনেক আগেই ভারতবাসীর প্রধান খাদ্য ছিল বালিশস্য। আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা বালির পুষ্টিকর গুণগুলির কথা জানতেন। পালা-পার্বণ ও উৎসবে এবং প্রাত্যহিক আহার ও পানীয় হিসেবে বালির ব্যবহার ছিল। এই কারণে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে বালিশস্য একাত্ম হ'য়ে আছে।

আজো বালি মানুষের একটি বিশিষ্ট খাদ্য। বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষে অসংখ্য মানুষ বালির পায়েস দিয়েই জীবনধারণ করে। বালিশস্য থেকে উৎপন্ন পার্ল বালি ও গুঁড়ো বালি সহজে হজম হয় এবং শারীর ক্রিয়ার সহায়ক ব'লে রুগ্নদের জন্যেই এর বহুল ব্যবহার।

শস্য উৎপাদন পদ্ধতি ও যান্ত্রিক উন্নয়নের ফলে বালির চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলেছে। 'পিউরিটি বালি' প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাটলাটিস (ইস্ট) লিঃ-এর সর্বাধুনিক কারখানায় উচ্চজাতের বালিশস্য থেকে স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে বালি তৈরী হয়। এই জন্যেই 'পিউরিটি বালি' রুগ্ন, শিশু ও প্রসূতিদের ব্যবস্থা দেওয়া হয়। যুবা ও বৃদ্ধরাও এই বালি খেয়ে উপকার পান।

অ্যাটলাটিস (ইষ্ট) লিঃ (ভেষজীয় ভাপপ্রক্রিয়ায় প্রস্তুত)

PTY 3084

ফিলিপ্‌স যে কোন
উৎসব-অনুষ্ঠানের
জাঁকজমক ও আনন্দ বাড়িয়ে দেয়।

ফিলিপ্‌স

PHILIPS

ফিলিপ্‌স ইণ্ডিয়া লিমিটেড

উৎসব উপহার হিসেবে সেলাই কল আজকাল এত জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে কেন? আপনার পরিবারে খুশী ভরে সেইজন্য কি? আপনার প্রিয়জনেরা আপনার নির্বাচনকে তারিফ ক'রবে, এই সুন্দর মনমত উপহারটি তাদের জীবনভোর অঙ্গ হ'য়ে থাকবে, তাই? হ্যাঁ। কিন্তু শুধু তাই নয়—এই সেলাই কল প্রাচুর্য্যের স্বচ্ছলতার প্রতীক। আপনার পরিবারের জন্য আদর্শ উপহার। এ বছর 'উষা'-র নতুন **'ট্রীমলাইন্ড'** মডেল দিয়ে আপনার পরিবারকে চমক লাগিয়ে দিন। সুন্দর, আধুনিক গড়ন আর নিখুঁত কাজের জন্য ভারতের বাইরে চল্লিশটিরও বেশী দেশে সমাদৃত —এদেশে এই প্রথম বাজারে ছাড়া হচ্ছে।

উষা

সেলাই কল

উষা ইণ্ডাস্ট্রিজ: কোর্ট দিঃ, কলিকাতা-১৬

স্মৃতি-সমুজ্জ্বল

৭নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট

কলকাতায় ৭নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে ইটের তৈরি যে বিরাট লাল বাড়িটি আজও দাঁড়িয়ে আছে একদা সেটি যে আমোদ-প্রমোদের কত বড় কেন্দ্র ছিল, ঝাকজমকে যে কত উজ্জ্বল ছিল সে ইতিহাস বর্ণনা করতে সেকালের কেউ আর আজ বেঁচে নেই। ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর জন্য এই বাড়িটি তৈরি করিয়েছিলেন। বহুকাল ধরে তৎকালীন ইংরেজ সমাজের নৃত্য-গীত ও অন্যান্য আনন্দ-উৎসবের প্রধান আসর রূপে এটির প্রসিদ্ধি ছিল। সেকালে এতে প্রবেশ লাভের অনুমতি পাওয়া এক সামাজিক গৌরবের বিষয় বলে গণ্য হতো।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত বার্ন কোম্পানি ব্যবসার জন্য এই বাড়িটি দখল করেন। তার পর প্রায় এক শতাব্দীকাল তাঁদের এই বাড়িতেই কাটে। ক্রমে ব্যবসা বৃদ্ধির দরুন এই বাড়িতে আর তাঁদের স্থানসঙ্কুলান না হওয়ায় বাধ্য হয়ে ১৯২৪ সালে এই বাড়ির মায়া কাটিয়ে তাঁরা উঠে যান ক্লাইভ ষ্ট্রীটে এক বিশাল অট্টালিকায়। মার্টিন অ্যাণ্ড কোম্পানির সঙ্গে তাঁদের সহযোগিতার পত্তন হয় এখানেই।

মার্টিন বার্ন লিমিটেডের বহুধা-বিচিত্র কর্মকাণ্ডে বার্ন কোম্পানি সহ আরো কয়েকটি বিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত। ভারতের দ্রুত শিল্পোন্নয়নের জন্য এদের সবগুলিরই একান্ত প্রয়োজন।

মার্টিন বার্ন লিমিটেড

মার্টিন বার্ন হাউস : ১২ মিশন রো, কলিকাতা ১

শাখা : নয়া দিল্লী বোম্বাই কানপুর

সুঠাম সুন্দর দেহ

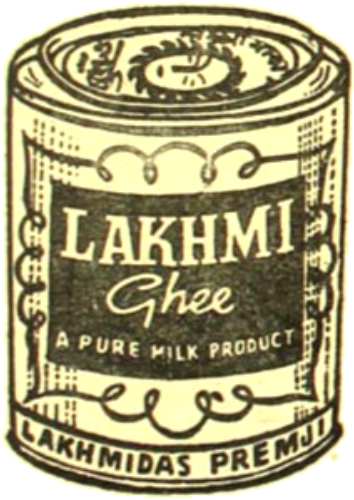

গড়ে তুলতে

লক্ষ্মীঘি

অপরিহার্য্য

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী • কলিকাতা-১১ • ফোন ২২-৭২৪৩

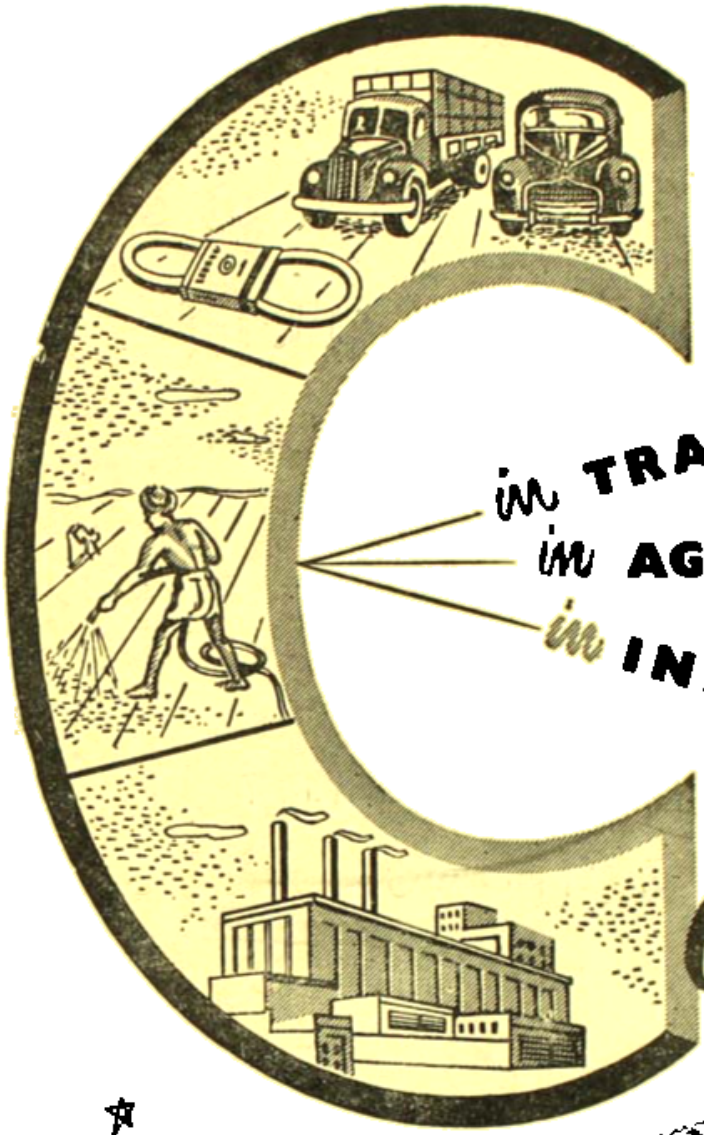

in TRANSPORT

in AGRICULTURE

in INDUSTRY

arumaco

RUBBER PRODUCTS

FOOTWEARS OF ALL VARIETIES FOR ALL AGES

at key points of national life

Kadar Rubber Mfg. Co., Private Ltd.

Head Office 46B THEATRE ROAD, CALCUTTA.
Phone : 44-1859

92, NARIKELDANGA MAIN ROAD, CALCUTTA
Phone : 35-2318

দুর্গত-সেবায় আত্ম-নিবেদিত

আর্যস্থান সোস্যাল সেণ্টার

★

মহিলা কর্মকেন্দ্রে প্রস্তুত পোষাক-পরিচ্ছদ

মাদুর ও এম্পুলস্ প্রভৃতি

ব্যবহার করিয়া সমাজ-কল্যাণে

সাহায্য করুন

মূল কেন্দ্র : ৫নং চেতলা রোড, কলিকাতা-২৭

রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ রবীন্দ্র-সাহিত্য ॥

ছিন্নপত্র

রবীন্দ্রনাথ পুত্র-জীবন ও -বাণীর যে ব্যাখ্যা বিভিন্ন সময়ে (১৯১০-১৯৩৬) করেছেন এই গ্রন্থে সেগুলি একত্র সংকলিত হয়েছে। সমাহৃত অধিকাংশ রচনা ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি। অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল -অঙ্কিত পুত্র-চিত্রে ভূষিত। মূল্য ২·৫০ টাকা।

ভারতপথিক রামমোহন রায়

বিভিন্ন বৎসরে (১২৯১-১৩৪৭) রামমোহনের স্মরণ-সভায়, রামমোহন শতবার্ষিকীতে, ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক উৎসবে, মাঘোৎসবে রবীন্দ্রনাথ রামমোহন সম্বন্ধে যে-প্রবন্ধ পাঠ করেছেন, অভিভাষণ দিয়েছেন, ও অন্য সূত্রেও রামমোহন সম্বন্ধে যা বলেছেন, এই গ্রন্থের নূতন সংস্করণে তা যথাসাধ্য সংকলন করবার চেষ্টা করা হয়েছে। পূর্ব সংস্করণের পর এই নূতন সংস্করণে, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অনেকগুলি রচনা সংগৃহীত হয়েছে। মূল্য ৩·০০, বোর্ড বাঁধাই ৪·০০ টাকা।

॥ পত্রধারা ॥

চিঠিপত্র সপ্তম খণ্ড

কাদম্বিনী দত্ত ও শ্রীমতী নির্মলিনী সরকারকে লিখিত পত্রগুচ্ছ।
মূল্য কাগজের মলাট ৩·০০, বোর্ড বাঁধাই ৪·৩০ টাকা

॥ শোভন সংস্করণ ॥

জীবনস্মৃতি

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত চিত্রাবলী-বিভূষিত শোভন সংস্করণ
এই সংস্করণে সুবিস্তৃত গ্রন্থপরিচয়ও আছে : মূল্য বোর্ড বাঁধাই ১২·০০ টাকা
মূগা ও চামড়া বাঁধাই ২০·০০ টাকা

রক্তকরবী

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রাবলীতে শোভিত
আর্ট পেপারে মুদ্রিত, বোর্ড বাঁধাই মূল্য ৪·৩০ টাকা : সাধারণ সংস্করণ মূল্য ২·৩০ টাকা

রক্তকরবীর ইংরেজি অনুবাদ Red Oleanders প্রকাশিত হলে বিলাতে সাময়িক পত্রে যে-সকল আলোচনা প্রকাশিত হয় সে সম্বন্ধে Manchester Guardian পত্রে কবির দীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশিত হয়। বর্তমান সংস্করণের গ্রন্থপরিচয়ে সেই প্রবন্ধটি ("Red Oleanders : Author's Interpretation") সংযোজিত হল। রক্তকরবী সম্বন্ধে বিভিন্নসূত্রে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য ব্যাখ্যান এবং মন্তব্যও এই গ্রন্থে মুদ্রিত আছে।

বিশ্বভারতী ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

নিখুঁত ব্লক ও মুদ্রণের জন্য

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফটো

এনগ্রেভিং কোম্পানী

- ব্লকমেকার
- প্রিণ্টার
- ডিজাইনার

ফোন : ৩৪-১৩৬১

১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

শারদীয়ার

আনন্দ-উজ্জ্বল উৎসবক্ষণে
আপনার স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে
সতত নিয়োজিত
দুইটি বিশ্বস্ত
সেবকের

প্রীতি সম্ভাষণ ও শুভ কামনা
গ্রহণ করুন।

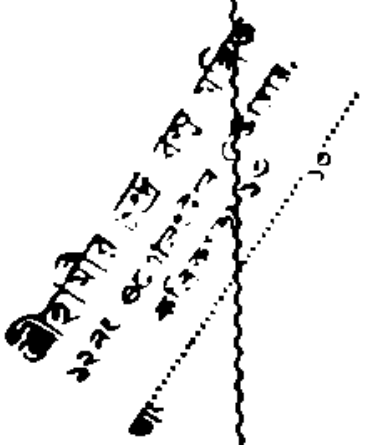

★

'কিরণ' ল্যাম্প

'ট্রপিক্যাল' ফ্যান

★

উৎকৃষ্ট বিস্কুট বাজার দরে

লিলি

স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়

লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ - কলিকাতা-৪

L. B/59

NATIONAL SCIENTIFIC AMPOULES SYNDICATE

294/2/1, Acharya Prafulla Chandra Road

FEDERATION HALL—CALCUTTA-9

Phone : 35-1591

FACTORY :

Radhanath Mullick Lane, Calcutta-12

MANUFACTURERS OF :

Quality Ampoules of all Types

SUPPLIERS OF :

Hospital and Laboratory Goods

Mother Durga's blessings to all !

For Quick and Correct CLINICAL EXAMINATION of

BLOOD, URINE, STOOL, SPUTUM Etc.

Call On

EASTERN CLINICAL LABORATORY

76, BOWBAZAR STREET (1st Floor),

CALCUTTA-12

Phone : 34-1373

List of Advertisers in "Madhurangscha", Bengali Autumn (Puja) Special, 1367 BS

Names of Clients	Page No.
A	
Afghan Snow	100
Atlantis (East) Ltd.	vi
Anjana Products	280, 285
Asoke Glass Works	227
Albert David Ltd.	270
Ananda Bazar Patrika (P) Ltd.	66
Arati Products	58
Aryasthan Social Centre	xii
A. K. Jewellers & Co.	482
B	
Bharati Book Stall	235
Bhim Chandra Nag	253
Bholanath Paper House (P) Ltd.	76
Bata Shoe Co. (P) Ltd.	239
Burmah-Shell	ii
B. Das & Co.	86
Book Land (P) Ltd.	295
Bengal Immunity Co., Ltd.	363
Basudhara	461
Bengal Chemical & Pharmaceutical Works Ltd.	419
B. K. Saha & Bros.	451
C	
Calcutta Chemical Co. Ltd.	iv
Calcutta Book House	204
Ceramic Sales Corporation Ltd.	421
Calcutta Collapsible Gate Co., P. Ltd.	490
D	
D. Ratan & Co.	111
D. N. Basu's Hosiery Factory	225
Dunlop Rubber Co.	ii
Dey & Dutta	264
D. N. Sinha & Co.	17
Dhole & Co.	355
Dey's Medical Stores (P) Ltd.	267
Dutta & Pyne Bros.	382
Dipak Printing	489

Names of Clients	Page No.
E	
East Bengal River Steam Service Ltd.	v
Eastern Railways	179
Eastern Industries Co.	349
Ever Shine Jewel House	484
F	
Farmers' Nursery	479
G	
Gramophone Co. Ltd.	231
G. D. Pharmaceuticals (P) Ltd.	260
G. S. Emporium (Agency) Ltd.	203
Govt. of West Bengal	xxviii
Ganguram Grandsons	476
Gour Baran Bhattacharjee	486
H	
Himani Private Ltd.	64
Himkalyan Works (P) Ltd.	195
I	
The Imperial Tobacco Co. of India Ltd.	160
Indian Fertilisers (P) Ltd.	213
Indian Silk House	xxvii
The Imperial Nursery	331
Imperial Watch Co.	353
J	
James Lord & Sons Ltd.	182
Jay Engineering Works Ltd.	viii
Jugantar (P) Ltd.	68
J. Sirkar & Sons	263
Jana-Sevak	445
Jewel of India Perfume Co. (P) Ltd.	i
K	
Krishna Silicate & Glass Works Ltd.	107
Kaviraj N. N. Sen & Co. (P) Ltd.	211
Kadar Rubber Manufacturing Works	xi
Kesoram Rayon	471
Kusum Products Ltd.	455

LIST OF ADVERTISERS (Contd.)

Names of Clients	Page No.
L	
L. C. Sett & Co. (P) Ltd.	218
Lipton (India) Ltd.	61
Lakshmidas Premji	x
Lily Biscuit Co. Ltd.	xvi
Life Insurance Corpn. of India	320
Lakshmi Brothers, Jewellers	474
Lakshmi Jewellers	490
M	
Mantala Tea Co. (P) Ltd.	119
M. C. Sarkar & Sons (P) Ltd.	189
M. B. Sarkar & Sons.	72
Martin Burn Ltd.	ix
Modern Book Agency	343
Modern Decorators	432
Martin's Light Railways	469
Metropolitan Spring Mfg. Co.	492
N	
Navana Printing Works (P) Ltd.	435
National Sugar Mills Ltd.	Cover (3rd page)
N. K. Gossain & Co. (P) Ltd.	327
Nabasakti Newspapers Co. (P) Ltd.	272
N. K. Som & Co.	333
New Kashmir & Oriental Transport (P) Ltd.	351
New Age Publishers (P) Ltd.	315
National Rolling & Steel Ropes Ltd.	447
N. C. Snuff & Co.	475
National Scientific Ampoules Syndicate	xvii
O	
Oriental Mercantile Co. Ltd. (Kiron Lamp & Tropical Fan)	xv
Orient Paper Mills Ltd.	Cover (4th page)
The Oriental Research & Chemical Laboratory Ltd.	317
Orient Traders	459
Oriental Jewellers	487
P	
Pasupati Das & Sons (P) Ltd.	xxvi
Projna Pracharani	292
Philips India Ltd.	vii
Parijat Cinema	323
Paharpur Aushadhalaya	253
Popular Library	467
Peary Mohan Dutta & Co.	473
R	
Roy-Singha Engineering Works	120
Rupa & Co.	191
Raghunath Dutta & Sons (P) Ltd.	70
Rajlakshmi Shilpa Mandir	341
Reva Chemical	485
Royal College	319
Radical Book Club	339
Radu & Co.	480
R. C. Ghose & Sons	488
S	
Soviet Desh	Cover (2nd page). 112
Sadhana Aushadhalaya	168
Standard-Vacuum Oil Co.	418
Sailalal-Manilal	221
Senco Jewellers (P.) Ltd.	481
Senco Jewellery House	478
South-Eastern Railways	223
Standard Photo Engraving Co.	xiv
Sri Gouranga Press (P) Ltd.	79
Sree Saraswaty Press Ltd.	iii
S. Mukherjee & Co.	325
Shipping & Clearing (Agents) Pr. Ltd.	347
Standard Woodcrafts (P) Ltd.	371
S. Sarkar & Co.	443
Sen Mahasaya	403
Stewarts & Lloyds of India (P) Ltd.	477
Sulekha Works Ltd	463
Sylco Industries	386
Sett & Co.	483
S. Banerjee & Co.	xxiv
T	
Tripura Administration	423
Teachers' Book Stall	270
U	
United Bank of India Ltd.	243
V	
Vidyodaya Library (P) Ltd.	298
Visva-Bharati	xiii

and Others

চিত্রসূচী

প্রচ্ছদপট	অবন ঠাকুর	শ্রীশ্রীদুর্গা	সৌরেনচন্দ্র রায়	ফ্রন্ট পত্র
[illegible]	১২	কর্ণ-দুর্যোধন সৌহার্দ্য (রাখিবন্ধন)		৭৮
[illegible]	১৩	রাজেন্দ্রের রাজ-পথে জীবন-চাঞ্চল্য		৭৯
[illegible]	১৪	সিকিম রাজের প্রাসাদে ওঙ্কার প্রার্থনা-চক্র ঘুরাইতেছে		৮০
[illegible]	১৫	অজন্তার কারুকার্য আলোক-চিত্র : তরুণ চট্টোপাধ্যায়		৮১
[illegible]	১৬	ঈর্ষা সন্তাপে অন্তরাত্মার দাহ	পুলিনবিহারী সেনগুপ্ত	৪১৭
[illegible]	১৭	কাশীর শাড়িতাত	সুরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	৪১৮
[illegible]	১৭	দুঃশাসনের অত্যাচারে অনুপম ভ্রূ	সুরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	৪১৯
[illegible]	১৭	ভরতের ভয়	পুলিনবিহারী চক্রবর্তী	৪২০
[illegible]	১৭	সমুদ্র বিহার ,,	অরুণ সেনগুপ্ত	৪২২
[illegible]	১৭	পূর্ব উপাত্তার প্রাকৃতিক দৃশ্য শিল্পী	কমল চৌধুরী	৪২৪
[illegible]	১৮	আদি মহাত্মার সপ্ত প্রতীক (চিত্রণ)		৪২৬
[illegible]	১৯	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ		৪৯১
[illegible]	২১			

এই চিত্র-সূচি ও অন্যান্য বিভিন্ন ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করেছেন : শ্রীমতী মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীসুভাষ সিংহ রায়।

দক্ষিণারঞ্জন বসুর

সর্বাধুনিক গ্রন্থনিচয়

পৃথিবীর মত মানুষের মনের জগৎও একটি পৃথিবী—এক বিদেশী পটভূমিকায় রচিত কয়েকটি সরস গল্পের মাধ্যমে লেখক ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন।

[illegible]
[illegible]
পশ্চিমবঙ্গের নব-
তম পট-ভূমিকায়

বিদেশ বিভুঁই

সম্পূর্ণ নতুন ধরণের
ভ্রমণ লিখিত বই
ছবি দিয়েই এটি
সুন্দর ভ্রমণ
কাহিনী।
মূল্য ৩·০০

একটি পৃথিবী একটি হৃদয়

মূল্য—৪·০০ —মিত্র ও ঘোষ

আমেরিকার সমাজ-জীবনের পটভূমিকায়
বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস

লাইলাক একটি ফুল

মূল্য—৪·০০ ভারতী লাইব্রেরী

এক ভদ্র-অপরাধীর বিচিত্র কাহিনী
(উপন্যাস)

পরম্পরা

মূল্য—৪.০০ মিত্রালয়

যন্ত্রা হাস-
পাতালের পট-
ভূমিকায় রচিত প্রথম
পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস বাংলা
সাহিত্যে নূতন দিগন্ত

রোদ জল ঝড়

এখানকার যেসব রোগী এত
কাল ঘুমিয়ে ছিল তারা জেগে
উঠছে নতুন প্রাণ
নিয়ে এ বইয়ের
পাতায় পাতায়।
মূল্য ৪·৫০

বেঙ্গল পাবলিসার্স অন্যান্য বই পপুলার লাইব্রেরী

মধুরেণ, বাজীমাৎ, সুভদ্রার ভিটে, অনেক সুর, অগ্নিকোরক, ছেড়ে আসা গ্রাম।

শারদীয়া

মধুরাংশু

সম্পাদক : শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু ॥

প্রকাশক : শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় ॥

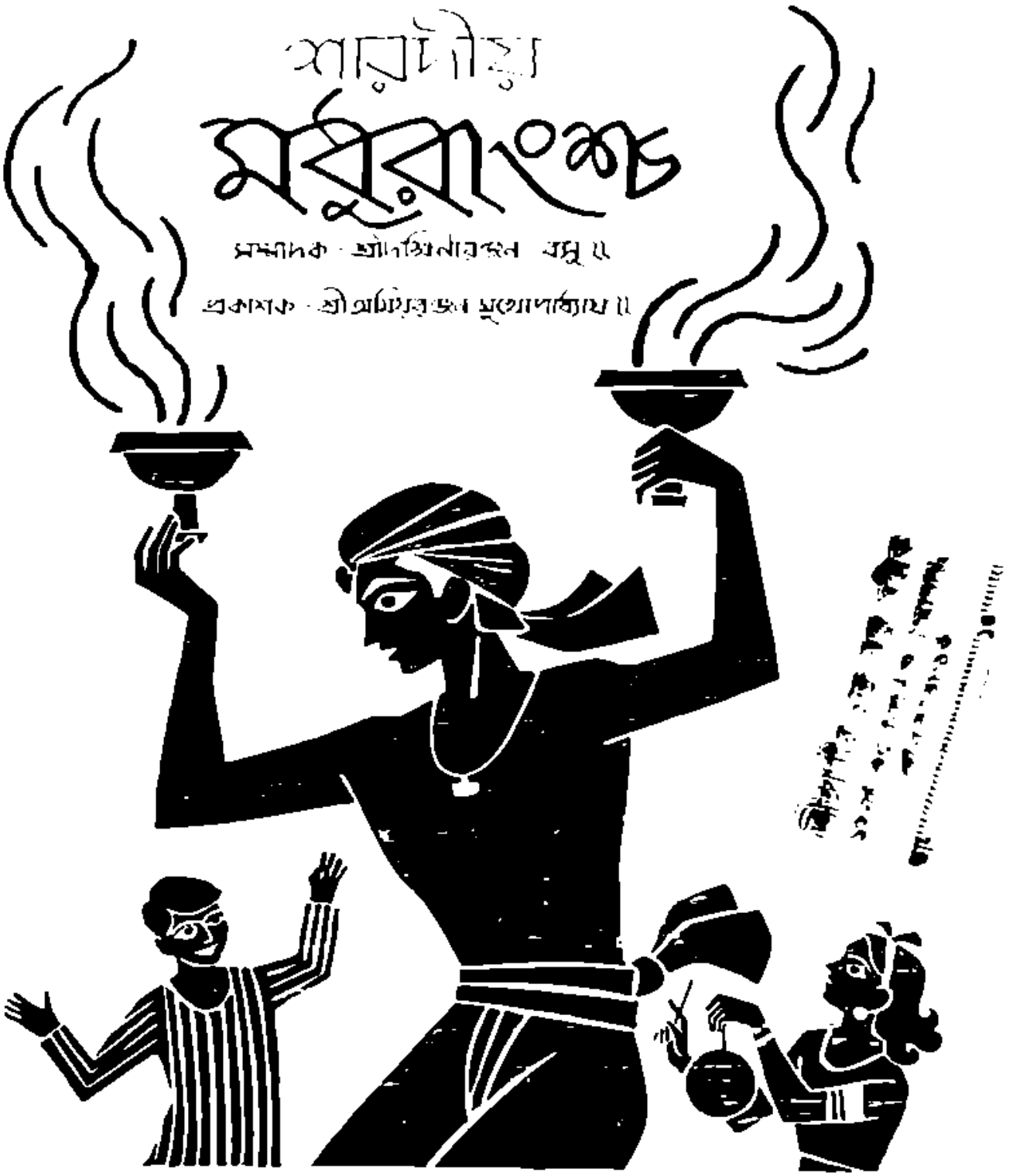

প্রতিষ্ঠান :

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড

অফিস [illegible]

[illegible]

মূল্য : ৫.০০

MADHURANGSCHA : Bengali Autumn (Puja) Special Anthology : Edited by Sri Dakshina Ranjan Basu & Published by Sri Amiya Ranjan Mukherjee : Price Rs. 5.00

শারদ সংকলন, দ্বিতীয় বর্ষ ॥

শিউলির স্নিগ্ধ সুবাস বা শুভ্র কাশের অনুপম ছন্দে নয়, অনিকেত জীবনের কান্না এবং দুর্গতের হাহাকারে এলো এবারের দুর্গোৎসব। যে আগমনীর ঐক-বোধনে বাঙালীর মন দুলতো, ঘর ভরতো, আর মাঠে মাঠে সোনা ফলতো আশ্বিনের হাওয়া—আজ সে-আগমনীতেই যেন অনুরণিত বেহাগের করুণ আলাপ। ধরণীর পরিব্যাপ্ত আকাশ তাই বুঝি থমকে আছে অবাক প্রশ্নে : কেন এমন হলো ?……

হাজার হাজার বাঙালীর দুঃসহ দুর্গতিই আজ ছায়া বিস্তার করেছে মাতৃ-রূপেণ দুর্গার আগমন-পথে এবার তাই উৎসব নয়, আলোকসজ্জা নয়। এবার শুধু আর্ত-ত্রাণের পথের অন্বেষাই হোক জীবনের লক্ষ্য। হে জীবন, তুমি আত্মবিস্মৃত হয়ো না।

আজ দ্বিতীয় বর্ষের এই দুর্দিনেও সুধীজনের সাহচর্যে সম্পূর্ণ হলো মধুরাংশুর তৃতীয় সংখ্যা। পূর্বেই শুরু হয়েছিল এর প্রস্তুতি। তাই উপায় ছিল না। নচেৎ এবার শারদ-সংকলনের প্রকাশ এবার আমরা বন্ধই রাখতাম। কারণ দেশের সর্বস্তরেই আজ ঘনায়মান দুঃসময়। এ-সময়ে সর্বপ্রকার বাতুলতা বরণ ক'রে জাতিকে আপদ-মুক্ত করাই জীবনের সাধনা। সব মত, সব পথ এবং সব দৃষ্টির আজ একই লক্ষ্য হওয়া উচিত—যে লক্ষ্য কেবল দুর্গত-ত্রাণ।

বাঙলা সংকলন-গ্রন্থের মধ্যে মধুরাংশুর আবির্ভাব এক ক্রান্তিকারী ঘটনা। ইতিপূর্বে প্রথম ও দ্বিতীয় সংকলনের অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা ও জন-অভিনন্দন লাভই বর্তমান সংকলনের বড় পরিচয়। রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ, চিত্রে ও আলোকচিত্রে সুচিত্রিত এবং গঠন-নৈপুণ্যে সুরুচির পরিচায়ক এই সংকলন এবারও সর্বজনের অকুণ্ঠ প্রশংসায় স্নাত হবে—এমন আশা আমরা করতে পারি।

যে সমস্ত শিল্পীর অংশ গ্রহণে, সাহিত্যিকের সহযোগিতায়, বিজ্ঞাপনদাতার আনুকূল্যে এবং পাঠক-পাঠিকার অকৃত্রিম সহানুভূতিতে মধুরাংশু তার সুনামকে অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে—আজ আবার তার আত্মপ্রকাশের শুভ লগ্নে আমরা তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন।

মধুরাংশুর প্রথম প্রকাশ থেকেই একে মাসিক পত্রে রূপান্তরিত করার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ ও বহির্বঙ্গ থেকে অনেক অনুরোধ পত্র আমরা পেয়ে আসছি। এ-সমস্ত পত্র-প্রেরকের উদ্দেশ্যে আমরা কেবল এ-কথাই বলি যে, মাসিক পত্রে রূপান্তরিত হবার পরিমিত শক্তি মধুরাংশু যেদিন অর্জন করবে—সেদিন আমরা অবশ্যই পূরণ করার চেষ্টা করবো তাঁদের দাবী। এ বিষয়ে মধুরাংশু-সম্পাদক খ্যাতিমান কথাশিল্পী ও কবি শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু ইতিমধ্যেই অনেকদূর অগ্রসর হয়েছেন। পাঠক-পাঠিকাদের তুষ্টিবিধানই তাঁর এবং আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক

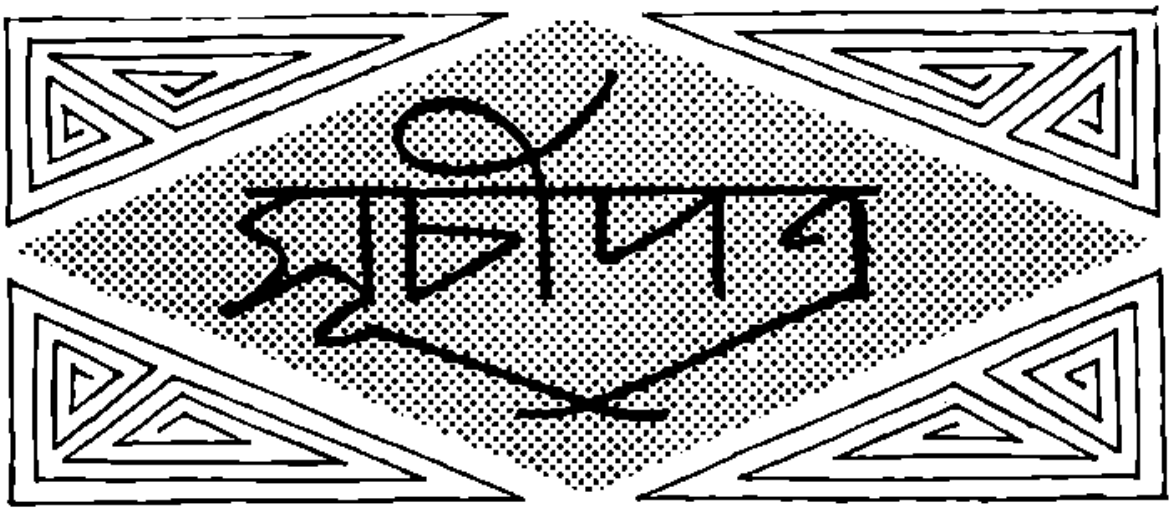

প্রবন্ধ

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব	শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী	১
জগৎ গোসাঁই ও জগজ্জননীর সংসার	ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত	৬
সে-কালের দুর্গোৎসব	শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল	১৮
কবিয়াল ও কবিগান	ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২১
লোকসাহিত্য ও সমাজ-সংস্কৃতি	ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য	৩৩
মহাভারতে কর্ণ	অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী	৩৮
পুরুষোত্তম	শ্রীদেবেশ	৪৯
রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক মন	ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী	৫৩
রাজধানীর রূপান্তর	ডঃ নিমাইসাধন বসু	৫৯
উনিশ শতকের গীতিকাব্য ও রবীন্দ্রনাথ	ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	৮২
নবজাগরণের ধর্ম	অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল নাথ	১০১
চাঁদে যাওয়ার বাধা কোথায়	অধ্যাপক জিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১০৫
নব নাট্য আন্দোলনের পটভূমি	গিরিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৩
সতীশচন্দ্র ঘটক ও বাংলা প্যারডি	জয়দেব রায়	৪৩৩

উপন্যাস ও নাটক

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
উত্তরণ (উপন্যাস)	শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী	১২১
নট্ গিলটি (নাটক)	শ্রীঅশোক সেন	১৭৩
দুর্বোধ্য (একাঙ্কিকা)	মন্মথ রায়	৩১৩
মেঘের নাও পক্ষী (উপন্যাস)	বিষ্ণু ভৌমিক	৩২১

সূচীপত্র : কবিতা

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা	বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
সত্যেন্দ্রনাথ	কালিদাস রায়	৬১	ঘুরিয়ে দেখি	সজনীকান্ত দাস	৬৩
শব্দ	প্রমেন্দ্র মিত্র	২৯৯	তুমি আছ	চিত্তরঞ্জন মাইতি	৩০৫
দেখা	হরপ্রসাদ মিত্র	২৯৯	এবং এই ভালোবাসা	মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত	৩০৬
নীড়	বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত	২৯৯	বাসনা সফল হোক	শান্তশীল দাস	৩০৬
রাখো এই মুহূর্তগুলোকে	কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	৩০০	তুমি যখন কাছে এলে	সিদ্ধার্থ গঙ্গোপাধ্যায়	৩০৭
হৃদের বন্ধু	মৃত্যুঞ্জয় মাইতি	৩০০	অশ্রুমতী	সত্যব্রত চক্রবর্তী	৩০৭
মর্গো ও ত্রিভিবে	আবুলকাশেম রহিমুদ্দীন	৩০১	অসমাপ্ত	সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	৩০৮
দুঃচোখ	সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়	৩০১	তোমাকে পেলাম	দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়	৩০৮
বকুলকথা	বটকৃষ্ণ দাস	৩০২	সে শুধু আসে না	প্রফুল্লকুমার দত্ত	৩০৮
সেপ্টেম্বের সেই রাতে ওরা এসেছিল			বৃষ্টি	তারাপদ রায়	৩০৯
লিওন দামাস (অনুবাদ)	সৌমেন দত্ত	৩০২	নতুন বন্দরে	প্রীতিভূষণ চাকী	৩০৯
স্বতন্ত্র নাম	গোবিন্দ চক্রবর্তী	৩০৩	এষণা	হরেন ঘোষ	৩১০
নির্জন প্রার্থনা	পরিমল চক্রবর্তী	৩০৩	ইংস	তুর্গাদাস সরকার	৩১০
চিত্রণ	সুলেখা ঘোষ	৩০৪	রাত্রির শিকিরা	রবেন্দ্রনাথ মল্লিক	৩১০
পুরস্কার	মাণিক মুখোপাধ্যায়	৩০৪	মুক্তি	ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত	৩১১
শিউলিরা	শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়	৩০৪	কাল সকালে	দিবোন্দু পালিত	৩১১
উত্তরঙ্গ	মায়া বসু	৩০৫	আকাশ বিহঙ্গ	ক্ষণপ্রভা ভাতুড়ী	৩১২

প ড় বা র ম তো ক য়ে ক খা না ব ই

অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

বৈষ্ণব কবিতা—দার্শনিক ভিত্তি ও কাব্য-বিশ্লেষণ

—মূল্য ৩·২৫ নঃ পঃ

শাক্ত পদাবলী—সাধনতত্ত্ব ও কাব্য-বিশ্লেষণ

—মূল্য ৩·২৫ নঃ পঃ

অধ্যাপক হরনাথ পাল

কবি মোহিতলাল—মূল্য ৫·৫০ নঃ পঃ

[সাহিত্য, সাহিত্যপ্রীতি ও সাহিত্যচর্চাই ছিল মোহিতলালের সমগ্রজীবন……তারই সার্থক আলোচনা]

অধ্যাপক ভোলানাথ ঘোষ

বাঙ্‌লা সাহিত্য পরিক্রমা—পরিবর্ধিত সংস্করণ

—মূল্য ১১৲

[হাজার বছরের বাঙ্‌লার সমাজ ও সাহিত্যের সার্থক আলোচনা]

ছন্দ ও অলঙ্কার—মূল্য—২·৫০ নঃ পঃ

[I.A. এবং B.A. ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী]

বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—মূল্য ২·৫০ নঃ পঃ

[কিশোর সংস্করণ

সাহিত্য বিচিন্তা

ডাঃ হরপ্রসাদ মিত্র (যন্ত্রস্থ)

এস্ ব্যানার্জি এণ্ড কোং ○ ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

○ বা মা পু স্ত কা ল য় ১১এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

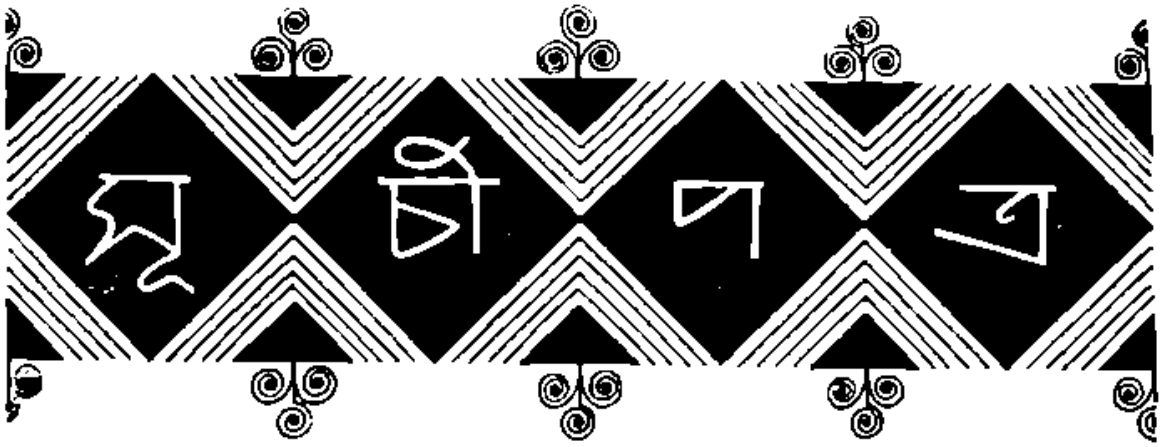

গল্প

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
পাখীদের মতো	বনফুল	৮১
সঞ্চয়	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	৮১
স্ত্রী নিয়ে	সন্তোষকুমার ঘোষ	৮৭
রাজহাঁস প্রবাহিত সদনে	আশা গঙ্গোপাধ্যায়	১১৩
একটি আশ্চর্য সকাল	সমর বসু	১৬৭
চেনা-অচেনা	প্রবোধ ভৌমিক	১৭৩
একটি নতুন গাছের গল্প	দক্ষিণারঞ্জন বসু	১৭৭
চাঁদ	শ্রীমতী দর্শী রায়	১৮৭
বিষ্ণু	ভবানী মুখোপাধ্যায়	১৯০
আলোর রেখা	গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য	১৯৬
একটি কোণের ঘর	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	২০৭
নন্দিনীর প্রেম	সুধীর করণ	২০৯
উপহার	ডঃ কৃষ্ণলাল শ্রীধরণী (অনুবাদ : নিখিল সেন)	২১৯
বল্লরী	সুতোষ সমাদ্দার	২২১
কামেলিয়া	রণজিৎকুমার সেন	২৪১
রাত্রির দলিল	বনেন্দ্রলাল রায়	২৫৭
কেউ তা জানে না	অনিলকুমার কংস	২৭৯
কবি	অবিনাশ সাহা	২৮৭
দারিদ্র্য দোহারের দুঃখে	দেবকুমার ঘোষ	৩৭১
প্রথম ও শেষ রাত্রি	তুলীল সিংহ	৩৮৩
মধুমতী	রাণু ভৌমিক	৪০৫
হিমাদ্রি	মানবেন্দ্র পাল	৪২৭

সূচীপত্র

রসরচনা

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
[illegible]	[illegible]	৩১৮
[illegible]	[illegible]	৩৬১
[illegible]	[illegible]	৩৭৮
[illegible] ...	[illegible]	৪৩৯

যে কোন উৎসবে

সুগন্ধি

বাসমতী চাউলের

'পোলাও'

পরম উপভোগ্য

পশুপতি দাস এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড

"ভারতের সর্ববিধ চাউলের শ্রেষ্ঠতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান"

৪৩/২ ও ৩৭ এ, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-১৪

টেলিফোন : ২৪-৪৩৮১/৮২ টেলিগ্রাম : 'রাইসকিং'

সূচীপত্র

বিবিধ

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
চতুর্দশী মনোরী [৮	অমল ঘোষ	
সর্পদষ্টের চিকিৎসা ও অন্ধবিশ্বাস	পরিতোষকুমার চক্র	
মিথিলার গুপ্তধন (ভ্রমণ কাহিনী)	সুতপা চক্রবর্তী	...

ইণ্ডিয়ান মিল্ক হাউস

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট • কলিকাতা

কল্যাণী

অধ্যাপকের ভালো লেগেছে

কল্যাণীতে এসে অধ্যাপকটি প্রথমেই গেলেন স্কুল দেখতে। শুনে তিনি খুবই খুশী হলেন যে এই নতুন শহরে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হবে। ছাত্ররা যা চায় সবকিছুই কল্যাণীতে রয়েছে— মুক্ত বাতাস, পার্ক ও খেলাধূলার মাঠ, রাস্তাঘাট আর সবুজের সমারোহ। প্রকৃতির কাছে থেকেও নগর-জীবনের সুখ-সুবিধার এই ব্যবস্থা দেখে অধ্যাপকটি মুগ্ধ।

জীবন যাত্রায়
আনন্দ আনবে

কল্যাণী

যোগাযোগ করুন :
কল্যাণী সেলস্ অফিস্, ১৮৮এ, রাসবিহারী এ্যাভেনিউ,
কলিকাতা-২৯, ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, রাইটার্স,
কলিকাতা বা পাবলিক রিলেশন্স অফিসার, কল্যাণী, জেলা—নদীয়া।

"জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তুতে॥"

[শিল্পী : শৈলেশচন্দ্র রায়

[প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার একটি নিদর্শন]

বাঙালীর দুর্গোৎসব

শ্রীশিবপ্রসাদ সেন

বাঙ্গালীর দুর্গোৎসবে বাংলার সংস্কৃতি ও সাধনার এক বিশিষ্ট ও বিচিত্র রূপের প্রকাশ দেখা যায়। বাংলার সংস্কৃতি যে ভারতীয় সংস্কৃতির একটি প্রধান ধারা হইয়াও আপন স্বাতন্ত্র্যের মহিমায় সমুজ্জ্বল, এই দুর্গোৎসবে তাহার প্রমাণ আছে। এই উৎসব কখন কাহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা লইয়া ঐতিহাসিকেরা বিবাদ করুন. কিন্তু বাঙ্গালীর ধ্যান ও ধারণা, তাহার সমাজ ও সাধনায় যে বিশিষ্টতা আছে, তাহার পরিচয় পাইতে হইলে নানা দিক হইতে এই দুর্গাপূজার আলোচনা করিতে হইবে। জাতীয় জীবনের চরম সঙ্কটের মুহূর্ত্তেও দুর্গোৎসব আসন্ন হইলে বাঙ্গালীর প্রাণ যেন এক অব্যক্ত আনন্দ ও বেদনায় পূর্ণ হইয়া উঠে।

বাংলা দেশ তান্ত্রিক সাধনার পীঠস্থান,—এই সাধনার দুইটি ধারা, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রেম-সাধনা ও মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত সন্তানগণের শক্তি-সাধনা আমাদের এই বাংলা দেশে গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমের ন্যায় অবিরোধে মিলিত হইয়াছে। তন্ত্র বলিতে শুধু শাক্ত তন্ত্রই বুঝায় না, গৌড়ীয়

বৈষ্ণবের প্রেম-সাধনাও তান্ত্রিক সাধনার অন্তর্গত।

বাংলা দেশে একাধিকবার ক্রিয়াকাণ্ডবহুল বৈদিক ধর্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু সে চেষ্টা তেমন সফল হয় নাই। আচার্য শঙ্করের মায়াবাদ বা জীব ও ব্রহ্মের অভেদবাদও বাঙ্গালী গ্রহণ করে নাই। বাঙ্গালী প্রাণের ধর্মে বিশ্বাসী এবং জীবন-রস-রসিক। শাস্ত্র বা লোকাচার হইতে যে মানুষ বড়, সে কথা বাংলার সাধকের কণ্ঠ হইতেই উৎসারিত হইয়াছে। আবার তান্ত্রিক ও জীবনবাদী বাঙ্গালী ভোগ ও মোক্ষের মধ্যে কোন বিরোধ কল্পনা করে নাই। সে জানে—

'দেব্যাপদাম্ভোজযুগাশ্রিতানাম্
ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব'।

'যাঁহারা দেবীর পাদপদ্ম আশ্রয় করেন, ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই তাঁহাদের করতলগত'। আবার এই দুর্গাদেবী যে ভোগমোক্ষদায়িনী, মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর সুরথ রাজা ও সমাধি নামক বৈশ্যের উপাখ্যানে সেই তত্ত্বই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

পরব্রহ্মের মধ্যে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারিণী যে শক্তি রহিয়াছে, বাঙ্গালীর ধ্যানে সেই শক্তিই জগন্মাতারূপে প্রকটিত হইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক হার্বার্ট স্পেন্সারের চোখে এ শক্তি শুধু অব্যক্ত শক্তি—Inscrutable power in Nature, কিন্তু ভক্তের চোখে ইনি দুর্গতি-নাশিনী বরাভয়-দায়িনী বিশ্বজননী, ইনি সৌম্যা অথচ ভয়ঙ্করী! জীবনে পরম মঙ্গল লাভ করিতে হইলে, অর্থাৎ ধনসম্পদ, দৈহিক ও মানসিক বল, পরা ও অপরা বিদ্যা, বিজয় ও কার্যসিদ্ধি প্রভৃতি লাভ করিতে হইলে সেই মহাশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হয়। বাঙ্গালী কোন দিন শুষ্ক বৈরাগ্যের সাধনা করে নাই, জগৎ ও জীবনকে সে মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা করে নাই, তাই সে চণ্ডীপাঠের পূর্বে দেবীর নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছে—

'দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥
বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥
বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

* * *

বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

* * *

ভার্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তানুসারিণীম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি'॥

হে দেবি, আমায় সৌভাগ্য, আরোগ্য ও পরম সুখ দাও, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, আমার শত্রু সংহার কর।

হে দেবি, আমার কল্যাণ বিধান কর, আমাকে বিপুল ঐশ্বর্য প্রদান কর।

হে দেবি, আমার শত্রুগণের নাশের বিধান কর, সর্বশ্রেষ্ঠ বল আমাকে প্রদান কর।

হে দেবি, আমাকে বিদ্যাবান, যশস্বান ও লক্ষ্মীবান কর।

হে দেবি, আমার মনোবৃত্তির অনুসারিণী মনোরমা ভার্যা আমাকে দান কর।

জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বাঙ্গালীর এ দৃষ্টি বলিষ্ঠ ও বাস্তবমুখী।

সেকালের বাঙ্গালী সংসারের বিচিত্র সম্পর্কের মাধুর্য উপভোগ করিতে জানিত। বৈষ্ণবীয় সাধনার ন্যায় বাংলা দেশের শক্তি-সাধনাও মূলতঃ রসের সাধনা। দুর্গোৎসবের মধ্য দিয়া বাঙ্গালী

একই সঙ্গে তাহার মাতৃভাবাসক্তি ও বাৎসল্য চরিতার্থ করিয়াছে।

বাংলা দেশের স্মার্ত রঘুনন্দন দুর্গাপূজার বিধান দিয়াছেন। এই দুর্গাপূজায় জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলেরই অধিকার আছে। তবে প্রকৃতিভেদে কোন মানুষের মধ্যে সত্ত্বগুণের, কাহারও মধ্যে রজোগুণের, আবার কাহারও মধ্যে বা তমোগুণের প্রাধান্য; তাই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক পূজার পদ্ধতিও ভিন্ন হইয়াছে।

দুর্গাপূজায় বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মন্ত্র উচ্চারিত হয়, চণ্ডীমণ্ডপে চণ্ডীপাঠ হয়, আবার পৌরাণিক কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়া বাঙ্গালী যে বাৎসল্য ও করুণ রসে স্নিগ্ধ আগমনী ও বিজয়ার গান রচনা করিয়াছেন, সেই সঙ্গীত শ্রবণে তাহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া ওঠে। শ্রীমধুসূদন পরধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আগমনী ও বিজয়ার গানের প্রভাব চিরদিন তাঁহার মনে অক্ষুণ্ণ ছিল। বিজয়া দশমীতে প্রতিমা-বিসর্জনের পর আমাদের অন্তর যে কন্যা-বিয়োগ-ব্যথায় হাহাকার করিয়া ওঠে, বাল্যের সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাটুকুও তাঁহার স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। মেঘনাদের চিতায় প্রমীলার সহমরণের পর লঙ্কার অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—

'বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমীদিবসে,
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিল বিষাদে'।

আবার পাশ্চাত্ত্য দেশে বসিয়া মধুসূদন বিজয়া-সম্পর্কে যে সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে কন্যার আসন্ন বিশ্লেষদুঃখে কাতরা মাতৃহৃদয়ের বেদনা চমৎকার অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

দুর্গোৎসবের মধ্য দিয়া বাঙ্গালী এক নূতন ভাবদৃষ্টি লাভ করিয়াছে। সে উপলব্ধি করিয়াছে, নারীমাত্রেই নারায়ণী, গৃহে গৃহে তিনিই কন্যারূপে বা মাতৃকারূপে বিরাজিতা।

'বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু।'

বাংলার সাধক অনুভব করিয়াছে, আমার মায়ের উদরে আছে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড, আবার আমার দেহে তিনিই চৈতন্যরূপিণী, তিনিই প্রসুপ্তা ভুজগাকারা কুলকুণ্ডলিনী, সাধনার দ্বারা তাঁহাকেই জাগ্রত করিতে হইবে।

সুতরাং দেবী পুরাণ বা কালিকা পুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসবের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব তাহা হইতে ভিন্ন বস্তু। আর্ষ রামায়ণে অবশ্য শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসবের কথা নাই। মহাভারতে দুর্গাস্তোত্রে জগন্মাতার রূপের বর্ণনা আছে, শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন এই স্তোত্র পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে দুর্গাপূজার কথা নাই। মনস্বী বিপিনচন্দ্র পাল বলেন—বাঙ্গালীর দুর্গাপূজা প্রতীকোপাসনা নহে, সম্পদুপাসনাও নহে, ইহা রূপক। বাঙ্গালীর প্রতিমাপূজা-সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন—

'প্রতিমাপূজা বাংলার বিশেষত্ব। ভারতবর্ষের আর কোথাও এভাবের মূর্তিপূজা নাই। অন্যত্র দেবতার মূর্তি আছে, কিন্তু সে সকল মূর্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। যজমানেরা পূর্বাহ্ণে কিংবা গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষ্যে দেবালয়ে যাইয়া দেবতার পূজা করিয়া আসেন। তাদের ঘরে ঠাকুরের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা হয় না। বাংলায়ও দেবালয় আছে, পীঠস্থান আছে। সেখানে দেবতার মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতিদিন সে মূর্তির পূজা হইয়া থাকে। কিন্তু এ সকল বাঙ্গালী হিন্দুর ধর্মজীবনের মূল প্রস্রবণ নহে। এগুলির দ্বারা বাঙ্গালীর চরিত্র গড়িয়া উঠে নাই। বাঙ্গালীর ধর্ম, বাঙ্গালীর চরিত্র, বাঙ্গালীর সংসার ও পরমার্থ গড়িয়া উঠিয়াছে তার নিত্য

সন্ধ্যারতি ও নৈমিত্তিক পূজাদির দ্বারা। ... ভাবের রাজ্যে ও রূপের রাজ্যে এ সকলের একটা বিশেষ মূল্য আছে।' (সাহিত্য ও সাধনা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২-৩)

বাঙ্গালীর প্রতিমা-পূজায়, বিশেষত দুর্গোৎসবে, তাহার কবি-মন ও শিল্পী-মনের এক বিশেষ প্রকাশ ঘটিয়াছে। বাঙ্গালী যে শুধু জীবনবাদী নয়, সে যে সৌন্দর্য-প্রিয় ও আড়ম্বর-প্রিয়ও বটে, দুর্গোৎসবেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এই জন্যই দুর্গোৎসবকে ক্রিসমাস অথবা ঈদের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

সেকালের দুর্গোৎসবের একটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকও ছিল। এই উৎসবকে উপলক্ষ্য করিয়াই ধনীর ধন সমাজের সকল স্তরের লোকের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছে। আবার বিশ্বজননীর উপাসনার মধ্য দিয়া মায়ের সকল সন্তান মিলিত হইয়াছে, জাতি বা ধর্মের প্রভেদ এই মিলনের অন্তরায় হয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম স্বদেশ-প্রেমকে নব্য তান্ত্রিক ধর্মে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। দেশ-মাতৃকার মধ্যে তিনি ঋষির ধ্যানদৃষ্টিতে দশপ্রহরণ-ধারিণী দুর্গা, কমলদলবিহারিণী কমলা ও বিদ্যাদায়িনী বাণীকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' কমলাকান্ত উপলব্ধি করিয়াছিলেন, দেবী দশভুজা এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা, সেই জননীকে উদ্ধার করিতে হইলে সপ্ত কোটি সন্তানকে ঐক্যবদ্ধ হইয়া মাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতে হইবে, আলস্য, ক্ষুদ্র স্বার্থ, ইন্দ্রিয়াসক্তি পরিহার করিতে হইবে। 'আনন্দমঠে' বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে শিখাইয়াছেন, 'দেশমাতৃকার জন্য জীবনদান করার চাইতেও দেশমাতৃকাকে ভক্তি করা মহত্তর আদর্শ, কিন্তু এই ভক্তি জ্ঞানমিশ্রা হওয়া চাই। 'আনন্দমঠে' ব্রহ্মচারী মহেন্দ্র সিংহকে জগদ্ধাত্রী, কালী ও দুর্গামূর্তির মধ্যে মায়ের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রূপ দেখাইতেছেন।

ব্রহ্মচারী মহেন্দ্র সিংহকে দুর্গামূর্তি দেখাইয়া বলিতেছেন—"এই মা যা হইবেন। দশ ভুজ দশ দিকে প্রসারিত,—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। 'দিগ্‌ভুজা'—বলিতে বলিতে সত্যানন্দ গদগদকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। 'দিগ্‌ভুজা—নানাপ্রহরণধারিণী শত্রু-বিমর্দিনী—বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ-বিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, এস, আমরা মাকে উভয়ে প্রণাম করি।

• • •

উভয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলে মহেন্দ্র গদগদকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মার এ মূর্তি কবে দেখিতে পাইব?'

ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে, সেই দিন উনি প্রসন্ন হইবেন।'

আজ বাংলার চরম দুর্দিনে, জাতির চিত্ত যখন নৈরাশ্যে মুহ্যমান, সেই সময়ে বাঙ্গালীকে এই ঐক্যের মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে। ক্ষুদ্র বিবাদ-বিসংবাদ ভুলিয়া, স্বার্থবুদ্ধি পরিহার করিয়া, আলস্য ইন্দ্রিয়াসক্তি পরিত্যাগ করিয়া আবার সন্তান-ধর্মে নব দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা আজ সার্বজনীন পূজার নামে অনেক ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়াসক্তিকেই প্রশ্রয় দিতেছি,—দুর্গোৎসবের তাৎপর্য বিস্মৃত হইয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠায় প্রমত্ত হইয়াছি। এই ধর্মভ্রংশই আজ আমাদের দুর্গতির মূল কারণ হইয়াছে, তাই আমরা প্রতি বৎসর সাড়ম্বরে শক্তিপূজা করিয়াও শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছি। অনেকের মনে এ প্রশ্নও জাগিয়াছে যে ভবিষ্যতে

বাঙ্গালী বাঁচিবে কি না। দীর্ঘকাল পূর্বে কবি আমাদিগকে আশার বাণী শুনাইয়াছিলেন—

'মন্বন্তরে মরি নি আমরা, মারী নিয়ে ঘর করি,
বাঁচিয়া গিয়াছি বিধির আশীষে অমৃতের টীকা পরি।'

কবি আরও বলিয়াছেন, অতীতে যাহা সংঘটিত হইয়াছে, ভাবী কালেও তাহা সংঘটিত হইবে। আমরা যদি যথার্থই শক্তিসাধনায় দীক্ষিত হইতে পারি, যদি আমরা আলস্য, ভীরুতা, দুর্বলতা, কাপুরুষতা পরিহার করিয়া বীরের মত উন্নত মস্তকে দাঁড়াইতে পারি, যদি আমরা বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব ও রবীন্দ্রনাথের সাধনার যোগ্য উত্তরাধিকারী হইতে পারি, তাহা হইলে আমরা শুধু বাঁচিয়াই থাকিব না, আমরা নিখিল ভারত তথা নিখিল বিশ্বের পথপ্রদর্শক হইতে পারিব। তাই আমাদিগকে আবার শক্তিমন্ত্রে নূতন করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে, আমাদের অন্তরের সুপ্ত বীর্যকে জাগ্রত করিয়া পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

এই বিশাল দেশে যেমন দ্রষ্টব্য স্থানের শেষ নেই, তেমনই শেষ নেই বক্তব্য বিষয়ের। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সভ্যতা ভারতের আধ্যাত্মিক চেতনাকে আজও গ্রাস করতে পারে নি। এ সত্য ইতিহাসের পাতায় লুকিয়ে নেই। আছে তার স্থাপত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে, সাহিত্যে, তীর্থ ও জনপদের প্রাচীন গরিমায়।

রম্যাণি বীক্ষ্য

এই বিরাট দেশের বিপুল ঐশ্বর্যের প্রাণবন্ত কাহিনী।
বাঙলা সাহিত্যের সুপ্রতিষ্ঠিত কথাশিল্পী
শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

পর্বে পর্বে এই দেশের নূতন রূপ উদ্ঘাটিত করছেন। এবারে দ্রাবিড় পর্ব নূতন প্রকাশিত হল।

একদা দক্ষিণ ভারত এক স্বতন্ত্র সভ্যতায় উজ্জ্বল ছিল। রম্যাণি বীক্ষ্যের দক্ষিণ ভারত পর্বে শুধু সমুদ্র-তীরবর্তী ভূমির পরিচয় আছে। দ্রাবিড় পর্বে মহিসুর ও হায়দ্রাবাদ রাজ্যের কাহিনী লিপিবদ্ধ হল। বালির কিষ্কিন্ধ্যা, হিন্দু সাম্রাজ্য বিজয়নগর, টিপুর শ্রীরঙ্গপত্তন। স্থাপত্যের শেষ কথা আছে হয়শাল স্থাপত্যের নমুনায়—বেলুর হালেবিদ ও সোমনাথপুরমে, শ্রবণবেলগোলায়, ইলোরা অজন্তায়। শুধু ভ্রমণের বৃত্তান্ত নয়। উপন্যাসের রসমণ্ডিত বিদগ্ধ সাহিত্যসৃষ্টি। আলোকচিত্র-সম্বলিত গ্রন্থ।

রম্যাণি বীক্ষ্য

রাজস্থান পর্বের তৃতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হল।

এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফোন: ৩৪-১৬০৬ : : গ্রাম: প্রকাশিকা

জগৎ জোড়া জগদ্ধাত্রীর সংসার

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

(কথিকা)

গরিবের সংসার হলেও একটা গোটা সংসারের কাজ, সবই করতে হয় একা একা। গণেশের মার একার শরীরে আর কত সয়! তবু নীরবে সারা সকালে ঘরের বাইরের সব কাজ সেরে স্নান করে এক কাঁখে জলের কলসি—আর হাতে ভিজা কাপড় নিয়ে পুকুরপাড় থেকে ঘরে ফিরছেন গণেশের মা, নরেশ ঠাকুরের নাকি ঝোলাঝুলি নিয়ে সাত সকালেই কোথায় বেরোবার কথা!

এসেই দেখেন, দাওয়ার কাছেই উঠোনে বসে কার্তিক-গণেশ দু'ভাইয়ে রীতিমতন চলছে মল্লযুদ্ধ। রোজ রোজ এই একই দৃশ্য মায়ের আর কত ভাল লাগে? মা দূর থেকে দেখে কাঁখের কলসিটি নামিয়ে রাখলেন, তার উপরে রাখলেন ভিজা কাপড়খানি; তারপরে উঠোনে শুকোতে দেওয়া চ্যালার মধ্যে থেকে পাতলা একখানি চ্যালা হাতে করে এগিয়ে এলেন।

মাকে চ্যালা হাতে এগিয়ে আসতে দেখেই পাতলাপানা পুঁচকে কার্তিক ঘরের ছাচে দৌড়ে পালাল, ভাঁদারাম গণেশ ভ্যাঁ ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে উঠে বলল,—আমাকেই ত আগে কান মলে দিচ্ছিল।

মা কার্তিককে ডেকে বললেন, কার্তিক—কথা শোন—

কার্তিক ছাচ থেকেই বলে উঠল, একেবারে মিছে কথা মা—কান মলি নি।

মা বললেন, ভাল চাও ত আগে এদিকে বেরিয়ে এস—নইলে আমি আজকে হাড় একদিকে আর মাস একদিকে করে ছাড়ব বলে দিচ্ছি। এখন পালালে চলবে না, ঘরে আমার হাতের কাছে আবার আসতে হবে, তা মনে থাকে যেন।

কার্তিক মাকে ভাল করেই জানে, মা যেদিন ধরেন সেদিন আর আস্ত রাখেন না; সুতরাং

ভয়ে ভয়ে আগে থেকেই দুই হাতে দু'টি কান ধরে কার্তিক ঘরের চাঁচ থেকে উঠোনে মায়ের কাছে গুটি গুটি চলে এল।

দেখে মা বললেন, ও সব ন্যাকামিতে চলবে না আজ; আগে বল, কেন দাদার কান মলে দিয়েছ।

ভয়ে মুখ কাঁচুমাচু ক'রে কার্তিক বলল, সত্যি বলছি, কান মলি নি, লম্বা কান দু'টো একটু এমনি করে নাড়িয়ে দিয়েছিলুম।

ধমক দিয়ে মা বললেন, তাই বা কেন করবে, বাঁদর ছেলে? কত দিন তোমাকে বারণ করি নি দাদার কানে হাত দিতে?

কার্তিক সহসা রাগে ফেটে প'ড়ে মুখ লাল করে বলল,—তা হলে ওই বা রোজ রোজ আমাকে 'দু'টা মুখ, বারো চোখ—জল খায় তের ঢোঁক' ব'লে ব'লে খেপাবে কেন, সেটা বুঝি কিচ্ছু না, না?

মা গণেশের দিকে তাকিয়ে বললেন, গণেশ, তোমারই বা রোজ রোজ এই সব ক্যাবলামি কেন? ছোট ভাইকে অমন ক'রে খেপাবারই বা মানে কি?

গণেশ বলল, তুমি ত দেখ নি, ও যে সারা সকাল একটা কাঠি দিয়ে আমার নাক নেপে নেপে কেবল গান গাইছিল, 'তিন হাত নাক লম্বা, খায় শুধু রম্ভা'!

দু'টোই সমান—বলে মা দু'টোরই মাথা টেনে এনে ঠোকাঠুকির ব্যবস্থা করতে যাচ্ছিলেন—এমন সময় দূর থেকে মহেশ ঠাকুরের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, কি রে গণশা, কিরে কার্তিকে, তোরা এখনও ওখানে বসে কি করছিস্ রে?

করছে আমার মাথা আর মুণ্ডু, দু'টো পাপে আমাকে দিনরাত্তির জ্বালিয়ে খায়—ব'লেই মা কার্তিক-গণেশ দু'জনের মাথায়ই দুই চাঁটি মেরে ছেড়ে দিলেন। দু'জনেই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদি কাঁদি ভাব করছে—মাও আবার জলের কলসির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন—এমন সময়ে গলার পৈতেটার জট ছাড়াতে ছাড়াতে খড়ম পায়ে মহেশ ঠাকুর উঠোনে প্রবেশ করলেন। বললেন,—ওই বুড়ো ষাঁড়টাকে তোরা এখনও গোয়াল থেকে বের করতে পারলি নে? তোদের না কাল রাত্তিরেই বলেছিলুম ওটাকে বনে জঙ্গলে নিয়ে হাতে ধরে একটু কাঁচা ঘাস খাইয়ে আনতে?

মা মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলেন, বললেই ত হবে না, অত বড় বেয়াড়া ষাঁড়কে সামাল দিতে পারে এই সব কাচ্চা বাচ্চা?

মহেশঠাকুরও ভেঙচি কেটে বললেন, আহা হা, কি আমার সব কাচ্চা বাচ্চা, যেন ঘর ছেড়ে আর সারা দিন বেরোন না, লক্ষ্মী ছেলে হয়ে ঘরেই বসে থাকেন!

মা বললেন, ঘরে ব'সে না থাকলেও রোজ রোজ ছেলে দু'টো অত বড় ষাঁড় নিয়ে বনে-জঙ্গলে, আদাড়ে বাদাড়ে ঘুরতে পারবে না। ওটাকে কি ওরা ধরে রাখতে পারে? ওদের টেনে নিয়ে পালায়, বেঁধে রাখলে দড়ি ছিঁড়ে পালায়, এর গাছ ভেঙে তচ্‌নচ্ করে, ওর ফসলের খেত মাড়িয়ে নষ্ট করে, এই নিয়ে যত রাজ্যের লোকের মুখ ঝামটি খেয়ে মরে ছেলেগুলো। সেদিন ত ওটাতে কার্তিককে পেছন থেকে গুঁতিয়ে মেরেছিল আর কি!

মহেশ ঠাকুর বললেন, বেশ ত, ও সব পাতলা পাতলা সোহাগের কথা ত সব বেশ বুঝতে পারলাম, কিন্তু ও জীবটাকেও ত বাঁচিয়ে রাখতে হবে? কাল ত ভোর বেলা বেরিয়েছি সন্ধ্যাবেলা ফিরেছি। সারাটা দিন এ গ্রাম থেকে ও গ্রাম ঘুরেছি ওটার পিঠে পিঠে; না ঘুরলে আজকাল কেই বা দেব-দ্বিজের জন্যে নৈবেদ্য-ভুজ্যি নিয়ে বসে থাকে? কাল সারা দিনে ওটা কিছু খেতে পায় নি, তাই

বলেছিলাম আজ আমি বেরোবার আগে ওটাকে একটু আফেপাশে কাঁচা ঘাস চরিয়ে নিয়ে এলেই হত

ওরা তা পারবে না বলে দিচ্ছি—ব'লে মা কলসি কাঁখে নিয়ে ঝুন্ ঝুন্ শব্দে ঘরে ঢুকলেন।

মহেশ ঠাকুর বললেন,—তা কেউ পারবে কেন? সময় মত চারবেলা দুক্তি বাড়তে পারবে সবাই; কেবল দুক্তি কোথেকে আসে।—ব'লে মহেশ ঠাকুর আর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন না, উঠোনের একটু দূরেই একটি বেলগাছের নীচে একটি মাটির ঢিবিতে গিয়ে বাঘছালের আসনখানি বিছিয়ে বসলেন। বেলগাছ হ'লেও গাছটি প্রকাণ্ড, ছায়াও বেশ, বছরে বড় বড় বেলও ধরে প্রচুর। চালচুলিহীন সংসারে সে কথাটাও ফেলবার নয়। এরই নীচে মহেশ ঠাকুর কবরে মতন এবং প্রয়োজন হলে হাত মাথায় দিয়ে একটু অর্ধশয়নের মতনও ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। ঘরের কামেলা এড়াতে হ'লে সন্ধ্যা-আহ্নিক, জপ-তপের নাম ক'রে ঠাকুর গোসাঁই এখানেই এসে নিমীলিত বা অর্ধনিমীলিত নেত্রে বোম্ ভোলা হয়ে বসে থাকেন।

কিছুকাল এইভাবে বিষমূলেই সময় কাটছে: অর্ধনিমীলিত নেত্রের ফাঁক দিয়ে মহেশ ঠাকুর দেখতে পেলেন, প্রৌঢ় একটি লোক তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। লোকটির পরণে একখানি ময়লা কাপড়, গায়ে জড়ান একখানি ময়লা চাদর। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, একসময়ে যেন বেশ ভাগড়াই চেহারা ছিল, এখন যেন কেন শুকিয়ে বিভিকিচ্ছি হয়ে গেছে। বড় ঘরের লোক যেন দুরবস্থায় পড়েছে।

লোকটি সোজা এসে মহেশ ঠাকুরের বেদীর নীচে ব'সে প'ড়ে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করল।

মহেশ ঠাকুর খানিকক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন,—তুমি কে বাবা; মুখখানা যেন চিনি চিনি মনে হচ্ছে, কিন্তু ঠিক ঠাহর করতে পারছি নে।

লোকটি পথশ্রমে এবং মনঃকষ্টে একটা দীর্ঘশ্বাস

এখন ত বড় লাচারে পড়ে গেছি।...

ফেলে বলল, আগে ত একসময়ে একটু একটু চিনতে ঠাকুর গোসাঁই, এখন ত বড় লাচারে পড়ে গেছি, এখন আর কেউ চিনতে পারে না।

মহেশ ঠাকুর সহানুভূতির সুরে বললেন, একবার নামটি শুনতে পাই?

লোকটি বলল, আমার নাম ভীম।

—নিবাস?

—ছিল ত হস্তিনাপুরে, এখন যেখানে ঠাঁই পাই।

—তুমি কি বাবা সেই যুধিষ্ঠিরের ভাই ভীম?

—ছিলাম ত তাই; এখন আর সেই সব পূর্ব পরিচয় দিয়ে লাভ হবে কি ঠাকুর গোসাঁই।

—ব'স বাবা, ভাল করে ব'স। তোমার এমন দুরবস্থা হ'ল কি করে ?

—বড় লাচারে পড়ে গেছি ঠাকুর। দেশে পর পর দু' সন অজন্মা ; ধান-গম যেমন অপ্রাপ্য তেমন মাগ্‌গি। দাদার আমি দোষ দি না, দাদা অনেক দিন আমাকে খাইয়ে পরিয়ে রাখবার অনেক চেষ্টা করেছে ; শেষে দাদার নিজেরই আর রাজা চলে না, তা আর আমাকে খাইয়ে রাখবে কি করে। এখন ত ঠাকুর অন্নচিন্তা চমৎকারা ; না খেয়ে না খেয়ে দেহের অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তা ত দেখতেই পাচ্ছ ; ভীম ব'লে পরিচয় দিলেও এখন আর কেউ ভীম ব'লে স্বীকার করবে মনে হয় না। এখন ত ঠাকুর অনন্যোপায় হয়ে এসে পড়েছি তোমার কাছে।

মহেশ ঠাকুর একটু বিমর্ষভাব প্রকাশ ক'রে বললেন, আমার কাছে যে এসেছ বাবা, আমি তোমার কি সাহায্য করতে পারি ? আমি ত দেখ গরিব ব্রাহ্মণ, এই চালটা কলাটা যেখানে যা পাই তাই দিয়ে কোনও রকমে সংসার চালাই।

ভীম বলল, সে আর বলতে হবে কেন ঠাকুর, সে ত আমার অজানা নেই। তবে দেখ, তোমার কাছে যে এসে পৌঁছেছি তারও একটা কারণ আছে ; যতই লাচারে পড়ি, একটা মান-মর্যাদা ত আছে, সবার কাছে ত গিয়ে আর উপস্থিত হতে পারি নে !

মহেশ ঠাকুর মাথা নেড়ে বলেন, তা ত বটেই।

ভীম বলে, দিন যখন আর চলে না তখন একদিন দাদাকে বললাম, দাদা, এখন কি বুদ্ধি করি ? দাদা বললেন, ভাই নিজে যখন ব্যবস্থা করতে পারছি না তখন আর কি বুদ্ধি দেব ; এখন যে যার নিজের বল-বুদ্ধির উপরে নির্ভর করেই চল, দাদা এখন গাধা ! নিজে নিজেই তখন ভাবতে বসলাম ; অনেক ভেবেচিন্তে দাদাকে গিয়ে একদিন বললাম, দাদা, আচ্ছা কৈলাসে গিয়ে যদি মহেশ ঠাকুরের বলদটি বাগি আর তার জন্যে সে যদি দু'বেলা দু'টি খেতে দেয় তবে কেমন হয় ? দাদা বললেন, দেখ গে মহেশ ঠাকুরের সঙ্গে কথা ব'লে ; তিনি যদি তাতে রাজি হন তবে আমার বিশেষ আপত্তি নেই। মহেশ ঠাকুরের কাজ, তা সবাই ক'রে দিতে পারে, তাতে কোন মান-অপমানের কথা নেই। এখন ত ঠাকুর তোমার চরণে এসে পড়েছি, যা হয় অনুমতি কর।

মহেশ ঠাকুর বললেন, লোকের যে দরকার একটা ছিল না তা নয় ; তবে সামাল দিতে পারব কি না সেটাই হচ্ছে কথা। তা তুমি এসেছ যখন, একটু ব'স, আমি ঘরে একবার গণেশের মার সঙ্গে কথা বলে আসি।

মহেশ ঠাকুর গিয়ে ঘরে এ প্রস্তাব দিতেই গণেশের মা বললেন, তা ভালই হবে। একটা লোকের খাওয়া তা যেমন করে হোক চলে যাবে। কষ্ট আমার একটু হবে, তা হ'লেও এই ছেলে দু'টোকে ঐ বলদ দিয়ে আমি একা একা বনে পাঠাতে ভয় পাই : ওরা বলদের গুঁতো খায়, লোকের গালমন্দ আর তাড়া খায়—আবার পাহাড়ি বন-জঙ্গল—সাপ-বাঘেরও ত ভয় রয়েছে, সঙ্গে একজন বয়স্ক লোক থাকলে আমি নিশ্চিন্ত হই। আমার গায়ের উপর দিয়ে ওঠে উঠুক, মনে ত একটু সোয়াস্তি পাব !

মহেশ ঠাকুর বেরিয়ে গিয়ে ভীমকে বললেন, তা হ'লে তাই ঠিক রইল ; গরিবের ঘরে একটু কষ্টেসৃষ্টে থাকতে হবে বাবা। তুমি ত এখানকার দেশ-গাঁয়ের কথা পথ-ঘাটের কথা জান না কিছুই, পাহাড়ি দেশ—বড় এবড়ো খেবড়ো—আর বন-বাদাড়ে ভরা ; সাপ-বাঘ প্যাঁচা-মশুর—এসব নিয়ে ত আমাদের ঘরই করতে হয়। তা এখন আগে যাও, মা ঠাকরুণের কাছ থেকে চেয়ে এক মুঠো

চাল আর একহাড়া জল খেয়ে একটু বিশ্রাম করে নাও, কাল সকাল থেকে বলব নিয়ে বেরোবে।

আশ্বাস পেয়ে ভীম মহেশ ঠাকুরের পায়ে আবার চুনিয় প্রণাম ক'রে গুটি গুটি বাড়ির ভিতরে চলে গেল। দোরা বারান্দের কাছে এসে ডাক দিল, ওগো মা জগজ্জননি, একবার রাঙা পায়ের দর্শন চাই মা।

মা চাল ধোবার জন্য কাংস্যপাত্রে চাল নিয়ে বেরোচ্ছিলেন, ভীমের গলার আওয়াজ পেয়ে লাল পাড়ের ঘোমটা মাথার উপরে একটু টেনে দিয়ে সেই চালভরা পাত্র হাতেই হাসি মুখে এসে দাঁড়ালেন দুয়ারের কাছে।

ভীম বলল, এই যে অন্নপূর্ণা মা আমার অন্ন হাতে নিয়েই যে একেবারে দেখা দিলে! ভীম এগিয়ে গিয়ে মায়ের রাঙা পায়ের ধুলো গ্রহণ করল—তাকে মাথায় ছোঁয়াল, বুকে ছোঁয়াল, আর জিভে ছোঁয়াল। তারপরে আবার বলল, আবার ত এসে জুটলাম এক আপদ।

মা হেসে মিষ্টি মুখে বললেন, আপদ আর কি, আমাদের যেমন চলে তেমন ক'রেই চলে যাবে; গরিবের ঘরে একটু কষ্টেসৃষ্টে চলতে হবে।

ভীম দুয়ারের কাছের মাটির ধাপের উপরে ব'সে প'ড়ে বলে,—ওসব কথা আর বলতে হবে না মা, আমাকে পর ভেব না। তবে যদি অভয় দাও মা, তোমার চরণে দু'একটা কথা নিবেদন করি।

মা আবার হেসে বলেন, ভয় কি, নির্ভয়েই বল।

সুধাময়ী মায়ের কথায় সত্যই সুধা ক্ষরে, মৃদু হাসিতে ব্যক্তিত করুণাময়ীর করুণা! ভীম একটি বারের জন্য তাকিয়ে দেখে, অতসীপুষ্পবর্ণাভা মায়ের নিরাভরণ দেহে ঐ একখানি লাল পাড়ের কাপড়, কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা,—আর হাতের দুগাছি সাদা শাঁখা কি অপূর্ব রূপ ধরেছে!

ভীম মাথা নীচু ক'রে মৃদু কণ্ঠে বলল,—আমার একটা দোষ আছে মা, তার জন্যেই এই দুর্দিনে কেউ আমাকে একদিনের বেশি দু'দিন ঠাঁই দেয় না। তোমাকে খুলে বলি, এর আগে আরও দু'চার জায়গায় গেছি, কাজ কর্ম দেখে সবাই প্রথমে আমাকে আদর ক'রে রেখেছে, কিন্তু শেষে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে। তোমার কাছে মাগো আগে ভেতো পরে মিঠে ভাল, তাই ভাবছি আগেই ব'লে ক'য়ে নি।

মা বললেন, বেশ ত বলেই ফেল না।

ভীম বলল, কথাটা মা একটু সঙ্কোচের, তাই বলতে আগুপিছু করছি। খোরাকটা মা আমার একটু বেশি। পূর্বের সে দিন নেই মা তা বুঝি, কিন্তু বুঝেও ত একদিনেই আর পেটের খোলটাকে কমিয়ে ফেলতে পারি না। তোমাকে ঢেকে চেপে আর কথা বলে লাভ কি, তুমি মা যে ক'টি চাল তোমার ঐ পাত্রে নিয়েছ ও কটি চাল মাগো জগজ্জননি, তোমার আশীর্বাদে এখনই এক ঘড়া জল দিয়ে গিলে রাখতে পারি।

শুনে মায়ের বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল, মুখখানিও সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে উঠতে চাইল; মা যে জোর ক'রে মুখের হাসি টেনে রেখে সেই ফ্যাকাসে ভাব ঢাকতে চাইছেন সে জিনিসটি ভীমের অজ্ঞাত রইল না। মাকে আশ্বাসিত করবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ভীম বলে উঠল,—অবশ্য পারলেও রোজ আমি অতটা ক'রে খেতে যাব কেন, আমারও ত একটা বুদ্ধি-বিবেচনা রয়েছে। তবে মা, হ্যাঁ, এ-কথাও খোলাখুলি ব'লে রাখছি, কিছু বেশি খাব—তাই জেনেশুনেই আমাকে রাখবে; পান্তা দাও—তপ্ত দাও—তাতে এখন আর বাদ-বিচার নেই—শাক দাও—পাতা দাও—তাতেও আপত্তি নেই, কিন্তু পেটটা আমার মোটের মাথায় ভরা চাই। শেষে যে পেছনে ফিস্‌ফাস্ ফুস্‌ফাস্ শুনতে

পাব, আবাগোর ব্যাটা বড় বেশি খায়—ওতে কিন্তু আমার বড় ঘেন্না লাগে—বড় বেজাজ চড়ে যায়, সে-কথা আমি প্রথমেই বলে রাখছি।

মা তাঁর শুষ্ক কণ্ঠকেই একটু ঢোঁক গিলে ভিজিয়ে নেবার চেষ্টা করে বললেন,—কত বেশি আর খাবে—একরকম চলে যাবে।

জোড় হাতে ভীম বলে, তুমি মা অভয়া, অভয় দিলেই বেঁচে যাই।

পরদিন সকাল থেকে মহেশ ঠাকুরের বলদ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ভীম, সঙ্গে যায় কার্তিক আর গণেশ। কার্তিক-গণেশের আনন্দ আর ধরে না। এতদিন এই কৈলাস পাহাড়ের আদাড়ে-বাদাড়ে বনে-জঙ্গলে বেয়াড়া বলদ নিয়ে ঘুরতে হত তাদের, ঝামেলারও অন্ত ছিল না—ভয়েরও অন্ত ছিল না। জোঁক-পোক বিচ্ছু-মাকড়ের ত কথাই ছিল না, সাপ-ভক্ষক—বাঘ-ভাল্লুকের ভয়ও কম ছিল না। একদিন ত গণেশের শুঁড় জড়িয়ে ধরেছিল প্রকাণ্ড এক মেঘডম্বর সাপ, বলদটাই তার শিঙ দিয়ে আর খুর দিয়ে গুঁতিয়ে মাড়িয়ে তবে তাকে তাড়ায়। কার্তিক অবশ্য চালাক ছেলে, দাদা গণেশকে বলদের কাছে বসিয়ে গিয়ে উঠত কাঁচা-ডাঁশা ফলের গাছে, নামত বাড়ি ফেরার আগে। কিন্তু একদিন সে কি বিপদ, গাছের ঝোপডালের মধ্যে চুপটি করে বসেছিল কালো এক ভাল্লুক, চট্ করে বেরিয়ে পড়ে সে খপ্ করে কার্তিককে মহাসমাদরে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরল; কার্তিক ত একেবারে পাঁজরার হাড় ভেঙে দম বন্ধ হয়ে মারা যাবার অবস্থা; একসঙ্গে ছয়মুখে কার্তিক হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠতে ব্যাটা হঠাৎ ভয় পেয়ে ছেড়ে পালাল।

ভীম সঙ্গে থাকাতে এখন তারা নির্ভয়, তাই তাদের মহা আনন্দ। এখন তারা সাহস করে দূরের দূরের বনে যায়, নোতুন নোতুন গুহায় লুকোচুরি খেলে, নোতুন নোতুন ঝরণার জল খাবার নাম করে ঝরণার জলে সারা শরীর ভিজিয়ে আসে।

কয়েকদিন ভীম নিজের হাতেই দড়ি ধরে বলদ চরাত; নোতুন নোতুন কাঁচা ঘাস খেয়ে বলদটিও অল্পদিনেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠতে আরম্ভ করল, দেখে মহেশ ঠাকুরও বেশ খুশি। সন্ধ্যাবেলায় এখন ঠাকুর নিজেই হাত বাড়িয়ে ভীমকে কলকে-প্রসাদ দেন। ভীমের আপত্তি নেই কোনটাতেই। তারপরে দু'জনেই বেশ নশ্‌গুল হয়ে গাল-গল্পে কাটিয়ে দেন অনেকটা রাত সেই বিল্বমূলেই।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই ভীমের বৈক্লব্য দেখা দিল। ভীমের আহার সম্বন্ধে গণেশের মা প্রথম থেকেই বেশ একটু সাবধান এবং হিসেবী। বুঝলেন, এত তপ্ত খাওয়ান সম্ভব নয়; তাই রাত্রে এক হাঁড়ি জল দিয়ে পান্তা রেখে দিতেন; ভীম তৃপ্তিসহকারেই সেটা লঙ্কা-লেবু সহযোগে চালিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ত। কিন্তু নিত্য নিত্য এত পান্তায় ভীমের নেশা ধরে যায়, গা টলমল, চোখ ঢুলু ঢুলু করে; ভীম কার্তিক-গণেশকে ধমক দিয়ে বলদের কাছে বসিয়ে রেখে যায়, নিজে গিয়ে বড় গাছের ছায়ায় বাহুখানি শিথানে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। অবশ্য বাঁচোয়া এই যে ভীম অল্পক্ষণের মধ্যেই এমন ভাবে নাক ডাকাতে আরম্ভ করে যে বনের হিংস্র পশুরাও আর সহজে কাছে আসতে সাহস পায় না।

বলদও এখন নোতুন নোতুন ঘাসের স্বাদ পেয়ে কোথায় কোন্ দুর্গম বনে কন্দরে চলে যায় কার্তিক-গণেশ তার হদিশ করতে পারে না। একদিন ঘুম থেকে জেগে উঠে ভীম দেখল, অনেক বেলা হয়ে গেছে। আজ আবার মহেশ ঠাকুরের সকাল সকালই অনেক দূরে চলে যাবার কথা, সেখানে যাগ-যজ্ঞের ভাল কিছু দেনা-পাওনার কথা আছে। বলদ যে কোথায় চলে গেছে তার আর

কিছুতেই খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ভীষণ মেজাজ খারাপ হয়ে যায় ভীমের। বলদ না পেয়ে বনের লতাপাতা এনে কার্তিক আর গণেশের পায়ে বেঁধে উল্টো করে দু'জনকে ঝুলিয়ে দেয় দুটি গাছের ডালে। বলদ খুঁজে পেয়ে তাদের নাবিয়ে নিয়ে ভীম শাসিয়ে দেয়, বাড়িতে গিয়ে কিছু বললে পরের দিন ঝুলিয়ে দেবে আরও বড় গাছের মগডালে। ভয়ে কার্তিক-গণেশ আর টুঁ শব্দটি করে না।

একদিন বলদ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ভীম, বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে বলদের গলায় পরিয়ে দিল দুটো নোতুন দড়ি, তার একটা দড়ি

সে কার্তিক-গণেশকে সেই পাহাড়ি পথেই হ্যাচড়াতে হ্যাচড়াতে টেনে নিয়ে চলে গেল অনেক দূরে।

সে বেঁধে দিল গণেশের পেটে—অপরটা জড়িয়ে দিল কার্তিকের ছয় গলায়। বলে দিল, আজ নোতুন দড়ি বেঁধে দিলুম, আজ বলদ পালালে আর আস্ত রাখব না কাউকে।

তারপরে ভীম একটি পাহাড়ি পদ্মপুকুর থেকে কয়েকটা পদ্মপাতা ছিঁড়ে নিয়ে এসে সেগুলি একটা বৃদ্ধ বহেড়া গাছের তলায় বিছিয়ে নিয়ে যথারীতি নাক ডেকে লম্বা ঘুম দিল।

মহেশ ঠাকুরের বৃদ্ধ বলদ কচি ঘাস খেয়ে নব যৌবন লাভ করেছে। সে কার্তিক-গণেশকে সেই পাহাড়ি পথেই হ্যাচড়াতে হ্যাচড়াতে টেনে নিয়ে চলে গেল অনেক দূরে। বলদ বন ছাড়িয়ে ঢুকে পড়ল গিয়ে একটি যবের ক্ষেতে। সে যব-ক্ষেতের মালিক ছিলেন লোহিতাক্ষ ঋষি। তিনি বেশি কথা বলবার লোক নন, সুতরাং ভর্ৎসনা-তিরস্কার প্রভৃতি কিছুর মধ্যে না গিয়ে তিনি বলদটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে নিজের গোহালে বেঁধে রাখলেন, কার্তিক-গণেশকেও সেই সঙ্গে বেঁধে রাখলেন সেই গোহালেই।

গোহালে বাঁধা পড়ে কার্তিক-গণেশ ভয়ে চুপটি ক'রে বসে রইল বটে, কিন্তু মহেশ ঠাকুরের বৃষ ত চুপ করে থাকবার পাত্র নয়, সে গর্জন শুরু করল বিষমভাবে। অনেক খুঁজতে খুঁজতে শেষে সেই শব্দ শুনে ভীম গিয়ে উপস্থিত সেই লোহিতাক্ষ ঋষির বাড়িতে। গোহালে একসঙ্গে বন্ধনদশা-গ্রস্ত বলদ এবং কার্তিক-গণেশকে দেখে ভীম চোখ

ছ'টোকে গোল্লা পাকিয়ে জিভ কেটে বলল,—হাঁ হে ঋষি ঠাকুর, এ করেছ কি! মহেশ ঠাকুরের ছেলে ছ'টোকে—

শুনে ঋষিও আঁৎকে উঠলেন, বললেন, অ্যাঁ—মহেশ ঠাকুরের ছেলে! তা কি ক'রে আমি জানব বাবা—বলেই তিনি প্রায় দৌড়ে গিয়ে কার্তিক-গণেশকে আর বলদটিকে ছেড়ে দিলেন।

ভীম অতি গম্ভীরভাবে বলল, কাজটা কি ভাল করেছ ঋষি? মহেশ ঠাকুরের কানে উঠলে—

কাজটা যে বেজায় অন্যায় হয়ে গেছে তাতে ত আর সন্দেহ নেই; লোহিতাক্ষ একটু ভড়কে গিয়ে বললেন, কাজটা ত অন্যায়ই হয়ে গেল, কি করে জানব? তা এখন উপায়? তুমি কে হে?

ঋষিকে ভড়কে যেতে দেখে ভীম আরও পেয়ে বসল। আরও গম্ভীর সুরে বলল,—আমি মহেশ ঠাকুরের অনুচর, নন্দি-ভৃঙ্গীর বদলে সম্প্রতি বহাল হয়েছি। কথাটা চেপে রাখতে হলে ঋষিঠাকুর ঐ মুখের মোলায়েম কথায় চলবে না, ছেলে ছ'টোকে একটু ভালো-অভালো দিয়ে ভাল করে খাইয়ে দাও।

ঋষি বললেন, তবে তুমিই বা বাদ যাবে কেন বাপু, তিনজনেই ব'সে পড় না।

ভীম যেন নিতান্ত তাচ্ছিল্য সহকারে বলল,—সে তোমার যা ইচ্ছে হয় কর।

ঋষি তাড়াতাড়ি ঘরে ভাত-ডাল ফলমূল যা কিছু ছিল সব এনে ভীমের সামনে উপস্থিত করলেন; ভীম এটা সেটা কার্তিক-গণেশকে একটু দিয়ে নিজেই সব গোগ্রাসে সাবাড় করতে লাগল। দেখে ঋষি ভাবলেন, এটা কোন্ হাভাতে হতভাগা, ছেলে ছ'টিকে ত কিছুই দিচ্ছে না। কিন্তু মুখে কিছু বলতে সাহস পান না।

ভীম একটু মুচকি হেসে বলল, কই হে ঠাকুর, এত বড় গোহাল তোমার, এতগুলো গোরু—একটু দুধ-দই কিছু নেই?

ঋষি দৌড়ে, ভিতরে গিয়ে এক হাঁড়ি ঘন দই নিয়ে এসে ভীমের সামনে রাখলেন। ভীম খাবলায় খাবলায় তার প্রায় সবটা শেষ করে বলল, কই হে ঠাকুর, ছেলে ছ'টোকেও একটু দাও।

ঋষি মুখখানা কাঁচুমাচু ক'রে বলল, দই ত আর নেই!

ভীম বলে, দই না থাকে ত দুধ দাও—তা ব'লে ওরা ছেলেমানুষ ছ'টো কিছুই খাবে না?

ঋষি দৌড়ে গিয়ে আবার ছ'বাটি ঘন দুধ এনে কার্তিক-গণেশের সামনে রাখেন।

ভীম হেসে বলে, এমন ঘন দুধে ঠাকুর বেশ একটু মোটা কলার দরকার!

ঋষি ঘরের থেকে কিছু কলাও বের করেন। দেখে ভীম বলে, পাহাড়ি মাটিতে বেশ ত কলা ফলিয়েছ ঠাকুর, দাও দেখি নি ছ'চার গণ্ডা এই দিকে।

বেশ ত কলা ফলিয়েছ ঠাকুর···

ভীম টপাটপ্ টপাটপ্ কিছু কলা মুখে পুরে দিয়ে বলল, না, মুখটা তুমি একেবারে বন্ধ করেই দিলে, আর মহেশ ঠাকুরকে কিছু বলা চলবে না। আচ্ছা তাহ'লে চলি এবারে।

পথে এসে ভীম কার্তিক-গণেশকে বলল, এই ছোকরা হাঁটো, বাড়িতে গিয়ে কি বলবি রে?

কার্তিক-গণেশ নীরবে চোখ-চাওয়া-চাউয়ি করে; ভীম ধমক দিয়ে বলে, চোখ পাট্ পাট্ করছিস্ কি রে হাঁদোরামের দল,—গিয়ে বলবি, পথের থেকে এক ঋষি মুনি আদর ক'রে ডেকে নিয়ে পেট ভ'রে খাইয়ে দিলেন, ভীম দাদা তেমন কিছু খায় নি, বুঝলি?

কার্তিক-গণেশ নীরবে হাঁ-সূচক মাথা নাড়ে।

আর এক দিনও এইরূপ। এদিন আর কারোর বাড়ি নয়, মহেশ ঠাকুরের ছাড়া বৃষ গিয়ে ঢুকল সোজা বিশ্বামিত্র মুনির আশ্রমের কলাবনে। টের পেয়ে মুনি খড়ম পায়ে দিয়ে বেরিয়ে এসে কটমট ক'রে তাকাতেই কার্তিক-গণেশের পিলে চমকে গেল; তারা চোঁচা দৌড়। দৌড়ে গিয়ে ঠেলে তুলল ভীমকে তার গাছের তলার ঘুন থেকে। নিতান্ত বিরক্তিসহকারে চোখ কচলাতে কচলাতে ভীম চলল বিশ্বামিত্র মুনির আশ্রমের দিকে।

মুনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে কাঁপছিলেন, ভীমকে দেখে যেন একেবারে দপ্ করে জ্বলে উঠে বললেন, —ব্যাটা, দেখতে ত বেশ একটা মোষের মত, একটা বলদ রাখতে পারিস্ নে ত করিস্ কিরে!

এতটা ভীমের সহ্য সইল না। ভীম বলল, ঠাকুর, একটু র'য়ে স'য়ে কথা কইবে, বয়সের কালে তোমার মত অনেক জপ-তপ-ওয়ালা মুনি-ঋষি দেখে নিয়েছি।

বিশ্বামিত্র বললেন, কি, তোর এত সাহস? গোরু চরানো চাকর আবার দম্ভ করিস্? ফের কথা বলবি ত ভস্ম ক'রে ফেলব।

ভীম বলল, দাঁড়াও ঠাকুর, ভস্মটা তবে তোমাকে করাচ্ছি। এই বলে ভীম হাতের কাছে একটা ছোট শালগাছ চড়াং ক'রে একটানে তুলে নিয়ে ধাওয়া করল বিশ্বামিত্র মুনিকে; সহসা মুনি দিগ্বিদিক্ না পেয়ে খড়ম ফেলে দে দৌড়। ভীম রাগের জ্বালায় সেই শাল গাছ দিয়ে মুনির আশ্রমের কতকগুলো ফলের গাছ আর ফুলের গাছ ভেঙে ফেলে বলদ নিয়ে কার্তিক-গণেশ সহ বাড়ি ফিরল।

সন্ধ্যায় বিশ্বামিত্র মুনি সব ব্যাপার নিবেদন করে এলেন মহেশ ঠাকুরের কাছে। সাহস পেয়ে কার্তিক-গণেশও বাপের কাছে খুলে বলল সব কথা।

'ধাওয়া করল বিশ্বামিত্র মুনিকে'

পরদিন সকালে মহেশ ঠাকুর ভীমকে ডেকে গম্ভীরভাবে বলে দিলেন, তুমি বাবা আবার হস্তিনাপুরেই চলে যাও, এই কৈলাসে তোমার পোষাবে না।

ভীম রাগে রাগে মুখে আর কোনও কথা না ব'লে কিছু না খেয়ে দেয়ে একা-একাই বলদ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ভেবেছিল, আজ আর দিনের বেলায় ফিরবেই না, কিন্তু ক্ষিদেয় ভীম বড় জব্দ হয়ে যায়। দুপুর পড়তে না পড়তে ফেরে বাড়িতে। গম্ভীর ভাবে প্রকাণ্ড হরীতকী গাছটার সঙ্গে বলদটা বেঁধে রেখে স্নান করে এসে খেতে বসে পড়ল পেছনের ছোট বারান্দায়। গণেশের মা থালায় করে ভাত আনেন, এক মুহূর্তে ভাত নেই! প্রকাণ্ড বাটিতে ক'রে ডাল আনেন, ডাল নেই! শাক-তরকারি দিতে আর শাক-তরকারি নেই! ফাঁপরে পড়েন গণেশের মা। প্রথমে ভীমেরটা দেন; ভীম চেঁচিয়ে বলে, ক্ষিদে যায় নি, আরও ভাত চাই, ডাল চাই। তারপরে মা নিজেরটা আনেন, ভীম বলে, আরও চাই। তারপরে মা মহেশ ঠাকুরের জন্য যে ভাগ তুলে রেখেছেন, তাও এনে দেন; যত দেন ভীম ততই বলে, আরও দাও —আরও দাও।

সর্বনাশ, হাঁড়িতে যে আর ভাত নেই! ঘরেও যে আর একমুঠো চাল নেই, একমুঠো ক্ষুদ-কুঁড়োও নেই। বলদ না পেয়ে সেই সকালে পায়ে হেঁটেই বেরিয়ে পড়েছেন মহেশ ঠাকুর, তিনি ফিরেই বা কি খাবেন! 'আবার আনছি' ব'লে সেই যে মা রান্নাঘরে ঢুকলেন, আর বেরোলেন না।

ভীম ব'সে ব'সে খানিকটা হাঁকডাক পাড়ে; সাড়া না পেয়ে একেবারে ক্ষেপে উঠে চেঁচিয়ে বলল, —ক্ষুদ-কুঁড়োর সম্বল নেই ঘরে, আবার বলদ চরাতে লোক চাই, লজ্জা করে না? সম্পদের মধ্যে ত দেখি ঘরের মধ্যে কয়েকটা একেবারে ঠনঠন হাঁড়ি —আর গোটা কয়েক কুটো-ফাটা ঝুলি, তাই নিয়ে আবার ঠাকুরালির ঠসক! আবার বলেন কি না হস্তিনাপুরে চলে যাও; তা ত' যাবই; এখানে কি এসেছি দিনরাত বনে গুহায় ঘুরতে—আর অনাহারে অর্ধাহারে শুকিয়ে মরতে? আক্কেল হয়েছে আমার খুব—এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি!

সব কথা রান্নাঘরে ব'সে শুনছেন গণেশের মা, মুখে টুঁ শব্দটি নেই। ঘরের জলে হাত দু'টো ধুয়ে ফেলে লজ্জায় অপমানে আঁচল বিছিয়ে অনাহারে মাটিতে শুয়ে রইলেন গণেশজননী।

মহেশ ঠাকুরের সেদিন বলদ ছাড়া কোলা ব্যাঙ পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা লেগে গেল। মহেশ ঠাকুর ফিরতে গণেশের মা চুপি চুপি ঝুলি থেকে ক'মুঠো চাল নিয়ে সিদ্ধ করে দিলেন। সারাদিনের ক্ষিদেয় মহেশ ঠাকুর গরম গরম সিদ্ধ ভাত খেয়েই উঠে পড়লেন। এতক্ষণে তিনি গণেশের মার মুখের দিকে তাকাবারও অবসর পান নি; এইবারে তাকিয়ে বললেন, একি গণেশের মা, তুমি এত মুখ শুকনো ক'রে বসে আছ কেন? শরীর কি তোমার খারাপ?

গণেশের মা প্রথমটায় কথা বলেন না, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকেন। বার বার শিব কথা তুললে মা এবারে মুখে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। বললেন,—দেখ, নিজের খেয়ালেই ত সারাজীবন চললে, এখন তুমি একটু শান্তমনে আমার কথা শোন। আজ ঘরের পরের কারোর কাছেই আর আমার অপমানের শেষ নেই।

মা তখন দুপুরের সব কথা খুলে বললেন। শুনে মহেশ ঠাকুর গুম হয়ে ব'সে রইলেন।

মা বললেন, দেখ আমি তোমাকেই কেবল দুষছি না; তুমি ত যথাসাধ্য করতে ত্রুটি করছ না, তবু ত সংসার কিছুতেই চলছে না। এখন আমার

"আমি তোমাকে ঐ বিদ্যে দিয়ে লাঙল গড়িয়ে আনব।"

হঠাৎ ঘরের বাইরের কাছাকাছি উঠোন থেকে শোনা গেল ভীমের গলা। ভীম গলাপ কণ্ঠে বলল, জগৎ-গোসাঁই মহেশ ঠাকুর আর জগজ্জননী মা ঠাকরুণ কথা বলছ, তার মাঝখানে কথা বলতি, বেয়াদবি মাফ কর মা-বাবা। আজ সারা দিকেল আমিও বড় মনস্তাপে ভুগেছি। আমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবই শুনেছি মায়ের কথা: মায়ের কথাই ঠিক কথা। তোমারও আর সে কাল নেই, আমারও আর সেকাল নেই: তুমিও এখন চাষ কর ঠাকুর গোসাঁই—আমিও তোমার সঙ্গে দিনরাত মন দিয়ে করব ক্ষেতির কাজ। এখনও ভীমের গায়েতে কিছু শক্তি অবশিষ্ট আছে—আর গলা ঘুরিয়ে আস্ফালন ক'রে সে শক্তি নষ্ট করতে চাই না, সে শক্তি ক্ষেতির কাজে লাগাব। তুমি কিছু ভয় ক'রো না ঠাকুর—ছায়ার মতন ভীম তোমার অনুচর হয়ে থাকবে।

জগৎ গোসাঁই মহেশ ঠাকুর এবার হেসে বললেন, তবে তা-ই ঠিক!

এইভাবে কতদিন চ'লে এসেছে বাঙলা দেশের ঘাটে-মাঠে জগৎ গোসাঁই মহেশ ঠাকুর আর

[illegible]

[illegible]

[illegible]

জগজ্জননী মা দুর্গার কথা। শুনে পণ্ডিতেরা বলেন, ছি ছি কানে হাত দাও, শুনলেও হয় অনন্ত পাপ। অপরে বলে না, না গো না—ঐ কাহিনীই বারবার করে শুনব। আমার দুঃখের সংসারের সকল কষ্ট-গ্লানি মান-অপমানের ভিতর দিয়ে জগৎ-গোসাঁই আর জগজ্জননী যদি বার বার করে এসে ধরা দিয়ে না থাকেন তবে তাঁরা আমার কিসের দেবতা? তাঁরা আমাদের সঙ্গে এমনি করে আমাদের মতন করে আসেন বলেই ত ভূমিষ্ঠ হয়ে বার বার বলতে ইচ্ছে হয়—ওগো জগৎ-গোসাঁই—ওগো জগজ্জননী—তোমরাই আমাদের চিরকালের দেবতা!

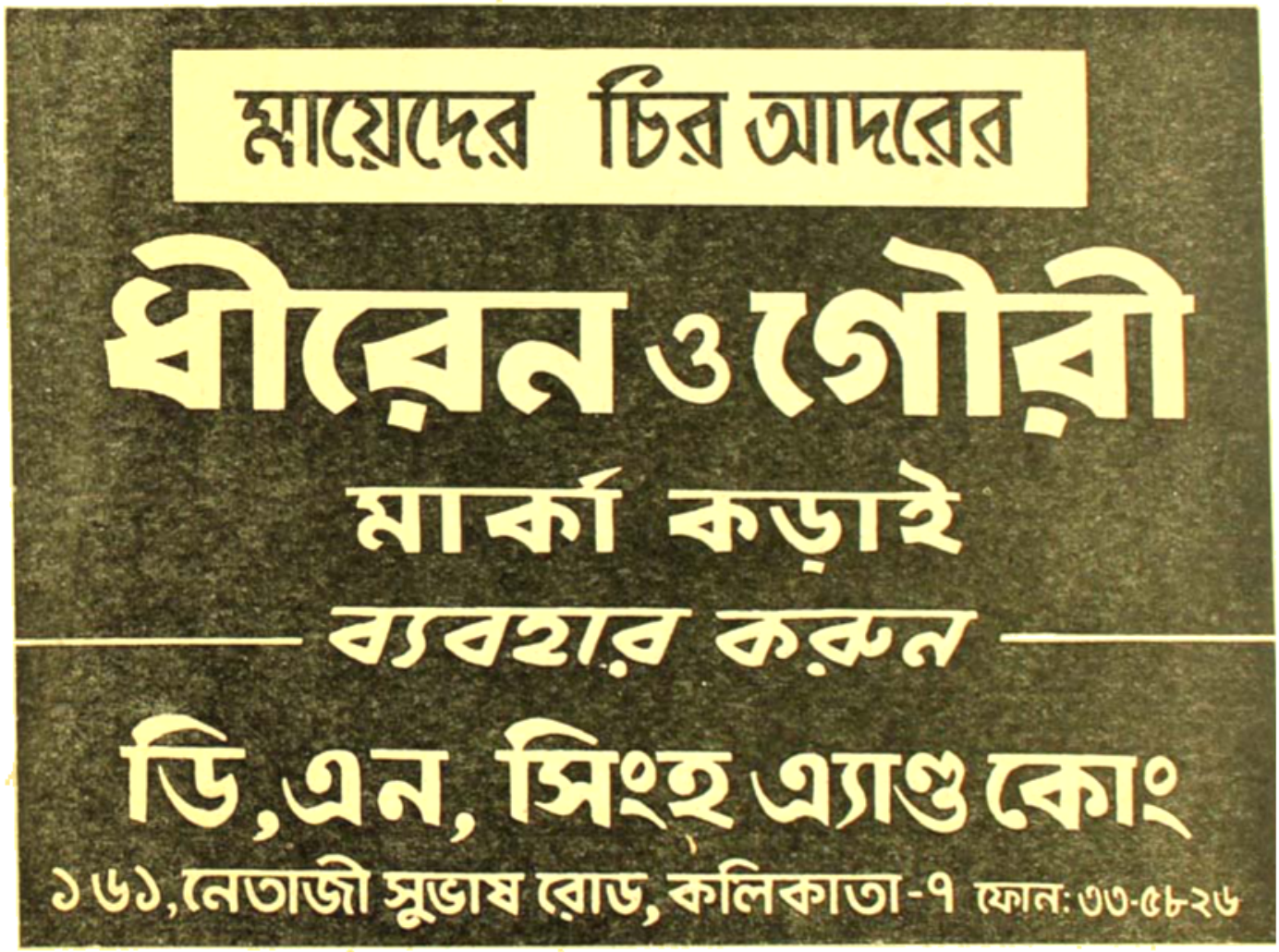

সে-কালের দুর্গোৎসব

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

(প্রবন্ধ)

মনস্বী রাজনারায়ণ বসুর "সেকাল আর একাল" শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই পাঠ করিয়া থাকিবেন। ইহাতে তিনি তাঁহার রাজনারায়ণের জীবদ্দশায় পঞ্চাশ বৎসর পরিবর্তনের কথা ইহাতে বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার শৈশবে বঙ্গীয় সমাজে অথবা বিশেষ করিয়া বলিতে গেলে তথাকথিত ভদ্রসমাজে কি অবস্থা ছিল এবং অর্ধ শতাব্দী পরে ইহা কি রূপ ধারণ করে তাহার বিষয় পুস্তকখানিতে সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আমাদেরও জীবিতকালে অর্ধ শতাব্দীর ব্যবধানে যে সব বিচিত্র ঘটনা ও পরিবর্তন দেখিতেছি তাহা তুলনা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। জগৎ চলমান,—জগতে আমরা নিয়ত প্রগতি বা উন্নতির পথে চলিয়াছি। এই মূল কথাটি মানিয়া লইয়া সে কাল আর এ কালের পর্যালোচনা করিলে সুধীমাত্রেই আমার মত বিস্ময়াপন্ন হইবেন বোধ হয়।

আমি এখানে একটি বিশেষ বিষয়ের কথা বলিতেছি। শিরোনামা হইতে পাঠক অবশ্যই বুঝিবেন—'সে-কালের দুর্গোৎসব'। বড় বড় শহরে এবং শহরের উপকণ্ঠে আজ দুর্গাপূজার সময় যে উৎসবের আয়োজন দেখি তাহা তো সকলেরই প্রত্যক্ষীভূত। দূর পল্লী অঞ্চলেও শহরে অনুসৃত নূতন নূতন পদ্ধতির রেশ পৌঁছিতেছে। এখন শহর পল্লীর পার্থক্য করা হয়তো খুবই কঠিন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে দৈনন্দিন ব্যবহারে বিজ্ঞানের প্রয়োগ এতটা সুরু হয় নাই। তাই ঐ সময়েই শহর ও পল্লীর বিভিন্ন ব্যাপারে, বিশেষতঃ উৎসবাদিতে এরূপ তারতম্য ঘটা সম্ভব ছিল না। আমি পল্লীর মানুষ, শৈশব পল্লীতে কাটিয়াছে। আর সে পল্লী শহর হইতে অতিদূরে এমন কি জমিদার বা ধনীসম্প্রদায়ও সেখানে ছিলেন না। সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ প্রায় সকলেই। কাজেই দুর্গোৎসবের স্বাভাবিক

রূপটি যাহা দেখিয়াছি তাহাই বলিতে চেষ্টা করিব।

দুর্গোৎসবের মূল উৎসব মাত্র তিন দিন ব্যাপিয়া, কিন্তু ইহার আরম্ভ ও শেষ যদি ধরা যায় তাহা হইলে সর্বসাকুল্যে তিন মাস হইবে। শ্রাবণ মাসের একটি ভাল তিথি দেখিয়া কুম্ভকার মূর্তি গড়িতে গৃহস্থের বাসভবনে আসেন। এই দিন হইতে কালীপূজা পর্যন্ত এই উৎসবটির জের নানাভাবে চলিতে থাকে। আমরা ছেলের দল অপেক্ষায় থাকিতাম কবে কুম্ভকার বাড়ীতে আসিবেন মূর্তি নির্মাণ করিতে। মূল কুম্ভকার একজন। কিন্তু সঙ্গে আরও দুই একজন সহকারী লইয়া আসিতেন। বাড়ীতে পৌঁছিলে আমাদের কি আনন্দ! তাঁহারা অন্তত পক্ষে দুইদিন থাকিয়া প্রাথমিক কার্য সমাধা করিয়া যাইতেন। প্রতিমার কাঠাম আগে হইতেই তৈয়ারী থাকিত, কুম্ভকারেরা খড় ও দড়ি দিয়া এক একটি মূর্তির 'ব্যানা' বা 'বিড়ে' বাঁধিত। মূল দুর্গা অসুর সিংহ লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক ও গণেশের এই রূপ 'ব্যানা' বাঁধিয়া তাহাতে মাটি লেপিতেন। তখনও কিন্তু মুণ্ড, হাত পায়ের আঙুল ও অলংকার সাজ-সজ্জা কিছুই করা হইত না। এইরূপ কার্যকে স্থানীয় পরিভাষায় প্রতিমার 'একমেটে' করা বলা হইত। এই পর্ব শেষ করিয়া কুমোরের দল চলিয়া যাইতেন। আমরা ছেলেরা এই দু' তিন দিন আহার নিদ্রা বাদে প্রায় সব সময়ই মণ্ডপে উপস্থিত থাকিতাম। কাজে ব্যাঘাত ঘটানোয় মূল কুম্ভকার আমাদের কত গালমন্দ করিতেন কিন্তু আমরা তাহাতে কর্ণপাতই করিতাম না। এক নাগাড়ে অতক্ষণ একই ব্যাপার দেখিয়া যে ক্লান্তিবোধ করিয়াছি ইহা তো আদৌ মনে হয় না। এতদিন পরে সেই অবর্ণনীয় আনন্দানুভূতি হয় তো লেখনীমুখে প্রকাশ পাইবে না। কিন্তু ইহার স্মৃতি এখনও প্রাণকে সরস করিয়া তোলে।

প্রতিমার মাটি শুকাইয়া যায়, কখন কখন গা ফাটিয়া চৌচিরও হয়। আমরা ভাবি কুমোর বা পাল মহাশয়েরা আবার কবে আসিবেন। আমরা আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষায় থাকিতাম। কুমোর তো আমাদের এক বাড়িতে মাত্র মূর্তি গড়েন না। তাঁহারা বিভিন্ন পল্লীতে গিয়া এক এক দল অন্তত আট দশখানা করিয়া প্রতিমা গড়িতেন। আবার বাড়িতেও কখন কখন কিছু কিছু গড়ানো হইত।

দ্বিতীয়বার কুমোরের দল আসিলেন, মনে হয় মাসখানেকের মধ্যেই। এবার প্রতিমা দো-মেটে করার পালা। আমরা ছেলের দল আবার মণ্ডপে কুমোর বা পালেদের আশে পাশে ভিড় করিতাম। তাঁহাদের ভ্রূকুটি বা গালমন্দ আমরা গায়ে মাখিতামই না। এবারে তাঁহাদের একটু সময় বেশি লাগে, প্রত্যেকটি মূর্তির মাথা হাত-পা-আঙুল, অলংকার, কাপড় পরান, মাজা ঘষা ইত্যাদি প্রায় তিন দিন ধরিয়া চলে। মূর্তিসমূহকে কাঠামে সাজাইয়া তাঁহারা চলিয়া যান। এই সময় হইতে বাস্তবিকপক্ষে পল্লীতে এবং পল্লীবাসীর নিজ নিজ গৃহে পূজা-উৎসবের সাড়া পড়িয়া যায়। যে বাড়িতে পূজা সে বাড়ির কর্তাব্যক্তিরা নিজেদের ভিতরে বিভিন্ন কাজ বণ্টন করিয়া লন। ছেলেমেয়েরাও শারদীয়ার আগমনী হৃদয় মন দিয়া অনুভব করিতে থাকে।

তৃতীয়বার কুমোর আসিলেন প্রতিমা রঙ করিতে। পূজারম্ভের সপ্তাহখানেক, কখন বা দু' তিন দিন পূর্বে। তাঁহারা মূল দুর্গা প্রতিমা এবং আনুষঙ্গিক মূর্তিগুলিকে নানা পর্যায়ে রাঙাইয়া একটি পরিণত রূপ দেন। তখন মানুষ আর দেবী-প্রতিমায় বড় ভেদ দেখিতাম না। প্রতিমার চোখ ফোটান হইয়াছে, হাত, পা, আঙুল, সাড়ি সকলই রঙ দিয়া বেশ সুন্দর করিয়া তৈরী হইয়াছে। আজকাল কলিকাতায় বা আশে পাশে দুর্গাপ্রতিমার যে রূপ দেখি সেকালে পল্লী অঞ্চলে সে-রূপ আমরা

কিন্তু আলো দেখি নাই। দুর্গা প্রতিমা সাক্ষাৎ মাতৃমূর্তি—গম্ভীর অথচ সস্নেহ বদনে প্রাকৃতজনের হৃদয়ে ভক্তি রসের উদ্রেক করিতেন। সেনাপতি কার্তিকের আজকালকার মত নবযুবারূপে বিকৃত ভাবে গঠিত না হইয়া সেনাপতির বেশেই আমাদের নিকট আবির্ভূত হইতেন। অসুর সিংহ বা অন্যান্য দেবতার রূপ বর্ণনা করিয়া আর কথা বাড়াইব না। এই যে, দুর্গা প্রতিমার রঙ দেওয়ার পালা এই সময় হইতেই আমাদের পল্লী পূজার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিত।

আমি এখানে পল্লীকে গ্রাম অর্থে প্রয়োগ করিতেছি। তখনকার দিনে, অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এই সব গ্রামের কম লোকই সরকারী চাকরী করিতেন বা কর্মব্যপদেশে দূরে থাকিতেন। গ্রামের অধিকাংশ লোকের জীবিকা গ্রাম হইতেই নির্বাহ হইত। অনেকের ভূমির উপস্বত্বের উপর নির্ভর। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীও বিস্তর। আবার বাহিরের সঙ্গে ব্যবসায় বাণিজ্যের যোগসূত্র রক্ষার জন্য এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণও ছিলেন। গ্রামীণ অর্থনীতি এই সব লোকের আয়ের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিত। চাষীও অনেক ছিলেন কিন্তু তাঁহারা প্রায় সবই মুসলমান। পূজা উৎসবে—এই মহাপূজায় শুধু বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যেই যে একটা আনন্দ হিল্লোল সুরু হইত তাহা নহে, প্রতিবেশী মুসলমান ভাইয়েরাও নানা কারণে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন। দুর্গাপূজাকে যে জাতীয় উৎসব বলা হয় তাহা এতটুকুও অতিরঞ্জন নয়।

প্রতিমা রঙ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বা ইহার কিছু পূর্ব হইতেই নারীদের মধ্যেও পূজা-উপচার সংক্রান্ত নানা কাজ সুরু হইয়া যাইত। সবই নূতন করিয়া করিতে হইবে। পূজার জন্য সংরক্ষিত ভূমি হইতে পাওয়া ধান ভানিয়া আতপ চাল করা হইত। আবার ইহার কতকাংশ হইতে চিঁড়া, খৈ প্রভৃতিও তৈরী হইত মণ্ডা প্রভৃতি করার জন্য। সর্বশেষ নারকেল নাড়ু। পূর্বাঞ্চলের নারিকেল আকারে বেশ বড়। এইরূপ ত্রিশ চল্লিশ বা পঞ্চাশটি নারিকেল হইতে একদিনে এক নাগাড়ে নাড়ু করা হইবে। বাড়ীর মহিলারা এবং প্রতিবেশিনীরা আসিয়া সানন্দে ঐ কার্যে যোগ দিতেন এবং এক প্রহরের মধ্যেই অতগুলি নারিকেল হইতে বিস্তর ছোট বড় নারকোল নাড়ু তৈরী করিতেন। তাঁহাদের এই এক একটি কার্য ছোটখাট উৎসবের আকার ধারণ করিত। প্রতিটি কাজের আরম্ভে হুলুধ্বনি দ্বারা ইহাকে স্বাগত করা হইত। পূজার সময় যতই ঘনাইয়া আসে বাড়ীর মহিলাদের কাজ ততই বাড়িয়া চলে। পূজার উপকরণের মধ্যে 'ফুলা সাজান' একটি অতি সূক্ষ্ম ব্যাপার, বত্রিশ কি তেত্রিশটি মাঙ্গলিক দ্রব্য দ্বারা এই ফুলা সাজান হইত। এ কাজটিও মহিলাদের নিজস্ব।

গ্রামের অধিকাংশ লোকেরই অবস্থা সচ্ছল নয় তথাপি মহাপূজার নিমিত্ত তাঁহারা বৎসরের আয় হইতে সামান্য কিছুও সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। পূজা নিকটবর্তী হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই নূতন বস্ত্র কিনিবারও আয়োজন হইত। এখানে একটি কথা বিশেষ করিয়া বলা দরকার। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে আমরা ছোট কি বড় একখানি করিয়া নূতন কাপড় মাত্র পাইলেই খুশি থাকিতাম। এখন সেখানে ইজার প্যান্ট সায়া ব্লাউস্ রকমারী রঙের ও ডিজাইনের সাড়ি ছেলে মেয়েদের নূতন জুতা এসবের জন্য মোটেই তাগিদের সূচনা হয় নাই। পল্লীবাসী আমরা একখানি মাত্র নূতন কাপড় পাইলে কতই না আনন্দিত হইতাম। আত্মীয় স্বজনের মধ্যে নূতন কাপড় দিবার রীতি ছিল, কিন্তু তাহাও জনপ্রতি সামান্য একখানি কাপড়, বড় জোর তাহার উপর একখানি চাদর। আর আজ কি দেখিতেছি। কি শহর কি পল্লী

সর্বত্রই পূজা সমীপবর্তী হইলে গৃহকর্তার প্রাণে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। সে নিরাবিল আনন্দ আজ নাই। নানাদিক হইতে তাগাদা ও "দাবী"র বহরে জীবন ওষ্ঠাগত হইয়া ওঠে।

অধিবাসের দিন হইতেই প্রকৃতপক্ষে পূজার সমারোহ আরম্ভ। এইদিন গোধূলির সময় 'নর' বা ঢাকী আসিয়া ঢাকের বাদ্যে মহাপূজার আগমন দিগ্‌দিগন্তে জানাইয়া দেয়। আমাদের ঢাকীর নাম ছিল ললিত। সে অধিবাস হইতে বিজয়া পর্যন্ত থাকিয়া পরদিবস চলিয়া যাইত। এই ক'দিন যে, কত রকম তালে দেই প্রকাণ্ড ঢাকে পূজার বিভিন্ন অঙ্গে বাদ্য হইত তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারিব না। প্রতিবেশীর পূজায় ঢাকী ছিল গৌরহরি। এই দুই ঢাকী মিলিয়া একই সময়ে যখন বাদ্য করিত তখন সমগ্র গ্রামখানি যেন বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিত! অধিবাসের দিন পুরোহিত ঠাকুর দূর হইতে আসিয়া আমাদের বাড়ীতে বাসা বাঁধিতেন। রাত্রে প্রতিমার সম্মুখে মঙ্গলঘটে সঙ্কল্প হইত। আমরা যাহারা পূজার ব্যয় নির্বাহ করিতাম তাঁহারা বাদে বাড়ীর অন্যান্য অংশীদারগণের নামেও সঙ্কল্প হইত। বাড়ীর বিভিন্ন অংশীর শতবিধ বাদবিসম্বাদ সত্ত্বেও এই দিনটিতে যেন আমরা নিজদিগকে এক পরিবারভুক্ত বোধ করিতে থাকিতাম।

মহাপূজা তো আরম্ভ হইয়া গেল। দূর ও নিকট হইতে আত্মীয়-স্বজনের আগমনে বাড়ি সরগরম হইয়া উঠিল। পূজা তিন দিন—মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী, মহানবমী। প্রতিমা রঙ হইবার পরই অপেক্ষাকৃত বড়রা মণ্ডপ সাজাইতেন বিভিন্ন রঙের কাগজের ফুল, লতা প্রভৃতির দ্বারা। সব মিলিয়া দেখিতে বড় চমৎকার লাগিত।

ছেলে মহলে ফুল তোলার উৎসাহ বেশ একটি লক্ষণীয় বিষয় ছিল। রাত্রির তৃতীয় যামেই তাহারা দলে দলে বাহির হইত পল্লীর বিভিন্ন বাড়ি হইতে ফুল তুলিবার জন্য। শুধু নিজেদের মধ্যে নয়—প্রতিবেশীর পূজার জন্যও ফুল তোলার আয়োজনে বেশ একটি সজীবতাপূর্ণ প্রতিযোগিতা দেখা যাইত। ফুল তোলা, মালা গাঁথা, ফুল দিয়া মণ্ডপ সাজান ইহাতে যে অনাবিল অভূতপূর্ব আনন্দ পাওয়া যাইত মনস্বী বিপিনচন্দ্র পাল একেশ্বরবাদী হইয়াও পরবর্তীকালে অন্য একটি সমাজের উৎসব সম্ভার তুলনামূলক আলোচনাকালে ইহার কথা উল্লেখ করিয়া ইহার প্রশংসায় মুখর হইয়াছিলেন।

সাধারণতঃ তিথি অনুযায়ী দিবসের প্রথম যামে মহাপূজা আরম্ভ হইত এবং তৃতীয় যামে ইহা শেষ। এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের পূজার্চনা ঢাক কাঁসীও তালে তালে বাজিয়া উঠিত। বাজনা শুনিয়াই বুঝা যাইত তখন কোন পর্ব চলিতেছে। শেষ বাদ্যভাণ্ড শুনা যাইত বলিদানের সময়। পরবর্তীকালে পশুবলি কতকটা বীভৎস বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে বটে কিন্তু সে সময়ে ইহার ভিতরেও একটা সরল বিশ্বাসজনিত গাম্ভীর্য ছিল। মহাপূজা অন্তে প্রতি দিন প্রতিমার পদতলে অঞ্জলি প্রদান সে আর একটি বড় সুন্দর বিষয়। একদিকে নারী অন্যদিকে পুরুষ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইতেন এবং পুষ্প বিল্বপত্রসহ পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে দেবীর পদতলে অথবা মঙ্গল ঘটোপরি তাহা তাঁহারা ছড়াইয়া দিতেন।

অঞ্জলির পরে পূজার অঙ্ক শেষ। ইহার পর চণ্ডীপাঠ আরম্ভ। পুরোহিত বা তদ্ধারক উদাত্ত অনুদাত্ত সুরে চণ্ডীপাঠ করিতেন। সহজ সরল সংস্কৃতে ছন্দোবদ্ধ করিয়া চণ্ডী রচনা। সুরথ রাজা দুর্গাদেবীর আরাধনা করিয়া কিরূপ সুফল লাভ করিয়াছিলেন চণ্ডীতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। সেদিন একজন যুবক বলিলেন, মূল রামায়ণের সংস্কৃত বেশ সহজ। বাস্তবিকই এমন সহজ সরল

ছন্দোবদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় রচিত বলিয়া হিন্দুর শাস্ত্র গ্রন্থটি আপনার সকলের এত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল সেই অতীত যুগে। চণ্ডীর নিগূঢ় তত্ত্ব তখন আমরা কিছুই বুঝিতাম না, কিন্তু ঠাকুর মহাশয়ের চণ্ডীপাঠ আমাদের অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হইত। কয়েক বৎসর আগে সবিজ্ঞ শ্রীনগানাবব্রত ব্রহ্মচারীর চণ্ডীর ব্যাখ্যান শুনিয়াছিলাম ইহার ভিতরে হিন্দুশাস্ত্রের সারকথা যে এমনভাবে বিধৃত রহিয়াছে তাহা তখনই মাত্র বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী কৃত পদ্যে চণ্ডীর অনুবাদ গ্রন্থ আছে। চণ্ডী মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আরও অনেকে লিখিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা এই সকল পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন। পর পর তিন দিন চণ্ডী পাঠ হইত। প্রবীণেরা সাগ্রহে ইহা শুনিতেন। ছেলেদের মধ্যে কেহ কেহ সে সুন্দর লালিত্যপূর্ণ পাঠে আকৃষ্ট হইয়া শুনিতে থাকিত চণ্ডীপাঠ। তিন দিনই পূজার অঙ্ক শেষ হইবার পর, মহাষ্টমী এবং মহানবমী পূজার দিন সকালের দিকেও এই চণ্ডীপাঠ চলিত। মহাপূজাকে চণ্ডীপাঠ গাম্ভীর্য ও মাধুর্যে ভরপুর করিয়া তুলিত।

বৈকালে প্রসাদ বিতরণের পালা। অধিবাসের দিন সন্ধ্যায় কি মহাসপ্তমীর দিন সকালে সমগ্র গ্রামের অধিবাসীবৃন্দকে পূজা দেখিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়া আসা হইত। এই আমন্ত্রণ হইতে উচ্চনীচ কেহই বাদ যাইতেন না। বর্তমান লেখকও পরে এক একবার এই রকম আমন্ত্রণে বাহির হইয়াছিলেন। সমগ্র গ্রামের অধিবাসীদের সঙ্গে এই যে পরিচিতি ইহা যেন পূজার মধ্যে একেবারে নিবিড় হইয়া উঠিত। শ্রেণী-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রায় সকলেই পূজা দেখিতে আসিতেন। পূজা শেষে বৈকালে প্রসাদ লইয়া গৃহে ফিরিতেন। প্রসাদ কি জানেন? অধিকাংশ ক্ষেত্রে দু'টি কি চারটি নারকেল নাড়ু, অবশ্য কখন কখন বাতাসাও দু' চারখানা দেওয়া হইত। একটি লক্ষণীয় বিষয় ছিল যে, প্রতিবেশী মুসলমানেরা তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের নূতন বস্ত্রে সাজাইয়া পল্লীর বিভিন্ন বাড়ীর পূজার্চনা দেখিতে পাঠাইতেন। অনেক সময় বয়স্ক নারীপুরুষও আসিতেন। নারকেল নাড়ু পাইয়া তাঁহাদের কি আনন্দ। এই প্রসাদ বিলি প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলি, গ্রাম নানা পল্লী বা পাড়ায় বিভক্ত। আমাদের পল্লীতে প্রতি গৃহস্থকে পূজার প্রসাদ স্বরূপ একখানি করিয়া নৈবেদ্য দিতাম। এক একখানি রেকাবে পোয়াটাক ভিজা আতপ চাল, কলা এবং সন্দেশ এই দিয়া নৈবেদ্য করা হইত। আমরা ছেলের দল কাদা বৃষ্টির মধ্যেও এই নৈবেদ্য বিলি করিতে দূর ও নিকট প্রতিবেশীদের বাড়ি যাইতাম। আর এইরূপ কার্যের পুরস্কার স্বরূপ পাইতাম দু'টি কি চারটি করিয়া নারকেল নাড়ু। পথিমধ্যে আমরা কিন্তু নৈবেদ্যে হাতই দিতাম না।

রাত্রে সন্ধ্যারতি। সেও এক আনন্দের ব্যাপার। আরতির বাদ্য আবার নূতন তালে চলিত। পুরোহিত ঠাকুর বয়োবৃদ্ধ হইয়াছিলেন তথাপি তিনি ছিলেন খুবই শক্তপোক্ত। বাদ্যের তালে তালে তিনি ধূপতি সহ নানা রূপ অঙ্গভঙ্গী-দ্বারা আরতি করিতে থাকিতেন। মণ্ডপের ভিতর এবং বাহির ধূনার গন্ধে ম ম করিত। ঠাকুর মহাশয়ের আরতি শেষ হইলে মণ্ডপের বাহিরে অন্যেরাও আরতি করিতে থাকিত। এইরূপে মহাপূজা শেষ হইত। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনের পূজা হইত দীর্ঘ সময় ধরিয়া। পূজার অঙ্গ এ দুই দিনে অনেকটা বাড়িয়া যায়। যজ্ঞ, সন্ধিপূজা প্রভৃতি লইয়া পুরোহিত ঠাকুর এবং অন্যান্যেরাও বেশ ব্যস্ত থাকিতেন। একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা দরকার। আমাদের ছেলে বেলায় দু'একবার 'নওপী' দেখিয়াছি। নওপী মানে মণ্ডপের ভিতরে পূজাদি যাবতীয় বিষয়ে

যোগান দেওয়া। ক্রমে দেখিলাম মণ্ডপের স্থান অধিকার করিয়াছেন বাড়ীর প্রবীণা বিধবা বা সধবা মহিলারা। তাঁহারা অতি নিষ্ঠার সঙ্গে পূজা সমাপন না হওয়া পর্যন্ত মণ্ডপের অভ্যন্তরে থাকিয়া সকল বিষয়ে যাজকের সহায়তা করিতেন। বস্তুতঃ দুর্গাপূজায় নারী পুরুষের স্থান সমান স্তরেই ছিল।

মহাপূজার গাম্ভীর্য ও মাধুর্য শৈশবে আমরা যেমনটি লক্ষ্য করিতাম পরবর্তীকালে তাহাতে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা পূজার দিন ক'টিতে সকল কার্যে নিজেদের ব্যাপৃত করিতাম। পরে পল্লীগ্রামেও থিয়েটার বা অনুরূপ রুচিক আমোদ-প্রমোদের আবির্ভাবে এই গাম্ভীর্যকে একেবারে চটুল ও হালকা করিয়া দিতেছিল। সেই আগেকার আনন্দানুভূতিতে যে এ সকল খানিকটা বিঘ্ন ঘটায় তা বলিতে বাধা নাই। মহানবমীর দিনে রাত্রি-জাগরণ পূজার অঙ্গ না হইলেও লোকাচারসম্মত ছিল। ইহার পর দিন দশমী। প্রতিমা বিসর্জন হইলে আমাদের ছেলেদের মনে কেমন একটা বিষাদের আবেশ লক্ষিত হইত। তবে, একটা কথা ভাবিয়া বড় আনন্দ পাইতাম—আমরা নদীতে 'দশরা' দেখিতে যাইব। বাড়ীর কর্তারা বড় নৌকা কখন একখানা কখন দু'খানা ভাড়া করিয়া আনিতেন কখন বা বিনাভাড়ায় প্রতিবেশি মুসলমানদের নিকট হইতে অমনি সংগ্রহণ করিতেন। তখনও পল্লী অঞ্চলে হিন্দু মুসলমানে কোন রকম রেশারেশি বা দ্বন্দ্ব কলহ দেখি নাই। পরস্পরে ভাই ভাই রূপেই বাস করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। আর দুর্গা পূজা সে তো সত্য সত্যই একটি জাতীয় উৎসব। হিন্দু সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী এবং নারী পুরুষের মধ্যেই কেবল একটা অভূতপূর্ব সাড়া জাগিত না, প্রতিবেশী মুসলমান সমাজও ইহার দ্বারা বিশেষ আকৃষ্ট হইতেন। পল্লীর অর্থনৈতিক কাঠামোতে হিন্দু মুসলমানের সংযোগ সমধিক। মহাপূজার সময় বিকি কিনি চলিত অবিরাম। কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই ইহাতে লিপ্ত থাকিয়া বেশ দু'পয়সা উপায় করিয়া লইতেন। আবার মহাপূজার ক'দিনে হিন্দুদের মত প্রতিবেশী মুসলমান পাড়া হইতে কত ছেলে মেয়ে নারী পুরুষ আসিতেন পূজা দেখিতে এবং পূজার প্রসাদ লইতে, একথা তো একটু আগেই বলিয়াছি। লক্ষ্য করিতাম আমাদের মত মুসলমান ছেলেমেয়েরাও নূতন বা 'জারিজুড়ি' পরিয়া আসিত। এইরূপ একটা ঐক্য বিজ্ঞমান থাকায় দশমীর দিনে তাহাদের নিকট হইতে সাহায্য পাওয়া বা লওয়া আদৌ আশ্চর্যের বিষয় ছিল না।

দশমীর দিন প্রতিমা বরণ মহিলাদের অবশ্য-করণীয় কার্য। পল্লীর বিভিন্ন বাসভবন হইতে নারীরা দলে দলে আসিয়া পূজা মণ্ডপে প্রতিমা বরণের জন্য ভিড় করিতেন। মূল পূজারীদের মহিলারা অগ্রে বরণ করিতেন, পরে অন্যান্যেরাও একে একে বরণ করিতে থাকিতেন। এ সময়টা আমাদের পক্ষে বড়ই আনন্দের ছিল। মহিলারা দুর্গা প্রতিমা এবং অন্যান্য প্রতিমার হস্তে নারকেল নাড়ু বাতাসা ইত্যাদি বসাইয়া দিতেন আর আমরা কাড়াকাড়ি করিয়া তাহা লইয়া খাইতাম। বড়দের নিষেধ বা গালমন্দ আমাদের গায়েই লাগিত না।

ইহার পর বৈকালে নৌকার উপরে প্রতিমা সাজাইয়া দশরায় যাইবার আয়োজন করা হইত। আমরা পুরোহিত ঠাকুরের যাত্রা-মঙ্গল মন্ত্র আওড়াইতে আওড়াইতে গৃহ হইতে যাত্রা করিয়া বাহির হইয়া নৌকায় উঠিতাম। নৌকা ভর্তি যেমন বড়, তেমনি ছোট'র দল। ঢাকী ঢাক বাজাইতেছে কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছে। আমরা নদীতে প্রতিমা বিসর্জন করিতে যে চলিয়াছি আশপাশ

গ্রামের সকলেই তাহা জানিতে পারিতেন। নদীতে নৌকায় কি দৃশ্য! নদীর প্রায় অর্ধেকটা জুড়িয়া বহু বহু নৌকার উপরে দেবী-প্রতিমা। বাজনা বাজিতেছে। আরতি চলিতেছে। কেহবা কূলে উঠিয়া জিনিসপত্র কিনিতেছেন। জলে ও স্থলে একটা আশ্চর্য রকমের মেলা বসিয়াছে। অনেকে ছোটরা উপরে উঠিতেন না। নৌকা এমন ভাবে মোড় করা হইত যাহাতে সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে সকল প্রতিমাই আমরা দেখিতে পাইতাম। গোধূলি লগ্নে প্রতিমা বিসর্জনের পালা। একে একে জলে প্রতিমা বিসর্জন হইতেছে। আনন্দ ও বিষাদ কেমন যেন পাশাপাশি চলিতেছিল। অর্ধ শতাব্দী পরেও তাহার রেশ হৃদয়ে অনুভব করিতেছি।

সেই আড়াই মাইল তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আমরা আবার বাড়ির সন্নিকটবর্তী হইলাম। ঢাকের বাদ্য এবং সময়োপযোগী সঙ্গীত জানাইয়া দিত 'নবমী' হইতে লোকজন ফিরিতেছে। আমরা বাড়িতে পৌঁছিয়াই দেখিতাম প্রায় সমগ্র উঠান জুড়িয়া আলপনা। তাহার মধ্যস্থলে মঙ্গল ঘট বসান। ইহার পার্শ্বে সেই অধিবাসের দিনের সেই মঙ্গলদ্রব্যাদি-সাজান কুলা। পুরোহিত ঠাকুর সম্মুখে আমাদের প্রতীক্ষায় বসিয়া। মঙ্গল ঘট বেষ্টন করিয়া আমরা চারিদিকে বসিতাম। তিনি এক একটি দ্রব্য মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক আমাদের কপালে ছোঁয়াইতেন। সকলের শেষে 'কুলা ছোঁয়ানো'। ইহাতে ঠাকুর মহাশয়ের খুব পরিশ্রম হইত। সকলের শেষে শান্তিজল! আমরা যে যাহার বস্ত্র দিয়া পা ঢাকিয়া মস্তকে পুরোহিতের ছিটান শান্তিজল ধারণ করিতাম। কখন এই সময় এবং সাধারণতঃ পরদিন আমরা বড়দের আশীর্বাদ লইবার জন্য প্রতিটি গৃহে গিয়া নমস্কার প্রণামাদি করিতাম। এই দিনটিকে 'বার দশরা'ও বলা হইত। নদীতে 'বাচ্' খেলা এবং মেলা ইত্যাদির দ্বারা এই দিনটির উৎসব প্রতিপালিত হইত।

মহাপূজা সমাপ্ত হইয়া গেলেও উৎসবের জের কিন্তু চলিত কালী পূজা পর্যন্ত। দুর্গাপূজাকে জাতীয় উৎসব বলিয়াছি। প্রতি গ্রামে সাধারণতঃ চার পাঁচখানার বেশি পূজা হইত না। কিন্তু উৎসবটি মনে হইত সর্বসাধারণের। আজকাল সর্বজনীন পূজার খুব চল হইয়াছে। আজিকার ছেলে মেয়েরা হয়তো মনে করিবে দুর্গাপূজার এই যে সর্বজনীন রূপ ইহা বর্তমানেরই আবিষ্কার। কিন্তু সত্য সত্যই কি তাই? কোন উৎসব জাতীয় উৎসব তখনই হয় যখন তাহার আনন্দ সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। আবার সে কালের দুর্গোৎসব মনে হয় আজিকার চেয়ে কম সর্বজনীন তো ছিলই না বরং বেশি সার্বজনিক ছিল। শ্রেণী-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে উৎসবে আমরা বিভিন্ন কারণে হইলেও মাতিয়া উঠিতাম। এই মহাপূজায় সকলেরই দান কম বেশি রহিয়াছে। আমরা ইহা হইতে কাহাকেও বাদ দিতাম না। চাষী মজুর শিল্পী বণিক বিভিন্ন শ্রেণীর যোগ সাধিত হইত এই মহাপূজার উৎসবকালে। দুর্গাপূজায় যে সব দ্রব্য প্রয়োজন তাহার তালিকা করা এখানে সম্ভব নয়। কিন্তু অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি যদি ইহা সম্বন্ধে গবেষণা করেন তাহা হইলে দেখিবেন এই পূজার আয়োজন হইতে কোন শ্রেণী বা বর্ণের লোকই বাদ যান না। বর্তমানের সর্বজনীন পূজা প্রায়ই হৈ হুল্লোড়ের ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। সে কালের নিষ্ঠাপূত ভক্তিশ্রদ্ধা যাহা আমরা অন্তরে অন্তরে তখন অনুভব করিতাম তাহা কি আমরা এখন দেখিতে পাই?

কবিগান ও কবিগান

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

·প্রবন্ধ·

কবিগান বাংলা সাহিত্যের একাধারে লজ্জা ও গৌরব, বঙ্গসরস্বতীর ভালে এক সঙ্গে কলঙ্কচিহ্ন ও চন্দনতিলক। একদিকে কুরুচি ও অশ্লীলতার জন্য ইহা শিষ্টসমাজে নিন্দাভাজন, অপর দিকে অশিক্ষিত, প্রাকৃত জনসাধারণের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত কবিত্বশক্তি, অকৃত্রিম ভক্তিরস ও বাদ-প্রতিবাদে সপ্রতিভ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য ইহা আমাদের বিস্ময়াশ্রিত প্রশংসার অধিকারী। কবিয়ালদের কুরুচির জন্য ইহারা ততটা দোষী নহে; আসল অপরাধ অশ্লীলরসভোগী, কুরুচির প্রশ্রয়দাতা সমকালীন সমাজ। তৎকালীন সমাজের মনোরঞ্জনের জন্যই ইহাদের আসরে খেউড় গাহিতে হইত। উচ্চরসের গান গাহিলে শ্রোতৃসমাজ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিত। কেষ্টা মুচির কাল-কোকিলের উল্লেখযুক্ত শ্রীরাধার বিরহ-সঙ্গীতের প্রতি যে প্রাকৃতরুচিসম্পন্ন শ্রোতা প্রতিবাদ জানাইয়াছিল সে সে যুগের শ্রোতৃসমাজের যথার্থ প্রতিনিধি। নাচের আসরে নামিয়া ঘোমটা টেনা যেমন নিরর্থক, কবি-গানের গাঁজান রসের মজলিশে রুচিবিশুদ্ধির আড়ম্বর তেমনি অপ্রাসঙ্গিক। বিশেষতঃ প্রতিযোগিতামূলক পালাগানে প্রতিপক্ষকে জব্দ করিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায় ছিল অশ্লীল গালিগালাজের মাত্রা চড়ান। চড়াসুর আর কড়া খেউড়—এই ছিল কবিয়ালের তূণীরে সর্বাপেক্ষা শাণিত অস্ত্র। মিহি সুর ও সুরুচির মাত্রারক্ষা ছিল পরাজয়ের সর্বস্বীকৃত আত্মঘোষণা। কাজেই কুরুচির জন্য নিছা কবিয়ালের ঠিক প্রাপ্য নহে, উহা সঙ্গীত-প্রথা ও সমাজের প্রত্যাশা ও চাহিদারই প্রত্যক্ষ ফল। ভীম-দুর্যোধনের গদাযুদ্ধে যেমন কলাকৌশলের বিশেষ কোন স্থান ছিল না। কর্মনিক্ষেপ উৎসবে অব্যর্থ লক্ষ্য ও মাপসই টিপ পরাইবার নৈপুণ্য কেহই প্রত্যাশা করিত না।

সুতরাং নিন্দার দিকটা বাদ দিয়া প্রশংসার দিকে লক্ষ্য-নিবেশ করিলেই অধিকতর লাভবান হওয়া যাইবে। হিসাব-নিকাশে খরচের অঙ্কটা বাদ দিয়া জমার অঙ্কের খোঁজ লইলেই কারবারের যথার্থ পরিচয় মিলিবে। কেননা লোক-সানটা সমাজের খাতায়, আর লাভটা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হিসাবে। সকল দেশেই উচ্চতর অভিজাত সংস্কৃতির একটা নিরন্তর ধারা জনসাধারণের মনে শেষ আশ্রয় পায়—প্রবহমাণ নদীর পঙ্ক মিশানো তলানি প্রাকৃতচিত্তে রসের ও ক্লেদের একটা বিশ্র উপাদান যোগান দিয়া থাকে। কিন্তু বাঙলাদেশে লোকশিক্ষার ব্যাপকতা ও উপায়-বৈচিত্র্যের ও লোকচিত্তের সহজ রস-পিপাসুতার জন্য বাঙালী নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে এই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারিত্বের যে অপূর্ব নিদর্শন রক্ষিত হইয়াছে, অন্য কোনও দেশে তাহা বিরল। ইংরেজী সাহিত্যে অভিজাত ও লোককল্পনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুই ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে—উভয়ের মধ্যে সংযোগসূত্র অতি ক্ষীণ। এক ব্যালাড বা গাথা সাহিত্যে উচ্চ প্রকার মানস প্রবণতার একটা সমন্বয় বা সংমিশ্রণ দেখা যায়—কিন্তু ইহাতে আদিম কৌম মনের নৈর্ব্যক্তিক, যৌথ রচনা-প্রণালী পরবর্তী যুগের উন্নততর শিল্পবোধের দ্বারা অনেকটা মার্জিত মনে হয়। আর ইংরেজীতে যে অবিমিশ্র লোকসাহিত্য তাহা বাঙলাদেশের শিশুকল্পনামূলক ছড়ার সহিত সমপর্যায়ের—একেবারে অবাস্তব

ও অসংখ্য ভাবচিত্রময়তায়। শেক্সপিয়ার ও এলিজাবেথীয় যুগের নাটকে মাঝে মাঝে ইহাদের স্বতঃস্ফূর্তের উদ্ভূতি দেখা যায়, Sir Walter Scott ও Burnsএর কবিতায় স্কটল্যাণ্ডের লোকসাধারণ স্মৃতি-প্রতিধ্বনি কখনও কখনও প্রথাগত কাব্যের সুরের সঙ্গে মিশিয়া আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে, ও বিংশ শতকে Yeats ও A. E.এর কবিতায় Irelandএর জনশ্রুতি ও অলৌকিক সংস্কারের কিছু নিদর্শন পরিমিত কাব্যশিল্পের অন্তরালে অনুভবগম্য হয়। কিন্তু মোটের উপর এই কথা বলা চলে যে পাশ্চাত্য দেশে লোক-সাহিত্য অভিজাত-সাহিত্যের পাশাপাশি ও উহার অনুকরণরূপে কোন শিথিলতর রূপে, উহার ভাব ও ভাষা বিকৃত-অপভ্রষ্ট রূপে গ্রহণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করে নাই।

বাঙ্গালাদেশের কবি-সঙ্গীত ও অন্যান্য প্রকারের লোক-সাহিত্য এই পাশ্চাত্যদেশসুলভ সাধারণ নিয়মের অসাধারণ ব্যতিক্রম। উচ্চতর হিন্দুধর্মের রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা, ও বাস্তুপূজা ও পৌরাণিক সংস্কার-চেতনা শিষ্টজনের আভিজাত্য-মর্যাদা-সম্পন্ন ও শিষ্টরীতি-পরিশীলিত মহিমা পরিহার করিয়া একেবারে শিক্ষা ও রুচিহীন একদল স্বভাবকবির হাতে একটা অনাভিজাত, অথচ অকৃত্রিম-অনুভূতি-লালিত, রাখালিয়া রূপকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অবশ্য রাধাকৃষ্ণ-প্রেম ও বাস্তুপূজা আদৌ অনার্যসংস্কৃতিপ্রসূত কি না, পূর্বতন যুগে উহাদের একটা স্থূল, উদ্ভট-কল্পনা-বিকৃত স্তরের উপরই সূক্ষ্মতর অনুভূতির প্রয়োগে উহারা বর্তমান শিল্প সৌন্দর্য ও ভাবমহিমায় উন্নীত হইয়াছে কি না এই সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন না করিয়াও বলা চলে যে কবিগানের দেবদেবী-প্রশস্তি সেই সুপ্রাচীন যুগের জের নহে, আর্যঋষি ও কবি-উদ্ভাবিত ভাব-চর্চারই অনুবৃত্তি। সুতরাং কবিগানের মধ্যে আমরা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় শ্রেণীর কবির একই বিষয় লইয়া প্রতিযোগিতার যে দৃষ্টান্ত পাই, তাহা বিশ্বসাহিত্যের সাহিত্যে অসাধারণ। এই আর্যধর্ম-চেতনা নিম্নতর সমাজগোষ্ঠীর মর্মে এমন গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে যে উহার আদিম সংস্কারের বিশেষ কোন চিহ্নই আর অবশিষ্ট নাই। এখন ধর্মের সহিত অসংশ্লিষ্ট লোক-কল্পনা বাঙ্গালার কোন কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলে, যেমন মানভূমের টুসুগান, কামাখ্যনি অঞ্চলের ভাদুগান প্রভৃতি বিরল নিদর্শনের মধ্যে সজীব আছে। কিন্তু সাধারণত বাঙ্গালার নিম্নশ্রেণীর দেব-পরিকল্পনা ও পরলোকতত্ত্ব উচ্চবর্গ-প্রচলিত ভাবসমৃদ্ধি ও আবেগবিশুদ্ধির মধ্যে নিশ্চিহ্ন ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। এমন কি রংপুর, কুচবেহার প্রভৃতি স্থান হইতে সংগৃহীত নাথ-গীতিকার মধ্যেও নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন, শিশুসুলভ উদ্ভট কল্পনার সহিত পৌরাণিক ধর্মের সারকথা এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে একীভূত হইয়াছে।

এই বিষয়টি ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে বিস্মিত হইবার যথেষ্ট উপাদান আছে। হিন্দুধর্মের সূক্ষ্ম দার্শনিক-তত্ত্বকণ্টকিত, ভক্তি ও আত্মনিবেদনে মধুর ও অধ্যাত্ম সাধনার চরমস্তরে উন্নীত মূল আবেদনটি নিরক্ষর কবিয়ালদের এরূপ অস্থি-মজ্জাগত সহজ সংস্কারে পরিণত হইয়াছিল যে তাহারা অবলীলাক্রমে এ সম্বন্ধে স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যরসের পরিচয় দিয়াছে। ব্যাপক অনুশীলন ও ব্যাখ্যার ফলে ধর্মের তত্ত্ব ও ধর্মের আবেগ দুইই তাহাদের এমন অনায়াস-অধিগত হইয়াছিল যে শিক্ষাদীক্ষার সহায়তা ছাড়াও ইহারা তাহাদের কবিত্বসংস্কৃতির অবলম্বন হইয়াছে। ইহা তাহাদের সহজ গানের সুরে, গ্রাম্য সংলাপের ভাষায়, প্রাকৃত জীবন-চর্যার অ-সম্ভ্রান্ত সরলতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী ও শাক্ত কবিতার ভাব ও সুর, অলঙ্কার ও আবেগযাত্রা দীর্ঘ ও অন্তরঙ্গ পরিচয়ের ফলে তাহাদের এতই আপনার হইয়া গিয়াছে যে নিজেদের বাগ্‌রীতি ও ঔচিত্যবোধের মাধ্যমে ইহাদের প্রকাশ করিতে তাহাদের কিছুমাত্র কৃত্রিমরীতি অনুসরণের অসুবিধা হয় না। রাধা-কৃষ্ণপ্রেমের মধুর রস হয়ত তাহারা তাহাদের প্রাকৃত চিত্তবৃত্তি দিয়া সহজেই অনুভব করিতে পারে। কেননা বৈষ্ণব পদকর্তাগণ অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলার মধ্যে প্রাকৃতজনসুলভ ইন্দ্রিয়াকুলতা ও প্রেমতীক্ষ্ণ বাগ্‌বিনিময়ের কিছুটা ছদ্মসারূপ্য ইচ্ছাপূর্বকই রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণচরিত্র যাহাতে সাধারণ বোধের অতীত না হয়, গোপসমাজের রীতি-নীতি ও সমাজ-প্রতিবেশের বহিরাবরণের মধ্য দিয়াই যাহাতে তাঁহার ঐশী লীলা স্ফুরিত হয়, ভক্তি যেন ভালবাসাকে অভিভূত না করে, দেবমহিমার দুঃসহ জ্যোতি যাহাতে নৈকট্যবোধের কাচাধারে নিস্তেজ হইয়া দেখা দেয়, ভাগবতকার হইতে পদকর্তাগণ পর্যন্ত সকলেই সেই দিকে বিশেষ অবহিত ছিলেন। সুতরাং সখা-সখী-দূতী প্রভৃতির মধ্যবর্তিতায়, হাস্য-পরিহাসের মনোজ্ঞতায় প্রাকৃত মান-অভিমান-বিরহ-জ্বালা প্রভৃতির সহ-

উপস্থিতিতে রাধাকৃষ্ণপ্রেম অধ্যাত্মলোকের দুরবগাহতা হইতে গ্রাম্য মজলিসের তরল দর্বজনবোধ্য রসোচ্ছলতায় সহজেই নামিয়া আসিয়াছে। বেদব্যাস হইতে কবিয়াল পর্যন্ত উদ্দেশ্যসমতার মধ্যে রুচিবৈষম্যের ক্রমাবরোহণকারী সোপানপরম্পরা যাহিয়া একই প্রক্রিয়ার সূত্রবিধৃতি দুর্লক্ষ্য নহে।

কিন্তু যখন আমরা দেখি যে শিব, দুর্গা ও কালীর বিচিত্র প্রকৃতি, তাঁহাদের দেবলীলার রহস্যময় বৈপরীত্য সত্ত্বেও কবিয়ালের বোধশক্তি ও ভক্তিচেতনা সমভাবেই প্রকটিত, তখন আমাদের চমৎকৃতি মাত্রা ছাড়াইয়া উঠে। বিশেষ করিয়া শিব ও কালী পরিকল্পনার মধ্যে যে বিপরীত গুণাবলীর দুরূহ দার্শনিক সামঞ্জস্যবিধান নেপথ্যচারী, যে রূপক-দ্যোতনা উহ্য, বিসদৃশ বেশভূষা-আচরণের নিগূঢ় মহিমা প্রকাশক, একজন অশিক্ষিত তরল-আমোদ-বিতরণকারী কবিয়ালের পক্ষে তাহার মর্মানুধাবন আশ্চর্যরূপ সূক্ষ্মানুভূতির নিদর্শন। জন্ম-বার্শনিকের জাতিসূত্র না হইলে, যুগযুগান্তর-বাহিত সংস্কৃতি-ধারা শিরাস্নায়ুর রক্তধারার সহিত সংমিশ্রিত না থাকিলে এরূপ দুঃসাধ্যসাধন তাহার পক্ষে সম্ভব হইত না। শিবের যে অংশ নেশা-ভাঙে ঢলঢল, যে অংশ পরস্ত্রীলোলুপ ও কামোজ্জ্বল, যে অংশ উলঙ্গ, অসংবৃত, রীতিমর্যাদার উল্লঙ্ঘনকারী ও দারিদ্র্যবিলাসী তাহার সহিতও কবিয়ালের সহজ রক্তসম্বন্ধ। নিম্নবর্গের বিশেষ রুচি-মেজাজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ও তাহাদের বিকৃত ভক্তিক্ষুধাকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্যই ত উচ্ছৃঙ্খল সমাজের এই ছন্নছাড়া দেবতা, স্বভাববাতাল গোষ্ঠীর এই ভোলা-মহেশ্বর, অভাব-শীর্ণ ও দাম্পত্যকলহজীর্ণ গৃহস্থালীগুলির এই ঔদরিক ও কোন্দলপ্রিয় নির্লিপ্ত গৃহস্বামী বিশেষভাবে কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই উপহাস্য প্রিয় দেবচরিত্রটির বিরাট, মহিমান্বিত ও রজতগিরিসন্নিভ উত্তুঙ্গতার দিকটিও তাহাদের অনুভূতিতে সেইরূপ সহজভাবেই প্রতিভাত হইয়াছে। গ্রীক জনসাধারণ সুরাদেব Bacchus-এর পান-মত্ত ও স্থূলদেহ রূপটিই মনে রাখিয়াছিল—তাহার মহত্তর, বিজিগীষু, অমিতশক্তি রূপটি হয়ত কবিকল্পনায় ছিল, কিন্তু জনস্মৃতি হইতে উহা বিলুপ্ত হইয়াছিল। হিন্দু জনসংঘ মহাদেবের দ্বৈতরূপের কোনটাই ভুলে নাই—মানুষের দুর্বলতাকে সে দেবের মর্যাদা দিয়াছে।

বীভৎসরসের প্রতি জনচিত্তের স্বাভাবিক প্রবণতা—এমন কি মধুর রসেও দু'চারি ফোঁটা বীভৎসাক্তিরঞ্জন না মিশাইলে ইহা স্থূলরুচি সমাজের আস্বাদনীয় হয় না। ব্যাস-বাল্মীকি কুম্ভকর্ণ-ঘটোৎকচ প্রভৃতি চরিত্রের অবতারণা ও রাক্ষস ও বানর সৈন্যের বিবিধ অঙ্গবিকৃতির চিত্রণে সম্ভবতঃ প্রাকৃত-মনোরঞ্জন-উদ্দেশ্যের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। আমাদের দেবমণ্ডলীতে কার্তিকের সুঠাম আর্য কল্পনারই অভিব্যক্তি; গজানন গণেশ তাঁহার দেবাগ্রগণ্যতা ও সিদ্ধি-দাতৃত্বের মহিমার সহিত প্রাকৃত কল্পনার অনুবর্তনেই কদাকার, নরদেহের সহিত মিলহীন হস্তিমুণ্ডটির সংযোজনা করিয়া-ছিলেন। কালী বীভৎসতার সহিত মহিমার অপূর্ব সমন্বয়ে উচ্চ ও নিম্ন উভয় বর্গের নিকটই সমভাবে সংবর্ধনা লাভ করিয়াছেন। উচ্চ বর্গ ধ্যানানুভূতি ও রূপক কল্পনার সার্থক প্রয়োগে তাঁহার মধ্যে অধীম রহস্যময়তার ব্যঞ্জনা অনুভব করে। নিম্নস্তরের মানুষেরা কালীর বিপদহরী, শালীনতা-লজ্জিনী, অসিতবর্ণা ও রুধিরচর্চিতা মূর্তি দেখিয়াই তাঁহার সঙ্গে একটা সহজ আত্মীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হয়। তাঁহার চরণে তাহারা যে ভক্তি-প্রণতি জানায় তাহা অভিরহস্যবোধের চৌম্বক আকর্ষণে আরও মোহময় হইয়া উঠে। সুতরাং কবিয়ালদের গানে কালী-প্রণতি যে একটা বড় স্থান অধিকার করে ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

এ পর্যন্ত পৌরাণিক দেবদেবী সম্বন্ধে কবিয়ালদের অনুকূল ও গ্রহণশীল মনোভাবের কথা বলা হইল। এখন কবিগানের মধ্যে শিল্পবোধের শিথিলতা সত্ত্বেও সহজ কবিশক্তির কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায় তাহা আলোচনা করিব। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও ভক্তিরসসিক্ত পরিমণ্ডলে যে এত অধিক সংখ্যক নিরক্ষর ব্যক্তির মধ্যে কবিত্বস্ফুরণ ও ভক্তিপ্রবণতার পূরণ সম্ভব হইয়াছিল ইহা বাঙালার পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা সন্দেহ নাই। এখানে যে নিম্নশ্রেণীর রচয়িতারা ছেলেভুলান ছড়া, অর্থহীন, অসংলগ্ন চিত্র ও ছন্দ এবং আদিম অপ্রাকৃত কল্পনার পরিবর্তে উচ্চ বার্শনিক তত্ত্ব, ভাবসমৃদ্ধি ও বিশুদ্ধতর অধ্যাত্ম অনুভূতিকে কাব্যের বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়াছিল তাহা অন্যান্য দেশের তুলনায় একটা প্রশংসনীয় ব্যতিক্রম। ইংরাজী সাহিত্যে একমাত্র স্কটল্যাণ্ডের কৃষক কবি বার্নসই সূক্ষ্মরুচি, সংস্কৃতিবান লেখক সম্প্রদায়ের সহিত প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ও তাহাদের নিজের

অন্তে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এখন উচ্চ কোটির বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর সহিত তুলনায় কবিয়ালদের এতদ্ সম্বন্ধীয় কবিগানগুলির কাব্যগুণ বিচার করা প্রয়োজন।

কবিগান সম্বন্ধে একটা কথা মনে করা দরকার—ইহা গানের আসরে গীত হইবার জন্য যথাসম্ভব সত্বর রচিত, ইহা প্রধানত কাব্য নহে, সুরলয়যোগে গানের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই পরিকল্পিত। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী ও শাক্ত পদাবলীও গানের মাধ্যমেই উহাদের পূর্ণতম মাধুর্য প্রকাশ করিয়াছে। তথাপি এই গীতি-ধর্মিতা উহাদের অত্যাজ্য সহজ ধর্ম নহে, উহাদের কাব্যাবেদনকে ঘনীভূত ও রসসৃষ্টিষ্ঠ করার জন্য পৃথক্-সংযোজিত আয়োজন। পদাবলী রচিত হইবার বহু পরে উহারা কীর্তনের সুর ও ভাবাবেশের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস বা গোবিন্দদাস সচেতন ভাবে সুরশিল্পের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া তাঁহাদের পদগুলি রচনা করেন নাই। ভক্ত সাধক ও সুরকর্তাদের অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও ভাবানুসারী বিস্তারে ইহারা আরও মধুর ও মর্মস্পর্শী হইয়াছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু কবি-প্রেরণায় ভক্তি-বিহ্বলতা, কলারসিকতা ও রূপসৃষ্টি ছাড়া আর কোন উপাদানের অস্তিত্ব ছিল না। সুর ও ভাবুকতার সংযোগে সোহাগা-সংযোগে স্বর্ণের ন্যায় উহাদের সৌন্দর্য বহুগুণে বাড়িয়াছে, কিন্তু ইহা ছাড়াও তাহাদের যে স্বতন্ত্র কাব্যমূল্য ছিল তাহাও বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় অন্তর্নিরপেক্ষ দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। কীর্তনরীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর যে সমস্ত পদাবলী লেখা হইয়াছে, তাহারা কীর্তন-আসরের প্রত্যাশিত রসোচ্ছলতা ও ভাবুকতার আবেশ দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু প্রথম যুগের পদগুলি সম্বন্ধে এ মন্তব্য প্রযোজ্য নহে। শাক্ত-পদাবলীতে রামপ্রসাদী সুর রামপ্রসাদী কাব্য-কলার অবিচ্ছেদ্য অংশ, কিন্তু এখানে শকুন্তলা ও মৃগশিশুর ন্যায় ভাবের আরণ্যকৌ। সরল বৈরাগ্যস্পৃষ্ট সুর অকৃত্রিম ভক্তি-আবেগের একান্ত নিজস্ব বাহন। কাব্যানুভূতির অতিরিক্ত যেন সুরের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নাই। কিন্তু কবিয়ালের সুর তাহার কাব্যকৃতিকে ছাপাইয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। ভক্তিরসের ঈষৎ আবেশকে অবলম্বন করিয়া গতানুগতিক বাগ্‌ভঙ্গীর ক্ষুদ্র অঙ্গগুলিকে ছাপাইয়া কবিয়ালের কণ্ঠনিঃসৃত সুরই প্রধানত রসসৃষ্টির হেতু। এই সুরনির্ভরতার জন্যই কবিগান নিছক কাব্যোৎকর্ষের মানদণ্ডে বিচারযোগ্য নহে।

কবিগানের সঙ্গীতধর্মিতার নিদর্শন পাওয়া যায় উহার সঙ্গীত-প্রয়োজনানুযায়ী অঙ্গবিন্যাসে। এই জাতীয় গানগুলি প্রথমে নানা অংশে বিভক্ত ছিল,—মহড়া, চিতেন, পরচিতেন, খাদ, ঝুমুর, মেলান, ধুয়া, পড়তা, অন্তরা প্রভৃতি বহু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিভাগে উহাদের অবয়ব গঠিত হইত। এই বিভাগের প্রয়োজনে উহাদের দৈর্ঘ্যও সাধারণ গান অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। কিন্তু এরূপ পূর্ণাঙ্গ কবিগানের রক্ষিত নিদর্শন খুব বেশী নহে। মনে হয় কালক্রমে এইরূপ নানা-প্রকরণবিশিষ্ট শ্রেণী-বিভাগের অবশ্যপালনীয়তা বিলুপ্ত হইয়া গেল। কবিগান সাধারণ গানের ন্যায় সংক্ষিপ্ত ও দুই তিনটি কলিতে মাত্র সীমাবদ্ধ হইল। গীতপ্রকরণের প্রয়োজনে অঙ্গবৃদ্ধি ও কবিত্বসঙ্কোচের যে ধারা কবিগানে প্রচলিত ছিল তাহা শেষ পর্যন্ত স্থায়ী না হইয়া উহা সাধারণ গানের লক্ষণ-বিশিষ্ট হইয়া উঠিল।

বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর সঙ্গে তুলনায় কবিগান অনেকটা শিথিলগঠন ও অতিভাষণ-প্রবণ। ইহা হওয়াই স্বাভাবিক। শিক্ষিত ও অনুশীলিত কবিমন যত অল্পকথায় ও নিবিড় ভাব-বন্ধের সহিত ভাব ব্যক্ত করিতে পারে, অশিক্ষিত কবিরা ভাববস্তুর নির্বাচনে ও সংক্ষেপীকরণে তাদৃশ পারদর্শিতা দেখাইতে পারে না; দ্বিতীয়ত, ভাবানুভূতি যখন নূতন থাকে তখন উহা নিজ আবেগের আবর্তনছন্দেই নিজের সুঠাম অবয়ব গঠন করে। এই আবর্তনবেগ যখন গতানুগতিকতার জন্য শিথিল ও মন্দীভূত হয়, তখন উহার বক্তব্য বিষয়ের দেহ-পরিধি যাত্রাতিরিক্ত বিস্তারের দিকে ঝোঁকে। কুম্ভকারচক্র বেগে ঘুরিলে অনাবশ্যক মৃত্তিকাপুঞ্জ গতিবেগেই কাটিয়া যায় ও মৃৎপাত্রের সুডৌল আকার-সুষমা ফুটিয়া উঠে। কবিয়ালগণ অপরের মুক্ত শ্রবণ আস্বাদনে অভ্যস্ত ছিল বলিয়া উহাদের রচিত গানের রূপ সব সময় সুগঠিত হয় নাই। যখন বিষয়বস্তু অত্যন্ত সুপরিচিত হয়, তখন কবি-কল্পনার সীমালঙ্ঘনের প্রবণতা বাড়ে। কবিয়ালেরা যখন বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর বিষয় লইয়া লেখে, তখন তাহাদের মনোভাব অনেকটা সূত্রের ভাষ্যকারের বা কীর্তনের আখরিয়ার মত—নূতন কথা না বলিয়া পুরাতনের জাগে দাগ বুলাইবার প্রবণতাই তাহাদের বেশী

দেখা যায়। বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর মধ্যে তুলনা করিলেও শাক্তপদাবলীর মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত বিস্তার ও শব্দসংযোজনা-বাহুল্য বেশী লক্ষ্য করা যায়। প্রেম অপেক্ষা বাৎসল্য অধিকতর প্রগল্‌ভ ও বহুভাষী। প্রেমের অসাধারণত্ব ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, বিশেষত রাধাকৃষ্ণ প্রেমের মধ্যে অধ্যাত্মব্যঞ্জনার ইঙ্গিত উহার প্রকাশকে ঊর্ধ্বলোকচারী ও সংযতবাক্ করিয়াছে। পদগুলির সাধারণ দৈর্ঘ্যও এই নিস্তব্ধতা ও প্রকাশমর্যাদার সহায়স্বরূপ হইয়াছে। কিন্তু আগমনী ও বিজয়া গানে বাৎসল্যরসের স্বভাব-আতিশয্য, মা ও মেয়ের বাধাবন্ধহীন স্নেহ-উৎসার উহার কাব্যরূপকেও অনেকটা অতিক্রান্ত করিয়াছে। রামপ্রসাদী সঙ্গীতের নিগূঢ় তত্ত্বসাধনা, তান্ত্রিক উপাসনার রহস্যময় ক্রমানুসরণ, কুচ্ছ্র ব্রতের কঠোর বিধি পালন ও আকুল অথচ সংযত আবেগ ইহাকে অভিজাত-অনুভূতির উন্নত স্তরে ধরিয়া রাখিয়াছে। রামপ্রসাদের কালীর প্রতি মাতৃ সম্বোধন আর মেনকার উমার প্রতি স্নেহব্যাকুল ভাবোচ্ছ্বাস ঠিক এক পর্যায়ের নহে; উভয়ের উৎস এক নহে। রামপ্রসাদের ভাব ঊর্ধ্বাভিমুখী; অনেক বস্তুজগতের বাধা অতিক্রম করিয়া, প্রাকৃত আবেগের সীমা ছাড়াইয়া, সাধনার নিগূঢ় সূত্রপথে অলক্ষ্যসঞ্চারিত হইয়া ইহা একটা আপাত-আত্মহারা-উচ্ছ্বাস-স্তরে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু মেনকার বাৎসল্যরস মাতৃহৃদয়ের ঝরঝরায় ন্যায় সহজ-উৎসারিত ও গিরিনির্ঝরের ন্যায় সমতলভূমির দিকে মাধ্যাকর্ষণের অনিবার্য বেগে প্রবাহিত। কবিগান এই আগমনী-বিজয়া গানের স্বভাবোৎসারকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছে ও উহার কলাগত অসংযমের জন্য এই আদর্শকে আরও বিকৃত করিয়াছে।

এই প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও কবিগান যাহার মধ্যে বিস্ময়কর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলাকে কোনও কোনও কবিয়াল বৈষ্ণবভাবপরিমণ্ডলমুক্ত এক নূতন দৃষ্টিতে দেখিয়া ইহার মধ্যে এক অভিনব ভাবরসের বিকাশ অনুভব করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবির দৃষ্টি অধ্যাত্ম বাসনা ও সম্ভোগসম্ভূত ভাবসাধনার উপর স্থির-নিবদ্ধ; উহার কবিয়াল উত্তরসাধকগণ এই প্রেমের নিগূঢ় মানবিকতা ও সার্বজনীন আলোড়নক্ষমতাটিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ইহারা বৈষ্ণব ভাবধারাকে অতিক্রম করিয়া প্রেমের মনোবিকারের ছবিটি আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছে। আদি কবিয়াল গোঁজলা গুঁইএর যে একখানি মাত্র গান প্রচলিত আছে, তাহাতে রাধাকৃষ্ণপ্রেমের নিবিড় একাত্মতা দার্শনিক তত্ত্বনিষ্ঠা ও কাব্যানুভূতির মিলিত সৌন্দর্যে হৃদয়গ্রাহীরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। রাসু-নৃসিংহের কয়েকটি গান বৈষ্ণব প্রেমতন্ময়তার মধ্যে আধুনিক সুর যোজনা করিয়াছে। "বিষাদের বাতি, জ্বেলেছেন শ্রীমতী, তাহাতে আহুতি দিও না" বা

স্নান, প্রদীপের আলো প্রকাশ পাইল
চন্দ্রমা লুকাল গগনে।
ও হে গোধূলির জল জলত বাপিল
সাগর শুকালো তপনে।

প্রভৃতি পংক্তিনিচয়ে বৈষ্ণব ভাবনিষ্ঠা আধুনিক অনুভূতির দীপ্তিতে ঝলমল করিতেছে। এই যুগ্ম কবির 'কহ সখি কিছু প্রেমেরি কথা' আত্মনিবেদনের চরম বিভঙ্গির অভিব্যক্তি। রাম বসুর 'জলে জলে কেগো সখি' কবিতায় কালিন্দীজলে কৃষ্ণপ্রতিবিম্বদর্শনে তন্ময় শ্রীমতীর মতি পদাবলীসাহিত্যের বিরাট ক্ষেত্রেও কিছু নূতন অনুভূতির পরিচয় দিয়াছে।

'আচম্বিতে আলো কেন যমুনারি জল।
দেখ সখি, কূলে থাকি
কে করে কি ছল।'

এই পংক্তি কয়টিতে রবীন্দ্রনাথের ছন্দবিন্যাসের সূক্ষ্মতম পূর্বাভাস মনকে স্পর্শ করে না কি?

কিন্তু বৈষ্ণব প্রেমভক্তিরসের সার্থক নবরূপায়ণ ছাড়া কবিগানের সত্যকার ভূমিকা আরও তাৎপর্যপূর্ণ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়। ইহা রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকে বৈষ্ণব পটভূমিকা হইতে মুক্তি দিয়া একটা সার্বভৌম প্রেমচেতনার উন্মেষকল্পে প্রয়োগ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবির নিকট যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কবিয়াল কিয়ৎ পরিমাণে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে। রাধিকার অন্তরদীর্ণ ব্যাকুলতা নিখিল মানব-মানবীর প্রণয়াভিরূপে কবিগানে প্রকাশ পাইয়াছে। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি বাংলা কাব্যের আকাশে-বাতাসে একটা তীক্ষ্ণ, জীবনসমস্যাজটিল, সার্বিক প্রেমসচেতনতা কবিগানে ও নিধুবাবুর টপ্পায় আন্তর্ভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। অধ্যাত্ম প্রেম উহার স্বয়ম্বরতা, আদর্শ অতীপ্সা ও রূপকাবরণ ভেদ

কবির লৌকিক প্রণয়ের প্রখর দীপ্তি, নিষ্ঠুর সংঘর্ষ ও অপ্রশমিত জ্বালা লইয়া মনোরম ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এইখানে রাধাকৃষ্ণের রোমান্সে যে প্রেম অরূপভাবে চাপা ছিল তাহা সমস্ত ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া উহার কলঙ্ক-রহিমাবিদ্ধ স্বরূপ-পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের কাব্যকেলিবিলাস সেই একই রুচিপ্রবণতার অনুরূপ অভিব্যক্তি; তবে বৈষ্ণবকবী ভারতচন্দ্র রাধাকৃষ্ণের নবীন ও দেখাইয়া কালীর অন্ধ চক্ষুর আশ্রয়ে ও তিমির ভাবের ইঙ্গিতের আবরণে রুচিদুষ্ট রোমাঞ্চকাহিনীকে ধর্মের আনুকূল্য ও রসিকচিত্ত-সংবেদ্যতা দান করিয়াছেন।

কবিবালকের মধ্যে হরু ঠাকুর ও রাম বসু এই দুইজনই ধর্মসম্পর্কহীন প্রেমবিকলতার বিচিত্র অবস্থা বিশ্লেষণে, উহার মান-অভিমান, নৈরাশ্য-নির্বেদ, অভিসার-অনুযোগ প্রভৃতি মনোভাবের বস্তুলগ্নপ্রধান বর্ণনায় বাংলা কাব্যে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছেন। শ্রীমতীর ছলনা হইতে আভি ও কণ্ঠ হইতে ভাষা গ্রহণ করিয়া তাঁহারা প্রাকৃত নারীর বাস্তব মনোবেদনা প্রকাশে উহাদিগকে নিয়োজিত করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে তাঁহাদের কবিতায় প্রেমের আদর্শ, ভাবনিষ্ঠ রূপের পরিবর্তে উহার বাস্তব ক্ষোভ ও জ্বালাই বেশী প্রকাশ পাইয়াছে। বাংলার তৎকালীন সমাজজীবনে এমন একটা উত্তপ্ত, সংঘাতবিক্ষুব্ধ, আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্বে ঘূর্ণাকুল ভাব-পরিবেশ সৃষ্ট হইয়া থাকিবে যেখান হইতে এই কবিবালের প্রেমগীতিগুলি তাহাদের বাস্তব উপলক্ষ্য ও অন্তর-প্রেরণা আহরণ করিয়াছিল। বৈষ্ণব কবিতার কাল্পনিক ভাবসম্ভিলন ও আকর্ষবিষাদমূলক আত্মনিরোধ এই দ্বন্দ্বজ্বালাময় পরিবেশে কোন মূলত সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে পারে নাই। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে হরু ঠাকুর ও রাম বসু উভয়েই কিছু কিছু রাধাকৃষ্ণ-বিরহ-মিলনের গান রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই অপ্রাকৃত, অতীত যুগের ভাবকুজ্ঝটিকায় তাঁহাদের কবিপ্রেরণা সীমাবদ্ধ থাকে নাই। তাঁহার বৈষ্ণব লীলাসূত্রের বন্ধনকে বেষ্টনী অতিক্রম করিয়া বাস্তব জীবনের অনাবৃত অন্তর্দ্বন্দ্বসংকুল পরিবেশে অবতরণ করিয়াছিলেন ও সেখান হইতেই তাঁহাদের কবিতার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বাংলা দেশের সমাজে কোন্ বাহ্য পদার্থ হইতে এরূপ তাপ সঞ্চিত হইয়াছিল, সেকালের অনুশাসন-নিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রার মধ্যে স্বাধীন প্রেমের এত মর্মদাহ কেমন করিয়া জ্বালা বিকীর্ণ করিয়াছিল তাহা হঠাৎ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। এই কবিতা পড়িয়া মনে হয় যেন বাঙ্গলা সমাজ পাশ্চাত্য সমাজের ন্যায় নিরঙ্কুশ মনোবৃত্তিচর্চার লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। বৃন্দাবনলীলার সখিদূতী-অভিসার-মিলন-সংবলিত স্বাধীন মানস বিহার যেন অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গলার বাস্তব সমাজে আরোপিত হইয়াছে। এখানে পরিবেশটা অর্ধ-কাল্পনিক, কিন্তু পরিবেশের আশ্রয়ে মানবহৃদয়ের যে বিচিত্র বেদনানুভূতি তাহা সম্পূর্ণ মনস্তত্ত্বানুসারী। মনে হয় যেন কৌলীন্যবিড়ম্বিত, স্বামিসৌভাগ্যবঞ্চিত উচ্চ বর্ণের যুবতীদের ব্যথাতুর, অন্তর্নিরুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস বাঙ্গলার আকাশ-বাতাসকে বিস্ফোরক উপাদানে পূর্ণ করিয়া কবিদিগকে প্রেমমনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে প্রেরণা যোগাইয়া থাকিবে। কুলীন ব্রাহ্মণ যুবতীর বাহিরের প্রশান্ত, বিষাদগম্ভীর মুখমণ্ডলের পিছনে যে বহ্নিশিখা তাহাদের অন্তর্লোককে আলোড়িত করিতেছিল, যে অনুচ্চারিত অনুযোগ ও বিদ্রোহ-প্রবণতা তাহাদের দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধরের আবরণতলে তাহাদের সমস্ত সত্তাকে বিপর্যস্ত করিতেছিল, কবিরা হয়ত তাহার কিছুটা অনুমান করিয়া এই অকথিত বেদনাকে তাঁহাদের গানে ভাষা দিয়াছেন।

হরু ঠাকুরের বিখ্যাত গান "শ্রীরিতি নাহি গোপনে থাকে" প্রেমরহস্যের চমৎকার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। বৈষ্ণব পদাবলীর চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের আক্ষেপানুরাগের পদে প্রেমের আনন্দ-বেদনাদিগ্ধ, দুর্বোধ্য বৈভবরহস্যের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রেম উপর মহলের ব্যাপার। লৌকিক আকর্ষণের রূপকে অধ্যাত্মরাজ্যের বিরহ-মিলনের কাহিনী। প্রেম যে স্তরে দেহসীমা ও সংসার-মূলতার উর্ধ্বে উদ্ধায়িত ভাবব্যঞ্জনায় স্পর্শে ভাস্বর হইয়া উঠে ইহা সেই স্তরের সংকেত-চমকিত। ইহার মধ্যে মানবিক উপাদান অতিমানবিক জ্যোতির্মণ্ডলের অন্তরালে দুর্নিরীক্ষ্য। শ্রীরাধার ভাবতন্ময়তা, তাঁহার ঊর্ধ্বতার নেত্র, কৃষ্ণসাযুজ্য রসে দেহলোকে উৎক্ষিপ্ত ও মন্থরের বিচিত্রবর্ণ কণ্ঠনিরীক্ষণে নিবদ্ধ দৃষ্টি বা প্রেমের অতলস্পর্শ রহস্যসাগরে নিমজ্জিত চিত্তবৃত্তি যে মনোভাবের বহির্লক্ষণ, তাহাকে মনস্তত্ত্ব বিচারের সাধারণ মানদণ্ডে বানবায়িত করা যায় না। কিন্তু হরু ঠাকুর ও রাম বসুর

প্রেমকবিতা সম্পূর্ণরূপে পার্থিব অনুভূতির স্তরেই সীমাবদ্ধ। বৈষ্ণব ভাবাদর্শের সহিত যাহার পরিচয় নাই তাহারও ইহার রসগ্রহণে কোন বাধা নাই। ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয় যে এই কবিরা কেমন করিয়া বাঙালীর সাধারণ জীবনে প্রেমের এত অবস্থি, এত ভাববৈচিত্র্যের ওঠা-নামা, তীব্র আক্ষেপ হইতে নির্লিপ্ত উদাসীন্য পর্যন্ত মনোভাবের এত স্তর-পরিবর্তন, 'হিয়াদগ্‌দগি পরাণ পোড়নি'-র এত নিদারুণ কতজ্বালা এরূপ শুদ্ধ অনুভূতিমূলক মনোজ্ঞতার সহিত বর্ণনা করিবার উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

রাম বসু বিরহগানে এখন পর্যন্ত অপরাজিত। নর-নারীর প্রণয়-পথে যত রকম আকার বাধা উপস্থিত হইতে পারে, প্রেম-নদীতে যত জোয়ার-ভাঁটা, ঝড়-তুফান, চড়া-আবর্ত দেখা দিতে পারে তিনি সমস্তকেই লক্ষ্য করিয়াছেন ও তাহাদিগকে সমস্ত-স্বাভাবিক বাণীরূপ দিয়াছেন। তিনি অনেক সময় এই সমস্ত অবস্থা বর্ণনায় নূতন বাগ্‌রীতিরও প্রয়োগ করিয়াছেন। নির্মমজ্বরা প্রেমিকাকে প্রেমিক অনুযোগ করিতেছে, "মানচণ্ডীর তলায়, তুমি নাগর কেটে দিবে নর-বলিদান।" এ ভাষা কোথাও ধার করা নহে। কবির অনুভূতির টাঁকশালায় সদ্যোনির্মিত। অবিশ্বাসী নায়কের দৃষ্টভাষণে নায়িকার প্রেমানল নির্বাপিত হইল, "উফ জলে করে যেমন অনলনির্বাণ।" উপমার তাজা ঘণ্টি লক্ষণীয়। বিবাহিতা স্ত্রী কর্তব্যহীন স্বামীর সম্বন্ধে ক্ষোভ জানাইতেছে—"নামে ভার্যা কাজে ত্যাজ্যা, সই, লোকের যেমন নদীর চড়ার সনন্দ।" নদীর চড়াতে স্বত্ব থাকিলেও যেমন মালিক কার্যত স্বত্বহীন, দাম্পত্য-অধিকারচ্যুতা স্ত্রীরও অবস্থা তদ্রূপ। প্রণয়হীন স্বামীর স্ত্রীর নিকট আচরণ যেমন অনিচ্ছুক বালকের নামতা-শিক্ষা, "যেন শতকেতে পাঠ এগুলো।" আবার নায়িকারও অবাবদ্বিতচিত্ততা কবির কষাঘাত এড়ায় নাই—"নারী, বারি, দুই জনারি নীচ পথে গমন।" "যেমন সদর্প গৃহেতে বাস, ছোলে দুষ্টে ভার্যে, বেড়ায় গর্জে, খেলে খেলে এমনি ত্রাস।" প্রেমিকের নিষ্ঠুর ব্যবহারে বিগতপ্রেম নায়িকা বলে "একবার পোড়ে যে পতঙ্গ হে, তার আতঙ্ক কি রয়?" উদাসীন, বীতরাগ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর উক্তি "আমার প্রাণপতি এসেছে এবার শাক্তিপুরে পড়ে।"

প্রেমের আদর্শবাদ ও ভাববিশুদ্ধির দিকটাও কবি একেবারে উপেক্ষা করেন নাই। মাটির পৃথিবীতে দাঁড়াইয়া নীল, নির্মল আকাশের দিকেও তিনি মাঝে মাঝে চোখ তুলিয়াছেন। তিনি বিরহোদ্বেল প্রেমিকাকে প্রেমের একনিষ্ঠতার কথা শুনাইয়াছেন—"একবার চাও পীরিতকে, আবার চাও বিচ্ছেদকে, দ্বিধা মনে কর রসবতী" ও এই প্রসঙ্গে ভগীরথ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও স্বয়ং মহাদেবের একনিষ্ঠ তপস্যার কথা শোনাইয়াছেন। প্রেমের আত্মসমর্পণপরায়ণতার প্রতি তিনি কটাক্ষ করিয়াছেন—"তুমি পীরিত আত্মসুখে সুখী।" যথার্থ প্রেমের অসাধ্যসাধন-ক্ষমতার সম্বন্ধেও তিনি অনবহিত নহেন :—

> প্রেম সুধা পান যে করে তারে।
> নাহি থাকে কোন খেদ
> সপক্ষ, বিপক্ষ প্রেমে পক্ষ নাহি ভেদ।
> নাই উঠতে বসতে শক্তি যার,
> শুনে প্রেমের কথা যায় সাত সমুদ্র পার।
> প্রেমে বোবার কথা শুনে কানায় চক্ষু পায়,
> আবার পঙ্গু এসে ছেসে লঙ্ঘায় গিরি।

প্রেমের এই প্রশস্তিবচন উচ্চারণে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও রোমান্টিক কবিকল্পনা, আটপৌরে জীবনের স্বাদ ও কল্প-লোকের দুরভিসারের অভাবনীয়তা উভয়েরই মিলিত সুর শোনা যায় না কি?

সাধারণত কবিয়ালদের গান খুব কমই ভাব, ভাষা, কল্পনা, আবেগ সব মিলিয়া অনবদ্য প্রকাশসৌষ্ঠব লাভ করে। ইহাতে দুই-একটি শক্তিশালী ও গাঢ়-অনুভূতিসম্পন্ন পংক্তি থাকিলেও সমস্ত কবিতাটি নিখুঁত ও পূর্ণতৃপ্তিবিধায়ক হয় না। হরু ঠাকুর ও রাম বসুর ও উহাদের পূর্ববর্তী রাম-নৃসিংহের কয়েকটি গান স্বরূপীয় সর্বাঙ্গসুন্দরতা লাভ করিয়াছে। হরু ঠাকুরের 'সখি, আমায় ধর ধর', 'পীরিতি নাহি গোপনে থাকে' ও রাম বসুর 'যৌবন জলের মত যায়', 'মনে রৈল সই মনের বেদনা', 'জলে কি জ্বলে, দেখ গো সখি', 'হের নই যে আমি যুবতী', 'দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ', 'কে সাজালে হেন যোগির বেশে' ও রমাপতি ঠাকুরের 'সখি, শ্যাম না এল' প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর প্রেম-কবিতারূপে স্থান পাইবার যোগ্য।

নিধুবাবু (১৭৪১-১৮৩৯) প্রধানত সুরকার ছিলেন,

গ্রন্থের সংযোজনা তাঁহার মৌল কৃতিত্ব। তিনি যদিও কবি হিসাবে ততো উৎকৃষ্ট বা মানে বড়ুর সঙ্গে তুলনীয় নহেন, তবুও তাঁহার প্রবন্ধগুলি কবিত্বরহিত বা রসানুভূতিতে হীন নহে। তাঁহার গানগুলির মধ্যে অন্তত কয়েকটি বিদ্যাপতি-সংগ্রহে অন্তর্ভুক্ত হইবার অধিকারী। কিন্তু তাহা হইতেই বাংলা কাব্যে প্রেমতত্ত্ব ও প্রণয়বিশ্লেষণ বিষয়ে যে অসাধারণ আগ্রহ দেখা দিয়াছিল তাহার এই হিসাব খানিকটা নিষ্প্রভ হইল। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্য ভাবকল্পনার অনুপ্রাণিত, পাশ্চাত্য দিক-দীক্ষায় সুসংস্কৃত কবিগোষ্ঠীর রচনায় প্রেম আবার নূতন রূপপরিগ্রহ করিল। ইহাতে আবেগের বাড় হইয়াছে প্রচুর, তবে কবিত্ব যে একেবারে উপেক্ষণীয় তাহা বলা যায় না। এই কবিতায় প্রেমের সঙ্গে আবাদের গার্হস্থ্য জীবনের যে বিচ্ছেদ ঘটিল তাহাতে প্রেম যতটা অতীন্দ্রিয়ী হইয়াছে ততটা মূর্তিকাঙ্ক্ষী হয় নাই। বিগত এক শতাব্দী ধরিয়া আমরা এই কবিকল্পনাবিহারী প্রেমের ছবিটিকে আমাদের প্রাত্যহিক অনুভূতির মধ্যে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি। কবিগানের প্রেম জীবনোদ্ভূত রস-উদ্গার-স্তূপের জল; আধুনিক কাব্যের প্রেম মেঘলোক হইতে ঝরিত বৃষ্টিধারা—ইহা আমরা চাতকবৃত্তি হইয়া ঊর্ধ্বমুখে পান করি, কিন্তু ইহাকে স্বাতীজাবে ধরা করিবার আগ্রহ আমাদের নাই।

কবি গানের যে নমুনাগুলি আমাদের হাতে পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে সেগুলি যে গানের আসরে মুখে মুখে রচিত তাহা মনে করিবার বিশেষ কারণ নাই। ছন্দরচনার কাঁচা দৃষ্টান্তগুলি বোধ হয় কালের প্রসাদে আপনা-আপনি বিলুপ্ত হইয়াছে। যেগুলি এখনও সংগৃহীত আছে তাহাদের অধিকাংশের মধ্যেই শিল্পবোধ ও সচেতন রচনা-কৌশলের কতকটা কিছু নিদর্শন মিলে। কবিয়ালের শিল্পবোধ শিক্ষিত ও মার্জিত রুচি কবির মত সজাগ্রত ছিল না—অবাস্তবের প্রক্ষেপ ও গঠনশিথিলতা ইহাতে বিশেষ প্রতিবন্ধক হয় নাই। তবে কাব্যরচনার মনস্তাত্ত্বিক প্রেরণার দিক দিয়া কবিগান যে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক তাহাতে সন্দেহ নাই। কবিয়ালরা আসরে গান বাঁধা আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত শিল্পশালার সূক্ষ্ম কারুকার্য পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। আসরের জনপ্রিয়তা ও কবি-যুদ্ধের উত্তেজনা না থাকিলে ইহাদের অনেকেরই কবিশক্তি অনাবিষ্কৃত থাকিত। কিন্তু ইহারা জাতিকে একটা নূতন শিক্ষা দিল যে কাব্য-রচনায় পুঁথিগত বিদ্যা ও শিল্পসাধনার বিশেষ প্রয়োজন নাই। মন ভক্তি ও আধি রসের মিশ্রিত অনুভূতায় পূর্ণ থাকিলে ভোতা কলম দিয়া, এমন কি কলম ছাড়িয়া শুধু মুখ দিয়া রচনা করা যায়। সাধারণ মানুষের এই কাব্য-রসোদ্গম অবস্থা আজীর জীবনে আর পুনরাবৃত্ত হইবে না—রস-গ্রহণ ও রস-আহরণের পুরাতন আয়োজনগুলি সবই বিপর্যস্ত হইয়াছে। এখন অন্তরার পক্ষপুটে যাহা নিষ্পন্ন হয় তাহা রাজনৈতিক উত্তেজনার উগ্র সুরা, ভক্তি-রসসমৃদ্ধ কাব্যসুধা নহে। তথাপি এই কবিগানের সাহিত্যের ইতিহাসে একটি চিরন্তন তাৎপর্য আছে। ইহা রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকে উচ্চ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবদ্যোতনা হইতে মুক্ত করিয়া সার্বভৌম রসানুভূতির ধারায় প্রবাহিত করিয়াছে। এই দিক দিয়া কবিয়ালেরা আধুনিক বৈষ্ণব ভাবাশ্রয়ী কবিগোষ্ঠীর পথপ্রদর্শক ও পূর্বসূরী। বৃন্দাবন-প্রেমলীলাকে তাহারা প্রথম কবিদৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছে ও ইহার বিভিন্ন খণ্ডগুলিকে সামগ্রিক তাৎপর্যের সূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইহাদের ভাবকল্পনাকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কুসুমরঞ্জন বা কালিদাস যে অর্থে বৈষ্ণব কবি সেই অর্থের প্রথম সূচনা কবিয়াল গোঁজার মধ্যেই পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত তাহারা প্রেমের লৌকিক দিকের বিস্তারিত কাব্যালোচনার দ্বারা বাঙলার সমাজ-জীবনে উহার একটা বিশিষ্ট স্থান নির্ধারণ করিয়াছে। তৃতীয়ত ধর্মনিরপেক্ষ গীতিকবিতা বা গানের চর্চার দ্বারা তাহারা গানকে ধর্মের অনুচরত্ব হইতে মুক্তি দিয়াছে। এই সমস্ত দিক দিয়াই বাংলা কাব্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু যাহারা এই পথরেখার প্রথম সূচনা করিয়াছিল তাহাদিগকে কুরুচি ও শিক্ষাহীনতার অপবাদ দিয়া তাহাদের প্রতি ক্ষণের বিস্মৃতি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছে। কবিয়ালের যুগ আর ফিরিবে না। বস্তুতের ভাষায়, উহার ফিরিবার আর প্রয়োজনও নাই; কিন্তু যাহা একদা ছিল ও কাব্য ধারাকে প্রবাহিত রাখিতে সহায়তা করিয়াছিল তাহাকে ভুলিলে ইতিহাসকেই বিকৃত করা হইবে।

জাতীয় গ্রন্থ পরিষদ
সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ
ডিপোজিট-১৩

লোকসাহিত্য ও সমাজ-সংহতি (প্রবন্ধ)

ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য ॥

এ কথা আমরা সকলেই জানি যে, জাতির সাহিত্যের মধ্য দিয়াই জাতীয় সংহতি সৃষ্টি ও তাহা দৃঢ়তর হইয়া থাকে; যে জাতির সাহিত্য নাই, সেই জাতির সামাজিক সংহতি নিতান্ত শিথিল। অনেকে মনে করিতে পারেন, সাহিত্য নাই—এমন জাতিও নাই; কারণ, যেখানে জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, সেখানে সাহিত্যের অভাব থাকিতে পারে না। কিন্তু এ কথা সত্য নহে; কারণ, আপাত দৃষ্টিতে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি যে বিশেষ কোন জাতি বাহির হইতে একটি রূপ লাভ করিয়াছে; কিন্তু গভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, যথার্থ জাতি বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার উপকরণ ইহার মধ্যে নাই, কিংবা থাকিলেও তাহা তত শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে নাই। সেইজন্য রাজনৈতিক কারণে বাহিরের দিক দিয়া কোন জাতির একটি আপাত অখণ্ড রূপ প্রত্যক্ষ করিলেও, কোন কোন বিশেষ অবস্থার সম্মুখীন হইলেই সেই জাতির আভ্যন্তরিক শক্তির যথার্থ পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়ে। তখন দেখা যায়, যাহাকে উপর হইতে আমরা এক অখণ্ড রূপ বলিয়া ভুল করিয়াছিলাম, প্রকৃতপক্ষে অন্তরের দিক দিয়া তাহার সেই পরিচয় সত্য ছিল না। অন্তরের শক্তিই বাহিরের রূপটিকে রক্ষা করে; অন্তর যেখানে শূন্য, বাহিরের কোনও অবস্থাই তাহাকে রক্ষার কার্যে সহায়তা করিতে পারে না। জাতি হিসাবে ইংরেজ যাহা, মার্কিন তাহা নহে। জনসংখ্যার আধিক্য কিংবা ভৌগোলিক বিস্তারেই জাতির সংহতির পরিচয় নাই; সংহতির শক্তিতেই জাতির শক্তি। সেই সংহতি ইংরেজ জাতির যেমন আছে, মার্কিন জাতির তেমন নাই। সুদীর্ঘ ঐতিহ্য অনুসরণ করিবার ফলেই ইংরেজ জাতি আজ এই জাতীয় সংহতির অধিকারী হইতে পারিয়াছে; কিন্তু আপেক্ষিক অল্প কালের জন্য বলিয়া মার্কিন জাতির মধ্যে সেই সংহতি গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। ইংরেজি সাহিত্য অপেক্ষা মার্কিন জাতির সাহিত্য যে আজও অবিশ্বিংকর, ইহাই ইহার অন্যতম কারণ। লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে সেই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

মার্কিন দেশের সুপরিচিত একটি শিশুর ছড়া এই প্রকার—

Eeny, meeny, miny mo,
Take the Nigger by the toe.
If he hollers, let him go,
Eeny, meeny, miny mo.

এই ছড়াটি পড়িলেই বুঝিতে পারা যাইবে, ইহাকে মার্কিন জাতির শিশুর ছড়া বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে বাধা আছে। কারণ, মার্কিন দেশের অধিবাসী কৃষ্ণকায় নিগ্রো জাতিও মার্কিন জাতির অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে তাহাদের উপর কটাক্ষপাত আছে। সুতরাং যে রসবস্তু সামগ্রিক জাতির আনন্দ সৃষ্টির অন্তরায়, তাহা সামগ্রিক ভাবে কোন জাতির সাহিত্য হইতে পারে না; যদি সামগ্রিক ভাবে একটি অখণ্ড জাতির সাহিত্য তাহা না হয়, তবে তাহা সাহিত্য-ধর্ম হইতেই বিচ্যুত হয়। কারণ, যখন আমরা বাংলা সাহিত্য বলি, তখন অখণ্ড বাঙ্গালী জাতির সামগ্রিক সাহিত্যই বুঝি; যখন মার্কিন সাহিত্য এ কথা বলি, তখনও অখণ্ড মার্কিন জাতির সামগ্রিক সাহিত্যই বুঝাইতে চাই। কিন্তু উপরে যে ছড়াটি উদ্ধৃত করিলাম, তাহা কৃষ্ণকায় ও শ্বেতকায় অধ্যুষিত সমগ্র মার্কিন জাতির অখণ্ড সাহিত্যের পরিচয় বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ, ইহাতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহাতে শ্বেতকায় মার্কিন শিশু কৃষ্ণকায় নিগ্রো জাতিকে আঘাত করিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, সাহিত্য পরস্পরকে কখনও বিশ্লিষ্ট করে না, বরং পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই ত্রুটির জন্য উক্ত ছড়াটি বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের মনোভাবের বাহন হইলেও, সামগ্রিক ভাবে মার্কিন জাতির কোন পরিচয় প্রকাশ করিতে পারে নাই।

যে জাতি একটি সুদীর্ঘ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া নিজের সংহতিকে সুদৃঢ় করিতে পারে না, তাহার মধ্যে লোক-সাহিত্যই হউক, কিংবা উচ্চতর সাহিত্যই হউক, কিছুই যথার্থ শক্তিলাভ করিতে পারে না। মার্কিন দেশের লোক-সাহিত্য হইতে এই প্রকার আরও বহু নিদর্শন উল্লেখ করা যায়।

এ কথা সকলেই জানেন যে, শিশুর ছড়ার একটি বিশিষ্ট রূপ আপনা হইতে গড়িয়া উঠে; ইহা শিশুর প্রয়োজনেই গড়ে, শিশুর প্রয়োজনেই ভাঙ্গে, এই ভাবেই ইহার প্রাণধারা অব্যাহত থাকিয়া যায়। জাতির বহির্মুখী জীবনের সঙ্গে শিশুর কোন যোগ নাই। জাতির বৃহত্তর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন শিশুর রস-দৃষ্টিকে কখনও আচ্ছন্ন করিয়া দিতে পারে না; শিশুর নামে প্রচলিত যে সকল রচনায় এই প্রয়াস দেখা যায়, তাহাদের যেমন কোনও ব্যাপক আবেদন প্রকাশ পাইতে পারে না, তেমনই তাহা সমাজে স্থায়িত্বও লাভ করিতে পারে না। দেশবিদেশের লোক-সাহিত্য অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, উল্লেখযোগ্য জাতিগুলির মধ্যে মার্কিন দেশের লোক-সাহিত্যেই এই ত্রুটি সর্বাপেক্ষা বেশি। সে দেশের ছেলে-ভুলানো ছড়াগুলি পাঠ করিলে দেখা যায়, রাজনৈতিক চেতনা তাহাদের মধ্যে কতখানি সজাগ হইয়া উঠিয়া তাহাদের শিশুর অকারণ আনন্দ সম্ভোগের ক্ষেত্রগুলিকে কত দূর আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মার্কিন দেশের কতকগুলি শিশুর ছড়া রাজনৈতিক প্রয়োজনের দিক হইতে কি ভাবে যে পরিবর্তিত হইয়া পরে যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে; এখানে বুঝিতে হইবে যে শিশুর প্রয়োজনে ইহারা পরিবর্তিত হয় নাই, বহির্মুখী রাষ্ট্রীয় ব্যবহারিক জীবনের তাড়নায়

ইহারা পরিবর্তিত হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে শিশুর চিরন্তন সহজ আনন্দ লাভের যে ব্যাঘাত হইয়াছিল, তাহার ফলেই তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দুই একটি ছড়া এখানে উদ্ধৃত করা যাক—

Eeny meeny Mussolini,
Hit him on the bumble beany.

বাংলাদেশের শিশুদিগের মধ্যে 'আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম' নামক যে ছড়াটি প্রচলিত আছে, শ্বেতাঙ্গ মার্কিন শিশুর 'Eeny meeny' ছড়াটিও তাহারই তুল্য। বাংলাদেশের উপর দিয়াও যুদ্ধ বিগ্রহ, মন্বন্তর ইত্যাদি কত দুর্যোগেরই ত প্লাবন বহিয়া যাইতেছে; তথাপি 'আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম' ছড়ার একটি অক্ষরও এই সকল বহির্মুখী প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে পরিবর্তিত করিয়া লওয়া হয় নাই। ইহাই লোক-সাহিত্যের ধর্ম। পূর্বেই বলিয়াছি, লোক-সাহিত্যের সকল বিষয়ের মত ছড়াও পরিবর্তিত হয় সত্য, কিন্তু তাহা শিশুর প্রয়োজনেই শিশু-জগতের নিয়মেই পরিবর্তিত হয়, সমাজের পরিণত-বুদ্ধি মানবের বহির্মুখী ব্যবহারিক প্রয়োজনে তাহা কদাচ পরিবর্তিত হয় না। কিন্তু এখানে দেখা যাইতেছে, বহির্মুখী একটি রাষ্ট্রীয় চেতনার ফলে ইহা পরিবর্তিত হইয়াছে। সুতরাং ইহার উপর যে পরিণত-বয়স্কের প্রভাব পড়িয়াছে, তাহা সহজেই অনুভূত হয়; এই ভাবেই ইহা লোক-সাহিত্যের ধর্ম হইতেও বিচ্যুত হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালেই এই ছড়াটি কত ভাবে যে পরিবর্তিত হইয়াছে, আরও কয়েকটি মার্কিন ছড়া উদ্ধৃত করিলে তাহা আরও স্পষ্ট হইতে পারে। জাপানের সঙ্গে যখন মার্কিন দেশ যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়িল, তখন মার্কিন শিশুরা এই ছড়াটি এই ভাবে পরিবর্তিত করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিল—

Eeny, meeny, miny mo,
Catch a Jap by the toe.
If he hollers, make him say:
'I surrender, U. S. A.'

এমন কি, জাপানের যুদ্ধকালীন প্রধান মন্ত্রী বৃদ্ধ তোজোও মার্কিন শিশুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পান নাই। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ছড়াটি তাহারা এইভাবে পরিবর্তিত করিল—

Eeny, meeny, miny mo,
Catch old Tojo by the toe.
If he hollers, make him say:
'I surrender, U. S. A.'

এই ভাবে এক বহির্মুখী রাষ্ট্র-সচেতন মন লইয়া সে দেশের শিশুর ছড়া রচিত হইয়াছে; তারপর সেই রাষ্ট্র-ব্যবস্থার যখন পরিবর্তন হইয়াছে, অর্থাৎ জাপান যুদ্ধের অবসানে হইয়া জাপানের সঙ্গে মার্কিন জাতির 'মিত্রতা' স্থাপিত হইয়াছে, তখন শিশুর সমাজ স্বভাবতই ছড়াগুলি বিস্মৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। শিশুর একান্ত নিজস্ব চিন্তাধারা অনুসরণ করিয়া যদি ইহারা রচিত হইত, তবে ইহাদের আয়ু এত ক্ষণস্থায়ী হইত না।

মার্কিন জাতির লোক-সাহিত্যের এই অবস্থার সঙ্গে যে কোন প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ জাতির লোক-সাহিত্যের তুলনা করিলেই ইহাদের কাহার যে কি শক্তি, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। এই সম্পর্কে বাংলা দেশের ছেলে ভুলানো ছড়ার কথাই ধরা যাক। কারণ, বাংলা দেশ আয়তনে যত ক্ষুদ্রই হোক, তথাপি এই সম্পর্কে ইহার যে ঐতিহ্য আছে, বৃহদায়তন মার্কিন দেশের তাহা নাই। বাংলা দেশের উপর দিয়াও যে কত রাষ্ট্রবিপ্লবের প্লাবন বহিয়া গিয়াছে, তাহার অন্ত নাই। তথাপি এ দেশের লোক-সাহিত্যের বিপুল সংগ্রহের মধ্য হইতে তাহার কোন পরিচয় পাইবার উপায় নাই। সমাজের উপরিস্তরে রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়, কিন্তু তাহার অন্তর্লোকে লোক-

সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ হয়; উপরিস্তরের ধূলি-মালিন্য ইহার অন্তর্লোক স্পর্শ করিতে পারে না। বাংলার সমগ্র লোক-সাহিত্য ইহার অন্তর্লোকেরই সৃষ্টি, বিষয়-বুদ্ধি ও ব্যবহারিক জীবনের স্পর্শহীন জননী ও শিশুসমাজ তাহাদের অকারণ আনন্দের প্রেরণায় তাহা সৃষ্টি করিয়াছে। সেইজন্য পুরুষের স্বার্থ দ্বন্দ্বের কোনও কোলাহল সেখানে শুনিতে পাওয়া যায় না। এই সম্পর্কে একটি ছড়া সম্পর্কে যে কাহারও একটু সন্দেহ হইতে পারে, তাহা এই—

ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিবে কিসে।

কেহ এ কথা বলিতে পারেন যে, ইহার মধ্যে ত বাংলার সমাজের এক বহির্মুখী বিপর্যয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। এ কথা সত্য হইলেও এই ছড়াটি সম্পর্কেও দুই একটি বিষয় ভাবিয়া দেখা যাইতে পারে। এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এই ছড়াটি যত তথ্যপ্রধান, তাহার চাইতে বেশী রস-প্রধান। বর্গীর আক্রমণ বিষয়ক তথ্য অপেক্ষা ইহার মধ্যে শিশুর নিদ্রা যাইবার উপযোগী যে একটি স্বপ্নধর্মী চিত্র ও সুর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার শক্তি বেশি এবং তাহার ভিতর দিয়াই ইহার আবেদন। 'বর্গী' শব্দটি এখানে ছন্দের সুর-প্রসঙ্গে আসিয়াছে, তথ্য পরিবেশন প্রসঙ্গে আসে নাই। এখানে 'ঘুমাল' 'জুড়াল' 'এল' 'বুলবুলি'—এই অনুপ্রাসযুক্ত শব্দগুলির ভিতর দিয়া নিদ্রার অনুকূল যে একটি পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ভিতর দিয়াই ইহার সাহিত্যগত রসসৃষ্টি সার্থকতা লাভ করিয়াছে—তাহার ফলে 'বর্গী' সংক্রান্ত ঐতিহাসিক তথ্যটি গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্যই ছড়াটি বর্গীর আক্রমণের স্মৃতি দেশ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবার পরও, লোক-সমাজের স্মৃতি অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া আছে। এমন কি, বাংলার যে অঞ্চলে বর্গীর আক্রমণ রূপ কোন উৎপাত হয়ও নাই, সেই অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিয়াও ইহার প্রচলন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে; তথ্যই যদি ইহার একমাত্র ভিত্তি হইত, তাহা হইলে ইহা কবেই এইভাবে বিস্তার লাভ করা দূরে থাকুক, আজ পর্যন্ত অস্তিত্বও রক্ষা করিতে পারিত না। বাংলার যে অঞ্চলে বর্গীর আক্রমণ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা হইতে বহু দূরবর্তী চট্টগ্রাম অঞ্চলে ছড়াটি এইভাবে প্রচলিত আছে—

মণি ঘুমাইল পাড়া জুড়াইল গোরুকী আইল দেশে।
টীয়া পাখীতে ধান খাইল খাজনা দিবে কিসে।

চিত্র এবং সুরকে আশ্রয় করিয়াই ইহা বাঁচিয়া আছে, একান্তভাবে তথ্যকে আশ্রয় করিলে বহু পূর্বেই ইহার বিনাশ হইত।

বাংলা দেশ দীর্ঘকাল যাবৎই হিন্দু মুসলমান অধ্যুষিত দেশ। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বাহিরের দিক দিয়া সর্বদাই যে প্রীতির ভাব রক্ষা পাইত, তাহা নহে। অথচ বাংলার লোক-সাহিত্যের যে বিপুল সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কোন অংশে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-প্রসূত কোন উক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। এমন কি, এই বিষয়ে উচ্চতর সাহিত্যের যে ত্রুটি দেখা যায়, লোক-সাহিত্যে তাহাও নাই। বাংলা লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান বলিয়া কেহ নাই, ছেলে-ভুলানো ছড়ায় চিরন্তন শিশু ও জননীরই যেমন সন্ধান পাওয়া যায়, কথা-সাহিত্য, গীতিকা ও গীতির ক্ষেত্রে সর্বধর্মসম্প্রদায়-নিরপেক্ষ চিরন্তন মানুষেরই অন্তর্বেদনার অভিব্যক্তি অনুভব করা যায়। বাংলার লোক-সাহিত্যের মধ্য দিয়াই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বাংলার অধিবাসীর ভিতরে একটি সংহতি গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছিল। বাহিরের দিক হইতে বৈষ্ণব, শাক্ত, বাউল, মুসলমান যতই পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার

প্রয়াস পাইয়াছে, বাংলার লোক-সাহিত্যে তাহাদের মধ্যে ততই ঐক্য স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছে। সমাজের অলক্ষিতে ইহার ক্রিয়া অব্যাহত ছিল বলিয়াই এক ভাষা ও সাহিত্যের বন্ধন আজ ইহার মধ্যে এত দৃঢ় বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে।

সুতরাং উচ্চতর বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'হিন্দু-সাহিত্য' কিংবা 'মুসলমান-সাহিত্য' বলিয়া কিছু থাকিলেও নিরক্ষর সমাজের মৌখিক সাহিত্য এই প্রকার সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা চিহ্নিত হইতে পারে নাই—বাংলায় হিন্দুর লোক-সাহিত্য কিংবা মুসলমানের লোক-সাহিত্য বলিয়া কিছু নাই, যাহা আছে তাহা বাঙ্গালীর লোক-সাহিত্য। এই ধর্ম-ও-সম্প্রদায় নিরপেক্ষ লোক-সাহিত্য বাংলার সমাজে সংহতি রক্ষা করিবার যতখানি সহায়ক হইয়াছে, বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের আর কোন উপকরণই ততখানি সহায়ক হইতে পারে নাই।

আমাদের প্রকাশিত

কয়েকখানি অমূল্য সাহিত্য-গ্রন্থ

সুধী সাহিত্যাধ্যাপক ও সমালোচক
ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রণীত

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস

[প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড]

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক
ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত

শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ

—দর্শনে ও সাহিত্যে

শি ল্প লি পি

কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়

এ. মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২

মহাভারতে কর্ণ

প্রবন্ধ

অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী

॥ ১ ॥

জন্মকথা : সূর্যতনয়ের সূতপুত্রত্বপ্রাপ্তি

স বালস্তেজসা যুক্তঃ সূতপুত্রত্বমাগতঃ।

—শান্তিপর্ব

মহাভারত "কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্তাঃ পুণ্যাঃ বিবিধাঃ কথাঃ"। অসংখ্য চরিত্রকথা এবং ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—জীবনের এই চতুর্বর্গের কথা ঋষিকবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই বিরাট গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। মহাভারতের প্রত্যেকটি চরিত্র একটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে ঋষিকবির লেখনীমুখে ফুটে উঠেছে। কর্ণচরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য মহাকবি বর্ণনা করেছেন সেটি হচ্ছে যে অসাধারণ বীর্য ও পরাক্রম, অলোকসামান্য প্রতিভা ও অসংখ্য গুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেও কর্ণের জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। কর্ণ মহাভারতে সবচেয়ে রূপবান ও বীর্যবান্ পুরুষ। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলছেন—কর্ণ দীপ্তিতে সূর্যতুল্য, কান্তিতে চন্দ্রের মতো ও দ্যুতিতে অগ্নিসদৃশ—"দীপ্তিকান্তিদ্যুতিগুণৈঃ সূর্যেন্দুজ্বলনোপমঃ।" দেহের গঠনে তিনি প্রাংশু স্বর্ণময় তালবৃক্ষের মতো। এত গুণ, এত প্রতিভা ও এত ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেও তাঁর জীবনের একমাত্র পরিচয় হল যে তিনি সূতপুত্র। সূতপুত্র ছিলেন না কর্ণ, ক্ষত্রিয় বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন কুন্তীর গর্ভে, সূর্যের ঔরসে। কিন্তু সূতের গৃহে লালিত পালিত হয়ে সূতপুত্রত্বের যে কলঙ্ক তাঁর ললাটে অঙ্কিত হয়েছিল সে কলঙ্ক কর্ণের সমস্ত জীবনকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল। কর্ণ কিন্তু জীবনে কখনও এই গ্লানি বা পরাভবকে স্বীকার করেন নি। পুরুষকার এবং দৈব এই দ্বন্দ্বের সংঘাতময় জীবন কর্ণের। তাই জীবনের

শেষমুহূর্ত পর্যন্ত কর্ণ পৌরুষের জয়গান করে গেছেন। কবি ভট্টনারায়ণের "বেণীসংহার" নাটকে কর্ণের মুখনিঃসৃত বাণী

"সূতো বা সূতপুত্রো বা যো বা কো বা ভবাম্যহম্।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মমায়ত্তং তু পৌরুষম্।"

কর্ণের চরিত্রের এই অসাধারণত্বের ওপর আলোকপাত করছে। কর্ণ বলেছিলেন যে তিনি সূতপুত্র হতে পারেন অথবা আরও নীচ বা ছোটো হতে পারেন। জন্মের জন্য মানুষ দায়ী নয়, জন্ম দৈবের অধীন। পৌরুষ বা পুরুষকার মানুষের করায়ত্ত এবং তাই হল তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা ও সম্পদ। কর্ণের পৌরুষ কিন্তু বার বার দৈবের দ্বারা প্রতিহত হল। তাই কর্ণ-চরিত্রের মূল সুর—নিষ্ফলতার, হতাশার, ব্যর্থতার ও বিষাদের সুর। জীবনে বার বার তাঁর পরাভব ঘটেছে কিন্তু সে পরাভবকে তিনি কখনও চরম বলে স্বীকার করেন নি। অক্লান্ত সংগ্রাম করে গেছেন চিরজীবন পরাভবের বিরুদ্ধে এবং সেইজন্য মহাভারতে কর্ণের পরাভব দীপ্তিহীন বা কীর্তিহীন নয়, বরং সেই পরাভব দীপ্তির গরিমায় এবং কীর্তির মহিমায় সমুজ্জ্বল। কুরুক্ষেত্র সমরপ্রাঙ্গণে অর্জুনের সঙ্গে শেষ যুদ্ধে কর্ণ তাঁর অহিতকামী সারথি মদ্ররাজ শল্যকে তিরস্কার করে বলেছিলেন যে কর্ণ পরাভবকে জীবনে কখনও স্বীকার করেন নি, ভয় যে কি তা তিনি কখনও জানেন না, বিক্রম প্রকাশের জন্য এবং যশের জন্য তিনি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

ন হি কর্ণঃ সমুদ্ভূতো ভয়ার্থমিহ মদ্রক।
বিক্রমার্থমহং জাতো যশোঽর্থং চ তথাত্মনঃ।

পাণ্ডুপত্নী ও পাণ্ডবজননী কুন্তীর কানীনপুত্র কন্যাবস্থায় গর্ভজাত কর্ণ। একজন মহাতপস্বী ব্রাহ্মণকে পরিচর্যার দ্বারা সন্তুষ্ট করে রাজা কুন্তিভোজের কন্যা কুন্তী তাঁর পিতৃালয়ে সেই ব্রাহ্মণের একটি বর লাভ করেছিলেন। কুন্তী তখন অবিবাহিতা। এই বরের দ্বারা যে কোনও দেবতাকে আহ্বান করলেই সেই দেবতা কুন্তীর কাছে উপস্থিত হতেন। এক দিন কুন্তী পূর্বাকাশে নবোদিত অংশুমান্ সূর্যকে দেখে কৌতূহলান্বিত হয়ে তাঁকে আহ্বান করলেন। সূর্যের আগমনে এবং সূর্যের সংস্পর্শে কুন্তী গর্ভবতী হলেন। যথাসময়ে একটি পুত্রসন্তান তিনি প্রসব করলেন। এই পুত্র সহজাত কবচ ও কুণ্ডল নিয়ে এসেছিল—"সহজং কবচং বিভ্রৎ কুণ্ডলদ্যোতিতাননঃ।" দিবাকরসদৃশ এই পুত্রকে কিন্তু কুন্তী লোকলজ্জাভয়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দিলেন।

পিতৃালয়ে রাজা কুন্তিভোজের গৃহে নিশীথ রাত্রিতে কুন্তী এই শিশু জন্মগ্রহণ করবার পরক্ষণেই ধাত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে বেতসনির্মিত একটি মঞ্জুষার ব্যবস্থা করলেন। সেই মঞ্জুষার মধ্যে কোমল বস্ত্রের দ্বারা উত্তমরূপে শয্যা রচনা করে সেই শয্যার ওপর শিশুসন্তানটিকে রেখে মঞ্জুষার সমস্ত দিক মোমের প্রলেপ দিয়ে ছিদ্রহীন করে দিলেন। তারপর কুন্তী ধাত্রীর সঙ্গে রোদন করতে করতে গভীর রাত্রিতে সেই মঞ্জুষা নিয়ে এলেন অশ্বনদীর তীরে। কুমারীর গর্ভধারণ অবৈধ জেনেও পুত্রস্নেহে কুন্তী করুণস্বরে বিলাপ করতে আরম্ভ করলেন। মঞ্জুষা অশ্বনদীর জলে ভাসতে আরম্ভ করেছে—এই দৃশ্য দেখে স্নেহপরায়ণা কুন্তী বলতে আরম্ভ করলেন—পুত্র, শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ, তোমার যাত্রাপথ মঙ্গলময় হোক্! সর্ব দিক্ তোমাকে রক্ষা করুক, জলে জলাধিপতি বরুণ, অন্তরীক্ষে সর্বগ পবন এবং ঊর্ধ আকাশে তোমার পিতা তপনদেব তোমাকে রক্ষা করুন! বিশ্বের সমস্ত দৈবী শক্তি তোমার আপদে বিপদে তোমাকে রক্ষা করুক! আজ আমি তোমাকে অকরুণভাবে নদীর জলে ভাসিয়ে দিচ্ছি কিন্তু তুমি যদি বেঁচে থাক তাহলে বিদেশেও তোমাকে দেখামাত্র আমি চিনতে পারব, কেননা এমন সহজাত অমৃতময় কবচকুণ্ডল নিয়ে কোনও শিশু আর কখনও মাতৃগর্ভে আসেনি। মা হয়ে আমি তোমাকে স্রোতের জলে বিসর্জন দিচ্ছি কিন্তু তোমার পিতা বিভাবসু ধন্য যিনি সমস্ত স্রোতোপথ ধরে তোমাকে দেখতে থাকবেন, তাঁর চোখের আড়াল তুমি কখনও হবে না। মা হয়ে আমি তোমাকে মাতৃত্বস্তন্য দিতে পারলাম না কিন্তু সেই নারী ধন্য যে তোমাকে পুত্ররূপে পেয়ে একদিন তোমার চুম্বিত মুখে স্তন্যদান করতে পারবে। সেই নারী কি পুণ্যবতী না আজ দেখেছে যে তোমার মতো দিব্যবর্মসমাযুক্ত দিব্যকুণ্ডলভূষিত পদ্মায়তবিশালাক্ষ সুললাট সুকেশ আদিত্যবর্ণ পুত্রকে লাভ করবে! পুত্র, তুমি যখন জানুযুগলদ্বারা মাটিতে হেঁটে বেড়াবে, অব্যক্তমধুর বাক্য উচ্চারণ করবে এবং ধূলিধূসরিত হবে, তখন তোমাকে যাঁরা আদর করবেন তাঁরাও ধন্য। তারপর আবার তুমি যখন যৌবনে পদার্পণ করে হিমালয়ের দৃপ্তসিংহের মতো

নিষ্ফল করবে সে দৃশ্যও যারা দেখবে তারাও ভাগ্যবান্। এইভাবে বারংবার বিলাপ করে অশ্রুনদীর জলে মহুয়া বিসর্জন দিয়ে পুত্রশোকাতুরা কুন্তী—পিতার ভয়ে গোপনে হাত-অঞ্চলপুটে ফিরে এলেন। জলের বুক আবেগ এবং মানুষহৃদয়নিঃসৃত অশ্রুধারা আজ কুন্তীকে লোকলজ্জাভয়ে সংযত করতে হচ্ছিল।

মহুয়া অশ্রুনদীর জলে ভাসতে ভাসতে চর্মণ্বতী (বা চম্বল) নদীতে এসে পড়ল। তারপর চর্মণ্বতীর স্রোত বেয়ে সেই মহুয়া যমুনায় এসে উপস্থিত হল। যমুনা সেই মহুয়াকে প্রয়াগে গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে নিয়ে এল। অবশেষে গঙ্গার প্রবাহে মহুয়া উপস্থিত হল অঙ্গরাজ্যে গঙ্গাতীরে চম্পানগরীতে। মহাভারতের মহাকবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বর্ণনা করছেন: আজ যেন নদীও বক্ষে ধারণ করে—যে মহুয়ায় অমৃতময় দিব্য বর্মকুণ্ডলযুক্ত কুন্তী-নন্দন সযত্নে রক্ষিত। তাই নদী পরম আনন্দে ও সগর্বে তরঙ্গের দোলা দিতে দিতে মায়ের মতো সেই শিশুকে বুকে করে তীরের দিকে নিয়ে চলল।

সেদিন সকালবেলা সূত অধিরথ পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গায় স্নান করতে এসেছে। অধিরথ-পত্নী রাধা বন্ধ্যা—পুত্রকামনায় অনেক ব্রত করেও পুত্রমুখনিরীক্ষণের সৌভাগ্য তার জীবনে ঘটেনি। গঙ্গা জলে স্নান করতে নেমেছে রাধা। হঠাৎ সে দেখতে পেল একটি মহুয়া ভাগীরথীর তরঙ্গে নাচতে নাচতে এগিয়ে এসে তার বুকের কাছে পৌঁছল। কৌতূহলী রাধা সেই মহুয়াটিকে পেয়ে স্বামী অধিরথকে দেখাল। তখনই অধিরথ জল থেকে সেই মহুয়াটিকে উদ্ধার করে তার মুখ খুলে তার মধ্যে দেখতে পেল কবচ-কুণ্ডল-সন্নিভ, স্বর্ণবলয়চর্চিত এবং কনক কুণ্ডলের দ্যুতিতে উদ্ভাসিতকক্ষ একটি বালক। বিস্ময়ে উৎফুল্ল অধিরথ সেই বালককে বুকে করে রাধাকে বলল: দেখ দেবতার আশীর্বাদে আপনা হতেই এই পুত্র আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। আমরা অপুত্রক, এই পুত্রকে তুমি গ্রহণ কর। স্বামীর কাছ থেকে প্রত্যয় পেয়ে রাধা সেই পুত্রকে বুকে তুলে নিল। রাধার স্তন্য দুগ্ধকে জাগিয়ে তুলল এই পুত্র এবং এর পর রাধার গর্ভে কয়েকটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করল। দৈবক্রমে প্রাপ্ত এই পুত্রের নামকরণ হল বসুষেণ, কেননা অঙ্গের সম্পদ নিয়ে এই শিশু পৃথিবীতে এসেছিলেন। সূত অধিরথের গৃহে লালিতপালিত হয়ে অচিরেই এই শিশু "সূতপুত্র" এই আখ্যায় পরিচিত হল।

অঙ্গরাজ্যে চম্পানগরীতে শিশু দিনে দিনে বড় হচ্ছে। অধিরথ তার শিক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেছে। অবশেষে দেখা গেল যে পুত্রের গুণানুযায়ী অস্ত্রশিক্ষার ব্যবস্থা সেখানে হচ্ছে না। তাই অধিরথ পুত্রকে পাঠাল চম্পাপুরী থেকে কুরুরাজধানী হাস্তিনপুরে। সেখানে অস্ত্র-গুরু ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য—যাঁকে প্রাচীন ভারতের সামরিক ঐতিহ্যের স্রষ্টা বলা যেতে পারে—কুরুরাজপুত্রগণের ধনুর্বেদশিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং দ্রোণাচার্যের সামরিক শিক্ষা তখন সমস্ত ভারতে অপূর্ব প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। অধিরথের ইচ্ছা হল যে তার পুত্র দ্রোণাচার্যের শিষ্য হয়ে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করুক। যথাসময়ে অধিরথ-সুত বসুষেণ দ্রোণের সামরিক বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পেল এবং সেখানে শীঘ্রই কুরুরাজকুমারগণের অগ্রণী দুর্যোধনের সঙ্গে বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হল।

॥ ২ ॥

অস্ত্রশিক্ষা: বঞ্চনা ও অভিশাপ

অর্জুনেন সমো যুদ্ধে ভবেয়মিতি মে মতিঃ

—শান্তিপর্ব

হাস্তিনপুরে দ্রোণাচার্যের অস্ত্রশিক্ষালয়ে বিদ্যার্থী কর্ণ অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করছে। ধনুর্বেদে অর্জুন এগিয়ে যাচ্ছে—এই দৃশ্য দেখে কর্ণ মনে মনে ব্যথিত। তারও প্রতিভা কম ছিল না কিন্তু দ্রোণাচার্যের অর্জুনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব তাকে বিদ্যার্থিগণের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য করে তুলছে।

একদিন সাহসে ভর করে দ্রোণাচার্যকে একান্তে পেয়ে কর্ণ গিয়ে তাঁকে বলল—

ব্রহ্মাস্ত্রং বেদ্তুমিচ্ছামি সরহস্যনিবর্তনম্।
অর্জুনেন সমো যুদ্ধে ভবেয়মিতি মে মতিঃ।

আমি ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ ও উপসংহার জানতে চাই। যুদ্ধে অর্জুনের সমকক্ষ হব এই আমার আকাঙ্ক্ষা।

কর্ণ আরও বলল—আপনি গুরু, শিষ্যগণের প্রতি আপনার সমান স্নেহ থাকা প্রয়োজন। আপনি যদি আমার প্রতি

প্রসন্ন হন তাহলে আমি জীবনে অস্ত্রবিদ্যায় কৃতী হতে পারি। নিষ্ঠুরভাবে দ্রোণাচার্য উত্তর দিলেন—ব্রহ্মার শিষ্য। করবার অধিকার ব্রাহ্মণের, অথবা সামী ক্ষত্রিয়ও এই বিদ্যা শিক্ষা করতে পারে কিন্তু আর কারও গ্রহণের অধিকার নেই। দ্রোণাচার্য যেন স্পষ্টই কর্ণকে বললেন যে সূতপুত্রের এই স্পর্ধা অমার্জনীয়। কর্ণের জীবনে এই প্রথম বঞ্চনা। অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার অদম্য আগ্রহ এইভাবে হাস্তিনপুরে অঙ্কুরেই নষ্ট হয়েই গেল।

অভিমান-ভরা মন নিয়ে তখনই কর্ণ চলে এল হাস্তিনপুর থেকে পূর্বভারতে সুদূর মহেন্দ্র পর্বতে। সেখানে ভার্গব পরশুরাম একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করে নির্জনে অবসর ভোগ করছিলেন। সহসা কর্ণ তাঁর কাছে এসে বলল—আমি ভার্গব-গোত্রীয় যুবক, অস্ত্রবিদ্যার জন্যে আপনার কাছে এসেছি। যুবকের দেহের গঠন, অসাধারণ রূপ ও প্রতিভার লক্ষণ দেখে ভার্গব পরশুরাম তাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করলেন এবং স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে তাঁর আশ্রমে তাকে স্থান দিলেন। অকাতরে সমস্ত অস্ত্রবিদ্যা দান করলেন পরশুরাম কর্ণকে। শুধু কর্ণও গুরুগত সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করে কৃতার্থ হল। এবার হাস্তিনপুরে প্রত্যাবর্তনের সময় হয়েছে। একদিন মহেন্দ্র পর্বতের সানুদেশে বঙ্গোপসাগর তীরে বিচরণ করছে কর্ণ ধনুর্বাণ ও পরশু হাতে নিয়ে। না জেনে না বুঝে হঠাৎ একটি ব্রাহ্মণের হোমধেনুকে বধ করে ফেলল কর্ণ। অনিচ্ছাকৃত এই অপরাধ এড়াতে চায়নি কর্ণ। নিহত ধেনুর পার্শ্বে অপেক্ষমাণ কর্ণ। মনের ইচ্ছা ব্রাহ্মণ এলেই তাঁকে সমস্ত কথা বলে মার্জনা চাইবে সে। ব্রাহ্মণ এলেন। কর্ণ কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁকে বলল—

অবুদ্ধিপূর্বং ভগবন্ ধেনুরেষা হতা তব।

না বুঝে আপনার এই ধেনুটিকে আমি হত্যা করেছি। আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনি প্রসন্ন হোন্। ব্রাহ্মণ কিন্তু সেকথা একেবারেই শুনলেন না। ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন—

দুরাচার বধার্হস্ত ফলং প্রাপ্নহি দুর্মতে।

তুমি দুরাচার, বধযোগ্য, এই কর্মের ফল তোমাকে পেতে হবে। ব্রাহ্মণ আরও বললেন—যার কথা মনে করে সব সময় স্পর্ধা করছ তোমার সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে যুদ্ধকালে মেদিনী তোমার রথচক্র গ্রাস করবে—কৃষ্ণিচক্রং গ্রসিষ্যতি। পালি তাই নয়, সেই অবস্থায় তোমার শত্রু তোমার দেহ থেকে তোমার মস্তক বিচ্ছিন্ন করবে। নরাধম, এই মুহূর্তে এখান থেকে তুমি দূরে সরে যাও।

কর্ণ অনেক অনুনয় করেছিল ব্রাহ্মণের কাছে এই অভিশাপ ফিরিয়ে নেবার জন্যে। অনেক গোধন ও ধন দান দিতে চেয়েছিল ব্রাহ্মণকে কিন্তু কিছুতেই ব্রাহ্মণ তুষ্ট হলেন না; সুতরাং অভিশাপ হয়েই গেল। জীবনে কর্ণের এই প্রথম অভিশাপ। সারা জীবন ধরে কর্ণ বঞ্চনা আর অভিশাপ সংগ্রহ করেছে। তাই মহাভারতের শান্তিপর্বে দেবর্ষি নারদ যথার্থই কর্ণশোককাতর যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন—

এবং শপ্তস্তব ভ্রাতা সর্বভিক্ষাপি বঞ্চিতঃ।

অর্থাৎ তোমার ভ্রাতা কর্ণ এই ভাবে সমস্ত জীবন অভিশপ্ত হয়েছে এবং সকলের কাছে বঞ্চনা লাভ করেছে।

ভগ্নহৃদয়ে ব্রাহ্মণের অভিশাপ নিয়ে গুরুর আশ্রমে ফিরে এল কর্ণ। একদিন গুরুশিষ্য দুইজনে আশ্রমের দ্বারে ভ্রমণ করছেন, ক্লান্ত হয়ে পরশুরাম বিশ্রাম করতে চাইলেন। কর্ণের কোলে মাথা রেখে ক্লান্তমনা পরশুরাম ঘুমিয়ে পড়েছেন। এমন সময় একটি কীট কর্ণের উরুদেশ বিদীর্ণ করে ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠতে লাগল।

কর্ণস্য বেদনাং ধৈর্যাদসহ্যাং বিনিগৃহ্যতাম্।

অকম্পয়বাথঃশ্চৈব ধারয়ামাস ভার্গবম্।

কর্ণ ধৈর্যের সঙ্গে এই অসহ্য বেদনা সহ্য করছিল। বাইরে কোনও লক্ষণ ছিল না। গুরুর নিদ্রাভঙ্গের আশঙ্কায় অকম্পিত দেহে তাঁর মস্তক একইভাবে সে ক্রোড়দেশে ধারণ করে রইল। রক্তে সমস্ত উরুদেশ ভেসে গেছে। হঠাৎ পরশুরাম জেগে উঠে বললেন—

অহোঽশুচিতাং প্রাপ্তঃ কিমিবং ক্রিয়তে ত্বয়া।

আমি অশুচি হয়ে গেলাম, তুমি কি করছ? গুরুর প্রশ্নের উত্তরে কর্ণ সমস্ত ঘটনা বিবৃত করল। সেকথা শুনে পরশুরাম খুশী হতে পারলেন না। ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ণকে বললেন—

অতি দুঃখমিদং মূঢ় ন সোঢ়ুং ব্রাহ্মণঃ সহেৎ।

ক্ষত্রিয়স্যৈব তে ধৈর্যং কামযা সত্যমুচ্যতাম্।

মূর্খ, ব্রাহ্মণ এত বড়ো কবচ কখনও লাভ করতে পারে না। তোমার বৈধ ক্ষত্রিয়ের অনুমান। সত্য কথা বল, সত্য পরিচয় দাও তোমার। তখনই কর্ণ বলল—

রাধেয়ং কর্ণ ইতি মাং প্রথয়ন্তি জনা ভুবি।
গুরবঃ সূত ইত্যেব বেদবিদ্যাপ্রদো গুরুঃ।
পিতা গুরুর্মমেত্যেষা বেদবিদ্যাপ্রদে প্রভু।
অতো ভার্গব ইত্যুক্তং ময়া লোভাৎ তবান্তিকে॥

পৃথিবীতে সকলে আমাকে বলে রাধার পুত্র কর্ণ। হে ভার্গব, বড়ো আশা করে আপনার কাছে অস্ত্রবিদ্যার লোভে এসেছি। আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আমি যে নিজেকে ভার্গব গোত্র বলে প্রচার করেছি তার কারণ এই যে বেদবিদ্যাপ্রদ গুরু পিতারই সমতুল্য। সুতরাং ভার্গব পরশুরামের শিষ্য কর্ণ যে ভার্গবগোত্রীয় হবে তাতে আর সন্দেহ কি? কর্ণ আশা করেছিল যে পরশুরাম এই উত্তর শুনে প্রীত হবেন। কিন্তু ফল হল বিপরীত। তখনই অভিশাপ দিলেন পরশুরাম এই বলে—

মূর্খ, আমার কাছে মিথ্যা আচরণ করেছ। সঙ্কটকালে এই বিদ্যা তোমার স্মৃতিপথে উদিত হবে না। তাছাড়াও কৃপা করে এই কথা বলছি যে পৃথিবীতে যুদ্ধে কোনও ক্ষত্রিয় তোমার সমকক্ষ হবে না।

আবার নতুন অভিশাপ! বঞ্চনা ও অভিশাপের বোঝা বহন করে কর্ণ চলে এল হস্তিনাপুরে দুর্যোধনের কাছে।

॥ ৩ ॥

রঙ্গভূমি : প্রত্যাখ্যান ও অপমান

দ্বন্দ্বযুদ্ধে পার্থেন কর্তুমিচ্ছামি ভারত

—আদিপর্ব

এদিকে হস্তিনাপুরে দ্রোণাচার্যের শিক্ষায় কুরুরাজকুমারগণ ও পঞ্চ পাণ্ডব অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হচ্ছে। প্রথম থেকেই দ্রোণাচার্যের অর্জুনের প্রতি বিশেষ স্নেহ ছিল। অর্জুনও গুরুর প্রতি শ্রদ্ধায় এবং অস্ত্রবিদ্যায় আর সকলকে অতিক্রম করে যাচ্ছিল। তাই দ্রোণাচার্য সর্বদা ঘোষণা করতেন যে তাঁর প্রণোদিক শিষ্য অর্জুন নিজ পুত্র অশ্বত্থামা অপেক্ষাও প্রিয়তর। একদিন তিনি সর্বজনসমক্ষে বলেই ফেললেন—অর্জুন, আমি তোমাকে এমন ধনুর্ধর করব যে তোমার সমকক্ষ অন্য কোনও যোদ্ধা পৃথিবীতে থাকবে না। দ্রোণাচার্য তাঁর শিষ্যগণের অস্ত্রবিদ্যার পরিচয় এক প্রকাশ্য রঙ্গভূমিতে দিতে চাইলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এই ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। হস্তিনাপুরের এক সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে রঙ্গভূমি ও প্রেক্ষাগার নির্মিত হল। ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও কুরুবৃদ্ধগণ প্রেক্ষাগারে সমাসীন। রাজ-অন্তঃপুরের নারীগণের জন্যেও বসবার বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে। সেখানে গান্ধারী ও কুন্তী এসেছেন তাঁদের পুত্রগণের রণ-নৈপুণ্য অবলোকন করবার জন্যে। দ্রোণাচার্য শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে রঙ্গালয়ে প্রবেশ করলেন। কুমারগণ অস্ত্র-নৈপুণ্য দেখাচ্ছে এবং প্রেক্ষাগার থেকে ঘন ঘন হর্ষধ্বনি উত্থিত হচ্ছে। অবশেষে দ্রোণাচার্য অর্জুনের হাত ধরে সভার কাছে অর্জুনের পরিচয় দিলেন :

যো মে পুত্রাৎ প্রিয়তরঃ সর্বশস্ত্রবিশারদঃ।
ঐন্দ্রিরিন্দ্রাদ্বরলব্ধঃ স পার্থো ধৃতরাষ্ট্রিতি॥

—আদিপর্ব, ১২৪ অধ্যায়

আমার পুত্র অপেক্ষা প্রিয়তর, ইন্দ্রনন্দন, বিক্রমশালী বীর্যবান্ অর্জুন আপনাদের সামনে উপস্থিত। প্রেক্ষাগৃহ থেকেও সমস্বরে সকলে দ্রোণের উক্তি সমর্থন করে বলতে আরম্ভ করল—ঠিকই কথা। কুরুকুলের রক্ষক, অস্ত্রবিদ্‌গণের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য শৌর্যবান্ অর্জুনই তো উপস্থিত দেখছি। এই কথা শুনে আনন্দাশ্রুতে এবং স্বতঃ উৎসারিত স্তন্যদুগ্ধে মাতা কুন্তীর বক্ষস্থল অভিষিক্ত হয়ে গেল।

কুন্ত্যাঃ প্রস্রবণং মিশ্রমৈক্ষ্যে স্নিগ্ধমুরোঽভবৎ।

—আদিপর্ব, ১২৪ অধ্যায়

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে জিজ্ঞাসা করছেন—বিদুর, নভস্তল বিদীর্ণ করে ক্ষুব্ধ সমুদ্রের গর্জনের মতো রঙ্গভূমিতে কেন এই তুমুল হর্ষধ্বনি! বিদুর বললেন—কাঞ্চনময় কবচ ধারণ করে গুরুর আদেশে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ। তাঁরই সম্বর্ধনায় জনতার এই স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাস। ধৃতরাষ্ট্র বললেন—বিদুর, আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হলাম। কুরুবংশের রক্ষক একজন আবির্ভূত হয়েছেন। অরণি-সদৃশ কুন্তী তিনটি পাণ্ডব-বহ্নি প্রসব করেছেন।

অর্জুন অস্ত্রনৈপুণ্য দেখিয়ে সর্বজনের বিস্ময় উৎপাদন

করছেন। হঠাৎ রঙ্গভূমির দ্বারদেশে এক বিপুল কোলাহল উপস্থিত হল। সকলের দৃষ্টি তখন দ্বারদেশে নিবদ্ধ।

দ্বারং চাভিমুখাঃ সর্বে বভূবুঃ প্রেক্ষকাস্তদা।

—আদিপর্ব, ১২৪ অধ্যায়

সৌবাস্তিকগণ প্রথমে বোধ হয় একজন আগন্তুককে বাধা দিচ্ছিল কিন্তু সেই আগন্তুকের অলোকসামান্য ব্যক্তিত্বে অভিভূত হয়ে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে তাঁকে প্রবেশের পথ ছেড়ে দিল। আজ কৃতবিদ্য কৃতাস্ত্র কর্ণ প্রবেশ করছেন দ্রোণাচার্যের রঙ্গালয়ে যে দ্রোণ একদিন সূতপুত্র বলে উপহাস করে তাঁর আত্মমর্যাদায় তীব্র আঘাত হেনেছিলেন। কবিকবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই প্রবেশের দৃশ্য অত্যন্ত দরদের সঙ্গে অনুপম ভাষায় বর্ণনা করেছেন। সহজাত কবচ ধারণ করে ও কুণ্ডলের দ্যুতিতে উদ্ভাসিত বদনে ধনু ও খড়্গধারী কর্ণ চলমান পর্বতের মতো সুবিস্তীর্ণ রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলেন। দেখে মনে হচ্ছিল যে কর্ণ দীপ্তিতে সূর্যতুল্য, কান্তিতে চন্দ্রের সমান এবং দ্যুতিতে অগ্নিসদৃশ। মনে হচ্ছিল সে যেন একটি সদ্যোদ্ভূত স্বর্ণময় তালবৃক্ষ। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলতে কুণ্ঠা প্রকাশ করছেন না যে সূর্যনন্দন শ্রীমান্ কর্ণ অসংখ্য গুণের অধিকারী।

কবির অনবদ্য বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করছি :

তস্যোপকাশে পুরুষৈর্বিস্ময়োৎফুল্ললোচনৈঃ।
বিবেশ রঙ্গং বিস্তীর্ণং কর্ণঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
সহজং কবচং বিভ্রৎ কুণ্ডলদ্যোতিতাননঃ।
সমুপেন্দ্রনিষ্ক্রান্তঃ পাদচারীব পর্বতঃ।
সিংহবিক্রান্তগামী চ তুল্যবীর্যপরাক্রমঃ।
দীপ্তিকান্তিদ্যুতিগুণৈঃ সূর্যেন্দুজ্বলনোপমঃ।
প্রাংশুঃ কনকতালাভঃ সিংহসংহননো যুবা।
অসংখ্যেয়গুণঃ শ্রীমান্ ভাস্করস্তাম্রসন্নিভঃ।

—আদিপর্ব, ১২৬ অধ্যায়

দৃপ্ত সিংহের মতো রঙ্গমণ্ডলে প্রবেশ করেছেন কর্ণ। চারদিক ভালো করে নিরীক্ষণ করছেন। অবশেষে সেখানে তাঁর ভূতপূর্ব গুরুদ্বয় দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্যকে উপস্থিত দেখে নিজের মনে বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব না থাকা সত্ত্বেও প্রথা অনুসারে প্রণাম করলেন।

প্রণামং দ্রোণকৃপয়োর্নাত্যাদৃতমিবাকরোৎ।

সভাস্থ সমস্ত দর্শকের নিষ্পলক নিস্পলক দৃষ্টি দীপ্তিকান্তিদ্যুতি-সমন্বিত এই বিরাট পুরুষকে সশ্রদ্ধ জানাল। তাদের বিস্ময়-বিহ্বল হৃদয় ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করল : "কে এ?"

প্রবেশ করেই বাগ্মিপ্রবর কর্ণ মেঘ-গম্ভীর স্বরে অর্জুনকে বললেন—পার্থ, তুমি আজ যে কৃতিত্ব দেখিয়েছ তার মধ্যে কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। এখনই আমি সর্বজনসমক্ষে সে কৃতিত্ব অপেক্ষা অধিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পারি। নিজের কীর্তিতে নিজে বিস্মিত হয়ো না, অর্জুন!—বাস্তবিক বিস্ময়কর।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলছেন—আজ অদৃষ্টের কি পরিহাস—ভাই ভাইকে চিনতে পারছে না। এক মায়ের সন্তান হলেও সবিতাপুত্র কর্ণের কাছে ইন্দ্রাত্মজ অর্জুনের ভাই-পরিচয় অজ্ঞাতই রয়ে গেল। কর্ণের কথা শেষ হতে না হতেই সমবেত জনতা যুগপৎ যেন যন্ত্রচালিত হয়ে সহসা রঙ্গালয়ের চতুর্দিকে উঠে দাঁড়াল। এতদিন পর দ্রোণাচার্যের পক্ষপাতিত্ব এবং অর্জুনের স্পর্ধার সম্যক্ উত্তর দিতে পারে এমন একজন বীর উপস্থিত দেখে দুর্যোধনের আহ্লাদের সীমা রইল না। তৎক্ষণাৎ অর্জুন অপমানে এবং ক্রোধে অভিভূত হয়ে পড়লেন। দ্রোণাচার্য বললেন—আচ্ছা তাই হোক্, দেখাও তোমার অস্ত্র-নৈপুণ্য। গুরু কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে অবিলম্বে রণপ্রিয় কর্ণ অর্জুনের অনুরূপ অস্ত্র-কৌশল প্রদর্শন করলেন।

যৎ কৃতং তত্র পার্থেন তচ্চকার মহাবলঃ।

এই দৃশ্য দেখে দুর্যোধন আনন্দে বিহ্বল হয়ে ভাইদের সঙ্গে নিয়ে কর্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন এবং স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন—হে মহাবাহু, আমার মান-বর্ধনকারী কর্ণ, সৌভাগ্যক্রমে আজ আবার তোমাকে আমি পেলাম। আমি তোমার এবং এই সমস্ত কুরু-রাজ্যও তোমার। তুমি তোমার ইচ্ছানুসারে আমাকে এবং এই রাজ্যকে পরিচালিত কর।

অহঞ্চ কুরুরাজ্যঞ্চ যথেষ্টমুপভুঙ্ক্ষ্বতাম্।

কর্ণ উত্তর দিলেন—কুরুরাজ, পার্থিব সম্পদ বা অন্য কোনও বস্তুতে আমার লোভ নেই। তুমি যে বন্ধুত্বের কথা বলেছ তাই আমার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। এখন আমার দ্বিতীয় বাসনা পূরণের ব্যবস্থা কর। অর্জুনের

[illegible] অবতীর্ণ হয়ে প্রমাণ করতে চাই যে [illegible]

যুযুৎসুর্মামকা: পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়।

দুর্যোধন বললেন—কেবল নিজের বন্ধুত্ব কেন, কর্ণ, আমার হয়ে আমার সমস্তই ভোগ করবার তুমি অধিকারী। বন্ধুজনের প্রিয় কাজ কর, কর্ণ, আর আমাদের সমস্ত শত্রুর মস্তকে তুমি পদাঘাত কর। এই কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে অর্জুন কর্ণের প্রতি অত্যন্ত কটূক্তি করলেন। কর্ণ কিন্তু তখনও শান্ত ও অবিচলিত। অর্জুন দুর্যোধনের সঙ্গে বললেন—কর্ণ, তোমাকে কেউ এখানে আহ্বান করে নি বা কেউ তোমার কথাও এখানে শুনতে চায় না। তোমার অনাহূত প্রবেশ ও অযাচিত প্রগল্‌ভতা দুইই সমান নিন্দনীয়। এই ছোট মানুষের যে মনোবৃত্তি হয় আজ আমার দ্বারা নিহত হয়ে তোমার সেই দুর্গতি হবে। কর্ণ তখনই সমুচিত প্রত্যুত্তর দিলেন—অর্জুন, এই রঙ্গভূমি তোমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, এতে সর্বসাধারণের অধিকার। যে বীর্যবান্ সেই এখানে প্রবেশ করতে পারে আর ধর্মও সবার সকলেরই অনুসরণীয়। তুমি যেরূপ নিন্দা করে আমাস বা সান্ত্বনা পাও সে নিন্দার প্রয়োজন কি? কেবী বাগ্‌বিস্তারেরই বা প্রয়োজন কি? তোমার বক্তব্য বীরের মুখে শুনিত হোক্। আজ তোমারই গুরু দ্রোণাচার্যের সামনে পরাঘাতে তোমার শিরশ্ছেদ করব।

তস্যোত্তরং সঞ্জনয়ন্হর্ষং কুরুবৃদ্ধস্য তস্য সিংহনাদবান্।
বীরঃ শ্রোতৃণাং রাজ্ঞশ্চ বলং বর্ধয়ংস্তদর্জুনস্যোত্তরতে।
কিং ক্ষেপৈরুক্তবানস্যৈঃ শস্ত্রৈঃ কথয় তাবত।
ততো: সমক্ষং যাবৎ তে হরাম্যদ্য শিরঃ শরৈঃ।

—আদিপর্ব

অবশেষে স্থির হল যে প্রকাশ্য রঙ্গভূমিতে কর্ণার্জুনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হোক। দ্রোণের অনুমতি নিয়ে এবং ভাইদের আলিঙ্গন করে অর্জুন রঙ্গমণ্ডলে অবতীর্ণ হলেন। কর্ণও দুর্যোধন কর্তৃক আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে ধনুর্বাণ হস্তে সেখানে উপস্থিত হলেন। মহাকবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই অবসরে রঙ্গভূমির চিত্রকে যেন পরিস্ফুট করবার জন্য প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা করছেন। হঠাৎ ইন্দ্রধনু-শোভিত মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। বিদ্যুৎ-দীপ্ত সে মেঘের গুরু গুরু গর্জনে দিগ্‌বিদিগন্ত মুখরিত হয়ে উঠল। তারপর মনে হল যে বলাকা-পংক্তির অবাধ বিচরণে কালো মেঘ যেন শুভ্র হাসি ছড়াচ্ছে।

ততঃ সবিদ্যুৎস্তনিতৈঃ সেন্দ্রায়ুধপুরোগমৈঃ।
আবৃতং গগনং মেঘৈর্বলাকাপংক্তিশোভিভিঃ।

—আদিপর্ব, ১২৬ অধ্যায়

আকাশপথে ইন্দ্র এসেছেন পুত্র অর্জুনকে মেঘের ছায়া দিতে। তাই দেখে সূর্যও এগিয়ে এলেন পুত্র কর্ণের মাথার ওপরকার মেঘখণ্ডগুলোকে সরিয়ে দিতে। চমৎকার দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে। মেঘের ছায়ায় অর্জুন এবং সূর্যকিরণে উদ্ভাসিতবদনমণ্ডল কর্ণ। রঙ্গভূমি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ কর্ণের পাশে এসে দাঁড়াল। দ্রোণ, কৃপ ও ভীষ্ম অর্জুনের কাছে এলেন। কেবলমাত্র তাই নয়, সমস্ত রঙ্গভূমির পুরুষগণ দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেল এবং দ্বৈতভাব রঙ্গালয়ে উপস্থিত নারীগণের মধ্যেও সংক্রামিত হল। কুন্তী ছিলেন সেখানে উপস্থিত। নবজাত কর্ণকে অশ্বনদীর জলে ভাসিয়ে দেবার পর কুন্তী এই সর্বপ্রথম অবলোকন করছেন কর্ণকে রঙ্গালয়ের নারীমণ্ডলীর মধ্য থেকে। পুত্রকে ভাসিয়ে দেবার সময় কুন্তী বিলাপ করে বলেছিলেন—

যেনাসি ত্বং বিদেশেঽপি
কবচেনাভিসংবৃতঃ

অর্থাৎ বিদেশেও যদি কখনও আমি তোমাকে দেখি তাহলে তখনই চিনতে পারব তোমার এই সহজাত কবচের পরিচয়ে। আজ কুন্তী সেই সংজাত কবচধারী পুত্রকে রঙ্গভূমিতে দেখেই বুঝতে পেরেছেন যে এই যুবক তাঁরই প্রথম গর্ভজাত সন্তান কর্ণ। মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন কুন্তী।

কুন্তীভোজসুতা মোহং বিজ্ঞাতার্থা জগাম হ।

নারীগণের মধ্যে কেউ বুঝতে পারছে না কেন কুন্তীর এই মূর্ছা। কিন্তু সর্ববিদ্‌ বিদুর দাসীদের সাহায্যে সুশীতল চন্দনবারি প্রক্ষেপে কুন্তীর সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনলেন। আজ নিজেরই গর্ভজাত দুই বীর সন্তান রঙ্গমণ্ডলে দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য অবতীর্ণ। এই দৃশ্য মাতা কুন্তীর পক্ষে চরমবিস্ময়কর। কি করবেন কিছুই ভেবে পাচ্ছেন না। কর্ণ এবং অর্জুন দুজনেই উদ্যতাস্ত্র, সরসন্ধান করতে থাকেন,

ঠিক এই সময় কৃপাচার্য এগিয়ে এসে দুজনের মধ্যে দাঁড়ালেন। তিনি কর্ণকে বললেন—কুরুবংশীয় পাণ্ডুনন্দন পৃথার তনয় অর্জুন তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দ্বন্দ্বযুদ্ধ করবে। কিন্তু তার পূর্বে মহাবাহু কর্ণ তোমার মাতৃকুল পিতৃকুল এবং যে রাজবংশের তুমি কুলবর্ধন তার সম্যক্ পরিচয় দাও। তা জানবার পর অর্জুন তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে কি না তার বিচার হবে। নৃপতনয় অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির সঙ্গে কখনও যুদ্ধ করে না।

অহং পৃথায়াস্তনয়ঃ কর্ণ বিদ্ধি পাণ্ডুনন্দনঃ।
কৌরবো ভবতা সার্ধং দ্বন্দ্বযুদ্ধং করিষ্যতি॥
তমপৃচ্ছৎ মহাবাহো মাতরং পিতরং কুলম্।
যস্যৈষ নরেন্দ্রাণাং যোনিঃ ত্বং কুলবর্ধনঃ॥
ততো বিদিত্বা পার্থস্য প্রতিযোৎস্যতি বা ন বা।
কৃপাকুলমাচার্যস্য যুধ্যন্তে নৃপাস্তথাঃ॥

—আদিপর্ব, ১২৯ অধ্যায়

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বর্ণনা করেছেন যে কৃপাচার্যের এই কথা শুনে কর্ণের মুখখানি লজ্জায় অবনত হয়ে গেল। সূর্যের দিকে মুখ করে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম হঠাৎ বর্ষার অকরুণ ধারায় যেরূপ নিষ্প্রভ নিস্তেজ ও বিবর্ণ হয়ে পড়ে আজ যেন কর্ণের সেই অবস্থা। তবু সেই ম্লান সুন্দর মুখের মধ্যে মহাকবি একটি দীপ্তি লক্ষ্য করছেন।

এবমুক্তস্তু কর্ণস্তু ব্রীড়াবনতমাননম্।
বভৌ বর্ষাম্বুভিঃ ক্লিন্নং পদ্মমাগলিতং যথা॥

বর্তমান ভারতের মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপূর্ব কাহিনী কর্ণ-কুন্তী-সংবাদে এই দৃশ্য অতুলনীয় ভাষায় বর্ণনা করেছেন। জননী কুন্তীর ব্যথা রবীন্দ্রনাথের লেখনীমুখে ব্যক্ত হয়েছে—

যবে কৃপ আসি
তোমার পিতার নাম শুধালেন হাসি।
কহিলেন, "রাজকুলে জন্ম নহে যার
অর্জুনের সাথে যুদ্ধে নাহি অধিকার,"—
আরক্ত আনত মুখে না রহিল বাণী,
দাঁড়ায়ে রহিলে,—সেই লজ্জা-অভাখানি
রহিল তাহার বক্ষ অহ্নিশ ভেদে,
কে সে অভাগিনী! অর্জুন-জননী সে যে!

দুর্যোধন তখনই এগিয়ে এলেন কর্ণের কাছে। কৃপাচার্যকে তিনি বললেন—আচার্য, কর্ণ রাজা নয় বলেই অর্জুন যদি তার সঙ্গে যুদ্ধে সম্মতি না চায় তাহলে আমি এখনই কর্ণকে অঙ্গরাজ্যের রাজা রূপে অভিষেক করছি। দুর্যোধনের আদেশে তখনই প্রকাণ্ড রঙ্গভূমিতে অভিষেকের আয়োজন হল এবং কর্ণ অঙ্গাধিপতিরূপে সম্বর্ধিত হলেন। কৃতজ্ঞতায় অভিভূত কর্ণ দুর্যোধনকে বললেন—এই রাজ্যদানের প্রতিদানে আমি কি করতে পারি? দুর্যোধন তখনই উত্তর দিলেন—আর কোনও প্রতিদান চাই না কর্ণ। কেবলমাত্র কামনা করি তোমার প্রগাঢ় ও অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব।

অভ্যাঞ্চং সখ্যমিচ্ছামীত্যাহ তং স সুযোধনঃ।

দুই বন্ধু তখনই পরস্পরের গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলেন।

॥ ৪ ॥

রঙ্গভূমি: পিতৃ-সম্বর্ধনা

কর্ণোঽভিষেকাঽধিরাঃ শিরসা সমবন্দত

—আদিপর্ব

অঙ্গরাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত কর্ণ রঙ্গভূমিতে সমবেত জনতা কর্তৃক বিপুল হর্ষধ্বনি দ্বারা সম্বর্ধিত হচ্ছেন। ঠিক এই সময়ে কর্ণের পালক-পিতা বৃদ্ধ সূত অধিরথ কর্ণের এই অভিষেকের কথা শুনে আনন্দ-বিহ্বল চিত্তে ঘর্ম-সিক্ত কলেবরে যষ্টি-হস্তে কম্পিত পদে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলেন। আনন্দের আতিশয্যে তাঁর দেহ থেকে উত্তরীয় খসে পড়েছে। কর্ণ তখনও অভিষেকের আসনে সমাসীন। কিন্তু পিতাকে দেখামাত্র ধনু ত্যাগ করে আসন থেকে উঠে এসে পিতার গৌরবে গৌরবান্বিত কর্ণ তাঁর অভিষেক-সিক্ত শির অধিরথের চরণে লুটিয়ে দিলেন।

রথ সারথি সূত অধিরথের পক্ষে এই দৃশ্য অভাবনীয়। অঙ্গরাজ্যের রাজা তাঁর পদপ্রান্তে অবনত। ভেবে ঠিক করতে পারছেন না এই ক্ষণে কি তাঁর কর্তব্য। সহসা সসম্ভ্রমে অধিরথ তাঁর উত্তরীয় দ্বারা পদদ্বয় আবৃত করে ফেললেন এবং অধিরথের জীবনের সেই সর্বোন্নত মুহূর্তে তাঁর হৃদয়ের সমস্ত রুদ্ধ আবেগ কেবলমাত্র একটি কথার মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করল। আবেগ-কম্পিত স্বরে তিনি শুধু

উচ্চারণ করতে পারলেন "পুত্র" এবং পরিপূর্ণার্থক এই কথাটির মধ্যে দিয়ে তাঁর হৃদয় কথা নিঃশেষ হয়ে গেল—

পুত্রেতি পরিপূর্ণার্থমস্রবীদ্রাজসারথিঃ।

স্নেহবশের অধিরথ কর্ণকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করে তাঁর নয়নের আনন্দাশ্রু দ্বারা কর্ণের অভিষেক-আর্দ্র মস্তক আবার সিক্ত করে দিলেন। রাজা দুর্যোধনের সদ্য-সংগৃহীত নানা তীর্থবারিতে কর্ণের যে অভিষেক আরম্ভ হয়েছিল তা যেন পিতা অধিরথের আনন্দাশ্রু দ্বারা পরিপূর্ণতা লাভ করল। এই ঘটনার দৃশ্য মহাকবি কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে অনুসরণ করে বর্ণনা করেছেন কর্ণদুর্যোধন-সংবাদে—

হেন কালে করি পথ
রঙ্গস্থলে পশিলেন সূত অধিরথ
আনন্দ-বিহ্বল। তখনি সে রাজসাজে—
চারিদিকে দুন্দুভিরা জনতার মাঝে
অভিষেকসিক্ত শির লুটায়ে চরণে
সূতকণ্ঠে প্রণমিলে পিতৃ-সম্ভাষণে!

এবার অপরপক্ষের পুরুষগণের মনে আর কোনও সন্দেহ রইল না যে কর্ণ সূতপুত্র। ধিক্কারের পক্ষ উত্থিত হল পাণ্ডবদলের পক্ষ থেকে। ভীমসেন তখনই বলে উঠলেন—তোমার পরিচয় পেয়েছি। সূতপুত্র অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে বধের অযোগ্য। অঙ্গরাজ্যের পরিবর্তে তোমার কুলের অনুরূপ অঙ্কুশ চাবুক হাতে গ্রহণ কর। কুকুর যেমন যজ্ঞীয় হবি আস্বাদনের উপযুক্ত নয় তেমনি তুমিও অঙ্গরাজ্য ভোগের অধিকারী নও। কর্ণের আর কিছু বলবার ছিল না। ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পড়ছে তাঁর। ক্রোধে, ঘৃণা ও লজ্জায় তাঁর ওষ্ঠাধর কাঁপছে। আজ ভেবে পাচ্ছেন না তিনি কি তাঁর বলবার আছে বা কোথায় তাঁর আশ্রয়। কেবল একটিবার দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে গগনস্থ দিবাকরের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন—

গগনস্থং বিনিশ্বস্য দিবাকরমুদৈক্ষত।

মহাকবি যেন বলতে চাইছেন যে প্রতিভা ও পৌরুষও ঘটনার আবর্তে অনেক সময় ব্যর্থ হয়ে যায়। আজ এই চরম ব্যর্থতার দিনে কর্ণ বোধহয় আশ্বাস বা আশ্রয় খুঁজছিলেন উর্ধ্বলোকের দিকে তাকিয়ে সূর্যের কাছে। তারপর কিছুক্ষণ প্রকাশ্য রঙ্গভূমিতে দুর্যোধন ও তাঁদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হল। দুর্যোধন অবশ্য প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করলেন যে সমুদ্রের সঙ্গমস্থল সর্বলক্ষণযুক্ত কর্ণ কখনও সূতপুত্র হতে পারে না, কেননা আদিত্যসদৃশ এই পুরুষব্যাঘ্রকে কখনও কোনও যজ্ঞ দুষ্ট প্রসব করতে পারে না। কিন্তু আজ দুর্যোধনের এই যুক্তিতে কর্ণপাত করবার মতো কেউ রঙ্গালয়ে উপস্থিত ছিল না। তখন রঙ্গালয় ভেঙে যাচ্ছে। দর্শকগণ কেউ কেউ অর্জুনের কথা আবার কেউ কেউ বা কর্ণের কথা বলতে বলতে রঙ্গভূমি ত্যাগ করে চলে গেল। মহাকবি আমাদের বলছেন যে সমস্ত দর্শকমণ্ডলের মধ্যে একজনের মনে যে গভীর রেখাপাত হয়েছিল তা কখনও মোছবার নয়। কুন্তী সমস্ত দৃশ্য লক্ষ্য করলেন নারীদের জন্যে নির্দিষ্ট আসন থেকে। বলবার বা মনের ইচ্ছা প্রকাশ করবার কোনও উপায় ছিল না। কুন্তীর বক্ষ যাঁরই হয়েছিল নিজেরই গর্ভজাত দুই সন্তানের পরস্পরের প্রতি নিক্ষিপ্ত বিদ্রূপ-বাণে। তাহলেও আজ কুন্তী পরিতৃপ্তা। তাঁরই জলে-ভাসিয়ে-দেওয়া ছেলে অঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর হলেন—এ দৃশ্য কুন্তী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলেন। দুর্যোধন বন্ধুপ্রীতিতে আজ গৌরবান্বিত। অর্জুনের ভয়ে তাঁর ঘুম নিদ্রা হত না। দুর্যোধন আশ্বাস পেলেন যে এমন একজন বীর বন্ধুরূপে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন যিনি অর্জুন অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নন। পাণ্ডবগণেরও, বিশেষতঃ যুধিষ্ঠিরের সেদিন এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে কর্ণের তুল্য ধনুর্ধর পৃথিবীতে নেই—ন কর্ণতুল্যোঽস্তি ধনুর্ধরঃ ক্ষিতৌ।

॥ ৫ ॥

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর : পুনরায় অপমান ও ব্যর্থতা

দৃষ্ট্বা তু তং দ্রৌপদী বাক্যমুচ্চৈর্জগাদ নাহং
বরয়ামি সূতম্
—আদিপর্ব

হাস্তিনপুরের রঙ্গভূমির ঘটনার পর আবার কর্ণকে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাঞ্চালরাজ্যে দ্রৌপদীর স্বয়ংবরসভায়। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের দুহিতা দ্রৌপদী প্রজ্বলিত যজ্ঞবেদী হতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দ্রৌপদীর রূপের তুলনা ছিল না। দ্রুপদ এক স্বয়ংবর সভার আয়োজন করে আমন্ত্রিত বীরপুরুষদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধাকে এই কন্যা সম্প্রদান

করবার সংকল্প করেছিলেন। দ্রুপদের আমন্ত্রণে ভারতবর্ষের বিভিন্ন দিক হতে এবং বিভিন্ন অঞ্চল হতে রাজন্যবর্গ, বোদ্ধৃবৃন্দ, এবং এমনকি অনেক মুনিঋষিগণও সেই সভায় সমবেত হয়েছিলেন। এসেছিলেন সেখানে দ্বারকা থেকে কৃষ্ণ বলরাম ও বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ। মগধ থেকে এসেছিলেন মগধাধিপতি প্রবলপরাক্রান্ত জরাসন্ধ। মধ্যভারত থেকে এসেছিলেন অভিমানী চৈদ্যরাজ শিশুপাল এবং কুরুরাজ থেকে দুর্যোধন তার ভাইদের নিয়ে। দুর্যোধন খুবই আশা করে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর চিরসুহৃদ্ ধনুর্ধরগণের মধ্যে অগ্রগণ্য মহাবীর কর্ণকে। পঞ্চপাণ্ডব তখন বারণাবতের জতুগৃহদাহ থেকে কোনও মতে রক্ষা পেয়ে গঙ্গা পার হয়ে গঙ্গার উত্তরে পাঞ্চাল দেশে ছদ্মবেশে বিচরণ করছেন। তাঁরা লোকমুখে শুনতে পেলেন দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের কথা। তাঁদের ইচ্ছা হল যে তাঁরাও ব্রাহ্মণবেশে এই স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হবেন।

বিরাট আয়োজন হয়েছে দ্রুপদের রাজধানীতে। দিন দিন সভার আয়তন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নানা দিক্ থেকে আগত জনগণের উপস্থিতিতে সকলের মনেই প্রবল ইচ্ছা যে আর কিছু না হোক অন্ততঃ দ্রৌপদীর দর্শন লাভ করা যাবে। স্বয়ংবর উৎসব অবিশ্রান্ত গতিতে চলছে। পনের দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ষোড়শ দিবসে সন্তস্নাতা সুবসনা সর্বাভরণভূষিতা দ্রৌপদী বরমাল্য হস্তে রঙ্গপ্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হলেন অপেক্ষমান কৌতূহলী জনতার কাছে। তুমুল বাদ্যধ্বনি হচ্ছে চতুর্দিকে। হঠাৎ সেই বাদ্যধ্বনি থামিয়ে দ্রৌপদীর ভ্রাতা বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে মেঘদুন্দুভি-স্বরে সভামধ্যে ঘোষণা করলেন—যে বীর আজ এই প্রকাণ্ড সভায় নির্দিষ্ট ধনুর্বাণের সাহায্যে আমাদের পরিকল্পিত লক্ষ্য ভেদ করতে সমর্থ হবে তারই হবে আমার এই ভগিনী। আমার এই কথা অন্যথা হবে না।

ধৃষ্টদ্যুম্নের ঘোষণা শুনে একে একে বীরপুরুষগণ লক্ষ্য-ভেদের জন্য এগিয়ে আসছেন, দ্রুপদ কর্তৃক রক্ষিত ধনুতে জ্যা-রোপণ বা শরসন্ধানের চেষ্টা করছেন, কিন্তু কেউ কৃতকার্য হতে পারছেন না। ভগ্নমনোরথ হয়ে লজ্জায় অধোমুখে বীরপুরুষগণ ফিরে যাচ্ছেন তাঁদের নিজ নিজ স্থানে। অনেকেরই সাধ্য হল না সেই ধনুতে জ্যা রোপণ করবার—শরসন্ধান তো দূরের কথা। রঙ্গমণ্ডলে প্রত্যেক যোদ্ধার মুখে যেন একটা আতি ফুটে উঠেছে। এমন সময় সমস্ত নৃপতিগণের এই দুর্দশা লক্ষ্য করে কর্ণ অগ্রসর হলেন লক্ষ্য-ভেদের জন্য—কর্ণো ধনুর্ধরাণাং প্রবরো জগাম। সেই নির্দিষ্ট ধনু তিনি অবলীলাক্রমে তুলে নিলেন। তাতে জ্যা-রোপণ করলেন এবং শরসংযোগও করলেন। পাণ্ডবগণ তাঁদের আসন থেকে এই দৃশ্য লক্ষ্য করছেন এবং গভীর দুঃখের সঙ্গে ভাবছেন আজ সূতপুত্র কর্ণ লক্ষ্য ভেদ করে দ্রৌপদীকে নিয়ে গেল। অর্জুন কর্ণের পরাক্রমকে অস্বীকার করবার উপায় ছিল না। কর্ণের আকৃতি গতি এবং বীর্যবত্তা লক্ষ্য করে সমস্ত রঙ্গপ্রাঙ্গণের সমস্ত ধনুর্ধরগণের মনেই এই ধারণা জন্মেছিল যে মহাবীর কর্ণ স্বীয় তেজে অগ্নি চন্দ্র এবং সূর্যকেও অতিক্রম করেছেন। লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে লাভ করা এঁর পক্ষে অত্যন্ত সহজ ব্যাপার।

দ্রৌপদী তাঁর আসন থেকে এই সমস্ত দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করছিলেন। হঠাৎ তিনি উচ্চস্বরে সভামধ্যে ঘোষণা করলেন, আমি সূতপুত্রকে বরমালা অর্পণ করব না—নাহং বরয়ামি সূতম্। কর্ণ তখন হতবাক্—অপমানে, লজ্জায়, এবং ঘৃণায় তাঁর মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল। বোধহয় ভাবছিলেন, অদৃষ্টের কি রূঢ় পরিহাস। একবার মাত্র গগনস্থ দিবাকরের দিকে ব্যাকুল-ভাবে দৃষ্টিপাত করে কর্ণ শরসন্ধানে উদ্যত সেই শরসন্ধান ধনু পরিত্যাগ করলেন—সামর্ষহাসঃ প্রসমীক্ষ্য সূর্যং তত্যাজ কর্ণঃ স্ফুরিতং ধনুস্তৎ। আজ ঊর্ধ্বলোকে আকাশে আশ্রয় খোঁজা ছাড়া তাঁর অন্য কোনও অবলম্বন ছিল কি?

॥ ৬ ॥

কলিঙ্গের স্বয়ংবর সভা : কর্ণের পরাক্রম

বাপোদ্যুক্তে রণং হিত্বা রাজানঃ ভগ্নমানসাঃ

—শান্তিপর্ব

মহাভারতের শান্তিপর্বে নারদের মুখে কলিঙ্গের স্বয়ংবর সভায় কর্ণের অদ্ভুতপূর্ব পরাক্রমের বর্ণনা আমরা দেখতে পাই। কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদ কন্যা স্বয়ংবরা হবেন এই ঘোষণা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচারিত হয়েছে। নানা দেশ থেকে মহারথগণ কলিঙ্গের রাজধানী রাজপুরনগরে

সমবেত হয়েছেন। এই কথা শুনে দুর্যোধনও কর্ণকে সঙ্গে নিয়ে কাঞ্চনময় রথে আরোহণ করে রাজসূয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে বিশুপাল জরাসন্ধ ও ভারতবর্ষের উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব দিক থেকে অনেক আর্য এমন কি ফ্লেচ্ছ রাজারাও সেই সভায় উপস্থিত। হস্তরাজ্যে রাজদুহিতা বরবর্ণিনী দ্রৌপদী স্বয়ংবর সভায় সমবেত বিভিন্ন রাজন্যের নাম, গোত্র ও কীর্তি একে একে বর্ণনা করে কন্যাকুমারীকে প্রত্যেক পাণি-প্রার্থী বীরের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। সেখা সেল সেই বরবর্ণিনী কলিঙ্গরাজতনয়া কর্ণসখা দুর্যোধনের নাম, গোত্র ও কীর্তির কথা শুনেও তাঁকে অতিক্রম করে চলে গেলেন। দুর্যোধন এই অপমান সহ্য করতে পারলেন না। তিনি বলে ফেললেন—রাজাদের অবজ্ঞা করে এই ভাবে চলে যাওয়া কন্যার পক্ষে অসঙ্গতিপূর্ণ। তখনই বল প্রকাশ করে দুর্যোধন সেই কন্যাকে রথে তুলে নিলেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী রাজগণকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করলেন। এই বলপ্রকাশের প্রকৃত কারণ ছিল যে কর্ণ দুর্যোধনের ঠিক পিছনেই—কর্ণং শস্ত্রভৃতাং শ্রেষ্ঠং পৃষ্ঠতঃ পুরুষর্ষভঃ। তখনই প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হল। সেই যুদ্ধে কর্ণ পরাঘাতে প্রত্যেক রাজার ধনু ও শরসমূহ ছেদনাতিত করলেন। অবশেষে অতি সহজেই শত্রুবিমর্দন কর্ণ সমস্ত নৃপতিগণকে পরাজিত করতে সমর্থ হলেন আর হতদর্প রাজন্যরাও সারথিহীন হয়ে নিজেরাই রথ চালিয়ে রণে ভঙ্গ দিলেন। সবারই মুখে কেবলমাত্র একটি কথা "পলায়ন কর।" সেদিন কর্ণের অনায়াস পরাক্রম সকলের বিস্ময় উদ্রেক করেছিল।

লাঘবাদাকুলীকৃতা কর্ণঃ প্রহরতাং বরঃ।
হতসূতাংশ্চ তুরিষ্ঠানবজিগো নরাধিপান্॥
তে স্বয়ং বাহনস্থোঽন্যান্ বাহি বাহীতি বাদিনঃ।
রাপেয়স্য রণং হিত্বা রাজানো ভয়নাদসাঃ॥

॥ ৭ ॥

কর্ণজরাসন্ধ যুদ্ধ

বিভেদ সন্ধিং দেহস্য জরয়া শ্রেষ্ঠিতস্য হ

—শান্তিপর্ব

ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ পূর্বভারতে, বঙ্গ তখন সর্বাপেক্ষা বিশাল রাজ্য। বঙ্গদেশের অধিপতি জরাসন্ধ পূর্ব-ভারতে একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করেছিলেন। জরাসন্ধের সাম্রাজ্য পশ্চিমে মথুরা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল এবং শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা নির্মাণের পূর্বে যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন যে জরাসন্ধের ভয়ে তিনি এবং যদুবংশীয়গণ মথুরা ত্যাগ করে পশ্চিম-ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানে দ্বারবতীপুরী (দ্বারকা) নির্মাণ করে বাস করছিলেন—

পলায়নায় ভগবান্ অস্মৎ সমুদ্রান্তিবাসিনঃ।
মথুরাং সংপরিত্যজ্য গতা দ্বারবতীং পুরীম্॥

শুধু তাই নয়, জরাসন্ধ সমস্ত মহাভারত যখন করে সেখানকার নৃপতিগণকে পরানত করেছিলেন—স্থিতো মূর্ধি নরেন্দ্রাণাবোজস্যাক্রম্য সর্বতঃ।

জরাসন্ধ পাঞ্চালরাজ্যে দ্রৌপদীর স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন এবং কলিঙ্গের স্বয়ংবরসভাতেও কর্ণের বীর্য ও পরাক্রম লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি কখনও মনে করতে পারতেন না যে তাঁর সমকক্ষ আর কোনও যোদ্ধা ভারতবর্ষে থাকতে পারে। সুতরাং কর্ণের বলের পরিচয় পেয়ে জরাসন্ধ কর্ণকে দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান করলেন। মহাভারতের শান্তিপর্বে দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলছেন যে এই দুই বীর পুরুষের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধে উভয়ের ধনু, বাণ, বর্ম ও রথ ভগ্ন হয়ে গেল। তারপর দুজনে বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। কিন্তু এই বাহুযুদ্ধে কর্ণের কাছে জরাসন্ধের ঘটল শোচনীয় পরাজয়। কর্ণ জরাসন্ধের দেহের বিভিন্ন সন্ধিস্থানগুলিকে বিভক্ত করবার চেষ্টা করলেন। তখন জরাসন্ধ বৈরভাব এবং অহংকার পরিত্যাগ করে কর্ণের কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন—আমি তোমার যুদ্ধে প্রীত হয়েছি—প্রীতোঽস্মীত্যব্রবীৎ কর্ণং বৈরমুৎসৃজ্য দূরতঃ। আর সেই প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ অঙ্গদেশে কর্ণকে মালিনী-নগর জরাসন্ধ দান করলেন। অঙ্গে এখন থেকে কর্ণের দুটি রাজধানী হল—চম্পা ও মালিনী।*

* অধ্যাপকপ্রবর শ্রীহিরণ্ময় চক্রবর্তী মহাশয়ের এই অপূর্ব কর্ণ-চরিত্র আলোচনা যথাযোগ্যভাবে এই সংখ্যায় সম্পূর্ণ প্রকাশ করা সম্ভব হইল না বলিয়া আমরা দুঃখিত। তবে প্রকাশক মহাশয় জানাইয়াছেন যে তিনি সম্পূর্ণ আলোচনাটি শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবেন।—সম্পাদক।

পুরুষোত্তম

(প্রবন্ধ)

শ্রীদেবল

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে তিনটি পুরুষের উল্লেখ আছে—ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ, এবং পুরুষোত্তম। সন্ধানী লোকের সাহায্য না নিয়ে যেমন কৈলাস তীর্থে যাওয়া সঙ্গত নয়, তেমনি ভাষ্যকার টীকাকারদের দিঙ্‌নির্দেশ অমান্য করে গীতোক্ত পুরুষদের খোঁজ করা ঠিক নয়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে দিক্ সম্বন্ধেই নানা মুনির নানা মত। বলা যায়, যত মত তত পথ, পথ অনুযায়ী মত বা মত অনুযায়ী পথ বেছে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। নিঃসন্দেহ; আমাদের দেশের এটা ঐতিহ্যও বটে। দৃষ্টান্ত, গীতা ও অন্যান্য প্রস্থান গ্রন্থের নানারূপ ব্যাখ্যা। প্রত্যেক ব্যাখ্যারই পথ অনুযায়ী উপযোগিতা আছে; প্রসঙ্গতঃ অন্য মতের খণ্ডন করা হয় ঠিক, কিন্তু উদ্দেশ্য দোষ দেখান ততটা নয় যতটা স্ব-স্ব বুদ্ধিকে স্ব-স্ব পথে চালিত করা। অধিকন্তু গীতা সঙ্কলন-গ্রন্থ—নানা মুনির মত এখানে সংগৃহীত হয়েছে বলে ব্যাখ্যান-বৈচিত্র্য খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু নিরপেক্ষ জিজ্ঞাসুর শঙ্কা এই উত্তরে নিরস্ত হয় না। তার মনে প্রশ্ন ওঠে—সিদ্ধান্ত বিচারসহ কিনা; চিন্তাধারার ইতিহাস, যুক্তি-প্রয়োগের কুশলতা, অনুভূতিগত প্রমাণ ব্যাহত হয়েছে কিনা। অনেকে বলেন, ক্ষর পুরুষ মানে জড়বস্তু বা যাবতীয় অচেতন সামগ্রী—এইজন্য যে তাদের ক্ষয় আছে, অনবরত তারা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। এই ব্যাখ্যা সর্বথা বর্জনীয়, কারণ মূলে আছে ক্ষর পুরুষ—ক্ষর বস্তু নয়। পুরুষ জড় বা অচেতন সামগ্রী হতে পারে না। মতান্তরে, ক্ষর পুরুষ মানে কার্যোপাধিযুক্ত পুরুষ বা চৈতন্য, এবং অক্ষর পুরুষ মানে কারণোপাধিযুক্ত পুরুষ। প্রবাহের মত সুখদুঃখ নিয়ত ভেসে চলে; সাধারণ ভোক্তা জীব সুখদুঃখের সঙ্গে এক হয়ে জড়িয়ে আছে বলে সবাই সে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। জীবচিত্ত ক্ষণভঙ্গুর, নিত্য পরিণামী। পরিণাম-সাক্ষেপী জীবই ক্ষর পুরুষ। উত্তম কথা, কারণ এই পুরুষের সঙ্গে সকলেরই পরিচয় আছে, সকলেই আমরা ক্ষর পুরুষ। কিন্তু কারণোপাধিযুক্ত পুরুষটি কে? অজ্ঞান বা প্রকৃতি যদি কারণ হয় তবে সুষুপ্তিকালীন পুরুষই অক্ষর পুরুষ। কিন্তু সুষুপ্তি বা কারণ-স্বরূপ অজ্ঞান সুখদুঃখাদির মতই চঞ্চল, ক্ষর। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন যেমন ওঠে এবং ডোবে, সুপ্তিও তেমনি ভাসে, তলিয়ে যায়। ক্ষর পুরুষের চিত্তপরিণামক্রমে জাগ্রৎ-স্বপ্নও যেমন আসে ও যায়, সুপ্তিও তেমনি আসে-যায়। সুতরাং

মুক্তাবস্থিত পুরুষকে অক্ষর নামে অভিহিত করা সঙ্গত নয়। যদি বলা হয় ব্যষ্টির অজ্ঞান ক্ষর হলেও সমষ্টির অজ্ঞান অক্ষর হতে পারে, তবে বক্তব্য এই যে সমষ্টিগত অজ্ঞান ব্যষ্টির কল্পনা মাত্র, অনুভবগোচর নয়। সমষ্টিগত অজ্ঞান যাঁর আছে তিনি যদি পুরুষ হন তবে ব্যষ্টি হয়ে পড়েন, সুতরাং ক্ষর পুরুষ। যদি সমষ্টিগত অজ্ঞান-উপাধি নিয়ে সত্যিই একজন অক্ষর পুরুষ থাকেন তবে অজ্ঞান-নাশ তথা মুক্তি কোন কালেই সম্ভব হয় না। যা ভাণ্ডে নেই তা ব্রহ্মাণ্ডেও নেই।

'ক্ষর পুরুষ' মানে 'আমি পরিণামশীল' এই বোধযুক্ত পুরুষ। 'অক্ষর পুরুষ' শব্দের অর্থ হওয়া উচিত—আমি অপরিণামী পুরুষ। এই পুরুষের সামান্য জ্ঞান আমাদের আছে, বিশেষ জ্ঞান নেই। অসংখ্য পরিবর্তনের ভিতর আমি 'আমিই' আছি এ ধারণা সামান্যজ্ঞানবশতঃ হয়। বিশেষ জ্ঞান অবিবেকীর হয় না, বিবেকীর হয়—"বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ", বলেছেন গীতাকার এই প্রসঙ্গের অবতারণায় (১৫-১০)।

'আমি অক্ষর পুরুষ' এই অনুভবের প্রকৃত অর্থ কি তা বিশ্লেষণ করা দরকার, কারণ এক কথার আভিধানিক অর্থ এক হলেও ভাবগত অর্থ প্রায়ই ভিন্ন হয়। যেমন উপনিষদের "অসদ্ বা ইদম্ অগ্র আসীৎ" (তৈত্তিরীয়-৭-৩৪)—এটি জগতের অভাব-বোধক শ্রুতিবাক্য এবং বেদান্তদর্শনের প্রপঞ্চোপশম অনুভূতি। পাতঞ্জল দর্শনের অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি এবং বৌদ্ধদর্শনের শূন্যানুভব সমগোত্র হলেও সমরস নয়, যদিও আপাতদৃষ্টিতে তিনটিই একার্থ-বাচক বলে মনে হয়। পাতঞ্জল দর্শন সাংখ্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সাংখ্য মতে প্রকৃতি নিত্য। সুতরাং অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে প্রকৃতির অদর্শন হয়, কিন্তু হেতু-সিদ্ধ অভাব হয় না। বৌদ্ধমতে প্রত্যেক চিত্তপরিণাম ক্ষণস্থায়ী; ক্ষণ অতীত-অনাগত হতে বিচ্ছিন্ন, সুতরাং শূন্য। ক্ষণে পৌঁছলে জগতের অদর্শন নয়, অনস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। বৈদান্তিকগণ এই অনস্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু প্রশ্ন করেন—অনস্তিত্ব উপলব্ধ হয় কি না? উপলব্ধ না হলে শূন্য শুধু কথার কথা, বা পাতঞ্জলোক্ত বিকলাজ্ঞান—আকাশ কুসুম। যদি উপলব্ধ হয় তবে উপলব্ধিই শূন্যের অধিষ্ঠান। উপলব্ধির অন্য নাম স্বয়ংজ্যোতিঃ, দৃক্, আত্মা, চৈতন্য, ব্রহ্ম, জ্ঞানস্বরূপ, সৎ-চিৎ-আনন্দ, ইত্যাদি। বৈদান্তিকগণ বলেন, অধিষ্ঠানশূন্য ভ্রম হয় না। ভ্রমের নিরসন হলে জগৎ মিথ্যা হয়, স্বপ্নবৎ হয়, ভ্রমরূপে অসৎ হয়। সুতরাং অসৎ-অনুভূতি পাতঞ্জল মতে জগতের লয়, বৌদ্ধ মতে জগতের অভাব, বেদান্ত মতে জগতের বাধ। জগতের বাধ ইতিবাচক হলে অধিষ্ঠান স্বরূপ ব্রহ্ম, নেতি-বাচক হলে জগতের রজ্জুসর্পবৎ মিথ্যার।

বৌদ্ধ দর্শনে আমি 'নিত্য পুরুষ' এ জাতীয় অনুভবের উল্লেখ নেই। সাংখ্য-পাতঞ্জল এবং বেদান্তে এই অনুভূতির নির্দেশ আছে, কিন্তু ভিন্ন অর্থে। প্রশ্ন হচ্ছে গীতাকার কোন্ অর্থে 'অক্ষর পুরুষ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। একথা অনস্বীকার্য যে গীতার মৌলিক ভিত্তি সাংখ্য-দর্শন। গার্বে-প্রমুখ পণ্ডিতগণ তো গীতাকে পুরোপুরি সাংখ্য গ্রন্থই বলেছেন। কেউ কেউ আবার "বুদ্ধৌ শরণম্ অন্বিচ্ছ" (২-৪৯) দেখে বিভ্রান্ত হয়ে বলেছেন যে গীতা বৌদ্ধদর্শনের পরিপোষক। অন্য পণ্ডিতগণ উভয় মতের অসারতা প্রমাণ করেছেন নানা যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে। কিন্তু 'দর্শন' বা অনুভূতির দিক থেকে কেউ বিচার করেছেন বলে মনে হয় না। ভারতবর্ষ হচ্ছে শ্রুতির দেশ। শ্রুতি মানে যথার্থদর্শী বা ঋষির বাক্য—হৈতুকদের মতবাদ নয়। পাশ্চাত্য দেশে তর্ক প্রতিষ্ঠার কারণ; আমাদের দেশে "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ"—সুতরাং

বর্জনীয়। তাৎপর্য এই যে অনুভূতি-প্রমাণকে বাদ দিলে সব আলোচনাই কেশব্যবচ্ছেদে পর্যবসিত হয়। গীতাকে আমরা গীতোপনিষৎ নামে অভিহিত করে থাকি, সুতরাং শ্রৌত অনুভূতিকে বাদ দিয়ে অক্ষর-পুরুষের অর্থনির্ণয় সম্ভব নয়। গীতোপনিষদের বিশেষত্ব এই যে শ্রৌততত্ত্বের সঙ্গে সাংখ্যতত্ত্বের সমন্বয় করা হয়েছে, যার দৃষ্টান্ত প্রতি অধ্যায়েই কিছু-না-কিছু দেখা যায়। 'তিন পুরুষ'ও সেই সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত। অক্ষর পুরুষের অনুভূতি সাংখ্যদর্শনের মৌলিক তত্ত্ব-পারিভাষিক নাম, বিবেকখ্যাতি বা সত্ত্বপুরুষন্যতাখ্যাতি। অক্ষর পুরুষ প্রকৃতি বা সত্ত্ব থেকে ভিন্ন এই অনুভূতিই সাংখ্যপাতঞ্জল দর্শনের তত্ত্ব এবং ভিত্তি। বৌদ্ধগণ এই অনুভূতিকে স্বীকার করেন না। বৈদান্তিকগণ পঞ্চকোষ বিচার দ্বারা এই অনুভূতি অনেক সময় লাভ করে থাকেন, কিন্তু এটিও কাষ্ঠা বা পরাগতির উপলক্ষণ নয়। কারণ, প্রকৃতি পুরুষ থেকে ভিন্ন হলেও সত্তাহীন হয় না; ফলে দ্বৈতবোধ থেকে মুক্তি বা দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা সিদ্ধ হয় না। এজন্যই অদ্বৈত বেদান্ত বিচারে বিবেকখ্যাতির প্রামাণ্য ব্রহ্মনির্ধারণ সাধনে স্বীকৃত হয় না, যদিও সাধকের বিবেক-খ্যাতি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ এই কারণে যে দ্রষ্টা হ'য়ে থাকার অভ্যাস জ্ঞানযোগী মাত্রই করে থাকেন।

তবুও দ্বন্দ্বাতীত অবস্থালাভের প্রশ্ন থেকে যায়। মীমাংসার ইঙ্গিত সাংখ্যের বিবেকখ্যাতিতেই আছে—প্রকৃতি এবং পুরুষের ভিন্নত্ব নয়, অভিন্নত্ব প্রতি-পাদন। পাতঞ্জল দর্শনের নিরোধভূমিতে সমস্যার অভাব হয়, সমাধান হয় না। কারণ, বৃত্তিহীন অবস্থায় প্রকৃতি লয়প্রাপ্ত হয়। অধিষ্ঠান পুরুষসত্তার সঙ্গে এক হয় না। শ্রৌত সমাধান হচ্ছে তৎ ত্বম্ অসি, পুরুষই প্রকৃতি, আমিই ব্রহ্ম। এরই অন্য নাম পুরুষোত্তমতত্ত্ব, যে তত্ত্বে দ্রষ্টা এবং দৃশ্য এক অভিন্ন দৃক্-স্বরূপ হয়ে প্রতিভাত হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে (১২-৮-৩) পুরুষকেই "উত্তমঃ পুরুষঃ" নামে অভিহিত করা হয়েছে। সাংখ্যদর্শনে বা বৌদ্ধদর্শনে এই অনুভূতির উল্লেখ নেই।

কেউ কেউ অক্ষর পুরুষের অনুভূতিকে ব্রহ্ম-দর্শন এবং পুরুষোত্তমের অনুভূতিকে ঈশ্বরদর্শন বলে ব্যাখ্যা করেছেন। এ মতও সমীচীন নয়। গীতাতে যে সাংখ্যধারা আছে এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোক হতে দশম শ্লোক পর্যন্ত যে সাংখ্য-বাদের আলোচনা আছে তাকে ভিত্তি করেই ব্যাখ্যা করা উচিত। অধিকন্তু বেদান্তাচার্যগণ ব্রহ্মানুভূতিকে ঈশ্বরানুভূতি থেকে উঁচু বা নীচু পর্যায়ে রাখা যুক্তিসঙ্গত বা অনুভব-সিদ্ধ মনে করেন না। মৃত্তিকার জ্ঞান হলে সব ঘট যে মৃন্ময় এ জ্ঞান পরক্ষণভাবী হলেও অবশ্যম্ভাবী। এমনি, পরমাত্মার জ্ঞান হলে (=ব্রহ্মজ্ঞান) সব কিছু যে পরমাত্মাই (=ঈশ্বরজ্ঞান) এ জ্ঞান পরক্ষণভাবী হলেও অবশ্যম্ভাবী। গীতাকার এজন্যই সপ্তদশ শ্লোকের প্রথমার্ধে উত্তম পুরুষকে পরমাত্মা নামে অভিহিত করে দ্বিতীয়ার্ধে পরমাত্মার ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদন করেছেন—যো লোকত্রয়ম্ আবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ। এই পরমাত্মাকেই ক্ষর এবং অক্ষর উভয়ের অতীত বলা হয়েছে—ক্ষরমতীতোঽহম্ অক্ষরাদপি। অক্ষর-পুরুষকে ব্রহ্ম বললে পরমাত্মাকে ব্রহ্মের ঊর্ধ্বে স্থাপন করতে হয়। ঐতিহাসিক ধারা, যুক্তি এবং অনুভব এ জাতীয় ব্যাখ্যার বিরোধী। গীতাকার অন্যত্র (৬-২৯)-ও ব্রহ্মদর্শন এবং ঈশ্বরদর্শনকে এক কোটিতে স্থাপন করেছেন—

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥

'সম' মানে ব্রহ্মকে দেখে যোগী সর্বভূতে আত্মাকে এবং আত্মাতে সর্বভূতকে দর্শন করেন। প্রথমটি

[illegible] পুরুষ। গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখবেন,
অভিব্যক্তির "এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পর
[illegible] জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, স
[illegible] উত্তমঃ পুরুষঃ"—তেমনি এই আত্মা এই শরীর
[illegible] থেকে সম্যক্‌রূপে উত্থিত হয়ে পরম জ্যোতিকে
[illegible] প্রাপ্ত হয়ে যে স্ব রূপে অভিব্যক্ত হন—ইনিই উত্তম
[illegible] পুরুষ।

কয়েকখানি অনন্যসাধারণ প্রকাশন

এই ভারতের পুণ্যতীর্থ—শ্রীদেবল প্রণীত ৬·০০

Thesis—Antithesis—Synthesis বা পূর্বরাগ-বিরহ-মিলনের সুরে তিন অঙ্কে তিন কাহিনীর মাধ্যমে একই স্রষ্টা কেন এই তিনজন জিজ্ঞাসার প্রেরণায় ভারতের তীর্থে তীর্থে ভাবমন্থনের অভিব্যক্তি।

ভ্রমণ-রসসিক্ত উপন্যাস

রম্যাণি বীক্ষ্য

রাজস্থান পর্ব ৭·০০

সৌরাষ্ট্র পর্ব ৬·০০

কালিন্দী পর্ব ৫·০০

(মধুরাংক)

দ্রাবিড় পর্ব ৭·০০

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

ছোটগল্প সঙ্কলন

সপ্তপুরা ২৫·০

পৌরাণিক পটভূমিকায় রচিত সাতটি অনবদ্য ছোটগল্প

ডঃ সুকুমার দত্ত

ভ্রমণ

কাশ্মীর পরিক্রমা ২·০০

শ্রীনলিনীকিশোর গুহ

উপন্যাস

মধুরে মধুর ৫·৫০

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

রূপম্? ৩·৫০

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা-১২

রবীন্দ্রনাথ ও আনুষঙ্গিক মল

ডক্টর নীরদ বরণ চক্রবর্তী

- প্রবন্ধ -

পঁচিশে বৈশাখকে কেন্দ্র করে সমস্ত বাংলাদেশ জুড়ে পক্ষকালব্যাপী রবীন্দ্র-পূজার হিড়িক পড়ে যায়। কোলাহল, আয়োজন, অনুষ্ঠানের যেন প্লাবন ডাকে। পাড়ায় পাড়ায় অলিতে গলিতে জানা, অজানা, খ্যাত, অখ্যাত, পুরাতন, নূতন সমস্ত ক্লাবই এই উপলক্ষে কর্মমুখর হ'য়ে ওঠে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের কর্ম তথাকথিত 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান'। নাচ-গান-হৈ-হুল্লোড় মিলে সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। অনেক সময় আবার কবি-জন্ম-তিথি উপলক্ষে নূতন নূতন ক্লাব জন্মগ্রহণ করে। সারা বছর এদের কোন সাড়া পাওয়া যায় না, হঠাৎ পঁচিশে বৈশাখের কাছাকাছি সময়ে এদের আবির্ভাব, আবির্ভূত হয়েই সংস্কৃতির কসরৎ-প্রদর্শন এবং ঠিক পরেই আবার তিরোভাব। বেশ কয়েক বছর ধরেই এ অবস্থা অব্যাহত গতিতে চলেছে।

আসছে বছর রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী। সরকারী, বেসরকারী, নানা রকমের উদ্যোগ আয়োজন এখন থেকেই শুরু হয়েছে। আশংকা করা যাচ্ছে, রবীন্দ্র-পূজার 'অসম্ভব আতিশয্য ও আনুষঙ্গিক 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান' নামে সংস্কৃতির উৎপাত আসছে বছর প্রলয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবে। লক্ষণ ভাল নয়।

দেশের জ্ঞানী-গুণীজন ও বিচার-বিবেচনা-সম্পন্ন লোকেরা এই হুজুগের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন কটাক্ষ করেছেন। এই রবীন্দ্র-পূজা যে রবীন্দ্র-চর্চা বা রবীন্দ্র-সাহিত্য অনুশীলনের সঙ্গে অধিকাংশ সময়েই সম্পর্কহীন, এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। জাতির মানসিক উন্নতির জন্য রবীন্দ্র-চর্চা অপরিহার্য। তবে উপায় কি?

অনেকে মনে করেন, রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে জনপ্রিয় বক্তৃতা, ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে রবীন্দ্র-ধ্যান-ধারণা প্রচার, সুলভ মূল্যে রবীন্দ্র-রচনাবলীর নূতন সংস্করণ প্রকাশ এবং রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সাহিত্যসৃষ্টির পরিচয়-জ্ঞাপক একটি বর্ণানুক্রমিক অভিধান রবীন্দ্র-চর্চার পথ প্রশস্ত করবে। এ বিষয়ে আমাদের মনেও কোন সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও ভেবে দেখা যেতে পারে।

কথকতা প্রচারের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে কথকতা লোকশিক্ষার একটি বিশিষ্ট উপায় বলে স্বীকৃত হয়েছিল। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, গীতা প্রভৃতি প্রসঙ্গে কথক ঠাকুরেরা যে কথকতা করতেন তা সাধারণ লোকের মনে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করতো। ফলে অগণিত নরনারী নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও অশিক্ষিত ছিল না। তারা সীতার পাতিব্রত্য,

রামের প্রত্যাবর্তন, কৈকেয়ীর কুমন্ত্রণা, দুর্যোধনের দুর্বুদ্ধি, ভীমের সভাশিক্ষা, শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র কর্ম-কাহিনী শুনে শুনে একপ্রকার শিক্ষা সংস্কৃতির অধিকারী হ'য়ে উঠেছিল। আমাদের বিশ্বাস, রবীন্দ্র-সাহিত্য-প্রসঙ্গে এমনি ধরণের সুমিষ্ট, প্রাঞ্জল, প্রাণস্পর্শী কথকতা রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রচারের একটি উপায় বলে গৃহীত হতে পারে। কাগজে প্রায়ই চণ্ডী, রামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ, সারদা মা প্রভৃতি সম্পর্কে কথকতার বিজ্ঞাপন দেখা যায়। এসব যদি সম্ভব হয় তবে রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রসঙ্গে কথকতাই বা সম্ভব হ'বে না কেন?

সাধারণ লোকের ভাবের আদান প্রদান ব্যাপারে মেলা একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র। মেলায় কেনাবেচা উপলক্ষে যারা সমবেত হয় তারা যে শুধু সওদার আদান প্রদান করে তা নয়, ভাবেরও আদান প্রদান করে। বিশেষ করে মেলা উপলক্ষে যাত্রা, কবিগান প্রভৃতির যে সমস্ত আয়োজন করা হয় তাতে মানুষের মেলামেশা নিঃশঙ্ক ও অবাধ হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে কবিদের জন্মতিথি উপলক্ষে মেলা অনুষ্ঠানের রেওয়াজ আছে। বোধহয় এই ট্রেডিশনে উদ্বুদ্ধ হয়েই হাল আমলে রবীন্দ্র জন্মতিথি উপলক্ষে রবীন্দ্র-মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। সাধু উদ্দেশ্য, সন্দেহ নেই। কিন্তু, এই প্রসঙ্গে কিছু বলার আছে। অবাধ মেলামেশা ও ভাবের আদান প্রদান মেলার প্রাণ। মেলা-ক্ষেত্রে জাতি-বর্ণ-বৃত্তি-বিদ্যা কোন প্রকারে বলেই গৃহীত হয় না। এখানকার আনন্দযজ্ঞে সকলেরই নিমন্ত্রণ। সে জন্যই মেলা উপলক্ষে মানুষ জীবনের নানারকমের মালিন্য, ক্ষয়-ক্ষতি ও দীনতার কথা বিস্মৃত হয়ে আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে। স্বাভাবিক ও সহজ হতে পারলেই মেলা হয় সার্থক।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যের আনন্দযজ্ঞে সবাইকেই সাদর নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। রবীন্দ্র-মেলা উপলক্ষে আমরা যেন একথা বিস্মৃত না হই। রবীন্দ্রনাথ জীবনে অস্বাভাবিকতাকে কোথায়ও প্রশ্রয় দেননি। বাউলদের মত সহজ ও স্বাভাবিক হওয়াই ছিল তাঁর জীবন-সাধনা। রবীন্দ্র-মেলায় যদি সমাজের অভিজাত সম্প্রদায় তাঁদের বিত্ত ও পোষাক পরিচ্ছদের অশোভন প্রদর্শনী খুলে বসেন, তবে তাতে যেমন রবীন্দ্রনাথকে অপমান করা হয়, তেমনই পণ্ড করা হয় মেলার উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মেলার উদ্যোক্তাদের প্রাধান্য ও প্রচার নিশ্চয়ই রবীন্দ্র-মেলায় বরদাস্ত করার মত নয়। এসব কথা অপ্রিয় হলেও সত্য এবং সত্য বলেই মনে রাখার মত। আসন্ন রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকীতে রবীন্দ্র-নাথের সাহিত্য-সাধনা প্রচার করার জন্য যাঁরা রবীন্দ্র-মেলার আয়োজন করবেন, তাঁদের এসব কথা নিশ্চয়ই মনে রাখতে হবে। রবীন্দ্র-মেলায় রবীন্দ্রনাথই মুখ্য, আর সবই গৌণ। রবীন্দ্র-সাহিত্যে সকলেরই সমান নিমন্ত্রণ, কারও এখানে অন্যকে বিদ্রূপ বা অবজ্ঞা করার অধিকার নেই। রবীন্দ্র-সাহিত্যে মানুষ হিসেবেই মানুষের মূল্য, মানুষের জাতি-বর্ণ-বৃত্তি বা বিদ্যা হিসেবে এখানে মানুষের মূল্য স্বীকৃত হয়নি। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের নামে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে তাতে মানুষের পূর্ণ মূল্য দিতেই হবে, এবং তা দিলেই রবীন্দ্র-প্রচার সার্থক হবে, নয়ত রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবেন কারণ, অবজ্ঞা সয়ে সাধারণ লোক রবীন্দ্র-মেলায় যাতায়াত করবে, এ আশা আমরা করতে পারি না; এবং ফলে রবীন্দ্র-মেলার উদ্দেশ্যই পণ্ড হ'বে।

এসব ত হচ্ছে রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রচারের কথা। কিন্তু, কেউ কেউ বলছেন, এত করলেও রবীন্দ্র-ধ্যান-ধারণা আধুনিক মনে কোন সাড়া জাগাবে না; কারণ, রবীন্দ্রনাথের মেজাজের সঙ্গে আধুনিক মেজাজের

না-কি কোন মিলই নেই। রবীন্দ্রনাথ ঔপনিষদিক আবহাওয়ায় মানুষ। তাঁর মানসিকতা গঠনে যেমন সাহায্য করেছে উপনিষদ, তেমনই বাউল সাধনা, তেমনই কারও কারও মতে য়ুরোপীয় রেনেসাঁস-চিন্তাধারা। হাল আমলে না-কি এসব চিন্তা বরবাদ হয়ে গেছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কথায় বিশ্বাস করবে কে? অভিযোগ মারাত্মক এবং একথা যদি সত্য হয় তবে রবীন্দ্রনাথের আবেদন বিশেষ কিছু থাকবে না। সুতরাং ভাল করে অভিযোগটি বিচার করে দেখা দরকার।

অভিযোগকারীরা বলেন, উপনিষদ এই বিশ্ব-সংসার আনন্দ ও অমৃতের প্রকাশ বলে মনে করে এবং প্রচার করে যে সমস্ত রকমের দুঃখ, সংঘাত, বিপর্যয় ও ব্যর্থতার মধ্যেও সার্থকতা প্রচ্ছন্ন। রবীন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে একথা বিশ্বাস করতেন। সেজন্যই তিনি বলেছেন, 'আনন্দ আছে ধূলায় ধূলায় আনন্দময় ধরণী', 'যে ফুল না ফুটিতে ঝরিল ধরণীতে, যে নদী মরুপথে হারাল ধারা, জানি হে জানি তাও হয়নি হারা', 'জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা—ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা—পূর্ণের পদপরশ তাদের পরে', 'রাহুর মতন মৃত্যু তবু ফেলে ছায়া গ্রাসিতে পারে না সে যে স্বর্গের অমৃত।' —এসব না-কি শুধু গালভরা কথা। আধুনিক মন এসব কথায় বিশ্বাস করে না। নানা দুঃখ, বেদনা, ব্যর্থতা, শোষণ, শাসন ও অপমানে বিপর্যস্ত মানুষ চোখের জলে কোন আনন্দ খুঁজে পায় না। তার কাছে কথার ফুলকিবাজী করে লাভ নেই।

উপনিষদ জীবে আর শিবে ভেদ করে নি। বাউলেরা বলে, জীবে জীবে চাইয়া দেখি সবই যে তাঁর অবতার, ও তুই নূতন লীলা কী দেখাবি যার নিত্যলীলা চমৎকার। রেনেসাঁস-এর চিন্তাধারায়ও মানুষের জয়গান লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এই ভাবনায় মানুষে দেবত্ব আরোপের চেষ্টা নেই, তবুও মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কথা কমুকণ্ঠেই ঘোষণা করা হয়েছে; মানুষের ব্যক্তিত্ব, তার বুদ্ধির মুক্তি ও অপরিসীম সম্ভাবনা সবই স্বীকৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের ঋষি ও পরবর্তীকালের বাউলদের মত মানুষের দেবত্বে বিশ্বাস করতেন এবং রেনেসাঁস-এর চিন্তাধারায় স্বীকৃত মানুষের ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধির মুক্তি ও অপরিসীম সম্ভাবনায় ছিলেন আস্থাবান। সেজন্যই তিনি মানুষের ধর্ম বলতে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন বোঝেন এবং দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ। অভিযোগকারীরা বলেন, বিগত দুই মহাযুদ্ধ, বিভিন্ন দেশে ডিক্টেটরশিপের অভিজ্ঞতা, প্রভৃতি নিকৃষ্ট স্তরের জিঘাংসার পরিচয় পেয়েও মানুষের দেবত্বে ও শুভবুদ্ধিতে বিশ্বাস রাখা অসম্ভব। এই পরিস্থিতিতে আধুনিক মনের দরবারে রবীন্দ্রনাথের আবেদন ব্যর্থ হ'তে বাধ্য।

অভিযোগ বোঝা গেল। এবার জবাব দেবার চেষ্টা। আসলে এ অভিযোগ আদর্শবাদের বিরুদ্ধে বাস্তববাদের অভিযোগ। বার বার বাস্তববাদীরা আদর্শবাদের বিরুদ্ধে এ জাতীয় অভিযোগ তুলেছেন, আদর্শবাদীরা তার জবাবও দিয়েছেন বারবার। কিন্তু সমস্যার মীমাংসা হয় নি। তবে এখনও আদর্শবাদী লোক অনেকেই আছেন এবং তাঁরা সব মূর্খ এমন মনে করার কোন কারণ নেই। লোকেরা বিজ্ঞানের জয়গান করে এবং বিজ্ঞানীর কথা সহজে ফেলনা বলে মনে করে না। তাই বলছি, একথা ভুললে চলবে না যে, বর্তমান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনও আদর্শবাদী ছিলেন। এতেই বোঝা যাচ্ছে, আদর্শবাদের কথা বর্তমান পৃথিবীতেও একেবারে মাঠে মারা যাচ্ছে না। একথা শুনবার লোকও অনেক। তবে রবীন্দ্রনাথের আবেদন আধুনিক মনে সাড়া জাগাবে না কেন?

দুঃখ, দৈন্য, ব্যথা, বেদনা, বিপর্যয়কে যদি চরম বলে গ্রহণ করা যায় তবে নিরুপায় হতাশায় আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। বর্তমান পৃথিবীতে আত্মহত্যা অনেকে করেছে ও করছে, কিন্তু বেশী সংখ্যক লোকই ত করে নি। তারা নিশ্চয়ই দুঃখের দুর্যোগ রাত্রিতেও কোন না কোন আশার আলোক খুঁজে পেয়েছে; বিশ্বাস করছে, রাত্রির অবসানে নিশ্চয়ই দিনের আলো দেখা দেবে। এই বিশ্বাসের জন্য কি মূল্য আছে তা বিচার না করেই বলা যায় এই বিশ্বাসের জন্যই তারা বেঁচে আছে। জীবনের চেয়ে মূল্যবান জিনিস আর ত কিছু নেই। বাঁচলে ত অন্য সব। সুতরাং এই বিশ্বাস অর্থহীন এমন মনে করার কারণ নেই। আধুনিক কালের লোকেরা এই বিশ্বাস করে না, একথাও ঠিক নয়। যদি এ বিশ্বাস তারা না করতো তবে যে বাঁচতোই না। সুতরাং এই বিশ্বাসের সার্থক বাণীরূপ দিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আবেদন ব্যর্থ হবে কেন?

আমরা অভিজ্ঞতাতেও পাই, লোকে ধাক্কা না খেলে জ্ঞান লাভ করে না। দুঃখ-দৈন্য মানুষের জীবনে আঘাত করে তবে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত করে। এইদিক থেকে ব্যর্থতা-বেদনারও একটা সার্থকতা আছে; ধূপ না পোড়ালে সে ত গন্ধ দেয় না, দীপ না জ্বালালে সে ত আলো দেয় না। তেমনই মানুষ দুঃখ-দহনে দগ্ধ না হ'লে নিজের মহিমা প্রকাশ করতে পারে না। আধুনিক কালের লোক অভিজ্ঞতা ও যুক্তি কিছুই স্বীকার করে না, এমন ত নয়। তবে তাদের কাছে একথা ব্যর্থ হ'বে কেন?

মানুষ যখন অভিভূত থাকে শোকে, ব্যর্থতায় হতাশায় জীবন হয় পঙ্গু তখন যদি তাকে আরও শোক আরও ব্যর্থতার কথা শোনান যায় তবে যে মৃত্যুবরণ করা ছাড়া তার আর কোন উপায় থাকবে না। এই অবস্থায় মানুষের কাজ হ'বে তাকে অশোক, সার্থকতা ও আশার আলো দেখানো আর তা করলেই ত সে মানুষ হ'বে জীবনদাতা। রবীন্দ্রনাথ কান্নাভরা ব্যথাভরা পৃথিবীতে যদি আনন্দবার্তা এনে দিয়ে থাকেন তবে নিশ্চয়ই তিনি মহাশ্মশানে জীবনের বাণী শুনিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে তাঁর বিরুদ্ধে দোষারোপ করে লাভ নেই, সাধুবাদ করতে হয়। শোকাতুরের কাছে সান্ত্বনার বাণী কি কোন আবেদনই রাখে না? অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই বলবে—রাখে। তবে রবীন্দ্রনাথ ব্যর্থ হবেন কেন?

জগতে সৌন্দর্যের কি অভাব আছে! ঋতু-ঋতুর বিবর্তনে প্রকৃতির পোষাক পরিবর্তন চক্ষুষ্মান লোকের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। এই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শে ভরা ধরণীর বার্তা কল্পনা করলে চলবে কেন? পৃথিবী চিরপুরাতনী হ'য়েও নিত্যনবীনা। কখনও নির্মেঘ নীল আকাশ বা বাদলঘন সজলকালো মেঘ, গন্ধে মাতালরূপে পাগল ফুলবন বা নির্জন তরঙ্গ উতল নদীতীর তাদের সৌন্দর্যের পশরা নিয়ে মানুষের হৃদয়ের দ্বারে আঘাত করছে। শতকর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও মানুষ মাঝে মাঝে তাতে সাড়া দেয়। তবে জগতের এই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শের ডালি যে রবীন্দ্রনাথ কাব্যের সুষমায় মধুরতর করে তুলেছেন তাঁর আবেদন আধুনিক মনে ব্যর্থ হবে কেন? প্রেম, করুণা, উদারতা, ভয়, ক্রোধ, ঘৃণা, বিস্ময় প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি সকল মানুষের মনেই ত আবেগ সঞ্চার করে থাকে। মা'র ভালবাসা, প্রেয়সীর নীরব আহ্বান, সন্তানের অস্ফুট কাকলি সমস্ত মানুষকেই নিশ্চয়ই বিহ্বল করে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রকৃতির সৌন্দর্যের দিক এবং মানুষের চিরকালীন চিত্তবৃত্তির দিক এমন মর্মস্পর্শী করে প্রকাশ করা হয়েছে যার তুলনা বিশ্বসাহিত্যে

খুব বেশী নেই। এই বাবদও ত রবীন্দ্রনাথের আবেদন বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন।

আর মানুষের শুভবুদ্ধির কথা বলছেন, তা-ই বা অস্বীকার করি কি করে? দু'টো মহাযুদ্ধ এবং পরবর্তী নানা সমস্যার জটিলতা মানুষের ঘৃণ্য পশুটাকে অনেকক্ষেত্রে প্রকাশিত করেছে সত্য, কিন্তু, এখনও ত মহানুভবতা, সহৃদয়তা, প্রেম, পরোপকার প্রভৃতি মানুষের দেববৃত্তির পরিচয় যথেষ্টই পাওয়া যাচ্ছে। আর যাচ্ছে বলেই ত এখনও সমাজে বাস করা সম্ভব। নইলে যে সমাজই থাকতো না, বন সঞ্চারিত হ'ত তথাকথিত নগরে ও পল্লীতে। মানুষ হ'ত পশু। হিংসার প্রচণ্ড তাণ্ডবে ও কলহের কলঙ্কিত কোলাহলে এখনও ত মানুষ শান্তির কথা বলে, ভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার করে, হৃদয়ের প্রসারের ঘটনা কানে আসে। নইলে যে ভরাডুবি হ'ত। সভ্যতা, সংস্কৃতির সব আলো নিবিয়ে নিবিড় অন্ধকারে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা ছাড়া উপায় থাকতো না। কিন্তু, অবস্থা ত তেমন নয়। তা হ'লে শান্তির বাণী, মহানুভবতার কথা সবই বাজে কথা হবে কেন? রোগী যদি প্রলাপ বকতে থাকে তবে যে ডাক্তার হাল ছাড়ে সে কেমন ডাক্তার? তেমনই মানুষ যখন কোন কারণে সাময়িকভাবে উন্মত্ত হ'য়ে ওঠে তখন সমাজের যাঁরা ডাক্তার সেই মহাপুরুষেরা হাল ছাড়বেন কেন? তাদের প্রকৃতিস্থ করা, পথপ্রদর্শন করাই ত মহাপুরুষদের কাজ। দেশ বা জাতির সংকট মুহূর্তেই ত সেজন্য যুগন্ধর মহাপুরুষদের আবির্ভাব। এ'ত ঐতিহাসিক সত্য। তবে জাতির অপ্রকৃতিস্থতার দিনে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবই বা অসঙ্গত বা অসমঞ্জস হ'বে কেন?

আর ব্যক্তিত্বের বিকাশের কথা বলুন বা মানুষের অনন্ত সম্ভাবনায় বিশ্বাসের কথাই বলুন, তা-ই বা আধুনিক কালে বেমানান শোনাবে কেন? ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ দেওয়াই ত আজ প্রগতিবাদী রাষ্ট্রের আদর্শ। মানুষ ত এই সুযোগের জন্যই লড়াই করছে। স্পুটনিকের যুগে মানুষের অনন্ত সম্ভাবনায় বিশ্বাস হারালে চলবে কেন? গ্রহান্তরে যাওয়ার স্বপ্ন মানুষ প্রায় সফল করে আনলো। এরপরও যদি তার সম্ভাবনায় অবিশ্বাস জন্মে তবে নাচার। এই পরিস্থিতিতে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও মানুষের অনন্ত সম্ভাবনায় বিশ্বাসী কবি রবীন্দ্রনাথের বাণী আমাদের বেসুরো লাগবার ত কথা নয়। বরং সাধারণ মানুষের লড়াই এতে ত আরও জোরদার হওয়া উচিত এবং সাধারণ মানুষ এতে আরও উদ্বুদ্ধ হ'বে এইত স্বাভাবিক।

আরও কথা, রাত্রি কখনই চিরস্থায়ী হয় না; ঝড় চিরকালই একটা সময়ে থামে। রাত্রি ও ঝড় উভয়ই সাময়িক, সর্বকালস্থায়ী নয়। মহৎ সাহিত্য, স্থায়ী সাহিত্য চিরকালই সাময়িককে উপজীব্য করে না, উপজীব্য করে যা চিরন্তন তাকেই। সাময়িক নিয়ে কারবার সংবাদপত্রের। সংবাদপত্র কোন মহৎ সাহিত্য নয়। মহৎ সাহিত্যস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ সাময়িককে কৌলীন্য দেবেন না এটাই ত প্রত্যাশিত। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। রাত্রি ও ঝড়কে চিরস্থায়ী মনে করে যারা তাদের জয়গান শুরু করে দেয় তারা খণ্ডকালের পূজা পেলেও অখণ্ডকাল তাদের দিকে মুখ ফিরিয়েই থাকে। রবীন্দ্রনাথ অখণ্ডকালের দরবারে আর্জি পেশ করেছেন। সে আর্জি কখনই ব্যর্থ হ'বে না। ক্ষয়রোগীর কাছে গানের আবেদন কি ব্যর্থ হয়? তবে আর দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথের অমৃত ও আনন্দের আহ্বান সাড়া জাগাবে না কেন?

আমাদের কিন্তু মনে হয়, বাঙ্গালী জাতির চারদিককার এই চরম দুর্যোগ দিনে ব্যর্থতা, হতাশা, বেদনার অন্ধকারে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের

বাণীই শুভ্রশ্বেতপদ্মের মত বাঙ্গালীর আশ্বাস ও আকর্ষণের বস্তু হ'তে পারে—

"মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে :
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার তখনি সে
পথ-কুক্কুরের মত সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে।
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার :
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে।"

আমাদের বিশ্বাস, বিচিত্র মত ও পথের আবেদনে দিশাহারা, যুদ্ধক্লান্ত, বেদনাবিধুর বিশ্ববাসীর কাছে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশই ধ্রুবতারার কাজ করতে পারে—

মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হ'বে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।
মৃত্যুরে করি না শঙ্কা।

তাই আমরা বলি, রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার আবেদন আধুনিক মনে সাড়া জাগাবে না, একথা সত্যি নয়।

(প্রবন্ধ)

রাজধানীর রূপান্তর

ডক্টর নিমাইসাধন বসু

প্রাচীন বাঙলার রাজধানী ছিল গৌড়। গৌড় বলতে যে কোন্ নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল বোঝায় তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রাজত্বে গৌড়ের সীমানার পরিবর্তন হয়েছে। পাল ও সেন রাজত্বের পূর্বে গৌড়ের সীমানার আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। এই সময় 'বঙ্গ' ও 'গৌড়' দুটি স্বতন্ত্র রাজ্য বলে পরিগণিত হত। কিন্তু প্রায়ই একই রাজার অধীনে থাকায় ও 'গৌড়েশ্বর' ও 'বঙ্গপতি' আখ্যা দুটি একই সঙ্গে ব্যবহারের ফলে এই দুটি রাজ্য প্রায় একীভূত হয়ে গিয়েছিল। মুঘল ও পরে ব্রিটিশ আমলের নথিপত্রে বাঙলাদেশকে 'গৌড়মণ্ডল' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

পালদের মত সেন রাজাদেরও একাধিক রাজধানী ছিল। অন্ততঃ লক্ষ্মণসেনের সময় থেকে গৌড় ছিল সেনেদের অন্যতম রাজধানী। মুসলমান আমলেরও প্রথম দিকে গৌড় ছিল বাঙলার রাজধানী। এই গৌড় বলতে মালদা জেলার গৌড় নগর বা লক্ষ্মণাবতীকে বোঝায়।

প্রাচীন গৌড়ের সমাজ ও সভ্যতা বাঙলার ইতিহাসের এক বিশেষ অধ্যায়। বলা বাহুল্য এ ছিল গ্রামীণ সভ্যতার যুগ। অন্যান্য প্রধান প্রধান নগরের মত গৌড়ে ছিল ধার্মিক, জ্ঞানী, কুচক্রী, ধনী, দরিদ্র, সরল, বিলাসী, শঠ ইত্যাদি নানান্ মানুষের বসবাস। গৌড়ের রাজবংশ ও রাজসভাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল গৌড় সমাজ। কিন্তু বাৎস্যায়নের ও অন্যান্য গ্রন্থে গৌড়ের রাজ-পরিবারের অবনতি ও চারিত্রিক দুর্বলতার উল্লেখ রয়েছে। এই প্রসঙ্গে তখনকার সমাজের আর এক অবাঞ্ছিত দিকের কথা বলা প্রয়োজন। তখনকার সমাজ দেশপ্রীতি ও ঐক্যবোধের উন্মেষের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। এর প্রধান কারণ সমাজে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। এই যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি গ্রামীণ হলেও এক স্বতন্ত্র নাগরিক জীবন গড়ে উঠেছিল। এই দুই'এর মধ্যে ছিল বিরাট পার্থক্য। গৌড় এবং অন্যান্য নগরগুলিতে কৃষিজীবন সম্পূর্ণ বর্জিত না হলেও, সরকারী, বিচারবিভাগীয় এবং সামরিক কার্যে ও ব্যবসাবাণিজ্যে লিপ্ত লোকেরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। আড়ম্বর ও বিলাসিতাপূর্ণ

নাগরিক জীবনযাত্রার সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের অনাড়ম্বর সরল জীবনযাত্রার পার্থক্যের কথা বহুসূত্রেই জানা যায়।

লক্ষ্মণসেনের ভাগ্যবিপর্যয় অনুষ্ঠিত হওয়ার পর মুসলমান যুগের প্রথম দিকে গৌড় রাজধানী থাকে। কালক্রমে বাঙলার ইতিহাসের গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীরও হয় পরিবর্তন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক কারণে রাজধানী স্থানান্তরিত হতে থাকে—তাণ্ডা থেকে রাজমহল, তারপর ঢাকা, সেখান থেকে মুর্শিদাবাদে। রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার কাহিনী বিচিত্র। কিন্তু তার থেকেও বিচিত্র হল প্রায় অখ্যাত ও অজ্ঞাত কলকাতার মহানগরী ও বাঙলা তথা সারা ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্রে রূপান্তরের কাহিনী।

১৬৯০ সালে জব চার্নক যখন কলকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন তখন অদূর ভবিষ্যতের এই রূপান্তর কেউই বোধহয় কল্পনা করেন নি। বাঙলার নবাবেরা আর যাই হোক, বিত্তশালী ভারতীয় বণিকদের মধ্যে আশা বা নিরাপত্তার ভাব জাগাতে সক্ষম হন নি। এই বণিক সম্প্রদায় ইংরাজ অধীনে কলকাতায় ব্যবসাবাণিজ্য করা শ্রেয় ও নিরাপদ মনে করতে থাকে। ১৭১৭ সালে মুঘল দরবারে সারমনের দৌত্যের পর কলকাতার অধিবাসীরা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্য যে কোন স্থান অপেক্ষা বেশী নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও সুযোগ সুবিধা লাভ করে। এর ফলে কলকাতার দ্রুত উন্নতি ও প্রসার হতে থাকে ও বিভিন্ন স্থানের লোকেরা সপরিবারে কলকাতায় বসবাস করতে আসে। কলকাতার প্রসার ও শুরুবৃদ্ধির আর এক কারণ হল সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের মারাঠা আক্রমণ বা বর্গির হাঙ্গামা। এই সময় বহু লোক পশ্চিমাঞ্চল ছেড়ে পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে কলকাতার নিরাপত্তার জন্য চলে আসতে থাকে।

১৭৭৪ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতে প্রথম গভর্নর-জেনারেল হয়ে এলেন। কলকাতা পরিণত হল ব্রিটিশ ভারতের প্রাণকেন্দ্রে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হল সামাজিক পরিবর্তন। কোম্পানীর শাসনের ফলে সৃষ্টি হল বাঙালী দেওয়ান ও বেনিয়ানদের এক সুবর্ণ যুগ। এদেশে অনভিজ্ঞ ইংরাজদের দক্ষিণহস্ত হয়ে দাঁড়াল এই বেনিয়ান ও দেওয়ানরা। সেকালের ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের অধিকাংশই হলেন এঁদের বংশধর। কোম্পানীর আমলের প্রথমদিকের শোচনীয় ব্যর্থতা ও তার পরিণামের সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ অনস্বীকার্য। তবে পরবর্তীকালে এঁদেরই অনেক বংশধর বাঙলার নবজাগরণে এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় সমাজ-জীবনকেও বিপর্যস্ত করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত আমরা পাই এক ক্ষয়িষ্ণু সমাজচিত্র, আর তা সবচেয়ে প্রকট হয়ে ওঠে কলকাতার সমাজজীবনে। এই যুগে কলকাতার বিত্তভোগী ধনী, মহাজন, বণিক সম্প্রদায়ের রস-রুচির প্রমাণ হল এই সময়ের কবিগান, আখড়াই, হাফ আখড়াই, তর্জা, চপ-কীর্তন ইত্যাদি। শহরের বিত্তশালী ভদ্রগৃহস্থদিগের গৃহের "বাবু"দের—"মুখে ভ্রূপার্শ্বে ও নেত্রকোলে নৈশ অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ কালিমারেখা, শিরে তরঙ্গায়িত বাউরি চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানে ফিনফিনে কালাপেড়ে ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেমরিকের বেনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে চুনটকরা উড়ানী ও পায়ে পুরু বসুলস সমন্বিত চিনের বাড়ীর জুতা। এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীন প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাপ আখড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া রাত্রে বারাঙ্গনাদের

আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত"— কলকাতার "বাবু" সমাজের এই চিত্র আজও পাঠককে লক্ষিত করে।

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ফলে দেখা দিল এক সামাজিক বিপ্লব—প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষ। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সংস্পর্শে জনজীবনের এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীদের জীবন সাধনার ফলে সমাজের রুদ্ধস্রোত মুক্তি পেয়ে এক নূতন গতি লাভ করে। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে ও বিধবা বিবাহ এবং স্ত্রী শিক্ষার পক্ষে ও অন্যান্য সমাজ সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। অচিরে সমাজের মূলকেন্দ্র কলকাতা মহানগরীতে পরিণত হয় নূতন সমাজ জীবনের অগ্রদূতে। অষ্ট কুল খার যুক্তিহীন বেশাচার ও সঙ্কীর্ণতার অবসানের ফলে এক নূতন সমাজের উদ্ভব হয়। এই সমাজ উত্তরকালে জাতীয়তাবোধের সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়। উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতার সমাজে যুগপ্রবর্তনের পরে নূতন সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দেয় বিংশ শতাব্দী।

গৌড় থেকে কলকাতায় রাজধানী শুধু ভৌগোলিক নয়, এক বিরাট যুগের। এই দীর্ঘকালের মধ্যে সমাজজীবনের বিবর্তন ও পরিবর্তন হয়েছে তা যেমনি বিস্ময়কর তেমনি বিচিত্র।

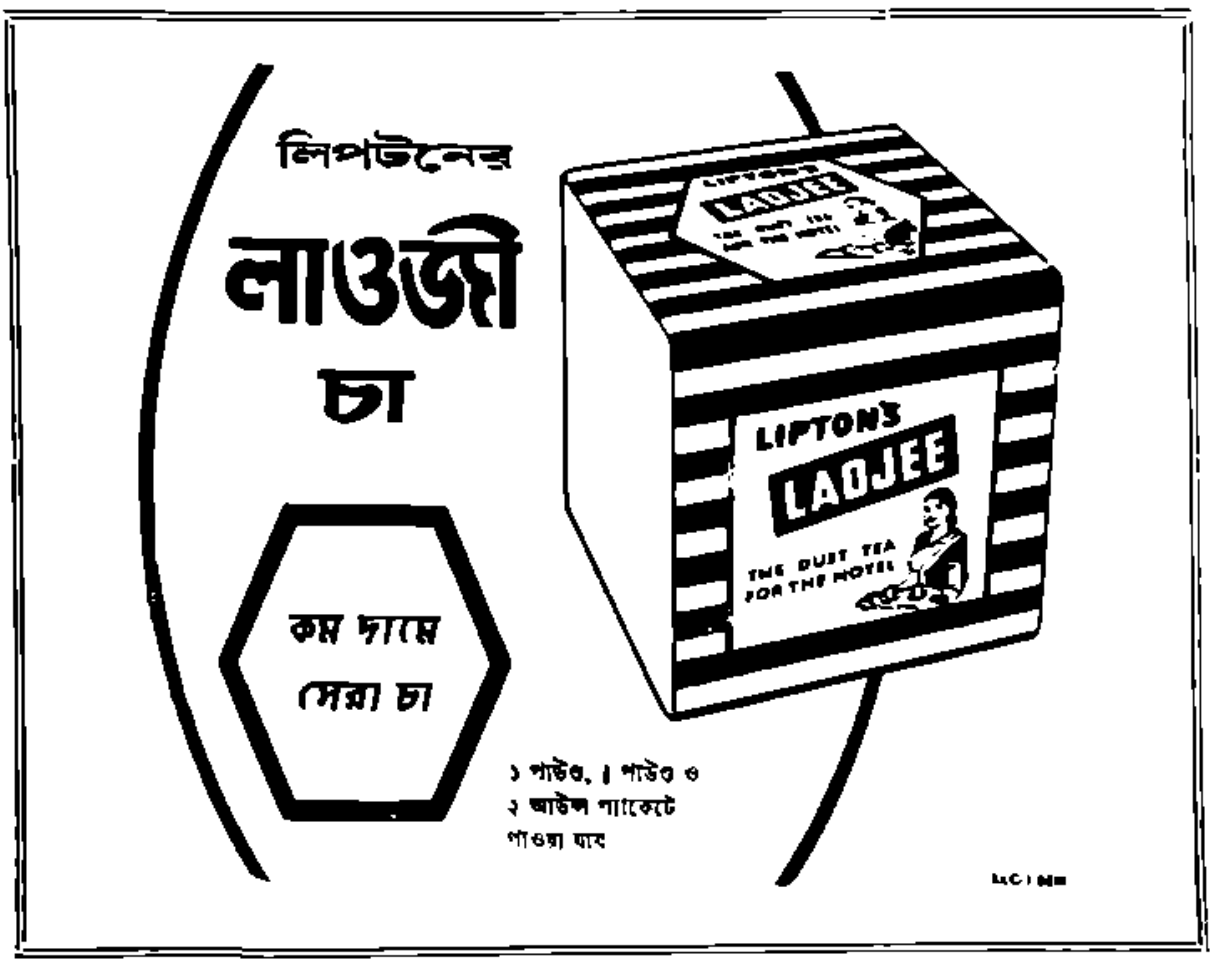

সত্যদর্শন

শ্রীকালিদাস রায়

রাত্রি দুটো, গ্রীষ্মকাল— দুরন্ত গরম ঘরে
থাকা হলো দায়।
এলাম ছাদের পরে, আকাশ ভূতল ভরা
অসংখ্য তারায়।
ঝিরিঝিরি হাওয়া বয় মুখর নগর এবে
নীরব, নির্বাক।
মাঝে মাঝে শোনা যায় শিশুর কাঁদন আর
কুকুরের ডাক।

কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথি, হেন রূপ নগরের
দেখিনি নয়নে—
বিরাটের যোগনিদ্রা শেষের ফণার পরে
সমুদ্র-শয়নে।
গৃহে গৃহে বন্ধ দ্বার, ঘুচায়েছে অন্ধকার
উঁচু-নীচু-ভেদ
পাঁচতালা একতালা কুঁড়ে ঘর একাকার,
নেইক বিচ্ছেদ।

সম্মুখে দেখিনু যেন তেপান্তর মাঠখানা
অনন্ত-প্রসার।
সে মাঠে রহস্যময় হেথা হোথা আলো যেন
নৃত্য আলেয়ার।
লক্ষ লক্ষ নরনারী দেখে যত সুখস্বপ্ন
গাঢ় ঘুমঘোরে—
তেপান্তর পারে তারা মিলে সব তোলে বুঝি
স্বপ্নপুরী গ'ড়ে।

সেই স্বপ্ন ইন্দ্রজালে উচ্চাবচ বন্ধুরতা
সকলি বিলীন,
পরম সত্যের বোধি পেলাম যা' কোথায় তা'
ছিল এতদিন?
দিনের আলোকে যারা ছোট বড় উঁচু নীচু,
স্বপ্নের পাথারে
তাদের সকল ভেদ সব ব্যবধান ছেদ
মগন আঁধারে।

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় প্রণীত

সন্ধ্যামণি (কবিতার বই) মূল্য ৫·৫০

সাহিত্যরসিক বাঙালী পাঠক-পাঠিকার কাছে কবিশেখর কালিদাস রায়ের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্রকালীন ও রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি 'কবিশেখর'-এর কয়েকখানি অমূল্য কবিতার রসমধুর সংগ্রহ। প্রত্যেক গ্রন্থাগারেই রাখার মতো একখানি রসোত্তীর্ণ কবিতা-সঙ্কলন।

খতিয়ে দেখি

শ্রীসজনীকান্ত দাস

একদিন তো সবই ছিল, আজকে কোথা গেল সে সব ?
রামমোহন আর বিদ্যাসাগর মধু দীনবন্ধু কেশব—
এসেছিলেন বঙ্কিমও তো দর্শাতে বঙ্গের গৌরব ;
এসেও ছিলেন, চলেও গেছেন—বঙ্গবাসী পেয়েছে কী
আজকে এস সে হিসেবটা সবাই মিলে খতিয়ে দেখি ।

এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, তস্য শিষ্য নরেন্দ্রনাথ
ভারতবাণী প্রচার ক'রে করেছিলেন প্রতীচী মাত ।
ভারত দিবাজীবন 'পরে করিয়ে ধরার দৃষ্টিপাত
অরবিন্দ এলেন গেলেন আশার কথা কতই লেখি—
একুনে ফল কী হয়েছে, এস হিসেব খতিয়ে দেখি ।

এসেছিলেন বঙ্গ-রবি বিশ্বভুবন আলো ক'রে,
উদয়ে তাঁর বাঙালী কি জাগল কেহ নতুন ভোরে ?
কিম্বা তারা রাত রয়েছে ভেবেই আছে ঘুমের ঘোরে—
রবির কিরণ হেথায় কি হায়, বিফল পাষাণ-ভালে ঠেকি !
জন্মশতক-জয়ধ্বনির মাঝেই হিসেব খতিয়ে দেখি ।

বঙ্গভূমির অঙ্গে আঘাত হানতে গিয়ে লর্ড কর্জন
শুনতে যে পাই খুঁচিয়ে বাঘে শুনেছিলেন ঘোর গর্জন :
ব্যাঘ্র যদি, কাঁপছে কেন—কাঁদছে শুনে কেউ-তর্জন ?
কিম্বা ছিল চামটা বাঘের আজকে ধরা পড়ল মেকী !
'রাহুলাটের রিপোর্ট'খানার সত্যাসত্য খতিয়ে দেখি ।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

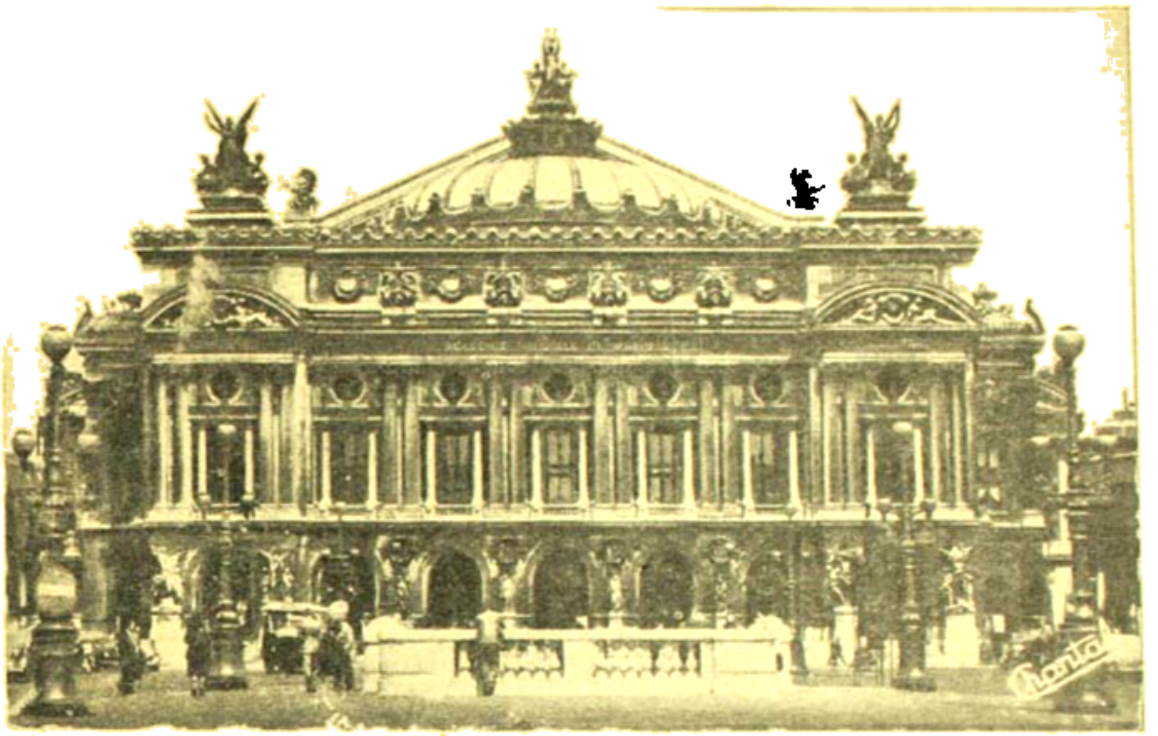

সৌধীন নগরী প্যারিসের অপেরা-থিয়েটার

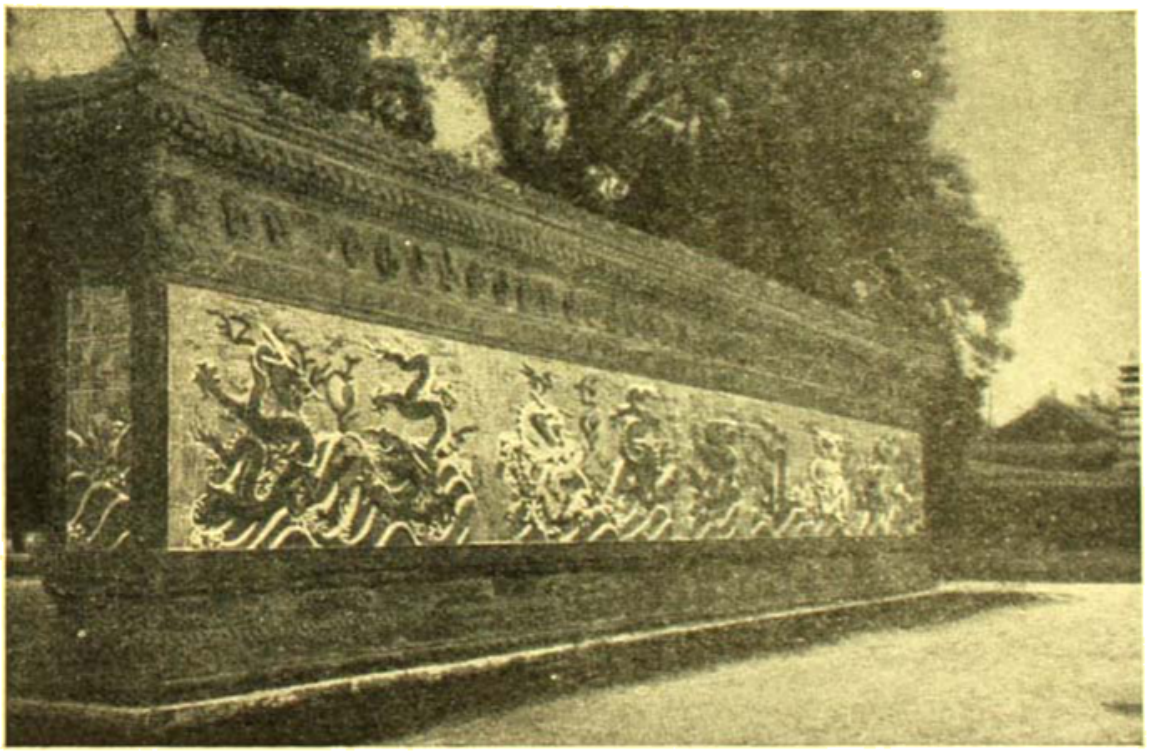

পিকিং শহরের একটি প্রাচীর-চিত্র

বাংলার সংবাদপত্র জগতে
নিঃসন্দেহে বৈচিত্র্য এনেছে

আনন্দ বাজার পত্রিকা

প্রতি প্রাতে প্রতি দেশের
নূতন সংবাদ পরিবেশন করে

ভারতীয় ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক

দেশে
দেশে—

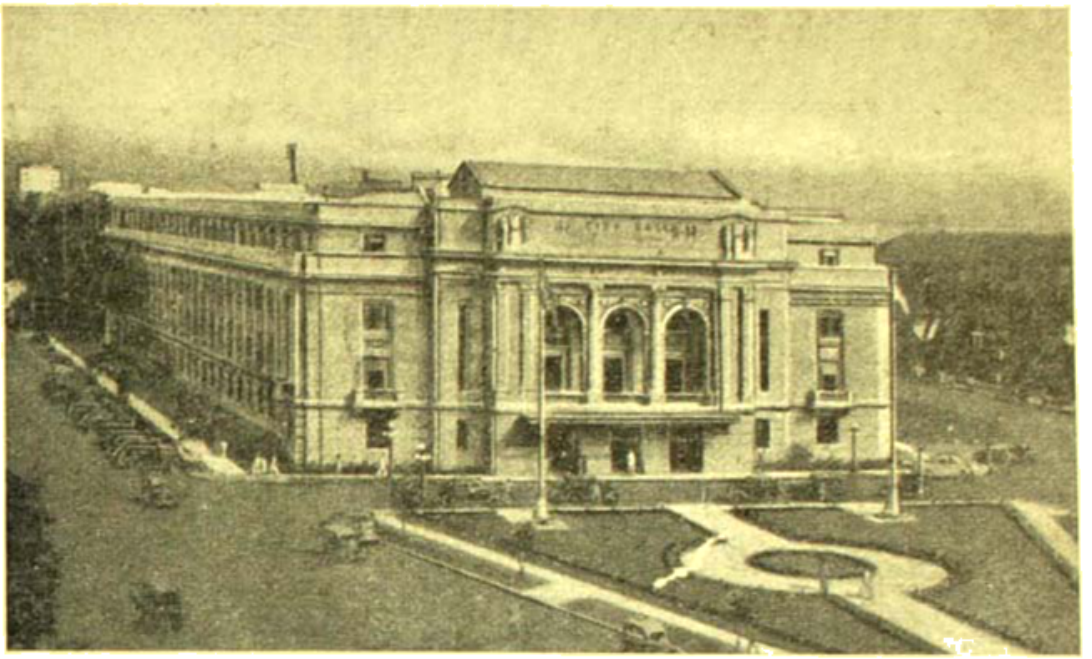

ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলার সিটি-হল

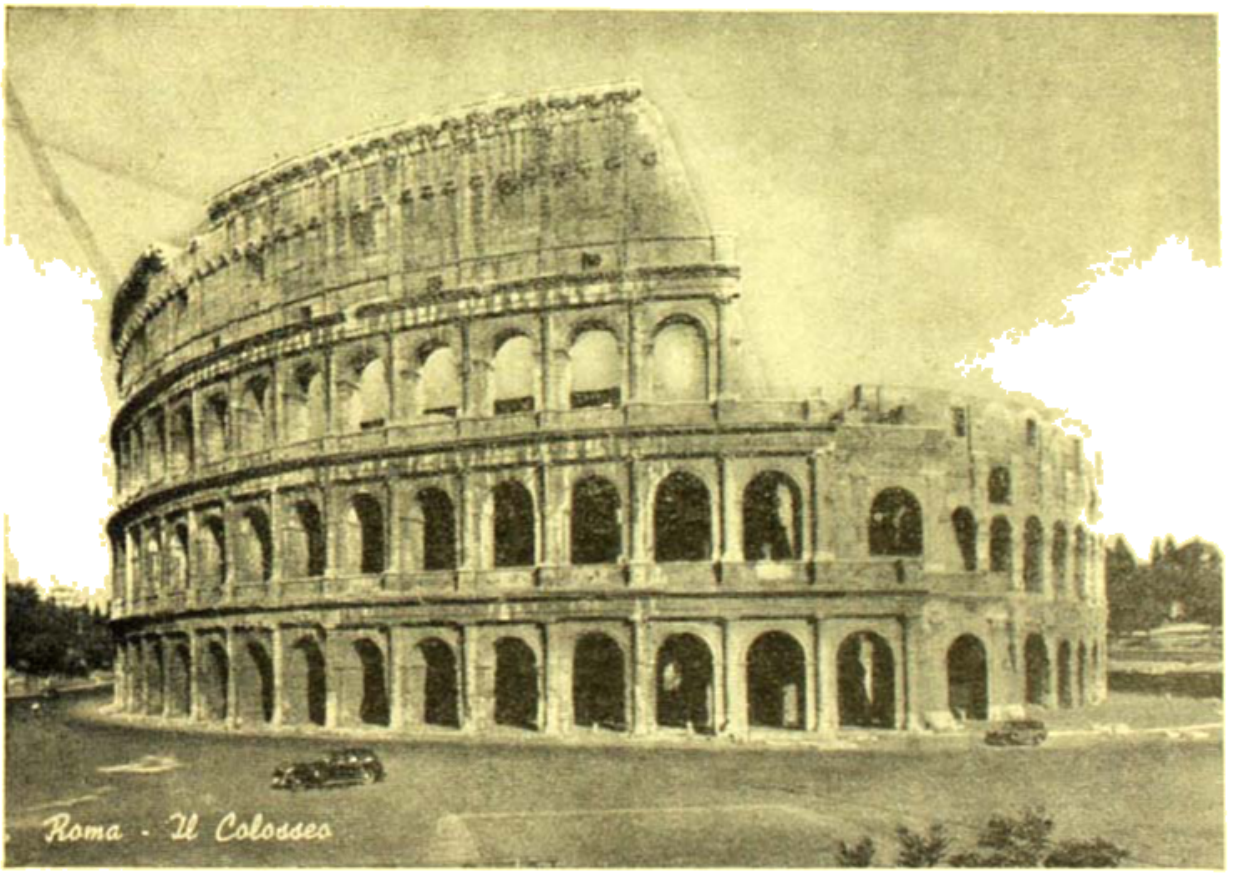

প্রাচীন রোমের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কলোসিয়ম-এর ধ্বংসাবশেষ

আজ সেই দিন

স্মরণীয় দিনগুলি অনেক সময় নিঃশব্দ পদক্ষেপে আসে, কিন্তু তা' বলে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে না। নিজগুণে ধীরে ধীরে চিরস্থায়ী পরিচয় অর্জন ক'রে তারাই ঐতিহাসিক রীতিতে ভবিষ্যতের নির্দেশ দেয়। এখানে ঈশ্বরের সৃষ্টি ও মানুষের সৃষ্টি একই নিয়মে চলে।

★

জয়মাল্য শুধু বীরেরই প্রাপ্য

★

১৯৩৭ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর ভারতের ইতিহাসে এমনি একটি স্মরণীয় দিন। সর্বজনপ্রিয় সংবাদ-পত্র **যুগান্তর** প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল এই দিনে। নির্ভীক, প্রগতিশীল ও সুস্পষ্ট জনমতের স্বচ্ছ দর্পণ—বাঙলা ও বাঙালীর কল্যাণপথের মুখপত্র এবং সংবাদ ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমন্বয় **যুগান্তর** দেশের ও দশের উন্নতি বিধানে আপনার নিত্য সহচর।

দেশে
দেশে—

তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলের গালাটা ব্রীজ

রোম নগরীর ছন্দসী ফুলধারা

শুভ শারদীয়ার আবির্ভাবে—

বাংলার প্রতি গৃহ পূর্ণ হোক

স্বাস্থ্যে ও সম্পদে,

উচ্ছল হোক

প্রাণের আনন্দে

★

রঘুনাথ দত্ত অ্যাণ্ড সন্স্

প্রাইভেট লিঃ

কাগজ, কালি, বোর্ড, লেখন সামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার

"রঘুনাথ বিল্ডিংস্"

৩২ বি, ব্রাবোর্ণ রোড, কলিকাতা-১

ফোন : ২২-৪২৯১ ও ২২-৪২৯২ ; তার : "নোটপেপার"

শাখা

কলিকাতা, পাটনা, কটক, গৌহাটী ও বারাণসী

দেশে
দেশে—

আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া রাজ্যের য়োসেমাইট ন্যাশনাল পার্ক। একটি রেডউড গাছের গুঁড়ির ভিতর দিয়ে তৈরি রাস্তায় মোটর গাড়ী চলছে।

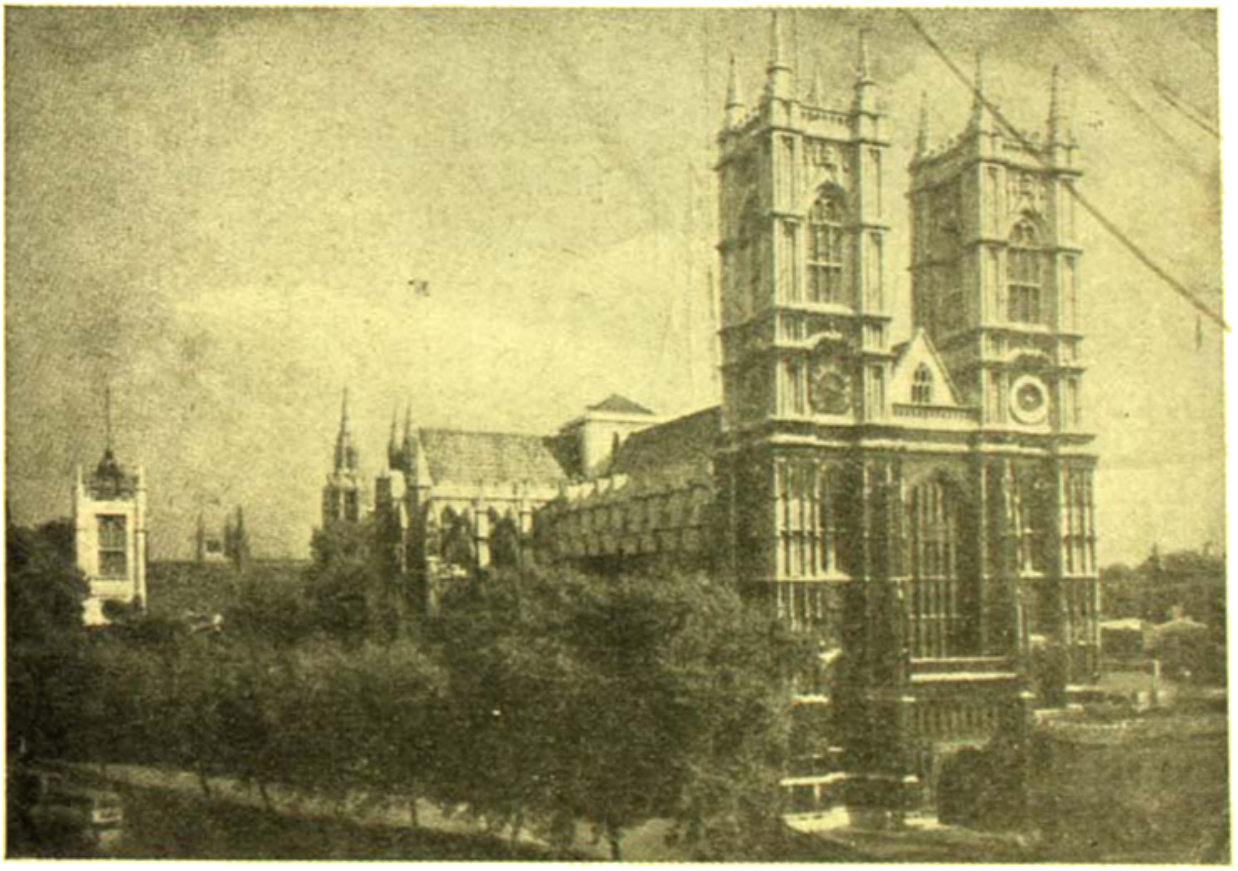

১২৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত লণ্ডনস্থ ওয়েস্ট মিনস্টার এ্যাবে। এখানেই বৃটিশ রাজা ও রাণীদের অভিষেক উৎসব হয়ে থাকে।

সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্য

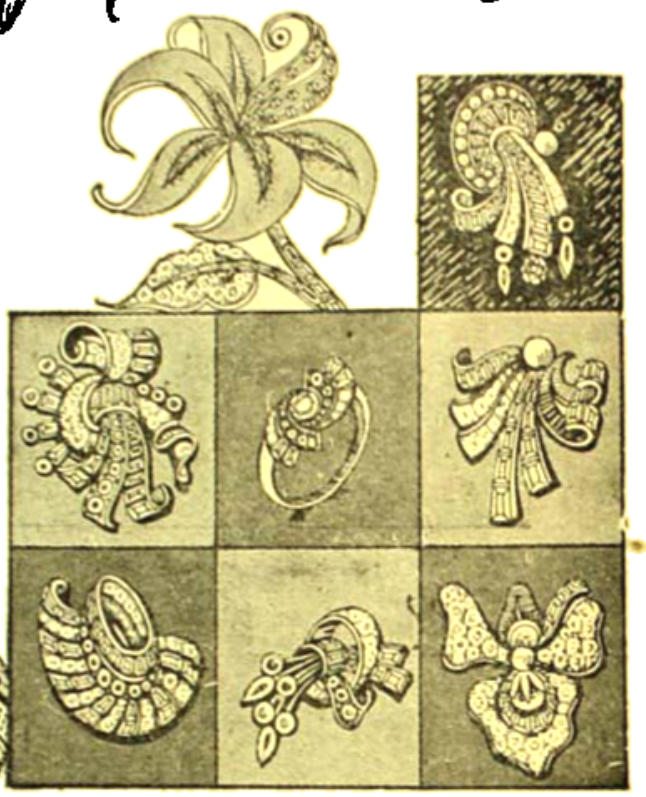

গিনি গোল্ড জুয়েলারী স্পেশালিষ্ট

এম,বি,সরকার এণ্ড সন্স

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

ফোন-৩৪-১১৬১ ১৬৭/সি ১৯৭ সি/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-১২ গ্রাম-স্বর্ণশিল্পী

ব্রাঞ্চ-ধানবাদ গেঃ ২৩৮/সি গ্রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-১৯ ফোন- ৪৬-৪৪৬৬

শোরুমের পুরাতন ঠিকানা ২২৪,২২৫/১,আপার সার্কুলার রোড,কলিকাতা-১২

কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে

ব্রাঞ্চ-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর- সিটি - ২৫৫৮-এ

B.B.

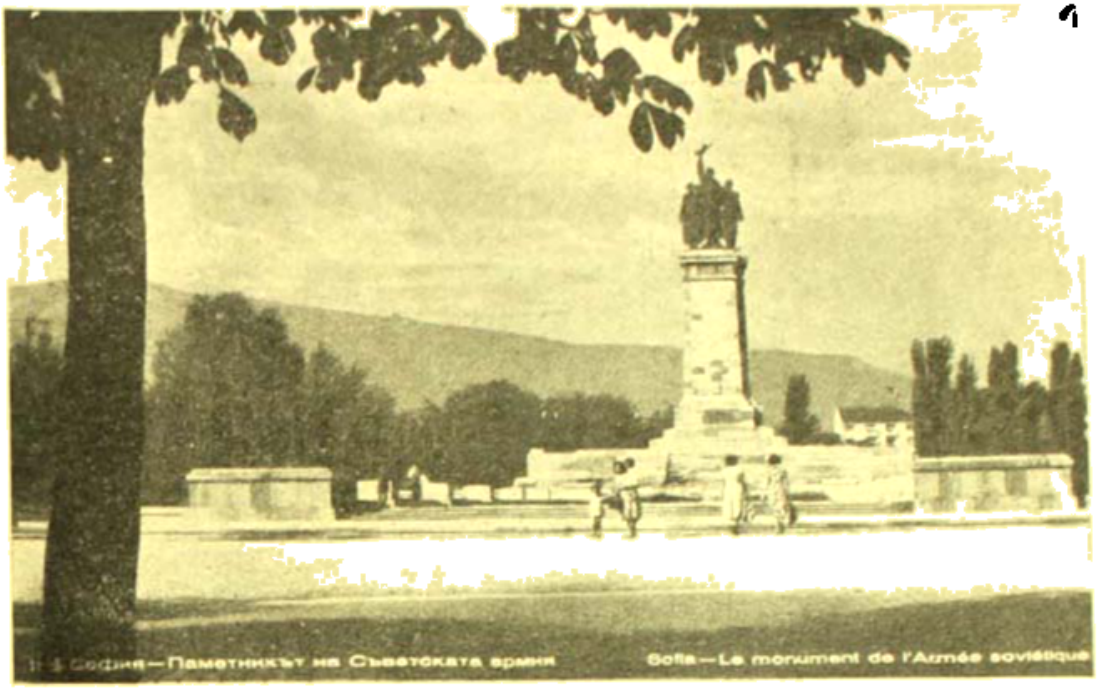

সোফিয়া নগরীর একটি স্মৃতিস্তম্ভ

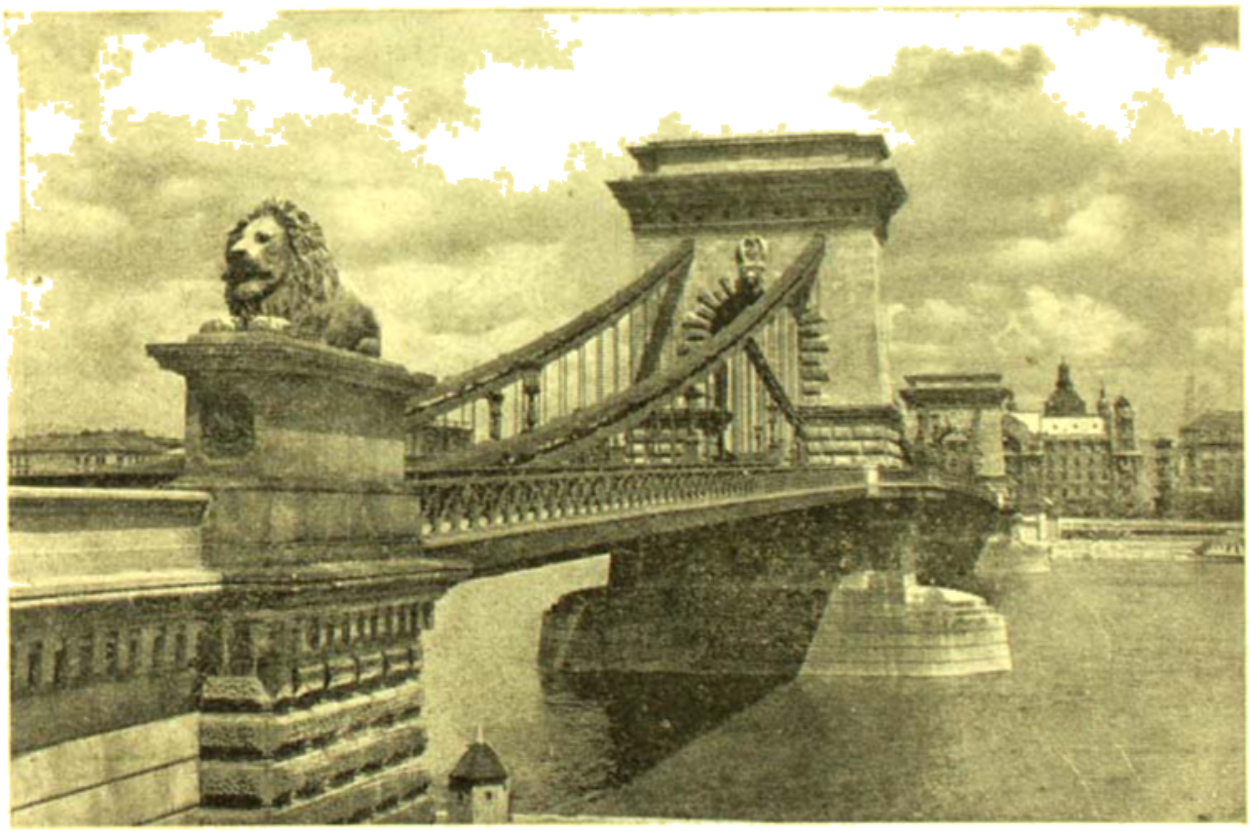

বুদাপেস্ট নগরীর নদীবক্ষে মনোরম সেতু

নিউইয়র্কের সুশোভিত সেণ্ট্রাল পার্ক

ডেকের দৃশ্য—[illegible]

আমাদের অগণিত গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকবর্গকে
আমাদের সানন্দ শারদীয় সম্ভাষণ জানাইতেছি—

মেসার্স ভোলানাথ পেপার হাউস
প্রাইভেট লিমিটেড

৩২এ ব্রাবোর্ণ রোড, কলিকাতা—১

পোস্ট বক্স : ৯৯১ টেলিফোন : ২২-১১৫২ গ্রাম : বিদ্যাদেবী

ঐতিহ্যে, সততায় ও সেবায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী

ব্রাঞ্চ :—
কলিকাতা :—
ভোলানাথ বিল্ডিং
১৮৭ নং ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট
১৯৮।১৯৯ নং ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট
৬৯নং মহাত্মা গান্ধী রোড
(ফোন : ৩৯-৯৯৮৯)

মফঃস্বল :—
১। ১নং চিউয়েট রোড, এলাহাবাদ
২। বালুবাজার, কটক
৩। বাঁকী রোড, পাটনা
৪। মার্কেট রোড, রাঁচী

সর্বপ্রকার দেশী ও বিদেশী কাগজের ও ছাপার কালির
বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

ইউনাইটেড পেপার স্টেশনারীর সুদৃশ্য কার্ড, খাম ও খাতার
সোল ডিস্ট্রিবিউটার।

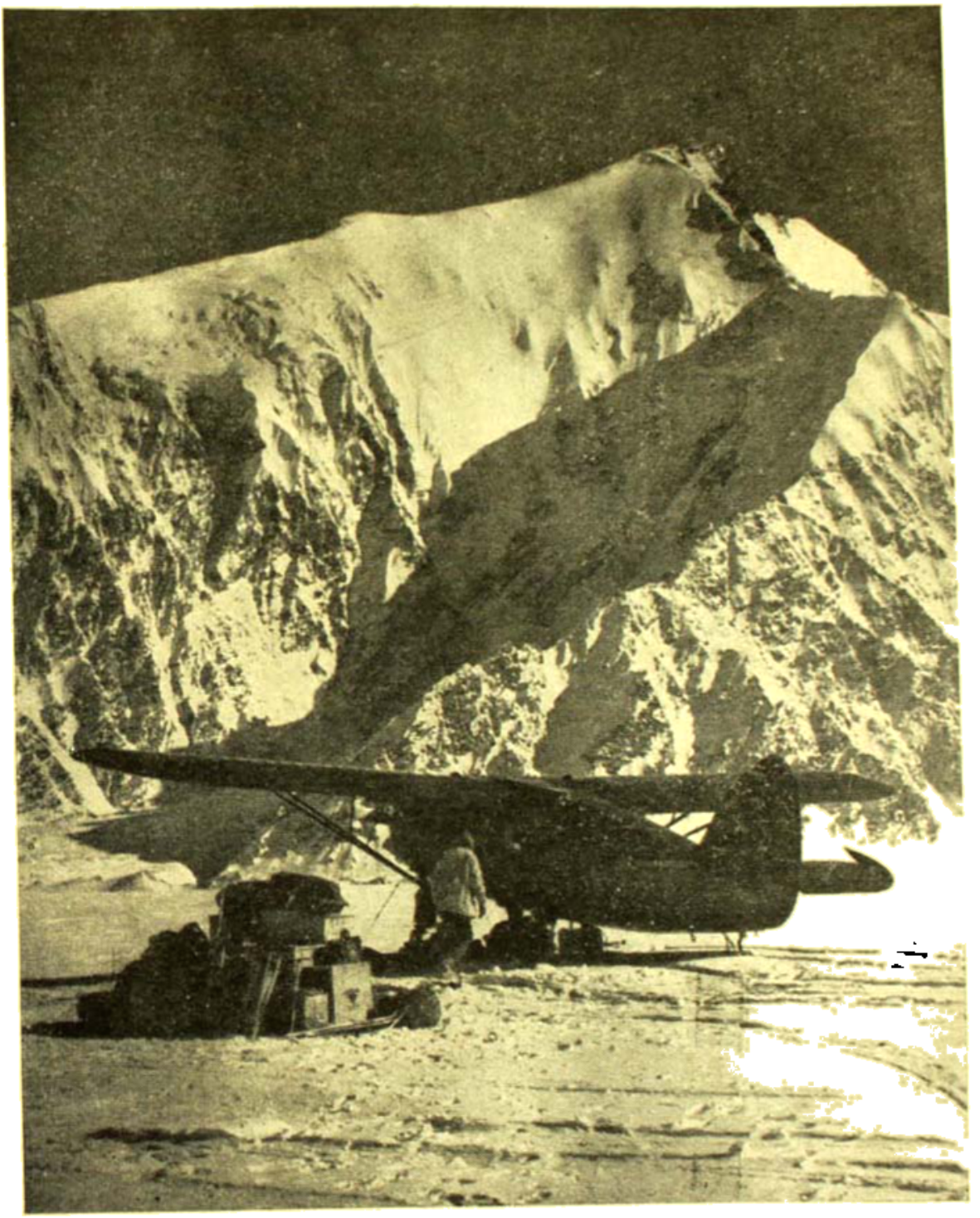

আমেরিকার উত্থত আলাস্কা-গিরি

কর্ম-মুখর লেনিনগ্রাদ (রাশিয়া)

হাঙ্গেরীর রাজ-পথে জীবন-চাঞ্চল্য

• নিজে পড়বার এবং প্রিয়জনকে পড়াবার মতো কয়েকখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ •

শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর
ভারতকথা
দাম : ৮·০০ টাকা।

•

প্রফুল্লকুমার সরকারের
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ
৩য় সংস্করণ : ২·৪০ টাকা
অ না গ ত
২য় সংস্করণ : ২·০০ টাকা
ভ্র ষ্ট ল গ্ন
২য় সংস্করণ : ২·৪০ টাকা

শ্রীজওহরলাল নেহরুর
বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ
শুধু ইতিহাস নয়, ইতিহাস নিয়ে সাহিত্য। ভারতের দৃষ্টিতে বিশ্ব-ইতিহাসের বিচার।
২য় সংস্করণ : ১৫·০০ টাকা

•

শ্রীজওহরলাল নেহরুর
আত্ম চরিত
৩য় সংস্করণ : ১০·০০ টাকা

•

মেজর চাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর
আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে
দাম : ২·৪০ টাকা

আর্থার ব্রায়ান্ট সম্পাদিত
ভারতে মাউণ্টব্যাটেন
২য় সংস্করণ : ৭·৪০ টাকা

•

আর জে মিনির
চার্লস্ চ্যাপলিন
দাম : ৫·০০ টাকা

•

শ্রীসরলাবালা সরকারের
অর্ঘ্য
(কবিতা-সঞ্চয়ন)
দাম : ৩·০০ টাকা

•

ত্রৈলোক্য মহারাজের
গীতায় স্বরাজ
২য় সংস্করণ : ৩·০০ টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড : ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯

সিকিম রাজ্যের প্রাসাদ গুম্ফায় একটি প্রার্থনা সভা পরিচালনা করছেন তিব্বতের দলাইলামা।

যন্ত্রভেদী কাঞ্চনজঙ্ঘা

আলোকচিত্রী : তরুণ চট্টোপাধ্যায়

আমগাছের সবুজ পত্রপুঞ্জের মাঝখানে কালো মতো কি একটা যেন রয়েছে, হঠাৎ চোখে পড়ল। কি ওটা? একটু বিস্মিত হয়ে এগিয়ে গেলাম। তারপর বুঝতে পারলাম। কোকিল। একটা নয়, দুটো। একটা বড়, আর একটা ছোট। বড়টা ধাড়ি, ছোটটা বাচ্চা। দুটোই পুরুষ, যদিও ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকিয়ে মুখোমুখি বসে' আছে দু'জনে। ব্যাপার কি! বিস্মিত হয়ে রইলাম।

কুক্, কুক্ কুক্—বড় কোকিলটা বললে।

ছোটটা নীরব।

কুক্ কুক্—আবার বললে বড়টা।

ছোট তবু নীরব।

এই রকম চলল মিনিট দশেক। মনে হল বড়টা যেন ছোটটার কানে মন্ত্র দিচ্ছে। ছোটটা নীরব হয়ে আছে বটে কিন্তু শুনছে একাগ্র হ'য়ে।

কুক্ কুক্ কুক্—আবার শুরু হ'ল। আবার চলল খানিকক্ষণ। বাচ্চাটা নড়ে' চড়ে' বসল। তারপর উড়ে গিয়ে বসল আর একটা ডালে। বড়টাও গিয়ে বসল তার পাশে। একেবারে ঘেঁসে। তারপর তার মুখের কাছে মুখ এনে আবার বলল—কুক্, কুক্। মনে হ'ল স্নেহ, অনুনয়, মিনতি যেন মূর্ত হ'য়ে উঠল ওই ডাকে।

অনেকক্ষণ পরে অবশেষে বাচ্চাটা বলল—কুক্।

সোল্লাসে চীৎকার করে উঠল ধাড়িটা—কুক্ কুক্ কুক্ কুক্, কুক্, কুক্, কুক্—।

মুখরিত হ'য়ে উঠল চারিদিক একটা সাড়া পড়ে গেল

আশপাশের গাছ থেকেও ডেকে উঠল অনেক কোকিল। ভাবটা যেন—এসেছে, এসেছে, এসেছে, এসেছে। আমাদের ডাক ডেকেছে!

তারপর হঠাৎ চোখে পড়ল একটু দূরে একটা কাক বসে আছে। করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে কোকিল-বাচ্চাটার দিকে। সে দৃষ্টির আহ্বান উপেক্ষা করতে পারল না বাচ্চাটা। উড়ে গেল কাকের কাছে। উড়ে গিয়ে তার পাশে বসে' মুখটা হাঁ করল। কাকটা খাইয়ে দিতে লাগল তাকে। খাওয়া শেষ হ'য়ে গেলে কোকিল-বাচ্চাটা আবার গিয়ে মিশল কোকিলের দলে।

রোজই দেখতাম এই কাণ্ড। কাক-মাতা কোকিল-বাচ্চাকে রোজ খাইয়ে যাচ্ছে। এতে কোকিলরাও আপত্তি করে না, কাকেরাও না। পাখীদের মধ্যে পলিটিক্স্ নেই।

সঞ্চয়

গল্প

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

০

লিফট সেদিন বন্ধ ছিল।

আমি আর আমার সহকর্মী অরবিন্দবাবু সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে তিনতলায় উঠলাম। তিনি দোতলায় একটু জিরিয়ে নিলেন। মোটা মানুষ। বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। আধময়লা পাঞ্জাবিটা ঘামে এরই মধ্যে ভিজে উঠেছে। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছি, তিনি পিছন থেকে বললেন, 'থামুন মশাই থামুন, আপনার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে হঠাৎ যদি হার্টফেল করে বসি লোকে আপনাকেই দোষ দেবে। বলবে সঙ্গের মোটা ভদ্রলোকের দিকে একবার তাকিয়েও দেখেন নি?'

কয়েক বছর আগেও মোটা বললে অরবিন্দবাবু বেশ ক্ষুণ্ণ হতেন। আজকাল নিজেই নিজেকে মোটা বলে নিজের দেহভার বহনের জন্যে অন্যের সহানুভূতির প্রত্যাশা করেন। বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে অরবিন্দবাবুর। কিন্তু আমাদের ক্ষীরোদ বসু আর মৃত্যুঞ্জয় রায়ও তো পঞ্চাশ ধর-ধর হয়েছেন কেউবা ধরেও ফেলেছেন। কিন্তু তাঁরা ইচ্ছা করলে দিব্যি বছর দশেক চুরি করতে পারেন। চল্লিশের পর একথা কার না মনে হয় বয়স চুরি করায় পাপ নেই। সংসারে এই একমাত্র নিজস্ব অপহরণ। পরের ধন পরের মন চুরি করতে গিয়ে নাকাল হয়ে নাস্তানাবুদ হয়ে এই বয়সে এসে মানুষ নিজের ঘরেই নিজে সিঁদ কাটে। নিজের মনে ধনের কাজ চালায়।

কিন্তু অরবিন্দবাবুর বয়স চুরি করবার জো নেই। চেহারা তাঁর সহায় নয়। দেহকে একটু সংস্কৃত মার্জিত করবার ঝোঁকও তাঁর মধ্যে কম। জানিনে বাড়িতে শ্রীমতী ঘোষের কাছে পঞ্চাশোর্ধ্বে বনবাসী এই আধা-সন্ন্যাসী তাঁর বৈরাগ্যের কী কৈফিয়ত দিয়ে থাকেন।

তেতলায় উঠে আমরা আমাদের ঘরে এসে বসলাম। অরবিন্দবাবু উত্তর-পশ্চিমের ছোট টেবিলটায় সরে এলেন। এখানে শুধু যে হাওয়া

আছে তাই নয় একটু নিভৃতিও আছে। পূবদিকে সিফট ইনচার্জের টেবিলের ধারে খুব ভিড় জমেছে। জানিনে কোন চমকপ্রদ খবর নিয়ে সবাই মশগুল হয়ে আছেন। সে-খবর দেশের না বিদেশের না কারো কোন ব্যক্তিগত জীবনের। কাগজের অফিসে খবরতো সব সময় লেগেই আছে।

আমাদের অপরাহ্ণের সিফট আরম্ভ হতে আরো কিছুক্ষণ দেরি ছিল। আমি অরবিন্দবাবুর সামনের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলাম।

বেয়ারা এসে ফ্যান খুলে দিল।

অরবিন্দবাবু বললেন, 'শুধু বায়ুতে কুলোবে না বাপু, এক গ্লাস জলও চাই।' তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঠাণ্ডা জল খাবেন নাকি এক গ্লাস?'

বললাম, 'আমি সব সময় গরম জলই খাই।'

তিনি হেসে বললেন, 'বেশ তো খাওয়ান না। গরম পেলে আর ঠাণ্ডা খায় কে?'

বেয়ারাকে ডেকে আমি দুকাপ চায়ের কথা বললাম। অরবিন্দবাবু খুশি হয়ে বললেন, 'তারপর আপনার লেখাটেখা চলছে কেমন? ভালো কথা, হেডমাষ্টার নামে সিনেমায় নাকি আপনার একটা বই চলছে—।'

হেসে বললাম, 'সে তো এক বছর আগের ব্যাপার। সাত আট সপ্তাহ চলেছিল।'

তিনি বললেন, 'মাত্র? একটা বইও তো লিখেছেন শুনেছি।

একটু হেসে বললাম, 'হ্যাঁ।'

আমার সহকর্মী আমার পাঠকও নন, দর্শকও নন, শুধু শ্রোতা।

চা এসে গিয়েছিল। কাপে চুমুক দিয়ে অরবিন্দবাবু বললেন, 'আপনার হেডমাষ্টার আমি পড়িওনি দেখিওনি। আমার মেয়ের মুখে গল্পটা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমার একজন হেডমাষ্টারের কথা মনে পড়ছে।'

আমি একটু চঞ্চল হলাম। হেডমাষ্টার নিয়ে যা লেখবার লিখেছি। আর পিগ্‌গির লিখতে যাচ্ছিনে। এক গল্প যদিও জীবনে বার বার ঘটে কিন্তু বারবার তা লিখতে নেই। ইতিহাস স্বচ্ছন্দে তার পুনরাবৃত্তি করতে পারে কিন্তু লেখক তার অনুকরণ করতে চাইলে তাকে উপহাস পরিহাসের পাত্র হতে হয়।

কিন্তু অরবিন্দবাবু আমাকে প্রায় একটা ধমক দিয়ে বললেন, 'এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন কেন মশাই! শুনুনই না একটু।'

বললাম, 'বলুন।'

অরবিন্দবাবু বলতে লাগলেন, 'আমাদেরও একজন হেডমাষ্টার ছিলেন। অমন মাষ্টারও আর হয় না, অমন মানুষও আর হয় না। আপনার গল্পের মত এম. ই. স্কুলের হেডমাষ্টারও নয়, হাই স্কুলের হেডমাষ্টার। খুব নামকরা হাইস্কুল ছিল আমাদের। ডিষ্ট্রিক্ট স্কলারশিপ, ডিভিসনাল স্কলারশিপ বাঁধা ছিল। একবার জেনারেল স্কলারশিপও পেয়েছিল। আমরা ক্লাস ওয়ান থেকেই তাঁর কাছে পড়েছি। অবশ্য অত নিচের ক্লাসে তিনি তো আর পড়াতেন না। তবে রোজ একবার করে সারা স্কুল টহল দিতেন। প্রথম প্রথম আমরা তাঁকে খুব ভয় করতাম। তারপর যত ওপরের ক্লাসে উঠতে লাগলাম তত তাঁকে শ্রদ্ধা করতে লাগলাম, ভালোবাসতে লাগলাম। ইংরেজী, অঙ্ক দুইই খুব ভালো জানতেন। সব সাবজেক্টের ওপরই তাঁর দখল ছিল। আমাদের ইতিহাসের শিবেনবাবু বলতেন, ইচ্ছে করলে উনি আমাদের টিচারদের নিয়েই একটা পাঠশালা খুলতে পারেন। আর পাঠশালার গুরুমশাই যেমন একা সব বিষয় পড়ান উনিও আমাদের সেইভাবে পড়াতে পারেন। কিন্তু শুধু বিদ্বান বলেই

যে ধরনের সবাই ওঁকে শ্রদ্ধা করতেন তা নয়, সৎ চরিত্রবান মানুষ বলে ওঁকে সবাই ভালোবাসতেন। কারো কারো নালিশ ছিল তিনি একটু অসামাজিক। তেমন মিশুক প্রকৃতির নন। কারো বিয়ে শ্রাদ্ধ অন্নপ্রাশনে তিনি পারতপক্ষে যেতেন না। যাত্রা-থিয়েটারের আসরে তাঁকে আমরা কেউ দেখি নি। সমবয়সীদের সঙ্গে কোন আড্ডা কি হৈ হুল্লোড়ে মেতে উঠতেও তিনি পারতেন না। শুধু স্কুল, স্কুলের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আর নিজের পড়াশুনো নিয়েই থাকতে ভালোবাসতেন। বাড়িতেও তিনি ওইরকম একক নিঃসঙ্গ ছিলেন। নিঃসঙ্গ বলা যায় না। বই তাঁর সব সময়ের সঙ্গী। তাঁর স্ত্রী নাকি বলতেন, 'এমন মানুষের বিয়ে না করাই ভালো ছিল।' তাঁর রাগ হওয়া উচিত ছিল না একথা অবশ্য তাঁর ছেলেমেয়েরা মুখ ফুটে বলত না। তবে তারা তাদের বাবাকে এড়িয়েই চলত। এ ধরনের মানুষের পারিবারিক জীবন তেমন সুখের হয় না, বুঝতেই পারেন। কিন্তু হেডমাষ্টারমশাইর বাসায় আমরা কেউ কোনদিন কগড়াঝাঁটি শুনি নি। কোন কোন বাসায় ঢুকতে গেলে কগড়ার তাণ্ডবে গালাগালি লাঠালাঠির শব্দে আমরা নিজেরাই পালিয়ে আসতাম, হেডমাষ্টারমশাইর বাসায় গিয়ে কোনদিন তেমন লজ্জায় পড়তে হয় নি। আর মনে যাই থাকুক তাঁর স্ত্রীও আমাদের সঙ্গে হেসে কথা বলেছেন, আদর করে কিছু না কিছু খেতে দিয়েছেন।

হেডমাষ্টারমশাইর আর একটু দুর্নাম ছিল। প্রমোশনের ব্যাপারে তিনি খুব কড়া। খাতায় মার্কস দেওয়ার ব্যাপারে তিনি বেশ কৃপণ। আগে আগে যেসব হেডমাষ্টার ছিলেন প্রোমোশনের ব্যাপার নিয়ে ছাত্রদের হাতে তাঁদের নানারকম নিগ্রহ হয়েছে এ কথা শুনেছি। কেউ বা মার খেয়েছেন, কারো বা ঘর পুড়েছে। কিন্তু ইনি অক্ষত ছিলেন। ওঁর আমলে স্কুলের রেজাল্ট খুব ভালো হতে থাকায় স্কুলের কমিটি ওঁকে পছন্দ করতেন। কেউ কেউ যে বিরুদ্ধে না ছিলেন তা নয়। কিন্তু হেডমাষ্টারমশাই তা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। কাউকে ভয়ও করতেন না। ভয় হত আমাদের। আমরা যাঁকে এত শ্রদ্ধা করি ভালোবাসি পাছে আর কেউ তাঁকে অপমান করে, পাছে আর কারো হাতে তাঁর কোন লাঞ্ছনা হয়।

সেবার এক কাণ্ড হল। আমরা সেবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিই। ক্লাসে আমরা তিরিশটি ছেলে ছিলাম। হেডমাষ্টারমশাই উনত্রিশটিকে অ্যালাউ করলেন, একটিকে রেখে দিলেন। তার নাম পরেশ সা। পরেশ ধনী টিম্বার মার্চেন্টের ছেলে। আগাগোড়া প্রাইভেট টিউটর রেখেছিল। তবু অ্যালাউড হতে পারল না। আমাদের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। আমরা সবাই পরীক্ষা দিতে যাব আর পরেশ পড়ে থাকবে! বড়লোকের ছেলে হলেও পরেশ দাম্ভিক ছিল না। সবাইর সঙ্গে মিশত। আর একটু তোষামোদ করে ফুলিয়ে টুলিয়ে দিলেই খুব খাওয়াত। আমরা ওর জন্যে সবাই দুঃখ পেলাম।

পরেশের বাবা নিবারণবাবু নিজে এলেন না। কিন্তু তাঁর ছোট ছেলে আর বড় ছেলেকে হেড-মাষ্টারের কাছে তদ্বিরের জন্যে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু তিনি অটল। পরেশ ইংরেজী আর অঙ্ক দুটোতেই কম পেয়েছে। পরেশের বাবা বললেন: 'allow করে দিন স্যার। সেণ্টারে গিয়েও ও না হয় ফেল করবে। তার চেয়ে তো খারাপ কিছু হবে না।' হেডমাষ্টারমশাই বললেন, 'ওর পক্ষে হবে না, স্কুলের পক্ষে হবে। একটু যদি ভেবে দেখেন ওর পক্ষেও তার পরিণাম ভালো নয়।'

এবার রঙ্গমঞ্চে আমরা নেমে পড়লাম। আমরা যে কজন ওঁর প্রিয় ছাত্র ছিলাম ওঁর বাসায় গিয়ে ওঁকে ধরলাম 'স্যার, পরেশকে অ্যালাউ করতেই হবে।' হেডমাষ্টারমশাই আমার দিকে চেয়ে

একটু হেসে বললেন, 'ফিলসফার, তুমিও এই জন্যে এসেছ?'

ক্লাসের ছাত্রদের সঙ্গে তিনিও আমাকে ফিলসফার বলতেন। তখন থেকেই আমার চেহারাটা একটু নাদুসনুদুস আর মেজাজ গুরুগম্ভীর। বোধ হয় সেইজন্যেই ওই বদনামটা হয়েছিল। আমি বললাম, 'হাঁ৷ স্যার। ওকে আমাদের সঙ্গে যেতে দিন। নইলে আমাদের সবাইরই মন খুব খারাপ হয়ে যাবে।'

এই দরবারের পর তিনি পরেশকে আলাউ করলেন। কিন্তু শুধু আলাউ করেই চুপ করে রইলেন না। তাঁর বাসায় সন্ধ্যার পর রোজ ওকে যেতে বললেন। এতদিন যাদের স্কলারশিপ পাওয়ার আশা আছে তারাই কেবল যেত। এবার আর একটি খারাপ ছেলে যেতে শুরু করল। অবশ্য এক সময় নয় একসঙ্গে নয়। পরেশের কাছে শুনেছি হেডমাস্টারমশাই তাকে খুব যত্ন করে পড়াতেন।

সেবার আমরা তিরিশটি ছেলেই পাশ করেছিলাম। দুটি স্কলারশিপ। আমরা ভেবেছিলাম পরেশ গেলেও থার্ড ডিভিসনে যাবে। কিন্তু সেও সেকেণ্ড ডিভিসনে গেল।

পরেশের বাবা খুব খুশি। তিনি পারেন তো হেডমাস্টারমশাইকে অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা দিয়ে দেন। কিন্তু হেডমাস্টারমশাই তাঁর কাছ থেকে শাল নিলেন না টাকা নিলেন না। বললেন, 'আপনি যদি কিছু দিতেই চান এক সেট এন-সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা স্কুলের লাইব্রেরীতে দিয়ে দিন। সহরসুদ্ধু লোকের কাজে লাগবে। ছেলেরা, টিচাররা পুরুষানুক্রমে পড়তে পারবে।'

প্রায় দু হাজার টাকার ধাক্কা। নিবারণবাবু আর কী করবেন! তাই দিলেন। পরে নাকি বলেছিলেন, 'হেডমাস্টারমশাইকে তো ভালো লোক বলেই জানতাম। কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে এমন জড়—!'

স্কুল ছেড়ে আসবার পরেও অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। সুযোগ পেলেই তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি। চিঠিপত্র লিখলে জবাব দিতেন। কাব্য সাহিত্য নিয়ে আলাপ করতেন। একবার তিনি আমাকে খুব এক দুঃখের সময় লিখেছিলেন: 'অরবিন্দ, জীবনে উন্নতিটাকেই খুব বড় করে দেখো না। নিজের মনকে উন্নত রেখো। সেই উন্নতিই সব চেয়ে বড়। সবাই সব কাজ পারে না, সব বস্তু পায় না: সাংসারিক সাফল্য আর অ্যাচিভ্‌মেন্টই সব সময় বড় নয়। এমন একটা সময় নিজের জন্যে রেখো এমন একটা শক্তির চর্চা গোপনে গোপনে কোরো যাতে নিজের সুখ নিজেই সৃষ্টি করে নিতে পারো। সেও এক ধরনের আর্ট। শিল্পীরা নিজেদের সৃষ্টির মধ্যে সুখী হন। আর আমরা সাধারণ মানুষ নিজেদের সুখের মধ্যে স্রষ্টা হই। শুধু লক্ষ্য রেখো তোমার সুখ যেন আর কাউকে দুঃখ না দেয়। কাউকে সুখী করতে পারো আর না পারো কাউকে দুঃখ দিয়ো না, ব্যথা দিয়ো না।'

প্রায় আশি বছর বয়স পর্যন্ত হেডমাস্টারমশাই বেঁচে ছিলেন। শেষের দিকে আমি আর কোন যোগাযোগ রাখতে পারি নি। বাড়িতে অসুখ বিসুখ নিয়ে বড় অশান্তিতে দিন কাটছিল। বলতে গেলে এখন আর কাটছে না।

কয়েক মাস আগে সেদিন হেডমাস্টারমশাইর ছোট ছেলে আমাদের এই অফিসে এসে উপস্থিত। চিনতে আর পারিনে। চেহারা টেহারা অনেক পালটে গেছে। পরিচয় দেওয়ার পর চিনতে পারলাম। তার মুখে হেডমাস্টারমশাইর মুখের আদল দেখে বড় ভালো লাগল। বিধুর মুখেই শুনতে পেলাম তার বাবা মারা গেছেন। আশ্চর্য, এই কলকাতাতেই ছিলেন, অথচ আমি কোন খবরই পাই নি।

মান অভিমান করে আর লাভ কি! বিধু তাঁর

মন্ত্রটা কাগজে তুলতে চায় খবরটা আমি একটু ভালো করে লিখে দিলাম সংক্ষিপ্ত জীবনীও লিখে দিলাম একটু খবরটা প্রেট হেডিংএ বেরিয়েছিল আমি আমার মাষ্টারমশাইর জন্যে এ ছাড়া আর কোন্ মন্ত্রমেন্ট তুলে দিতে পারি।'

অরবিন্দবাবু একটু ভাল চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'শুনেছি শেষদিন অবধি তিনি পড়াশুনো নিয়েই ছিলেন। সেই শেক্সপীয়র পড়াচ্ছেন। তিনি আমাদের বলতেন : 'আমার যখন রিটায়ার দিনেমা দেখবার ইচ্ছা হয় আমি শেক্সপীয়র খুলে বসি ' পড়তেন আর মাঝিনাট্টাদের পড়াতেন। আর মাঝে মাঝে বারান্দায় চেয়ার কি মোড়া পেতে বসে গাছপালার দিকে চেয়ে থাকতেন : পাতাগুলি স্থির হয়ে থাকত তিনি দেখতেন, বাতাসে অল্প অল্প পাতাগুলি নড়ত তিনি চেয়ে থাকতেন। সেই পাতার ওপর টুপ টুপ করে বৃষ্টি পড়ত তিনি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন। শেষপর্যন্ত বইয়ের পাতা আর গাছের পাতাই তাঁর সম্বল হয়েছিল।

আমার মনে হয় আমি তাঁর কাছ থেকে অনেক পেয়েছি। কী যে পেয়েছি তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। কিন্তু আমার অনেক দুঃখের সময় হতাশার সময় তাঁর কথা আমার মনে হয়। তাঁর কথা মনে হলে আমি শান্তি পাই।'

অরবিন্দবাবু থামলেন। তারপর চুপ করে সামনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলেন। দেয়াল কি কিছুক্ষণের জন্যে তাঁর স্মৃতির পট হয়ে উঠল? সেই পটে তিনি তাঁর কৈশোর যৌবনের কোন্ কোন্ ছবি দেখতে লাগলেন জানিনে। আমি তাঁকে দেখতে লাগলাম।

বিষম মোটা কুচকুচে কালো, দুদিনের জাত-শ্মশ্রু, ক্লান্ত বিষণ্ণ এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। প্রায় রোজই তো তাঁকে দেখি। কিন্তু রোজ যাদের দেখি তাদের তো আর রোজই দেখিনে।

কি দিলে?

সন্তোষ কুমার ঘোষ

গল্প কী করে তৈরি হয়?

অনেক অনুরাগী পাঠকই, আমার অনুমান, এ-রহস্যটি জানেন না। কাপড়ের মিল তাঁরা দেখে থাকবেন, এবং চটের কল, ঢালাই-লোহার কারখানা। কিন্তু কাহিনী-বোনার কারখানা ত চোখে দেখা যায় না?

গল্পের মাল-মশলা কী? এক কথায় জীবন। কিন্তু জীবনেরই কতখানি? যদি বলি, যতটা দেখা যায়, ঠিক হবে না। কারণ, জীবন আসলে পাটীগণিতের সেই লাঠির মত—যার এক ভাগ ওপরে, দুই ভাগ জলে, আরও এক ভাগ জলের তলায়।

তবে কি মাত্র যেটুকু দৃষ্টিগোচর, লেখকেরা সেইটুকুকেই হাজির করেন! তা যদি হত, তা-হলে কথাশিল্প অত্যন্ত সামান্য বস্তু হত, অর্থাৎ শিল্পই হত না। অগোচরকেও হাজির করার জাদু জানে বলেই কথাশিল্পের মর্যাদা।

সেই জাদু ভাবনা। তাকে বারুদ বলতে পারি। এবং দৃষ্ট বস্তু একটা কাঠি মাত্র। ছোঁয়া লাগল, কি বারুদ জ্বলল: বিস্ফোরণে সত্তা পূর্ণ হয়ে যা ছিটকে বেরুল তাই শিল্প।

• • •

খুব অল্প রেখা আর সামান্য শোনা দিয়েও অনেক সময় গল্প হয়। একটা দৃষ্টান্ত দিই।

অফিস-টাইমের বাস, প্রচণ্ড ভিড়। যত জন না বসেছে, তার দ্বিগুণ দাঁড়িয়ে। হাতল ধরে যাঁরা টাল সামলাচ্ছেন, ধরা যাক, তার মধ্যে একজনকে বলতে শোনা গেল, চাটুজ্যে মশাই, আপনি অনেক দিন আমাদের তাসের আড্ডায় আসেন নি।

—সময় পাই নি ভাই।

—উপরে-উপরি দুটো রবিবার গেল, এলেন না! ভাবলুম, কী না জানি হল। অসুখবিসুখ করল কিনা।

—না ভাই, অসুখ নয়। গত রবিবার গেছলুম শ্রীরামপুরে। ছেলের জন্যে পাত্রী দেখতে।

—ও। তার আগের রবিবার?

—একই ব্যাপার ভাই। ঘড়ন'-য়।

—ভাল। তা পছন্দ হল?

—কই আর হল! খড়ম-র মেয়েটি এমনিতে ত ভালই লেখাপড়া, গানবাজনা জানে। কিন্তু কানের ওপর বড় বড় একটা জড়ুল যে! ভুরুসুদ্ধ, জড়াধরি

—আর শ্রীরামপুরের পাত্রী?

—চোখ একটু টারা। নইলে স্বাস্থ্য-চেহারা মেটামুটি ভালই।

বাস আবার দুলতে দুলতে চলল।

এখন, ওই ভিড়ে লেখক যদি কেউ থাকেন, এবং এই আলাপ যদি তাঁর কানে গিয়ে থাকে, অবশ্যই তিনি চোখ তুলে তাকাবেন। প্রশ্নকারী আর উত্তরদাতা দুজনকেই দেখবেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

দু-জনেই প্রৌঢ়। বয়স দুজনেরই পঞ্চাশের নীচে পরে। যিনি জিজ্ঞাসা করছিলেন, তিনি এখনও সক্ষমসমর্থ, হাফ্ শার্ট ধুতির নীচে গুঁজে চলেছেন। দ্বিতীয় ভদ্রলোক তুলনায় কিছু কাহিল। ঢিলে পাঞ্জাবি আর্থিক ক্ষীণতা ঢাকতে পারে নি, বরং অনেক চোখে ধরিয়ে দিয়েছে। গাল তোবড়ানো।

—এই রবিবার আসছেন ত? (সেই কথার জের)

—কী জানি ভাই! জোর করে বলা কি যায়? তা-ছাড়া, এ-রোববারেও যাদবপুর যাবার কথা আছে

—কেন?

—আবার কেন। পাত্রী দেখতে! আমার যে পুত্রদায়।

—তা-হলে চটপট পছন্দ করে ফেলুন।

—দেখি।

সেই মুহূর্তে ভিড়ের লেখকটির মনে হতে পারে, হবে না, পছন্দ হবে না। তিনি বক্তাকে—পুত্রদায়-গ্রস্ত ভদ্রলোককে আরও খুঁটিয়ে দেখতে চেষ্টা করবেন। যেন নকল দাঁত! ডেঁড়াখোঁড়া নেবের নীচে আকাশের মত বিরল চুলের তলায় চকচকে টাক। হাতল ধরে দাঁড়া আছেন ভদ্রলোক, তবু ঈষৎ কুঁজো—নুয়ে-পড়া ভাবটা লুকোতে পারেন নি।

—দেখি। বলে যদি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে থাকেন তিনি, অর্থহীন ভঙ্গিতে হেসে থাকেন, লেখক অবশ্যই টের পাবেন।

পছন্দ হবে না, আপন মনেই লেখক বলবেন, কিছুতেই কোন মেয়েকে উনি পছন্দ করবেন না। আগামী রবিবার কনে দেখতে যাবেন, পরের রবিবার আবার। রবিবারের পর রবিবার। এই বয়সে—যখন শরীর ভেঙেছে, নকল দাঁত, তখন কোন কিছুই সরাসরি নেবার শক্তি নেই; পেটে কিছু সয় না, তখন আর গতিই বা কী আছে। এই ওঁর নেশা, এই ওঁর বিলাস। ছেলের জন্যে মেয়ে খোঁজা। চুল খুলিয়ে, হাতের গড়ন পায়ের গোছ দেখে, গান শুনে এক-একটি ছুটির বিকাল ভরে তোলা। তারুণ্যের সান্নিধ্য। ভাগে অর্ধভোজন।

মৃতদেহে সজীব ইচ্ছাকে বহন করার জ্বালা জুড়োনোর মন্দ উপায় নয়।

হঠাৎ কাউকে পছন্দ করে ঘরে তুললেই ত এ-খেলা শেষ।

কিন্তু ওঁর ছেলে! সে যদি টের পায়? যদি ধরে ফেলে বাবার এই দুর্বলতা!

সে নিজেই হয়ত কাউকে পছন্দ করে বসতে পারে। গোপনে বিয়ে সেরে যদি তাকে নিয়েই এসে দাঁড়ায়?

প্রচণ্ড একটি বিস্ফোরণ ঘটবে। থরথর করে কাঁপবেন ভদ্রলোক। চিৎকার করে লাঠি ঠুকবেন।

বাস, ওই পর্যন্তই। খুব বাড়াবাড়ি কিছু না। হঠাৎ শান্ত হয়ে বসে পড়বেন তিনি। ছেলেও চাকরে—বেশি কিছু বলাও ত যায় না। হাত তুলে আশীর্বাদ করবেন পুত্রবধূকে।

ক্ষীণ গলায় নতুন বউকেই বলবেন রোজ সকালে সেই কবিরাজী ওষুধটা এনে দিতে, আদার রস আর তুলসীপাতার অনুপানসহ যা সেব্য।

খলে ওষুধ মাড়তে মাড়তে বসবেন রকে এসে। প্রত্যহ ভোরে। আর পিঠে যখন রোদ লাগবে তখন খুলে বসবেন খবরের কাগজ;—সেই পাতাটা যেখানে কলমের পর কলম জুড়ে সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী সুনিপুণা পাত্রীদের বর্ণনা।

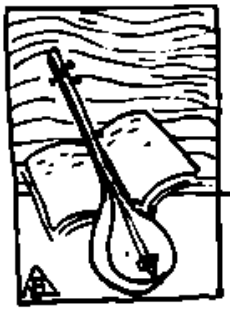

উনিশ শতকের গীতিকাব্য ও রবীন্দ্রনাথ

ড: অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

বাংলা কাব্যের হাজার বছরের ইতিহাস রবীন্দ্রনাথে এসে পূর্ণতা লাভ করেছে, একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য তা রবীন্দ্রনাথেই থেমে যায় নি, তারপরও এগিয়ে চলেছে। তথাপি শতাব্দীর অধীশ্বর রবীন্দ্রনাথ আরো বহু বছর আমাদের জীবনে-সাহিত্যে-শিল্পে কেন্দ্রীয় প্রভাবশক্তিরূপে বিরাজ করবেন, একথাও স্বীকার্য।

এই অমিতশক্তি কবিপ্রতিভার উদ্ভব কেমন করে হল, কোন্ মানস পরিবেশে তা বেড়ে উঠেছিল, তা কি অমূল-তরু না দেশের চিত্তভূমিতে তার উৎপত্তি: এসব কথা জানতে স্বভাবতই রবীন্দ্রানুরাগী মাত্রেরই কৌতূহল হয়। এই কবিপ্রতিভার গঙ্গোত্রী থেকে মোহনা পর্যন্ত পথ-পরিক্রমার শেষে তাঁর কথাতেই বলতে ইচ্ছা করে: 'হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা!'

এখানে উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের সার্বিক নবজাগরণের পটভূমিতে কবি রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের কাব্যগত মূল্য নিরূপণের পূর্বে তাঁর দুটি উক্তি স্মরণ করা যাক। দুটি উক্তিই উনিশ শতকের বাংলা দেশের জেনেসিস্ সম্পর্কে। এক্ষেত্রে স্মর্তব্য কবির জন্ম হয়েছিলো ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে।

কবি বলেছেন: "যাঁরা আমাকে জানবার কিছুমাত্র চেষ্টা করেছেন এতদিনে অন্তত তাঁরা একথা জেনেছেন যে, আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করি নি। আমি চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ আমার কখনো তাতে ক্লান্ত হলো না, বিস্ময়ের অন্ত পাই নি।.....সৌরমণ্ডলীর প্রান্তে এই আমাদের ছোটো ভ্রমণ পৃথিবীকে কতুর আবোজ্জ্বতগুলি বিচিত্র রসের বর্ণলজ্জায় সাজিয়ে দিয়ে যায়, এই আদরের অনুষ্ঠানে আমার হৃদয়ের অভিষেকবারি নিয়ে যোগ দিতে কোনোদিন আলস্য করি নি।"

কবি নবীন জগতের মানুষ; প্রাণশক্তির উপাসক। তাই তাঁর পক্ষে সহজেই চিরাগত সংস্কারের শৃঙ্খল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসা সম্ভবপর হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণকে এই সংস্কারমুক্ত নবীন দৃষ্টিতেই দেখেছিলেন, বলেছিলেন, "যাঁরা বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাস অনুসরণ করেছেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে একটি কথা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, এই সাহিত্য দুই ভাগে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এর দুই ধারা দুই উৎস থেকে নিঃসৃত। আধুনিক বাংলা কবিতার উৎপত্তি য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় তাতে সন্দেহ নেই। এই নিয়ে অপবাদ দেওয়া হয় যে, এসব জিনিস ন্যাশন্যাল নয়। তার মানে যদি এই হয় যে, এ সব কাব্য স্বভাবতই বাঙালি জাতির রুচিবিরুদ্ধ, তাহলে তো এ জমিতে স্বতই উঠত না, এর অঙ্কুর উঠলেও শিকড়শুদ্ধ দুদিনে যেত শুকিয়ে, বলা বাহুল্য তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।.....আধুনিক কাব্য আপন বেগেই দেশের চিত্তে আপনার পথ গভীর ও প্রশস্ত করে দিয়েছে।.....বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রবর্তনা যে এত দ্রুতগতিতে নানাপথে নানা রূপ নিয়ে এগিয়ে চলেছে তার কারণ সেই সাহিত্যের আদর্শ হঠাৎ বাঙালির মনকে বাঁধা পড়ি থেকে মুক্তি দিয়েছে। তার মধ্যে একটা কৌতূহলী প্রাণশক্তি আছে যা নব নব পরীক্ষার পথে আপনাকে নূতন করে আবিষ্কার

করতে উদ্যত। সে চিরপ্রবহমান প্রবাহ বাধার উপর দিয়ে বারে বারে উচ্ছল হয়ে চলেছে। এই প্রাণশক্তির জিয়ন-কাঠি একটিমাত্র সুরে বাংলা ভাষাকে স্পর্শ করল। বস্তুতই যেমন ভরা সাড়া দিয়ে জেগে উঠল, ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে এমন ঘটে নি। তারপর থেকে বাঙালির ভাবপ্রবণ মনের পরিপ্রেক্ষিকা সাহিত্যসৃষ্টিতে বিস্তীর্ণ হয়ে গেল।" ['বাংলা কাব্য পরিচয়', ভূমিকা]

এই জাগরণের সার্থক পরিচায়ক উনিশ শতকের বাংলা গীতিকবিতা। রবীন্দ্র-প্রতিভার আবির্ভাব ঘটলো এই পটভূমিতে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনার শ্রীসজনীকান্ত দাস কৃত তালিকা এখানে উদ্ধার করছি (দ্রঃ 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য', পৃঃ ১০৪)—

১। 'অভিলাষ'—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ১৮৭৪ নভেম্বর-ডিসেম্বর

২। 'হিন্দুমেলার উপহার'—'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় ফাল্গুন ১৮৭৫, ২৪শে ফেব্রুয়ারী।

৩। 'প্রকৃতির খেদ'—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ১৮৭৫ জুন।

৪। 'জল জল চিতা'—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকে ১৮৭৫, ১০ই নভেম্বর।

৫। 'প্রলাপ' (১, ২, ৩)—'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব'এ ১৮৭৬, ২৪শে ফেব্রুয়ারী হইতে।

৬। 'চলিনু না অয়ি ভারতসাগর'—১৮৭৭ সনে হিন্দু-মেলায় পঠিত ; জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' নাটকে ১৮৮২।

৭। 'অয়ি বিষাদিনী বীণা'—'জাতীয় সঙ্গীত' প্রথম ভাগ, ২য় সংস্করণে ১৮৭৮, ৩০ আগষ্ট।

৮। 'তারত রে তোর কলঙ্কিত'—ঐ ঐ ঐ ১৮৭৮, ৩০ আগষ্ট।

৯। 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন'—জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের 'পুরুবিক্রম' নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণ।

এ ছাড়া, 'ম্যাকবেথ' ও 'কুমারসম্ভব' কাব্যানুবাদ এবং 'বৈষ্ণব সংগীত' ও 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র অন্তর্ভুক্ত (১৮৭৭ খ্রীঃ জুলাই, ১২৮৪ শ্রাবণ থেকে 'ভারতী' মাসিক পত্রিকায় প্রথম মুদ্রিত) কবিতা ও গান কিশোর কবির প্রথম সাহিত্যসম্ভার বলে গণ্য হতে পারে।

উপরুক্ত নাটি কবিতাই কিশোর রবীন্দ্রনাথের তেরো থেকে সতেরো বৎসর বয়সের রচনা। প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ এগুলির মধ্যে দেখা যায় না, একথা স্বীকার করতেই হয়। মধুসূদন-বিহারীলাল-হেমচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-অক্ষয় চৌধুরীর নিছক অনুকরণ ও কালিদাস-শেক্সপীয়ারের বিশ্বস্ত অনুবাদচেষ্টাই এগুলিকে গণ্য করতে হয়। দিব্য কাব্যপ্রেরণার প্রথম স্ফুলিঙ্গটি লক্ষ্য করা গেল 'অবসাদ' কবিতায় ('বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা আঃ ১৮৭৪ খ্রীঃ)। কবিতার শেষে লেখা আছে 'বালক' রচিত, আর সূচীপত্রে লেখা আছে—রচয়িতা "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বাল্যকালের লেখা)"। এই আবিষ্কারের গৌরব দাবি করতে পারেন শ্রীসজনীকান্ত দাস (দ্রঃ "রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য", পৃঃ ১০৭)।

প্রতিভার প্রথম স্ফুলিঙ্গ এই 'অবসাদ' কবিতায় আছে। অমের মূল্যবান দুর্লভ কবিতাটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি—সন্ধ্যাসংগীত-মানসী-চিত্রার কবিকে এখানে রসিক পাঠক আবিষ্কার করে বিস্মিত আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠবেন, সমস্ত মনে বলে ওঠে—পেয়েছি, গঙ্গোত্রীকে পেয়েছি, উষার প্রথম আলোর চরণধ্বনি শুনতে পেয়েছি।

প্রাক্‌সন্ধ্যাসংগীত-পর্বের এই কবিতাটি নিঃসঙ্গ মহিমায় বিরাজমান। সম্পূর্ণ কবিতাটি এই :

ধরাসখি, বাসি, বীণাখানি,
জাগাও—জাগাও, দেবি, উঠাও আমারে দীন হীন !
ঢাল' এ হৃদয়মাঝে জলন্ত অনলময় বল !
দিনে দিনে অবসাদে হইতেছি অবশ মলিন ;
নির্জীব এ হৃদয়ের দাঁড়াবার নাই যেন বল !
নিদাঘ-তপন-শুষ্ক ম্রিয়মাণ লতার মতন
ক্রমে অবসন্ন ঘোরে পড়িতেছি ভূমিতে লুটায়ে,
চারিদিকে চেয়ে দেখি শ্রান্ত আঁখি করি উন্মীলন—
বন্ধুহীন—প্রাণহীন—জনহীন—হুহু হুহু হুহু—
আঁধার—আঁধার সব—নাই জল নাই স্থল তরু,—
নির্জীব হৃদয় মোর ভূমিতলে পড়িছে লুটায়ে ;
এস দেবি, এস, মোরে,
রাখ এ মূর্ছার ঘোরে ;
বলহীন হৃদয়েরে দাও দেবি, দাও গো উঠায়ে !

দাও দেবি সে ক্ষমতা, ও গো দেবি, শিখাও সে মায়া—
যাহাতে জগত হয় নিরানন্দ মরুমাঝে থাকি
হৃদয় উপরে পড়ে যবনের নন্দনের ছায়া,—
তুমি সুহৃদের হয় থাকিলেও বিজনে একাকী!
দাও দেবি সে ক্ষমতা, যাহে এই নীরব শ্মশানে,
হৃদয়-প্রমোদ-বনে বাজে সদা আনন্দের গীত!
মুমূর্ষু মনের ভার—
পারি না বহিতে আর—
হইতেছি অবসন্ন—বলহীন চেতনারহিত—
অজ্ঞাত পৃথিবীতলে—অকর্মণ্য—অনাথ—অজ্ঞান—
উঠাও উঠাও মোরে—করহ নূতন প্রাণ দান!
পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে যুঝিব—যুঝিব দিবারাত—
কালের প্রস্তর-পটে লিখিব অক্ষয় নিজনাম।
অবশ নিদ্রায় করিব না এ শরীর পাত,
মানুষ জন্মেছি যবে করিব কর্মের অনুষ্ঠান!
দুর্গম উন্নতি পথে পৃথি তরে গঠিব সোপান,
তাই বলি দেবি—
সংসারের তরোদ্যম, অবসন্ন, দুর্বল পথিকে
কর গো জীবন দান তোমার ও অমৃত নিঝরে!

বীণাপাণির শরণার্থীর কণ্ঠস্বরে 'এবার ফিরাও মোরে' (চিত্রা) কবিতার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় যে দিব্য প্রেরণা ও অপার বেদনার কথা বলা হয়েছে, এখানে সে প্রেরণা ও বেদনার প্রথম ইশারা পাই। 'কালের প্রস্তর-পটে লিখিব অক্ষয় নিজনাম'—এই স্পন্দিত ঘোষণা একমাত্র প্রতিভারই সাজে, পরবর্তী ষাট বছরের কাব্যসাধনায় এই ঘোষণা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। জীবন-স্মৃতির দুটি অধ্যায়ে ('প্রত্যাবর্তন' ও 'সাহিত্যের সঙ্গী') মহর্ষির সঙ্গে হিমালয়-ভ্রমণান্তে প্রত্যাবৃত্ত বারো বছরের বালকের মনোভাব রবীন্দ্রনাথ নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষায় প্রবল বিরাগ ও কবিতায় মুক্তি অন্বেষণ তখন বালকের জীবনে প্রবল হয়ে উঠেছিল। দুটি উক্তি 'অবসাদ' প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। 'প্রত্যাবর্তন' অধ্যায়ে কবি বলছেন: "আমি বেশ বুঝিতাম, মনুষ্যসমাজের বাজারে আমার দর কমিয়া যাইতেছে কিন্তু তবু যে বিদ্যালয় চারিদিকের জীবন ও সৌন্দর্যের সংগে বিচ্ছিন্ন জেলখানা ও হাসপাতাল জাতীয় একটা নির্মম বিভীষিকা, তাহার নিত্য-আবর্তিত ঘানির সংগে কোনমতেই আপনাকে জুড়িতে পারিলাম না।" তাই বারবারই স্কুল একাডেমী ও সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে নানাছলে পলায়ন।

আর 'সাহিত্যের সঙ্গী' অধ্যায়ে এই সময়ের (১৮৭৩-এর মাঝামাঝি) বর্ণনা: "হিমালয় হইতে ফিরিয়া আসার পর স্বাধীনতার মাত্রা কেবলই বাড়িয়া চলিল। চাকরদের শাসন গেল, ইস্কুলের বন্ধন নানা চেষ্টায় ছেদন করিলাম, বাড়িতেও শিক্ষকদিগকে আমল দিলাম না।...বাড়ির লোকেরা আমার হাল ছাড়িয়া দিলেন। কোনোদিন আমার কিছু হইবে এমন আশা, না আমার না আর কাহারও মনে রহিল। কাজেই কোনকিছুর ভরসা না রাখিয়া আপন মনে কেবল কবিতার খাতা ভরাইতে লাগিলাম।...উহার মধ্যে আমার যেটুকু সে কেবল একটা অশান্তি, ভিতরকার একটা দুরন্ত আক্ষেপ। যখন শক্তির পরিণতি হয় নাই অথচ বেগ জন্মিয়াছে তখন সে একটা ভারি অন্ধ আন্দোলনের অবস্থা।"

এই ধিক্কার ও অবসাদে, লাঞ্ছনা ও নৈরাশ্য, অশান্তি ও আক্ষেপের মধ্যে প্রতিভার ব্যাকুল প্রার্থনা:

দয়াময়ি বাণি, বীণাপাণি,
জাগাও জাগাও দেবি, উঠাও আমারে দীন হীন।...
অজ্ঞাত পৃথিবী তলে—অকর্মণ্য—অনাথ—অজ্ঞান—
উঠাও উঠাও মোরে—করহ নূতন প্রাণ দান!
পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে যুঝিব—যুঝিব দিবারাত—
কালের প্রস্তর-পটে লিখিব অক্ষয় নিজ নাম।

কাব্যসরস্বতী তাঁর ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলেন—সুবিপুল রবীন্দ্রসাহিত্য তার প্রমাণ।

॥ ২ ॥

উনিশ শতকের গীতিকবিতার পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনাকে স্থাপিত করলে দেখা যাবে যে রবীন্দ্র-প্রতিভা অমূলতরু নয়, তা আপনাতে আপনি বিকশিত হয় নি, সমকালীন কাব্যভূমি থেকেই জীবনরস আহরণ করেছিল।

গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দুজন শক্তিশালী যুগপ্রবর্তক কাব্যের দুটি বিশিষ্ট রীতিতে দু পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। একদিকে মধুসূদন দত্ত, তাঁর বাহন ক্লাসিক মহাকাব্য,

আরেকদিকে বিহারীলাল চক্রবর্তী, তাঁর বাহন রোমান্টিক গীতিকাব্য। বাংলা কাব্য সেদিন এই দুই পথের মোড়ে বসে ভাবছিল—কোন্ পথে সে যাবে? এই প্রশ্নের সার্থক উত্তর পাই রবীন্দ্র-কাব্যে।

সেদিন এই প্রশ্নের উত্তর সহজসাধ্য ছিল না, কেননা পথ নানা জটিল জালে আকীর্ণ ছিল। বিশুদ্ধ ক্লাসিক পর্ব বাংলা কাব্যেতিহাসে কখনই দেখা যায় নি। ইংরেজি কাব্যের পথানুসরণে বাংলা কাব্যে একটানা ক্লাসিক পর্বের অন্তে রোমান্টিক পর্ব আসে নি। এই ছন্দে মহাকাব্য, কাহিনীকাব্য এবং রোমান্টিক গীতিকাব্য একই সময়ে লিখিত হয়েছিল। কেবল তাই-ই নয়। যিনি মহাকাব্য বা মহাকাব্যোচিত দীর্ঘ কাহিনীকাব্য লিখেছেন, তিনিও রোমান্টিক কবিকল্পনাকে একবারে উপেক্ষা করেন নি, বরং গীতিপ্রবণতা তাঁদের কাব্যে প্রভাব বিস্তার করেছে। এ যুগের কবিরা সজ্ঞানে সচেতনভাবে ক্লাসিক কাব্যের মধ্যে গীতিকবিতার ধর্মিন হাওয়া আমদানি করে এনেছিলেন। মধুসূদন হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র একাধারে ক্লাসিক ও রোমান্টিক কবি। সুতরাং বাংলাকাব্যের কোন নির্দিষ্ট বিশুদ্ধ ক্লাসিক পর্ব ছিল না।

এই জটিল আবর্তের মধ্যে কিশোর রবীন্দ্রনাথও পড়েছিলেন। তদানীন্তন প্রতিষ্ঠিত অগ্রজ কবিদের প্রভাব তাঁর উপরও পড়েছিল। 'বনফুল' (রচনা: ১৮৭৬, প্রকাশ: ১৮৮০) থেকে 'প্রভাতসঙ্গীত' (১৮৮৩)—এই আট বছর কিশোর কবি পথসন্ধান করেছেন। এই সময়ে (১৮৭৬-৮৩) রচিত রবীন্দ্ররচনার তালিকা:

১৮৭৮	কবিকাহিনী	(কাহিনীকাব্য)
১৮৮০	বনফুল	(ঐ)
১৮৮১	ভগ্নহৃদয়	(ঐ)
	বাল্মীকি-প্রতিভা	(গীতিনাট্য)
	রুদ্রচণ্ড	(নাটিকা)
	য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র	(ভ্রমণ)
১৮৮২	সন্ধ্যাসংগীত	(গীতিকাব্য)
	কালমৃগয়া	(গীতিনাট্য)
১৮৮৩	বৌঠাকুরাণীর হাট	(উপন্যাস)
১৮৮৩	বিবিধ প্রসঙ্গ	(প্রবন্ধ)
	প্রভাত সংগীত	(গীতিকাব্য)

এই তালিকা থেকে প্রমাণিত হয় যে গোড়া থেকে রবীন্দ্রনাথ তিনটি বাহন নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন: কাহিনী-কাব্য, নাটক, ও গীতিকবিতা। বনফুল ও কবিকাহিনীর পরে কাহিনীকাব্য রচনা ছেড়ে দেন, বাকি রইল নাটক ও গীতিকবিতা। বাল্মীকি-প্রতিভাকে বাদ দিলে দেখা যায়, রুদ্রচণ্ড নামক ট্রাজেডি দিয়ে তিনি নাট্যরচনা শুরু করেন; প্রচলিত ট্রাজেডি রচনা থেকে শুরু করে নানাবিধ রীতির পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পরিণত বয়সে তিনি স্বকীয় নাট্যরীতিতে উপনীত হন।

গীতিকবিতাই রবীন্দ্র-প্রতিভার বাহন, একথা অনস্বীকার্য। কাহিনী-কাব্য ও ট্রাজেডি রবীন্দ্র-প্রতিভার অনুকূল নয়, একথাও অস্বীকার করা যায় না। তবে তিনি কেন ঐ দুই জাতীয় রচনা দিয়েই সাহিত্য-জীবন শুরু করেছিলেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে সমকালের সাহিত্য-পরিবেশটি স্মর্তব্য। ঐ সময়ে কাব্যজগতে রাজত্ব করছিলেন মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল। "মাইকেল-হেমচন্দ্রের ঘটনা-প্রধান বহির্মুখী মহাকাব্য; বিহারীলালের ঘটনাবিরল গীতিপ্রধান অন্তর্মুখী দীর্ঘকাব্য: এ দুয়ের আকর্ষণ রবীন্দ্র-নাথকে প্রথমে কাহিনীকাব্যের পথে পরিচালিত করিয়াছিল। অবশ্য মাইকেল-হেমচন্দ্র অপেক্ষা বিহারীলালের কাব্যের প্রভাবই তাঁহার কাহিনীকাব্যে অনেক বেশি।" (শ্রীপ্রবোধনাথ বিশী—'রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর')। বনফুল ও কবিকাহিনী—রবীন্দ্রনাথের এই দুই কাহিনীকাব্য তাই সেদিনের প্রচলিত সাহিত্যপ্রথার অনুসৃতি মাত্র।

এর পর ভগ্নহৃদয়। "নাটক ও গীতিকবিতার সীমান্ত প্রদেশের রচনা ভগ্নহৃদয়; তাহার খানিকটা নাটকীয়, খানিকটা কাব্যীয়: বহির্লক্ষণ নাটকের অন্তর্লক্ষণ কাব্যের; বেশ বোঝা যায়, দুই শ্রেণীর রচনাই কবির মনকে টানিতেছে; আবার কবিকাহিনী বনফুল রচয়িতার কলমও একেবারে বিশ্রুতি লাভ করে নাই, সেও মাঝে মাঝে দেখা দিয়া গিয়াছে। কাহিনীকাব্য, নাটক ও গীতিকাব্যের ত্রিমুখ প্রভাবে ভগ্নহৃদয়ের সৃষ্টি। ইহা রবীন্দ্রকাব্যের তেমাথার মোড়; এখানে আসিয়া কবিকে স্থির করিতে হইয়াছে কোন্ পথ তিনি অবলম্বন করিবেন। এই জন্যই এই কাব্যের মূল্য এত অধিক।" (তদেব)

বনফুল ও কবিকাহিনীতে "গল্পের ক্ষীণ সূত্রে লিরিকের মালা গাঁথা হইয়াছে, গল্প গৌণ হইয়া পড়িয়া লিরিক মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। পরবর্তী কালে এই লিরিক প্রেরণাই গল্পের কাঠামো মুক্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার রূপ ধারণ করিয়াছে।" (ভূদেব) বনফুল, কবিকাহিনী, ও ভগ্নহৃদয়—এই তিন কাহিনীকাব্য কবির প্রচলিত প্রথানুবর্তন ও আপন স্বভাবের অনুকূল পথাবিষ্কার-প্রয়াসের প্রামাণ্য দলিল।

এখন কাহিনীকাব্য বিদায় গ্রহণ করেছে, কিন্তু নাটক গীতিকবিতার সহজ স্ফূর্তিতে বাধা দিচ্ছে। কবির লিরিক ও নাটকের প্রকাশ-তালিকা এখানে দিলাম :

সন্ধ্যাসংগীত	১৮৮২	প্রকৃতির প্রতিশোধ	১৮৮৪
প্রভাতসংগীত	১৮৮৩	নলিনী	১৮৮৪
শৈশবসংগীত	১৮৮৪	রাজা ও রাণী	১৮৮৯
ছবি ও গান	১৮৮৪	বিসর্জন	১৮৯০
কড়ি ও কোমল	১৮৮৬		
মানসী	১৮৯০		

এই তালিকা দেখলে বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথের নাটক ও গীতিকবিতা সমান্তরাল ভাবে চলেছে, কিন্তু গীতিকবিতা অপেক্ষা নাটকের পরিণতি ও পূর্ণতা আগেই ঘটেছে। রাজা ও রাণী, ও বিসর্জন—এই দুই ট্রাজেডি রবীন্দ্রনাথের ট্রাজেডি-রচনার পরীক্ষোত্তীর্ণ ফল; নিখুঁত পরিপূর্ণ ফল। এর পর রবীন্দ্রনাথের মনোযোগ অন্যদিকে ধাবিত হয়েছে, ট্রাজেডি রচনায় আর আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় না; পরবর্তী কালে রচিত ট্রাজেডিতে অন্য গুণ প্রাধান্য লাভ করেছে।

কবি তখন ট্রাজেডি ছেড়ে গীতিকবিতার দিকে ঝুঁকলেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তিনি অত শীঘ্র ও অত সহজে পরিণতিতে উন্নীত হন নি।

ভাগ্যদেবীর দ্বিধা-বিভক্ত পথের মোড়ে রবীন্দ্রনাথ থমকে দাঁড়িয়ে ছিলেন—এবার কোন্ পথে? এর পরই পাই শৈশবসংগীত (রচনা ১৮৭৭-৮০; প্রকাশ ১৮৮৪)। গীতি-কবিতার বিলম্বিত পরিণতির কারণ শৈশবসংগীতে পাওয়া যায়।

"শৈশবসংগীতে অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তু কি? 'ফুলবালা', 'ফিরিবালা', 'অপ্সরা প্রেম', 'কামিনী ফুল', 'গোলাপবালা', 'ফুলের ধ্যান', 'প্রভাতী' ইত্যাদি। এসব বিষয় কবিরা তখনই গ্রহণ করিয়া থাকে যখন জীবনের সঙ্গে তাহাদের পূর্ণ পরিচয় ঘটে নাই।...এই জীবনপরিচয়ের ঐকান্তিক অভাব শৈশব-সংগীতে।...এই সময়ের নাটক যে অনেক বেশি পরিণত তাহার কারণ জীবনপরিচয়ের জন্য কবিকে নিজের অভিজ্ঞতার জগতে হাতড়াইয়া বেড়াইতে হয় নাই। নাটকের গল্পাংশেই তিনি তাহা হাতের কাছে পাইয়াছেন।...শৈশবসংগীতের প্রধান গুণ জীবনপরিচয় নহে, কবিতার গীতিসম্পদ।" (ভূদেব)

সুখের বিষয় এই যে, গীতিকবিতার পরীক্ষা তাঁকে দীর্ঘকাল করতে হয় নি। শৈশবসংগীত রচনার পরেই সন্ধ্যাসংগীতের অধিকাংশ কবিতা রচিত। সন্ধ্যাসংগীত রচনার পর কবির আর সন্দেহ ছিল না যে, গীতিকবিতাই তাঁর যোগ্য ও সত্য বাহন। সেকারণেই সন্ধ্যাসংগীতের মূল্য এত বেশি। এর পর প্রভাতসংগীত। কবিতা মুক্ত করার দিন শেষ হল, কিশোর কবিবশঃপ্রার্থী এইবার পরিণত কবি হলেন, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হল। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় রবীন্দ্রকাব্যের তিনটি মূল তত্ত্ব প্রকাশ লাভ করেছে— (ক) আত্মসচেতনতা : 'জাগিয়া উঠেছে প্রাণ'; (খ) সেই জাগ্রত প্রাণের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের দ্বন্দ্ব : 'ওরে চারিদিকে মোর, একি কারাগার ঘোর'; এই বদ্ধ কারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও প্রাণপ্রতিষ্ঠার সংকল্প : 'আমি ভাঙিব পাষাণকারা'; (গ) এই প্রতিষ্ঠার অর্থ জীবনে সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ বিকাশ : 'কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া, রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া, রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া' জীবনকে বিকশিত করাই এর উদ্দেশ্য। মানসী কাব্যে রবীন্দ্রপ্রতিভা আপন শক্তিতে ও প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো, একটা স্পষ্ট আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা ও সাধনার পরিচয় কবি দিলেন। প্রাক্-সন্ধ্যাসংগীত পর্বে হেমচন্দ্র-বিহারীলালের প্রভাব কিছু কিছু ছিল, মানসীতে এসে রবীন্দ্রনাথ সকল বহিঃপ্রভাব কাটিয়ে উঠলেন, আপন চিরুণীল আলিয়ে তারই আলোকে নোতুন পথে যাত্রা করলেন।

॥ ৩ ॥

কিশোর রবীন্দ্রনাথের কবিতায় হেমচন্দ্র ও বিহারীলালের প্রভাবই বেশি। মধুসূদন ও নবীনচন্দ্রের প্রভাব বিশেষ

লক্ষ্য করা যায়। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতি ও কবিদের এনেই বিশেষত্ব যে কিশোর রবীন্দ্রনাথ কুলেও মাইকেলের দিকে আকৃষ্ট হন নি। মাত্র একটি ক্ষেত্রে—'বনফুল' কাহিনীকাব্যের তৃতীয় সর্গে কমলা-নীরজার কথোপকথন মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গের সীতা-সরমা-সংবাদের অনুরূপ। এ ছাড়া আর কোন প্রভাব নেই। আর মাইকেলী অমিত্রাক্ষরে ও রাবীন্দ্রিক অমিত্রাক্ষরে প্রভেদটাই বড়, মিল নেই। রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম পর্বে নবীনচন্দ্রের প্রভাব নেই। কারণ নবীনচন্দ্রের বহুখ্যাত রচনার সময় রবীন্দ্রনাথের শৈশব রচনার পরে। হেমচন্দ্রের প্রভাব শৈশবসংগীতেই বেশি। সন্ধ্যাসংগীতে কবি এইসব কবিপ্রভাব কাটিয়ে উঠেছেন ও নিজস্ব পথ আবিষ্কার করেছেন।

হেমচন্দ্রের প্রভাব বালক রবীন্দ্রনাথের রচনায় লক্ষ্য করা যায়। বালক রবীন্দ্রনাথের 'অভিলাষ' ও 'হিন্দু মেলায় উপহার' কবিতা দুটিতে হেমচন্দ্রের প্রভাব লক্ষণীয়। প্রথমটি নীতিমূলক, দ্বিতীয়টি দেশপ্রীতিমূলক কবিতা। হেমচন্দ্রীয় রূপকচিত্রণ ও নীতি-আরোপ-প্রবণতা এখানে লক্ষ্য করা যায়। হেমচন্দ্রের 'ভারত-বিলাপ', 'কালচক্র', 'ভারতসংগীত' (কবিতাবলী), 'কি হবে কাঁদিয়া' (চিত্ত-বিকাশ), 'মরমসাধন' (বিবিধ কবিতা) প্রভৃতি কবিতার ভাব ও ভাষার সঙ্গে এই দুটি কবিতার সাদৃশ্য আছে।

শৈশবসংগীতের কবিতায় হেমচন্দ্রের প্রভাব আরো স্পষ্ট। যেমন, রবীন্দ্রনাথের পূর্ণিমানিশি বর্ণনা :

আজি পূরনিমা নিশি
তারকা কাননে বসি
অলস নয়নে শশী—
মৃদু হাসি হাসিছে।
পাগল পরাণে ওর
লেগেছে ভাবের ঘোর
যামিনীর পানে চেয়ে
কি যেন সে ভাবিছে। [শৈশব সংগীত]

তুলনীয় হেমচন্দ্রের অনুরূপ বর্ণনা :

আহা কি সুন্দর নিশি, চন্দ্রমা উদয়
কৌমুদীরাশিতে যেন ধৌত ধরাতল
সমীরণ মৃদু মৃদু সুগন্ধমু বয়
কল কল করে ধীরে তরঙ্গিণীজল
['যমুনাতটে', কবিতাবলী]

প্রকৃতিবর্ণনায় হেমচন্দ্রের একটা দৃষ্টিভঙ্গী ছিল—মানবের চিন্তার সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক কবি আবিষ্কার করেছিলেন। প্রাক্-বিহারীলাল-পর্বে এই প্রকৃতিবোধ প্রশংসার্হ। প্রকৃতির স্পর্শের মধ্যে হেমচন্দ্র ব্যথিত মনের সান্ত্বনা অন্বেষণ করেছেন :

কে আছে এ ভূমণ্ডলে যখন পরাণ
জীবনপিঞ্জরে কাঁদে যমের তাড়নে
যখন পাগল মন ভাবে এ শ্মশান
ধায় ক্ষুব্ধ দিবানিশি প্রাণ অন্বেষণে,
তখন বিজন বন শান্ত বিভাবরী,
শান্ত নিশানাথ-জ্যোতি বিমল আকাশে,
প্রশান্ত নদীর তট পর্বত উপরি
কার না তাপিত প্রাণ জুড়ায় বাতাসে।
['যমুনাতটে', কবিতাবলী, ১৮৭০]

কিশোর রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ ভাষা-ভাবনা প্রকাশ করেছিলেন :

কে আছে এমন যার এ হেন নিশীথে,
পুরানো সুখের স্মৃতি উঠেনি উথলি।
কে আছে এমন যার জীবনের পথে
এমন একটি সুখ যায় নি হারায়ে,
যে হারা সুখের তরে দিবানিশি তার,
হৃদয়ের একদিক শূন্য হয়ে আছে।
এমন নীরব রাত্রে সে কি গো কখনো
ফেলে নাই মর্মভেদী একটি নিশ্বাস ?
['কবিকাহিনী' (১৮৭৮), তৃতীয় সর্গ]

প্রকৃতিবর্ণনায় কিশোর কবি আর এক জনের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। কবির অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ রূপক কাব্যটিতে যে স্বপ্নলোক নির্মাণ করেছিলেন, তার সৌন্দর্যে অনুজ কবি মুগ্ধ হয়েছিলেন। স্বপ্নপ্রয়াণের বর্ণনা রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল। তার পরিচয় পাই পাতাল বর্ণনায়—

গম্ভীর পাতাল ! যথা কালরাত্রি করাল যমনা
বিস্তারে একাধিপত্য। খসয়ে অমৃত কণিকণা
দিবানিশি কাটি রোষে ; ঘোর নীল বিবর্ণ অনল
শিখাসঙ্ঘ আলোড়িয়া ধাপাধাপি করে অবিরল ॥
[ঋষিপ্রয়াণ (১৮৭৫), পঞ্চম সর্গ]

এর সঙ্গে তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের শ্মশান বর্ণনা—

গভীর আঁধার রাত্রি শ্মশান ভীষণ।
ভয় যেন পাতিয়াছে আপনার আঁধার আসন।
সরসর মরমরে সুদূরে তটিনী বহে যায়।
প্রাণ আকুলিয়া বহে ধূমময় শ্মশানের বায়।
[বনফুল (১৮৮০), সপ্তম সর্গ]

বর্ণনাভঙ্গী ও দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দের অনুসৃতি এখানে অতি স্পষ্ট।

এই বাহ্য, কেননা এইসব প্রভাব অল্পকাল মাত্র স্থায়ী হয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথের নিজ স্বীকৃতি ও রচনার সাক্ষ্য অনুসারে একথা বলা যায় বিহারীলালের প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশি, কিন্তু তাও বেশিদিনের জন্য নয় ; সন্ধ্যাসংগীতে এসে এই প্রভাবও অপসৃত হয়েছে।

যে সময়ে মাইকেলের প্রভাবে বাংলাকাব্য প্রধানত বহির্মুখী ছিল, তখন বিহারীলালের কাব্যে অন্তর্মুখীনতা প্রাধান্য লাভ করেছে। এই অন্তর্মুখীনতার ইশারা রবীন্দ্রনাথকে পথের সন্ধান দিয়েছিল, এর বেশি আর কিছু নয়। "আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে কবির নিজের কথা" প্রথম বিহারীলালই শোনালেন, একথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন (দ্রঃ 'আধুনিক সাহিত্য')। বঙ্গসুন্দরী ও সারদামঙ্গল কাব্যের নিকট কাব্যঋণ রবীন্দ্রনাথ বারবার স্বীকার করেছেন। কিন্তু, না, তা ঋণ নয়, গ্রহণ, আত্মস্বীকরণ, সম্পূর্ণ নিজের করেই তা তিনি গ্রহণ করেছেন।

বিহারীলালের প্রভাব রয়েছে বনফুল, কবিকাহিনী ও বৈষ্ণবসংগীত কাব্যে। তারপরই সন্ধ্যাসংগীতে সেই প্রভাব থেকে মুক্তি। মনে হয় এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ প্রাক্-সন্ধ্যাসংগীত পর্বের সমুদায় রচনাকে (অচলিত সংগ্রহ, দু খণ্ড) স্বীকার করতে চান নি।

বিহারীলাল যে হেমচন্দ্রের মতো ক্রিয়াপদিক মিল ব্যবহার করেন নি এজন্য রবীন্দ্রনাথ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন।

বঙ্গসুন্দরী কাব্যের—

একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুরনদীর জলে
অপরূপ এক কুমারী রতন
খেলা করে নীল নলিনীদলে।

এর মিষ্ট লালিত্য ও শ্রুতিমাধুর্য রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল, শৈশবসংগীতে এরই অনুসৃতি—

তরল জলদে বিমল চাঁদিমা
সুধার করণা দিতেছে ঢালি
মলয় চলিয়া কুসুমের কোলে
নীরবে লইছে সুরভি ঢালি।

এই ছন্দের প্রসঙ্গে কবি বলেছেন, "একদা এই ছন্দটাই আমি বেশি করিয়া ব্যবহার করিতাম।...এইটেই আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যাসংগীতে আমি ইচ্ছা করিয়া নহে, কিন্তু স্বভাবতই এই বন্ধন ছেদন করিয়াছিলাম।" [জীবনস্মৃতি, 'সন্ধ্যাসংগীত'] কেবল ছন্দের ক্ষেত্রে নয়, ভাবের ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ সন্ধ্যাসংগীতে মুক্তি অর্জন করেছিলেন প্রতিভার অসাধারণ আত্মবিশ্বাসের জোরে।

বিহারীলালের 'শরৎকাল' ও 'সারদামঙ্গল' কাব্যের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের 'বনফুল', 'বৈষ্ণবসংগীত', 'বাল্মীকি-প্রতিভা' কাব্যে লক্ষণীয়। বিহারীলালের তিনটি সম্ভাবনা রবীন্দ্রনাথে অধিকতর সার্থকতায় মণ্ডিত হয়েছিলো। প্রথমত, প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপনে ও তার মধ্যে একটি রোমান্টিক বিষাদের সুর আবিষ্কারে বিহারীলালের ইঙ্গিত সাহায্য করেছিল। দ্বিতীয়ত, প্রেমের লৌকিক ও আধারগত সত্তার উর্ধ্বে যে একটি সার্বভৌম অধ্যাত্মসত্তা আছে, তার অনুভূতি বিহারীলালের কাব্যে (প্রেমপ্রবাহিণী, সারদামঙ্গল) প্রথম লক্ষ্য করা যায়, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে (সোনার তরী) সে কাব্যভাবনা পরিপুষ্টি লাভ করেছে। তৃতীয়ত, রোমান্টিক কাব্যভাবনা থেকে মিষ্টিক্ কাব্যভাবনায় উত্তরণ ঘটেছে, বিহারীলালের সংগীতশতক (১৮৬২) থেকে সাধের আসন (১৮৮৮) কাব্যধারা তার পরিচয়স্থল ; রবীন্দ্রনাথের

ক্ষেত্রেও তা ঘটেছে, কড়ি ও কোমল (১৮৮৬) থেকে চিত্রা (১৮৯৬) কাব্যবধূর তার প্রমাণ। চিত্রা কাব্যে এসে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কাব্যজন্ম পূর্ণতা পেয়েছে, এখানে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন।

এই তিনটি ক্ষেত্রে বিহারীলালের দান ও রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি ও গ্রহণ-বর্জনের বিস্তারিত বিবরণ বর্তমান লেখকের "ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য" গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে করা হয়েছে।

॥ ৪ ॥

ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদে সমসাময়িক কবিদের কাব্য-সাধনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্র-প্রতিভা-বিচারে এই দিকটি নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয় নি। এই আলোচনায় একথাই প্রমাণিত হবে বলে আমার ধারণা যে রবীন্দ্র-প্রতিভা অমূল-উদ্ভব নয়, তা সমকালের কাব্যপরিবেশ থেকে আলো বাতাস গ্রহণ করেছে, সহযাত্রী কবিদের কাব্য-ভাবনার অংশ নিয়েছে। প্রেম, প্রকৃতি ও বিষাদ : কাব্যের তিনটি মূল ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যে আন্তরিক চেতনাকে বাণীরূপ দান করেছিলেন, তা সমকালীন কবিদের দ্বারা সমর্থিত ও পরিপুষ্ট হয়েছিল।

প্রথমেই ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতার আলোচনা করা যাক্। যৌবনের ও প্রেমের জয়গান রচনায় সেদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীর অভাব ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমের কাব্য 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬)। সমকালের যে-সব কবি ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেম-কবিতা রচনায় ব্যাপৃত হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন—বলদেব পালিত ('কাব্যমালা' : ১৮৭০), বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ('ভ্রান্তি' : ১৮৭৭), মুন্সী কায়কোবাদ ('অশ্রুমালা'), হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী ('বিনোদমালা' : ১৮৭৮, 'মালতীমালা', ১৮৮৩), গোবিন্দচন্দ্র দাস ('প্রেম ও ফুল' : ১৮৮৮, 'কুসুম' : ১৮৯২, 'কস্তুরী' : ১৮৯৫, 'চন্দন' : ১৮৯৬), দেবেন্দ্রনাথ সেন ('অশোকগুচ্ছ' : ১৯০০)।

কড়ি ও কোমলের রচয়িতা মূল মানবসত্তার কবি। এ কাব্যের প্রেম পার্থিব প্রেম। ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমের জয়গানে এ কাব্য মুখরিত। এখানে কবির মনে "আমার যৌবনস্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ। ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে জলদীর পরশের মতো।" প্রকৃতির নিবিড় সাহচর্যের মধ্যে থেকে রবীন্দ্রনাথ কী ভাবে নারীর প্রেমসাহচর্য বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন, তার আলোচনা আছে এই কাব্যে। এখানে স্মর্তব্য, শুধু কামনাগন্ধী, বাহু মিলনে পরিসমাপ্ত প্রেম কোনদিনই রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে নি, ইন্দ্রিয়লালসা কখনও প্রেমের স্বর্গীয় সুষমাকে খণ্ডিত করে নি।

বলদেব পালিতের 'কাব্যমালা'য় ভোগের উল্লাস, যৌবনের চাঞ্চল্য, আর 'কড়ি ও কোমল'-এ ভোগের শুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা, যৌবনের স্বপ্ন। দেহ-কামনার সংকীর্ণ সীমাকে লঙ্ঘন করে গেছে 'কড়ি ও কোমলে'র সনেট-নিচয়, বলদেব তা পারেন নি। একই বিষয়ে রচিত কবিতার উদ্ধৃতিতে একথা স্পষ্ট হবে।

স্তনের বর্ণনায় বলদেব বলেছেন :

পল্লবস্বরূপ ধনি এ করপল্লবে
রাখিব ঘটের মুখে কাম মহোৎসবে।
সিন্দূরের বিনিময়ে নখক্ষত-দুটী
অপূর্ব শোভিবে, যেন প্রবালের ঘটী॥

একই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য :

প্রেমের সংগীত যেন বিকশিয়া রয়,
উঠিছে পড়িছে ধীরে হৃদয়ের তালে।
হেরো গো কমলাসন জননী লক্ষ্মীর
হেরো নারী-হৃদয়ের পবিত্র মন্দির॥

নারীপ্রেমের পবিত্রতাকে রবীন্দ্রনাথ কোনক্রমেই ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি, স্তনযুগলের প্রতি কামজ আকর্ষণ নয়, রোমান্টিক আকর্ষণ এখানে প্রবল।

আরো একটি উদাহরণ গ্রহণ করা যাক্। হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর 'বিদায়', মুন্সী কায়কোবাদের 'প্রণয়ের প্রথম চুম্বন' ও 'বিদায়ের শেষ চুম্বন' ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'দাও দাও একটি চুম্বন'—চুম্বন-বিষয়ক এই কবিতা-চতুষ্টয়ের সঙ্গে 'কড়ি ও কোমলে'র 'চুম্বন' সনেটের তুলনা করা যায়। রবীন্দ্রনাথের সনেট এই কবিতা চতুষ্টয়ের পূর্বেই ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব

ভাবের সমুন্নতিতে, রোমান্টিক কল্পনায় সমারোহে, শালীন চিত্রণে। পর পর চারজন কবির চুম্বন বর্ণনার কয়েকটি চরণ উদ্ধার করছি, এতেই সক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

[এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য বর্তমান লেখকের 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য' গ্রন্থের তৃতীয় ও নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

মুন্সী কায়কোবাদের ব্যাকুল জিজ্ঞাসা :

মনে কি পড়ে গো সেই প্রথম চুম্বন ?
যবে তুমি মুক্ত কেশে
ফুলরাণী বেশে এসে,
করেছিলে মোরে প্রিয়া স্নেহ আলিঙ্গন।
মনে কি পড়ে গো সেই প্রথম চুম্বন ?
—'প্রণয়ের প্রথম চুম্বন'

হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর প্রীতি-প্রণয় চিত্তের আবেদন :

আর নয়, বিদায় দো ! যাই এইবার,
সুরক্ত অধরোপরি
বিদায় চুম্বন করি,
চালিয়া উরসে বর শ্রীঅঙ্গের ভার,
হাসিয়া বিদায় দাও, প্রেয়সী আমার। —'বিদায়'

বলেন্দ্রনাথের দুর্বার কামনা :

দাও, দাও, একটি চুম্বন
মিলনের উপকূলে সাগর সঙ্গমে
দুর্জয় যানের মুখে দিব ভাসাইয়া সুখে
দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন,
দাও, দাও, একটি চুম্বন।
—'দাও দাও একটি চুম্বন'

আর রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক তীর্থাভিসারের হর্ষ ও আবেগ :

অধরের কানে যেন অধরের ভাষা
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে।
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর সঙ্গমে।...
দুটি অধরের এই সুদূর মিলন
দুইটি হাসির ঝাড়া বাসর-শয়ন ॥

প্রেমের স্বর্গীয় সুষমা এখানে ইন্দ্রিয়লালসা দুর্বার কামনার দ্বারা পতিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব এখানে স্বতঃই প্রমাণিত।

আদর্শায়িত প্রেমকবিতার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রীর অভাব ছিল না। মানসী (১৮৯০), সোনার তরী (১৮৯৪), ও চিত্রা (১৮৯৬) কাব্যের আদর্শায়িত প্রেমের সহগামী কাব্যসাধনা হল সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পোলা' (১৮৯৮), বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভ্রান্তী' (১৮৯৭), সরোজকুমারী দেবীর 'হাসি ও অশ্রু' (১৮৯৫), প্রিয়ম্বদা দেবীর 'রেণু' (১৯০০) ও প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর 'পদ্মা' (১৮৯৮) ও 'গীতিকা'।

বাস্তব জগতে প্রেমের বৃথা সন্ধান, প্রেমের ব্যাখ্যাতীত রহস্য, সংসার জীবনে অতৃপ্তি ও সংশয়ের তীব্রতা, প্রেমাস্পদের সঙ্গে আত্মিক মিলনের জন্য বৃথা ক্রন্দন 'মানসী' কাব্যে রয়েছে। প্রেমাকর্ষণ মূলতঃ অতিবাস্তবের আকর্ষণ, প্রেমের দুর্জ্ঞেয় রহস্য ও প্রেমিক হৃদয় অন্তরীন রহস্যের মিলন, তার পরিচয় 'সোনার তরী'তে আছে। বলেন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিদের রচনায় প্রেমের অতিবাস্তব আকর্ষণ ও রহস্যময় রূপ, দুটই প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে।

রবীন্দ্রনাথ বর্ষা ও বিরহ তত্ত্বটিকে কাব্যরূপ দিয়েছেন 'সোনার তরী'তে এইভাবে—

আজি বর্ষা গাঢ়তম
নিবিড় কুন্তলসম
মেঘ নামিয়াছে মম
দুইটি তীরে : —'হৃদয় যমুনা'

বলেন্দ্রনাথের কাব্যে এরই প্রতিধ্বনি :

মেঘ নামিয়াছে আজি ধরণীর গায়,
তুমি এস নেমে এস হৃদয়গুহায়
অন্তরের মাঝে, অয়ি অন্তরবাসিনি।—'অন্তরবাসিনি'

প্রিয়ম্বদা দেবীর কাব্যে একই ভাবনার প্রতিধ্বনি :

মেঘ নামিয়াছে আজ ঘেরি চারিপাশ
নবনিদ্ধ অন্ধকার, সজল বাতাস
ধরণীর আর্দ্রবক্ষে নিবিড় পরশে
রোমাঞ্চ জাগায়ে তুলি উদাস হরষে

ছোট্ট পরিচয় :···তবু ধরে একা বসি
অন্ধ বাঁশি, প্রাণে জাগে তব ঘুমঘোরী।
তবু একবার এস নয়ন সম্মুখে
হাতখানি তুলে নাহি লহ বুকে। —'বিরহ'

যাঁর প্রকৃতিতে বিরহীচিত্তের আপন বেদনাবিধুর হৃদয়ের সমর্থন পায়, বলাকা কাব্যে এই তত্ত্বটির প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ।

মানুষ জগতে প্রেমের পূর্ণ সন্ধান ও তার জন্য নিষ্ফল মূর্ছনা বিহারীলালের 'প্রেমপ্রবাহিণী' কাব্যে, তার পূর্ণতা রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যে ও তারই বিস্তৃত অনুভূতি সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দোলা' কাব্যে। এই কাব্যে 'নিখিল প্রয়াস', 'অবিশ্বাস', 'হৃদয় যমুনা', প্রমুখ কবিতার নাম-পরিচয়ে মানসী সোনার তরীর আনুকূল্য প্রতিষ্ঠিত। 'সোনার তরী' কাব্যে প্রেমের দুর্জ্ঞেয় রহস্য ও মৃত্যুর সঙ্গে প্রেমের একাত্মতা সূচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথের (হৃদয়যমুনা : দোলা) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাবনা ও চিত্রকল্পের আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় ('সোনার তরী', 'মূলধন' ও 'হৃদয়যমুনা')।

সুধীন্দ্রনাথের ও সরোজকুমারী দেবীর প্রেমসাধনায় যে নিবেদন ও আত্মসমর্পণের সুর আছে, তা রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও বর্তমান।

জীবনসাধনা ও কাব্যসাধনার ফল জীবনাধিষ্ঠাত্রী দেবীর চরণে সমর্পণের অপূর্ব কাহিনী রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। প্রেমের আদর্শায়িত রূপচিত্রণ, তার অতিবাস্তব পরিণতি, প্রেমিকাকে জীবনাধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বরণ, প্রেমের রহস্যময়তা এবং কাব্যসাধনা ও জীবনসাধনার ভেদবিস্মৃতি সোনার তরী-চিত্রা কাব্যকে মহত্ত্বর পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা বন্দনা :

দেবী, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে
অনেক অর্ঘ্য আনি ;
আমি অভাগা এসেছি বহিয়া নয়নজলে
ব্যর্থ সাধনখানি।···
তুমি যদি, দেবী, পলকে কেবল
কর কটাক্ষ স্নেহসুকোমল,—
একটি বিন্দু কেন আঁখিজল করুণা মানি
সব হতে তবে সার্থক হবে ব্যর্থ সাধনখানি।
['সাধনা'—চিত্রা]

সুধীন্দ্রনাথের বিচিত্ররূপিণী বন্দনা :

কে তুমি রয়েছ মোর অন্তরের মাঝে
বিচিত্ররূপিণী ! কত দিন কত সাজে
দেখেছি তোমায় :·····পরাণ বুঝায়ে
নিশিদিন প্রাণপণে কেমনে না জানি
তোমা হতে প্রাণরস লইতেছে টানি।
চিরতরঙ্গিত এই জীবনসাগরে
এতদূর আনিয়াছ তুমি হাত ধরে :
যারা ঘটিয়াছে মন হতে দূর করে
এবে তোমা কাছে যাচি—জান ত সুন্দরি
অন্তরের মাঝে মোর দিবস শর্বরী
কি আশা জাগিয়া আছে, তাহে পূর্ণ করি
জীবনের সুধাপাত্রখানি দাও ভরি,
তারপর হৃদচক্রতলে বাঁধি মোরে
দেবা খুসি নিয়ে যেয়ো অয়ি অয়ি ধরে।
['অদৃষ্টদেবী'—দোলা]

আর সরোজকুমারী দেবীর ব্যাকুল প্রার্থনা :

জেনেছি বুঝেছি দেবী বিফল সাধনা।
নিখিনি করিতে পূজা ও দুটি চরণ
আজন্মের মোর তৃষা অতৃপ্ত বাসনা,
মিটিবে না কভু মোর থাকিতে জীবন।·····
তবু দেবী আশাহীন নবীন আশায়
গেঁথেছি যতনে এই করাঙ্গুলগুলি,
পরাইতে যাই আর সাহস ফুরায় ;
পরিবে না গলে তুমি সবে না কি তুমি ?
না হয় রাখিয়া দাও চরণের ছায়,
মুহূর্ত বিফল আশা যদি মেটে যায়।
['সাধনা'—বাঁশি ও অশ্রু]

রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা-তত্ত্ব ও অতিবাস্তব প্রেম-সাধনা এই দুজন কবির কাব্যে সমর্থিত হয়েছে, এতে রবীন্দ্রপ্রতিভার জয় সূচিত হয়েছে।

কেবল ইন্দ্রিয়াশ্রিত ও আদর্শায়িত প্রেমের ক্ষেত্রেই নয়,

রোমান্টিক বিষাদের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ একক ছিলেন না। রোমান্টিক বিষাদ বাংলা গীতিকাব্যে প্রথম দেখা দিল বিহারীলালের কাব্যে। বিহারীলালের প্রকৃতিপ্রেম, নির্বিশেষ অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য-সন্ধান, অম্লান প্রসন্নতা এবং ধ্যানমগ্নতা রবীন্দ্রমানসের যথার্থ অনুকূল হয়েছিল। তবে বিহারীলালের প্রভাব স্থলস্থায়ী হয়েছিল। কাব্যজীবনের প্রথম পর্বে কবি হৃদয়-অরণ্যে পথসন্ধান করে ফিরছিলেন। সন্ধ্যাসংগীতে কবিকে হৃদয়-অরণ্য থেকে মুক্তির পথ দেখাল, যথার্থ মুক্তি ঘটল প্রভাতসংগীতে। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে মুক্তিলাভ করলেন, তা এই বিষাদ থেকে মুক্তি; এ কবিতায় প্রসন্ন আনন্দসংগীতে সুষমাময় প্রভাতের সংগে কবির সাক্ষাৎ পরিচয় স্থাপিত হল।

এই মুক্তি কবির নিজের মধ্য থেকেই ঘটেছে, বাহিরের কোন শক্তি কবির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। আর সমকালীন কবিরা রোমান্টিক বিষাদ অপেক্ষা শোক ও আত্মবিলাপের হাহাকারেই নিজেদের নিঃশেষিত করে দিয়েছিলেন। তাই রোমান্টিক বিষাদের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ আপন স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য বর্তমান লেখকের 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য' গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

এবার শেষ প্রসঙ্গ: সমকালের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-কবিতার বিচার। বিহারীলালের 'প্রণয় করেছি আমি প্রকৃতি-রমণী সনে' (সংগীতশতক : ১৮৬২) ও

সুধাময় প্রণয় তোমার
জুড়াবার স্থান হে আমার :
তব স্নিগ্ধ কলেবরে,
আলিঙ্গন দিলে পরে
উলে যায় হৃদয়ের ভার। [বঙ্গসুন্দরী : ১৮৭০]

এবং হেমচন্দ্রের—হায়রে প্রকৃতি সনে মানবের মন
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি।
['যমুনাতটে', কবিতাবলী : ১৮৭০]

প্রকৃতি কবিতার উপযুক্ত পটভূমি রচনা করেছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন কাব্যক্ষেত্রে এলেন তখনও তিনি হৃদয়-অরণ্য হতে নিষ্ক্রান্ত হন নি। এই সময় হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র প্রকৃতিতে নীতি ও গুরুচিন্তা আরোপ করতেন। তখনকার দিনে প্রকৃতি কবিতা রচনার এই ছিল প্রচলিত রীতি। রবীন্দ্রনাথ এই কৃত্রিমতা ও সজ্জার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলাল যা করতে পারেন নি, রবীন্দ্রনাথ তা করলেন। কবিতাকে জীবন ও প্রকৃতির কাছে নিয়ে এলেন।

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি তাই একাধিক কারণে মূল্যবান। বিষাদ থেকে, কৃত্রিমতা থেকে, নীতি বা তত্ত্বারোপ প্রবণতা থেকে প্রকৃতি-কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ মুক্ত করলেন। হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে উৎসারিত আনন্দধারায় স্নাত হয়ে কবি প্রকৃতিকে দেখলেন, সমগ্র প্রকৃতি সেই বৃহৎ আনন্দের অঙ্গীভূত হয়ে গেল। প্রকৃতিতে চিন্তারোপ না করে কবি তাকে জীবনের সঙ্গে মেশে নিলেন; প্রকৃতি-কবিতায় নূতন ধারা প্রবর্তিত হল। সরোজকুমারী দেবী ('মধ্যাহ্ন'), বিনয়কুমারী ধর ('রাত্রির প্রতি রজনীগন্ধা'), স্বর্ণকুমারী দেবী ('শারদজ্যোৎস্না'), দেবেন্দ্রনাথ সেন ও অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতায় এই নবদৃষ্টিভঙ্গীর অনুসরণে অনুভূতিশীল নিদর্শের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। বর্তমান লেখকের "উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য" গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' (প্রভাত সংগীত), 'অহল্যার প্রতি' ও বর্ষা-বিষয়ক-কবিতা (মানসী) এবং 'বসুন্ধরা' ও 'সমুদ্রের প্রতি' (সোনার তরী)—এই কটি উজ্জ্বল আন্তরিক গভীর কবিতায় বাংলা প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতা এক মহত্তর পর্যায়ে উন্নীত হল। জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ আধুনিক কবিদের হাতে প্রকৃতি-কবিতার রূপান্তর ঘটার আগে পর্যন্ত রবীন্দ্র-নির্ধারিত পথেই প্রকৃতির-কবিতার দায়েশ সুচিহ্নিত হয়ে গেল। 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় কবি মাতৃরূপা প্রকৃতিকে দেখেছেন, আর মানসীর বর্ষা-কবিতাগুলিতে সর্বজনলভ্য বিরহবেদনা ও রোমান্টিক বেদনাকে প্রকাশ করেছেন। বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনায় ও তার সংগে মানব-হৃদয়ের ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ সম্পর্কস্থাপনে রবীন্দ্রনাথ বোধ করি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ছাড়া আর সকল কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় প্রকৃতির প্রতি যে সুগভীর মাতৃ-প্রীতি প্রকাশ পেয়েছে, 'বসুন্ধরা' কবিতায় তার রসসমৃদ্ধ পরিণতি।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও এই শতকের সমাপ্তির পূর্বেই তাঁর নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। প্রকৃতি-বর্ণনায়, ইন্দ্রিয়াশ্রিত অতীন্দ্রিয় ও মিস্টিক্ প্রেমের উপস্থাপনায় এবং রোমান্টিক বিষাদের অন্তরঙ্গ পরিচয় দানে সমসাময়িক কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য ও স্বাতন্ত্র্য এতক্ষণ লক্ষ্য করা গেল। রূপতান্ত্রিকতা ও ভাবতন্ময়তা, তৃপ্তি ও অতৃপ্তি, যৌবনের হর্ষ ও বেদনা, বাস্তবের কঠিন পেষণ থেকে মুক্তিসন্ধান, আদর্শ ও সৌন্দর্যের সন্ধান : এই পর্বে রবীন্দ্রনাথকে ক্রতবিক্ষত করেছে। এই ক্ষেত্রে সহযাত্রীর অভাব ছিল না, তাও লক্ষ্য করেছি।

তবে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য কোথায়? রবীন্দ্রকাব্যে সকল ধারার সমন্বয় সাধিত হয়েছিল ও এই সময় থেকেই বাংলা কাব্যে এক উত্তরতর কবিকর্মের উদ্ভব হয়েছিল। উনিশ শতকের বাংলা গীতিকাব্যসম্ভারে রবীন্দ্রনাথ একক নন, কিন্তু তিনি শ্রেষ্ঠ। শতাব্দীর সাধনার ফল রবীন্দ্রনাথেই প্রকাশিত হয়েছিল।

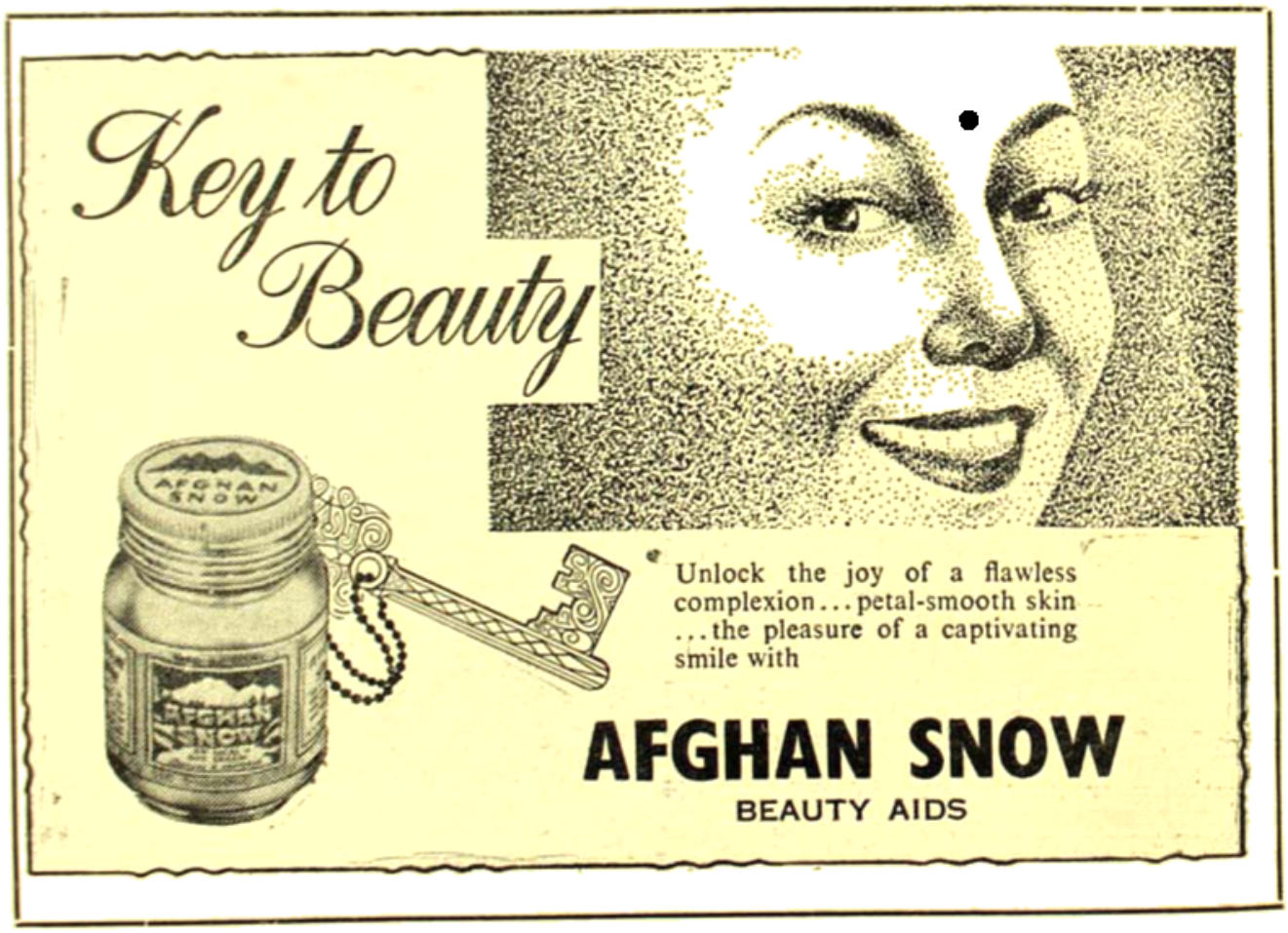

সাহিত্যিক প্রবন্ধ

নবজাগরণের ধর্ম

অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

ইংরাজী Renaissance কথাটিকে আমরা ব্যবহার করি নবজাগরণ বা নবজাগৃতি অর্থে, যদিও শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ হল নবজন্ম। এই নবজাগরণের অবস্থা যদিও ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে, তথাপি কথাটি সাধারণতঃ প্রযুক্ত হয় একটি জাতির মানসিক বা নৈতিক পরিবর্তনকে লক্ষ্য করে। নবজাগরণ কথাটি খুবই তাৎপর্যময়। এ-কথাটি শুনলে শ্রোতার চোখের সামনে ভেসে উঠে এমন একটা ছবি—যে ছবির মধ্যে ব্যক্তি বা সমাজের বিবর্তনরেখা অত্যন্ত স্পষ্ট। যে ব্যক্তি বা জাতি একদিন জাগ্রত ছিল, মাঝে নিদ্রিত হয়ে পড়েছিল, তারপর কোন ঘটনা বা ভাবের সংঘাতে সেই নিদ্রিত সত্তা পুনরায় যখন জাগ্রত হয়ে উঠল—সে অবস্থাকে বলা যায় নবজাগরণের অবস্থা। অতএব নবজাগরণের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে একটা গতির প্রশ্ন। এই গতির উৎস সামাজিক মানুষের মনে। এই গতিবেগ সঞ্চারিত হয় সাধারণতঃ কোন আকস্মিক রূপান্তরকারী ঘটনা বা ভাবের প্রভাবে। এই ধরণের ঘটনা বা ভাবসংঘাত সামাজিক মানুষের মনে এনে দেয় একটা আমূল পরিবর্তন। এই পরিবর্তনক্রিয়ার ফলে ভাবসংকুচ্ছ মানুষ তার পুরাতন সংস্কারের খোলস ছাড়িয়ে হয়ে উঠে নতুন মানুষ। এই মানসিক metamorphosis-এর অনিবার্য পরিণতি হল সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তন। রেনেসাঁসের ইতিহাসকে তাই বলা চলে সমাজমনের বিবর্তনের ইতিহাস।

সমাজমনের ক্রান্তিকালীন অবস্থার প্রধান পরিচয় হল যুগমানবের দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্ব। যে বিচারহীন বিশ্বাসের উপর এককালে মানুষের জীবন দাঁড়িয়েছিল স্থাণুর মত, সে-জীবন অকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে উঠে প্রচলিত বিশ্ববিধানের প্রতি একটা প্রশ্নাত্মক দৃষ্টির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। এই নবদৃষ্টিলাভের ফলে প্রচলিত জীবনের জীর্ণ দৃশ্যপট ক্রমশঃ অপসৃত হয়ে যায় জাগ্রত জাতির চোখের উপর থেকে; জাতি প্রবেশলাভ করে একটা সংস্কারমুক্ত উদার জগতে। বিচারমূঢ় জাতির এই মানসিক সচলতাকে বলা চলে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তীর্ণ হওয়ার ক্রমিক ইতিবৃত্ত।

সমাজমনের এই ক্রান্তিকালীন ইতিবৃত্ত স্বরূপতঃ। এই দ্বন্দ্ব প্রধানতঃ ভাবভিত্তিক। পরস্পরবিরোধী ভাব-সংঘাতের ফলে জাগ্রত জাতি লাভ করে একটা প্রচণ্ড আত্মিক শক্তি। এই শক্তি উদ্বুদ্ধ করে জাতির সমগ্র চৈতন্যকে, আর প্রবর্তনা দেয় জাতিকে এমন সমগ্র সৃষ্টির স্বাধীন অনুশীলনে যা ছিল পূর্বযুগে অভাবিত।

এই হল নবজাগরণের গভীরতর ভাবব্যঞ্জনার দিক। এ ছাড়া নবজাগরণের আর একটা দিক আছে যা মূলতঃ মানসিক সক্রিয়তার পরিচায়ক। জাতির ইতিহাসে দেখা যায় এই মানসিক ক্রিয়া গতিবেগ প্রাপ্ত হয় প্রাচীন সংস্কৃতির জগতের সঙ্গে নব-পরিচয়ের ফলে। পুরাতন জগতের সঙ্গে এই নতুন পরিচয় জাগ্রত জাতির শিল্প ও সাহিত্যকে করে তোলে নতুন মূল্যে মূল্যবান। নবজাগরণের যুগে সাহিত্য ও শিল্পের এই মূল্যসমৃদ্ধি জাতীয় চিত্তের পূর্ণ পরিচয় বহন করে না সত্য, কিন্তু জাতীয় জীবনের সামগ্রিক উজ্জীবনের ইঙ্গিত বহন করে এই নতুন শিল্প ও সাহিত্য।

[illegible]

[illegible]

আসলে জাতির নবজাগরণ একটি দীর্ঘবিস্তারী প্রক্রিয়া। বৃহৎ ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে জাতীয় মনে নবজাগরণের ঘরে প্রস্তুতিপর্ব চলতে থাকে সকলের অলক্ষ্যে বহুকাল ধরে। রিনেসাঁসের পূর্বে আধো ঘুম এবং আধো জাগরণ বা সুপ্তির যে একটা পর্ব আছে নবজাগরণের পূর্বের অবস্থাকে সেই অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যায়। য়ুরোপের জীবন-প্রবাহও এমন একটা অবস্থার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছিল নিতান্ত অর্থপূর্ণ 'প্রাচীন জ্ঞানে'র পুনরুদ্ধারের পূর্বে। যে রোম সাম্রাজ্যকে একদিন চিরস্থায়ী মনে করা হত সে সাম্রাজ্যেরও একদিন পতন হল। য়ুরোপের জনচিত্ত বিভ্রান্ত হয়ে গেল এই বিরাট শক্তির পতন দেখে। কিন্তু সেই বিভ্রান্তির অবস্থাও একদিন তারা কাটিয়ে উঠল। টিয়ুটনিক জাতিসমূহের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের ফলে ক্রমে ক্রমে তারা সভ্য হয়ে উঠল এবং সভ্যতর জাতির সঙ্গে তারা ক্রমশঃ একাত্ম হয়ে গেল। বিশৃঙ্খলা এবং নিরক্ষরের জীবনযাত্রার স্থলে এল আপেক্ষিক শান্তি ও সমৃদ্ধি। নিজেদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখেও য়ুরোপীয় জাতি-সমূহ একটা যৌথ রাষ্ট্রনীতির দ্বারা চালিত হতে প্রস্তুত হল। পবিত্র রোম সাম্রাজ্য এবং রোমীয় ধর্মমন্দিরের (Church) দ্বৈতশাসনে সার্বভৌম রাজত্ব এবং অধিরাজ্য খ্রীষ্টধর্মের ধারণা ক্রমশঃ অন্তর্হিত হল। রাষ্ট্র ও ধর্ম সম্বন্ধে নিত্য-নতুন মতবাদের উদ্ভব হল, যে সমস্ত মতবাদ মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে ছিল অন্যের মত অবাস্তব বা অপবিত্র।

এই হল খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে য়ুরোপের ক্রান্তিকালীন অবস্থা। এ-যুগে য়ুরোপের জনচিত্তে নবজাগরণের যে সূচনা হয়েছিল তার সঙ্গে প্রাচীন জ্ঞানের সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। অতএব য়ুরোপীয় নবজাগরণের ইতিবৃত্ত বর্ণনায় এই মূলবৈশিষ্ট্যকে বিন্দুমাত্রও কোন সংজ্ঞা দিয়ে চিহ্নিত করা উচিত।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর জাতীয় জীবনে নব-জাগরণের যে প্রবল স্পন্দন অনুভূত হয়েছিল তারও কোন প্রস্তুতিপর্ব ছিল কিনা সমাজতাত্ত্বিকের পক্ষে সে এক অনুসন্ধিৎসার বিষয়। সমকালীন ধর্মীয় কুসংস্কারকে অতিক্রম করে হিন্দুর সনাতন শাস্ত্রের সত্যালোকে রামমোহনের জাতীয় জীবনের আদর্শ অনুসন্ধান সে-যুগের বাঙালীর নবজাগরণকে ত্বরান্বিত করেছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে

নবজাগরণের পূর্বেও বাঙালীর জাতীয় জীবনে সুষুপ্তির একটা স্তর ছিল এ অনুমান অযৌক্তিক নয়। বাঙালী-জীবনের সে অন্ধকারাচ্ছন্নতার মূল পলাশির যুদ্ধের সমাপ্তিকাল থেকে রামমোহনের কলকাতায় স্থায়ী ভাবে বসবাসকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দীর্ঘ সময়ে তামসিক আবাসের বাঙালী আধুনিক চিন্তা-জগতে উত্তীর্ণ হওয়ার স্বপ্ন দেখেনি সত্য, কিন্তু সে-যুগের কতগুলি যুগান্তরকারী ঘটনা ও ভাবের প্রভাব তাদের সুষুপ্ত চেতনার স্তরকে ঈষদ্ভাবেও স্পর্শ করেনি—এমন কথা জোর করে বলা যায় না। যুগান্তরকারী ঘটনার মধ্যে প্রধান হল পলাশির যুদ্ধ। এই যুদ্ধ বাঙালীর সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রসারিত করে দিল একটা অনাগত ভবিষ্যতের দিকে। সেই ভবিষ্যৎ অস্পষ্ট, কিন্তু সেই অস্পষ্টতার ক্ষীণ ছায়ায় তারা বাঙালীর পরাভূতিক জাতী। জীবনে একটা প্রচণ্ড শক্তির আবির্ভাব দেখে স্তম্ভিত হল। দ্বিতীয়, খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের আগমনে বাঙালীর প্রচলিত ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে নবতর আঘাত এল। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত দিক থেকে এই বিদেশী ধর্ম-সংঘাত বাঙালীর চিরাচরিত রক্ষণশীলতাকে আরো তীব্র করে তুললেও, সে তীব্রতা মধ্যযুগের তন্দ্রাচ্ছন্ন বাঙালীর মানসিক সক্রিয়তারই পরিচায়ক। এই মানসিক সক্রিয়তাই পরবর্তী কালে বাঙালীকে ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণকে ত্বরান্বিত করেছে। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানশক্তির ক্রমবর্ধমান প্রভাবও অর্ধচেতন বাঙালীর মানসকৌতূহলকে উদ্দীপ্ত করেছিল এ-যুগে। এই কৌতূহলের অনিবার্য পরিণতি হল, কল্পিত পরলোকের প্রতি সংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালীর পরাভূতিক দৃষ্টি ক্রমশঃ আকৃষ্ট হল ইহজীবনের বাস্তব-প্রয়োজনের দিকে। দৃষ্টিভঙ্গীর এই মৌলিক পরিবর্তনের ফলে বাঙালীর বিচারহীন বিশ্বাসনির্ভর মধ্যযুগের অবসান হল। এই যুগসমাপ্তির প্রধান লক্ষণ হল, বিদেশী ইংরাজের নিকট-সংস্পর্শে আগত একশ্রেণীর শিক্ষিত বাঙালীর মনে প্রাচীন সর্ববিধ সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহচেতনা এবং নবীনকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রবল আগ্রহ। এই বিদ্রোহী মানসচেতনা ফ্রান্সিসের তন্দ্রাচ্ছন্ন জড় বাঙালীর নয়, পাশ্চাত্ত্য প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের প্রভাবে নতুন দৃষ্টিতে জ্যোতিষ্মান জাগ্রত বাঙালীর। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই নানা ভাবসংঘাতের মধ্য দিয়ে বাঙালীর এই নবজাগরণের সূত্রপাত।

নবজাগরণের জটিল প্রক্রিয়া আলোচনায় আরও একটা প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে। কি য়ুরোপের, কি আমাদের দেশের নবজাগরণের নেতৃবৃন্দ মধ্যযুগের ধর্মসংস্কারকে পরিত্যাগ করে সহসাই আদিযুগের ধর্মতত্ত্বানুশীলনে প্রবৃত্ত হলেন কেন? সত্যি কি তাঁরা সেই অস্পষ্ট প্রাচীন যুগের ধর্মানুভূতির জগতে প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছিলেন? একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় এ ধরণের ধারণা অত্যন্ত অবাস্তব। আসলে সমকালীন সংস্কারাচ্ছন্ন শক্তিহীন মানুষকে আধুনিকতার পাদপীঠের উপর স্থাপন করবার জন্যে তাঁরা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন আদি সত্য মানুষের সংস্কারমুক্ত ধর্মচেতনা। সেই অকৃত্রিম ধর্মবোধ মধ্যযুগের অতিলৌকিকপরায়ণ ধর্মগুরু ও সমাজনেতাদের দ্বারা বিকৃত হয়ে উঠেনি।

জাতির নবজাগরণ প্রসঙ্গে আরও একটা কথা স্মরণীয়। শুধু কোন আকস্মিক ঘটনার প্রভাবেই জাতির জীবনে নবজাগরণ আসে না। নবজাগরণ একটা ক্রমসঞ্চারণশীল প্রক্রিয়া। মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণামুক্ত হয়ে আধুনিক ভাব ও চিন্তাজগতে প্রবেশ করছে মানুষ ধীরে ধীরে। বস্তুতপক্ষে নবজাগরণ হল মধ্যযুগের শেষ স্তর, যে স্তরে য়ুরোপের মানুষ ধর্মযাজক ও সামন্ততন্ত্রের একনায়কত্ব থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করেছে; এবং আমাদের দেশে বিদেশী শাসনপাশ স্বীকার করেও বাঙালী ধর্ম ও সমাজজীবনে বন্ধনমুক্তির স্বপ্ন দেখেছে। এই মুক্তিস্বপ্নকে সম্ভব করেছে ক্লাসিকেল জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন। এই মুক্তিস্বপ্নের মধ্যেই অবশ্য প্রতিশ্রুতি ছিল আধুনিকতার।

অতএব জাতির জীবনে নবজাগরণের অধ্যায়কে বলা চলে একটা ক্রান্তিকালীন অবস্থা, যে অবস্থায় নবভাব গ্রহণ করবার প্রস্তুতি, এবং ভাবসমন্বয়ের জন্যে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত প্রয়াস অব্যাহতগতিতে চলতে থাকে। এই প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সনাতন জ্ঞানের পুনরনুশীলনের তাৎপর্য বুঝে নিতে হবে।

আত্মিক স্বাধীনতা লাভের জন্যে নবজাগরণের যুগের নায়কদের যে প্রাণপণ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, সেই প্রয়াসকে প্রভাবান্বিত করেছিল অতীত জীবনের সনাতন ভাবাদর্শের

[illegible] ঘটেছে। নবজাগরণের যুগের নায়করা বুঝতে পেরেছিলেন বিভিন্ন ধর্মমতের ও রীতিনীতির বৈচিত্র্য সত্ত্বেও মানুষ মূলতঃ এক। এবং বিচিত্র উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে মানবেতিহাসের ধারা ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত। একই সঙ্গে মানবজীবনের বৈচিত্র্য ও ঐক্য উপলব্ধি করবার প্রয়াসে তাঁরা জনসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন প্রাচীন যুগের মহান সাহিত্য, শিল্পকীর্তি ও দর্শন। এ-ছাড়া তাঁরা জাগ্রত করে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন সমকালীন মানুষের মনে অনুসন্ধিৎসা, উৎসাহিত করছিলেন তাঁদের প্রশ্নাকুল দৃষ্টিভঙ্গীকে এবং মধ্যযুগের মানুষের সামনে বস্তুকে তার স্বরূপে দেখার বিরুদ্ধে যে মানসিক বাধার সৃষ্টি হয়েছিল, সে বাধাকে ভিন্নদিকে সবলে অপসারিত করে।

এই নবীন দৃষ্টিপ্রভাবে মানবজীবনের প্রতি নবজাগরণ-যুগের নায়কের মনে যে শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হল তারও ভাবতৎপর হল সংস্কারমুক্ত প্রাচীন জগতের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়। মধ্যযুগের সংস্কারান্ধ ধর্মপ্রভাবমুক্ত ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস এই শ্রদ্ধাবোধের মূলে। এই নব মানবতাবোধের প্রেরণায় নবজাগরণ-যুগের মানুষ উপলব্ধি করল, শাস্ত্রীয় এষণানিকরের আকাশে সে বন্দী নয়,—তারও একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে। ব্যক্তিক ও গোষ্ঠীগত সত্তার এই আত্মিক উপলব্ধিই নবজাগরণের মর্মবাণী। য়ুরোপের নবজাগরণের নায়কেরা মানবমহাত্ম্যবোধের উৎস খুঁজে পেয়েছিলেন ক্লাসিকেল সাহিত্যে। আমাদের দেশেও নবজাগরণের নেতৃবৃন্দ বেদান্ত ও উপনিষদের মধ্যে তাঁদের নব-উপলব্ধ সত্যধর্মের প্রেরণা খুঁজেছিলেন।

বিভিন্ন দেশের ইতিহাসের প্রকৃতি যেমন বিভিন্ন, তেমনি দেশে দেশে নবজাগরণের প্রকৃতিও ভিন্নতর। য়ুরোপের রেনেসাঁস মূলতঃ একটি মননধর্মী আন্দোলন—ব্যক্তিত্বের বন্ধনমুক্তি ও চিন্তার স্বাধীনতা সে-আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য। যুক্তিবাদের স্বাভাবিক দাবী এবং মানবচৈতন্যের সহজ স্বীকৃতি সেই আন্দোলনকে বেগবান করেছিল। মানুষের বাসযোগ্য স্থান হিসাবে পৃথিবীর অনাবিষ্কৃত অংশে অধিকার স্থাপন, ব্যক্তিক ও রাষ্ট্রিক জীবন পরিচালনার জন্যে যথাসম্ভব স্বৈরাচারী মতবাদ থেকে পৃথক, সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত রাষ্ট্রভাবনাও য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের উল্লেখ্য প্রবৃত্তি। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর নবজাগরণে যুক্তিবাদের জয় ঘোষণা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপ্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় তীব্র হলেও বিদেশী শাসনাধীনে য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের দুঃসাহসিক প্রবণতাগুলি আত্মপ্রকাশ করবার অবকাশ পায় নি। কিন্তু নবজাগরণের যুগে বাঙালী চিত্তে মানবমুখী ভাবনার সঙ্গে অধ্যাত্মভাবনা যেরূপ সমান্তরালভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, য়ুরোপীয় রেনেসাঁসে সে রকম কোন ভাবনা যুক্ত হয়ে নবজাগ্রত জনগণের চিত্তের ভারসাম্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়নি। একথা অবশ্য স্বীকৃত যে, য়ুরোপের ধর্মসংস্কার আন্দোলন (Reformation) রেনেসাঁস আন্দোলনের পরিপূরক; কারণ এই উভয় আন্দোলনের ভাবপ্রেরণা প্রায় এক। ধর্ম ও সমাজজীবনে যে সমস্ত ভাবধারা জীর্ণ ও অপ্রচলিত বলে বিবেচিত হচ্ছিল, তার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই উভয় আন্দোলনের সূত্রপাত। এ ছাড়া সেই জীর্ণ জগতকে অতিক্রম করে নতুন ভাবজগতে প্রবেশ করবার জন্যে জাতির মনে অলক্ষ্যে যে শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছিল, সেই শক্তি-চেতনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল এই উভয় ভাবধর্মী আন্দোলন। য়ুরোপীয় জাতির নবজাগরণে এই উভয় শ্রেণীর আন্দোলন বেগ ও বলিষ্ঠতা এনে দিয়েছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু যে সুগভীর অধ্যাত্মচেতনার প্রভাবে জাতীয় জীবনে স্থায়ী মানবকল্যাণ ও মৈত্রীভাবনার একটা মহৎ উজ্জীবন ঘটে, য়ুরোপের এই দুই বিশিষ্ট ভাবান্দোলন সেদিক দিয়ে কতটা অর্থপূর্ণ তা বিচার্য।

অতীতে যা ছিল কবি-কল্পনা, বিংশ শতকের শেষার্ধে এসে তা পরিকল্পনায় রূপায়িত হয়েছে। চন্দ্রলোকে বসবাস করবার ব্যাপারকে স্বপ্নবিলাস ভিন্ন অন্য কিছু মনে করার কোন কারণ ছিল না। সাম্প্রতিক কালের বিজ্ঞান তাকে বাস্তবের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। কিন্তু তবুও সফলতায় পৌঁছবার পথে রয়েছে অনেক বাধা, নানা সমস্যা, বহুবিধ বিপত্তির ঝুঁকি। যদিও এদের কোনটাকেই এখন আর অনতিক্রম্য মনে করা হচ্ছে না এবং বিজ্ঞানী ও বহুকুশলীরা ভাবছেন পৃথিবীর সীমানা পেরিয়ে আকাশে আকাশে বিচরণ করবার ব্যাপারকে এখন আর আকাশকুসুম বলে উড়িয়ে দেবার কোন যুক্তি নেই, তবুও সিদ্ধি এখনও তাঁদের করায়ত্ত হয়নি।

নভোবিজয়ের অভিযানে চরম সাফল্য না হলেও পরম-প্রাপ্তি সূচিত হয়েছে সোভিয়েট স্পুটনিকের জয়যাত্রা থেকে। পৃথিবীর বাঁধন কাটিয়ে মহাশূন্যে প্রবেশ লাভের জন্য একান্ত প্রয়োজন হচ্ছে প্রচণ্ড বেগ সৃষ্টি করবার কৌশল আয়ত্ত করা। ঊর্ধ্বে ঢিল ছুঁড়লে তা আবার মাটিতে নেমে আসে। ঢিলের প্রাথমিক বেগ যত বেশী হয় ঢিল তত বেশী উঁচুতে উঠতে পারে। পৃথিবীর অভিকর্ষের টানেই ঢিল আবার মাটির বুকে ফিরে আসে। বেগ বেশী হলে এমনও হতে পারে যে ঢিল আর পৃথিবীতে ফিরে আসবে না। গত মহাযুদ্ধে রকেট-শেলের সাফল্য থেকে জানা গিয়েছিল পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে অসীমে পাড়ি দেবার জন্য যে বেগ দরকার তা উৎপন্ন করা অসম্ভব নয়। একটির মাথায় একটি রকেট পর পর বসিয়ে ধাপে ধাপে বিস্ফোরণের সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহকে উপযুক্ত গতিসম্পন্ন করে তাকে নির্দিষ্ট কক্ষে স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। এই জাতীয় উপগ্রহের প্রতিষ্ঠার জন্য বিপুল বেগ সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয়ে থাকে। উপগ্রহ পৃথিবী থেকে কতটা দূরে থাকবে প্রয়োজনীয় বেগ তার উপরে নির্ভর করবে। চাঁদ পৃথিবী থেকে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে রয়েছে, তাকে ঘুরতে হচ্ছে প্রতি ঘণ্টায় দুই হাজার মাইল বেগে। পৃথিবী থেকে দুইশত মাইল দূরে অবস্থান করে যদি কেউ চাঁদের মতন পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে চায় তবে তাকে প্রথমে উপযুক্ত বেগ সংগ্রহ করে সেই কক্ষে পৌঁছতে হবে এবং তারপর সেখানে পৌঁছে প্রতি ঘণ্টায় আঠার হাজার মাইল (সেকেণ্ডে ৭·৯ কিলোমিটার) বেগে চলতে

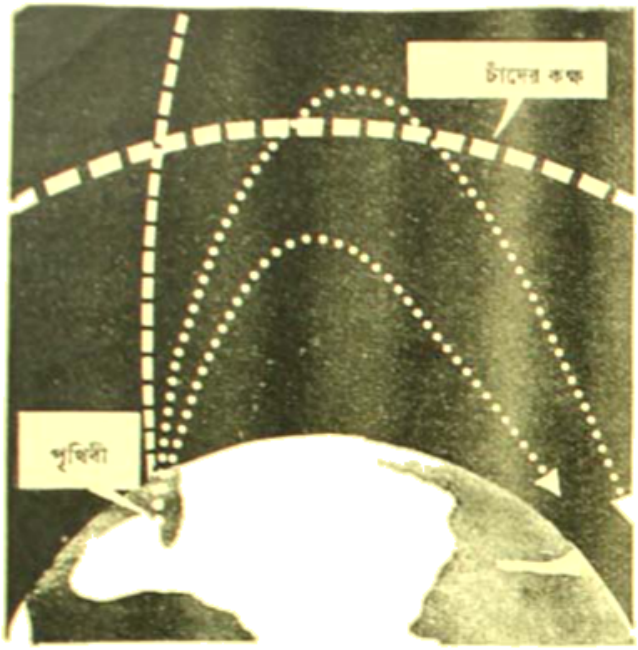

বেগের পরিবর্তনে রকেটের কক্ষ বদলাবে

হবে। কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করতে হলে মূলতঃ এই দুটো বেগ কোন বস্তুকে দিতে হবে। পৃথিবী থেকে যত দূরে যাওয়া যাবে আবর্তন বেগ অবশ্য তত কম লাগবে। কিন্তু এ থেকে একথা মনে করা ভুল হবে যে অধিকতর দূরত্বে উপগ্রহের প্রতিষ্ঠা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে, কারণ উপগ্রহের কক্ষ যত বেশী দূরে অবস্থিত হবে তাকে সেখানে পৌঁছে দিতে প্রাথমিক বেগ তত বেশী লাগবে। কৃত্রিম উপগ্রহকে রকেটের সাহায্যে পৃথিবী থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে ঠেলে দিয়ে সেখানে তাকে অনুভূমিক দিকে যথা-প্রয়োজন বেগযুক্ত করে দিলেই সে চাঁদের মতই বৃত্তপথে ঘুরপাক খেতে শুরু করবে এবং পৃথিবীর অভিকর্ষের টানই তাকে ঘুরিয়ে নিয়ে চলবে, অতঃপর আর কোন শক্তি সরবরাহ করবার দরকার হবে না। এই বেগ প্রয়োজনের চেয়ে কম হলে রকেট পৃথিবীতে নেমে আসবে এবং বেশী হলে রকেট ডিম্বাকৃতি বা উপবৃত্তপথে ঘুরবে। বেগ যত বেশী হবে, কক্ষপথ তত বেশী বিস্তৃত হবে এবং বেগ পৃথিবীর পৃষ্ঠের পঁচিশ হাজার মাইলের কাছাকাছি (সেকেণ্ডে ৩৬.৬ কিলোমিটার) হলে উপবৃত্তপথের প্রান্ত চাঁদের

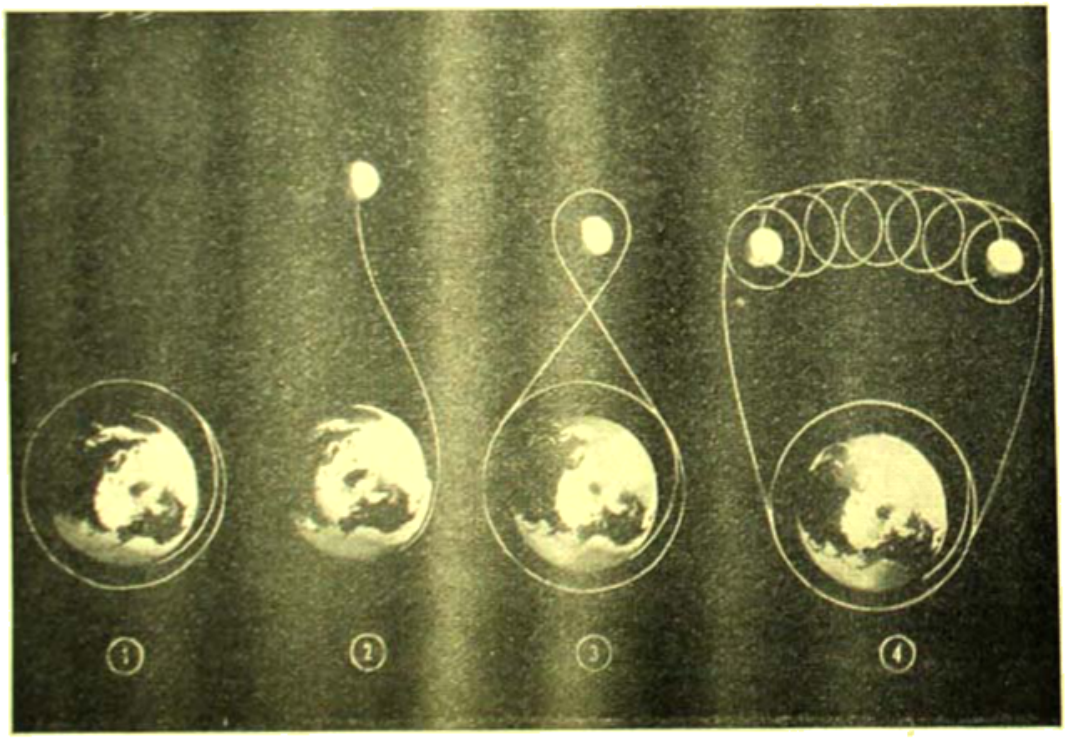

চাঁদে প্রেরিত রকেট

কৃষ্ণাগ্লাস বলিতে কি বুঝায় ঃ—

- স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সহযোগে
- জাতীয় শিল্পায়নের পরিচয় বহিয়া চলা
- বাঙালী কর্মিগণের আত্মনির্ভরতা ও সহযোগে কারিগরি শিক্ষাদান
- বাঙালী উদ্যোক্তাগণের অর্থনৈতিক পুনরুত্থান
- শ্রমিকগণের সমষ্টিগত দাবী-দাওয়া আদায়ের সংবিধানের সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া কর্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা
- শ্রমের মর্যাদা প্রদান ও শ্রমিকগণের কল্যাণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ
- শ্রমিকগণের সামাজিক ও জাতীয় কর্তব্যবোধ জাগ্রত করিয়া তোলা
- আঞ্চলিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন
- আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক কাজের অনুষ্ঠান ও তাহার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা
- জনসংযোগ ও জনকল্যাণের ব্রত

কৃষ্ণা সিলিকেট এণ্ড গ্লাস ওয়ার্কস লিঃ

হেড অফিস ঃ ১৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১

টেলিফোন ঃ ২২-৭২১৮, ২২-৭৮২১

কারখানা ঃ—১। কলিকাতা (যাদবপুর) ২ বোম্বাই

টেলিগ্রাম ঃ ৪৬-৫৩০৯

কক্ষকে অতিক্রম করে যাবে। বেগ আরও একটু বাড়লে (সেকেণ্ডে ১১·২ কিলোমিটার) রকেট চাঁদকে ছাড়িয়ে ছেড়ে পারবে এবং এর চেয়ে বেশী হলে গ্রহান্তরে পাড়ি জমানো চলবে। এই বেগকে বলা যাবে 'মুক্তিবেগ', কারণ এই পরিমাণ বেগ পেলেই কোন বস্তু পৃথিবীর আকর্ষণের টান থেকে ছাড়া পেয়ে মোক্ষ লাভ করবে। এই রকম বেগ নিয়ে নিশানা করে রকেট ছুঁড়লে তাকে চাঁদে পৌঁছিয়ে দেওয়া যাবে। নিশানা করবার ব্যাপারে খুবই সূক্ষ্ম হিসেব-নিকেশের প্রয়োজন হয়ে থাকে। একটু এদিক-ওদিক হলে লক্ষ্যভ্রষ্ট

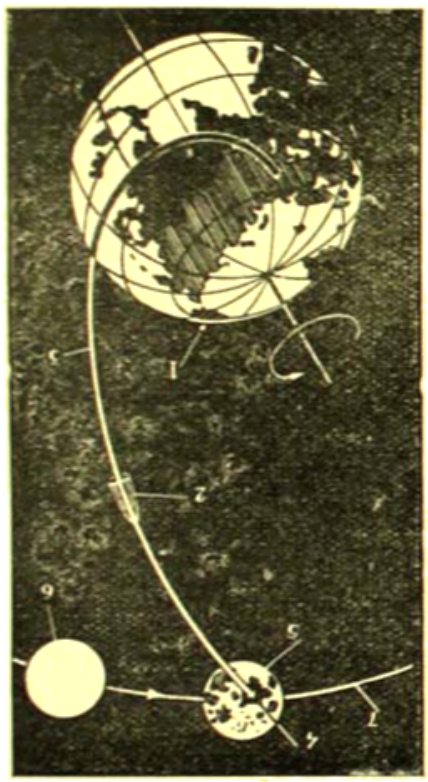

লক্ষ্যভেদ

হতে হবে। যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট রকেট চাঁদকে না ছুঁয়ে তার পাশ দিয়ে চলে আসে তবে আরও মজার ব্যাপার ঘটতে পারে। এমনি হলে চাঁদের আকর্ষণে রকেট চাঁদকে পরিক্রমা করবে এবং এমনও হতে পারে যে চাঁদকে একাধিকবার প্রদক্ষিণ করে সে আবার ধরাধামে অবতীর্ণ হবে। এ সবই নির্ভর করবে রকেটের গতি ও গতিপথের উপর। বিজ্ঞানের বাহাদুরী এই যে পৃথিবীতে বসেই শূন্যে ধাবমান রকেটের গতি ও পথ যন্ত্রবিশেষ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।

এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় সূক্ষ্মতম মাপজোখের প্রয়োজন হয়ে থাকে। চাঁদে রকেট ছুঁড়বার সময় নিশানা করতে হবে চাঁদের কক্ষস্থ সেই বিন্দুতে চাঁদ দিন দুয়েক পরে যেখানে এসে হাজির হবে। এটা অনেকটা উড়ন্ত পাখিকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ার মতন ব্যাপার। এই হিসেবে সামান্য গোলমাল হলে রকেট লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার সমূহ সম্ভাবনা। যে গতিতে রকেটকে চলতে হবে তা সেকেণ্ডে এক মিটার কমবেশী হলে রকেট ব্যর্থ হবে। রকেট যে দিকে উৎক্ষিপ্ত হবে সেই দিকের বিচার এক ডিগ্রীর দশমাংশ পর্যন্ত নির্ভুল রাখতে হবে। হিসেব মত রকেট যে মুহূর্তে ছুঁড়বার কথা তা থেকে দশ-সেকেণ্ড এদিক-ওদিক হলে লক্ষ্যস্থল হতে রকেট প্রায় একশ পঁচিশ মাইল সরে আসবে। যন্ত্রের সাহায্যে এই পথ ও গতি নির্দিষ্ট করে দিয়েই সোভিয়েট রকেটকে চাঁদে পাঠানো হয়েছে। সোভিয়েট প্রথম 'লুনিক' লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মহাশূন্যে চলে গিয়েছে, দ্বিতীয় 'লুনিক' চাঁদে পৌঁছেছে এবং তৃতীয়টি চাঁদকে প্রদক্ষিণ করেছে। কিন্তু এতেই সশরীরে চন্দ্রলোকে গমনের সমস্যার কিন্তু সমাধান হয়ে যায়নি। চাঁদে রকেট পাঠানো সম্ভব হয়েছে কিন্তু মানুষকে কি অমনি করে পাঠানো যাবে? মানুষকে শুধু সেখানে পৌঁছে দিলেই চলবে না, তাকে আবার ফিরিয়েও আনতে হবে। এ সব সমস্যার সমাধান কি সত্যি সম্ভব!

গভীর সমুদ্রের মাছকে জল থেকে তুলে নিয়ে এলে সে ফুলতে ফুলতে ফেটে যায়। চাপের হ্রাস হওয়ার ফলেই মাছের এমন দশা ঘটে। দেহের উপর থেকে বায়ুমণ্ডলের চাপ সরে গেলে মানুষেরও অনুরূপ দশা হবে। পৃথিবীর ঊর্ধ্বে বায়ু বিরল, মানুষের শ্বাসকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সেখানে যথেষ্ট মিলবে না। পৃথিবী ছেড়ে দু'মাইল ঊর্ধ্বে অবশ্য বিশেষ কোন অসুবিধে হয় না। যেটুকু হয় তাতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া শক্ত নয়। তিন মাইল ঊর্ধ্বে অক্সিজেন না নিয়ে গেলে প্রাণ বাঁচানো দায়। কিন্তু প্রকৃত বিপদ দেখা দেয় আরও ঊর্ধ্বে উঠলে। শরীরের ভিতর যে জলীয় অংশ আছে বায়ুর চাপ কমে গেলে তা দেহের স্বাভাবিক উষ্ণতাতেই ফুটতে আরম্ভ করে। নাইট্রোজেন ও

অন্যান্য যে গ্যাস এই জলীয় অংশে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে সে সব বুদবুদের আকারে বেরিয়ে আসে। বার মাইল উর্ধ্বে গেলে শরীরের ভেতরে এই সব গ্যাস দ্রবীভূত অবস্থা হতে মুক্ত হয়ে বিভিন্ন স্থানে জমা হতে থাকে, এই অবস্থায় মৃত্যু অনিবার্য। তা হলে নভোবিজ্ঞানের পরিকল্পনা কি এই কারণেই ব্যর্থ হবে? বিশেষজ্ঞেরা বলেন মাইল। বায়ুর পক্ষে দুঃপ্রবেশ্য প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ হয়ে সেখানে প্রয়োজনানুযায়ী বায়ুর চাপ ও অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা নিয়ে মানুষ আকাশে উঠবে। কিন্তু তবুও প্রশ্ন থাকছে। ঐ অবস্থায় দীর্ঘকাল মানুষ সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকবে তো? নিঃসঙ্গ ভাবে বাইরের আকাশ বাতাস আলোর সঙ্গে সংযোগহীন। অবস্থায় মানুষের মন ও মতি কি স্বাভাবিক থাকবে? তারই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে আপাততঃ ইতর প্রাণী নিয়ে।

মহাশূন্যে পৌঁছতে যে বেগ প্রয়োজন হবে তার জন্য রকেটে বিস্ফোরণে যে ধাক্কাটা লাগবে মানুষ তা সহ্য করতে পারবে কি? একই বেগে চলতে থাকলে তা সে বেগ যতই প্রচণ্ড হোক না কেন মানুষের দেহে তার কোন অস্বস্তিকর প্রতিক্রিয়া হয় না। পৃথিবীর আবর্তনের সঙ্গে আমরাও তো প্রতি সেকেণ্ডে আঠার মাইল বেগে ছুটে চলেছি। কিন্তু কোন বস্তুতে বেগ বাড়াতে হলে তাকে ধাক্কা দিতে হয়। পৃথিবীর আকর্ষণ কাটিয়ে দূরে পাঠাতে হলে রকেট ও আরোহীকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিতে হবে। এই ধাক্কায় শরীরের উপর যে প্রতিক্রিয়া হবে মানুষের পক্ষে কি তা সহনীয় হবে? পরীক্ষায় দেখা গেছে স্বাভাবিকভাবে দেহ যে পরিমাণ ধাক্কা সইতে পারে তার চেয়ে চার পাঁচগুণ ধাক্কা লাগলেও সে মরবে না এবং উর্ধ্বে যাওয়ার সময় শরীরকে অনুভূমিক রাখলে এ ক্ষমতা আরও বাড়বে। কিন্তু এই ধাক্কা আরও প্রচণ্ড হলে রক্তসংবহন ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যাবার সম্ভাবনা এবং মার্জের কার্যেও গোলমাল বেঁধে যেতে পারে। বিশেষ রকম দেহ-বর্ম পরে এবং বিশেষ ভঙ্গীতে শরীরকে রেখে অভ্যাস দ্বারা দশ বারগুণ বেশী ধাক্কা সহনীয় করা যেতে পারে। এই ব্যাপারে দেহের সহনক্ষমতা বিষয়ে সঠিক কিছু বলা যায় না কারণ স্বল্পকালস্থায়ী পরীক্ষায় যা জানা গেছে, দীর্ঘকাল ধরে মানুষকে এই সব অবস্থার ভেতর দিয়ে যেতে হলে তখন অবস্থা কি দাঁড়াবে তা বলা মুস্কিল।

প্রচণ্ড গতি পেয়ে পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে যাবার পর রকেটের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাবে, তখন আবার আসবে এক বিপরীত অনুভূতি। পৃথিবীর টান তখন আর নেই—'ভারমুক্ত' সেই অবস্থায় মানুষের দশা কি হবে? সেখানকার মহাশূন্য বাহুতঃ অবস্থাটা কি হবে তা কল্পনা করা যেতে পারে। পাত্র থেকে জল ঢাললে তা পড়বে না, হাত পা নাড়াচাড়া করতে কোন শক্তি খাটে হবে না। তাই প্রশ্ন হচ্ছে দেহযন্ত্রের কার্যাবলী কি তখন স্বাভাবিক ভাবেই চলবে? চলাফেরা ও খাদ্যাদি গ্রহণে কি অসুবিধে হবে না? আশঙ্কা করা হচ্ছে যে মানসিক ও শারীরিক নানা সমস্যার উদ্ভব হবে। দীর্ঘকাল এই পরিস্থিতিতে থাকতে হলে মানুষের খাদ্যগ্রহণ ও চলাফেরায় নূতন কায়দা অভ্যাস করতে হবে। এই বিষয়ে পরীক্ষা করাও সহজ নয়। কারণ যান্ত্রিক উপায়ে দীর্ঘকালস্থায়ী ভারমুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। ইতর প্রাণী নিয়ে যে পরীক্ষা করা হয়েছে তাতে এইটুকু মাত্র জানা গেছে যে স্বল্পকাল এই অবস্থায় থাকলে স্নায়ুতন্ত্র বা রক্তসংবহন তন্ত্রের কার্যে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। কিন্তু এই ব্যাপারে এখনও অনেক পরীক্ষা চালাতে হবে এবং সেজন্য ইতর প্রাণীর বদলে মানুষকেই ঝুঁকি নিয়ে চরম সত্য জেনে নিতে হবে। আশা করা হচ্ছে ভারমুক্ত অবস্থার প্রতিক্রিয়া মানবদেহে অসহনীয় হবে না।

নভোযানের বাইরে যেতে হবে বায়ুর পক্ষে দুঃপ্রবেশ্য প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ হয়ে। উল্কা পতনের ফলে সেই প্রকোষ্ঠ যদি ফুটো হয়ে যায়? অর্থেক ওজনের উল্কাপিণ্ড কয়েক ইঞ্চি পুরু এলুমিনিয়মের আবরণ ভেদ করে যেতে পারবে। এমনি উল্কার আক্রমণে নভোযাত্রী পরাস্ত হবে সন্দেহ নেই। এই বিষয়ে ভাবনা হওয়া অস্বাভাবিক নয় কারণ পৃথিবীর উপরে ক্ষুদ্র আকারের উল্কা প্রতিদিন কয়েক লক্ষ করে পড়ছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞেরা বলেছেন এতে উতলা হবারও কিছু নেই, পৃথিবীটা আকারে প্রকাণ্ড বলেই (ভূপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল দুই হাজার কোটি বর্গ মাইল) পৃথিবীতে পতনশীল উল্কার সংখ্যাটা বেশী। একটি নভোযানের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল যদি এক হাজার বর্গফুটও ধরা যায় তাহলে ১/৫ ইঞ্চি আকারের উল্কা ২৩০০০ বৎসরে উহার উপরে একটির বেশী পড়বে না, বৃহত্তর উল্কার আক্রমণের সম্ভাবনা আরও কম।

পৃথিবীর উপরে সবরকম আলট্রাভায়োলেট তথা কসমিক রশ্মি এসে পড়ছে। এই রশ্মিগুলোর প্রতিক্রিয়ায় দেহের

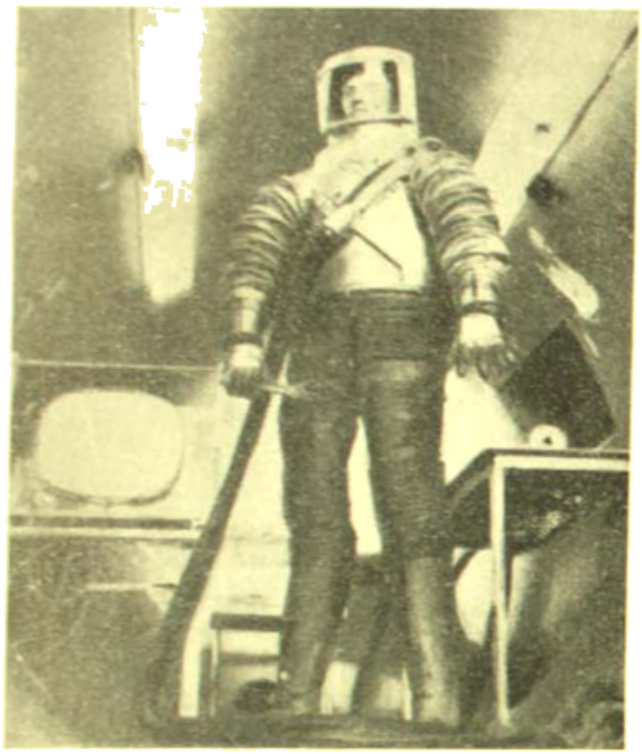

মহাকাশচারীর কেমন উড়াও

উপর কত হওয়ার কথা নয়। শক্তিশালী এক্স-রশ্মি, গামা-রশ্মি বা পরমাণু থেকে বিকিরিত তেজ মানুষের দেহের যে প্রকার ক্ষতি করে এই রশ্মিগুলোও তেমনি ক্রিয়া করবে। বায়ুমণ্ডলের প্রতিরোধে বেশীর ভাগ রশ্মিই ঊর্ধ্বাকাশে আটকা পড়ে, পৃথিবীতে সামান্যই পৌঁছায় এবং সেজন্য আমরা এদের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিশেষ টের পাই না। কিন্তু মহাশূন্যে বিচরণকালে এর ঘোরালো আক্রমণ থেকে মানুষ কি আত্মরক্ষা করতে পারবে? পনর কিংবা মাইল ঊর্ধ্বে কসমিক রশ্মির তীব্রতা ভূপৃষ্ঠের তুলনায় ষোড়শ গুণ হলেও তা দেহের পক্ষে আপাত ক্ষতিকারক নয়, কিন্তু সুদীর্ঘকাল পরে এর কোন প্রতিক্রিয়া হবে কিনা তা এখনই বলা চলে না। ইঁদুর প্রভৃতির নিয়ে যে পরীক্ষা করা হয়েছে তা খুব আশাপ্রদ নয়। কিছু মাইল ঊর্ধ্বে রকেটে পাঠিয়ে তাতে ইঁদুরকে চব্বিশ ঘণ্টা কাল রেখে দেখা গেছে দুই তিন মাস পরে কিছু লোম সাদা হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। কিন্তু একজাতীয় পোকাকে পাঠিয়ে দেখা গেছে তাদের পরবর্তী সপ্তম পুরুষ বংশবৃদ্ধির পূর্ণাবয়ব লাভ করার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। মহাশূন্যে এই রশ্মির তীব্রতা আরও অনেক বেশী হবে, তা থেকে মানুষ আত্মরক্ষা করতে পারবে কি? উপযুক্ত বর্মের আবরণে রশ্মিগুলোকে আটকানো যাবে বলা হচ্ছে, তা না পারলে মহাশূন্যে বিচরণ স্বপ্ন হয়েই থাকবে।

চাঁদ বা গ্রহান্তরে পৌঁছে সেখানে অবতরণ ও বসবাস করা আদৌ চলবে কি? চাঁদে নেই জল, নেই বায়ু—মানুষ সেখানে নামলেই মারা পড়বে। চিন্তা করা হচ্ছে ডুবুরীদের মত কোন পোষাক কিংবা ছুচে ব্যবহৃত ট্যাঙ্কের মত বায়ু-নিরোধক গাড়ি সেখানে ব্যবহার করা হবে। গাড়ির ভেতরেই মানুষের জীবন-ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সব উপকরণ নিয়ে যেতে হবে। চাঁদে গিয়ে পৌঁছুলে সেখান থেকে আবার ফিরে আসবার ব্যবস্থাটাও পৃথিবী থেকে করে নিয়ে যেতে

কৃত্রিম উপগ্রহের পরিকল্পিত রূপ

হবে। মাটিতে বেশ, বিভিন্ন রাসায়নিক ও খাদ্যোপাদান জন্য কোটি কোটি টন বিভিন্ন পদার্থ—সব মিলিয়ে কয়েক লক্ষ টন ওজন হবে। এত ভারী রকেট নির্মাণ করা অসম্ভব বলেই মনে করা হচ্ছে। বিকল্প-পন্থা হিসেবে পৃথিবী ও চাঁদের মাঝখানে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়ে একটা মহাকাশী ঘাঁটি নির্মাণ করার কথা ভাবা হচ্ছে। এই ঘাঁটি থেকে চাঁদে যে মহাকাশযান যাবে তাকে আকারেও ছোট হবে। মাঝের এই উপগ্রহ ঘাঁটিতে স্বাভাবিক ভাবে বসবাস করতে পারে এমন কোন প্রাণী নেই। কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে এখানে বাস করে পৃথিবীতে বাস করার মতন অভ্যস্ত হওয়া যাবে। পৃথিবী থেকে এই ঘাঁটিতে কিছুদিনের জন্য যাত্রীরা যাবে। এরা সেখান থেকে প্রয়োজন মত চাঁদে বা যে কোন গ্রহে পাড়ি দিতে পারবে।

চাঁদ অভিযানের পরিকল্পনা এই ভাবে চাঁদকে শুধু প্রদক্ষিণ করে ফিরে আসার সম্বন্ধে করলে সে কাজ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হবে। এপোলো-যানের দুইটি মূলিক চাঁদকে একটি পরিক্রমা করতে বলে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু রকেট চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে যে কোনও মানুষকে সেই রকেটে পাঠানো হলে পূর্বোক্ত সমস্যাগুলোর নিরসন করতে হবে। মানুষকে চাঁদের কাছে নেবার পর ফিরিয়ে আনতে হবে। রকেটকে সোজা ভাবে না পাঠিয়ে সোজা এবং প্রকার ভঙ্গিতে পাঠানো হবে, যাতে রকেট নিজে চাঁদের টানে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে পৃথিবীর দিকে ফিরে আসতে পারে। রকেটের সোজা ভাবে না পাঠিয়ে সোজা এবং প্রকার ভঙ্গিতে পাঠানো হবে, যাতে রকেট নিজে চাঁদের টানে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে পৃথিবীর দিকে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু এই ফিরে আসার পথে কিছু সমস্যা আছে। মানুষকে নিয়ে রকেটের গতিবেগ এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে পৃথিবীর কাছে এসে রকেট ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল বেগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। এই সময়ে রকেট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মানুষটির সাহায্যে তখনো কোন যান সম্বন্ধে অভিযানে হবে সফল

এই আছে, বিজ্ঞানের, সমস্যা চন্দ্রিল। তবুও মানুষের সাহস ও সাধন তাকে সব সমস্যা জিতে যাবে। চাঁদ আজ মানুষের কাছে নিয়েছে হাতছানি, এবার হাতে হাত মিলিয়ে, বিজ্ঞানের মান নিয়ে তাকে জয় করতে হবে—এই কথাই এই সময়ে সবার

★ দেশবাসীকে আমাদের ★

শারদীয় অভিবাদন • • •

ও

• • • অভিনন্দন জানাই

D. RATAN & CO.

Artists and Photographers

22/1, CORNWALLIS STREET,
CALCUTTA-6

PHONE : : 34-3711

সোভিয়েত দেশের কয়েকখানি বাংলা বই

ইভান তুর্গেনেভের

*** বসন্ত প্লাবন ***

ইভান তুর্গেনেভের নাম আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী মহলে পরিচিত। উনবিংশ শতাব্দের রুশ সাহিত্য তথা বিশ্বসাহিত্যের একজন দিক্‌পাল ছিলেন তিনি। পুশকিন, লের্মন্তফ ও গোগোলের পাশেই তাঁর আসন।

তুর্গেনেভের "ভার্জিন সয়েল" রুশ সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস যার মধ্যে অক্টোবরোত্তর প্রতিনিধিরা চরিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। অক্টোবর আন্দোলনের সেই প্রাথমিক অবস্থায় লেখক সেই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ বিশ্বব্যাপী রূপ মানস চক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন।

"বসন্ত প্লাবন" তুর্গেনেভের শেষ বয়সের পরিণত প্রতিভার এক অপূর্ব সৃষ্টি। এ এক আশ্চর্য প্রেমের গল্প। তুর্গেনেভের আদর্শবাদী রুশ তরুণ সম্প্রদায়ের এক মর্মান্তিক ট্রাজিডিও বটে। ভাষা ও শিল্পশৈলীর দিক থেকে এই উপন্যাসটিকে এক অভিনব কাব্যোপন্যাস বলা চলে। নির্মম সমাজ-বাস্তবতার সঙ্গে সৌন্দর্য ও কাব্যরসের এমন নিখুঁত সংমিশ্রণ একমাত্র দিক্‌পাল শিল্পীর সৃষ্টিতেই চোখে পড়ে।

লিও টলস্টয়ের

*** সেবাস্তোপলের কাহিনী ***

লিও টলস্টয়ের নাম বাংলার পাঠক মহলে সুপরিচিত বললেও কম বলা হয়। "সেবাস্তোপলের কাহিনী" এই মহালেখকের জীবন ও সাহিত্যের বিকাশের ইতিহাসে এক অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

১৮৫৪ সালের ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় রুশ বন্দর সেবাস্তোপল ফরাসী নৌবহরের দ্বারা যখন অবরুদ্ধ তখন এক গোলন্দাজ বাহিনীর নায়করূপে বিখ্যাত চতুর্থ কেল্লার প্রাকারে দিনের পর দিন টলস্টয় লড়াই করেছিলেন। সেই যুদ্ধের অগ্নিশিখা তাঁর সাহিত্য-প্রতিভাকে উদ্দীপ্ত করে। টলস্টয়ের যুদ্ধকাহিনী যুদ্ধের রোমাঞ্চ ও মিথ্যা কল্পনা ছিন্নভিন্ন করে দেয়। যুদ্ধের এতখানি নির্মম সমালোচনা এর আগে আর হয়নি। সেবাস্তোপলের যুদ্ধের মধ্যেই রুশিয়ার আসল মানুষ, সিপাইবেশী চাষীদের সোনার চেয়ে দামী চরিত্রের সাক্ষাৎকারে এসে মোড় ঘুরে গেল টলস্টয়ের জীবনের ও সাহিত্য-সাধনার।

এই অভিনব যুদ্ধ-কাহিনীর মত মানব প্রেমের এতবড় আলেখ্য বিশ্বসাহিত্যে বিরল।

এম মিক্রিউকফের

*** মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ***

তেরা বিলশাই-এর

*** সোভিয়েত ইউনিয়নে নারী ***

প্রাপ্তিস্থান : ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সী (প্রাঃ) লিঃ
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট :: কলিকাতা-১২

ভিও মেজ দুনারোদনায়া ক্নিগা
মস্কো—২০০ ইউ এস এস আর

নব নাট্য আন্দোলনের পটভূমি

(প্রবন্ধ)

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১)

বাংলা দেশে নব নাট্য আন্দোলনের রূপ যাই হোক তার অস্তিত্বকে অন্তত আর কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারেন না। অবশ্য কোন কোন লোককে বলতে শোনা যায়—কিছুই হচ্ছে না, শুধু গুজব। কেউ কেউ বলছেন—আন্দোলন হয়েছে সত্য, কিন্তু নাটক কোথায়?—একথাও তো নাটক হচ্ছে না। অপরদিকে প্রচারকৌশলের জোরে অ-নাটককে নাটক বলে চালাবার উদ্যোক্তাও কম নয়। একদিকে উদাসিকতা, আর একদিকে বদান্যতা। এর ফলে সাধারণ লোক বেশিকটা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়তে বাধ্য।

নব নাট্য আন্দোলনের পতাকা তুলে কোন অক্ষম নাট্যকার যদি তাঁর দুর্বল নাটককে প্রগতির ফোঁটা-তিলক পরান এবং তা নিয়ে কীর্তন শুরু করেন, তা যেমন হাস্যকর, তেমনি যে সমস্ত তাৎপর্যপূর্ণ আধুনিক নাটককে অবলম্বন করে বর্তমান নাট্য আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছে সেগুলোকে নস্যাৎ করে কেউ যদি দিগ্‌গজ সাজবার চেষ্টা করেন তবে তাও হাস্যকর। নাটকই যদি না আসবে তবে নাট্য আন্দোলনের ভিত্তি রচিত হবে কী করে? এ যেন হ্যামলেট ছাড়াই হ্যামলেটের অভিনয়। পুরনো নাটক নিয়ে নিশ্চয়ই নব নাট্য আন্দোলনের জন্ম হয়নি। নতুন নাটকই নব নাট্য আন্দোলনকে জন্ম দিয়েছে। এই মূল সত্যটাকে স্বীকার না করলে নব নাট্য আন্দোলনের যথার্থ মূল্যায়ন করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

একথা সর্বজনবিদিত ও ইতিহাসসম্মত যে, যখনই কোনো নতুন সৃষ্টিধর্মী শিল্প আন্দোলন আসে তখনই তার পূর্বসূরীর থাকে একটা নতুন জীবনবোধ, বৈপ্লবিক চিন্তাধারা, নতুন জীবনবোধ ও রূপান্তরের ঝোঁক। ইতালীয় রেনেসাঁস এবং ইউরোপে যে শিল্পবিপ্লবের ঢেউ এসে, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের পরিবর্তে ধনতন্ত্রবাদের অভিষেক ঘটল মুক্তি ও সাম্যের পথ খোঁজে, তখন সেই সন্ধিক্ষণের রেনেসাঁসের মানবতাবাদী নাট্যকার শেক্সপিয়র অথবা ফরাসী বিপ্লবের শতাব্দীর শেষদিকে ইউরোপে যে নব নাট্য আন্দোলনের বিকাশ হয়, তারও মূলে ছিল যেমনি একটা নতুন চেতনা। আমাদের দেশের বর্তমান নব নাট্য আন্দোলনকে পরিপ্রেক্ষিতে চিহ্নিত করতে হলে ইউরোপের যে কয়েকটি নাট্য আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতটি আমাদের জানা দরকার তা হল এই।

উনিশ শতকের মধ্য ভাগে ইউরোপের নাটকের মধ্যে অভাবনীয় বিস্ময়কর চমক দেখা যায়। অতিনাটকীয়তা ও ভাবালুতা পূর্ণ নাটকগুলো আজ স্বল্প জোর পেয়ে থাকে। কিছু পুরনো ভালো নাটক অবশ্য মাঝে মাঝে অভিনীত হয়, কিন্তু ছাঁটা-কাটা করে সেগুলোকে এমনভাবে পরিবর্তিত করা হয়েছে যে, সামাজিক মূল্য ও নাটকীয়তা প্রায় সবক্ষেত্রেই বিনষ্ট হয়ে উঠেছিল। তখন প্রয়োজন হয়েছিল নতুন নাটকের পুরনো কাঠামোটা অনুসরণ করে নতুন নাটক লেখার চলল। কিন্তু সে চেষ্টা এমনভাবে ব্যর্থই হল বলা চলে, এমন কি ইবসেন, ব্রাউনিং এবং টেনিসনের মতন শক্তিমান কবিরাও সেপথে গিয়ে ব্যর্থকাম হলেন। পুরনো ছকে পুনরুজ্জীবিত করতে গিয়ে তাঁরা বিষেটারকে নতুন প্রাণশক্তি যোগাতে পারলেন না। এলিজাবেথের যুগের যে অবসান হয়েছে, মানুষের মনে যে নতুন চিন্তা এসেছে, সেই নতুন চিন্তা

যে নাট্যসাহিত্য প্রকাশ পেতে চাচ্ছে, তা উপলব্ধি করতে না পারাই তাঁদের ব্যর্থতার কারণ। নতুন যুগের কথা, নতুন যুগের চিন্তা খুঁজতে লাগলো নতুন নাট্যকারকে যিনি তাদের রূপ দেবেন নতুন শৈলীতে, নতুন আঙ্গিকে।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকেই বিজ্ঞান সম্পর্কে মানুষের মনে একটা নতুন বোধ জন্মে। আগেকার দিনে বিশ্বাস ছিল, কতগুলো বিষয় অধিক গুরুত্বপূর্ণ আর কতগুলো বিষয় কম গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা বলে, কতগুলো জিনিসকে অনাবশ্যক বোধে যদি বাদ দেওয়া হয় এবং সামগ্রিক সৃষ্টিকে যদি না ভাবা হয়, তবে বাস্তবতা বিকৃত হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানের এই নতুন বোধ দ্বারা ইউরোপের শিল্প-সাহিত্যও প্রভাবিত হয়। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বস্তুজগতে যেমন পরিহার্য বলে কিছু নেই, শিল্প-সাহিত্য ক্ষেত্রেও তেমনি জীবনের পরিহার্য-অপরিহার্য সীমারেখা ক্রমশ ঘুচে যায়। যে-জীবন আগে উপেক্ষিত হতো, শিল্প-সাহিত্যে তাই উপজীব্য হয়ে আসতে থাকে। শিল্প-সাহিত্যে জন্মতে এলো একটি নব গণতান্ত্রিক ঘুম। বণিকতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরাও দাবী করে বসলেন, তাঁদের দিকেও নজর দিতে হবে। গোড়ার দিকে অবশ্য তাঁরা এমন একটা ভাব দেখালেন যে, অভিজাত শ্রেণীর জীবন নিয়ে রচিত নাটকগুলো দেখে তাঁরা যথেষ্টই আনন্দ পান। কিন্তু এটা ছিল তাঁদের ভান। মনের আসল কথাটা পরে ব্যক্ত হয়ে পড়লো। তাঁরা চাইলেন তাঁদের নিজেদের জীবনচিত্র মঞ্চে দেখতে। ফলে সংঘাত ও সংকট দেখা দিল। ক্লাসিক্যাল ও এলিজাবেথীয় যুগের নাট্য-বিধান অনুযায়ী ট্র্যাজেডি লিখতে হলে একজন অসাধারণ লোকের পতন দেখাতে হয়। কিন্তু বুর্জোয়া ট্র্যাজেডি লেখকরা তা স্বীকার করলেন না। তাঁরা বললেন, যে বংশেই জন্ম হোক বা যে শ্রেণীরই হোক, মানুষ হিসেবে মানুষের মর্যাদা সবারই সমান। সুতরাং নাটকের নায়ক হতে কারুরই বাধা নেই। বলা বাহুল্য, এই বিদ্রোহী চিন্তাধারাই উনবিংশ শতকের শেষার্ধে ইউরোপের নাট্য-জগতে এক বিপ্লব সৃষ্টি করলো।

ইওরোপের এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে প্রতিফলিত হয় ইবসেনের নাটকে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রচিত 'ঘোস্ট্‌স্' নাটক এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। ট্র্যাজেডি নতুন রূপ নিয়ে আসে। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী কোনো রাজা এ নাটকের নায়ক হয়নি। তাছাড়া এর ভাষাও হয় স্বতন্ত্র। কাব্যের ভাষা ছেড়ে এ নাটকে এমন সাধারণ গদ্য ভাষা ব্যবহার করা হয় যা সচরাচর সাধারণ লোকের মুখে শুনতে পাওয়া যায়। ভাষা যাতে বিজ্ঞানসম্মত হয় সেদিকে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রেখে নাটক রচনা করেন ইবসেন। 'ঘোস্ট্‌স্' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র মিসেস আল্‌ভিং নরওয়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি নারী। তাঁর স্বর্গত স্বামী ক্যাপ্টেন আলভিং-এর স্মৃতিরক্ষার্থে তিনি একটি অনাথ আশ্রম খোলেন। পুত্র অস্‌ওয়াল্ড্ প্যারিস থেকে ফিরে এসেছেন। নাটক শুরুবার সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারা যায় মিসেস আলভিং বিবাহিত জীবনে সুখী ছিলেন না। স্বামী ছিলেন অসচ্চরিত্র আর মিসেস আল্‌ভিং নিজে ছিলেন নীতি-পরায়ণা। একবার তিনি স্বামীকে ত্যাগ করতে চাইলেন, কিন্তু পাস্টর মাণ্ডার্স-এর পরামর্শে তিনি ক্যাপ্টেনের কাছে ফিরে এলেন। জন্ম হলো অস্‌ওয়াল্ড্-এর। কিন্তু পিতার কুৎসিত ব্যাধি তার দেহে দেখা দিল। নাটকের শেষের দিকে দেখা যায় অস্‌ওয়াল্ড্-এর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে। মিসেস আল্‌ভিং বুঝতে পারলেন—স্বামী তাঁর জীবনে অভিশাপ, শত চেষ্টা করেও তা থেকে মুক্তি পাওয়া গেল না। মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি ভাবছেন, বিষপ্রয়োগে পুত্রের এই অভিশপ্ত জীবনের অবসান করবেন কি না?

নতুন নাটকের প্রত্যাশায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা 'ঘোস্ট্‌স্' পেয়ে উত্তপ্ত হলেন। প্রত্যয়ের সঙ্গে তাঁরা বললেন, একটি যথার্থ সমস্যাকে বাস্তবানুগ করে রূপ দেওয়া হয়েছে; ভেতরে প্রবেশ করে জীবন যা তাই দেখানো হয়েছে। প্যারিসে আঁদ্রে আঁতোয়া 'থিয়েতর লাইবর' (ফ্রী থিয়েটার) স্থাপন করে 'ঘোস্ট্‌স্'-এর ফরাসী অনুবাদ মঞ্চস্থ করালেন এবং নিজে 'অস্‌ওয়াল্ড্'-এর ভূমিকায় অভিনয় করলেন। প্যারিসের 'থিয়েতর লাইবর'-এর দেখাদেখি ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনে প্রতিষ্ঠিত হলো 'ফ্রেই বুন' (মুক্ত নাট্যশালা) এবং তার উদ্বোধন হলো 'ঘোস্ট্‌স্' নাটক দিয়ে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট্ থিয়েটার' তার দ্বারোদ্ঘাটন করলো 'ঘোস্ট্‌স্' নাটক দিয়েই।

ইবসেন তাঁর 'ঘোস্ট্‌স্' নাটকের দ্বারা যে নব নাট্যধারার প্রবর্তন করেন, ক্রমশ সমগ্র ইওরোপে তা ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। স্ট্রীণ্ডবার্গ, শেখভ, বার্ণার্ড শ' প্রভৃতির নাটকের দ্বারা উত্তরকালে তা আরো পরিপুষ্টি লাভ করে। নাটকের বিষয়বস্তু, রূপ, আঙ্গিক সমস্তই পরিবর্তিত হয়ে যায়। রাজা-রাজড়ার পরিবর্তে সাধারণ মানুষ এসে নাটকের নায়কের আসন গ্রহণ করে। নাটকের চরিত্রগুলি কথা বলতে আরম্ভ করে সাধারণ মানুষের ভাষায়—কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত হয়ে নাটক স্বাভাবিকতার পথ ধরে।

ইবসেনের 'ঘোস্ট্‌স্' নাটকের নায়িকা মিসেস আল্‌ভিং উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর। বিংশ শতাব্দীতে গোর্কি নজর দিলেন সমাজের আরো নীচের তলার দিকে। তিনি লিখলেন 'দি লোয়ার ডেপথস্'। বাহ্যত সামাজিক দৃষ্টিতে যাদের জীবনের কোনোই মূল্য নেই, যারা সমাজের জঞ্জাল বললেও চলে, তাদেরও যে আত্মার সত্তা আছে, গ্লানির মধ্যেও যে জীবনবোধ আছে, সেদিকেই অঙ্গুলিসংকেত করলেন গোর্কি। 'দি লোয়ার ডেপথস্' নাটকে কোনো ব্যক্তি-বিশেষ নায়ক নয়, সমস্ত চরিত্র মিলে নায়ক হয়ে উঠেছে। প্রতিকূল চরিত্রও কোনো ব্যক্তি নয়, পরিবেশটাই তাতে প্রতিকূল চরিত্রের ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

মার্কিন নাট্যকার ইউজিন ও' নীল তাঁর 'ডিজায়ার আণ্ডার দি এল্‌মস্' নাটকে নায়ক করে আনলেন নিউ ইংল্যাণ্ডের আদিম শ্রেণীর মানুষকে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই নাটক রচনা করেন। নাটকের পাত্রপাত্রীরা যে-জীবন যাপন করে তা প্রায় পশুস্তরের। কিন্তু তাদের বর্বর জীবনের চিত্র আঁকাই নাট্যকারের উদ্দেশ্য নয়। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, জীবনের প্রচণ্ড দাবী বর্বরভাবে আত্ম-প্রকাশ করলেও তার মধ্যে একটা গৌরব থাকে। অবশ্য নাটকটি যৌনসমস্যাকেন্দ্রিক। কিন্তু একজন বর্বর মানুষের জীবনসমস্যাও যে আবেগের দিক থেকে গ্রীক ট্র্যাজেডির সমপর্যায়ে গিয়ে পৌঁছুতে পারে ইউজিন ও' নীল সার্থকভাবেই তা প্রমাণ করেছেন। সেজন্যেই তাঁর 'ডিজায়ার আণ্ডার দি এলম্‌স্' নাটককে বলা হয়, 'আধুনিক ইডিপাস্'।

এখন বিচার্য বিষয় হলো, আধুনিক বাংলা নাটকে এ সমস্ত লক্ষণগুলি আছে কি না। অনুকরণের কথা বলা হচ্ছে না। বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নব নাট্য আন্দোলনের নাট্য-কারগণ নাটক রচনা করেছেন কি না। আরও একটি বিচার্য বিষয় হলো, এ যুগের জীবনদর্শনের ভিত্তিতে নতুন মানবতা-বোধ সাম্প্রতিক নাটকগুলোতে প্রকাশ পাচ্ছে কি না।

বাংলা নাটকের ইতিহাসে দেখা যায়, বর্তমান শতকের চতুর্থ দশক পর্যন্ত যত সামাজিক নাটক রচিত হয়েছে তার অধিকাংশই মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে' সাধু-চরণ, রাইচরণ, তোরাপ প্রভৃতি জীবন্ত চাষীচরিত্র এলেও তারা নাটকের প্রধান চরিত্র নয়। গোলক বসুর পরিবারকে কেন্দ্র করেই নাটকের কাহিনী বিস্তৃত। গোলক বসু প্রধানত কৃষিজীবী হলেও ঠিক চাষী অর্থাৎ সমাজের নীচের তলার মানুষ নন। সম্পন্ন গৃহস্থ পরিবার। সুতরাং 'নীল-দর্পণ'কে একান্তভাবে অন্ত্যজকেন্দ্রিক নাটক বলা চলে না। তবে একথা ঠিক যে, পার্শ্বচরিত্র হলেও 'নীলদর্পণে'র চাষীদের মধ্যে দীনবন্ধু যে প্রচণ্ড আবেগ সৃষ্টি করেছেন, বাংলা নাটকে তা বিরল। মাইকেলের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নাটকে অবশ্য দীনবন্ধুর আগেই চাষী চরিত্র এসেছিল। গিরিশচন্দ্র 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে কিছু চাষীচরিত্র আমদানী করেছিলেন কিন্তু তাঁর 'প্রফুল্ল', 'বলিদান' প্রভৃতি সামাজিক নাটক মধ্য-বিত্তকেন্দ্রিক। শরৎচন্দ্রের 'রমা' নাটকে আকবরকে অতি অল্পক্ষণের জন্যেই পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' ও 'মুক্তধারা' নাটকে যে সমস্ত গ্রামবাসী রয়েছে তারা ঠিক চাষীচরিত্র হয়ে ওঠেনি।

আধা-সামন্ততান্ত্রিক অবস্থার মধ্যে বাস করে এবং যে-দেশের শতকরা আশীজনেরও বেশি কৃষিজীবী সে-দেশের মানুষ হয়ে আমাদের পূর্বসূরীরা কৃষকজীবন অর্থাৎ সমাজের নীচের তলার মানুষকে কেন্দ্র করে দু'চারখানা নাটক লিখতে পারতেন না, একথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। আসলে এদেশে সাহিত্যচিন্তা তখনো সেপথে ধাবিত হয়নি বলেই তাঁদের দৃষ্টিও সেদিকে নিবদ্ধ হয়নি। তাঁরা ছিলেন বুর্জোয়া মানবতাবাদ বা জীবনবোধে বিশ্বাসী। নীতিগতভাবে তাঁরা সকল মানুষকেই সমান মর্যাদা দানের আদর্শে বিশ্বাস করতেন; সমাজের অবহেলিত ও অনাদৃত মানুষের প্রতি তাঁদের সহানুভূতি, অনুকম্পা এবং দয়াও ছিল। কিন্তু

একাত্মবোধ ছিল না। এই কারণেই নীচের তলার মানুষের জীবনে তাঁরা এমন কোনো নাটকীয় উপাদান দেখতে পাননি যা দিয়ে একখানা পূর্ণাঙ্গ সার্থক নাটক রচিত হতে পারে। শোষণের বিরুদ্ধে সময় সময় তাঁদের লেখনীতে ক্ষুব্ধ রোষও প্রকাশ পেয়েছে; নীতিগতভাবে তাঁরা তাতে বেদনাবোধও করেছেন, কিন্তু সমাধান খুঁজেছেন পুরনো কাঠামোতে। নতুন কোনো সমাজবিন্যাসের কথা তাঁরা ভাবতে পারেননি। 'রথের রশি' নাটকে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য শেষপর্যন্ত সমাজের তথাকথিত অপাংক্তেয়দের হাতেই রথের রশি তুলে দিয়েছেন; ইঙ্গিতধর্মী প্রকাশ পেলেও একটি ভাব উপলব্ধি করা ছাড়া তাতে আমরা জীবনের প্রত্যক্ষ উষ্ণস্পর্শ অনুভব করিনে।

মোট কথা, মানুষকে সমমর্যাদা দানের বুর্জোয়া আদর্শ যে পুঁজিবাদী শ্রেণীশোষণের চড়ায় ঠেকে বানচাল হয়ে গেছে, বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা তা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি বা দেখেও দেখতে চাননি। তার ফলে তাঁদের মধ্যে একটা ভাবসংকট দেখা দেয় যা থেকে উৎপত্তি হয় সংস্কারবাদের। বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমাজে শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে বৈষয়িক বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়, তাতে সকল মানুষ সমান মর্যাদা লাভের সুযোগ পেতে পারে না। বুর্জোয়া চিন্তানায়ক ও শিল্পী-সাহিত্যিকগণ যে মানসিক উদারতা নিয়ে একদিন মানুষের সমমর্যাদা, স্বাধীনতা ও মুক্তির কথা ঘোষণা করেছিলেন, তাকেই দৃঢ়ভিত্তির ওপর দাঁড় করাবার জন্যে শ্রেণীশোষণমুক্ত একটি নতুন সমাজবিন্যাসের প্রয়োজন দেখা দিল। বলা বাহুল্য, মার্ক্সীয় দর্শনই নিয়ে এলো এই নতুন সমাজচিন্তা। মৌল বুর্জোয়া মানবতাবোধের সঙ্গে মার্ক্সীয় মানবতাবোধের বিরোধ নেই—কিন্তু পার্থক্য আছে। বুর্জোয়া চিন্তা শ্রেণীশোষণকে অব্যাহত রেখেও মানবতা প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী—মার্ক্সীয় চিন্তা শ্রেণীশোষণের অবসানের মধ্যেই যথার্থ মানবতার প্রতিষ্ঠায় প্রত্যয়ী। এই শ্রেণীশোষণ-মুক্ত নতুন সমসমাজ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হবে নীচের তলার লোক—সেজন্যেই মার্ক্সীয় শিল্পী-সাহিত্যিকের দৃষ্টিও নীচের তলার মানুষের দিকেই। যুগ যুগ ধরে বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার মধ্যে থেকেও কোন্ প্রাণসম্বলে টিকে আছে তারা, কোথায় তাদের জীবনের অবলম্বন, আপাতদৃষ্টিতে যারা নিঃসহায়, নিরালম্ব ও নির্জীব বলে মনে হয়, তাদের কোন্ ঘুমন্ত শক্তি জেগে উঠে এই মহাবিপ্লব সাধন করবে, মার্ক্সীয় শিল্পী-সাহিত্যিকগণ তাঁদের সন্ধানী আলোক ফেলে তাই দেখবার ও দেখাবার চেষ্টা করেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই দেখার মূলে থাকে একটি জীবনপ্রত্যয় এবং প্রত্যয় থাকে বলেই তাঁরা নীচের তলার মানুষের মধ্যে শিল্প-সাহিত্যের যথেষ্ট উপাদান খুঁজে পান। তাঁরা দেখতে পান, নীচের তলার মানুষের জীবন শুধু ক্লেদাক্তই নয়, তাদের মধ্যেও এমন মহত্ত্ব থাকে যা নিয়ে মহানাটকের সৃষ্টি হতে পারে।

(২)

সাহিত্যে অনাদৃত শ্রেণীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিয়ে সাহিত্যসৃষ্টি করেন ম্যাক্সিম গোর্কি। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষ ভাগে ও তৃতীয় দশকে বাংলা সাহিত্যিক গোষ্ঠীর একটি অংশের ওপর গোর্কির সাহিত্যের প্রভাব পড়তে আরম্ভ করে। তাঁদের সবাই যে তখন মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করেন এমন নয়; তবে গোর্কির সাহিত্যে তাঁরা এক নতুন মানবতাবোধের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। এই নতুন মানবতাবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে একদল তরুণ কবি ও কথাসাহিত্যিক কাব্য, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি রচনা করতে আরম্ভ করলেন। কবি যতীন সেন, কাজী নজরুল ইসলাম প্রভৃতির কবিতায় নতুন সুর শুনতে পাওয়া গেল। কথাসাহিত্যে এলেন কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকগণ। তারপর বেরুল 'কালি-কলম' পত্রিকা। অবহেলিত শ্রেণী উপজীব্য হয়ে উঠলো প্রেমেন মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির গল্প ও উপন্যাসের। এঁদের অনেকের ওপর ফরাসী 'ন্যাচারেলিজম্' এবং 'একজিস্টেন্-সিয়ালিজম্'-এর প্রভাব ছিল। ফ্রয়েড এবং হ্যাভলক এলিস্-এর মতবাদের প্রভাবও কারো কারো ওপরে পড়ে। মার্ক্সীয় জীবনদর্শনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকায় এঁদের লেখায় বুর্জোয়া চিন্তাধারার ঘাদ রয়ে গেল। মানবতাবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিপীড়িত ও অবহেলিত শ্রেণীর জন্যে এঁরা বেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করলেন বটে, কিন্তু কোনো বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ তাতে প্রকাশ পেল না। একমাত্র নজরুলের

কবিতায় সাম্যবাদের একটা বিদ্রোহী রোমান্টিক চেতনা পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা সুস্পষ্ট জীবনদর্শনে উত্তরণ অবশ্য স্বীকার্য।

এর পরে আসে 'পরিচয়'-এর যুগ। গোড়ার দিকে পরিচয়-গোষ্ঠীর মধ্যে মার্ক্সীয় চেতনা অনুপস্থিত থাকলেও সমসাময়িক বিশ্বসাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা হতে থাকে। তার ফলে রোমান্টিকতার পরিবর্তে সাহিত্যচিন্তা যুক্তিবাদের পথ ধরে। চল্লিশের কাছাকাছি পরিচয় গোষ্ঠিরই উদ্যোগে বাংলা দেশে প্রগতি লেখক সংঘ স্থাপিত হয়। এই প্রগতি লেখক সংঘেরই একটি ছোট গোষ্ঠী মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে শিল্প-সাহিত্যের বিচার করতে আরম্ভ করেন। সংঘের সমস্ত সভ্য কিন্তু মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন না। তারপর শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধের সময় গড়ে উঠলো ফ্যাসী-বিরোধী লেখক সংঘ। সংঘের সবাই মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী না হলেও সংঘের নেতৃত্ব ছিল মার্ক্সপন্থীদেরই হাতে। এখান থেকেই মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে শিল্প-সাহিত্যের বিচার ও মূল্যায়ন একটা নির্দিষ্ট পথ নেয়।

বাংলা কাব্যে ও কথাসাহিত্যে এই যে একটি নতুন ধারা ক্রমশ বিকাশ লাভ করে, বাংলার পেশাদার মঞ্চে কিন্তু তার কোনো লক্ষণই প্রকাশ পেল না। সেখানে তখনো পর্যন্ত অর্থাৎ চল্লিশের কাছাকাছি এসেও পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটকগুলোই প্রাধান্য পেতে লাগলো। সামাজিক নাটক যা দু'চারখানা আদছিল তাও সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রোমান্টিকতাকেন্দ্রিক। যুগের মূল সাহিত্যচিন্তা থেকে নাট্যসাহিত্য ছিল অনেক দূরে। একমাত্র শরৎ-সাহিত্যের নাট্যায়ন ছিল তখন ভরসা। কিন্তু যুগের দাবী মেটাবার পক্ষে শরৎ-সাহিত্যও যথেষ্ট ছিল না। তবু স্বাভাবিক আবেদনগুণে শরৎ-সাহিত্যের নাট্যরূপগুলো দর্শকদের মঞ্চের দিকে কিছুদিন আকৃষ্ট করলো। যুগোপযোগী চিন্তা ও বিস্তৃত সামাজিক পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে নতুন নাটক সৃষ্টির দিক থেকে পেশাদার মঞ্চগুলো বন্ধ্যা হয়েই রইলো।

নতুন সাহিত্যচিন্তার সঙ্গে যুক্ত একদল তরুণ তখন নব নাট্য আন্দোলনের কথা ভাবলেন। আন্দোলন করতে হলেই নতুন ধরনের নাটক চাই। প্রয়োজনের তাগিদে নাটক লেখাও শুরু হলো। ১৯৪১ সালে আমি লিখলাম 'অন্তরাল' নাটক। লিখে বন্ধুবান্ধবদের পড়ে শোনালাম। নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসা করলেন তাঁরা। উৎসাহিত হয়ে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে পাণ্ডুলিপি পড়তে দিলাম। পড়ে অনুকূল মত প্রকাশ করলেন তিনি; কিন্তু একথাও জানালেন —পেশাদার মঞ্চ যদি কখনো এই চিন্তাধারাকে স্বীকৃতি দেয়ও, জানবেন বিশ বছরের আগে নয়। পাণ্ডুলিপি পড়তে দিলাম শচীন সেনগুপ্তকে। তিনিও নাটকের প্রশংসা করলেন, কিন্তু পেশাদার মঞ্চে যে আশু এ ধরনের নাটক মঞ্চস্থ হবার সম্ভাবনা নেই একথাও বললেন। পরে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যেরই পরামর্শে 'অন্তরাল' নিয়ে গেলাম নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের কাছে। নাটক পড়ে খুশি হয়ে তিনি বললেন, 'অন্তরাল' মঞ্চস্থ করবেন, তবে কিছু বিলম্ব হবে। দু'বছর অপেক্ষা করলাম,—কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম যাঁদের ওপর তাঁকে খানিকটা নির্ভর করতে হয় তাঁদের এ নাটক সম্পর্কে আপত্তি আছে। বিরক্ত হয়ে পাণ্ডুলিপি প্রত্যাহার করলাম। বুঝতে পারলাম, পেশাদার মঞ্চের কাঠামোতে নতুন যুগের বার্তা দেওয়া যাবে না। বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে নাটকের দল করলাম। শ্রীরঙ্গম ভাড়া নিয়ে 'অন্তরাল' অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে, বাধা এলো পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। তাঁদের অভিযোগ, 'অন্তরাল' নাটকে দুর্নীতি প্রচার করা হয়েছে। অন্তরাল-এর বক্তব্য নারীজাতির অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই বলেই ভ্রূণহত্যা করা হয়। শ্রেণীহীন সমাজে অর্থনৈতিক মুক্তি পেয়ে নারীজাতি যদি পূর্ণ সামাজিক মর্যাদা ও স্বাধীনতা পায় তবে কোনো নারীই যে অবস্থাবই হোক তার মাতৃত্বের অবমাননা করতে চাইবে না। এই মতকে প্রচার করতে দিতে পুলিশ কর্তৃপক্ষের আপত্তি। অনেক তর্কবিতর্কের পর অভিনয়ের ঠিক একদিন আগে নাটকের শেষের দেড় দৃশ্য কেটে পুলিশ কর্তৃপক্ষ নিতান্ত অনিচ্ছায় অনুমতি দিলেন। শ্রীরঙ্গমে ১৯৪৪ সালের ৩১শে অক্টোবর প্রগতি শিল্পী সংঘ কর্তৃক 'অন্তরাল' প্রথম অভিনীত হলো। অভিনয় সাফল্য লাভ করলো না দুই কারণে, প্রথমত কেটে নাটকের অঙ্গহানি করায় শিল্পীরা নিরুৎসাহ হয়ে গেলেন, দ্বিতীয়ত 'অন্তরাল' অভিনয়ের জন্যে যে নতুন অভিনয় পদ্ধতির প্রয়োজন তাতে অধিকাংশ শিল্পীই

অভাব ছিলেন না। পরে 'অঙ্গার' যখন অবিকৃত অবস্থায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলো, তখন বাংলা দেশের সমস্ত পত্র-পত্রিকায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করলো। নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত লিখলেন, "...এতে ইবসেনের প্রভাব কম দিলেও ইবসেন থেকে একে স্বতন্ত্র করে রাখা হয়েছে আধুনিক বিপ্লবধর্মী মনের গতিকে সম্প্রদারিত করে। যে মতবাদকে ভিত্তি করে এই নাটক রচিত হয়েছে ইবসেনের মতবাদের সঙ্গে তার মিল নেই, একটা সাদৃশ্য থাকি আছে।"

এদিকে এলো পঞ্চাশের মন্বন্তর। মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ মানুষের চেতনাকে ভীষণভাবে নাড়া দিল। ফ্যাসী-বিরোধী লেখক সংঘের সভ্যরা মানুষের এই বিপদে স্থির থাকতে পারলেন না। একদল শিল্পী-সাহিত্যিক সঙ্গীতে ও নাটকে মানুষের এই বিপদ ও যন্ত্রণাকে রূপ দিতে চেষ্টিত হলেন। গড়ে উঠলো একটি ছোট দল। বিজন ভট্টাচার্য লিখলেন একটি ছোট নাটিকা 'জবানবন্দী'। দুর্ভিক্ষে চাষী-জীবনের মর্মান্তিক দুর্দশা ফুটে উঠলো তাতে। এই 'জবানবন্দী' নিয়ে সূচনা হলো ভারতীয় গণনাট্য সংঘের। 'জবানবন্দী' বহু জায়গায় অভিনীত হয়ে বিপুল অভিনন্দন লাভ করলো। আমি লিখলাম 'দীপশিখা'। অনাহারে মৃত্যু থেকে বাঁচবার আশায় এক কৃষক রমণী তার নাবালক দুটি শিশু নিয়ে গ্রাম থেকে কলকাতা শহরে এসে কী নিদারুণ অভিজ্ঞতা লাভ করলো তারই চিত্র। ১৯৪৩ সালে অর্থাৎ মন্বন্তরের বছর ২২শে অক্টোবর রঙ্গমহলে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ 'দীপশিখা' মঞ্চস্থ করে দর্শকবৃন্দকে অভিভূত করলো। 'দীপশিখা' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার পর (জানুয়ারী, ১৯৪৪) কলকাতা ও মফস্বলের বহু জায়গায় অভিনীত হতে থাকলো। এই সময় 'দীপশিখা'র ওপর আক্রমণ এলো নয়া দিল্লী থেকে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের দিল্লী শাখা 'দীপশিখা' মঞ্চস্থ করতে চাইলে দিল্লীর কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিতে অস্বীকার করলেন। এই অন্যায় আদেশের তীব্র প্রতিবাদ করলো আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, দেশ প্রভৃতি পত্রিকা। এর পর বিজন ভট্টাচার্য লিখলেন "নবান্ন"। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ 'নবান্ন' এমন সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করলো যার ফলে নব নাট্য আন্দোলনের বুনিয়াদ রচিত হয়ে গেল। দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে এই সময়েই তুলসী লাহিড়ী লিখলেন 'দুঃখীর ইমান'। 'দুঃখীর ইমান'ও ভারতীয় গণনাট্য সংঘ কর্তৃক অভিনয়ের কথা হয়েছিল; কিন্তু 'নবান্ন' নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় তা আর হয়ে উঠলো না। নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীর নিবেদনে 'দুঃখীর ইমান' ১৯৪৮ সালে শ্রীরঙ্গমে অভিনীত হয়ে দর্শকদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করলো। 'নবান্ন' এবং 'দুঃখীর ইমান' দুটি নাটকই চাষীজীবনকেন্দ্রিক। অবহেলিত চাষীজীবন এতদিনে নাটকের নায়ক হয়ে উঠলো। আধুনিক জীবনবোধ ও সাহিত্যচিন্তার দিক থেকে বাংলা নাটক সাহিত্যের অন্যান্য শাখার সমগোত্রীয় হয়ে আত্মপ্রকাশ করলো।

তারপর লেখা হলো আমার 'তরঙ্গ' যার নায়ক একজন পরিহ্রু ছুতোর। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ভিত্তিতে রচিত এই নাটক সাহিত্যিক ও নাট্যরসিক মহলে পরম সমাদর লাভ করলো। ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'তরঙ্গ' নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ করেন। কয়েক বছর পরে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়।

তারপর এলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। হলো দেশবিভাগ। বাস্তুভিটা ত্যাগের মর্মান্তিক বেদনা প্রকাশ পেল আমার 'বাস্তুভিটা' নাটকে। নাটকের নায়ক পাঠশালার পণ্ডিত। একেবারে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর চরিত্র যার সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক চাষীদের সঙ্গে। পাকিস্তান সরকার দু'বার 'বাস্তুভিটা' বাজেয়াপ্ত করেছেন।

এদিকে তুলসী লাহিড়ী লিখলেন করলার খনি অঞ্চলের জীবন নিয়ে 'পাষাণ'। মালিক শ্রেণীর শোষণের চিত্র, তিনি চমৎকারভাবেই আঁকলেন। নাটকটিকে জনপ্রিয় করে তুললেন 'বহুরূপী' সম্প্রদায়।

আমি লিখলাম 'মোকাবিলা'। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পরেও যে অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যে সাধারণ মানুষকে সংগ্রাম করতে হবে তার ইংগিত দেওয়া হলো এই নাটকে। মিম্ন মধ্যবিত্ত কেন্দ্রিক এ নাটক।

তুলসী লাহিড়ী লিখলেন 'ছেঁড়া তার'। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ও জমিদারী-জোতদারী ব্যবস্থায় সাধারণ চাষীদের বিপন্ন অবস্থার চিত্র আঁকলেন তিনি। শোষণ-ব্যবস্থায় ও পীড়নে যে হিন্দু-মুসলমানে কোন পার্থক্য নেই তারও দিকে অঙ্গুলিসংকেত করলেন নাট্যকার। এই

নাটকটিকে পাদপ্রদীপের সামনে এনে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন 'বহুরূপী' সম্প্রদায়।

এর পর এলো আমার 'মশাল'। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিপন্ন মানবাত্মার আর্তনাদ শোনা গেল এই নাটকে। নাটকের নায়ক একজন শ্রমিক 'মশাল' জনপ্রিয় হয়ে ওঠে 'অশনি চক্র'-এর চেয়ে।

তারপর এলো উষারঞ্জন ভট্টাচার্যের মর্মস্পর্শী নিবেদন সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী'। ছিন্নমূল এক বিরাটের পরিবার রয়েছে এই কাহিনীর কেন্দ্রে। উত্তর সাধক এই নাটকটি জনপ্রিয় করে তোলেন।

এছাড়াও বিভিন্ন লেখক এই সময়ে ছোট বড় কয়েকটি নাটক লেখেন যা নব নাট্য আন্দোলনকে অগ্রগতির সহায়তা করেছে। তার ফিরিস্তি দিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাবে।

নব নাট্য আন্দোলনের প্রথম পর্বের অর্থাৎ গোড়ার দিকের দশ বারো বছরের কথাই এখানে বলা হলো। এর পরেও অনেক নাটক লেখা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। নাট্য আন্দোলনের গতি-প্রকৃতিরও খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে। তার বিস্তৃত আলোচনা স্থান ও সময়সাপেক্ষ।

এই আলোচনা থেকে কেউ যদি মনে করেন যে আধুনিক প্রগতিশীল নাটক রচনা করতে হলে কেবল কৃষক, শ্রমিক ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনকে কেন্দ্র করেই লিখতে হবে তবে তিনি ভুল করবেন। যুগের দাবীতে নাট্যকারকে যে সম্প্রদায়ের কথাই লিখতে হোক তবু তাই দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে এই আলোচনায়। দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টি থাকলে যে কোনো শ্রেণীর জীবন নিয়েই আধুনিক প্রগতিশীল নাটক লেখা চলে। কারণ প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষেরই জীবনে সংকট ও সমস্যা আছে।

অবশেষে আর একটি কথা বলা দরকার। নব নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে যাঁরা নাটক লিখেছেন তাঁদের সবাই যে মার্কসীয় রাজনৈতিক মত ও পথে বিশ্বাসী এমন নয়। নিছক মানবতাবোধ থেকে যুগের প্রভাবেও কেউ কেউ নাট্যকারিতার এই নতুন পথে পদক্ষেপ করেছেন। গোড়ার দিকে উপজীব্যের এই ক্ষেত্রান্তর ছিল অভিনব; এখন অভিনবত্বের পর বেশ হয়ে এ একটা Method বা রীতিতে পরিণত হয়েছে। মোট কথা, বাংলা দেশের অধিকাংশ নাট্যকারই আজ নাটক লেখার সময় এই রীতিতে ঝোঁক দেন—অভিনব কথকতা ও আঙ্গিকে সবাই এক পথের পথিক নন। সুতরাং বলা যায়, নব নাট্য আন্দোলন তার একটি বিশেষ ট্রাডিশনও সৃষ্টি করতে পেরেছে। অবশ্য গঠন, আঙ্গিক, বিষয়ের গভীরতা ও জীবনদর্শনের দিক থেকে কোন্ কোন্ নাটক সুসমঞ্জস ও সার্থক হয়েছে, তারও বিচার করা দরকার। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের মানদণ্ডে কোন বিজ্ঞ নাট্য সমালোচকরা যদি তার বিশদ আলোচনা ও বিচার করেন, তবেই মঙ্গল। আর তা না হলে তামাটোলের বাজারে মুড়িমিছরি একই দরে বিকোবে।

শারদীয় পূজায়
আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন
মনতলা টি কোং (প্রাইভেট) লিমিটেড
হেড অফিস : ২৮, ওয়াটারলু স্ট্রীট, কলিকাতা-১

STEEL FURNITURE

for

OFFICE, HOME & INDUSTRY

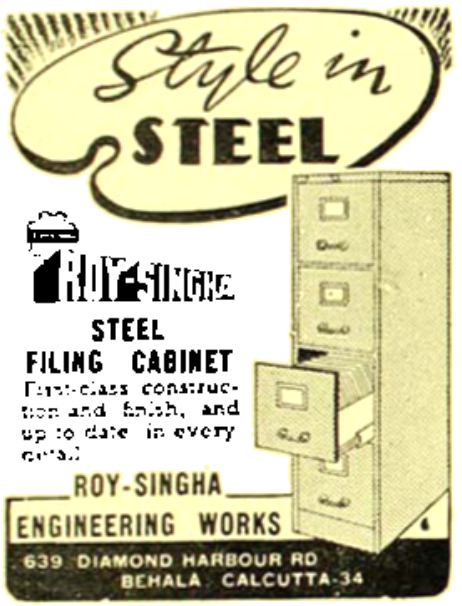

Phone : 45-1603

"ROY SINGHA"

Steel Almirahs, Racks, Tables, Chairs and Hospital Equipment of all Types.

ভারতবর্ষ সবে স্বাধীন হয়েছে। পাকিস্তান স্বতন্ত্র রাজ্য। তবু আমরা বিনা ছাড়পত্রে পাকিস্তানের উপর দিয়ে দার্জিলিঙে চলে এলাম।

পাহাড়ের নিচে থেকে মেঘ উঠছে। ধূসর ধোঁয়ার মতো পাতুর ঘন মেঘ। লঘু চঞ্চল অস্থির। কোথাও জমে না, কোথাও আটকায় না। নিচে থেকে উঠে এসে উপরে মিলিয়ে যায়। দেহটা এমন আলতো ভাবে ছুঁয়ে যায় যে সে স্পর্শে রোমাঞ্চ নেই। মনটা সংহত করলে শুধু শরীরে শীত সিরসির করে ওঠে।

এই মেঘ জমছে দূরের পাহাড়ে। তার রঙ বদলে গেছে। সবুজ রঙ হয়েছে ঘন নীল। তুষারমৌলি কাঞ্চনজঙ্ঘা অদৃশ্য হয়ে গেছে মেঘের আড়ালে। খানিকটা দূরের জিনিস এখন আর প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে না। সহসা আমি আমার মালবাহী কুলির সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলাম। কুয়াশায় হারিয়ে গেলে আমি আর তাকে খুঁজে পাব না।

কোথায় যাব?

একটা হোটেলে। স্টেশনের যত কাছে হয়, তত ভাল। যত ওঠানামা কম, তত মঙ্গল। দার্জিলিঙে ভ্রমণ করতে আসি নি, এসেছি বিশ্রাম নিতে। কয়েকটা দিন নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে পারলে জুতসই একটা লেখা হবে। হোটেল সবই সমান, হোটেলের বৈশিষ্ট্য আমার নেই।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে আমরা কার্ট রোড ধরে হাঁটতে লাগলাম। একটা সমর্থ পাহাড়ী মেয়ে আমার সুটকেস আর হোল্ডঅলটা তার পিঠে ঝুলিয়ে নিয়েছে। ফিতে দিয়ে কপালের উপর বাঁধা। বলল, গাড়ি কি হবে, হেঁটেই আপনাকে পৌঁছে দেব।

এরা তা পারে। আমি এদের পুরুষকে দেখেছি, পিঠে আলমারি বেঁধে জলাপাহাড়ে উঠে যাচ্ছে। নেপালে মোটর বইতে দেখেছি কাঁধে করে। তিনটে পাহাড় ডিঙিয়ে কাঠমাণ্ডু। নতুন পথ তখনও খোলা হয় নি। খানিকটা পথ তাই সবাইকেই হাঁটতে হত। তখন ছোটবড় মোটর নেপালীরা কাঁধে করে পার করে দিত।

হোটেলে পৌঁছে মনে হল, এখানে না এলেই পারতাম। ম্যানেজার তো নয়, যেন কাস্টমসের দারোগা। তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার আর শেষ নেই।

কলকাতা থেকে আসছি শুনে ভদ্রলোক কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন। একে ছোটখাট খিটখিটে চেহারার মানুষ, তার উপর গলার আওয়াজটা ভাঙা কাঁসির মতো। তাঁর কথা শুনে মনে হল, সেই কাঁসি বুঝি সিমেন্টের মেঝের পড়ে ভেঙে খানখান হয়ে গেল।

বিস্ময়ের আর শেষ নেই। বললাম: কলকাতার নামে আপনি এমন ভয় পাচ্ছেন!

ভদ্রলোক নিজেই খানিকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছেন। বললেন: কলকাতাকে কেন ভয় পাব, ভয় পাচ্ছি আপনাকে।

আমি নিজের পা থেকে কাঁধ পর্যন্ত একবার দেখে নিলাম। ধুতির উপর গলাবন্ধ কোট, তার উপর গরম চাদর। নিজের মুখখানাও মনে মনে স্মরণ করে নিলাম—এমন কিছু বীভৎস নয় যে ভয় পেতে হবে। ব্যাকুল ভাবে আমি তাঁর পরবর্তী কথার অপেক্ষা করলাম।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ম্যানেজার বললেন: সব ফুরো মশাই, সব ফুরো। মানুষের বিচারবুদ্ধি, অভিজ্ঞতার গর্ব, শিক্ষের ও সব তুলে রাখতে হবে।

পাহাড়ী মেয়েটি আমার জিনিসপত্র নিয়ে বারান্দায় তুলেছিল। ম্যানেজার চেঁচিয়ে উঠলেন: ও কি করেছিস! লেবেল-টেবেলগুলো দেখতে যে আসে।

ভদ্রলোক আর একমুহূর্ত নষ্ট করলেন না। অত্যন্ত তৎপরতাবে বাক্সবিছানা উল্টেপাল্টে দেখলেন। বললেন: কোন লেবেলই তো নেই মশাই!

লেবেল কোথা থেকে আসবে! কে লাগাবে লেবেল!

কেন?

ও দুটো জিনিস তো আমি সঙ্গে করে এনেছি।

সবাই তো সঙ্গে করেই আনে, তবু লেবেল থাকে।

ভারি বিপদের কথা। দাঁড়িয়ে তর্ক করার চেয়ে বেরিয়ে পড়া ভাল। মেয়েটার দিকে চেয়ে বললাম: অন্য হোটেলে চল।

সে আশ্চর্য হয়েছিল, কিন্তু কথা কইল না। মালপত্র তোলবার জন্য নিঃশব্দে এগিয়ে গেল।

ম্যানেজার বললেন: অত চটছেন কেন? আপনাদেরই সুবিধের জন্যে তো এত কড়াকড়ি করছি।

সুবিধে চাই নে, একটু শান্তি চাই।

বলে রাস্তার দিকে পা বাড়িয়ে দিলাম।

ভদ্রলোক লাফিয়ে এসে পথ রোধ করলেন, বললেন: রাগ দেখিয়ে চলে যাবেন ভাবছেন! ওরে ও বাহাদুর!

বাহাদুরকে আবার কেন!

ভদ্রলোক উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন: এইতো সাহস! এই সাহস নিয়ে আমাকে ভয় দেখাচ্ছিলেন!

ততক্ষণে বাহাদুর এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। তাকে বললেন: তিন নম্বর ঘর। মেয়েটি তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাহাদুরের পিছনে গিয়ে তিন নম্বর ঘরে ঢুকল।

ভদ্রলোক আমাকে বললেন: আসুন।

তাঁকে অনুসরণ করে আমি তাঁর অফিসঘরে এলাম। বসতে হল।

ম্যানেজার তাঁর বাঁধানো খাতা খুলে গম্ভীর গলায় বললেন: মশায়ের নাম?

সত্য রায়।

ভদ্রলোক আবার লাফিয়ে উঠলেন: অ্যাঁ!

ভারি জ্বালা!

জ্বালা তো আমার মশাই। আপনি আবার ঘাঁটাতে এলেন কেন?

আমাকে চেনেন নাকি?

চিনি নে? অত বড় মামলায় ফেঁসে আছেন! কিন্তু আমি কী দোষ করেছি বলুন তো! একজনের পর একজন যদি আমার ওপরে দয়া করেন তো আমি যে পাগল হয়ে যাব!

বড় অসহায় দেখাল ভদ্রলোককে। বড় করুণ, বড় উদ্বিগ্ন। বিরক্তির বদলে আমার বেদনাবোধ হল। বললাম: একটুখানি স্থির হয়ে কী হয়েছে বলুন।

ভয়ে ভয়ে ম্যানেজার বললেন: আমার কোষ্ঠীতে যে একটু আগে ছড়ি পড়ে নি, এ আমার বাপের ভাগ্যি।

শেষজীবনে তিনি অনেক তপতপ করেছিলেন। আমি আজ হাতে-হাতে তার ফল পেলাম।

পুলিসের ঘড়ি!

এই তো একটু আগের ঘটনা। এখনও সবার বুক কাঁপছে।

তারপরেই ভদ্রলোক অন্তরঙ্গভাবে অত্যন্ত কাছে মুখ আনলেন। বললেন: বলুন না কী হয়েছিল সেদিন রাত্রে!

আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে। বললাম: আপনার খাতায় যা লেখবার লিখে নিন।

ভদ্রলোকও স্পষ্টভাবে বললেন: তার দরকার হবে না। বাহাদুর!

বাহাদুরের উত্তর পাওয়া গেল না। আমি বললাম: তাকে ডাকতে হবে না, আমি নিজেই যাচ্ছি।

বলে সেই অফিসঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

পাহাড়ী মেয়েটা পয়সার জন্ত অপেক্ষা করছিল। বললাম: চল অন্ত হোটেলে।

বারান্দার সামনে ছোট একটুখানি লন। সেইখানে দাঁড়িয়ে অনকয়েক ভদ্রলোক রোদ পোয়াচ্ছিলেন। একজন ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন: চলে যাচ্ছেন যে?

এই পাগলের হোটেলে কে থাকবে?

ম্যানেজারও যে আমার পিছনে বেরিয়ে এসেছিলেন, তা খেয়াল করি নি। এবারে বলে উঠলেন: আর একটি অপদার্থ।

অপদার্থ!

বাগে সারা গা জ্বলে গেল। কিন্তু যাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের শুধু কৌতূহল বাড়ল। একজন বলে উঠলেন: কী নাম বলুন তো!

উত্তর ম্যানেজার দিলেন: সঞ্জয় রায়।

সঞ্জয় রায়! উঁহু, ও নামটা কোন অপদার্থের শুনি নি।

তখুনি আমার মনোজ মিত্রের কথা মনে পড়ে গেল। কলকাতায় তার হত্যার মামলা চলেছে সাড়ম্বরে। বড় বড় হরফে সংবাদপত্রে সেই মামলার বিবরণ বের হচ্ছে। 'অপদার্থ সংঘে'র একজন বিশিষ্ট 'অপদার্থ' মনোজ মিত্র খুন হয়েছে সংঘের ভবনে। এ নিয়ে প্রচুর ধরপাকড় হয়েছে। অভিযুক্তও হয়েছে জনকয়েক, কিন্তু আসামী নাকি সনাক্ত হয় নি। শুধুমাত্র সন্দেহের বশে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এখন তাদের জবানবন্দী গ্রহণ করা হচ্ছে একে একে। কলকাতায় আমি সেই কাগজ পড়েছি। বুঝতে পারলাম, এখানে এঁরাও সেই কাগজ পড়ছেন। ম্যানেজার চেঁচিয়ে উঠলেন: নিশ্চয়ই শুনেছেন।

অন্ত ভদ্রলোকেরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

তাঁর ভুলটা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তিনি ভুল করেন নি বলে নিঃসন্দেহ ছিলেন। ছোট ছোট পা ফেলে তাঁর অফিসঘর থেকে খবরের কাগজ একখানা বার করে আনলেন। মনোজ মিত্রের হত্যার মামলা। উপর থেকে নিচে অবধি কয়েকবার চোখ বুলিয়েও আমার নামটা খুঁজে পেলেন না। বললাম: আমাকে দিন।

রবিবারের কাগজ। তাতে আমার একটা লেখা ছিল। সেইটা বার করে বললাম: এইটের কথা বলছেন তো?

এই তো!

বলে ভদ্রলোক প্রায় লাফিয়ে উঠেছিলেন। তারপরেই মিইয়ে পড়লেন। বেশীক্ষণ নয়, শুধু একটি মুহূর্ত মাত্র। সামলে নিয়েই ধাকড়াক শুরু করলেন: ওরে ও বাহাদুর, হতভাগা কোথাকার! দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল, ব্যাটারা পড়ে পড়ে এখনও ঘুমচ্ছে।

বাহাদুর বেরিয়ে এসেছিল।

ম্যানেজার আমাকে বললেন: দুপুরের খাওয়া নিশ্চয়ই হয়েছে, তবে একটু চা খান।

গাড়ি আজ অনেক লেট ছিল, আমরা শিলিগুড়িতেই আহার সেরে নিয়েছি। বললাম: চা আমার ঘরে দিতে বলবেন।

দুই

তিন নম্বর ঘরে এসে আমি চারিদিকে চেয়ে দেখলাম। উত্তরের জানলাটি বন্ধ আছে, সেটি খুলে দিতেই চোখ

ছুড়িয়ে গেল। একটুও সন্দেহ রইল না যে এই জানলা দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ো দেখা যাবে। আজ যা মেঘে ঢাকা আছে, সকালের প্রথম রোদে কাল তা ঝলমল করে উঠবে। ওই উদার দিগন্তের দিকে তাকিয়ে প্রাথমিক অভ্যর্থনার খানিকটা গ্লানি মন থেকে মুছে গেল। আমি সহজ হবার চেষ্টা করলাম।

কিছুক্ষণ আগে যে এই হোটেলে একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে গেছে, তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সেই ঘটনার কথা কেউ বলেন নি। শুধু নিজের আতঙ্ক প্রকাশ করেছেন নাটকীয় ভাবে। সুস্থ মাথায় সমস্ত কথোপকথন স্মরণ করলে একটা দুর্ঘটনা অনুমান করা সম্ভব হবে। হয়তো এখানে কোন ব্যক্তি ছিলেন, মনোজ মিত্রের হত্যার মামলায় তিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন। এ ছাড়া অন্য কিছু অনুমান করা অসম্ভব মনে হয়।

দরজায় টোকা পড়তে আমি ভাবলাম, এবারে বুঝি বেয়ারা চা আনছে। তাকে ভিতরে আসার অনুমতি দিলাম।

কিন্তু বেয়ারার বদলে অন্য এক ভদ্রলোক এলেন। মোটাসোটা রাশভারি চেহারা, কিন্তু গলার আওয়াজটি বড় মিহি। একেবারে কাছে এসে ফিসফিস করে বললেন: কলকাতা থেকে আপনিই বুঝি এলেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

খুব ভাগ্যবান মশাই আপনি।

কেন?

কেন! আজ না এসে আপনি কালও তো আসতে পারতেন। আরও তো আসতে পারতেন একটু আগে। তা না এসে আপনি এলেন সমস্ত ঝঞ্ঝাট মিটে যাবার পর। আপনার জন্যে ট্রেন আজ লেটে এল।

তা ভাগ্যবানই বটে।

একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললাম: আপনার দুর্ভাগ্যটা কোন্‌খানে?

স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করে যখন এই পাহাড়ে আসতে হল, তখনই জানি যে কপাল ভেঙেছে।

সেকি! আপনি স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করেছেন?

ঐ একই কথা মশাই। বাড়িতে ফেলে আসাও যা, আর পরিত্যাগ করাও তাই।

কিন্তু কেন ফেলে এলেন?

ভদ্রলোক একটা বিষণ্ণ হাসি হাসলেন। বললেন: সে দুঃখ আপনারা বুঝবেন না, কেউই বোঝে না। দেশের সরকার খানিকটা বুঝলেও কিছু প্রতিকার হত। ছন আনতে যে পান্তা ফুরোয়, এ কথাটা কেউ বোঝে না।

ভদ্রলোকের আপাদমস্তক আমি একবার ভাল করে দেখলাম। ছন-পান্তার শরীর নয়। নবম দেহে খাদ্যের বিজ্ঞাপন আছে লেগে। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বললেন: দয়া করে এই শরীর দেখে গরিবের বিচার করবেন না। একেবারে জলের শরীর, পেটে কিছু আটকায় না। তা না হলে কি স্ত্রী পুত্রের মায়া ত্যাগ করে এই পাণ্ডবর্জিত দেশে পড়ে আছি।

পাণ্ডবর্জিত দেশ কেন বলছেন?

তা বটে। পাণ্ডবের সঙ্গে কৌরবও আছে দেখছি। একেবারে কুরুক্ষেত্র।

আপনি সেই কুরুক্ষেত্রের গল্প বলুন।

ভদ্রলোক ভয়ে ভয়ে নিজের চারিদিকে একবার চাইলেন। কোথাও কেউ নেই দেখে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে একেবারে ফিসফিস করে বললেন: এই তিন নম্বর ঘরেই কুরুক্ষেত্র হল। সে বলব কি মশাই, একেবারে আপনার মতন চেহারা।

বলে আমার দিকে তাকালেন। আমার বেশভূষা দেখে বললেন: আপনার মতো ধুতি চাদর নয়—

নিজের দিকেও একবার তাকিয়ে বললেন: আমার মতো লুঙ্গিও নয়—

তারপর স্মরণ করে বললেন: ধামী ধামী পাতলুন। বেশ বড়লোকী ব্যাপার। আমরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকতাম।

গল্পটা অকারণে দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। সেই কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। বললাম: কী হল সেই ভদ্রলোকের?

ভদ্রলোক নয়, বলুন নির্মল সেন। তার পেটে যে এত ছিল, সে কি আমরা কেউ সন্দেহ করেছিলাম, না সকলেই এখন বিশ্বাস করতে পারছি!

এ দেখছি বিপদের কথা। ভদ্রলোক শুধু মজবাই

করছেন, কিন্তু ঘটনাটা খুলে বলার কোন লক্ষণ নেই। কিছু অসহিষ্ণুভাবে বললাম: বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা পরে শুনব, আগে ঘটনাটা বলুন।

ঠিক আপনার বয়স মশাই নির্মল সেনের, ত্রিশ পেরিয়েছে কি পেরয় নি। একটু আগেও এই ঘরেই ছিলেন। আমাদের চোখের সামনে দিয়ে কোমরে ঘড়ি বেঁধে নিয়ে গেল।

কে?

কে আবার! কোমরে ঘড়ি দেবার অধিকার কার আছে, সেই পুলিসে। তা না হলে আপনি আমি কি অন্যের কোমরে ঘড়ি দিয়ে নিজের কোমরে ঘড়ি লাগাবার ব্যবস্থা করব! বেশ বলেছেন!

সত্যিই কোমরে ঘড়ি দিয়েছিল?

প্রায় সেইরকম। আপত্তি করলেই দিত।

এইবারে গল্পটা বলুন।

সত্যি বলব কি মশাই, আমরা কেউ কোনদিন ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করি নি। কারও সঙ্গে কথা নেই, বার্তা নেই, ঝগড়া বিবাদ নেই। একেবারে শান্তশিষ্ট ভালমানুষ। অথচ তিনিই নাকি মনোজ মিত্রকে খুন করেছেন।

দার্জিলিঙে থেকে কলকাতায় কী করে খুন করলেন?

সেই কথাই তো আমরা ভাবছি। চিঠিতে মারহানি হয়, মোকদ্দমা হয়, কিন্তু খুন কী করে হয় তা কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

বলে ভদ্রলোক দরজার দিকে চাইলেন।

ভেবেছিলাম, এবারে তিনি কোন গোপন তথ্য প্রকাশ করবেন। কিন্তু তা করলেন না, বললেন: এ হোটেলের বেয়ারারা একেবারে অকেজো। ম্যানেজারবাবু নিজে বলে দিলেন, তবু আপনার চায়ের এত দেরি হচ্ছে।

চায়ের জন্যে আমার তাড়া নেই।

আপনার না থাকতে পারে, এদের তো থাকা উচিত। আপনি তো আর যিনি পয়সায় এদের হোটেলে থাকবেন না।

আমি কোন উত্তর দিলাম না দেখে ভদ্রলোক আরও ব্যস্ত হলেন। বললেন: দাঁড়ান, আমি দেখছি।

আপনি আবার কেন কষ্ট করবেন!

আমার আবার কষ্ট কিসের! চাকডাক করতে আমার মোটেই কষ্ট হয় না।

বলে বাইরে বেরিয়ে ডাকাডাকি শুরু করলেন। অতবড় শরীরে এমন মিহি সুর খুব কমই শোনা যায়। বারান্দা পেরিয়ে সে ডাক বোধ হয় বেয়ারার কানে পৌঁছল না। ফিরে এসে বললেন: এই হোটেলের এই-সব অসুবিধে আছে। বেয়ারাদের কেউ কানে খাটো, কেউ আবার কানে তুলো দিয়ে রেখেছে। যাহোক লোকটা ভারি চালাক। আমি ডেকে যাই, সাড়া দেবে না। ম্যানেজারবাবু মুখ খুলতে না খুলতেই সামনে হাজির হবে।

ম্যানেজারের গলার জোর আছে।

আমার নেই!

বলে নিজের দেহের দিকে তাকালেন।

ঠিক এই সময়ে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বেয়ারা ঘরে না এলে উত্তর দিতে আমার কষ্ট হত। ভদ্রলোক বললেন: দেখলেন তো আমার আওয়াজও ওদের কানে পৌঁছেছে।

এ কথা অস্বীকার করে আমি আমার বিদ্যে বুদ্ধি করলাম না। বললাম: আসুন, একসঙ্গেই চা খাই।

বেয়ারা বলল: আপনার কোকো কি এইখানে আনব?

না না, আমি পরে খাব।

আমি বেয়ারাকে বললাম, আর একটা পেয়ালা আনবার জন্যে।

ভদ্রলোক হেসে করে ফেললেন: কী যে করেন আপনি!

দ্বিতীয় পেয়ালা এলে তিনি আমার চায়ের ভাগ নিলেন। প্রসন্ন মুখে বললেন: দার্জিলিঙে এই একটি সুখ আছে। এখানকার চা-টা বড় ভাল। কলকাতার চা তো চা নয়, একেবারে বিষ। এক চুমুক পেটে গেলে অনেকক্ষণ মন আটকায়।

গম্ভীর ভাবে বললাম: আচার প্রভুর যার তো সেই কথাই বলেছেন।

অতদূর কেন, আমার ঘরেই আছেন এ কথা বলবার

লোক। বাইরে আমি চা খেয়ে এসেছি শুনলে তাঁর কষ্টই বিষ হবে।

সহাস্তে বললাম : তবে যান কেন ?

কেন যাই ? ও একটা নেশা মশাই, চায়ের জন্যে প্রাণ আইঢাই করে। খেয়েদেয়ে শোবার তো জো নেই, বাইরে পায়চারি করছিলাম আর ভাবছিলাম একপেয়ালা চা হবে। আজ আপনার জন্যেই একটু তাড়াতাড়ি হল, আমাদের এখনও দেরি আছে।

মেসের ম্যানেজারের গলা শোনা গেল। মিনিটখানেক পরেই দরজায় টোকা দিয়ে বললেন : ভেতরে আসতে পারি ?

আসবেন বৈকি !

ম্যানেজার ঘরে ঢুকে চমকে উঠলেন : একি অনাদিবাবু, আপনি এখানে বসে চা খাচ্ছেন ?

অনাদিবাবুর মুখ তখন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বললেন : কি করব বলুন, ভদ্রলোক আদর করে ডাকলেন।

আমি ব্যস্তভাবে বললাম : তাতে কী হয়েছে।

ম্যানেজার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন : কী হয়েছে ! ওঁর স্ত্রী আমায় বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন, চা যেন ওঁর পেটে না পড়ে। তাই ওঁকে ওষুধটুধ দিই, কফি দিই, কোকো দিই—যখনই তেষ্টা বলেন তখনই কিছু পরম খেতে দিই। দুবের এক মহিলার একটা সামান্য অনুরোধ, তাই আমি রক্ষা করতে পারছি না।

কাতরস্বরে অনাদিবাবু বললেন : এ নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করবেন না ম্যানেজারবাবু।

অভিভাবকের মতো ম্যানেজার বললেন : আপনি এঘরে কেন এসেছিলেন ?

উত্তরটা আমি দিলাম, বললাম : চা খেতে উনি আসেন নি। চা আমি দিয়েছি।

আর্তনাদের সুরে অনাদিবাবু বললেন : বলুন সত্যবাবু, ব্যাপারটা আপনি বুঝিয়ে বলুন।

নিজে আর বললেন না। অসমাপ্ত পেয়ালাটি নামিয়ে রেখেই পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন।

ম্যানেজার বললেন : আপনি আমাকে নিশ্চয়ই অসভ্য ভেবেছেন, সেইজন্যেই আবার আপনার কাছে এলাম।

না না, অসভ্য কেন ভাবব। এতবড় একটা সুযোগ দেন আপনাদের ওপর দিয়ে—

দেন কোথায় ! এলুন। আমাদের নিয়ে টানা-হেঁচড়া তো এখন শুরু হবে।

তা আপনারা কী করবেন ?

জানি নে।

তবে ভয় পাচ্ছেন কেন ?

আমার নাম তো নিয়েছেই। হোটেলের সমস্ত বোর্ডারের নাম পুলিসে লিখে নিয়ে গেছে। শুনতে পাচ্ছি, শুধু ধানবিলিও নয়, কলকাতা পর্যন্ত নাকি টানাটানি করবে। আপনিই বলুন, আমি ব্যবসাদার মানুষ—

সত্যিই তো !

ভদ্রলোক খুশী হলেন। বললেন : আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন।

তারপর তাঁর মুখখানা একেবারে আমার কানের কাছে এনে বললেন : আরেকটা মেয়ে বোধ হয় জড়াবে, তবে সে পালিয়েছে শুনলাম।

এই হোটেলের মেয়ে ?

ভদ্রলোক গর্বিতভাবে বললেন : পাশের হোটেলের। দিনকয়েক থেকে দুজনকে আমরা একসঙ্গে দেখছিলাম। ঘরের ভেতর সারাক্ষণ গুজগুজ করছে। তারপর হাত ধরে বেড়ানো। আমরা ভাবতাম—

বলে ম্যানেজার তাঁর চোখজোড়া ছোট করলেন। কী ভাবতেন, তা তাঁর মুখের ভঙ্গি দেখে বুঝতে বাকি রইল না। বললাম : তারপর ?

এখন শুনছি, সে মেয়ে নাকি উধাও। তার বুড়ো বাপও পালিয়েছে। সঠিক খবরটা সংগ্রহ করতে বাহাদুরকে পাঠিয়ে এলাম।

ব্যাপারটা তাহলে ঘোরালো মনে হচ্ছে।

বিলক্ষণ। তবে কি জানেন, এখানকার পুলিস কোন গণ্ডগোল করবে না। আমরা এখানকার পুরনো কারবারী পুলিসের সঙ্গে আমাদের সদ্ভাবই আছে। পাকা বন্দোবস্ত। মুশকিল হয়েছে কলকাতার গোয়েন্দা নিয়ে। ভেতরে ভেতরে তারা নাকি কাজ করছে। ওরা তো আর ছেড়ে কথা কইবে না !

তা তো বটে।

উৎসাহ পেয়ে ভদ্রলোক বললেন: এ সবের আমরা কী জানি মশাই। হোটেল খুলে বসেছি। আপনি এলেন, নাম পরিচয় ঠিকানা লেখালেন, ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। আমার হচ্ছে আপনাদের বয় আর টাকার সঙ্গে সম্বন্ধ। আপনি খুন না গোয়েন্দা, তার আমি কী জানি!

দরজার পাশ থেকে কেউ সরে গেলেন মনে হল। শব্দটা ম্যানেজারের কানেও গিয়েছিল, তিনি হাঁক দিলেন: কে?

কোন উত্তর এল না।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে বাইরেটা একবার দেখে এলেন। কেউ নাকি কোথাও নেই, শুধু কয়েকজন বোর্ডার রোয়াকে দাঁড়িয়ে এখনও জটলা করছেন। বললেন: বিপদের কথা। আমাদের পেছনে আবার গোয়েন্দা লাগল না তো!

ভদ্রলোকের চোখেমুখে আমি আতঙ্কের লক্ষণ দেখলাম। স্থির হয়ে বসতে পারলেন না। বললেন: দেখি একবার। বাহাদুর কী খবর আনল।

বলে বেরিয়ে গেলেন।

তিন

এতক্ষণে আমি একটু আরাম পেলাম। এসে অবধি কথা শুনে আর কথা বলে ক্লান্তি এসেছিল। এবারে একটু বিশ্রাম পাব। সারারাত ট্রেনে কেটেছে, সারা দিনটাও। বিশ্রামের লোভে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছি। এবারে চায়ের সরঞ্জাম সরিয়ে রেখে একটা চুরট ধরালাম।

কলকাতায় আমি সিগারেট খাই। শখ করে শীত-কালে দু-একটা চুরট চলে। দার্জিলিঙ শীতের শেষ বলে এক বাক্স ভাল চুরট এনেছি। সেই বাক্স কালিয়তে খুলেছিলাম। এখানে শেষ করব।

আর একটি কাজ করবার বাসনা আছে। একখানি বই লেখার বাসনা। কলকাতার জীবনে অখণ্ড অবকাশ নেই, সাহিত্যের চিন্তা পদে পদে ব্যাহত হচ্ছে। সবচেয়ে বড় চিন্তা সেখানে জীবনযুদ্ধের। সারাটা পথ আমি ভেবেছি। বিষয়বস্তুর ভাবনা। আধুনিক উপন্যাস সম্বন্ধে অনেক আলোচনা ও সমালোচনা পড়েছি। কেউ ইতিহাস নিয়ে উপন্যাস রচনা করছেন। কেউ সংবাদ-পত্রের ঘটনা নিয়ে। বাস্তবঘনিষ্ঠ লেখা হচ্ছে না বলে অনুযোগ শোনা যাচ্ছে, জীবনবোধের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না বলে ক্ষোভ দেখা দিচ্ছে। কাজেই গল্প লেখা উচিত নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ উপাদান নিয়ে। সেই উপাদানে সত্যের সন্ধান থাকলে লেখা ওতরাবেই। কিন্তু এসব সম্পদ আমার মুঠোর ভিতর নেই। আমাকে কল্পনার সাহায্যেই কাহিনী বয়ন করতে হবে। বাস্তবের রঙ তাতে যত চড়াতে পারি, তত তা স্বাভাবিক হবে।

এ যুগের সমাজ নিয়ে লেখায় বিপদ আছে। সমাজের কোন ক্ষেত্রে কোন প্রগতির আস্বাদ পাওয়া যাচ্ছে না। শিশুরা শিখতে চায় না, ছাত্ররা না পড়ে পাস করবে, কর্মীরা মজুরি নেবে তাকি দিয়ে, শ্রমের দাম নেই, টাকার মূল্য কমে যাচ্ছে, সততা শেষ হয়ে গেছে; এখন শুধু একটা আজব জীবন যাপন। এই জীবনের বাস্তব চিত্র হবে নরকের কল্পনার মতন। তার চেয়ে অন্য কিছু লেখা ভাল। কিন্তু কী লিখি!

দরজার বাইরে হঠাৎ চুড়ির শব্দ পেলাম। সেই সঙ্গে একটু মৃদু শব্দ: আসতে পারি?

নিশ্চয়ই।—বলে আমি উঠে দাঁড়ালাম। পর্দা ঠেলে একজন মহিলা ভিতরে এলেন।

ক্ষীণ দেহ, কর্সা রঙ, চোখে চশমা। একখানা সাদা সুতোর শাড়ি পরনে, জামার রঙ তার আঁচলের মত। একনজরে এর চেয়ে বেশী দেখা সম্ভব নয়। একখানা চেয়ার এগিয়ে দেবার সময় আর যা দেখলাম, সে হল একটু শুকনো হাসি। ঐ হাসি দিয়ে মেয়েটি হাত জোড় করলেন: নমস্কার।

নমস্কার। বসুন।

নিরুত্তরে মহিলাটি বসলেন, কোন কথা কইলেন না। আমার ভারি অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। কিছু বলতে না পারার জন্য অস্বস্তি। মহিলার মুখেচোখে দুর্ভাবনার ছায়া, উদ্বিগ্ন বিষণ্ণ। তিনি যে মনোজ মিত্রের খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়বার আশঙ্কা করছেন, তাতে আমার একটুও

সঙ্কোচ হইল না। তাঁর কারণ দুটিই ম্যানেজারের উক্তিকে সমর্থন করছে বললাম: আপনি তো পাশের হোটেলে আছেন?

এখানেই উঠে এসেছি।

আমি আশ্চর্য হলাম। এইটুকু সময়ের মধ্যে হোটেল বদল হয়ে গেল! না ম্যানেজারের অজ্ঞাতে তিনি এখানে উঠে এসেছেন! জিজ্ঞাসা করলাম: কোন্ ঘরে আছেন?

আপনার পাশেই।

তাই আশ্চর্যের ব্যাপার। আমরা কোনই সাড়াশব্দ পাই নি।

মহিলা বললেন: ওরা রান্নায় বড় ঝাল দিত, তাই এখানে উঠে এসেছি।

আপনার বুঝি—

কোন ব্যক্তিগত প্রশ্ন অনুচিত হবে ভেবে থেমে গেলাম। কিন্তু মহিলাটি উত্তর দিলেন: অনেক দিন মাস্টারি করে পেটের হজমশক্তি ফুরিয়ে গেছে।

তাঁর বয়সের কথা এতক্ষণ ভাবি নি। এবারে তাই অনুমানের চেষ্টা করলাম। ত্রিশ বছর নিশ্চয়ই হবে না। চোখের চশমা আর গম্ভীর মুখ দেখে বছর ত্রিশেক মনে হচ্ছে। হেসে বললাম: মাস্টার মশাইরা চাকরি নিয়েই ওই রকম বনে থাকেন।

আমার বেলায় ভাববেন না যে চাকরিটা আমি সম্প্রতি নিয়েছি, আমার ছাত্রীরাও মাস্টার হয়েছে।

এক বছর আগে পাস করলেই তা সম্ভব হয়। সাধারণভাবে বছর তিনেকই যথেষ্ট। এম. এ পাস করে কোর্থ ইয়ারের গোটাকয়েক ক্লাস নিলেই হল।

আমি ধরে নিয়েছিলাম যে এই মহিলা কলেজে পড়ান। বোধ হয় ঠিকই ধরেছি। উত্তরে তাই তিনি হাসলেন, কোন প্রতিবাদ করলেন না।

এই হাসিতে খানিকটা সহজ ভাব ছিল। তাই পরিচয় জানতে চাইলাম: আমার নাম—

সঞ্জয় রায়।

আমি চমকে উঠে প্রশ্ন করলাম: আপনি চেনেন আমাকে?

না চিনলে আলাপ করতে আসব কেন? আমার নাম কল্যাণী চৌধুরী।

আমাকে বিভ্রান্ত দেখে মহিলাটি হেসে বললেন: ম্যানেজারবাবুর কাছে আপনি যখন নামধাম লেখাচ্ছিলেন, তখন আমি শুনেছি। আপনার লেখাও পড়েছি। 'আদালতের আত্মকথা' তো আপনারই লেখা?

আপনি পড়েছেন বুঝি?

পড়েছি।

আশা করেছিলাম যে এবারে কল্যাণী হয়তো বইয়ের সম্বন্ধেই কিছু বলবেন। কিন্তু তা বললেন না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললাম: কেমন লেগেছে?

প্রশ্নটা করেই বড় লজ্জা বোধ হল। এমন করে মতামত চাইলে কি কেউ মন্দ বলতে পারেন, না সেই ভাল বলার কোন দাম আছে! লেখককে সামনে পেয়েও পড়া বই সম্বন্ধে যাঁরা নির্বাক থাকেন, তাঁরা মন্দ বলতে চান না তাবাই সঙ্গত। আমাদের দুর্বলতা তবু যায় না। কল্যাণী বললেন: কিছু যদি মনে না করেন তো বলি।

অসঙ্কোচে বলুন।

পড়তে নিঃসন্দেহে ভাল লাগে, সে আপনার বইয়ের বিষয়বস্তুর জন্যে। ফৌজদারি আদালতে যে সমস্ত অপরাধের বিচার হয়, তার প্রতি আমাদের সনাতন দুর্বলতা। আমাদের আদিম প্রবৃত্তিতে সুড়সুড়ি লাগে বলে আমরা খবরের কাগজে মামলার পাতাটা মনোযোগ দিয়ে পড়ি। জেলখানার গল্পের চেয়েও আপনার গল্প মুখরোচক হয়েছে এই কারণে যে যারা ছাড়া পেয়েছে তাদের কথাও আপনি লিখেছেন। আজকের সমাজে ছাড়া পায় তো ফাঁসী আসামীরা, যারা বিচারকের বিচার করছে আদালতের বাইরে।

এ অভিযোগ আমাকে মেনে নিতেই হবে। আমি ফৌজদারি আদালতের উকিল। বয়সে প্রবীণ হই নি, অভিজ্ঞতাতেও নয়। নতুন মামলায় তাই কৌতূহলের আস্বাদ পাই। এই আস্বাদই আমার লেখার ভিতর সঞ্চারিত করে দিয়েছি। আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না।

কল্যাণী বললেন : আমাদের সমাজজীবনে আজ দুটো ধারা বড় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—ক্রাইম আর সেক্স্। এ দুটোর এমন একটা আকর্ষণ আছে যে সবশ্রেণীর জীবকে সারাক্ষণ পাহারা দেবার প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশের মুনি ঋষিরা তাই নানারকমের সংহিতা প্রণয়ন করেই ক্ষান্ত হন নি, নানা দেবদেবী ও ভগবানকেও সৃষ্টি করেছেন। সেই ভগবানের পাহারাই সবচেয়ে বড় পাহারা। দুর্বলচিত্তরা তাঁরই ভয়ে কাবু থাকে।

আমার মনে হল, কল্যাণী এরই পরে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবেন, আমি 'আদালতের আত্মকথা' লিখে দুর্নীতির প্রচার করেছি। কিন্তু তাঁর আর একটু সমালোচনা বাকি ছিল। বললেন : অপরাধীর চিতর আপনি রহস্যের অন্বেষণ করেছেন। পরশুচন্দ্রও করেছিলেন তাঁর কয়েকটি নায়িকার বেলায়। পড়তে বেশ লাগে। পাপীরাও তো মানুষ, তাদেরও প্রাণ আছে। কিন্তু তার ফল কী হচ্ছে? বাংলা খবরের কাগজ পড়ে দেখুন।

বিব্রতভাবে আমি বললাম : কঠিন ভাবে নিন্দা করলে বোধ হয় ভাল হত।

হত না। সমাজে নোংরামি আছে, এ কথা স্বীকার করাই অন্যায়। আদালত করুক, খবরের কাগজ করুক, কিন্তু সাহিত্য করবে না। যে ছবি ক্যামেরায় ওঠে, সাহিত্যে সমাজের সেই ছবি উঠবে। গভীর অন্ধকারে সমাজের যে গোপন অভিশাপ, তাকে আবিষ্কার গোয়েন্দারা করুক, সাহিত্যিকের এ কাজ নয়।

মনে হল, কল্যাণী তাঁর কলেজের ক্লাসে সাহিত্যের পাঠ দিচ্ছেন। সহসা সেই কথাটি বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়ে উঠলেন। বললেন : কী বিশ্রী অভ্যেস দেখুন। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসে যতসব আজেবাজে বকছি।

আলাপ মানেই তো আজেবাজে বকা। যিনি যত বাজে বকেন, তিনি তত সদালাপী বলে পরিচিত।

আলাপের বিষয়বস্তু ভাল হওয়া দরকার। কিন্তু আমি আপনার কাছে একটা প্রয়োজনের বিষয় নিয়ে আলাপ করতে এসেছিলাম।

প্রয়োজন! আমার কাছে কল্যাণী চৌধুরীর কী প্রয়োজন থাকতে পারে! মনোজ মিত্রের মামলার সঙ্গে কি জড়িয়ে পড়বার ভয় পাচ্ছেন! তার জন্যেই কি তাঁর আইনের সাহায্য চাই। কিন্তু আমি তাঁকে সহজ ভাবে বললাম : বেশ তো।

কল্যাণী বললেন : আপনার পরিচয়টা জেনে অবধি ব্যস্ত হয়েছি। কিন্তু আপনাকে একা পাচ্ছি না। অনাদিবাবু বেরবার আগেই ম্যানেজারবাবু ঢুকে গেলেন। দেরি করলে হয়তো আর কেউ এসে ঢুকতেন। নির্মলবাবু গ্রেপ্তার হবার পর থেকেই সবার প্রাণে একটা বেয়াড়া ভয় ঢুকেছে। অন্য কোন কথা কেউ আর ভাবতে পারছেন না। আজ কেউ বোধ হয় বেড়াতেও বেরবেন না।

আপনাদের ভয় কিসের?

শুনতে পাচ্ছি, পুলিস নাকি সমস্ত বোর্ডারের নাম লিখে নিয়ে গেছে।

তাই বলে সমস্ত বোর্ডারকে তো গ্রেপ্তার করতে আসবে না!

মিস্টার ঘোষ বলে এক ভদ্রলোক তো ট্যাক্সি ডেকে পালিয়ে গেলেন। নির্মলবাবুর সঙ্গে তাঁরই মেলামেশা ছিল সবচেয়ে বেশি। কলকাতার ঠিকানাও বোধ হয় বদলে দিয়ে গেছেন।

সত্যি?

ম্যানেজারবাবুকে টাকা দেবার সময় চুপিচুপি বললেন, দেখুন তো বাড়ির নম্বরটা কত দিয়েছি। মনে হল যেন পালটে দিলেন।

ভালই করেছেন। কলকাতার মত শহরে বাড়ির নম্বর না মিললে পুলিসকে হয়রান হতে হবে। প্রতিবেশীকে তো সেখানে কেউ চেনে না।

আমারও সেই ভয়।

নির্মলবাবুর সঙ্গে—

না না, নির্মলবাবুর সঙ্গে নয়। ওঁদের সংঘের সঙ্গে একসময় আমার একটু সম্বন্ধ ছিল। সংঘের খাতায় আমার নাম ঠিকানা আছে। কাগজে পড়েছি যে পুলিস নাকি সবার নামধাম লিখে নিয়ে গেছে।

তাতে আপনার ভয় পাবার কী আছে?

কিছু নেই তো ?

'অপদার্থ সংঘে'র নাম আমি কোনদিন শুনি নি। শুনেছি এই হত্যার মামলা শুরু হবার পর। সংঘের সভ্যদের এরা 'অপদার্থ' বলে। 'অপদার্থ' বিশেষণ নয়, বিশেষ্য। 'অপদার্থ' বলে এরা পরস্পরকে সম্বোধনও করে। সংঘের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমার কোন স্পষ্ট ধারণা হয় নি। কল্যাণীর কাছে সেই কথা আমি ব্যক্ত করলাম।

কল্যাণী বললেন : তাহলে আমাকে গোড়া থেকেই শুরু করতে হয়।

'অপদার্থ সংঘের' কথা আমি গোড়া থেকেই শুনলাম।

এই সংঘের জন্ম হয়েছিল যুদ্ধোত্তর যুগে। এক শ্রেণীর মানুষের যখন অভাবে নাভিশ্বাস উঠেছে, আর এক শ্রেণীর মানুষ তখন কাঁচা পয়সার গরমে সংযম হারিয়েছে। পা পড়ছে বেসামাল ভাবে, কী করা উচিত ভেবে পাচ্ছে না। কাঁচা পয়সা যাদের হাতে চিরকাল থাকে, তারা ফেঁপে-ফুলে উঠল। দোকানে কর্মচারী বসিয়ে তারা কারখানা খুলল। মাটি কাটার ঠিকাদার মিল কারখানা গড়বার কন্ট্রাক্টর। এসব তো অবাঙালী ব্যবসাদার। বাঙালীর ব্যাপার অন্যরকম। কাঁচা পয়সার আস্বাদ তার কাছে মধুর নেশার মত। সিন্দুকে তুলে শান্তি নেই, আকণ্ঠ উপভোগ করে নেশায় বুঁদ হবার বাসনা। এমনই একদল যুবক পার্ক ষ্ট্রীটের একটা বারে বসে একটি সংঘ স্থাপনের সংকল্প করল। একেবারে নিজস্ব ব্যাপার। আনন্দে উদ্দাম হলেও কারও কিছু বলবার নেই। গলা ধাক্কা দিয়ে কেউ বার করে দিতে পারবে না।

জেনেশুনে এইরকম একটা প্রতিষ্ঠানে কল্যাণী চৌধুরী কেন যোগ দিলেন, সেই কথা ভেবে আমার আশ্চর্য লাগল। কিন্তু কোন প্রশ্ন করবার সাহস পেলাম না। কল্যাণী চৌধুরী কিন্তু আমার মুখে এই ধরনের একটা প্রশ্নের প্রত্যাশা করেছিলেন। তাই তিনি নিজেই বললেন : এমন একটা সংঘে আমি কেন যোগ দিলাম, তা বলে রাখা দরকার। নিজের প্রয়োজনে আমি আসি নি, এসেছিলাম বন্ধুর অনুরোধে। অর্থব্যয়ের বাসনায় নয়, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের অভিলাষে। অল্পদিনেই আমি অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম।

কল্যাণী চৌধুরী শুনেছিলেন যে বর্তমান যুগের কয়েকজন আদর্শবান স্ত্রী পুরুষ একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, আবার ক্লাব-জাতীয় আড্ডার স্থানও নয়। শিক্ষিত অভিজাত নরনারী একত্র মিলিত হয়ে সার্থক কাজে অবসর যাপন করবে। কিছুদিন বোধ হয় করেছিল। প্রতিষ্ঠা তারা না করলেও আর কয়েকজনের সাধু উদ্দেশ্য ছিল। অন্ততঃ কল্যাণী চৌধুরী প্রথম প্রথম কোন সন্দেহ করেন নি।

যে বাড়িটা ভাড়া নেওয়া হয়েছিল, তাতে অনেকগুলি ঘর ছিল। ঘরগুলি বিচিত্রভাবে সাজানো, তাদের বিচিত্র নাম। কোথাও তাসপাশা, কোথাও শুধু ধূমপান আর আলোচনা, কোন ঘর একেবারে নিস্তব্ধ, আবার উন্মত্ত কোলাহলও কোন ঘরে। যে ঘরে পড়াশুনো হত, তার পাশের ঘরে যেতেন কল্যাণী চৌধুরী। সেখানে তাঁরা সমাজনীতির আলোচনা করতেন।

মহেশবাবু নামে এক ভদ্রলোক সমাজটা উৎসন্নে যাচ্ছে বলে বড়ই উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে ভারতবর্ষ একদিন স্বাধীন হবেই, মানে, ভারতবর্ষের লোকেরা স্বাধীনতা আদায় করতে পারবে না, ইংরেজ তাকে স্বাধীনতা দিয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে জাতের মেরুদণ্ড যেন ভেঙে যায়। ঐ ভাঙা মেরুদণ্ড জোড়া লাগাবার আগেই যেন আর কোন জাত যেনটা দখল করতে পারে। অনেকে এ কথা মানত না বলে তর্কটা জোরালো হত। মহেশবাবু বলতেন, চরিত্রবল মানুষের সবচেয়ে বড় বল। আর এই চরিত্রটাই তারা দুর্বল করে দিয়েছে। সাধারণ লোকের স্বভাব তো অভাবেই নষ্ট হয়েছে। নেতাদের অনেকেই দেখা যাচ্ছে বাবু হয়ে গেছেন। যাঁরা চিরকাল স্বাধীন অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখেছেন, তাঁরাই নাকি চুপিচুপি খণ্ডিত ভারতের পরিকল্পনা করছেন। নিজেদের মধ্যে দলাদলি, এক দল ছেড়ে অন্য দলে গিয়ে যোগ দিচ্ছেন নির্বিচারে। একজনের পিছনে অন্য জন লাগছেন।

রাজনীতিতে কল্যাণী চৌধুরীর রুচি ছিল না। তিনি সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে উদ্বিগ্ন হতেন। এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার আগে থেকেই দেখতে পাচ্ছিলেন

যে সংসার প্রায় অচল হয়ে আসছে। পিতার রোজগারে আর সংসার চলে না। কিছু উপরি টাকা চাই। এই উপরি টাকা আজকাল নানা ভাবে আসছে, কিন্তু তাতে তাঁর পিতার একেবারে প্রবৃত্তি নেই। তাঁর পুরাতন ধ্যানধারণায় ঐ জাতের রোজগারের নাম পাপের পয়সা। সংসারে ঐ পয়সা এলে পরিবারের অকল্যাণ হবে। কাজেই থাক অভাব, ভগবান মুখ তুলে চাইলে সুদিন আসবে।

কল্যাণী চৌধুরী ভাই এম. এ. পাস করেই চাকরি নিলেন একটা মেয়েকলেজে। তাতে শুধু একটা পরিবারের অভাব ঘুচল। সমাধান হল না তার চেয়ে বড় সমস্যার। মা বললেন, মেয়ে বড় হয়েছে, কিন্তু সে ছেলের মতো সংসারের ভার বইবার জন্য বড় হয় নি। এই যে সে স্বেচ্ছায় কাঁধে বোঝাটা তুলে নিল, আর কি সে নামাতে পারবে। তার ব্যক্তিগত জীবনটা বুঝি নষ্ট হয়ে গেল।

মহেশ বাবুর মন্তব্যগুলো বড় কঠিন হত। একটা

'প্রদীপিকা'র খানকতক ভাল বই

গল্প, উপন্যাস, নাটক, গান ইত্যাদি

গল্প ও উপন্যাস

সুভদ্রার ভিটে (ছোটগল্প-সঙ্কলন)—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু ৩·৫০

কথা নয় কবিতা (নূতন ধরনের উপন্যাস)—মহুয়া ২·২৫

অপরাজিতা (চমৎকার একখানি মিলন-মধুর উপন্যাস) ১·০০
—শ্রীযুক্তা নীলিমা দেবী

ভ্রমণ

মুসাফিরের ডায়ারী—নরেন্দ্রনাথ রায় ২·৫০

নাটক

দুগম হয় পন্থা—শ্রীঅশোক সেন ২·৫০

ডাঙ্গন-কূলে—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় ১·০০

অম্বপালী (বৌদ্ধযুগের নাটক)—গোপালদাস চৌধুরী

রম্যরচনা

নব কমলাকান্ত—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

গান

একশ'টি বাংলা গান—শ্রীলতিকাদেবী চট্টোপাধ্যায় (O. P.)

সমালোচনা

রবীন্দ্রনাথ ২য় পর্ব—অশোক সেন
(সাহেতিক নাট্য)

স্মৃতির রেখা [জীবনস্মৃতি]
(শ্রীযুক্তা মহাদেবী বর্মার 'স্মৃতি কী রেখায়ে' পুস্তকের অনুবাদ)
অনুবাদিকা : শ্রীযুক্তা মলিনা রায়

প্রদীপিকা : প্রকাশক : : ৮৫, গ্রামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দেশকে শত্রু করে দেবার জন্ত নাকি এর চেয়ে সহজ উপায় আর নেই। দেশের অর্ধেক খাদ্য রাতারাতি লুকিয়ে ফেল। বাকি অর্ধেক নিয়ে দেশশুদ্ধ লোক কাড়াকাড়ি কামড়াকামড়ি করবে। যারা ব্যবসা করে, তারা কালোবাজার করবে, যারা ঐ খাদ্যের ভাগ-বাঁটোয়ারার ভার পাবে, তারা ঘুষ খাবে। খাদ্যের পরে অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস ধরে টানো। দেশের সব মানুষ এক রকম হয়ে যাবে। পেটে খেতে না পেয়ে উলঙ্গ মানুষ কতদিন সৎ থাকবে। একতাড়া কাগজের নোট ছেপে হরিলুটের মতো তাদের মুখের সামনে ছড়িয়ে দাও, খুন রাহাজানি নারীহরণ সব শুরু হয়ে যাবে।

মহেশ বাবুর কথা মিথ্যা হয় নি, দেশে সবই শুরু হয়েছে। দুর্গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে দিনে দিনে। এদিকে দৃষ্টি দেবার কারুর অবকাশ নেই। কারণ খণ্ডিত ভারত এখন নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। মহেশ বাবু বলেছিলেন, সমস্ত সমস্যা এখন শিকেয় তুলে রেখে দেশের লোকের চরিত্র গঠনের চেষ্টা করা উচিত। পাঁচসালা যোজনার কথা শোনা যাচ্ছে। তাতে কোটি কোটি টাকা খরচ হবে। দরকার হলে বিদেশ থেকে নাকি টাকা ধার করবে। মহেশ বাবুর ধারণা ছিল যে ওই দেশে যথেষ্ট টাকা আছে। খরচ করে তা শেষ করা যাবে না। এত খাদ্য আছে যে খেয়ে কোনদিন ফুরবে না। একদল ফাটকাবাজের হাতে পড়ে দেশের লোক খাবি খাচ্ছে, আর সরকার কী প্রতিকার করবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

মহেশ বাবুর ধারণা, এই সরকারের বেশী টাকাই অপব্যয় হবে। এত চুরি হবে যে নদীর বাঁধে জল আটকাবে না, কিংবা বন্যায় বাঁধ ভেঙে যাবে। ইস্পাতের কারখানায় লোহা হয়তো হবে, কিন্তু শক্ত ইস্পাত হবে না। একটা চরিত্রহীন জাতের কাছে—

উইথ্ ড্র—বলে সেদিন যে ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে পড়েছিল, তারই নাম মনোজ মিত্র। অদ্ভুত সুন্দর চেহারা, দীর্ঘ বলিষ্ঠ। একবার দেখলে তাঁকে জনতার ভিতর থেকে চিনে বার করতে একটুও কষ্ট হবে না। মনোজ মিত্র বলেছিল, দেশের মাটিতে বসে দেশের লোকের নিন্দা করতে আপনার লজ্জা করে না।

পরদিন মহেশ বাবু আর এলেন না, তার পরদিনও না। মহেশ বাবুকে আর কখনও আমি সংঘের ঘরে দেখি নি। কিন্তু মনোজ মিত্রকে দেখেছি দিনের পর দিন, নানা জায়গায়, নানা ভাবে। তাঁর বন্ধু নির্মল সেনকেও দেখেছি, এই ঘর থেকে যিনি গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। আরও অনেক কিছু দেখেছি যা কোনদিনই কারও কাছে খুলে বলতে পারব না।

আমি আশ্চর্য হচ্ছিলাম এই ভেবে যে এত কথাই বা কল্যাণী চৌধুরী আমার কাছে কেন বললেন! আমার সঙ্গে তাঁর কোন পরিচয় ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকবে না। পরিচয়ের প্রথম দিনেই এত কথা বুঝি বিসদৃশ ঠেকছিল। তবু আমি সহজভাবেই উত্তর দিলাম: যাই বা সে কথা খুলে বললেন।

বাইরের রাজপথে আর রৌদ্রালোক নেই। পাহাড়ের আড়ালে সূর্য অন্তর্হিত হয়েছেন। মেঘের সঙ্গে তাঁর লুকোচুরি খেলা যে অনেক আগেই সমাধা হয়েছে, ঘরের ভিতরে আমরা তা লক্ষ্য করি নি। কল্যাণী সহসা সচকিত হয়ে বললেন: ছি ছি, বড় বিশ্রীভাবে আপনাকে আটকে রেখেছি। আপনি যে আজই এসেছেন, সে কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম।

উঠে দাঁড়িয়ে আবার দুহাত যুক্ত করলেন। বললেন: সন্ধ্যাবেলায় আবার একবার বিরক্ত করতে আসব।

বেশ তো।

তখন আর 'বেশ তো' বলবেন না। আপনাকে তো গল্প শোনাতে আসি নি, এসেছি পরামর্শ নিতে—উকিলের পরামর্শ।

হেসে বললাম: কী বেচেন তো?

চাইলে দিতেই হবে।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে বললেন: ভেবেছিলাম, দার্জিলিঙেরই কোন উকিলের কাছে যাব। আমাদের নাম যেদিন পুলিসে লিখে নিয়েছে বলে পড়লাম, সেদিন থেকে আমার আর দুর্ভাবনার অন্ত নেই।

যারা ভাবতে জানে, দুর্ভাবনা তাদেরই জিনিস। আনন্দের ভাবনা ভাবে কবি পাগল আর প্রেমিক।

কল্যাণী চৌধুরী হেসে বললেন: আমি কোনটাই না।

চার

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, আজ বেরুব কিনা। দেহে ক্লান্তি খুব বেশি নেই, মনে একটুও উৎসাহ পাচ্ছি না। হোটেলের মানুষগুলো দেখেই কি আমি মিইয়ে গেলাম!

চোখের সামনে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে মানুষ বিচলিত হয়, অনেকক্ষণ পর্যন্ত মন তার আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তার পরেও আলোচনা চলে আরও কিছুক্ষণ। এ সবই স্থির জলে একটা ঢিল পড়ার মতন। জলে খানিকটা আলোড়ন হয়ে আবার সব শান্ত। কিন্তু এই গ্রেপ্তারের ব্যাপারে একটু ব্যতিক্রম দেখছি। নির্মল সেন বলে একটা মানুষ অনেকক্ষণ আগে ধরা পড়েছে। তার সঙ্গে কারও বিশেষ জানাশোনা ছিল না। কোন দুর্ঘটনাও ঘটে নি কারও চোখের সামনে। শুধু গ্রেপ্তার। এই সামান্য ব্যাপারটা এতগুলো মানুষকে কেন এতক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখবে! শুধু কি পুলিসের ভয়, না এর সঙ্গে আর কিছু জড়িয়ে আছে!

ঘরের বাইরে হঠাৎ অন্নদাবাবুর গলা শুনতে পেলাম। ভদ্রলোক বোধ হয় আমাকেই ডাকলেন। দরজার পর্দা সরিয়ে আমি বাইরে এলাম। বললাম: বাইরে কেন, ভেতরে আসুন।

না না, আমাকে আর ভেতরে যেতে বলবেন না।

কেন?

বাইরে ম্যানেজার, ভেতরে আপনি—আমি যে মশাই ত্রিশঙ্কু হয়ে রইলাম।

আমি তাঁর ভয় দেখে হাসলাম।

হাসি নয় মশাই, হাসি আমার শুকিয়ে গেছে। শুধু একটি কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি। আমি কি আপনার কোন ক্ষতি করেছি?

অদ্ভুত প্রশ্ন। বললাম: ক্ষতি কেন করবেন!

প্রতি ঘরে প্রতি পাঠাগারে রাখিবার মতো, প্রিয়জনকে নিঃসঙ্কোচে উপহার দিবার মতো,

কয়েকখানি অনবদ্য প্রকাশন

ভ্রমণ-রসসিক্ত উপন্যাস

রম্যাণি বীক্ষ্য

কালিন্দী পর্ব ৫·০০

(মধুরাংশ্চ)

রাজস্থান পর্ব ৭·০০

সৌরাষ্ট্র পর্ব ৬·০০

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

নূতন প্রকাশিত হইল—

রম্যাণি বীক্ষ্য

দ্রাবিড় পর্ব

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

উপন্যাস

মধুরে মধুর ৫·৫০

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

রূপম্? ৩·৫০

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

ভ্রমণ

কাশ্মীর-পরিক্রমা ২·০০

শ্রীনলিনীকিশোর গুহ

গল্প সাহিত্য

বাল্মীকি রামায়ণ ১২·০০

বাংলা গদ্যে বাল্মীকি-রামায়ণের সারানুবাদ—সটীক, সম্পূর্ণ ও বর্তমান-কালোপযোগী। শশিশেখরকুমার নিয়োগী কর্তৃক অনূদিত

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

হবে আমাকে কেন জড়াতে চাইছেন বলুন। আমি নিতান্ত ঘরোয়া মানুষ। বিশ্বাস না হয় কলকাতায় আমার বাড়ি এসে নিঃসন্দেহ হয়ে যাবেন।

তাঁর কথার মানে আমি বুঝতে পারি নি। কিন্তু বোঝবার জন্যে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। আর এক ভদ্রলোক বললেন: কী হচ্ছে অনাদিবাবু?

অনাদিবাবু প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললেন: একটুখানি চা খেয়ে কী বিপদে পড়েছি বলুন। একেবারে ঘনে-প্রাণে মারা গেলাম। উনি মামলাং তদন্ত করতে এসেছেন জানলে কি আমি চায়ের দোকানে ওঁর ঘরে ঢুকি!

অনাদিবাবুর কথা শুনে আমি হেসে ফেললাম। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, অপর ব্যক্তিও আমাকে গোয়েন্দা বলে সন্দেহ করছেন। বললেন: আপনার সঙ্গে দুয়েকটা কথা আছে।

বললাম: আজ কি না বললে নয়?

ভদ্রলোক বললেন: আপনারই প্রয়োজনের কথা। একদিনেই অনেকটা এগিয়ে যেতে পারবেন।

আপনার নাম?

এই ক্যালাদ। একটা ধরে নিন না কিছু।

পরম শ্রদ্ধার চোখে অনাদিবাবু বললেন: আপনি তো বেশ চালাক লোক যদুবাবু, নিজের নামটা কায়দা করে এড়িয়ে গেলেন।

যদুবাবু চটে উঠলেন: আপনি আবার এখানে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন।

বলেই তিন নম্বর ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়লেন। বললেন: অনর্থক এ হোটেলে আপনি সময় নষ্ট করবেন না। এখানে একজনও খারাপ লোক নেই।

গম্ভীরভাবে বললাম: ঐ মেয়েটার খোঁজ কার কাছে পাব?

মায়ার?

না, কল্যাণীর।

কল্যাণী বলে কেউ নেই মশাই, মায়ার খবর যদি চান তো পাশের হোটেলে গিয়ে উঠুন।

নির্মল সেনের খবর বুঝি আপনারা জেনেন না?

বিপদের কথা। সে ভদ্রলোক তো কারও সঙ্গেই মিশতেন না। যিনি মিশতেন তিনি এতক্ষণে শিলিগুড়ি পৌঁছে গেছেন।

খুব সাহস দেখছি আপনাদের। এক নিরীহ ভদ্রলোককে পুলিসে ধরে নিয়ে গেল, আর আপনারা সবাই মজা দেখছেন।

মজা দেখছি কি মশাই!

মজাই তো দেখছেন। কেন তাকে ধরে নিয়ে গেল কেউ জিজ্ঞেস করেছেন? কেউ বলেছেন যে এমন ভাল মানুষ ভদ্রলোক কখনও খুন করতে পারে না?

আমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু কল্যাণী চৌধুরী আমাকে রক্ষা করলেন। বললেন: হোটেলে আর নয় গঙ্গাবাবু, আপনার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। তার চেয়ে আসুন একটু বেড়িয়ে আসি।

এই প্রস্তাবটি আমার ভাল লাগল, বললুম: চলুন।

পাশ দিয়ে যাবার সময় অনাদিবাবুকে কল্যাণী ভয় দেখালেন, বললেন: যা জানি সব বলে দেব, সবাইকে ধরিয়ে দেব।

ভয়ে অনাদিবাবু আড়ষ্ট হয়ে রইলেন, কোন কথা কইতে পারলেন না।

পাঁচ

পথে নেমে ভারি ভাল লাগল। মেঘে বুঝি উত্তাপ আছে। মেঘ যত আড়ষ্ট হবে ভেবেছিলাম, তা হল না। এক রকম উপভোগ্য আবেজে মন প্রফুল্ল হয়ে উঠল।

কল্যাণী চৌধুরী আমার পাশে পাশে চলছিলেন। তিনিও ওভারকোট পরে বার হন নি। আমার মতোই একখানা শাল জড়িয়েছেন। লক্ষ্য করে দেখলাম যে তাঁর শালখানা আধুনিক মেয়েদের মতো এক টুকরো কাপড় নয়। এক কাঁধ থেকে আর এক কাঁধে তুলতেই ফুরিয়ে যায় নি। একখানা প্রমাণ মাপের শাল তাঁর করে গায়ে জড়িয়েছেন। শৌখিনতার চেয়ে শালীনতার দিকে তাঁর বেশী নজর দেখলাম। আরও একটা জিনিস নজর এড়ায় না। তাঁর শালখানা একালের নয়। পুরনো আমলের। হাল্কা তুষের জমির উপর জাফরানের

মতো সূক্ষ্ম কাজ করা। জিনিসটা যে মনোজ্ঞ সে বিষয়ে আমার সন্দেহ রইল না। কল্যাণী চৌধুরীর চলনেও একটু মনোজ্ঞতা দেখলাম।

নরতল পথ ছেড়ে কখন আমরা উপরে উঠতে শুরু করেছি খেয়াল করি নি। গতি আমাদের মন্থর হয়ে গেছে। কল্যাণী বললেন: আজ আর বেশী দূর যাব না—বলে একখানা বেঞ্চির উপর বসল।

হেসে বললাম: আজ আমার নিজের কোন মত নেই।

আমার আছে। একজন ক্লান্ত মানুষকে জোর করে টেনে বার করেছি। সে কথা ভুলে গেলে তো চলবে না।

বাইরে এনে তো আমাকে আপনি রক্ষা করেছেন, আরও সোজা কথায়, আমাকে রক্ষা করবার জন্যেই আপনি টেনে এনেছেন।

তার জন্যে আমিও সমানভাবে দায়ী। নিজের প্রসঙ্গ নিয়ে যখন আপনার কাছে গিয়েছিলাম, তখন ভাবি নি যে সবাই মিলে আপনাকে আক্রমণ করবে।

খানিকটা পথ নিঃশব্দে অতিক্রম করবার পর কল্যাণী বললেন: শুধু আপনার চেহারার নয়, হাবেভাবেও আমি একটা আভিজাত্যের পরিচয় পেয়েছি। মনে হয়েছে, আপনার কাছে অনেক গোপন কথা আমি অসঙ্কোচে বলতে পারব।

কিন্তু কিছুই বলেন নি।

যা বলেছি তা কি কম? পথ চলতে অনেক পদক্ষেপ ভুল হয়, ভুল জায়গায় পড়ে। সে কথা অতি সঙ্গোপনে রাখবার জিনিস। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কলঙ্কের কথা আমি অসঙ্কোচে আপনাকে বলে ফেলেছি।

লজ্জা পাবার মতো তো আপনি কিছু করেন নি।

করেছি। কিন্তু তাগ্য আমাকে সাহায্য করেছে, পালিয়ে আমি আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলাম। আজ আমার জীবনে যে আলো, তার বিন্দুটুকু আমি সেইখান থেকেই সংগ্রহ করে এনেছি। এসব কথা বলবার সময় নিজেকে আমি হারিয়ে ফেলি। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

আমার মনে হল, দীর্ঘদিন কল্যাণী চৌধুরী নিঃসঙ্গ আছেন। অনেক কথা তাঁর বুকের ভিতর পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। পরিচিত কারও কাছে তা প্রকাশ করতে না পেরে ভিতরটা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। বললাম: আমিও আপনার মতো নিঃসঙ্গ। বলার কথা বলতে না পেরে লিখে রাখবার সংকল্প নিয়ে এখানে এসেছি।

আমি যে লিখতেও পারি নে।

আমারও তাই মনে হয়েছিল।

কিন্তু আপনার লেখায় আমি মুনশীয়ানা দেখেছি। অপরাধীর মন আপনি খুব স্বচ্ছভাবে দেখতে পান। কিন্তু আমি পারি নে। মানুষ চিনতেই আমার ভুল হয়ে যায়।

অপরাধীর নাম শুনলে আমার কি ইচ্ছে হয় জানেন? ইচ্ছে হয় তার গলা টিপে দিতে। শ্বাস বন্ধ হয়ে সে মরুক, ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে তাকে মারা হোক। যত অন্যায় যত অনাচার সে করেছে, তার উপযুক্ত শাস্তি তার হোক। আমি তাই সহজভাবে কিছু লিখতে পারি নে. যা লিখি তা মিথ্যে।

কিন্তু আপনি তো নির্মল সেনকে সাহায্য করার কথা বলছিলেন?

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় প্রণীত

সন্ধ্যামণি (কবিতার বই) মূল্য ৫·৫০

সাহিত্যরসিক বাঙালী পাঠক-পাঠিকার কাছে কবিশেখর কালিদাস রায়ের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্রকালীন ও রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি 'কবিশেখর'-এর কয়েকখানি অমূল্য কবিতার রসমধুর সংগ্রহ। প্রত্যেক গ্রন্থাগারেই রাখার মতো একখানি রসোত্তীর্ণ কবিতা-সঙ্কলন।

কল্যাণী চৌধুরীকে আমি সতর্ক করে দিলাম। জনবহুল প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে আমরা চলেছি। কোন ঘুনের আসামীর মত করা আমাদের অনুচিত হবে। তাতালেরও জান আছে।

কল্যাণী তখনি মেনে নিলেন। বললেন: সত্যি কথা। আমি একটুতেই আজকাল উত্তেজিত হয়ে উঠছি। গত কয়েকদিন আমি ঘর থেকে বার হই নি। কেন বার হই নি জানেন?

জানি না।

কয়েকদিন থেকে একটা মেয়ে যাতায়াত করছিল। তাকে আমি বাড় ছিলে প্রথম দেখি। প্রথম থেকেই আমি তাকে সন্দেহের চোখে দেখেছি।

কথায় কথায় মনে আমরা পৌঁছে গেলাম। কল্যাণী একবার চারিদিকে চেয়ে বললেন: ঐ ধারে চলুন, ঐ ধারটা নির্জন আছে। ঠাণ্ডা হাওয়া একটু বেশী আসবে। আপনার কি শীত করছে?

শীত আমার করছে না, করলে গায়ের চাদরটা আরও ভাল করে জড়িয়ে নিতে পারব।

সেই ভাল। নির্জনে বসলে আমি একটু হাল্কা হতে পারব।

মনের মাঝখান দিয়ে আমরা অন্ধকারে চলে গেলাম। বড় বড় দোকানে সব বাতি জ্বলে উঠেছে। নানা রঙের মেয়ে-পুরুষে মাঝখানটা ভরে আছে। যত সৌরভ তত ফুল নেই, যত রঙ তত রূপ নেই, যত কোলাহল তত গান নেই। কোনদিকে না তাকিয়ে আমরা একটা খালি বেঞ্চিতে গিয়ে বসলাম। কল্যাণী চৌধুরী নিজের চাদরটা আবার দেখে গায়খানা জড়িয়ে বসলেন।

আস্তে আস্তে আমি বললাম: আপনি মায়ার কথা বলছিলেন।

আপনার মনের ওপর ভার পড়ছে না তো?

একটুও না।

আপনি বোধ হয় আশ্চর্য হবেন, নির্মলবাবু আমাকে চিনতে পারেন নি, সন্দেহও করেন নি এতটুকু। অথচ একবার দেখেই আমি তাঁকে চিনতে পেরেছিলাম। মনোজ মিত্রের সঙ্গে তাঁকে অনেকবার দেখেছি। দুজনেই প্রচুর মদ খেতেন—আকণ্ঠ খেতেন। শুনেছি, বাড়ি ফেরে খেতেন। মনোজ মিত্র নাকি কোনদিন ফেরে যান নি। নির্মল সেন গড়িয়ে পড়ে গেলে গাড়িতে তুলে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছেন।

কল্যাণী চৌধুরী হঠাৎ বলে উঠলেন: সে সব নোংরামির কথা থাক। আমি বরং মায়ার কথা বলি।

মায়ার গল্প আমি কল্যাণীর মুখে শুনলাম। পাশের হোটেল থেকে আমাদের হোটেলে উঠে এসে কল্যাণী নির্মল সেনকে দেখলেন। কিন্তু নিজের পরিচয় দেবার চেষ্টা করলেন না। সেটা ঘৃণায় নয়—ভয়ে। তার আগেই খবরের কাগজে বেরিয়েছিল যে অপদার্থ সংঘের সমস্ত অপদার্থের নাম পুলিস সংগ্রহ করেছে এবং একে একে অনেককেই ধরপাকড় করছে। কল্যাণী তাই লুকিয়ে থাকাই সমস্ত মনে করলেন।

মায়াকে প্রথম দেখলেন বার্চ হিলে। সেদিন তিনি বিকেলবেলাতেই দূরের পথে বেরিয়েছিলেন। ওঠানামা কম বলে বার্চ হিল তাঁর ভাল লাগে। বসবার জায়গা আছে, ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করে। বসে বসে খেলা দেখতে মন্দ লাগে না। কল্যাণী ছেলেমেয়েদের খেলা দেখছিলেন।

নির্মল সেন কখন এসে আর একটা বেঞ্চে বসেছিলেন, কল্যাণী তা খেয়াল করেন নি। খেয়াল করলেন মায়াদের লোভী দুটি চোখে। সাদা গোঁফদাড়িওয়ালা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে মায়া বাগানে আসছিল। মায়া চোখের ইশারায় নির্মলকে দেখিয়ে দিল। বৃদ্ধের চোখে আমি স্নেহদৃষ্টি দেখলাম। ঐ বৃদ্ধকে সবাই মায়ার বাবা মনে করেন।

কল্যাণী বললেন: এই সামান্য ঘটনার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে আমি মনে করি। মায়ার সঙ্গে নির্মলের সম্বন্ধ যদি প্রীতির হবে, তাহলে এই ঘটনাটি মিথ্যা হওয়া উচিত। কোন কুমারী মেয়ে চোখের ইশারায় তার বাপের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না তার বান্ধবের প্রতি। আর বৃদ্ধ বাপের চোখেই বা আমি স্নেহের দৃষ্টি কেন দেখব।

এই মন্তব্য করে আপনি ভাল করলেন না। আমার মনেও খটকা লেগে গেল।

তার পরের ঘটনা আপনার খটকাকে সমর্থন করবে। মায়া তার বাপের সঙ্গে পাশাপাশি বসে নির্মলকে লক্ষ্য করতে লাগল। নিজেদের মধ্যে যা বলাবলি করেছে, তা শুনতে পাই নি সত্য, কিন্তু সে যে কোন চক্রান্তের মত জটিল, তাতে আমার সন্দেহ ছিল না। প্রথমে বুড়ো উঠে গিয়ে নির্মলবাবুর সঙ্গে কথা কইলেন, তারপর মেয়েকে ডেকে নিলেন।

গোড়া থেকেই নির্মলবাবুকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছিল, এরা কাছে যাবার পরেও কিছু হাল্কা হতে পারলেন না। মনে হচ্ছিল, ওদের সঙ্গ তিনি পছন্দ করছেন না, শুধুমাত্র ভদ্রতার খাতিরে সঙ্গ করতে বাধ্য হচ্ছেন।

অপদার্থ সংঘে কখনও তাঁকে গম্ভীর হতে দেখা যায় নি। তাঁর মত প্রাণবন্ত মানুষ সেখানে কম ছিল। সবারই প্রাণ ছিল, প্রাণ না থাকলে কেউ অপদার্থ সংঘে আসত না। ধীরে ধীরে বোঝা যাচ্ছিল যে, সাহিত্য দর্শন রাজনীতি বা সমাজনীতি এই সংঘের উদ্দেশ্য নয়, এর উদ্দেশ্য একেবারে পার্থিব বিলাস। একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে সংঘ ছাড়বার সময় বলে গেলেন, যত সব অপদার্থ, অপদার্থ সংঘ। যাঁরা রইলেন, তাঁরা রাতারাতি ঐ নামটা গ্রহণ করে নিলেন। মনোজ মিত্র বললেন, এর চেয়ে যোগ্যতর নাম আমাদের হতে পারে না। সেইদিন থেকেই তাঁরা পরস্পরকে সম্বোধন করতে লাগলেন অপদার্থ বলে।

কল্যাণী চৌধুরী বললেন: মানুষ দিনে দিনে এত হাল্কা হয়ে যাবে, একথা ভাবতে আমার কষ্ট হয়। তবু আমি আরও কিছুদিন সেখানে ছিলাম। আমি দেখছিলাম এই দেশের মাটিতে একটা সম্পূর্ণ নূতন সমাজ জেগে উঠছে। বিভিন্ন তবে তারই বিচিত্র রূপ। এ দেশের মাটির সঙ্গে এ সমাজের যোগ নেই, যোগ নেই এ দেশের আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে। জাপানীরা বুঝি আকাশ থেকে বোমার সঙ্গে এক ঝাঁক মানুষ ফেলে দিয়ে গেছে, কিংবা আমেরিকা এদেশ রক্ষা করতে এসে তাদের মানুষগুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় নি।

যুদ্ধের এটা অনিবার্য ফল।

আমি তা স্বীকার করি না। পঁচিশ বছর আগে বাকি আরও একটা বড় যুদ্ধ হয়েছিল। আরও ভয়াবহ। অভাবে অভিযোগে এদেশ জর্জরিত হয়েছে, কিন্তু দেশের মানুষ মনুষ্যত্ব হারায় নি। এবারের যুদ্ধ শুধু মনুষ্যত্বটুকু কেড়ে নিয়ে গেছে।

আমার মনে হল, কল্যাণী চৌধুরীর আর একটা রূপ ছিল, সে রূপ একটা বিরাট আঘাত পেয়ে বদলে গেছে। পারিবারিক জীবনের কোন বিচিত্র ঘটনা এই মেয়েটির জীবনে বিক্ষোভ এনেছে, হয়তো কোন বিসর্জন দেখেছে। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতায় আজও তার মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাকে আশ্বাস দেবার জন্য বললাম: দেশ স্বাধীন হয়েছে, আমাদের আর দুঃখ থাকবে না।

দুঃখ বাড়বে। নতুন জাত মাটিতে শেকড় গেড়েছে, গাছ এবার ফুলে ফলে ভরে উঠবে। বিষবৃক্ষ হবে।

আমি আর প্রতিবাদ করলাম না, জিজ্ঞাসা করলাম: মায়ার কী হল?

লজ্জিত হয়ে কল্যাণী চৌধুরী আবার মায়ার গল্প শুরু করলেন।

মেয়েটি সুশ্রী, বোধ হয় কুলীনও। কিন্তু প্রসাধনের রঙে তার স্বাভাবিক রঙ ঢাকা পড়েছে। রঙ মেখে মন ভোলাবার চেষ্টা এ দেশে নতুন শুরু হয়েছে। চোখে একটু কাজল কিংবা ঠোঁটে পানের রঙ মন্দ লাগে না। কিন্তু কামানো ভ্রূ এখনও অনেকে সইতে পারেন না।

প্রকাশিত হইল

ওয়েটিং ফর গোডো: স্যামুয়েল বেকেট

এ যুগের ইউরোপ ও আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ-সমস্যামূলক নাটক। অনুবাদক: শ্রীমনোক সেন।

প্রাপ্তিস্থান:

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং (প্রাঃ) লিমিটেড

পুস্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা

২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফোন: ৩৪—১৬০৬

মাত্রার এ সহ্যটুকু কামানো নয়, উপর-নিচে কাঁপিয়ে খানিকটা লঘু করে নিয়েছে।

আপনি ভাবছেন, প্রণাধন সম্বন্ধে আমি খুব সচেতন। কিন্তু এ কথা ভাবলে আপনি ভুল করবেন। মায়াকে আমি নানা কারণে লক্ষ্য করেছি। তাকে লক্ষ্য করা উচিত হবে বলে আমি মনে করেছিলাম। আপনাকে আমি বলেছি যে নির্মল সেনকে আমি চিনতে পেরেছিলাম, কিন্তু তার স্বভাবের আমূল পরিবর্তন দেখে আমার বিস্ময় বোধ হচ্ছিল। খবরের কাগজের একটা সংবাদ পড়ে মানুষের পরিবর্তন হয় না, কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মৃত্যু-সংবাদ শুনে মানুষ ছুটে যায়। বাচ ছিলের থেকে বলে লার্শনিকের মত এমন আকাশপাতাল ভাবে না। অসহায় শিশুর যতটুকু আমি দেখেছি, তাতে এইরকমের একটা পরিণাম আমি অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করেছি। তাইতেই আমি মনোজ মিত্রের হত্যার সঙ্গে নির্মল সেনের একটা যোগাযোগ আন্দাজ করে গোড়া থেকেই সতর্ক ছিলাম।

মনোজ মিত্র যে খুন হবে, এ কথা আপনি জানতেন?

এ একটা সত্য কথা। বিষ খেলে ভেতরটা জ্বলে গিয়ে মৃত্যু হবে, এই রকমের একটা সত্য। প্রথমে কে মরবে, মনোজ মিত্র না নির্মল সেন না আর কেউ, তা অবশ্য জানা ছিল না। ওদের সঙ্গে যখন আমি যোগ দিই, তখনকার কথা বলেছি। মহেশবাবু বেরিয়ে গেলেন, তাঁর সঙ্গে আরও অনেকে গেলেন। আমি আরও কিছু দেখবার ও জানবার অপেক্ষায় সঙ্গে হয়ে গেলাম।

না না, আমি আপনার কাছে সত্যি কথাই বলব। অকপটে সমস্ত স্বীকার করেই আমি আপনার সাহায্য চাইব। মনোজ মিত্র আমার হাত ধরে আমাকে টেনে নিয়ে গেল, বলল: জীবনটাকে নষ্ট করছ কেন?

প্রচণ্ড দাবী। কিন্তু সেদিন আমি আত্মসমর্পণ করি নি। শুধু বুঝে ফেললাম যে এতদিন আমি পুরুষ দেখি নি। জগতের একমাত্র পুরুষকে আমি যেন প্রথম দেখলাম। সে দাবী জানাতে জানে, জোর হয় কেড়ে নিতেও জানে। সংঘের ভবন থেকে আমি পালিয়ে গেলাম, স্থির করলাম যে আর কখনও সেখানে যাব না। হয়তো যেতাম না। যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে যেমনা দিয়েও আমি আত্মসংবরণ করতে পারতাম। কিন্তু মনোজ মিত্র খুঁজে খুঁজে বাড়ি এসে আমায় টেনে নিয়ে গেল। বলল: আর কতদিন লুকিয়ে থাকবে?

লুকিয়ে থাকবার বাসনা আমার ছিল না। ছিল ভয়। আমার পঁচিশ বছরের যৌবন যে লোকটা নাড়া দিতে পারে এমন নির্মমভাবে, তাকে ভয় করে বই কি! কিছুই যে তার জানি নে। তার শক্তির উৎসে আছে প্রেম, না কামনা? সহজে আমি তাই ধরা দিতে পারলাম না।

নির্মল সেন আমাকে এক গ্লাস মদ এগিয়ে দিয়েছিল। আমি ছুঁই নি। মনোজ মিত্র তাকে ধমকে দিয়েছিল। বলেছিল, ভদ্রতা শেখ। বস্তি থেকে একে আমি কুড়িয়ে আনি নি।

এই উৎসনা শুনে মনোজকে আমি ভালবেসেছিলাম। কিন্তু পরে জানলাম, আমি ভুল করেছি। আমার মতো ভুল আরও অনেকে করেছে। এক বিবাহিত মহিলা আমার চোখ খুলে দিয়েছিলেন। এই কৃতজ্ঞতার ঋণ আমার শোধ করা হয় নি।

কেন?

তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন।

তাঁর নাম আপনার মনে আছে?

জেনে নেবার সময় পাই নি।

তারিখটা মনে আছে?

১৯৬৫ সনের ডিসেম্বর মাস।

পঁচিশে নয় তো!

কল্যাণী চৌধুরী গভীর ভাবে আমার মুখের দিকে তাকালেন। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে কিছু আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন মনে হল। বললাম: আমার স্ত্রী সেদিন আত্মহত্যা করেছিলেন।

কল্যাণী কি এই কথারই অপেক্ষা করছিলেন! তবু যেন স্তব্ধ হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত মুখে তাঁর কথা যোগাল না।

ছয়

কল্যাণী চৌধুরীকে আমি জাগিয়ে দিলাম। বললাম: আপনি অনেকক্ষণ কথা কইছেন না।

আপনার কাছে আমি হেরে গিয়েছি যে!

কল্যাণীর দৃষ্টি বড় বেদনার্ত দেখাল, বড় অন্তরঙ্গ। বললাম: সে কি?

কল্যাণী বললেন: আমার মনে পড়ছে, আমি একদিন আপনাকে সংঘের ভবনে দেখতে পেয়েছিলাম।

ঠিকই দেখেছেন। আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পরে আমি একদিন সেখানে গিয়েছিলাম।

আমাকে দেখেছিলেন?

মনে পড়ে না। অনেক মেয়ের ভিড়ে আপনি বোধ হয় হারিয়ে গিয়েছিলেন।

এ কথার পরে কল্যাণী আর কিছু জানতে চাইলেন না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আমাকে চিনলেন কি করে?

সবাই বলছে, সেই আত্মহত্যার ব্যাপার নিয়ে অনুসন্ধান করতে এসেছেন। কিন্তু মহিলা কেন আত্মহত্যা করেছেন তা কেউ বলল না।

আমার মনে হল, কল্যাণী এবারে আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করবেন। কিন্তু প্রশ্ন করলে কী উত্তর দেব! সে রহস্য তো আজও অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে। শুধু কৌতূহল নিরসন হয়েছে যুগের ধর্ম দেখে।

আইন পাস করে তখন আমি আদালতে যাতায়াত করছি। দেওয়ানি মামলা করি। আত্মীয় বন্ধুরা আমার মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা দেখে উৎসাহিত হচ্ছেন। সে আমার নিজের যোগ্যতা দেখে, না পিতার প্রতিপত্তির কথা জেনে, তা বলা শক্ত। বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়ার কথা ছিল, কিন্তু বিশ্বের বর্তমান অবস্থায় তা আর সম্ভব নয়। ইয়োরোপে যুদ্ধ চলছে। বোমা পড়ছে বিলেতের উপর। নিজেদের দেশেও স্বাধীনতার স্বপ্ন মনেপ্রাণে গুমরে উঠছে। নেতাজী কী করবেন জানা নেই, কিন্তু বাংলা দেশ তাঁর আহ্বানের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। কাজেই দেশ ছেড়ে বিদেশে আমার যাওয়া চলে না। চাকরির চেষ্টা না করে আদালতে যোগ দিলাম।

এই সময়ে পৃথিবীর রঙ বদলাচ্ছে। মানুষেরও রঙ বদলাচ্ছে। পুরনো ধ্যানধারণা, রীতিনীতি, সমাজ ও ধর্ম দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। পৃথিবীর প্রয়োজনের নামে স্বার্থের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে দৃঢ়মূলে। উনিশশো বিয়াল্লিশের বিপ্লব সফল হল না। নেতাজী নাকি দেশের মাটিতে পৌঁছেছিলেন মুক্তির বার্তা নিয়ে, নেতারা সে কথা বিশ্বাস করেন নি। আমরা যখন আনন্দে সংশয়ে তাঁর নির্দেশের অপেক্ষা করছি, তখনই সব শেষ হয়ে গেল। নেতাজী নেই বলে আমাদের নিশ্চিন্ত করে দেওয়া হল। এসব রাজনীতির কথা। রাজনীতি জানার অহংকার আমার ছিল না। আমি বললাম যে সেই আঘাতে বাংলা দেশের মেরুদণ্ড ভেঙে গেল। মেরুদণ্ড ভাঙল আমাদের গোটা দেশের। স্বাধীনতা হয়তো একদিন আসবে কিন্তু সে স্বাধীনতা সমাজের মুক্তি আনবে না। কুড়িয়ে পাওয়া স্বাধীনতায় যে মুক্তির আস্বাদ নেই। নাগপাশের মতো বিষাক্ত বন্ধনে দেশ আর্তনাদ করবে।

আমি যে পরিবারে মানুষ হয়েছি, সেই পরিবারের একটা আভিজাত্য গর্ব ছিল। সে শুধু পয়সার নয়, পাণ্ডিত্যেরও। আমি তা ভুলে থাকবার চেষ্টা করি। কথায় ও ব্যবহারে যাতে কিছু প্রকাশ না পায়, তার

প্রকাশিত হইল

বরণীয় ৫·০০

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

গ্রন্থকার তাঁহার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনে বহু মহামান্য ব্যক্তির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের বরণীয় জীবনের কাহিনী ইহাতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-সিক্ত হইয়া বিধৃত রহিয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান:

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং (প্রাঃ) লিমিটেড

পুস্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা

২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফোন: ৩৪-১৬০৬

অন্ত সবসময় সতর্ক থাকি। শৈশবে মায়ের কাছে আমি এই শিক্ষাই পেয়েছিলাম। পিতা যে আমাকে অন্ত রকমের শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা নয়। তবে মাঝে মাঝে আমার মনে হয়েছে যে সংকারী চাকরির গতানুগতিক তাঁকে জনতার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। অর্থের কৌলিন্য অক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তায়। তাঁর ভুল হয় না বলে একটা অহংকার ছিল। কিন্তু আমার বিবাহের ব্যাপারেই বোধ হয় তাঁর প্রথম ভুল হল।

মা তখন বেঁচে ছিলেন না। কিন্তু তিনি যে উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, তা আমার মনে ছিল। তিনি বলেছিলেন, আমাদের ছোট সংসার, তাই যে কোন মেয়েই হয়তো মানাবে। অন্তত: আমরা মানিয়ে নিতে পারব। কিন্তু সংসার বড় হলে পুরনো ঘরের মেয়ে আনা খুবই দরকার। তারা ঘর ভাঙতে ভয় পায়, বরং ভাঙা ঘর জোড়া দেবার চেষ্টা করে। আমার মা বেঁচে থাকলে নতুন ঘরের মেয়ে তিনি কিছুতেই আনতেন না।

শৈলা নতুন ঘরেরই মেয়ে ছিল, উঠতি ঘরের। ওর বাবার ইটের ভাটি গঙ্গার ধারে। যখন লড়াই লাগল, তখন আমাদের সেতুর তৈরি করতে। তারপর এখানে সেখানে সৈন্যদের ব্যারাক তৈরি করে কলকাতা সহরে নিজের ম্যানসন তুললেন। মেয়ের বিয়ে যে আরও ভালো ঘরে দিতে পারতেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সময়ের অভাবেই বেশি সময় নষ্ট না করে আমার সঙ্গেই শৈলার বিয়ে দিয়ে দিলেন। বড়লোকের মেয়ে বাবা খুশী মনেই নিয়েছিলেন। বিয়েটা তাঁর ইচ্ছাতেই হয়েছিল। ছেলেকে ছেলের মত আমি নিজের ভাগ্যকে তাঁরই হাতে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। পরে বাবা স্বীকার করেছিলেন যে তাঁর হিসেবের ভুল হয়েছিল। কিন্তু বেশীদিন তাঁকে সেই ভুলের মাশুল দিতে হয় নি। একদিন সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করে অসম্মানের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেন। শৈলাকে আত্মহত্যা করতে তিনি দেখে যান নি। তাঁকেও আত্মহত্যা করতে হয় নি বলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি।

কল্যাণী বললেন: আপনার পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে আমি আপনাকে বিব্রত করব না।

বিব্রত আমি হব না, কিন্তু—

কিন্তু কী?

আপনি আমাকে অনেক কিছু অসংকোচে বলেছেন। সে কি শুধু আইনের সাহায্য পাবার আশাতেই বলেছেন?

তার জন্ত সংক্ষেপে বলা যেত।

সত্যি কথা। তবে কেন কল্যাণী চৌধুরী আমাকে এত কথা অসংকোচে বলে এমন বিপদে ফেলেছেন। বছর তিনেক হল আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ের ভিতর এই প্রশ্ন আমাকে উত্থাপন করতে হয় নি। যারা কৌতূহলী হয়ে কিছু জানতে এসেছিল, তাদের আমি জানিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আজ তো কল্যাণীর কাছে কিছু গোপন করতে ইচ্ছা করছে না।

কল্যাণী বললেন: কী ভাবছেন?

ভাবছি আপনার কথা।

কল্যাণী হাসলেন। সুন্দর সরল নিরভিমান হাসি। এই হাসি দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। আমার মনে হল, কল্যাণী একসময় হাসতে জানতেন, এই রকম সুন্দর হাসি তাঁর মুখে সারাক্ষণ লেগে থাকত। হাসির সঙ্গে তাঁর প্রাণের যোগ ছিল, প্রাণের সজীবতা হাসি হয়ে ঝরে পড়ত। মনে হল, আজ অনেক দিন পরে কল্যাণী চৌধুরী আবার হাসলেন। তাড়াতাড়ি বললাম: হাসলেন যে?

কল্যাণী বললেন: সরলতা আমরা একেবারে হারিয়ে ফেলেছি। এর জন্তে বোধ হয় শিক্ষা ও সভ্যতাই দায়ী। আমরা যদি বন্ত হতাম, আপনার মনে এত সংকোচ হত না। নিজের কথাও সহজে বলতেন, আর আমি কী করে বললাম সে চিন্তাতেও এত ক্লেশ পেতেন না।

বন্ত জীবনের প্রতি কল্যাণীর কি শ্রদ্ধা আছে! কিন্তু আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করবার সাহস পেলাম না।

কল্যাণী বললেন: আপনাকে দেখে আমার একটা কথা মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, আপনি একজন আঘাত-পাওয়া মানুষ। কেন এ কথা মনে হয়েছিল তাও বলি। একটা খুনের খবর পেয়ে আপনি কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না, কৌতূহলীও হলেন না। আপনি একজন উকিল, আপনার প্রাণে সাড়া না জাগাক,

আপনার বুদ্ধিকে নাড়া দেবেই। কিন্তু আপনার কথা-বার্তায়, আপনার আচরণে কোন পরিবর্তনই ফুটে উঠল না। আমি আড়াল থেকে আপনাকে দেখছিলাম। বুঝতে আমার দেরি হল না যে এর চেয়েও কোন গভীর দুর্ঘটনা আপনার প্রাণকে পাথর করেছে। আমি ঠিক এই রকমেরই একজন মানুষকে খুঁজছিলাম। আঘাত-পাওয়া মানুষ যে মানুষের বেদনা বুঝবে নিজের বেদনা দিয়ে।

আমি বিহ্বল হয়ে যাই। কল্যাণী কি আমাকে জাদু করছেন! আমার চেতনায় কেন রূপান্তর হচ্ছে!

কল্যাণী বললেন: আপনাকে বোধ হয় আমি চিনতেও পেরেছিলাম। আপনি যখন ম্যানেজারের সঙ্গে কথা কইছিলেন, আমি ভাবছিলাম আপনাকে কোথায় দেখেছি। তারপর সেই মহিলার আত্মহত্যার কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল, সেই ঘটনার পরেই বোধ হয় আপনাকে প্রথম দেখেছি, সেই শেষ। তারপরে আমিও আর সংঘে যাই নি। কলকাতা থেকে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছি।

আমি বুঝতে পারছিলাম, আমার দৃঢ়তা ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছে, ভেঙে পড়ুক, ভেঙে পড়ে বলেই তো সে হৃদয়। হৃদয়ের ধর্ম কেন যুক্তি দিয়ে খর্ব করি! বললাম: আপনি আমাকে ঠিকই চিনেছিলেন। শৈলার আত্মহত্যার পরে আমি একদিন সংঘের ভবনে গিয়েছিলাম। তার আগে 'অপদার্থ সংঘে'র নাম আমি শুনি নি। এ রকম একটা নামের সংঘে যাতায়াত করতে আমার নিশ্চয়ই লজ্জা করত। নামটা অন্য কিছু হলে আমি হয়ত আরও কয়েকদিন যেতাম। গেলে আর কিছু না হোক, খানিকটা রহস্যভেদ হত।

আমাদের মনে হয়েছে, রহস্যভেদ করবার বাসনা আপনার ছিল না।

বাসনা ছিল, কিন্তু প্রবৃত্তি ছিল না। আরও সত্য কথা, আমার আভিজাত্যের অহঙ্কার একটা মস্ত বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শক্ত মাটির মানুষ হয়ে নোংরা পাক ঘাঁটতে মন আমার কিছুতেই রাজী হল না।

কিন্তু তিনি তো আপনার স্ত্রী ছিলেন!

তাতে কোন সন্দেহ নেই, আমার কিছু কর্তব্যও ছিল মানি। কিন্তু সে কর্তব্য আমি যদি তার মৃত্যুর আগে পালন করতাম, তাহলে হয়ত এ দুর্ঘটনা ঘটত না।

কল্যাণী চৌধুরী শিউরে উঠলেন। শীতার্ত বাতাস বইছিল অল্প অল্প। দিনের আলো নিবে গিয়ে পথের উপর অন্ধকার ঘনিয়েছে। পাহাড়ের অন্ধকারে ঠাণ্ডা আছে। কিন্তু কল্যাণী যে শীতে শিউরে উঠলেন না, তা আমি বুঝতে পেরেছি। গায়ের শালখানা তিনি ভাল করে জড়ালেন না, শুধু একটু আড়ষ্ট হয়ে বসলেন।

বললাম: ভয় পাবেন না। আমি তাঁর মৃত্যুর কারণ নই, আমি সতর্ক থাকলে হয়তো তাঁকে রক্ষা করতে পারতাম।

পারতেন?

এমন করে প্রশ্ন করবেন না। তাঁকে রক্ষা করবার কোন সুযোগ পাই নি বলেই আমার আক্ষেপ হয়েছিল। আমার অসতর্কতার জন্য নিজেকে ধিক্কারও দিয়েছিলাম। সব কথা জানলে আমি নিজেই তাঁকে হত্যা করতাম

প্রকাশিত হইল

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ ৮·০০

ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

সত্যেন্দ্রনাথ, কুমুদরঞ্জন, করুণানিধান, কালিদাস, কিরণধন, পরিমলকুমার, মোহিতলাল, নজরুল, যতীন্দ্রমোহন, যতীন্দ্রনাথ, সতীশচন্দ্র, মণিলীকান্ত, সাবিত্রীপ্রসন্ন,—এই তের জন রবীন্দ্রানুসারী কবির কবিকর্মের বিস্তৃত আলোচনার মধ্য দিয়ে আধুনিক বাংলা কবিতার অব্যবহিতপূর্ব রূপটি এই গ্রন্থে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রাপ্তিস্থান:

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং (প্রাঃ) লিমিটেড

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা

২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফোন: ৩৪—১৬০৬

কিনা, তাও বলতে পারি না। সোজা কথায়, তাঁর আত্মহত্যা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। আমার নিজের ঘরে যে এরকম একটা ঘটনা ঘটতে পারে, স্বপ্নেও আমি তার আভাস পাই নি। এই আত্মহত্যার কারণ আমাকে পেয়েকার মতো অনুসন্ধান করতে হয়েছিল। কিন্তু আমার পিছনে পেয়েকা লাগে নি। শুনেছিলাম, শৈলর বাবা কিছুই প্রকাশ হতে দেন নি। এমন কি কোন কাগজেও খবরটা প্রকাশ করা হয় নি। শুধু একদিন আমাকে বলেছিলেন যে পাত্র-নির্বাচনে তাঁর ভুল হয় নি, কিন্তু আমার ভুল হয়েছিল পৃথিবীটাকে চিনতে। প্রচুর লেখাপড়া করেও আমি নাকি অঙ্ক থেকে গিয়েছি।

এ হল নতুন পৃথিবী সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা। পিতা তাঁর কন্যাকে চিনেছিলেন, এবং একটা বৃহৎ দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সে গোপনে। আমার কাছে কিছু প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। করলে অন্য রকমের নমস্যা ঘনিয়ে উঠত। আমি যখন তাঁকে টেলিফোনে তাঁর কন্যার মৃত্যুসংবাদ দিই, তিনি একটুও বিচলিত হন নি। শুধু একটি কথা বলেছিলেন, আসছি। তারপর সমস্ত ব্যবস্থাই তিনি একা করে ছলেন।

শৈলর বাবা আমার কাছে কিছুই জানতে চান নি। প্রথমটায় মনে হয়েছিল যে তিনি এমন গভীর ভাবে আমাকে অপরাধী সন্দেহ করছেন যে কোন প্রশ্ন করার প্রয়োজন মনে করেন নি। তার পর মনে হল যে তিনি এমন কোন দুর্ঘটনার সংবাদের জন্য অনেক আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলেন। আমার কাছে তাঁর একটি কথা জানবার ছিল—এ রকম একটা পরিণতির আশঙ্কা আমি করেছিলাম কিনা।

তাঁর ছেলেমেয়েদের কথা আমি পরে শুনেছিলাম। ছেলে বিলেত গিয়েছিল, সে ফেরে নি। খরচ পাঠানো বন্ধ করে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন, তাতে ফল হয় নি। যখন তিনি আসামে পথ তৈরি করছিলেন, তখন তাঁর বড় মেয়ে নাকি হারিয়ে যায়। সেই মেয়ের কথা আমরা কোনদিন শুনি নি। ভদ্রলোক বিপত্নীক বলে পরিচিত। অত্যন্ত চাপা স্বভাবের মানুষ। তাইতেই তিনি জীবনের অনেক মর্মান্তিক ঘটনা গোপন রাখতে পেরেছিলেন।

বিয়ের সময় মেয়েকে তিনি বাড়ি গাড়ি কাঁচা পয়সা অনেক দিতে পারতেন। কিন্তু কিছুই দেন নি। বলেছিলেন, তোমাদের বাড়ি গাড়ি তো আছেই, পয়সারও অভাব নেই। আমি বরং কিছু কাগজ দিচ্ছি, বছর দশেকের আগে ভাঙানো চলবে না।

এ কথা শুনে তখন আমার কিছু মনে হয় নি। পরে বুঝেছিলাম যে তিনি দূরদর্শিতার কাজ করতে চেয়েছিলেন। আমি সেই কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছি। সাবেকি আমলের চক-মেলানো বাড়ি শৈলর ভাল লাগে নি। শুধু বাড়ির চেহারার জন্য নয়, নানা কারণেই ভাল লাগে নি। বাবা অবসর নিয়েছিলেন। সময় কাটাবার জন্য যে পথ বেছে নিলেন, তা প্রাচীনজনোচিত। পূজাপাঠ ও শাস্ত্রাধ্যয়ন। আমাদের ঠাকুরঘর ছিল, তাতে শিব ছিলেন প্রতিষ্ঠিত। এতদিন পূজারী ব্রাহ্মণ পূজা করতেন, এবারে বাবা সেই ভার নিলেন। মার কথা আমার মনে পড়ে। শিবের পূজা না করে তিনি জলস্পর্শ করতেন না। সন্ধ্যাবেলায় শিবের আরতির পূর্বে তাঁকে কোন উৎসবে পাওয়া যেত না। শৈশবে আমি একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ঐ পাথরে মাথা ঠুকে তুমি কী পাও? মা বলেছিলেন, কী পাই নি বড় হয়ে তা ভেবে দেখিস। সবাই বলে, মা সব পেয়েছেন। স্বামী পুত্রকে রেখে যাওয়ার মতো বড় পাওয়া বুঝি আর নেই। তাইতেই বলেছিলেন, তুলসীতলা নয়, শিবমন্দিরের নিচে আমাকে নামাস। সেই তাঁর শেষ কথা।

আমাদের জীবনে এই প্রথম কথা। বিশ্বাসে কী না মেলে!

নিজেকে আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু কল্যাণী আমাকে খেই ধরিয়ে দিলেন। বললেন: আপনাদের সেকেলে বাড়ি আপনার স্ত্রীর ভাল লাগে নি।

বাবাকেও তার ভাল লাগে নি। ধূপধুনোর তার দম আটকাত, শঙ্খঘণ্টার ধ্বনিতে কান হত ঝালাপালা। আচারনিষ্ঠার তার স্বাধীনতা ব্যাহত হত। এই ধারণা যে নিতান্তই মনগড়া, তাতে সন্দেহ নেই। শিবের মন্দিরে

দেবসেবা হলে বা নির্জনে কেউ শাস্ত্রপাঠ করলে অপরের অসুবিধা কেন হবে! আমি এই অন্যায় আবদারের প্রতিবাদ করেছিলাম।

কল্যাণী চৌধুরীর দৃষ্টিতে আমি যেন আমার কাজের সমর্থন পেয়ে গেলাম। মনে হল, প্রতিবাদ না করে আমি যদি তার আবদারের প্রশ্রয় দিতাম, তাহলে সে আমাকে উপহাস করত, কিংবা ধিক্কার দিত। তবু আমি তার কাছে স্বীকার করলাম যে তার অন্য আবদারে আমি বাধা দিই নি। সে বেড়াতে ভালবাসত বলে আমি আদালতে পৌঁছে গাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দিতাম। সন্ধ্যাবেলা যখন আমার মক্কেলরা আসত, তখনও আমি তাকে বেড়াতে যাবার অনুমতি দিতাম। আর দিতাম তার প্রয়োজনের মতো পয়সা। তাতে আমি কোনদিন কার্পণ্য করি নি।

আজ স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই, পিতার মৃত্যুর পরে আমি যা কিছু পেয়েছি, তাকে সব দিয়ে আমি নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলাম। কেন তার অর্থের প্রয়োজন, সে কথা কোনদিন জানতে চাই নি। কিন্তু তার দাবী মেটাবার জন্য আমি আপ্রাণ পরিশ্রম করেছি। কতটুকুই বা সময়! দু-তিনটে বছরেই আমি নিঃস্ব হয়ে গেলাম। ব্যাঙ্কের পয়সার জন্য ক্ষোভ ছিল না। তার মৃত্যুতে আমি মনের ভরসা হারিয়ে রাতারাতি যেন বুড়ো হয়ে গেলাম।

কল্যাণী চৌধুরীর উজ্জ্বল দৃষ্টিতে এক জিজ্ঞাসা জ্বল-জ্বল করছে। আমি তার প্রশ্ন জানি। বললাম: কেন দিলাম? দান মানুষের ধর্ম, কৃপণতা নয়। দিয়ে মানুষ কাঙাল হয় না। দেবার জিনিস কোনদিন ফুরিয়েও যায় না। শীলাকে যা দিয়েছি, তা নিতান্তই পার্থিব। অপার্থিব কিছুই সে নিতে পারে নি। তাকে এখন আমি করুণা করি।

এমন কাজ কেন তিনি করলেন, তা কি জানতে পেরেছিলেন?

কী হত জেনে! শুধু এইটুকু জানি যে দুঃখে মানুষ সংগ্রাম করে, আর আত্মহত্যা করে অনুশোচনায়। কোন কারণে তার মোহভঙ্গ হয়েছিল, এইটুকু জেনেই নিশ্চিন্ত হয়েছি। মোহের কারণ অনুসন্ধানে নিজের মনটা কলুষিত করি নি।

তারপর?

দুর্বলতার দিন আমার অতিক্রান্ত হয়েছে।

বাধা দিয়ে কল্যাণী বললেন: হয় নি। জীবনকে আপনি অন্য চোখে দেখছেন। যারা আপনার স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ, তাদের আপনি আজও ক্ষমা করেন নি।

আমি বোধ হয় চমকে উঠেছিলাম।

কল্যাণী বললেন: চমকে উঠবেন না। আমি যে কথা বলছি, তা সত্য। মিথ্যা বলে সন্দেহ থাকলে এমন সহজে অভিযোগ করতাম না।

কল্যাণী কি ভুল বলছেন না! আমি কি আমার দুর্বলতা আজও অতিক্রম করতে পারি নি! ক্ষমা করতে পারি নি শীলার হত্যাকারীদের! কিন্তু কাউকে তো আমি চিনি না, কারও উপর তো আমার অভিযোগ নেই, প্রতিশোধ নেবার সংকল্প নেই কারও উপরে।

কল্যাণী বললেন: আপনার স্ত্রীর মৃত্যুর আগে আপনি দেওয়ানি আদালতের উকিল ছিলেন, তারপর যোগ দিয়েছেন ফৌজদারি আদালতে। এই পরিবর্তনের মূলে কোন প্রতিক্রিয়া আছে। আপনি ভেবে দেখবেন।

আবার আমি চমকে উঠলাম।

প্রকাশিত হইল

এই ভারতের পুণ্যতীর্থে ৬·০০

শ্রীকেবল

Thesis—antithesis—synthesis বা পূর্বরাগ-বিরহ-মিলনের সূত্রে তিন অধ্যায়ে ভ্রমণকাহিনীর মাধ্যমে 'কো অহা বেদ' এই চিরন্তন জিজ্ঞাসার প্রেরণায় ভারতের তীর্থে তীর্থে জীবনব্রতের আহুতিদান।

প্রাপ্তিস্থান:

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং (প্রাঃ) লিমিটেড

পুস্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা

২, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

ফোন: ৩৪—১৬০৬

কল্যাণী হাসলেন।

তাড়াতাড়ি আমি বললাম: সময় হাওয়া বইছে। চলুন একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়ি।

তাহলে হোটেলেই ফিরি।

হোটেলের নামে আমার মন ভরে উঠল না। বললাম: তার আগে এক পেয়ালা কফি। চিনেবাদাম আপনার ভাল লাগে না?

কল্যাণী হেসে বললেন: লাগে।

এবারে আমরা একটা রেস্তোরাঁয় বসব।

সাত

রেস্তোরাঁয় ঢুকে আমার বিস্ময়ের অবধি রইল না। কল্যাণী বলেছিলেন, একটু নিরিবিলিতে বসব। সেই নিরিবিলি খুঁজতে গিয়ে দেখি, অনাদিবাবু একটা কোণার দিকে পরম পরিতৃপ্তি সহকারে চা খাচ্ছেন। আমাদের দেখতে পেয়েই চমকে উঠলেন, মুখের উপরে নামল দুর্ভাবনার ছায়া। আমি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললাম: আপনি নিশ্চিন্তে বসে যান, আমরা কাউকে এ কথা বলব না।

সহসা ভদ্রলোকের মুখে কোনো উত্তর যোগাল না।

কল্যাণী বললেন: সরে আসুন, এই দিকটায় একটু ফাঁকা আছে।

আমরা সেই ফাঁকা জায়গায় এসে বসলাম। বললাম: কফি নয়, যা আপনার ভাল লাগে তাই বলুন।

বেয়ারাকে কল্যাণী বললেন বাদ বাদ কোনো কিসিমের কথা। তার সঙ্গে চা। আমি হেসে বললাম: আপনার সঙ্গে আমি রোজ এখানে আসব।

কল্যাণীও হেসে বললেন: আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে বাদের ভয়ে আমি হোটেল বদল করেছিলাম। দুবার বলেও যখন বাদ করল না, আমাকে হোটেলই ছাড়তে হল।

এরা আপনার কথা শুনছে তো?

এদের ম্যানেজারকে তো দেখলেন। ওঁর নিজেরও বোধ হয় বাদ চলে না। তাইতেই সুবিধে হয়েছে।

আজ অনাদিবাবুর মতো আপনারও সাহস বেড়েছে দেখছি।

সাহস বাড়ে নি, বেড়েছে অনিয়মের বাসনা। আজ বাঁধাবাঁধি নিয়মকানুন থেকে একটু মুক্তি পেতে চাই।

একটু স্বাধীন জীবনের আস্বাদ তাই নয়। তাহলে আমি কী করি?

ভেবে দেখুন, কী আপনি করেন না, বা কী করা আপনার অনুচিত।

মনে পড়ল যে মেয়েদের সঙ্গেই আমি সহজ ভাবে মেলামেশা করি না। করতে পারি না। কোথায় একটা ক্ষতস্থান আছে, সেখানে বেদনার শেষ নেই। শীলাকে আমি ভালবেসেছিলাম, ভাবতাম সেও আমাকে ভালবাসে। সেই বিশ্বাস ভেঙে যাবার পর থেকেই আমার বিশ্বাস হারাবার বেদনা গভীর হয়েছে। আজ ইচ্ছা হল, এই অবিশ্বাসকে দূরে ঠেলে রাখি, কল্যাণীর সঙ্গে এই সন্ধ্যাটা সহজ ভাবে কাটিয়ে দিই। মন আমার প্রফুল্ল হয়ে উঠল।

কল্যাণী আমাকে লক্ষ্য করেছিলেন, বললেন: কী স্থির করলেন?

শুনবেন?

কল্যাণী বুঝতে পারলেন যে আমি কোন তরল পরিহাসের কথা বলব। বললেন: এখনও আপনার সঙ্কোচ যাচ্ছে না।

আজকের সন্ধ্যেটা আপনার সঙ্গে সহজ ভাবে কাটাব।

শুধু আজকের সন্ধ্যা? কালকের নয়, পরশুর নয়, তার পরের দিনের?

আমার ভাবনা যেন এলোমেলো হয়ে গেল। এ কথার কী উত্তর দেওয়া উচিত, তা ভেবে পেলাম না। একটা ভাল উত্তরের জন্য আমার মন যখন বুদ্ধির সঙ্গে পরামর্শ করছে, সেই সময়ে অনাদিবাবু আমাকে রক্ষা করলেন। চায়ের পাত্র শেষ করে তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন। কাছে এসে হাত কচলে কৈফিয়ত দিলেন: এদের জায়গায় কখনও আমি আসি নে। আজ—

আজ একটু মন খারাপ হয়েছিল।

ঠিক বলেছেন। দুপুর থেকেই মনটা আজ ভাল

নেই। হাজার হলেও ভদ্রলোক তো আমাদের সঙ্গেই ছিলেন।

তা তো বটেই।

ভদ্রলোক কৃতার্থ হলেন, বললেন আপনি যে বুদ্ধিমান লোক, তা মুখ দেখেই আমি বুঝেছিলাম। ব্যাপারটা চট করে বুঝে নেলাম।

ভদ্রলোক বেরিয়ে যাবার আগে আর একবার ফিরে এলেন, বললেন : দেখবেন ঐ হতভাগা ম্যানেজারকে যেন বলবেন না। ভদ্রলোক যেন আমার গার্জেন হয়েছেন।

আমি হেসে বললাম : আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি কিছুই বলব না।

অনাদিবাবু চলে যাবার পরেও কল্যাণী চৌধুরী অনেকক্ষণ কথা কইলেন না। চায়ের সঙ্গে মাংসের ঘুগনি এল। এক চামচে মুখে দিয়ে বললাম : বেশ মিনিশ, তাই না?

উত্তরে কল্যাণী অন্য কথা কইলেন। আস্তে আস্তে বললেন : মায়ার কথা বলতে গিয়ে আমরা কোথায় পৌঁছে গেছি।

মায়ার কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। কল্যাণীর কথায় আবার মনে পড়ল। বললাম : তাকে আর আমাদের দরকার নেই। এবারে আমরা স্বাধীনভাবেই এগোতে পারব।

কল্যাণী হেসে বললেন : তা পারব। কিন্তু ঐ মেয়েটার সম্বন্ধে সন্দেহ আমার যাবে না।

কিসের সন্দেহ?

নির্মল সেনকে সে-ই ধরিয়ে দিয়েছে। প্রথম দর্শনেই এই সন্দেহ আমার মনে জেগেছে, আর প্রতিদিন তার সমর্থন পেয়েছি।

কল্যাণী বলতে লাগলেন মায়া ও তার বাবা ফিরলেন নির্মল সেনের সঙ্গে। কল্যাণী তাদের পিছনে ছিলেন। কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু মায়ার হাসি শুনতে পাচ্ছিলেন থেকে থেকে। নির্মল গম্ভীরভাবে পথ চলছিল। নিজেদের হোটেলের সামনে এসে মায়ারা বিদায় নিল। নির্মল এগিয়ে গিয়েছিল, কল্যাণী পিছনে ছিলেন। শুনতে পেলেন, মায়া অত্যন্ত মৃদুস্বরে প্রশ্ন করল, কেমন দেখছেন? বৃদ্ধ ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, ধরতে হবে। তারপরে দুজনেই চলে গেলেন হোটেলের ভিতরে।

এ ঠিক পিতা পুত্রীর মতো কথা নয়। এ তো জাল ফেলে পাখি ধরা নয় যে কন্যা পিতাকে প্রশ্ন করবে পাত্রের সম্বন্ধে, আর পিতা তার কন্যাকে নিকায় রাখবার আদেশ দেবে! অন্য কিছু অনুমান করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কল্যাণী তাদের গোয়েন্দা বলে সন্দেহ করলেন।

পরদিন সকালে মায়া একা এল। বিকালে আবার এল বেড়াতে টেনে নিয়ে যাবার সময়। মায়ার ছোট-খাট টুকরো কথা কল্যাণীর কানে গেছে—আপনি বড় বেশী গম্ভীর, বড় চুপচাপ থাকতে ভালবাসেন; বাবা বাবার বলেছেন, পৃথিবীর কথা এখন তাঁর মনে পড়বে না ইত্যাদি।

নির্মল সেনের সম্বন্ধে কল্যাণীর কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। বয়স বছর ত্রিশেক বলে অনুমান করে। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার আগেই যে জন্মেছিল, তাতে তাঁর সন্দেহ নেই। কেন না বন্ধুদের কাছে বয়স নিয়ে গর্ব করতে শুনেছে—আমি কি আর আজকের লোক হে, বিছানায় পড়ে না থাকলে ভিক্টোরিয়া ক্রস নিতাম। যুদ্ধের পরে পাওয়া পীস মেডেলটা নাকি এখনও আলমারিতে তোলা আছে। এটা বয়সের ধর্ম। এ বয়সে সব যুবকই বয়স বাড়িয়ে আনন্দ পায়। সত্যই যখন বয়স বাড়বে, তখন আর এ কাজ করবে না।

নির্মলের পিতার পয়সা আছে বলেও কল্যাণী শুনেছিলেন। যুদ্ধের সময় বাণিজ্যে নেমে লক্ষ্মীকে তিনি সিন্দুকে আটকেছেন। নির্মলের শৈশবেই তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নি। বিবাহে নির্মলেরও নাকি রুচি নেই। এটা বোধ হয় যুগের হাওয়ায়। দাদা জীবনের সঙ্গী হিসেবে যাকে গ্রহণ করতে হবে, তাকে ভাল করে দেখে শুনে বাজিয়ে নেওয়া দরকার। এই বাজিয়ে নেবার নামে যথেচ্ছাচার চলছিল বলে কল্যাণী মনে করেন।

লেখাপড়া শিখে নির্মল চাকরীতে ঢোকে নি। বাপের

ইচ্ছায় যাদের যাবজ্জীবনে কয়েকটা দায়িত্বহীনভাবে কিছু দেখাশুনো করছিল। আরও সব কর্মচারীর মতো মোটা মাইনে নেয়, ছুটি নেয় প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে, মোটরগাড়ির মাঝে দাঁড়িয়ে ঘণ্টা, ঘণ্টা ও ঘুরোর আড্ডায় তার ছুটি মেলে না। মনোজ মিত্র তার নাম দিয়েছিল হিরো।

এই নির্মল সেন কি করে এখানে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছে, সেই ভেবে কল্যাণীর আশ্চর্য লাগছিল। এইবারে মায়ার এই ঘনিষ্ঠতা দেখে তাঁর সন্দেহ রইল না যে দু-দিনেই সে এই মেয়েটার কাছে বাঁধা পড়বে। বয় তো ছাড়া নয়, বয় বয়সে পড়া, মহীর হাতের স্পর্শেই ঝনঝন করে বেজে উঠবে।

কল্যাণী গোপন করবেন না তাঁর দুর্বলতার কথা। নির্মলের দিকে তিনি অতিরিক্ত বেশী নজর দিতে শুরু করলেন। তাঁর মনে হতে লাগল যে হাজিলিঙের এক ঘেয়ে জীবনে নির্মল ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কলকাতার যে হইচই হাঙ্গামা সন্ধ্যাগুলি তাকে এতদিন মাতাল করেছে সেই নেশা এখনও তার রক্তে লেগে আছে, এখনও তাকে চুম্বকের মতো টানছে। তারই সঙ্গে একটা মর্মান্তিক যন্ত্রণা আছে, নানা আশঙ্কায় তার সমস্ত স্নায়ুগুলো জড়ের মতো অসাড় হয়ে যাচ্ছে। দেহটা চাঙ্গা হয়ে উঠতে না উঠতেই একটা পুঞ্জিত গ্লানির ভারে মনটা মিইয়ে যাচ্ছে। নির্মল ডাক্তার দেখাচ্ছিল, টনিক খাচ্ছিল, আর আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে কত অসম্ভব আজগুবী কথা ভাবছিল।

সেদিন মায়াকে নির্মলের ঘরে ঢুকতে দেখে কল্যাণী এসে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়েছিলেন। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন নির্মলকে। সে খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ একখণ্ড মেঘ এসে রৌদ্রকে ঢেকে দিল, একটা গাঢ় নীল ছায়া এল সামনের দিকে এগিয়ে। নির্মল চমকে উঠল। অকস্মাৎ দেহটা উঠল থরথর করে কেঁপে। মায়া যে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল, তা সে লক্ষ্য করে নি। এবারে তার প্রশ্ন শুনে আর একবার চমকে উঠল। কী হল। অমন চমকে উঠলেন যে?

নির্মলকে বড় অসহায় দেখাল। যেন তার একটা গভীর অপরাধ হঠাৎ ধরা পড়ে গেছে। মায়ার কথার উত্তর তার মুখে যোগাল না। মায়াই আবার বলল: বড় দেখছিলেন বুঝি?

খোলা খবরের কাগজখানা মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে। মায়া সেখানা কুড়িয়ে নিয়ে গুছিয়ে রাখল। বলল: এই খুনের খবরটায় আপনি খুবই বিচলিত হয়েছেন। হবারই কথা। মনোজ বাবু তো আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

কল্যাণী চৌধুরী সরে এসেছিলেন। বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ধরা পড়বার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। কিন্তু মায়াকে তিনি ধরে ফেলেছেন। মায়ার সম্বন্ধে আর তাঁর কোন সন্দেহ রইল না।

খানিকটা পরে নিজের ঘর থেকে কল্যাণী দেখলেন, মায়ারা বেড়াতে গেল। মেয়েটা নিত্য নূতন সাজ করে আসে। নিত্য নূতন হবার বাসনা। বয়স কম বলেই তত বেমানান হয় না। কিন্তু নির্মল কেন এমন বোকামি করছে। নিজের ভালমন্দ সে কি বুঝতে পারছে না। মায়াকে প্রশ্রয় দিয়ে সে যে বিপদেরই আশ্রয় নিচ্ছে। কল্যাণী পথে বেরিয়ে অস্থির ভাবে পায়চারি করলেন। সম্ভব অসম্ভব অনেক কথা ভেবে অশান্ত হলেন। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন যে নির্মল ফিরে এলে আজ রাতেই তাকে সাবধান হতে বলবেন। এই সিদ্ধান্ত নেবার পর তাঁর খানিকটা আরাম বোধ হল। প্রসন্ন চিত্তে তিনি নিজের ঘরে ফিরে এলেন।

নির্মলের ফিরতে সেদিন দেরি হয়েছিল। বোধ হয় জলাপাহাড়ে উঠেছিল। দেহে ক্লান্তির ছাপ ছিল, কিন্তু মনে ছিল সজীবতা। নির্মল তার ঘরে ঢুকল শিস দিতে দিতে। ঠিক এই সময় তার ঘরে ঢুকতে কল্যাণীর সঙ্কোচ বোধ হয়েছিল। মনে হয়েছিল, নির্মল তাকে অসৎ ভাবতে পারে। অন্ততঃ তার সন্দেহের কথা শুনে নির্মল বিশ্বাস করবে না, হেসে উড়িয়ে দেবে। কিংবা এই ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপের জন্য অপমানও করতে পারে।

করুক অপমান। একটা মানুষকে নিগ্রহের হাত থেকে রক্ষা করতে পারলে সে অপমান তাঁর গায়ে লাগবে না।

এইখানে আমি কল্যাণীকে বাধা দিলাম। বললাম: নির্মলকে আপনি কোন দিন শ্রদ্ধা করেন নি। বরং মনোজ মিত্রকে হয়তো ভালবেসেছিলেন। মনোজ মিত্রকে যে খুন করেছে, তার প্রতি বিরূপ হওয়াই আপনার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল।

যতটুকু শুনেছেন, তারপরে এই ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু মনোজ মিত্রকে আমি ঘৃণা করতে শিখেছিলাম। শিখিয়েছিলেন আপনার স্ত্রী।

আমাকে অভিভূত হবার সময় না দিয়ে কল্যাণী বললেন: নির্মল সেনকেও ঘৃণা করতাম, ঘৃণা করতে শিখলাম অপদার্থ সংঘের প্রত্যেকটি অপদার্থকে। সেদিন যদি ঐ সংঘের ভবনের উপর একটা বোমা পড়ত, আর সমস্ত অপদার্থ মরত বাড়ি চাপা পড়ে, তাহলে আমার একটুও কষ্ট হত না, বরং একটা পৈশাচিক আনন্দে মন আমার ভরে যেত। পরে আমি সবাইকে ক্ষমা করেছি। এখন আমার কারও ওপর এতটুকু অভিমান নেই।

কল্যাণী চৌধুরীর কাছে মনোজ মিত্রের অপরাধের গুরুত্ব আমার জানা নেই। কিন্তু কল্যাণী যা বললেন, তাতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে কোন সময় শীলা তাদের তাঁদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। এ সংবাদ আমার জানা নেই। কল্যাণী নিজে না বললে কৌতূহল প্রকাশ করা আমার পক্ষে অন্যায় হবে। তবে এইটুকু বুঝতে পেরেছি যে শীলা তাঁকে সাবধান না করলে কল্যাণীর জীবনটা অন্য রকম হত। আত্মহত্যা করতে হত কিনা জানি না। তাই আমি প্রশ্ন করলাম কিন্তু ক্ষমা তাদের কী করে করলেন?

ক্ষমা করে নিজেরই তো উপকার করেছি। মহৎ ভাবতে পারছি নিজেকে।

সেই সঙ্গেই যোগ করলেন: আর আপনার দুর্বলতা আজও যায় নি বলে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারছি।

আর একটু খুলে বলবেন কি?

আমার মুখে আর নাই বা শুনলেন। আপনি বুদ্ধিমান সিচুয়েশন একটু মিরিবিলিতে চিন্তা করলেই আপনার কাছে সমস্ত স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

বেয়ারা এসেছিল এঁটো প্লেট তুলে নিতে। তাকে বললাম, আর একপ্লেট ঘুগনি আধাআধি করে দিতে। পটে আরও চা ছিল। কল্যাণীকে বললাম: মায়ার গল্পটাই তাহলে শেষ করুন।

কল্যাণী বললেন, সেই রাত্রে তিনি নির্মলের কাছে গিয়েছিলেন। বাইরে শীতার্ত রাত্রি স্তব্ধ হয়ে প্রহর গণনা করছে। সূর্যাস্তের পর কত মুহূর্ত গেল। পৃথিবী ঘুমন্ত। তারপর আবার প্রহর গণনা, সূর্যোদয়ের আর কত মুহূর্ত বাকি। মানুষের জীবনেও এই রকম গেল আর কত রইল তার অবিরাম গণনা চলছে।

কল্যাণীর কথা শুনে নির্মল সেন হেসে উঠেছিলেন। মায়ার বাবা বিপিনবাবু নাকি উত্তরবঙ্গের এক আদালতে ওকালতি করেন। চারিদিকে চা-বাগানেও তাঁর পেয়ার আছে। পুরনো প্রতিষ্ঠিত পরিবার বলে এঁদের খ্যাতি আছে।

কল্যাণী বললেন, এই পরিচয়ে বিপিনবাবুর সম্বন্ধে যে ধারণা হওয়া উচিত তা তাঁর হয়নি। বৃদ্ধের চোখের দৃষ্টি শ্যেনের মতো তীক্ষ্ণ। মাথার চুল ও দাড়ি অকালপক্ক না হলে বয়স তাঁর ষাটের কম বলা উচিত হবে না। তাঁর পাশে সুদর্শনা মায়াকে মেয়ের বদলে নাতনি বলে মনে হয়েছিল।

সমকালীন সাহিত্য.....৩·০০

নারায়ণ চৌধুরী

। সমকালীন বাংলা সাহিত্যের তীক্ষ্ণধী সমালোচকের
দৃষ্টিতে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ-বিশ্লেষণ ।

নির্মলকে কল্যাণী যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে তার সতর্ক হবার প্রয়োজন আছে। নির্মল এ কথা মানে নি। কল্যাণী বলেছিলেন, আমি আপনার সুহৃৎ। নির্মল বলেছিল, তাহার আপনি কাতর হয়েছেন। এ কথার পরে কল্যাণী কথা বলেন নি, অপমানে মাথা নিচু করে তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।

কিন্তু আপনার তো লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল না।

না।

তবে?

মেয়ে হয়ে লজ্জাকে জয় করা লজ্জার কথা।

মুগ্ধ বিস্ময়ে আমি কল্যাণীর মুখের দিকে তাকালাম। কল্যাণীকে আমার প্রদ্ধা করতে ইচ্ছা হল।

ফেরার পথে কল্যাণী বললেন: আপনাকে একটা অনুরোধ করব?

নিশ্চয়ই করবেন।

নির্মল সেনকে বাঁচাবার দায়িত্ব আপনি নিজে গ্রহণ করুন।

আমি চমকে উঠলাম। কল্যাণী যে কথা কইছেন, আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। পথের আলোয় আমি তাঁর মুখ খুব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সে মুখে অভিমান নেই, ঘৃণা নেই, বেদনা নেই। প্রসন্ন ক্ষমার উজ্জ্বল দেখাচ্ছে কল্যাণীর মুখ।

তবু আমি রাজী হতে পারলাম না। বললাম: আমাকে এমন অনুরোধ করবেন না।

কেন করব না? পাপীকে শাস্তি দেবার সংকল্প নিয়ে দেওয়ানি ছেড়ে ফৌজদারি আদালতে গেছেন বলে?

আমি চমকে উঠলাম। কল্যাণী এ সংবাদ কোথায় পেল! এ দত্তা যে আমার কাছেই এতদিন অজ্ঞাত ছিল। আমি তো একথা কোনদিন ভাবি নি।

কল্যাণী হাসছেন। এখন আর তাঁর একটুও আড়ষ্টতা নেই। কল্যাণীর কাছে হার মানবার আগে আমি নিজের চারধার একবার দেখে নিলাম। কিন্তু ও কে? আমাকে পেছনে তাকাতে দেখে ও কেন পিছন ফিরল! তবুও শ্যামা হরশঙ্কর মেয়ে। তার মুখে যত আর সব কিছু আমি দেখতে পেয়েছি। ওরই নাম কি মায়া।

আট

হোটেলের বাইরে অনাদিবাবু পায়চারি করছিলেন, আমাদের দেখতে পেয়েই পুলকিত হয়ে উঠলেন। বললেন: ফিরলেন! আসুন আসুন, আপনাকে একেবারে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

ঘনে পাশে পাশে হাঁটতে লাগলেন। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম যে ম্যানেজারের অফিসঘর পেরবার সময় তিনি আমাকে আড়াল করে নিয়ে চলেছেন। তাবি দেহ নিয়ে নিজে ছিলেন দরজার দিকে, সতর্কভাবে পা ফেললেন আমার পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে। কল্যাণীকে একটা নমস্কার করে এগিয়ে দিয়ে আমার সঙ্গে আমার ঘরেই ঢুকে পড়লেন।

তাঁর কাণ্ড দেখে হাসি পায়, কিন্তু হাসবার উপায় নেই। তাই গম্ভীরভাবে বললাম: তারপর, খবর কি বলুন।

আর খবর! ওরে সবাই মুষড়ে পড়েছেন। বেড়াতে এসে এ কী বিপদ!

মায়ার খবর আনতে ম্যানেজার লোক পাঠিয়েছিলেন, তার কি খবর এল?

পাঠিয়েছিলেন বুঝি! কিন্তু খুব সাবধান। ঐ লোকটাকে আপনি সব সময় এড়িয়ে চলবেন। বেঁটে-খাট চেহারার ছোট মানুষ বটে, কিন্তু পাকা শয়তান। আপনার সংসারটা ছারখার করে দেবার মত বুদ্ধি রাখে।

তাই বুঝি

তাই নয়। তা না হলে কোন ভাল ভদ্রলোক কি অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে সম্ভাষণ করে! আমার স্ত্রী যদি আমার খবরের জন্য ব্যস্ত হন তো আমি তাঁকে খবর দেব। হোটেলের ম্যানেজার বলে কি আমার গার্জিয়ান হয়েছেন! হোটেলের মালিক হলে কী করতেন আমি তাই ভাবি।

একটু চা দিতে বলব?

চা!—ভদ্রলোকের চোখের দৃষ্টি জলজল করে উঠেই নিবে গেল, বললেন: চা আর দরকার নেই মশাই। মুখে থাকতে ভূতের কিল খেতে আর ইচ্ছে নেই।

হেসে বললাম: ভয় পেলেন নাকি?

ভয় বলবেন না, ভয় বলে কোন পদার্থ অনাদি সিংহের শরীরে নেই।

ভদ্রলোক একবার নিজের শরীরটা দেখলেন, তারপর বললেন: রাজেনবাবুর আখড়ায় মশাই শরীর চর্চা করেছি। পেটে চা না পইতে পারে, শরীরে ভয় ঢুকতে পারে নি।

ভয় তো মনে থাকে!

ভদ্রলোক ঘাবড়ে গেলেন, বললেন: না না, মন-টনের কথা আর তুলবেন না। বড় গোলমেলে কথা ঐ মন। দুটো অক্ষর যে এমন জট পাকাতে পারে জানা ছিল না।

ভদ্রলোক বলতে গিয়েও আর বললেন না। আমি তাঁকে ডেকে বললাম: একটু বসে যান, বলে যান কোথায় কি জট পাকল।

অনাদিবাবু ভয়ে ভয়ে বসে পড়লেন, বললেন: ম্যানেজারবাবু তো তাই বলছিলেন, মন দেওয়া-নেওয়া করতে গিয়েই নির্মল সেন ধরা পড়ল। ঐ মনটা না থাকলে কি আর তাঁর খুনের কথা ধরা পড়ত!

খাঁটি কথা। ঐ মনটা না থাকলে হয়তো খুনও করতেন না।

এও তো খাঁটি কথা।

হঠাৎ বললাম: আচ্ছা অনাদিবাবু, পাশের ঘরের ঐ মাহলাকে আপনি ভয় পান না? তিনিও তো আপনাকে চা খেতে দেখেছেন?

অনাদিবাবু একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করলেন: কারও সঙ্গে আলাপ নেই, ম্যানেজারের সঙ্গেও না। এই হোটেলে যে থাকেন, তাই অনেকে জানেন না।

তারপরেই হঠাৎ ঘনিষ্ঠভাবে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার আত্মীয় বুঝি?

না।

প্রতিবেশী?

তাও না।

তবে নিশ্চয়ই পুরনো পরিচিত।

এ কথার উত্তর না দিয়ে আমি হাসলাম। কিন্তু অনাদিবাবু অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন: কিছুই যদি না হন, তাহলে একটু সাবধান হবেন। ঐ শয়তান ম্যানেজার সব দেখেছেন। আপনার ঠিকানাও আছে ওর খাতায় লেখা। একখানা চিঠি দিয়ে আপনার সাজানো সংসার তছনছ করে দেবেন।

ভদ্রলোকের কথা আমি উপভোগ করছিলাম। তাই অনুমান করে বলে উঠলেন: এখন আপনি সাহস দেখাচ্ছেন, পরে কিন্তু পস্তাতে হবে। হোটেলে এরই মধ্যে কথা উঠেছে।

তাই নাকি!

এমনিতেই ভদ্রলোকের ক্ষীণ কণ্ঠ, তাতে আরও সন্তর্পণে বললেন: মাংসের ঘুগনি খেতে আপনারা বেরিয়েছিলেন, আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম। আর এদিকে পাঁচজনে নানা কথা আলোচনা করছে।

তারপরেই আশ্বাস দিলেন: তা করুক, আপনি ভয় পাবেন না, ম্যানেজারকে আমি সামলাব।

ঘর ছেড়ে যাবার আগে বলে গেলেন: দেখবেন মশাই, আমার কথাটা যেন প্রকাশ না হয়। ভয় আমি পাই নে,

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের দু'খানি প্রামাণ্য গ্রন্থ

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস ১৫·০০

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস [২য় সংস্করণ—যন্ত্রস্থ

তবু বুঝেছেন কী—অনর্থক কালেরা বাড়াতে আর ইচ্ছে নেই।

আমি আবার ভরসা দিলাম : আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

তা আছি বৈকি। কোন ছোট কাজ যে আপনি করতে পারবেন না, তা আমরা বুঝতে পেরেছি।

অতিরিক্ত বিনয়ে ভদ্রলোক নমস্কার করে গেলেন।

নয়

কল্যাণীর একটা কথা আমার হৃদয়কে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। যে কথা আমি নিজে কোনদিন ভাবি নি, সে কথা কল্যাণী আমাকে ভাবতে বললেন। এমন অবলীলাক্রমে বললেন যে আমি সন্দেহ করবারও সুযোগ পেলাম না।

আমি আমার অতীতটা স্মরণ করবার চেষ্টা করলাম। শৈলার মৃত্যুর পর তিন বৎসর এখনও পূর্ণ হয় নি। কিন্তু আমার জীবনের উপর দিয়ে বুঝি অনেক তিন বৎসর বহিয়ে গেছে। আমি আমার যৌবনটাকে হারিয়ে ফেলেছি নিজের অজ্ঞাতসারে।

কল্যাণী বলছিলেন, আমি দেওয়ানি থেকে ফৌজদারি আদালতে এসেছি একটা প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার ফলে। শৈলার আত্মহত্যার পিছনে পাপের গোপন অভিসার ছিল। সেই পাপ আমাকে পাগল করেছে, প্রতিহিংসা-পরায়ণ করেছে। পাপীর উপর প্রতিহিংসা নেবার জন্যই আমি নাকি দেওয়ানি ছেড়ে ফৌজদারি আদালতে এসে যোগ দিয়েছি। কল্যাণী কি সত্য কথা বলছেন?

বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়তে যাওয়ার কথা আমার মনে পড়ল। শুনেছিলাম, ব্যারিস্টারদের শপথ গ্রহণ করতে হয় যে বিনা পারিশ্রমিকে নির্যাতনের পক্ষ সমর্থন করব। এ কথা কবে কার কাছে শুনেছিলাম মনে নেই, কিন্তু একদা আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। আমি যখন দেওয়ানি ছেড়ে ফৌজদারি আদালতে আসি, তখন এই কথা আমার নূতন করে মনে পড়ে। মামলা গ্রহণ করবার আগে আমি জিজ্ঞাসা করতাম, আসামী কে? আসামী পক্ষের মামলা কি আমি কখনও হাতে নিয়েছি? মনে পড়ছে না।

অনাদিবাবু চলে যাবার পরে একটা চুরুট ধরিয়েছিলাম। সেই চুরটের ধোঁয়ায় অনেকখানি স্থান আচ্ছন্ন হয়েছে। ঘরের আবহাওয়াও হয়েছে অনেকখানি ভারি। বুকের উপর যেন খানিকটা চাপ পড়ছে। গত তিন বছরে যত মামলা করেছি, একে একে সেই সমস্ত মামলা মনে পড়তে লাগল।

মিথ্যা মামলায় যারা জড়িয়েছে, তাদের আমি বাঁচিয়ে এনেছি। উৎপীড়িতকে রক্ষা করেছি পরম যত্নে। কিন্তু সে তো পয়সার জন্য করেছি, জীবিকার জন্য, সুনামের জন্য। এ সবের জন্য যা করি নি, সেই কথা আমাকে স্মরণ করতে হবে।

১৯৪৬ সালের একটা মামলার কথা আমার মনে পড়ল। চারুশীলার মামলা। রাজেন দাস নামে একজন বিপত্নীক ঠিকাদারের কাছে চারুশীলা ঘর করতে গিয়েছিল। তার স্বামী মামলা রুজু করে। আমি ছিলাম চারুশীলার স্বামীর পক্ষে উকিল। রাজেন দাসের কঠিন শাস্তিবিধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম। ফলে তার সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। সেই মামলায় আমার খুব সুনাম হয়েছিল। অনেকে বলেছিল, এ রকমের সওয়াল জবাব নাকি অনেকদিন হয় নি।

এর পরেই মনে পড়ল, গত বছরের সেই মামলাটার কথা। নবীন পালের মামলা। তার স্ত্রী পালিয়ে গিয়েছিল। এই ঘর-পালানো বউকে সে ত্যাগ করতে চায়। তার স্ত্রীর পক্ষে কোন উকিল ছিল না। দু একটা সওয়াল করতেই স্ত্রীলোকটি কেঁদে ফেলল। তাকে আড়ালে ডেকে সব কথা জেনে নিলাম। নবীন পাল মদ্যপ, অসচ্চরিত্র। স্ত্রীকে ঘর করতে পারলে নূতন মেয়েমানুষ নিয়ে ঘর করবে। পথের কাঁটা সরাতে চায়। তার স্ত্রী কেঁদে বলল, সে না পালালে সেই রাতেই তাকে কেটে ফেলত। নবীন পালের প্রচুর কাঁচা পয়সা ছিল। তার টাকা তাকেই ফিরিয়ে দিয়ে আমি তার নিঃস্ব স্ত্রীর

পক্ষ নিয়ে লড়লাম। লোকটার চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড হল।

আমি যে ঘন ঘন চুরট টানছিলাম, সেদিকে আমার খেয়াল ছিল না। গরম ধোঁয়ায় গলা আমার জ্বলে যাচ্ছিল, মাথা ভারি হয়েছিল। একটা দুটো নয়, অসংখ্য মামলার কথা আমার মনে পড়ছে। এক একটা মামলা নিয়ে আমি মেতে উঠতাম, পাগলের মত পরিশ্রম করে শাস্তির ব্যবস্থা করতাম। লোকে আশ্চর্য হত, নিষ্ঠুর বলত, আমার বন্ধু আনন্দ দেখে বর্বর বলতেও লোকে দ্বিধা করত না। কিন্তু আমি সে কথায় কোনদিন কান দিই নি। ফৌজদারি আদালতে তিন বছরেই আমি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলাম।

কল্যাণী চৌধুরী ঠিকই বলেছেন। আমার হৃদয়ে একটা প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি দিনে দিনে নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে। এ প্রবৃত্তি আমার সহজাত নয়, এ একটা প্রতিক্রিয়ার। লীলার মৃত্যুর পরেই এই প্রকৃতির সূত্রপাত হয়েছে। দিনে দিনে ভীষণ আকার ধরছে। মানুষের ধর্মকে রক্ষা করবার নামে নিজের মনুষ্যত্বই বুঝি আমি বিসর্জন দিচ্ছি। কিন্তু কল্যাণী এ কথা কার কাছে জানল? নিশ্চয়ই সে কোন সত্য গোপন করেছে। সে আমাকে চেনে, সে আমাকে জানে, সে আমার—

হাতের চুরটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম। কোথায় তার চার নম্বর ঘর? কোথায় কল্যাণী লুকিয়ে আছে? তাকে আমার আবিষ্কার করতেই হবে।

ঝড়ের মত চার নম্বর ঘরে ঢুকে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। উজ্জ্বল আলোর নিচে বসে কল্যাণী 'আদালতের আত্মকথা' পড়ছে।

আমার অশিষ্ট আচরণে কল্যাণী আপত্তি করল না। বইখানা মুড়ে রেখে উঠে দাঁড়াল। মুখে প্রসন্ন হাসি।

উন্মত্তের মত আমি বলে উঠলাম: হাসি নয় কল্যাণী, আমি তোমার জবাব চাইতে এসেছি।

কল্যাণী তার চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল: বসে প্রশ্ন কর, জবাব নিশ্চয়ই দেব।

আগে জবাব দাও, তারপরে বসব।

কল্যাণী হেসে বলল: কিসের জবাব?

আমার দুর্বলতার কথা তোমায় কে বলল?

এই কথা!

কল্যাণী তার বইখানা তুলে ধরল, বলল: এই বিষাদঘাতক বই তো জড়পদার্থ নয়, বইয়ের প্রাণ আছে, চুপি চুপি তারা মানুষের মতই কথা বলে।

আমি বসে পড়লাম। আমার মাথা ঘুরছিল। আমার বলার কথা সব এলোমেলো হয়ে গেছে।

কল্যাণী তার চেয়ার আমার পাশে টেনে এনে বলল। বলল: অত বিচলিত কেন হচ্ছ?

বিচলিত হবার মতই কথা।

তা নয়, জীবনটা যদি অঙ্ক হত, তাহলে তার উত্তর হত সকলের বেলাতেই এক। জীবন বিচিত্র হয়েই মুস্কিল হয়েছে! বাঁধা কোন ছকে পড়ে না, অথচ তার ছন্দ আছে।

আমার অস্থিরতা কমে এসেছিল। খানিকটা সুস্থ হতেই লজ্জা পেলাম। আমার উত্তেজনা দেখে কল্যাণী কী ভাবল!

কিন্তু কল্যাণী কিছুই বোধ হয় ভাবে নি। সে তার নিজের কথাই বলল: তোমার স্ত্রীর মৃত্যুতে তুমি একটা অস্বাভাবিক আঘাত পেয়েছিলে। ভেবেছিলে, তোমার অমনোযোগেই এমন ঘটনা ঘটল। মনোযোগ দিলেও তুমি এ দুর্ঘটনা এড়াতে পারতে না। শুধু একটা বিশ্রী সন্দেহে নিজের মনটা আবিল করতে। তা না করে ভালই করেছ।

অনেকক্ষণ থেকেই আমি লক্ষ্য করছিলাম যে কল্যাণী ঘুরে ফিরে আমার ব্যক্তিগত কথার মধ্যে এসে পড়ছে। উভয়ের পরিচয় এত ঘনিষ্ঠ নয় যে এ সব আমাদের আলোচনার বিষয় হতে পারে। তবু যেন অবান্তর মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে না অশিষ্ট আলোচনা। বললাম: একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করব?

অত সঙ্কোচ কিসের? আমি তো কোন অনুমতির অপেক্ষা রাখি নে।

সে কথা সত্যি। কিন্তু আমি যে দুঃসাহসী হতে চাইছি। জানতে চাইছি, তুমি বিয়ে কর নি কেন?

খিলখিল করে কল্যাণী হেসে উঠল। পাহাড়ী ঝর্ণার মত হাল্কা আবেগে-উচ্ছল হাসি। কল্যাণীকে এতক্ষণ আমি এমন করে হাসতে দেখি নি। আমি লজ্জা পেয়ে বলে উঠলাম: এ আমার একটা কৌতূহল, আর কিছু নয়।

আর কিছু হলেই বা লজ্জা পাবার কী আছে!

কে বললে লজ্জা পেয়েছি?

তা না হলে উত্তরের অপেক্ষা না করে প্রশ্নের বৈকিয়ত কেন দিচ্ছ?

এ তোমার উত্তর এড়িয়ে যাবার ছল, কিন্তু আমি মানব না। আমি তোমার উত্তর চাই।

এই তো সাহস হয়েছে তোমার। এইবারে জবাব দেব। মনোজ মিত্রের পর আর একটা পুরুষের সন্ধান পাই নি। যে দাবী জানাতে পারে না, সে আবার কেমন পুরুষ!

মনোজকে কেন বিয়ে করলে না?

বলেছি তো, তোমার স্ত্রী আমাকে বারণ করেছিল।

এ কথা বল নি।

তবে কি আমার চোখ খুলে দিয়েছিল বলোছ? ও দুটোই এক কথা। আসলে আমি জানতে পারলাম যে মনোজ মিত্র শুধু আমাকেই ভালবাসে না, আমার মত আরও অনেককে ভালবাসে। তারা আবার ভালবাসে, না ভালবাসার ভান করে, তাই নিয়ে সন্দেহ করছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে লোকটার পয়সা ছিল না। নির্মল সেনের পয়সায় মদ খেত, আর ফুর্তি করত বেয়ারেরই পয়সায়।

আমি স্তম্ভিত হয়ে কল্যাণীর কথা শুনছিলাম। কিন্তু সে খুব সহজ ভাবে বলল: ভাবছ, খুব আঘাত পেয়ে তপস্বী হয়েছি, তা মোটেই নয়। আঘাত যতটুকু পাবার, ঠিক ততটুকুই পেয়েছি, তার বেশি একটুও না। সেও মনোজ মিত্রের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য নয়, সে এই সমাজের নগ্ন রূপটা দেখে। কয়েকটা দিনেই আমি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম।

কল্যাণী খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কাটাল। তারপর বলল: নিজেকে আমি অশুচি ভাবি, ভালবাসতে ভয় পাই কোন নতুন পুরুষকে। সবাকে পুরুষ ভয় পায়। তাই বলে মিথ্যা দিয়ে নারী কেন পুরুষ ভোলাবে!

আমি শীলার কথা ভাবছিলাম। শীলার সঙ্গে কল্যাণীর প্রভেদটা কোথায়? মনোজ মিত্রকে শীলা বিবাহের আগে দেখেছে, না পরে। বোধ হয় আগেই দেখেছে। বোধহয় তার পিতাও এ কথা জানতেন। সেই ভদ্রলোকের সতর্কতার কথা আমার মনে পড়ল। বোধহয় ভেবে-ছিলেন, মনোজ মিত্রের সঙ্গে তাঁর মেয়ের অন্তরঙ্গতা বিবাহের পরেই ফুরিয়ে যাবে। তা ফুরোয় নি, ধরা না পড়লে হয়তো কোনদিন ফুরোত না।

কিন্তু আত্মহত্যা সে কেন করল? অনুশোচনা? কল্যাণী তো আত্মহত্যা করে নি? এমন কোন লজ্জার মুখোমুখি হয় নি যে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর তার অন্য উপায় ছিল না। কী জন্য সে এমন সাংঘাতিক কাজ করতে গেল!

কল্যাণী হাসছিল। সে বড় ম্লান হাসি। বলল: তাইতেই কল্যাণী চৌধুরী কুমারী রয়ে গেল।

শীলাও তো বিবাহিত স্ত্রী থাকতে পারত!

পারত না।

কেন?

কল্যাণীর মন্তব্য শুনে আমি চমকে উঠলাম। কিন্তু সে বড় শান্ত ভাবেই জবাব দিল: কল্যাণী নিজে ঠকেছে, কাউকে ঠকায় নি। শীলা তার স্বামীকে ঠকাতে গিয়ে নিজেই ঠকে গিয়েছিল।

কল্যাণী থামল না, বলল: কোথাও ঠকে গেলে সে কথা স্বীকার করা যায়। ক্ষমা চাইতেও দ্বিধা আসে না। কিন্তু—

বুঝতে পেরেছি। কাউকে ঠকাবার জন্যে বেরিয়ে যদি নিজে ঠকে, তাহলে আর ফিরে আসা যায় না।

কল্যাণী দৃঢ়ভাবে বলল: তাও যায়। তোমার কোন দুর্বলতার সংবাদ জানা থাকলে ফিরে আসবার কথা সে ভাবতে পারত।

শীতের রাত্রি আজ থমথম করছে। কিন্তু আড়ষ্টতা

[শেষাংশ ৩২১ পৃষ্ঠায় দেখুন

মস্ত-আসা প্রসূতিটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করল আরতি—

—দিদি, এই প্রথম ?

যন্ত্রণায় সমস্ত দেহ শিউরে উঠলেও রক্তহীন মুখখানাতে ম্লান হাসি ফুটিয়ে আক্ষেপ করে বললেন রোগিণী শান্তি সেন—

—পোড়া কপাল আমার ! কি বলব দিদি, আমি হচ্ছি আসল ডাইনী যাকে বলে। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই ছট্‌ফট্ করে বাচ্চাগুলো বুকের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। হাঁ, এর আগে চার—চারটে ছেলে এসেছিল পোড়া পেটে—তা—

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেদনায় বিবর্ণ হয়ে নীরব হয়ে গেলেন শান্তি সেন।

সমবেদনায় কাতর হয়ে পড়ল আরতি তাড়াতাড়ি অপ্রস্তুত মুখে বলে উঠল—

—থাক দিদি, যা হবার হয়েছে। এবার ত আমরা আছি, কিছু ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।

একেবারে মেয়ের চাঁদ ছেলে কোলে করে নিয়ে বাড়ি ফিরবেন

অবিশ্বাসের সুরে শান্তি সেন বললেন—

—তাই কি আর হবে ? কত যে পাপ করেছিলাম গত জন্মে—এত সোনার ছেলেকে খুন-জখম করেছিলাম ভিতরে ভিতরে। তাই এ জন্মে নিজের সন্তান নিজেই করছি আমার মরণও নেই দিদি —একবার যে ভোগ করছি যন্ত্রণা—কই দিদি, একবারও ত প্রাণটা বেরুচ্ছে না !

আরতির হাত দুটি জড়িয়ে ধরে কাঁদো হয়ে বললেন বিহ্বল বিধুর ভঙ্গীতে দিদি, তোমার এই হাত দুটো আমি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেবো তোমার ওই মুখখানিতে ঝলমলে পড়ুক রক্তরাগ হয়ে থাকো তাই শুধু একবার—একবারটি তোমরা আমার খোকাকে বাঁচিয়ে দাও—আর—কিচ্ছু চাই না আমি। আমি একেবারে কেনা

সোনার হয়ে থাকব তোমাদের—বন্দী হয়ে থাকব চিরকাল—

রোগিণীর আক্ষেপ শুনে ব্যস্ত হয়ে আরতি সান্ত্বনা দিতে লাগল—

—ছি ছিঃ!—এসব কি যা তা বলছেন আপনি! দেখুন না, আমি কত ছিঃছি, ঠিক আপনাকে ছেলে কোলে দিয়ে বাড়ি পাঠাব। ভগবান এবার ঠিক মুখ তুলে চাইবেন দিদি। কিন্তু দিদি—আপনি অত কাতর হবেন না—তাহলে প্রসব হতে কষ্ট পাবেন। মনে জোর করুন—আর ঠাকুরকে ডাকুন, তিনিই সব ঠিক রক্ষা করবেন।

ঠাকুর কিন্তু মুখ রাখেননি সে রাত্রে।

পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলাতে বেশ জনবহুল এই রাজহাট শহর। শহরের সমস্ত রকম সুবন্দোবস্ত আছে। সবচেয়ে উন্নত হচ্ছে এখানকার মাতৃমঙ্গল হাসপাতাল এবং শিশুসদনটি। অনেকগুলি জেলার মধ্যেই এই বিশেষ হাসপাতালটির বেশ একটি নামডাক আছে।

এখানকার ডাক্তার, সেবিকা, এবং সমস্ত কর্মচারীই যেন একটি মহান্ উচ্চ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আর্তসেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেছেন।

রোগিণীরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে চোখের জলের মধ্যে দিয়ে বিদায় নেয়—এই সেবাসদনটি থেকে। অনেক সময় কেউ কেউ স্বেচ্ছায় বেশ কিছুদিন থেকে যায় শুশ্রূষাকারিণীদের সুমিষ্ট ব্যবহার এবং সুশিক্ষিত চিকিৎসকদের অমায়িক সুমিষ্ট ভাষণের আকর্ষণে।

একটি নার্সিং হোমের পক্ষে এটা কম গৌরবের কথা নয়। এখানকার সুব্যবস্থার কথা শুনে শহর কলকাতা থেকে ছুটে আসে জননীরা—বিদায় নেবার সময় প্রসন্ন মনে অন্তরের আশীর্বাদ উজাড় করে দিয়ে যায়—সঙ্গে নিয়ে যায় সেবিকাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

এমন যে মাতৃসদনের সুদূর প্রসারী যশোসৌরভ—হঠাৎ একটি রাত্রির একটি ঘটনার বৈচিত্র্যে সব একেবারে ধূলিতে লুটিয়ে পড়ল যেন। আর সেই বিচিত্র কাহিনীর নায়িকা ছিল সেদিন সর্বাপেক্ষা দক্ষিণী সেবিকা আরতি।

হাসপাতালের সূতিকাকক্ষে পাশাপাশি সেদিন শায়িত ছিল দুটি রোগিণী।

তিন নম্বরের মৃতবৎসা শ্রীমতী শান্তি সেন—

আর সাত নম্বরের রোগিণী শ্রীমতী লতিকা রায়—প্রথম মাতৃত্বের স্বাদে গৌরবান্বিতা, পরিপূর্ণা ভাবী জননী।

দুটি টেবিলের ভার ন্যস্ত ছিল দুই সেবিকার ওপরে—যথাক্রমে আরতি ও মীরা।

বিয়ের অনেক বছর পরে লতিকার এই প্রথম মাতৃত্বের অনুভূতি! রাত্রি দশটা বাজে।

সহজেই ভূমিষ্ঠ হল চাঁদের মত একটি দেবকন্যা—লতিকার সন্তানক্ষ প্রথম আত্মজা।

মায়ের চোখের সামনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগল মীরা—গরম কাপড়ে-জড়ানো নরম তুলোর মত একটি শিশু—

—দেখুন,দেখুন, ও দিদি। ওমা! এযে রাজকন্যা এসেছে ভাই আপনার কোলে। ইস্—একেবারে ঠিক পূর্ণিমার চাঁদের মত মিষ্টি মুখ—তাতে আবার ছোট্ট, একরত্তি কলঙ্ক—দেখুন, দেখুন সত্যি বলছি—

সলজ্জ দৃষ্টি সস্নেহে শিশুকন্যার দেহের উপর বুলিয়ে দিয়ে ভাগ্যবতী লতিকা বলল—

—ওমা তাই ত! অতটুকু মুখ—তাতে আবার একটা তিল চিবুকের পাশে। ওমা—কি হবে দিদি—এ মেয়ের বিয়ে দেবো কেমন করে—

—থামুন ত!

ধমকে উঠল কপট ক্রোধে মীরা আয়া প্রসূতিসদনের পরিচারিকা—

—যত সব অলক্ষুণে কথা! চাঁদের মত পেলেন তার আবার খুঁত! এমন রূপ ক'জনের ঘরে আছে? নিন্—ওষুধটা খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। মেয়ের ভাবনা আমরা ভাবব—আপনার আর নিয়ের জন্য মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই এখন থেকে।—

তাই ত! রোগিণীর এবার বিশ্রাম প্রয়োজন। ট্রলিতে চাপিয়ে ঠেলে ঠেলে তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল মীরা। নতুন করে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার ভাবে রাখতে হবে সূতিকাগার—অপেক্ষমানা পরবর্তী জননীর জন্য।

এদিকে আরতির অপেক্ষার আর যেন শেষ নেই। অনেক কসরত, অনেক মেহনতের পর শেষকালে খবর দিতে হল ডাঃ মিত্রকে—সেবিকা-প্রধানা মেট্রন মিসেস্ ব্যানার্জীকে। আরতি জনান্তিকে রোগিণীর ইতিহাস বলল ডাঃ মিত্রকে কাজে হাত লাগাবার আগে—এইবার নিয়ে পাঁচবার হবে—প্রত্যেক বারই স্টিপ্ বেবী। এবারও মনে হচ্ছে বেঁচে নেই, আঃ ফরসেপ্স্ ছাড়া অসম্ভব, ডাঃ মিত্র।

সবচেয়ে সুদক্ষ এবং অভিজ্ঞ এ লাইনে এই আরতি। ওর কথার উপর ডাক্তাররা সবাই নির্ভর করেন নির্ভয়ে। শেষ পর্যন্ত ফরসেপ্স্ ডেলিভারি করলেন ডাঃ মিত্র—শান্তি সেনকে ঔষধ প্রয়োগে অচেতন করে প্রসব করালেন তার গর্ভস্থ সন্তানকে। হৃষ্টপুষ্ট, স্বাস্থ্যবান সুন্দর একটি মানবশিশু—প্রাণহীন, অসাড়। ব্যথার আঘাতে নীল, বিবর্ণ। মৃতবৎসা শান্তি সেনের অভিশপ্ত গর্ভের বহু-আকাঙ্খিত সন্তান—পঞ্চম পুত্র!

কিন্তু আরতি?

সমস্ত মস্তিষ্ক ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল।

সে যে বড় মুখ করে কথা দিয়েছে ওই অচৈতন্যাবস্থায় শান্তি বঞ্চিত জননীকে! সে যে অঙ্গীকার করেছে—মায়ের কোলে তুলে দেবে রক্তমাংসে গড়া নবজাতককে!

পাঁচ-পাঁচটি সন্তানকে হারিয়েছে যে নারী—তার মুখের বেদনাকাতর ছবিখানি—তার শূন্যহৃদয়ের হাহাকার যেন দিব্যদৃষ্টিতে, দিব্যকর্ণে দেখতে শুনতে পেল আরতি।

—শোন, আরতি—

ডাঃ মিত্র ডেকে বললেন—

পেশেন্ট ভয়ানক দুর্বল—দেখো, জ্ঞান হবার পর হঠাৎ শকটা পেয়ে খারাপ দিকে টার্ণ্ নিতে পারে। এমন কি, কেস্টা ফেটালও হতে পারে। তাই খবরটা একটু সইয়ে সইয়ে দিও—কেমন? আশা করি এ কথা তোমাকে বেশী বোঝাতে হবে না?

তারপর রোগিণীর অচেতন রক্তহীন মুখের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—

—রেচেড্ মাদার! এত সাধনার, এত সন্ধের এই পুরস্কার! সবই ভগবানের ইচ্ছা—আমরা কিছুই করতে পারি না। যাক্—যা বলছিলাম—একটু সাবধানে খবরটা দিও, বুঝলে?

আরতি মাথা-নাড়া কাঠের পুতুলের মত শুধু মাথা নাড়ল। মন তার কোথায় চলে গেছে!

চোখের সামনে ভাসছিল সদ্যোজাত একটি চাঁদের মুখ।

না, ওই টেবিলটাও ত ধোয়া-মোছা পরিষ্কার—কখন চলে গেছে মীরায় পেশেন্ট। প্রসূতি চলে গেছে তার নির্দিষ্ট কক্ষে—শিশুকক্ষে শিশুটি।

না, কেউ নেই, ধারে-কাছে নেই একটু আলো দেখবার মত—আরতিকে এই বিপদে বাঁচাবার মত কোন কাণ্ডারীই নেই খেয়াঘাটে।

তারপর ঘণ্টা তিনেক গেছে কেটে। রাত্রি দেড়টার সময় ধড়মড়িয়ে উঠতে গেলেন শান্তি সেন—

—দিদি, ও দিদি, আমার ছেলে—আমার খোকন!—

অবশ্য আরতি চমকে উঠল বিছানার পাশটিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

সব যেন গোলমাল হয়ে গেল মাথার ভিতরে। ছুটে চলে গেল অদূরবর্তী শিশুকক্ষটিতে।

শিশুদের তত্ত্বাবধানে ছিল নতুন নার্স, অমলা। দরজার পাশ থেকে সদ্যোজাত কম্বলে-ঢাকা শিশুটিকে বুকে নিয়ে হন্ হন্ করে বেরিয়ে এল আরতি।

বিস্মিত অমলার প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলল—আসছি এক্ষুণি। মৃতবৎসার বুকের কাছে শুইয়ে দিল—এক গুচ্ছ ফুলের স্তবক!

—এই নিন, আপনার মেয়ে—চাঁদের মত টুক্‌টুকে মেয়ে। দেখুন, বলেছিলাম না—ছেলে কোলে বাড়ী যাবেন—এবার হল ত? তবে ছেলে নয় মেয়ে—

আবোল তাবোল বকে চলল আরতি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন শান্তি সেন—

—না না, ছেলে নয়—ছেলে নয়—মেয়ে—মেয়ে—মেয়েই ত চেয়েছিলাম আমি। মেয়েই বেঁচে থাকবে—আমার সোনা হয়ে, আমার মানিক হয়ে বেঁচে থাকবে আমার কোল জুড়ে।

আরও বলে চললেন শান্তি সেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা—

—জানেন দিদি, আমি স্বপ্ন দেখছিলাম যে এবার আমার মেয়ে হয়েছে। আর তার চাঁদের মত মুখ—হুবহু পূর্ণিমার চাঁদের মত। এই দেখুন, এই ত সেই চাঁদের মেয়ে আমার—চাঁদমুখ, চাঁদের মত কলঙ্ক, সেই ছোট্ট এককৌটা তিল। দেখুন, দেখুন দিদি, আমার মায়ের মুখে কি সুন্দর ছোট্ট তিল একটি! এর নাম কি জানেন? তিলু—তিলোত্তমা মা আমার! হ্যাঁ, তিলে তিলে গড়ে উঠেছে আমার এই বুকখানার মধ্যে—আমার মনের মধ্যে বহু আশা দিয়ে, বহু স্বপ্ন দিয়ে তৈরী হয়েছে মা জননী আমার। আমার তিলোত্তমা—আমার সোনা—

বুকের সঙ্গে সজোরে চেপে ধরলেন সাধের স্বপ্নটিকে। বিব্রত হয়ে তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে নিতে গেল আরতি—

—ইস্, কি করছেন—মরে যাবে যে একেবারে! —দিন, দিন, আমার কাছে দিন—

তিরস্কার করে উঠল নার্সের কর্তব্যবোধ নিয়ে—

—বাচ্চা আপনার কাছে কিছুতেই রাখা হবে না। দেখেছেন ত—দিন এবার আমার কাছে—রেখে আসি ওর বিছানায়। এখুনি মেট্রন এসে আমাকে বকবেন জানতে পারলে।

কে কার কথা শোনে?—

শান্তি সেন দুই কঠিন বাহুবন্ধনে আঁকড়ে ধরে রাখলেন বুকের সঙ্গে সদ্যজাত ওই স্বপ্নশিশুকে—যক্ষের ধন—সাত রাজার ধন—এক মানিককে।

আরতির বুকের মধ্যটা খড়াস্ করে উঠল। সর্বনাশ! একি করল সে খেয়ালিনীর মত? কোন সন্তান-পাগলিনীকে সান্ত্বনা দিতে কার নাড়ীছেঁড়া ধনকে এনে দিল সে আবেগের মাথায়! এই ভুলের গতি কোথায় তাকে টেনে নিয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত? কে বইবে এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধের বোঝা? কে ছাড়াবে এই জটিল সমস্যার গ্রন্থি?

নিরুপায় হয়ে তাড়াতাড়ি ঘুমের ওষুধ ইন্‌জেক্ট করল বুভুক্ষু জননীর বাহুবন্ধন থেকে উদ্ধার করতে ওই রক্তমাংসে-গড়া জীবন্ত পুতুলটিকে। ফিরিয়ে নিয়ে গেল যার অঞ্চলের নিধি তারই কাছে গচ্ছিত রাখতে।

—শুনছেন, ও দিদি, দিদি—এই আপনার মেয়েকে ধরুন—সাত নম্বরের মাথার কাছে গিয়ে অস্ফুটে ডাকাডাকি করল—হাঁপাতে লাগল প্রেত-তাড়িত মানুষের মত ভয়ার্ত করুণ চোখে, বুকের সঙ্গে চেপে ধরে আছে সেই অপহৃতপ্রায় সম্পত্তিটুকু! —একটু কোলে নিন, বুকের কাছে রাখুন ত, বড্ড কাঁদছে বেচারী!

অকস্মাৎ তন্দ্রা ছুটে যাওয়াতে চমকে উঠেছিল প্রসূতি। তাই ত! এতদিনের স্বপ্ন যদি বা সফল হল, কোথায় কোন প্রান্তে নিয়ে গিয়ে রেখেছে—একটু বুকে ধরতে পর্যন্ত দেয়নি। অনর্থক অভিমানে সমস্ত হৃদয়মন উদ্বেগ হয়ে উঠছিল। কিন্তু উপায় নেই—হাসপাতালের নিয়ম মানতেই হবে।

অদ্ভুত নিয়ম!

লতিকা শুয়ে শুয়ে ভাবছিল। সদ্যোজাত শিশুকে মায়ের কোল থেকে সরিয়ে দূরে রাখতে হবে—একেবারে চোখের আড়ালে ভিন্ন ঘরে—ভিন্ন শয্যায়।

হাসি পাচ্ছিল লতিকার। হাসবে নির্বোধ সেবিকার দল—তোরা কি পারিস্ মায়ের দাবিকে অস্বীকার করে উড়িয়ে দিতে? চোখের আড়ালে সরালেই কি দৃষ্টির আড়াল করা যায়? স্পর্শ বাঁচালেই কি যায় যোগাযোগ ছিন্ন করা?

দশটি মাস ধরে তিল তিল করে দেহের জারক রসে যাকে জীইয়ে রেখেছিল—সে কি এত সহজেই দূরে সরে যাবে! দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয় যে শুধু ওই একরত্তি জীবনের ধুক্‌ধুকি শোনবার জন্য অহোরাত্র সতর্ক সজাগ হয়ে আছে! হাত দুটি বাড়িয়ে বুকে নিল লতিকা বুকের ধনকে—

—দিন ভাই, সেই কখন নিয়ে গেছেন—নিশ্চয় ওর আমার জন্য খুব মন কেমন করছিল, না দিদি?

প্রশ্ন করতে গিয়ে আরতির আরক্ত মুখের দিকে চেয়ে বিস্মিত হয়ে আবার অন্য রকম প্রশ্ন করল—

—আপনি অত হাঁপাচ্ছেন কেন ভাই! দিদি, আপনার কি অসুখ করেছে! আমার খুকু ভাল আছে ত দিদি—বাৎসল্যরসে সিক্ত করে ব্যাকুল জননী পুনর্বার জিজ্ঞাসা করল—

—দিদি, আমার বাচ্চা ভাল আছে ত ভাই!

নিজেকে জোর করে সামলাতে চেষ্টা করল আরতি। বলল—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভাল আছে—খু-ব ভাল আছে। হ্যাঁ, আপনার জন্য ওর খুব কষ্ট হচ্ছিল, তাই দিয়ে গেলাম। দেখবেন আর হাতছাড়া করবেন না যেন—ঘুমান দুজনে এবার—

হাতে যেন স্বর্গ পেয়ে গেছে লতিকা—

ঘরের বাইরে এসে একেবারে চাপা কান্নায় ভেঙে পড়ল আরতি। সেবিকার জীবনের এ এক অভিনব অকরুণ অভিজ্ঞতা। দুটি রিক্ত হৃদয়কে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে যাচ্ছিল সে না বুঝেই। উঃ! ভগবান রক্ষা করেছেন। যার জিনিস তার কাছে পৌঁছে দিয়েছে সে—একেবারে হাতে তুলে বুকের মধ্যে গচ্ছিত করে দিয়েছে—আর কেউ নিতে পারবে না তাকে—আর কারও সাধ্য নেই জননীর কঠিন বাহুপাশ থেকে ছিন্ন করে আনবে সে ঐশ্বর্য!

তিনটি প্রাণীকে বাঁচিয়ে দিয়ে নিজের প্রাণটাকে আর তার সঙ্গে আরতির এতদিনের কর্মজীবনের সুযশ-সুনাম—সব কিছু বাঁচাতে পেরেছে সে শেষপর্যন্ত।

কিন্তু চোখের জল ফেলে মনের ভারকে হাল্‌কা করবার মতই বা অবসর কোথায় সেবিকার জীবনে! কঠোর কর্তব্যের হাতছানি ত এড়িয়ে যাবার উপায় নেই!

সুদক্ষা ধাত্রী হিসাবে তখনি ডাক পড়ল সূতিকাকক্ষে। টেবিলে কঠিন কেস্ অপেক্ষা করছে—প্রসূতির জীবন সংশয়।

ভোরের সূর্য পূর্বাচলের চূড়ায় তখন আগমনির আভাস দিয়েছে। গত রাত্রির সমস্ত অপচিন্তাকে মন থেকে মুছে ফেলে নতুন উদ্যম নিয়ে কাজে লাগল আরতি।

যাকে তিন দিন ধরে অপেক্ষাকক্ষে যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছিল—এ সেই রোগিণী। জীবনের হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে দিয়ে বোধ করি চিরদিনের জন্য ছুটি নিতে এসেছে রাজহাট নার্সিং হোমের প্রসূতিকক্ষে।

সব সব স্বামীকে হারিয়েছে বেচারী—অত্যন্ত দুর্বল—রক্তহীন। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় থ্রম্বোসিস্ রোগাক্রান্ত স্বামীর সেবা করেছে অনাহারে, অনিদ্রায়, দুশ্চিন্তায়। নিজের জীবনের সঙ্গে গর্ভস্থ সন্তানের জীবনকেও বিপন্ন করতে দ্বিধা করেনি। ফলকে ছেড়ে মূলকে আঁকড়ে রাখতে চেয়েছে অভাগিনী। অবাঞ্ছিত হতভাগা শিশু পৈত্রিক রক্তধারাকে সঞ্জীবিত রাখতে নিজের ত্যাগে হয়েছে ভূমিষ্ঠ—জননীর জীবনের শিখাটিকে একেবারে নির্বাপিত-প্রায় রেখে।

এমন সময়ে ডাক পড়েছে আরতির। এসেই সে সদ্য-প্রসূত পুত্রসন্তানটিকে পাঠাল অক্সিজেন চেম্বারে। অজ্ঞানাবস্থাতেই জন্ম দিয়েছে দুর্ভাগা জননী। অনিশ্চিতের কোলে নিজের সর্বস্বধনকে ফেলে দিয়েছে—নিজে কিন্তু পরম নিশ্চিন্তমনে চলেছে যেন কোন অজানালোক।

কিন্তু করা গেল না। ডাঃ মিত্র যখন এলেন আরতির সাহায্যের জন্য, তখন সব শেষ হয়ে গেছে।

শিশুকে ভাল করে দেখলেন—না, খুব দুর্বল নয় সে। সন্তানের অধিকারবোধ ও কিন্তু জঠরের অভ্যন্তরে বসেই ভাল করে বুঝে নিয়েছিল মনে হচ্ছে। জননীর জীবনের ক্ষীরসাগর রসটুকু চুষে চুষে নিংড়ে নিঃশেষ করে দিয়েছে একেবারে। পিতৃ-হীনতার প্রতিশোধ নিতেই যেন মূর্তিমান প্রতিবাদের মত ও তার জননীকে করেছে হত্যা।

• • •

তৃতীয় দিন ভোর রাত্রে শান্তি সেন চোখ মেলেই প্রশ্ন করলেন—

—কই আমার মেয়ে? আমার তিলু, তিলোত্তমা?

ডিউটিতে ছিল সেদিন মীরা। অভিজ্ঞ সেবিকাদের অন্যতমা। দারুণ আশ্চর্য হল সে। প্রশ্ন করল পাল্টা—

—দিদি, কি বলছেন?

সুদীর্ঘ সময় ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে থাকবার পর অনেক ক্ষেত্রে রোগিণীকে প্রলাপ বকতে শোনা যায়।

এও হয়ত সেই রকমই একটা কিছু। মীরা ত ভাল করেই জানে মৃতবৎসা রোগিণী জন্ম দিয়েছে একটি নিষ্প্রাণ মাংসপিণ্ডকে। পাছে মনে আঘাত লাগে তাই কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল মীরা—

—দিদি, এখন কেমন বোধ করছেন?

সেবিকার হাত ঠেলে সরিয়ে একই প্রশ্ন করে উঠলেন শান্তি সেন—

—আমার মেয়ে—আমার তিলোত্তমা? আমার কাছে এনে দিন—দূরে রাখবেন না ওকে—ও তাহলে একদিনও বাঁচবে না। এনে দিন—এনে দিন শীগ্‌গির—

ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠলেন রোগিণী।

হতবুদ্ধি হয়ে ক্ষণকাল অপেক্ষা করল মীরা। সমস্যা কঠিন। শোকে দুঃখে জননী উন্মাদ হয়ে উঠছে। না—আবার স্লিপিং ড্রাগ দিতে হবে। কিন্তু তার আগে একবার চাই ডাক্তারের পরামর্শ। কিন্তু সবচেয়ে প্রয়োজন আরতির পরামর্শ। অথচ সে আজ হাসপাতাল থেকে অনেক দূরে ছুটিতে চলে গেছে কলকাতায়।

নিরুপায় মীরা মেট্রনের শরণাপন্ন হল। মেট্রন আর ডাঃ মিত্র—দুজনে মিলে অনেক ভেবে-চিন্তে একটি চমৎকার সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন—রোগিণীকে সান্ত্বনা দেওয়াই সর্বোৎকৃষ্ট সহজতম উপায়।

গত রাত্রের মাতৃহারা অনাথ শিশুটিকে এনে ধরে দিলেন শান্তি সেনের শূন্য কোলের কাছে ডাঃ মিত্র। হাসতে হাসতে বললেন বেশ উৎসাহের সঙ্গে—

—এই নিন, মিসেস্ সেন—আপনার ছেলে ধরুন। বাপ্‌রে বাপ্, কি দুষ্টু ছেলে হয়েছে আপনার। এক রাত্রেই বেশ টনটনে জ্ঞান হয়েছে

দেখছি। ঠিক বুঝে ফেলেছে মায়ের কাছে এসেছে। দেখছেন, এতক্ষণ কাঁদছিল—আর আপনার কাছে আসাতেই একেবারে চুপ—বেশ ঘুমিয়ে পড়ল নিশ্চিন্তে।—

সাদা কম্বলের টুকরো জড়ানো ছোট্ট টীনামাটির পুতুলের মত—নিজীব একটি মানবক।

শয্যায় শোয়াতে না শোয়াতেই চিৎকারে ফেটে পড়লেন রোগিণী—না না, এ নয় এ নয়—ছেলে নয় আমার! আমার মেয়ে—আমার সোনামণি তিলোত্তমা। চাঁদের মত মুখে চাঁদের মত কলঙ্ক—ছোট্ট তিল, এককোঁটা কালো টিপ্ চিক্ চিক্ করছে চিবুকের পাশটিতে, দিন—মেয়েকে দিন আমার। আর ছেলের সাধ নেই—তাই এবার ভগবান মেয়ে দিয়েছেন কোলে—কোল-জুড়ে চিরদিন বেঁচে থাকবে—নিয়ে আসুন—আসুন শীগ্‌গির আমার তিলোত্তমাকে! ডাক্তারবাবু, আপনার দুটি পায়ে পড়ি—তাকে এনে দিন—আমি আর কিছু চাই না। কিছু বলব না, বিরক্ত করব না আপনাদের। দয়া করুন, দয়া করুন, ডাক্তারবাবু! আমার জিনিস আমাকে ফিরিয়ে দিন—আমার বুকটা যে একেবারে খালি হয়ে গেছে—

স্পন্দনের আবেগে রোগিণী মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

প্রমাদ গুণলেন ডাঃ মিত্র। শোকে উন্মাদ হয়ে গেছে—আবোল তাবোল বকছে—ঘুমের ওষুধ ছাড়া কিছু দিয়েই থামানো যাবে না মনে হচ্ছে। সহজে ভোলবার কেস্ নয়—পেথিড্রিন—সিলিং ড্রাগ—

ডাঃ মিত্র বুঝলেন না—কিন্তু রোগিণীর অবস্থা দেখে প্রলাপোক্তি শুনে মীরা ভয়ে কাঠ হয়ে রইল।

জননীর বিলাপ ত মোটেই অসংলগ্ন প্রলাপ নয়—রীতিমত যুক্তিসঙ্গত সত্য ঘটনা। তাই ত, চাঁদমুখে ছোট্ট তিল—সে যে মীরার হাতেই ভূমিষ্ঠ হয়েছে—। কিন্তু—সে সময় ত এ রোগিণী ছিল অচেতন—অসাড়। তার সন্ধান এ পেল কি করে?

এই কঠিন প্রমাদ—অজ্ঞাত রহস্যজালের সৃষ্টি কে করে বসল তাহলে?

নিদ্রাভঙ্গের সংবাদ পেয়ে দেখা করতে এলেন স্বামী—সরল সেন। ডাক্তারের কাছে আগেই সব খবর পেয়েছেন। তিনি এই দুর্ঘটনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রেখেছিলেন।—চার-চার বার যে ঠকেছে—সে কি পঞ্চমবারে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে—কোন পুণ্যফলে! এ যে অসম্ভব—অভাবনীয়! তিন দিন পর চেতনাপ্রাপ্ত জাগ্রত স্ত্রীকে পেয়ে তিনি আগ্রহে সান্ত্বনা দিতে পাশে এসে বসলেন—। মাথায় হাত বুলিয়ে সস্নেহ বাক্যে বল্লেন—

—শান্তি, এইবার দিন পাঁচেক পরই নিয়ে যাব বাড়ী, কেমন?

শীর্ণ গালদুটি ধরে আদর করে জিজ্ঞাসা করলেন—

—এখন কেমন আছ?

স্বামীর হাত দুটি দুহাতে জড়িয়ে ধরে উঠে বসতে চেষ্টা করেন শান্তি সেন। তাড়াতাড়ি মিঃ সেন শুইয়ে দিলেন পাছে অঘটন কিছু ঘটে। শান্তি সেন স্বামীর কোলে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন কাতর হয়ে—

—আমার মেয়েকে—আমার সোনার চাঁদ বাচ্চাকে এরা লুকিয়ে রেখেছে। তুমি এদের ফিরিয়ে দিতে বল।

শোকে দুঃখে পত্নীর মাথার ঠিক নেই। আবার বৃথাই সান্ত্বনা দিলেন মিঃ সেন—

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুমি ঘুমোও ত দেখি। সব ঠিক হয়ে যাবে।

একটি শূন্য হৃদয়ের অগ্নিদাহকে প্রশমিত করতে আর একটি শূন্য কুম্ভ আর কতই বা শীতল ধারা বর্ষণ করতে পারে?

হাতের কাছে ক্যাপস্টান
মজুত রাখুন!

যেখানেই থাকুন, আর যাই করুন—সবসময়ে হাতের কাছে ক্যাপস্টান মজুত রাখবেন। ধূমপানে এমন আনন্দ আর কিছুতেই পাবেন না।

উইল্‌স-এর ক্যাপস্টান-এর তুলনা নেই

দি ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট টোব্যাকো কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত।

—না, না—তুমি জানো না, জানো না তুমি! আমার মেয়ে—আমার ছোট্ট সোনা খুকুকে এরা লুকিয়ে রেখেছে। হ্যাঁ, আমি যে তাকে বুকে ধরেছি, আদর করেছি, তার চাঁদমুখে চুমো দিয়ে হাজারবার। ডাকো ডাক্তারবাবুকে—ডাকো সিস্টারকে। ওদের নিয়ে আসতে বলো—ওগো, তোমার মেয়ে যে—বাপ হয়ে তুমি মেয়েকে দেখতে পাবে না—এ আবার কিসের জুলুম এদের?

বেশ স্বাভাবিক যুক্তিসঙ্গত কথাবার্তা মনে হতে লাগল। স্ত্রীর একান্ত পীড়াপীড়িতে মিঃ সেন সিস্টারকে কাছে ডাকলেন।

কম্পিতপদে মীরা এসে সামনে দাঁড়াল। অন্তরের উতরোল তরঙ্গ বাইরে শান্ত।

—সিস্টার।

সরল সেন সরলভাবেই প্রশ্ন করলেন মৃদুস্বরে,

—পেশেণ্ট কি বলছেন শুনুন ত একটু ভাল করে।

কণ্ঠস্বরকে আরও নীচু করে প্রায় চুপিচুপিই জিজ্ঞাসা করলেন আবার—

—আচ্ছা, এগুলি কি ডিলিরিয়াম্?

একেবারে বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্র গতিতে বিছানার উপরে উঠে বসলেন রোগিণী—

—মিথ্যেবাদী, মিথ্যে কথা! ডিলিরিয়াম নয়—আমি বেশ ভাল আছি। আমার ত কিছু অসুখ নেই। দিন আমার মেয়ে দিন। চুরি করেছ, তোমরা চুরি করে লুকিয়ে রেখেছ আমার সোনা-মণিকে, আমার বুকজোড়া মাণিককে—আমার চাঁদের মত কলঙ্কমাখা ছোট্ট তিল দিয়ে সাজানো অপরূপ রূপসী মেয়ে—রাজকন্যার মত সুন্দর—পূর্ণিমার চাঁদের মত তার গায়ের রং। আনো, এনে দাও তাকে—

স্ত্রীকে জোর করে শান্ত করবার বৃথা চেষ্টা করলেন সরল সেন। সিস্টারের প্রতি দুর্ব্যবহারে তিনি বিশেষ লজ্জিত হয়ে পড়লেন। তাড়াতাড়ি শান্তিকে মৃদু তিরস্কারের স্বরে বললেন—

—আঃ—শান্তি, কি যা তা বলছ! চুপ কর, চুপ কর লক্ষ্মীটি। তারপর বিব্রত স্বরে মীরাকে বললেন—

—দেখুন সিস্টার, আপনি কিছু মনে করবেন না। কিন্তু, এ লক্ষণ ত ভাল মনে হচ্ছে না। আপনি বরঞ্চ ডাঃ মিত্রকে খবর দিন—আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

হঠাৎ শান্তি সেন দুই বাহু দিয়ে জাপটিয়ে ধরলেন মীরাকে—

—দিদি তোমার দুটি পায়ে ধরছি—আমার সর্বস্ব নাও—সব, সমস্ত দিচ্ছি আমি—শুধু তাকে আনো—আমার যাদুকে ফিরিয়ে দাও। আমার বুক যে জ্বলে গেল—পুড়ে খাক্ হয়ে গেল—

স্বামীর প্রশস্ত বক্ষে মাথা গুঁজে ফুলে ফুলে উচ্ছ্বসিত কান্নায় বিলাপ করতে লাগলেন—

—ওগো— আমি যে তাকে নিজে হাতে বুকে ধরে আদর করেছি—চুমো দিয়েছি—যাও তুমি। সমস্ত ঘর খুঁজে এস—যাও, ধরে আনো যেখান থেকে পার আমার মেয়েকে। তার মুখের পাশে ছোট্ট তিল—সে ত ভুল করবার উপায় নেই কারো—সে যে আমার মেয়ে—

তারপর মীরার হাত দুটি ধরে মিনতির সুরে বুঝিয়ে বললেন—

—দিদি, আপনাদের ত ভুলও হতে পারে ভাই। আপনারাও ত মানুষ! দিবারাত্র জেগে জেগে রোগী নেড়ে চেড়ে আপনাদের ত মাথার ঠিক থাকে না সব সময়ে—তাই হয়ত ভুল হয়ে যায়। আপনি নিশ্চয় ভুলে গেছেন আমার মেয়ের কথা—হ্যাঁ, একবারটি মনে করে দেখুন ভাই—স্মরণ করুন সেই তিল-আঁকা চাঁদের খুকুর সোনামুখ—

অকস্মাৎ যেন কি মনে হল—মনে পড়ে গেল

গত রাত্রির কাহিনী সংক্ষেপে স্মিত হেসে বললেন—

—ওহো! দেখুন ত'ও! আমিই ত ভুল করেছি—আপনি ত নন—সে যে অন্য সিস্টার। হ্যাঁ, অন্য সিস্টারই ত ছিলেন আমার কাছে—তিনিই ত এনে দিলেন খুকুসোনাকে বুকে করে। যান সিসি, তাঁকে ডাকুন—সব ঠিক হয়ে যাবে এক্ষুনি। তিনি খুব ভাল—তিনি শপথ করেছিলেন আমার খুকুকে বাঁচিয়ে রাখবেন—তাঁর হাত আমি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দোব। হ্যাঁ, একে একে স—ব মনে পড়ছে। যান, যান—ডাকুন, ডেকে দিন তাঁকে।

স্বামীকে তাগাদা দিলেন—

—ওগো—একবারটি উঠে দেখ না, তিনি কোথায়? কোন মায়ের কাছে ব্যস্ত আছেন। একটিবার তাঁকে ডাকলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়। তাইত! আমার কি ভুলো মন—

এতক্ষণে সন্দেহের ছায়া পড়ল মৃতবৎসা সরল সেনের অন্তঃস্থলটিতে। এ নার্স সে নার্স নয় তাহলে। দেখা যাক্—কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

কেউ বদলে দেয়নি ত তাঁর পঞ্চম কন্যা হিরণ্ময়ীকে অন্যের মৃত শিশুর সঙ্গে?

বেদনার পুঞ্জ ঘনীভূত হয়ে উঠল বুকের মধ্যে। শুধু একটিবার বুকে চেপে ধরতে ইচ্ছে করে ছোট্ট নরম একটি ঈষদুষ্ণ দেহ—চাঁদের মুখে ছোট্ট কালো কৌটা।

পাঁচ-পাঁচটি সন্তানের হতভাগ্য জনক—কিন্তু কাউকে হাতে ধরবারও সুযোগটুকু পেলেন না।

তবু ভাল যে ওই অভাগিনী অন্ততঃ স্বপ্নে হোক জাগরণে হোক—একটি ক্ষণের জন্যও সেই স্বর্গসুধার স্বাদ বুক ভরে পান করতে পেরেছে।

যদি ভুলই হয়—(হায়—তাই যেন হয়—মনে হল।) তাহলে ত তিনিও পারবেন সেই পরমানন্দ-টুকু আকণ্ঠ পান করতে। হাঁ, ভুলকে সংশোধন করা প্রয়োজন বৈকি?

আর যদি জন্মেই শেষ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে—কি মুখ নিয়ে তিনি দাঁড়াবেন সকলের কাছে? তিনিও কি উন্মাদ হয়ে প্রলাপে মুখর করে তুলবেন সমস্ত নার্সিং হোমের আকাশ-বাতাস? বেশী ভেবে লাভ নেই। জরুরী তদন্ত চাই।

প্রথমেই জেরা করলেন মীরাকে—

—সিস্টার, সত্যি করে বলুন ত আমার স্ত্রীর কি হয়েছিল? ছেলে না মেয়ে? জীবিত না মৃত?

—মৃত ছেলে। রিপোর্টে দেখেননি—

—হ্যাঁ দেখেছি বৈকি। আচ্ছা, ছেলে ত মরাই হয়েছে—

—হ্যাঁ।

—তবে শান্তি কেনই বা মেয়ে-মেয়ে করে চিৎকার করছে বলুন ত? আর মেয়ের মুখে যে তিল আছে তাই বা ওর মাথাতে এল কি করে? এই নিয়ে পাঁচবার হল। প্রতিবারই ছেলে। কিন্তু এবার হঠাৎ ওর মাথাতে মেয়েই বা ঢুকল কি করে?

—দেখুন সবই ভগবানের হাত—আমাদের ত কিছু করবার নেই।

—আচ্ছা, আর একটা কথা। আপনিই কি লেবার রুমের চার্জে ছিলেন?

কণ্ঠস্বর কেঁপে গেলেও দৃঢ়স্বরে জবাব দিতে চেষ্টা করল মীরা—

—না।

—তবে?

দারুণ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন সরল সেন।

—আপনি তখন সে ঘরে উপস্থিত ছিলেন? ছিলেন আমার স্ত্রীর কাছে?

উত্তর নেই।

চারিদিকের বাতাস যেন থমথম করতে লাগল।

সেই থমথমে জমাট বাতাসের পর্দাটাকে অকস্মাৎ

বিরাট বিস্ফোরণে বিদীর্ণ করে হতভাগা পিতা সরল সেন চিৎকার করে উঠলেন—

—দিন, আমার মেয়ে দিন—নয়ত পুলিস ডাকব আমি! বলুন, সত্যি করে বলুন কি ঘটেছিল—কি করেছেন আমার মেয়েকে নিয়ে আপনারা—

কাঁপতে কাঁপতে বিকৃতস্বরে জবাব দিতে চেষ্টা করল মীরা—

—হাঁা, হাঁা, সত্যি বলছি। মেয়ে আপনার হয়নি। আপনার স্ত্রীর মৃতছেলে হয়েছিল। আর—আর—

বজ্রমুষ্টিতে সেবিকার দুই হাতের কব্জি চেপে ধরে বজ্রগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন সরল সেন—

—কি হয়েছে আর—বলতেই হবে! আমি কেস্ করব—চাকরি খাব আপনার! এত বড় স্পর্ধা—আমার মেয়েকে কেড়ে নিয়ে মরা ছেলের গল্প বলছেন ইনিয়ে বিনিয়ে?—আর তাই বাপ হয়ে আমাকে বিশ্বাস করতে হবে। বাড়ি ফিরতে হবে শূন্য বুকে, শূন্য হাতে? উঃ—কি নিষ্ঠুর আপনারা! কি পৈশাচিক কার্য করতে পারেন আপনারা—কি খুনী—কি—

হাসপাতাল ভেঙে পড়ল একেবারে। সাত নম্বর পেশেন্ট তিলোত্তমাকে বুকে চেপে মূর্ছিত হয়ে পড়ল সংবাদটার গুরুত্ব উপলব্ধি করে।

ডাঃ মিত্র এসে উদ্ধার করলেন মীরাকে স্বতপুত্র জনকের বজ্রমুষ্টি থেকে।

—কি হয়েছে—আমাকে খুলে বলুন ত কি ব্যাপার?

আগুনের মত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলেন পাঁচ-সন্তানের পিতা।

—চালাকি শুনতে চাই না—আমার মেয়ে দিন! আমি তোলপাড় করে খুঁজব—হাসপাতালের একখানা ইটও আস্ত রাখব না—রাখব না অ-দেখা।

ডাঃ মিত্র স্থির দৃষ্টিতে সরল সেনের বিস্ফারিত চক্ষুর দিকে চেয়ে দৃঢ়স্বরে বললেন—

—না, একথা সত্যি নয়। আমি নিজে হাতে ডেলিভারি করেছি আপনার স্ত্রীর। তাঁর সন্তান মৃতই ভূমিষ্ঠ হয়েছে এবং সেটি পুত্র—কন্যা একেবারেই নয়! তাঁকে অজ্ঞান করে প্রসব করানো হয়েছিল, সুতরাং কি হয়েছে না হয়েছে তাঁর নিজের ত জানা সম্ভব নয়!

ভ্রূকুটি করে মিঃ সেন প্রশ্ন করলেন—

—তাহলে মেয়ের কথা উঠছে কি করে?

ডাঃ মিত্র একটু চিন্তা করে বললেন—

—সেটা ত আমিও ভেবে ঠিক করতে পারছি না—মেয়ের প্রসঙ্গ উঠছে কেন? আপনার স্ত্রী ছেলে না চেয়ে মেয়েকেই পাবার জন্য অত উতলা হয়ে উঠছেন কেন?

—দেখুন—

কঠোর স্বরে মন্তব্য করলেন মিঃ সেন—

—সমস্ত এঁদের কারসাজি—এই হাসপাতালের সেবিকাদের! কার মরা ছেলের বদলে আমার বাঁচা মেয়েকে দিয়ে মোটারকম ঘুষ খেয়েছে এরা। আপনারা সব পারেন এখন মনে হচ্ছে। কিন্তু এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না—মরা ছেলের বাপ হয়ে কি করে বাড়ি ফিরব আমি এবারেও—উঃ—

অসহায়ের মত দুই হাতে মুখ ঢাকলেন হতভাগা জনক। ডাঃ মিত্র মুস্কিলে পড়লেন অত্যন্ত। এ আবার কি ধরনের সমস্যা! সবই যেন কেমন জট-পাকানো মনে হচ্ছে।

মিঃ সেনের কাছে সরে এসে ওঁর কাঁধে একটি হাত রেখে সহানুভূতির স্বরে ডাঃ মিত্র বললেন—

—দেখুন, মিঃ সেন, আপনি অত বিচলিত হবেন না। কিছু একটা ব্যাপার হয়েছে হয়ত। আমাকে একটু ভেবে দেখতে দিন। খোঁজ নিতে দিন একটু মাথা ঠাণ্ডা করে। রাত্রের নার্স

আরতি—যে মিসেস্ সেনের কাছে সে-রাত্রে ছিল—সে ছুটিতে বাড়ি গেছে—অবশ্য এখুনি এসে পড়বে। সে না এলে কিছু ধরা যাচ্ছে না ঘটনাটার। আরতিই ঠিক বলতে পারবে গোলমালের আসল কারণটা কোথায়? আপনি বরং ততক্ষণ আপনার স্ত্রীর কাছে যান—তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করুন। আমি এদিকে সমস্ত স্টাফদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করি।—

ডাক্তারের কোমল কণ্ঠে মিঃ সেনের ক্রোধ ও সন্দেহ কিছুটা শান্ত হলেও তিনি একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। তবু ডাঃ মিত্রকে তদন্তের ভার দিয়ে তিনি পত্নীর পাশে ফিরে গেলেন।

প্রথমেই জেরা করলেন মীরাকে।

—তোমার চাকরি এই ঘটনার উপর নির্ভর করছে কিন্তু, মীরা। যা জিজ্ঞাসা করব, সত্যি সত্যি জবাব দেবে কিছু না লুকিয়ে।

ডাক্তারের পদতলে পড়ে কাঁদতে লাগল মীরা—

—ডাক্তারবাবু, আমাকে বাঁচান—আমি ত এর কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি ত ছিলাম সাত নম্বরের কাছে। একই সময়ে প্রায় দুজনের ডেলিভারি হয়।

—কী বেবী হয়েছে তার—সাত নম্বরের।

ডাঃ মিত্রের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর যেন তপ্ত লৌহশলাকার মত মীরার কর্ণকুহরে প্রবেশ করল।

মীরার জিহ্বা-তালু শুষ্ক কাঠ হয়ে উঠল।

—মীরা—

ওর হাত ধরে প্রবল ঝাঁকুনি দিলেন ডাঃ মিত্র।

—তোমার এই কাজ?

ককিয়ে উঠল মীরা—

—না, না, সত্যি আমি নয়—আমি কিছু জানি না।

—তবে, জবাব দিচ্ছ না যে? সাত নম্বরের কি বেবী?

—মে—মে মেয়ে!

সেবিকার হাত ছেড়ে দিয়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন ডাঃ মিত্র—কোথায় সেই মেয়ে? বেঁচে আছে?

—হ্যাঁ।

—তবে? বদল হল কেমন করে ভগবানের নামে শপথ করে বল। তোমাকে বলতে হবেই।

আকাশ থেকে পড়ল মীরা। হতভম্ব চোখ দুটি তুলে মিলিত করল সিনিয়রমোস্ট ডাক্তার প্রসাদ মিত্রের কঠোর দৃষ্টির সঙ্গে—

—বাচ্চা ত বদল হয়নি।

এরপর বেশ শান্ত স্বরে বলল—

—শান্তি সেনের মরা বেবী-ই হয়েছে—আর সাত নম্বরের সুন্দর তাজা মেয়ে—চাঁদের মত সুন্দর, মুখের নীচে ছোট্ট তিল……

—মানে? কি বলছ তুমি?

অদ্ভুতভাবে অন্যমনস্ক লাগল মীরাকে। সে বলল—

—হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, আমিও ত তাই ভাবছি। সে মেয়ের সন্ধান অজ্ঞাত-অচৈতন্য পেশেণ্ট শান্তি সেন পেলেন কি করে! সে মেয়ে ত খোঁজ করবার প্রয়োজন নেই—সে ত আমি নিজে হাতে প্রসব করিয়েছি—রয়েছে তার মায়ের কাছে। লতিকা রায়—বিয়ের অনেক দিন পরে এই প্রথম—

—কিন্তু—ডাক্তার মিত্র চিন্তিত হলেন,

—কিন্তু, এ ত বড়ই গোলমেলে ব্যাপার! এরকম ভয়ঙ্কর কাণ্ড কে করে বসল! না—আরতি না এলে কিছুই বোঝা যাবে না ব্যাপারটা। সেই ত ছিল সারারাত অচেতন ঘুমন্ত রোগিণী শান্তি সেনের কাছে সেদিন।

বেশীক্ষণ ভাবনার সমুদ্রে আর হাবুডুবু খেতে হল না সকলকে।

আরতি ফিরে এল যখন তখন সমস্ত

হাসপাতালের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে অবিশ্বাস, সন্দেহ আর উৎকণ্ঠার ঢেউ বইছে যেন। নিজের উত্তেজনা ও আবেগ ঢাকতে, নিজের প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে সেবিকার কর্তব্য ভঙ্গ করে যে অপরাধ সেদিন সে করেছিল মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করল আরতি।

মৃতবৎসার কাতর বিলাপ তাকে বিচলিত করেছিল—মনুষ্যত্ববোধের তাগিদেই মানুষের শোকে সান্ত্বনা দিতে তাকে অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই যে জটিল সমস্যার সমাধান করতে হয়েছিল তার জন্য সে শাস্তি নেবে বৈকি?

হৃদয়াবেগের চরম মুহূর্তে অবহেলা করেছে নার্সিং হোমের কঠোর নিয়মতন্ত্রকে, সেবিকার শুষ্ক কর্তব্যবোধকে।

রিক্ত হৃদয়ের ক্ষতি পূরণের জন্য নিজের ক্ষতি অর্থাৎ কর্মজীবনের অবসান সে সহ্য করবে।

তখনকার মত আরতির বিচার শেষ করলেন ডাঃ মিত্র। কিন্তু সরকারের বিচারালয়ে কেস্ তুললেন মিঃ সরল সেন। কন্যাচুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করলেন রাজহাট প্রসূতি সদনকে—অবহেলার ফলে কত বীভৎস কাণ্ডই না ঘটতে পারে, তাই দেখালেন তিনি—তার চন্দ্রমুখী তিলোত্তমাকে দাবি করবার সময়।

মৃতপুত্রকে হাসপাতালের সাজানো কাল্পনিক ঘটনা বলে উল্লেখ করলেন—পুত্রের পিতৃত্ব সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করলেন ধর্মাধিকরণে সর্বসমক্ষে দাঁড়িয়ে সেন দম্পতি।

কিন্তু সত্যকে মিথ্যে বলে অস্বীকার করলেই ত আর সত্য মিথ্যে হয়ে যায় না।

সুদীর্ঘ চার বছর কেটে গেছে।

সেদিন সকাল বেলা আরতিরই নজরে পড়ল খবরটা। একখানি দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলামেই বেশ ফলাও করে বড় বড় হরফের হেড-লাইনের নীচে ছাপা হয়েছে একটি চমকপ্রদ সুবিস্তৃত খবর:—

"দীর্ঘ কাল ধরে—প্রায় চার বছর মামলা চলবার পর—গত সপ্তাহে শ্রীমতী লতিকা রায় তাঁর কন্যাটির মাতৃত্বের অধিকার শেষ পর্যন্ত ফিরে পেয়েছেন।

বিচারে প্রমাণিত হয়েছে শ্রীমতী শান্তি সেন কোনও প্রকারেই শিশু-কন্যাটির মাতৃত্বের দাবি করতে পারেন না। কারণ শিশুটির রক্তের সঙ্গে লতিকা রায়ের রক্তের মিল বা ঐক্য একাধিক ডাক্তারের গবেষণাগারে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেছে। সুতরাং শান্তি সেন কন্যাটির উপর থেকে সমস্ত রকম দাবিদাওয়া তুলে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

চার বছর পূর্বে একটি হাসপাতালে উক্ত দুটি প্রসূতি একই নবজাত কন্যাকে স্ব স্ব গর্ভজাত সন্তান বলে দাবি করেন।

সেই সময়ে ওই হাসপাতালেই একটি শিশু-পুত্রকে প্রসব করে জনৈকা সদ্যবিধবা জননী অসুস্থাবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। এই অনাথ শিশুটিকে শান্তি সেনের হাতে তুলে দিলে তিনি তাকে নিজপুত্র বলে মেনে নিতে মোটেই রাজী হন না। অপার করুণাময়ী লতিকা রায় স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহবশে একাধারে পুত্র ও কন্যা—দুটি সদ্যজাত শিশুরই প্রতিপালনের ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন।

এদিকে বিচারালয় যখন লতিকা রায়কেই কন্যাটির প্রকৃত জননী বলে স্বীকার করে এবং সন্তানহীনা শান্তি সেনকে এই পুত্রটির ভার নিতে অনুরোধ করে—হতভাগ্য জননী তার স্বপ্নলালিত কন্যালাভে বঞ্চিত হয়ে এই অনাথ বালককে গ্রহণ করতে কোনও মতেই সম্মত হন না।

শিশু-কন্যাটি এতবছর পরে জনক-জননী লাভ করে ধন্য হল—কিন্তু মাতৃপিতৃহীন ভাগ্যহীন ছেলেটি বিশ্বের দরবারে একেবারে আশ্রয়চ্যুত ও অপাংক্তেয় হয়ে পড়ল।

শেষ পর্যন্ত মহীয়সী মহিলা লতিকা দেবীই নিজকন্যার সঙ্গে একই সঙ্গে অনাথ শিশুটিকে অপত্য-স্নেহে পালন করবার সাগ্রহ প্রতিশ্রুতি দেন। দুটি শিশু এবং তাদের পিতামাতা এখন বেশ আনন্দেই দিন যাপন করছেন।

দুঃখের বিষয়—এই মামলার রায় প্রকাশ হবার পরই শ্রীমতী শান্তি সেন আশাভঙ্গজনিত মনোবেদনা সহ্য করতে না পারায় সহসা উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন।

বর্তমানে তিনি রাঁচি মানসিক চিকিৎসালয়ে বিশেষজ্ঞদের বিশেষ তত্ত্বাবধানে আছেন।"

পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা এই সঙ্গে মন্তব্য করেছেন নীচে—

"হাসপাতালের অব্যবস্থার জন্য, কর্তব্যবোধহীন চিকিৎসক ও নার্সদের অবিবেচনা এবং অবহেলার ফলে কত রোগিণীর জীবনসংশয় হচ্ছে, কত পরিবারের শান্তি সারা জীবনের মত যাচ্ছে শূন্যে মিলিয়ে। মানুষের প্রতি দয়া-মায়া-মমতা হারিয়ে, কর্তব্যবোধ বিসর্জন দিয়ে মানুষ দিনের পর দিন কোথায় নেমে যাচ্ছে?"

পুরোপুরি দুটি কলম ধরে এই যে সুদীর্ঘ সংবাদ, এর উপরেই দৃষ্টিটা আটকে রইল আরতির।

কতখানি কর্তব্যনিষ্ঠা থাকলে, কতখানি দয়া থাকলে মানুষ এই ধরনের অন্যায় কাজ করে বসে—সে কথা আরতি ছাড়া কেই বা জানবে?

কেই বা খোঁজ রেখেছে—পাছে একটি হতভাগ্য নারীর জীবনসংশয় হয়—পাছে একটি সুখী পরিবারের শান্তি নষ্ট হয় সারা জীবনের মত—সেই জন্য অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণাতেই আরতি সেদিন হাসপাতালের সমস্ত রকম সুব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করে—নিয়ম-কানুনকে অবহেলা করেই সেই অদ্ভুত প্রমাদ করে বসেছিল?

মনুষ্যত্ব হারায়নি বলেই ত মানবতাবোধ জেগেছিল কর্তব্যবোধকে সরিয়ে দিয়ে।

হৃদয়ে দয়া-মায়া থাকলেই কি সব সময়ে তা দেখানো যায়, না প্রাণের মধ্যে মমতার বন্যা বয়ে গেলেই তাই দিয়ে প্লাবিত করা যায় সব রোগের যন্ত্রণাকে—রোগিণীর অন্তরের দুঃসহ জ্বালাকে?

না—নার্সের জীবনে একথা একেবারেই খাটে না। মমতার প্রতিমূর্তি যে সেবিকা—সেও পারে না হৃদয় উজাড় করে ঢেলে দিতে পীড়িতের বেদনা লাঘব করতে।

শুশ্রূষাকারিণীর হৃদয়ে থাকা চাই করুণার প্রস্রবণ—কিন্তু তার স্রোত প্রবাহিত হবে একটি নির্দিষ্ট পথরেখা বেয়ে। দুকূলপ্লাবিনী বর্ষার ভরা গঙ্গার মত অন্ধ উচ্ছ্বাসে শহর-গ্রাম-জনপদকে ভাসিয়ে দিলে ত চলবে না! করুণা প্রকাশেরও একটি কাল্পনিক সীমানা আছে বৈকি!

আরতির নিজের কানেই আশ্চর্য হয়ে বাজল কথাগুলি।

কিন্তু এ ত গল্প নয়—মিথ্যেও নয়।

আরতির জীবনের সে যে এক রোমাঞ্চময় রাত্রির বিচিত্র কাহিনী!

একটি আশ্চর্য সকাল

[গল্প]

আজ সকালে উঠে একটা জিনিষ লক্ষ্য করল তুষার। বৌদির মুখে হাসি। হেসে হেসে দাদার সঙ্গে কথা কইছে। হাসতে হাসতে ডাকছে তুষারকে।—চা যে জুড়িয়ে গেল ঠাকুরপো। কতক্ষণ ধরে ডাকছি,—ঘুম যে আর ভাঙতে চায় না। সারা রাত ধরে কোন্ রূপবতীর ধ্যান কর,—যে ঘুম ভাঙতে বেলা বারোটা বেজে যায়!—সেই আগেকার বৌদি। বিয়ের পর যেন নতুন ঘর করতে এসেছে। কত ঠাট্টা, কত হাসাহাসি। কি সুন্দর ছিল সেই দিনগুলো!

বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল তুষার।—অ্যাম্ শো সরি স্যাডাম্। এক্সকীউজ মী।—আমি এখনই মুখ ধুয়ে আসছি।—তুষারও আজ চপল হয়ে উঠেছে। যেন এখনও সে থার্ড ইয়ারে পড়ে।

চায়ের কাপটা বৌদির হাত থেকে নিয়ে বৌদিকে বসতে বলল তুষার।—রাজ্যের কাজ বাকী আছে এখনও। তোমার দাদা গেছেন বাজারে, এখনই ফিরবেন। ভাত চাপিয়ে এসেছি যে। আমার সে সময় কোথা যে দু'দণ্ড বসে গল্প করবো!—কতকগুলি অগোছাল কথা। কাজের তাড়া কত বেশী,—ও থেকেই তা বোঝা যায়। তবুও তাকে ছাড়ল না তুষার। অনেক দিন পরে সেই হারানো দিনের একটিকে যদি পাওয়া গেছে—তাকে এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যেতে দেবে না। ধরে রাখবে অনেকক্ষণ। গাছ থেকে ছিঁড়ে এনে ফুলদানিতে সাজিয়ে-রাখা ফুলগুলো ঝরে যায়, শুকিয়ে যায় সত্যি,—কিন্তু যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ত আনন্দ দেয়। সংসারের রুক্ষতায় এমনি কত ফুল যে ঝরে গেছে কে তার হিসেব রাখে। আজ তাদের একটিকে পাওয়া গেছে। নাই বা হল তাজা,—মলিন ত হয়নি এখনও।

: দাদাকে মাছ আনতে দিয়েছ বৌদি। কতদিন মাছ খাইনি বলত!—কতদিন আবার! এই ত

আহারের পর দিনে দু'বার..

সব খাওয়ার শ্রেষ্ঠ লাভের উপায়

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাসি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, গোয়াবাগান রোড, কলিকাতা-৩৭

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি; এস, (লণ্ডন), এম, সি, এস (আমেরিকা), ডাঙ্গলপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

গেল হপ্তায় আস্ত একটা মাছ এসেছিল।—দেখতেই আস্ত! ওজন কত তা জান?—হলই বা পাঁচেটাক, টাটকা পুকুরের মাছ। দাম নিয়েছিল পুরো পনেরো আনা। চার পয়সার পান নিতেই এক টাকা ফুরিয়ে গেল। মাসের প্রথম তাই গায়ে লাগেনি।

ঠোঁটের উপর তর্জনী রেখে বৌদিকে থামতে বলল তুষার। কথার সুরটা যেন ঘোলা খাতের দিকে এগিয়ে চলেছিল। একটু ভুল করলেই ফুলদানি থেকেও খসে পড়ত ফুলটা। আর বৌদি,—শুধু বৌদিই বা কেন,—তুষারও হয়ত মাড়িয়ে যেত তাকে। এই সুন্দর সকালটার ঘটত অপমৃত্যু। মুহূর্তে বৌদির মুখটা হয়ে উঠত থমথমে। আর হাফশার্টটা কাঁধে ফেলেই তুষারকে বেরিয়ে যেতে হত বাইরে।—নাঃ, আজ আর ওসব কিছুতেই হতে দেবে না তুষার। বাজার—মাছ, মাছের দাম, সংসার খরচা,—এসব নিয়ে কোনও কথা নয়। অন্য কথা বলতে হবে! বাঁচিয়ে রাখতে হবে বৌদির মুখের ঐ হাসিটাকে।

: তোমার জন্মদিন কবে বৌদি?—খিলখিল করে হেসে উঠল বৌদি।...বৌদির গলার হাড় দেখা যাচ্ছে। গালে মাংস নেই, চোখগুলো তাই ভেতরে ঢুকে গেছে। তা যাকগে। এখনও হাসলে সুন্দর দেখায় বৌদিকে। বুঝতেই পারা যায় না—বয়স কত!

তুষার আবার জিগ্যেস করে,—কত বয়স হল তোমার?

: কত আর! একমণ চালের দাম যত টাকা—ঠিক তত!

অনেকদিন আগে এইভাবেই কথা বলত বৌদি। সহজ হেঁয়ালি, অথচ কত সরল।—কিন্তু আবার ঐ বাজার-দর কেন?—তুষার আশঙ্কিত হল। নানা সমস্যায় সংসারটা যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। একটু সহজ হবার জো নেই। একটু অসাবধান হলেই যমদূতটা এসে হাজির হবে। হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবে কথা বলা। পরস্পরের দিকে চোখ মেলে চাইতেও পারা যাবে না। বসে বসে দুজনেই মরে যাবে। কী দুঃসহ অস্বস্তিকর অবস্থা!—তুষারের মত বৌদিও কি ভাবছে ঐসব!—তা কেন ভাববে! তুষারের মত তার মনে ত ঘা নেই। এতখানি স্পর্শকাতর বৌদি হতে যাবে কেন!

সত্যি কত বদলে গেছে তুষার। কত সংকোচ, কত দ্বিধা।—তুষার কি এখন বলতে পারে!—বৌদি, এক্ষুণি এক কাপ চা করে দাও, খেলা দেখতে যাবো! বলতে পারে!—ডালের সঙ্গে ভাজা না হলে ভাত যেন আর উঠতেই চায় না বৌদি!—তোমার ঐ লম্বা গলায় হার না হলে কি মানায়। কিন্তু কই, গলায় ত হার নেই। কোথায় গেল সেই সূক্ষ্ম কাজ-করা ছোট ছোট কুঁড়ির উপর প্রজাপতি-বসানো হারটা!—কোথায় যে গেছে সে কি আর তুষারের জানতে বাকি আছে! এইখানেই ত তুষারের লজ্জা। আর এইখানেই ত সে অপরাধী।

: আমার জন্মতিথি আর বয়স নিয়ে হঠাৎ তুমি অত মেতে উঠলে কেন বলত ঠাকুরপো। বয়সের তুলনায় আমি খুব বুড়ী হয়ে গেছি নয়!—গলাটা ভারী হয়ে উঠল। মুখটা বিবর্ণ! তুষারের ঘা থেকে বুঝি এখনই রক্ত ঝরবে। কিন্তু তুষার আজ খুব সাবধানী। আজকের এই সকালটাকে কিছুতেই সে মরে যেতে দেবে না। বৌদির একমুখ হাসি দেখে যখন ঘুম ভেঙেছে তখন সারাদিন ধরে সেই হাসিকে সে বাঁচিয়ে রাখবে। একটু একটু করে দিনটাকে খরচ করবে সে। ছোট ছেলের মত রসগোল্লা সে চেটে চেটে খাবে। চিলের ছোঁ থেকে বাঁচাতেই হবে সেই খাবারটাকে।

: তুমি যদি বুড়ী হয়ে যাও বৌদি, আমি ত তাহলে গঙ্গার ঘাটে! জান, তোমার চেয়ে আমি একশো পঞ্চাশ দিনের বড়।

: পাঁচবাস বলেই ত পারতে।—বৌদি ঠোঁট উল্টে হাসল।

: তাড়াতাড়ি যে ফুরিয়ে যেত তা হলে,—এটাও বুঝলে না।

: একশো পঞ্চাশ ফুরোতে বুঝি বেশী দিন লাগে!

এবার আর হাসল না বৌদি।—আবার সেই সংসার। শতছিদ্র। একটুখানি আনন্দও সেখানে ধরে না।

: মাস গেলে একশো পঞ্চাশটি টাকা হাতে পাই। দেখছ ত এদিক আনতে ওদিক কুলোয় না। একশো পঞ্চাশ টাকা আবার টাকা! এবার কিন্তু একটু হাসল বৌদি। কিন্তু হাসিটা, ঠিক হাসির মত নয়।

: একশো পঞ্চাশ!—দাদা বুঝি অত কম মাইনে পায়! নিজের অজান্তেই সংসারের মধ্যে ঢুকে পড়ল তুষার। সকালটাকে বুঝি আর বাঁচিয়ে রাখা গেল না।.....

: কম কেন! শুনেছি ত দুশোর উপর মাইনে তাঁর। কেটেকুটে ঐ একশো পঞ্চাশেই দাঁড়ায়।—বৌদি যেন চেপে-চুপে বসল। মনে হচ্ছে সহজে এখন উঠবে না।

তুষারের কিন্তু আর ভাল লাগছে না। এক্ষুণি বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে ঘর থেকে।

: মনে নেই, ঠাকুরঝির বিয়েতে একহাজার টাকা ধার করে নিয়ে এলেন। সেই টাকাই ত মাসে মাসে কেটে নেয়।—তুষার ত সবই জানে। নতুন করে এসব কথা তাকে শুনিয়ে লাভ কি। একটা কিছু উদ্দেশ্য নিয়েই বোধ হয় কথাগুলো বলছে বৌদি। সব বুঝতে পারছে তুষার। ওর অক্ষমতার উপর পরোক্ষ কটাক্ষ। সবই বুঝতে পারছে, কিন্তু বুঝতে চাইছে না। আজকের সকালটার জন্যে যদি সে একটু অবুঝ হয়, তাতে সংসারের এমন কি ক্ষতি হবে? আর বুঝেই বা সে কি করতে পারছে! তার চেয়ে অবুঝ হয়ে থাকা অনেক ভাল।

: তোমাকে আর কি বলবো ভাই, সবই ত তুমি জান! যাই,—তাতে বোধ হয় জল নেই!—বৌদিকে আর বাধা দিল না তুষার। ঠিক মুহূর্তেই চলে গেছে সে। কথা ফুরিয়ে যাবার পরও বসে থাকলে ব্যথাই মুখর হয়ে উঠত মনের মধ্যে। চলে গিয়ে বৌদি নিজে বাঁচল, আর বাঁচিয়ে গেল তার ঠাকুরপোকে।

কিন্তু আজকের সকালটা কি এখন বেঁচে আছে? আছে বোধ হয়। তাকে যে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে! আজ আর বাইরে বেরুবে না তুষার। এইখানেই সে শুয়ে থাকবে। দাদা অফিস বেরিয়ে গেলেই আবার সে ডেকে নিয়ে আসবে বৌদিকে।.....

ডাকতে হল না। বৌদি নিজেই এল। দাদা এখনও ফেরেনি বাজার থেকে। উনুনে চারটি কয়লা দিয়ে একটু সময় করে নিয়েছে বৌদি।

: কি মহারাজ আজ সারাদিনই শুয়ে থাকবেন নাকি!—'মহারাজ'!—চমকে উঠল তুষার। বৌদি কি বিদ্রূপ করল! পাঁচবছর ধরে বাড়িতে যে বেকার হয়ে বসে আছে—সে হল মহারাজ! নাকি ও অলস ভাবে শুয়ে আছে—আর দাদা সেই ভোর থেকে ছুঁচের পেছনে সুতো দিয়ে চলেছে বলেই ওকে মহারাজ বলে ডাকা হল!—এমন ভাবে ত বৌদি কোনও দিনই ডাকেনি! বৌদির মনেও এত নোংরা!

বিছানা ছেড়ে সোজা মেঝের উপর দাঁড়িয়ে পড়ল তুষার। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বৌদি মুচকে মুচকে হাসছে। দুষ্টুমিভরা প্রথম কিশোরীর হাসি।—সে হাসিতে বিদ্বেষ নেই, ভর্ৎসনা নেই, কুটিলতা ত নেই-ই। সে হাসিতে যদি কিছু থাকে, সেটা প্রীতি—স্নেহ।

ছিঃ ছিঃ, এই বৌদিকে সন্দেহ করছিল তুষার! এত দৈন্য তার মনে, এতখানি নীচতা!

: আজ তোমার কি হয়েছে বল ত বৌদি, আমাকে একটু একলা থাকতে দিচ্ছ না। কিন্তু ভারী ভাল লাগছে আজ তোমাকে।

: ভাল লাগবারই ত কথা। শুধু আমাকে কেন! জগতের সব কিছুই আজ ভাল লাগবে। ঐ তোমার দাদা আসছে। যাই। অনেক রাঁধতে হবে আজ।

তুষার জানলার ধারে এসে দাঁড়াল। সামনে ছোট্ট বাগান। নানা আগাছায় ভরতি।···· কাজ-কর্ম নেই, বাগানটা ত পরিষ্কার করতে পারে তুষার। আনাজপাতি না হোক, দু'একটা ফুলগাছও ত বসাতে পারে।—দাদা একদিন বলেছিল কথাগুলো। বলেছিল বৌদিকে। কিন্তু ঘর থেকে তুষার শুনতে পেয়েছিল সব। দু'একদিন চেষ্টাও করেছিল বাগান পরিষ্কার করতে, কিন্তু তারপর আর ভাল লাগেনি। অনেক কাজই তার ভাল লাগে না। সব তাতেই কেমন যেন নিরুৎসাহ ভাব। একটা গভীর নৈরাশ্যের ছাপ মনে, চোখেমুখে, সারা শরীরেও ছড়িয়ে পড়েছে তার। সব তাতেই ক্লান্তি, সব তাতেই অবসাদ।

ভাইপোদের পড়ানো। তাও তিন দিনের দিন বন্ধ হয়ে গেল। আমার কাছে ওরা পড়তে চায় না দাদা। খালি গল্প শুনতে চায়। তার চেয়ে এক কাজ কর, আমি অন্য কোথাও টিউশনী করি, আর ওদের জন্যে তুমি মাস্টার রাখো। ঘর থেকে আর টাকা বার করতে হবে না।·····শুধু ঐটুকুই সাহায্য সে করে আসছে অনেকদিন। ওর চেয়েও বেশী সাহায্য যাতে করতে পারে সে চেষ্টারও কমতি নেই তুষারের। কিন্তু জুটছে না। গ্র্যাজুয়েট হয়েও এই ক'বছরের মধ্যে একটা চাকরিও জোটাতে পারেনি তুষার। এর জন্যে কী সে দায়ী? তবে সে নিজেকে অপরাধী ভাবে কেন! চোরের মত চুপি চুপি আসে। খায়দায়, বেরিয়ে যায়, নয়ত শুয়ে থাকে। দাদার সঙ্গে বড়-একটা দেখাই হয় না। বৌদির সঙ্গেও ভাল করে কথা বলে না। কেন? কেন সে আজকের মত সহজ হতে পারেনি এতদিন!··· ··সহজ আবহাওয়াটাই ত বিদায় নিয়েছে বাড়ি থেকে। বৌদিও কি এমনি করে কোনও দিন চা নিয়ে ডেকেছিল তার ঠাকুরপোকে। ঠাণ্ডা চা পড়ে থাকত। ঘুম ভাঙলে তাকেই গরম করে দিত। আজকের এই আনন্দোজ্জ্বল সকালটা হয়ত ভুল করেই ঢুকে পড়েছে এই বাড়িতে। দুঃস্থ মনগুলো নিয়ে একটু খেলা করছে বোধ হয়।

·····কিন্তু দাদার হাতে মাটির ভাঁড় কেন? দাদা কি খাবার নিয়ে এল? কেউ কি আসবে আজ? হতেও পারে। বৌদির ভাইয়ের নাকি বিয়ে। হয়ত কেউ নেমন্তন্ন করতে আসছেন।—এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে তুষার। বুঝতে পেরেছে বৌদির এত ফুর্তি কেন! বাপের বাড়ির লোকের কাছে দেখাতে চায়, বাড়িতে তাদের কি গভীর শান্তি! একটুও মালিন্য নেই কোথাও। মেয়েরা কী ভয়ানক অভিনয়পটু।···কি কুৎসিত আজকের এই সকালটা! রাত্রির সঙ্গে কি ভয়ানক ষড়যন্ত্র ছিল তার। ভালই হয়েছে। মুখোশ খুলে গেছে।·····

হাফশার্টটা গায়ে গলিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল তুষার। বৌদি ডাকল।—এখন আবার কোথায় বেরুচ্ছ ঠাকুরপো?

তুষার ফিরল না। উত্তরও দিল না।

: তুষার!—দাদার ডাক। উত্তর দিল না বটে। কিন্তু ফিরতে হল তুষারকে। নিজের ঘরে গিয়ে সটান শুয়ে পড়ল বিছানায়।

: আর শুয়ে থেকো না ঠাকুরপো। বেলা অনেক হয়ে গেল। চান করে এসো।

: চান করবো। কেন, কি করেছি আমি?

: জানো না আজ কত তারিখ?

: সতেরো তারিখ বোধ হয়! তাতে হয়েছে কি!

: তুমি ভুলে থাকতে পার ঠাকুরপো, কিন্তু আমরা ত আর ভুলতে পারি না! আমরা যে দিনরাত ঐ চিন্তা করি।

: কিসের চিন্তা ?

: তোমার চাকরির।

: ও, মনে পড়েছে—। আজ দাদার অফিসে যেতে হবে, নয় ! সব ঠিক হয়ে গেছে বুঝি ! কই এতক্ষণ ত কিছু বলনি ?

: এখনও ঠিক হয়নি,—তবে আজই ঠিক হয়ে যাবে। তাই ত দই আনাসনি দইয়ের যাত্রা শুভ।

বৌটা মোচড় দিয়ে উঠল তুষারের। কোনও ক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল,—তুমি ঠিকই বলেছ বৌদি—নিশ্চয়ই আমি চাকরিটা পাবো।

: অমন করে বল না ঠাকুরপো। বুকটা আবার ধড়াস করে ওঠে। শেষ কালে যদি না হয় !—রক্তহীন ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল। চোখের পাতাগুলো ভিজে ভিজে।

তাড়াতাড়ি বৌদির হাত দুটো ধরে বিছানার উপর তাকে বসিয়ে দিল তুষার।—তুমি কাঁদছ বৌদি !

: কই,—না ত ! কাঁদতে যাবো কেন ! কাঁদবার কি আছে ! তবে হাসতেও বড় ভয় করছে যে ! একটি মিষ্টি হাসিকে ঠোঁটের মধ্যে চেপে ধরল বৌদি। আর তাইতেই তাকে আশ্চর্য সুন্দর লাগল।

এই বিশাল দেশে যেমন দ্রষ্টব্য স্থানের শেষ নেই, তেমনই শেষ নেই বক্তব্য বিষয়ের। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সভ্যতা ভারতের আধ্যাত্মিক চেতনাকে আজও গ্রাস করতে পারেনি। এ সত্য ইতিহাসের পাতায় লুকিয়ে নেই। আছে তার স্থাপত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে, সাহিত্যে, তীর্থ ও জনপদের প্রাচীন গরিমায়।

রম্যাণি বীক্ষ্য

এই বিরাট দেশের বিপুল ঐশ্বর্যের প্রাণবন্ত কাহিনী। বাঙলা সাহিত্যের সুপ্রতিষ্ঠিত কথাশিল্পী

শ্রীসুবোধ কুমার চক্রবর্তী

পর্বে পর্বে এই দেশের নূতন রূপ উন্মাটিত করছেন। এবারে **দ্রাবিড় পর্ব** পূজার পূর্বে প্রকাশিত হবে।

এতদিন দক্ষিণ ভারত এক স্বতন্ত্র সভ্যতার উজ্জ্বল ছিল। রম্যাণি বীক্ষ্যের দক্ষিণ ভারত পর্বে শুধু সমুদ্র-তীরবর্তী ভূমির পরিচয় আছে। দ্রাবিড় পর্বে মহিসুর ও হায়দ্রাবাদ রাজ্যের কাহিনী লিপিবদ্ধ হল। বালির কিষ্কিন্ধ্যা, হিন্দু সাম্রাজ্য বিজয়নগর, টিপুর শ্রীরঙ্গপত্তন। স্থাপত্যের শেষ কথা আছে হয়শাল স্থাপত্যের নমুনায়—বেলুর হালেবিদ ও সোমনাথপুরমে, শ্রবণবেলগোলায়, ইলোরা অজন্তায়। শুধু ভ্রমণের বৃত্তান্ত নয়। উপন্যাসের রসমণ্ডিত বিশুদ্ধ সাহিত্যসৃষ্টি। আলোকচিত্র-সম্বলিত গ্রন্থ।

এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফোন : ৩৪-১৬০৬ : : গ্রাম : প্রকাশিকা

আকাশ জুড়ে কখন যে মেঘ করে এসেছে, অন্ধকার হয়ে গেছে চারিদিক—আমি কিছুই জানতে পারিনি। আমার দু-চোখের দৃষ্টি তখন শুধু সামনে-খোলা খাতার পাতাটুকুর গণ্ডির মধ্যেই বন্ধ; আমার মন তখন শুধু কথায় পরে কথার মালা গাঁথায় ব্যস্ত। বাইরে কোথায় কি ঘটছে বা ঘটছে তার কিছুই আমি বুঝতে পারিনি।

এতো মনোযোগ দিয়ে জীবনে আর কখনো কোন পরীক্ষার উত্তর দিই নি আমি—না স্কুলে, না কলেজে, না য়ুনিভার্সিটিতে। অবশ্য কারণও ছিল তার, যে-কারণ আগে ছিল না—অন্তত তেমন করে তো নয়ই। যদিও য়ুনিভার্সিটির গণ্ডি পেরিয়েছি বছর কয়েক আগেই, তবুও আজ পর্যন্ত আমি কোন জীবিকাতেই সুস্থির হতে পারিনি। কিছুটা আমার স্বভাবের দোষ ছিলই; কিন্তু তারো চেয়ে ঢের বেশী ছিল উপযুক্ত সুযোগের অভাব। ধরাপড়ার লোক যেমন কোথাও কেউ ছিল না, তেমনি ও-সব দিকে আমার নিজেরও স্পৃহার কিছু কমতি ছিল। বরং খানিকটা কুণো স্বভাব আমাকে কোণঠাসা করে রেখে দিয়েছিল। কাজেই যাকে আমরা এখন কেরিয়ার বলি, তার দিক থেকে আমার কোন সুবিধেই হয়নি। কাজকর্ম যা পেয়েছি তার কোনটাই আমার পক্ষে বিশেষ লোভনীয় ছিল না। তার ফলে কোনটাতেই টিকতে পারিনি বেশী দিন: এটা ছেড়ে ওটায় গেছি, আবার ওটা ছেড়ে সেটায়। এমনি করেই কেটেছে এতোদিন। কিন্তু আর কাটছিল না। বয়েস একটু বাড়ার ফলে আমি বুঝতে পেরেছি, সংসারে পায়ের নীচে যথেষ্ট উপার্জনের শক্ত জমি না থাকলে চারিদিক থেকেই সব-কিছু ফাঁকা হয়ে আসে। আমি নিতান্তই সাধারণ মধ্যবিত্ত ভদ্রসন্তান আমার পক্ষে সাংসারিক জীবনে ঐ শূন্যতার আঘাত মোটেই বরণীয় ছিল না। কাজেই শুরু হয়েছে মোটামুটি ভদ্র এবং স্থায়ী কোন জীবিকার সন্ধান। আর, সে-সন্ধানের ফলেই আজকের এই পরীক্ষা।

কিছুদিন আগে ব্যাঙ্কারি গোছের একটা সরকারী চাকরির জন্যে এ্যাপলাই করেছিলাম পাবলিক সার্ভিস কমিশনে। তারই আজ রীটন্ টেস্ট্।

এ-চাকরিটা আমার পক্ষে বেশ-একটু লোভনীয়ই ছিল। মাইনের দিক থেকে তো বটেই;—তা' ছাড়া কাজের প্রকৃতির দিক থেকেও কাজেই আমি পরীক্ষার জন্যে তৈরী হয়েছিলাম প্রাণপণে। কয়েকদিন ধরে আমার মনে এই পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

এই কয়দিন ধরে আমি যতো কাজ করেছি, যতো কথা বলেছি, যে-সব মানুষ আর দৃশ্য দেখেছি তার কিছুই আমার মনে গিয়ে পৌঁছয়নি। আমার ইন্দ্রিয়েরা কেবল অভ্যাসমতো যান্ত্রিক নিয়মে কাজ করে গেছে—দেখেছে, শুনেছে, স্পর্শ করেছে, ঘ্রাণ আর স্বাদ নিয়েছে। কিন্তু মন তার কোন কিছুই গ্রহণ করেনি। সে শুধু এই পরীক্ষার কথাই ভেবেছে—কি প্রশ্নের কি উত্তর দেবে তার খসড়া করেছে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে।

এমনি করেই আমার কেটেছে ক-দিন। বাইরের জগতে কি ঘটছে না-ঘটছে তার প্রায় কিছুই আমি জানতে পারিনি।

প্রতিদিনের অভ্যাসমতো আজো সকালে উঠেই আমি জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকেছি খানিকক্ষণ। তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখেছি মেঘের আনাগোনা। তারপর যখন স্নান করতে গেছি, বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, ট্রাম স্টপে এসে দাঁড়িয়েছি—তখনও।

বরং আকাশে তখন টুকরো-টুকরো খণ্ড-খণ্ড মেঘ এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে ছিল। আমি অভ্যাস-মতোই মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকিয়েছি তাদের দিকে;—তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছি তাদের নড়াচড়া, তাদের রঙ। কিন্তু সে কোন দেখাই আমার সচেতন মনে জ্ঞান হয়ে ওঠেনি;—শুধু অবচেতনায় অস্পষ্ট অনুভব হয়েই থেকেছে।

যখন পরীক্ষার হলে ঢুকেছি, প্রশ্নপত্রে নিজের আকাঙ্ক্ষিত প্রশ্নগুলিকেই দেখতে পেয়েছি, তখন সে-অনুভবও নিঃশেষে মুছে গেছে আমার মন থেকে। আমার সমস্ত মন জুড়ে হয়েছে শুধু উত্তর সাজানোয়, কথার মালা গাঁথায়।

তারপর, কখন আকাশ জুড়ে কালো মেঘ ঘন হয়ে এসেছে, অন্ধকার হয়ে গেছে চারিদিক—আমি কিছুই জানতে পারিনি।

জানতে পারলাম সব লেখা শেষ হলে, খাতা জমা দেওয়া হয়ে গেলে। উত্তর আশাতীত ভালোই দিয়েছি। কাজেই মন আমার আনন্দিত হয়েই ছিল। তা' ছাড়া, চেতনার উপর থেকে এ-কদিনের আবিষ্ট ভাব সরে যাওয়ায় এক মুহূর্তে সমস্ত জগৎ তার রূপ-রঙ-রস নিয়ে আমার মনের 'পরে আকুল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমি ভেসে গেলাম। অদ্ভুত একটা আনন্দে আমার মন ভরে উঠলো।

হল থেকে বেরিয়ে এলাম আর-সবার সঙ্গে।

বাইরে তখন অঝোরে জল ঝরছে; আকাশে মেঘ ডাকছে মাঝে মাঝে। আমরা সবাই গাড়িবারান্দার নীচে এসে দাঁড়ালাম। সকলে যে যার পরিচিত লোক খুঁজে নিয়ে গল্প করতে লাগলো, হাসাহাসি করতে লাগলো। আমার চেনাশোনা কেউ ছিল না। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম একপাশে। দেখতে লাগলাম জল আর বাতাসের মাতামাতি খেলা; শুনতে লাগলাম সকলের সব কথা, হাসি।

কতোক্ষণ পরে মনে নেই, হঠাৎ আমার ডান পাশে বারান্দার এককোণে চোখ পড়তেই আমি অবাক হলাম। আমার থেকে মাত্র হাত তিনেক দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েটি। আমি সেদিকে তাকিয়েওছি অনেক বার, তবু এতোক্ষণ তাকে দেখিনি কেন—তাই ভেবেই অবাক হয়েছি প্রথমটা। কিন্তু পর মুহূর্তেই বুঝতে পেরেছি তার কারণ। মেঘে-ঢাকা আকাশের নীচে বিষণ্ণ আলোয় বর্ষার দিনের যে-ছবি জলরঙে আঁকা হয়ে ছিল সে-ছবির রঙে-রেখায় ওর মূর্তি মিশে ছিল এক হয়ে। তাই হঠাৎ আলাদা করে তাকে আমি দেখতে পারিনি।

সত্যিই তাই। প্রথম দেখাতেই যে-ছবি আমার মনে এসেছে, তা মেঘের-আড়ালে-পড়া সুন্দর স্নিগ্ধ একটি তারার। জীবনে আর-কখনো কোন মেয়েকে দেখে হঠাৎ এমন কথা আমার মনে হয় নি।

তাই মনে মনে অবাক হয়েই আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়েছি। তাকিয়ে থেকেছি অনেকক্ষণ।

তারপর মনে পড়েছে, পরীক্ষার হলে ঢুকেই প্রথমে যখন চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েছি, তখনই প্রথম দেখেছি ওকে। আমার সিট্‌টার খানিকটা পিছনেই বসেছিল ও।

সেই দেখার ছবি আমার অবচেতন থেকে এখন চেতনায় উঠে এলো। বুঝতে পারলাম, আমার মতো ও-ও এই চাকরির প্রার্থী। আর যে-মুহূর্তে এ কথা বুঝলাম, আমার কল্পনা ওর জীবন, ওর মন, ওর সংসার সম্বন্ধে কাজ করতে শুরু করলো। আমার নিজের জীবনকে দিয়েই আমি ওর জীবনকে বুঝতে চাইলাম।

মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে আমি। বেকার হয়েও থেকেছি অনেকদিন। জীবনের নির্মম আঘাতের স্বাদ পেয়েছি অনেক। সেই স্বাদের স্মৃতির রঙ দিয়েই এখন আমার মন ওর জীবনের ছবি আঁকতে চাইলো।

আর, সেই ছবির সঙ্গে মিলিয়ে নেবার জন্যে আমি তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। দেখতে লাগলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

মেয়েদের বয়স বোঝার ক্ষমতা নেই আমার। তবু মনে হলো, তেইশ-চব্বিশের বেশী বয়স ওর হবে না। মাঝারি লম্বা চেহারা। একটু রোগাই। ফর্সা সুশ্রী মুখে কেমন-একটা গম্ভীর বিষণ্ণতা। পাতলা ঠোঁটের দু-পাশের কোঁচকানো রেখায় যেন অনেক অভিজ্ঞতার ছাপ আঁকা।

আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়েই রইলাম। ও আমার দিকে ফিরেও তাকালো না। একদৃষ্টে বাইরের বৃষ্টির দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

ওর সেই নির্নিমেষ দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আমি বুঝতে পারলাম, নিজের জীবনের বেদনার কথাই ও ভাবছে। এমন জলে-ভেজা আকাশের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে তা' ছাড়া আর-কিছুই কেউ ভাবে না —ভাবতে পারে না।

আমি বুঝতে পারলাম। আমি জানতাম, বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী। সে-একাকিত্ব যে একটি মেয়ের পক্ষে কতো বেশী হতে পারে, তা যেন এই মুহূর্তে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। আর, ওর সেই আত্মমগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে একটি মেয়ের নির্জন জীবনের বেদনাকে পড়তে পড়তে হঠাৎ আমার মনে হতে লাগলো: ও যেন আমার অচেনা নয়, অপরিচিত নয়। ওকে যেন আমি চিনি—অনেক অনেক দিন ধরে। ওর জীবনের সব কথা যেন আমার জানা। ওর জীবনের সব সুখে, সব দুঃখে, সব আনন্দে-বেদনায় যেন আমারও ভাগ আছে।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি নিজের মনে অনুভব করতে লাগলাম ওর মনকে—ওর মনের বেদনাকে। ও আমার দিকে তাকালোও না। এক-দৃষ্টে তাকিয়ে রইলো বাইরে—তেমনি আপনমনে। বৃষ্টির-জলে-ভেজা ঠাণ্ডা বাতাস এসে ওর মুখে লাগতে লাগলো। দুটি নিমেষহীন গভীর-কালো চোখের পল্লব মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। আর, দীর্ঘ বেণীর বাঁধন এড়িয়ে একগুচ্ছ পলাতক চুল বারবার কপালের 'পরে এসে লুটোপুটি খেতে লাগলো।

আমার ভীষণ ইচ্ছে করতে লাগলো: ওর কপালের উপর থেকে ঐ অলকগুচ্ছকে হাত দিয়ে সরিয়ে দিই, ওর ঠোঁটের কোণের বেদনার রেখাকে মুছে দিই।

কিন্তু হাত বাড়ালাম না আমি। পারলাম না বাড়াতে। আমার সামাজিক মন আমার পাগলামির কথা আমাকে বুঝিয়ে দিতে লাগলো।

শুধু দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। এক পাও এগিয়ে যেতে পারলাম না। বলতে পারলাম না একটিও কথা।

মনে মনে শুধু ভাবতে লাগলাম ওর বেদনার কাহিনী। কোথায় ব্যথা ওর;—কিসের ওর অভাব?

একবার মনে হলো, হয়ত এই চাকরির প্রয়োজন ওর আমার থেকেও বেশী। আর যে-মুহূর্তে এ-কথা মনে পড়লো, আমার সমস্ত মন বলতে চাইলো: আমি চাই না এ-চাকরি;—ও পাক, ও পাক!

আমি প্রাণপণে বলতে চাইলাম। কিন্তু কিছুতেই বলতে পারলাম না। কিছুতেই চাইতে পারলাম না, যেন এ-চাকরি আমার না-হয়ে ওর হয়। বারবার চেষ্টা করলাম। পারলাম না।

আর যতোই ব্যর্থ হতে লাগলাম,—নিজের 'পরে, পরিবেশের 'পরে, সমাজের 'পরে, দেশের 'পরে,—অসহ্য রাগ হতে লাগলো আমার। নিজের হীনতা যতোই আমাকে পীড়া দিতে লাগলো, ততোই প্রাণপণে তার হাত থেকে আমি মুক্তি পেতে চাইলাম। কিন্তু সে আমাকে ছাড়লো না। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, যে-জগৎ আমার এই মন গড়ে দিয়েছে, মনে মনেও তাকে পেরিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা নেই আমার। তার হাতে আমি একটা মাটির পুতুলের মতোই অসহায়।

এই অসহায়তার বোধ কোনদিন এমন করে বড়ো হয়ে ওঠেনি আমার কাছে—যেমন এখন উঠলো। কোন কথা বলতে পারলাম না আমি। শুধু কান্না পেতে লাগলো আমার।

আর এই মুহূর্তে যে-নাম আমি কখনো মানিনি, আর-কোনদিন স্মরণ করি নি, শুধু সেই নামই মনে এলো আমার। বারবার শুধু সেই নামই মনে মনে উচ্চারণ করলাম আমি। বারবার বললাম: হে ঈশ্বর! ওকে তুমি সুখী করো! ওর জীবনে শান্তি দাও, ভালোবাসা দাও!

আমি বারবার প্রার্থনা করলাম। শুধু ওর জন্যেই না, আমার নিজের জন্যেও;—একটু আগে যে-জগৎকে আমি ঘৃণা করেছি, তার জন্যেও।

একবারও আমার দিকে ফিরে চাইলো না মেয়েটি।

আর, ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমি কেবলই ভাবতে লাগলাম: অচেনার অকূল অন্ধকার থেকে এই মুহূর্তে ও যে আমার চিরদিনের চেনার জগতে চলে এসেছে, এ-কথা কী করে ওকে আমি বলি! কেমন করে বলতে পারি!

বলতে পারলাম না কিছু। কী করে বলা যেতে পারে ভেবে পেলাম না।

এমনি করেই কাটলো অনেকক্ষণ।

তারপর, এক সময় বৃষ্টি নেমে গেল। আমরা বেরিয়ে এলাম পথে। আমি উত্তরের পথ ধরলাম; আর, ও পশ্চিমের। এক মুহূর্তে চোখের আড়াল হয়ে গেল ও।

আমি শুধু একবার ভাবলাম, জীবনে আর কখনো কি ওর সঙ্গে দেখা হবে আমার? হয়ত হবে না কখনো; হয়ত-বা হবে। হয়ত আকাশে সেদিন এমন মেঘ থাকবে না, এমন অন্ধকার হয়ে থাকবে না চারিদিক, হয়ত আকাশভরা থাকবে সূর্যের আলো। কিন্তু অতো আলোতেও সেদিন ওকে কি আমি আর চিনতে পারবো?

চিনতে কি পারা যায়? জীবন থেকে যে-মুহূর্ত একবার চলে যায়, সে কি আর ফিরে আসে!

একটি নতুন গল্পের প্লট

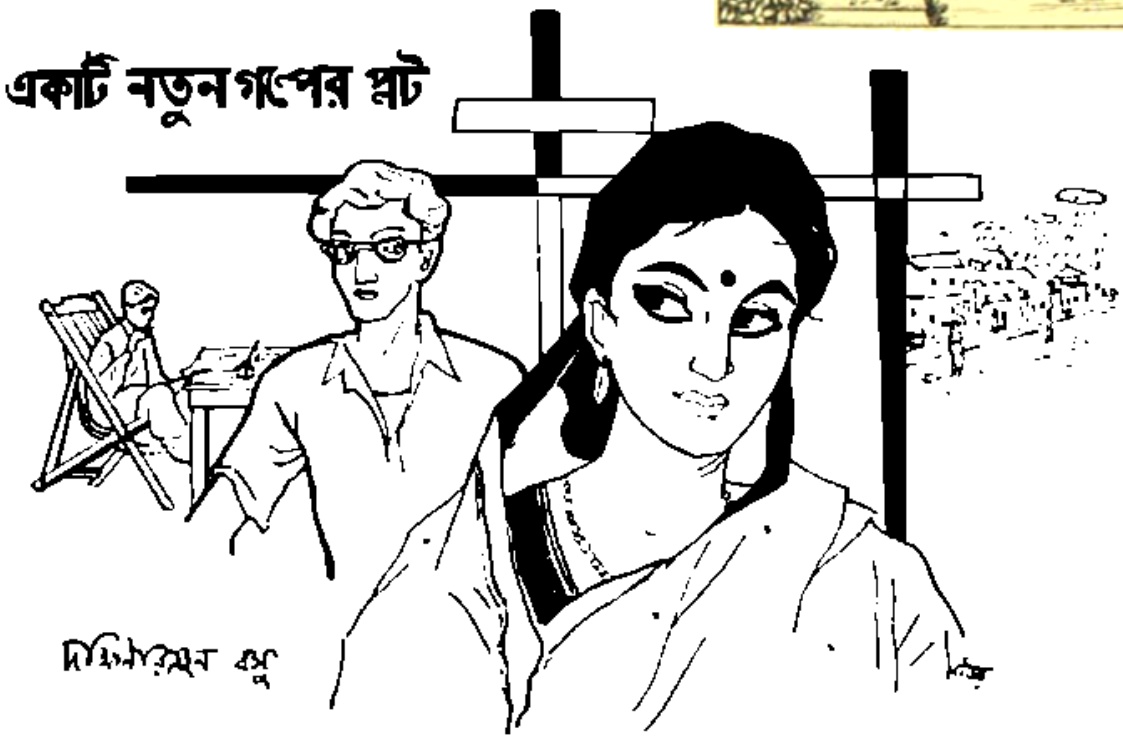

গল্পের প্লট খুঁজে খুঁজে পল্লব হয়রান।

কোন সন্দেহ নেই সত্যিকারের নামকরা গল্প-লিখিয়ে পল্লব রুদ্র। তা হলেও মগজটা তো আর মেশিন নয়। সব কটা পত্র-পত্রিকা একই সঙ্গে গল্প চাইলে সে তাগিদ মেটানো শিবেরও অসাধ্য। তবে যারা আগাম টাকা গছিয়ে দিয়ে গেছে তাদের দায় তো আগে মেটাতেই হবে। অনুরোধ রক্ষার চিন্তা তার পরে।

কে? অমৃত না!—কতোকালের পুরোনো একটা নাম হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে এলো পল্লবের প্রায় সতেরো-আঠারো বছর আগের পুরোনো সহপাঠীকে দেখে।

হ্যাঁ, কিন্তু তুমি এখানে? কাগজে কাগজে যে পল্লব রুদ্রের লেখা পড়ে আমরা গৌরব করে বেড়াই তাকে এই উদ্বাস্তু কলোনীর জল-কাদায় এমনি ঘুরে বেড়াতে দেখবো তাতো ভাই স্বপ্নেও ভাবিনি। উঃ কতোকাল পরে দেখা!—বলেই পল্লবকে একেবারে পরম আনন্দে জড়িয়ে ধরে অমৃত ঘোষাল। তারপর তার বন্ধুকে নিয়ে যায় তার নিজের বাড়িতে।

সেখানে বসেই যতো আলাপ।

বৃষ্টি নেমেছে টিনের চালে বৃষ্টির ঝুপ ঝুপ আওয়াজ বেশ লাগে পল্লবের। দেশবন্ধু কলোনীর প্রায় সবগুলো বাড়িই টিনের। বৃষ্টির আওয়াজ তাতে আরো জমাটি হয়ে উঠেছে। ঘোষাল খুব খুশি। বন্ধুকে সে অনেকক্ষণ আটকে রাখতে পারবে।

আজ তো ভাই মহরমের জন্যে সব অফিসই ছুটি। নিশ্চয়ই তোমারও কোনো তাড়া নেই। বেশ ভালোই হয়েছে, এই বাদলা দিনে গল্পে গল্পে একটা বেলা খুব আনন্দে কাটিয়ে দেওয়া যাবে। কি বলো, কোনো আপত্তি নেই তো?—ঘোষাল তবু জেনে নিতে চায় বন্ধুর সুবিধে-অসুবিধের কথা।

না না, আপত্তির আবার কী থাকবে! তবে একটা ব্যাপার কি জানো, আমার আফিসে কোনো ছুটি-ছাটার বালাই নেই। কাজেই যতোটা সম্ভব তাড়াতাড়িই বেরুতে হবে।

এ আবার তোমাদের কেমন আফিস হে, মহুয়ার দিন পর্যন্ত ছুটি নেই!—অমৃত বিস্ময় প্রকাশ করে পল্লবের কথায়। তবে পরক্ষণেই অবশ্য তার সেই বিস্ময়ের ঘোর কেটে যায় যখন তার বন্ধু তাকে বুঝিয়ে বলে যে, জীবনের ঘাটে ঘাটে নানা রূপের নানা রসের সন্ধান করে বেরাই তার কাজ এবং কোনো সময়েই সে কাজে বিরতি নেই—দুঃখ-বেদনার পরিবেশেও নয়, উৎসবের আনন্দেও নয়।

ঠিক আছে, বৃষ্টিটা না থামলে তো আর যাওয়া হচ্ছে না। তার আগে আমার গিন্নীর সঙ্গে তোমার পরিচয়টা অন্তত হয়ে যাক। তারপর না হয় দেখা যাবে কতোক্ষণ থাকতে পারো না পারো।—এটুকু বলেই ঘোষাল সেই পুরোনো কালের 'কই গো' বলে একটা হাঁক ছেড়ে গৃহিণীকে এনে হাজির করে বন্ধুর সামনে।

বাহে, এযে আমাদের মহুয়া! তুমি কার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছ হে অমৃত?—পল্লব চমকে ওঠে ঘোষাল-গৃহিণীকে দেখে।

তোমাদের মহুয়া মানে?—অমৃত জিগ্যেস করে।

মানে কিছুই নয়, ও আমার এক মাসীমার ভাসুর-ঝি। ওরা তো সব ধানবাদে থাকতো। তোমার ঘরে কবে এলো মহুয়া?

থাক থাক, ও নিয়ে আর এখন গবেষণার দরকার নেই কোনো। তোমার তো একটা কিছু পেলেই হলো, অমনি একটা গল্পের প্লান করে ফেলবে। ওসব চলবে না কিন্তু, আগে থেকেই বলে দিচ্ছি পল্লবদা!

বাঃ, তুমি যে আগের মতোই এখনো আছো দেখছি!

সে কি কথা, এরি মধ্যে আমি পাল্টে গেলে তুমি বুঝি বেশ খুশি হতে পল্লবদা?

না না, তা বলছি না। তবে····

কিন্তু মনটা খুব বেশি না পাল্টালেও আমার শরীরটা যে অনেকখানি বদলে গেছে তা বুঝি চোখেই পড়েনি তোমার? আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি একটু বোসো পল্লবদা, আমি এক্ষুনি তোমার চা-টা নিয়ে আসছি।—পল্লবের কথার আধটুকরো চিলের মতো ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে নিজের কথাটুকু বলেই পাশের চিলতে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকে পড়ে মহুয়া।

তা হলেও এই সময়টুকুর মধ্যেই মহুয়ার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই পল্লব স্টীমারের ফ্লাশ লাইটের মতো চট করে একবার চোখ বুলিয়ে নেয় তার বন্ধু-পত্নীর গোটা চেহারার দিকে।

সত্যিই তো কেমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে মহুয়াকে! এমন রোগা তো কোনোদিন দেখিনি ওকে।—অমৃতকে শুনিয়ে শুনিয়েই এই মন্তব্য করে পল্লব। সে তার জবাবও পায় সঙ্গে সঙ্গে। বন্ধুর এ কথার উত্তর দিতে গিয়ে ঘোষাল যেন একটু মুখরই হয়ে ওঠে।

মানুষকে বুঝতে হলে তার জন্যে একটা মূল্য দিতে হয়, কি বলো বন্ধু! তুমি সাহিত্যিক মানুষ, এ বিষয়টা আমার চেয়ে তোমারই বেশি ভালো করে জানা থাকার কথা। তবে এটুকু জেনে যাও, মহুয়াকে বুঝতে গিয়ে আমাকেও অনেক মূল্য দিতে হয়েছে—সেই মূল্য আজো দিয়ে চলেছি। হালে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আর যেন সংসার রথের রশি টানতে পারছি না এই দুঃখ।—অমৃতের কথায় সহানুভূতিতে যেন নুয়ে পড়ে পল্লব। যাদবপুরে একটা রিসার্চ ইন্সটিট্যুটে কেরানীর চাকরিতে কতোই বা আর রোজগার! এখানকার সংসার এবং বর্ধমানে বাপ-মা ও ছোট বোনের খরচ সবই চালাতে হয় ঐ সামান্য আয়ে। সবদিক রক্ষা করতে

জনযাত্রা ঘরানার পেঁছিয়ে পালকি চলে।

বৌয়ের মন চলে তারও আগে। সোঁদামাটি আর

সিউলি ফুলের গন্ধে মন আনচান। বাপের বাড়ীর দেশ আর কতদূরে?

এতটুর যাত্রাপথ দুরন্তের কাব্য সহজ হোক

পূর্ব রেলওয়ে

উড়িষ্যার লোকশিল্পের নিদর্শনে।

দিয়ে সবার সামনে হঠাৎই অমলিনীর অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় অমৃতকে। একটু আগে তার চাকরির কথা বলতে বলতে যেমনি একটা আভাষ দিয়েছিলো সে। তারই ফলে বোধ হয় অমৃতের এই মানসিক অবসাদ, মনে মনে অনুমান করে নেয় পল্লব।

আসলে কিন্তু তা নয়। মহুয়াকে আজো সঠিক ভাবে বুঝে উঠতে পারেনি অমৃত, সেই ব্যর্থতার বেদনাই পরিষ্কার হয়ে ওঠে তার স্বীকৃতিতে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দুঃখের একটানা কাহিনীর বর্ণনা দিয়ে চলে অমৃত, আর পল্লব তা চুপচাপ শুনে চলে এক মনে। বাইরে তখনো অবিরাম বরষণ চলেছে।

হাঁ, মহুয়ার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে বানবাদে। জানোই তো গানের দিকে আমার একটা ভীষণ রকমের ঝোঁক ছিলো ছোটবেলা থেকে। কলেজের হয়ে অনুষ্ঠানে কতো গান গেয়েছি সে সব হয়তো একটু চিন্তা করলেই মনে করতে পারবে।

হাঁ, হাঁ, খুব মনে আছে।—পুরোনো কথা মনে পড়তেই উল্লসিত হয়ে ওঠে পল্লব, বন্ধুর কথায় সায় দিয়ে তাকে উৎসুক করার চেষ্টা করে।

তারপরে এক সময়ে ভালো গাইয়ে বলে আমার নামটামও বেশ ছড়িয়ে পড়েছিলো চারদিকে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ডাক পড়তো, কিছু কিছু রোজগারও হতো তাই করে। তেমনি একটা অনুষ্ঠানেই একটি গানের দল নিয়ে গিয়েছিলাম বানবাদে। আমাদের গানবাজনায় খুবই খুশি হয়েছিলেন উদ্যোক্তারা। কিন্তু আমি বিশেষ ভাবে মুগ্ধ হয়েছিলাম সেই আসরে মহুয়ার দুখানা নাচ দেখে।

ও সেই নাচ দেখে মুগ্ধ হয়েই মহুয়াকে বিয়ে করে ফেলে বুঝি?—হঠাৎ একথা বলেই হো-হো করে হেসে ফেলে পল্লব। তার পরেই আবার প্রশ্ন করে, সেটা কোন বছরের ঘটনা বলো তো।

আজ থেকে ঠিক ছ' বছর আগের কথা। আমার কাছ থেকে প্রচুর বাহবা পেয়েই হোক কিংবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক সেই অনুষ্ঠানের পর থেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে থাকে মহুয়া। কিন্তু সত্যি বলছি ভাই, এ আমি কখনো ভাবতে পারিনি যে একা একাই এক দিন সে তাকে বিয়ে করার দাবি নিয়ে আমার কাছে এসে উপস্থিত হবে। সেদিন আমি তাকে ফিরিয়ে দেইনি, বরং বলবো সে সময় তাকে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিলো না আমার পক্ষে। কারণ আমিও যে তাকে গভীর ভাবেই ভালোবেসেছিলাম। রেজিস্ট্রী বিয়ের পর দু'পক্ষের গার্জেনকেই আমরা চিঠি লিখে জানিয়ে দেই আমাদের বিয়ের খবর। আমার বাবা মা এ সংবাদে খুশি না হলেও কোনো প্রতিবাদ জানাননি, কিন্তু তীব্র প্রতিবাদ এসেছিলো মহুয়ার বাবার তরফ থেকে। তিনি পরিষ্কার ভাষায় চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছিলেন মেয়ের সঙ্গে তাঁদের সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দেবার কথা। সেই থেকে মহুয়া প্রায় একটানাই রয়েছে আমার কাছে, ছেলের মা হয়েছে, কিন্তু তবু আজো পর্যন্ত তাকে পুরোপুরি বুকে ওঠা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠলো না। ভীষণ রকমের একটা কিছুর অভাব তাকে যেন ভেতরে ভেতরে ক্ষয় করে দিচ্ছিলো। হাঁ, হাঁ, সত্যি সত্যি ক্ষয়রোগই হয়েছিলো মহুয়ার। তাকে সেই রোগ থেকে মুক্ত করতে সর্বস্বান্ত হয়েছি, কিন্তু তবু তো তার মুখে অনাবিল হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলতে পারলাম না ভাই!—এই বলে একটু যেন দম নেবার চেষ্টা করে অমৃত। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মন্তব্য করে পল্লব—

ও টি-বি হয়েছিলো মহুয়ার, তাই এই চেহারা!

'হ্যাঁ' বলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অমৃত। তক্তপোষের উপর বসা অবস্থায়ই গুরুগম্ভীর ভাবে আসন-বদ্ধ পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে কী যেন চিন্তা করতে থাকে।

ঠিক সে সময়ই পাশের এক ফালি রান্নাঘরের খোলা দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পল্লবকেই আর একবার দেখে নিচ্ছে নাকি মহুয়া? পল্লবের তাই মনে হলো। রান্নাঘর থেকে তাদের দুই বন্ধুর সব কথাই হয়তো মহুয়া শুনেছে। অমৃতের কোনো কথার হয়তো সে প্রতিবাদ করবে, তাও হতে পারে।

না, তা নয়। সামান্য একটু সময় পল্লবের দিকে তাকিয়ে থেকে একটু মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে মহুয়া। তার ঐ হাসি ও হিটারের আলোয় মহুয়ার ফ্যাকাশে মুখেও কেমন একটা রক্তিমাভা যেন ফুটে ওঠে।

পল্লবের মনে হয়, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব তার এখন চলে যাওয়াই ভালো। একটা নতুন গল্পের পক্ষে যথেষ্ট মাল-মশলা তার পাওয়া হয়ে গেছে। আর বেশিক্ষণ থাকতে গেলে তার বা মহুয়ার কোনো কথাবার্তা বা চালচলনে অমৃতের মনে যদি কোনো রকম সন্দেহ দেখা দেয় তা হলে সে এক বিশ্রী ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

কিন্তু চট করে এখন আর উঠেই বা যাবে কি করে পল্লব? চায়ের জলের গরম কেটলি নামিয়ে হিটারে লুচি ভাজতে শুরু করেছে মহুয়া। সেই চা-লুচি না খেয়ে কী করে সে ছাড়া পাবে? এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে অনেক অতীত স্মৃতিই যেন এক সঙ্গে দলা পাকিয়ে ওঠে পল্লবের সামনে।

এই মহুয়ার সঙ্গেই পল্লবের বিয়ের পাকাপাকি প্ল্যান করে রেখেছিলেন তার মাসীমা, তার মায়ের কাছ থেকেও মাসী কথা আদায় করে নিয়েছিলেন। এবং সে কথা জেনেই ওরাও দুজনে অনেকখানি ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলো এক সময়। কিন্তু হঠাৎ বেঁকে বসলেন পল্লবের বাবা, নাচিয়ে বৌ ঘরে আনতে তিনি নারাজ হলেন। তা জানাজানি হবার পরেই মহুয়ার নিরুদ্দেশ হবার খবর এসেছিলো পল্লবদের বাড়িতে এবং তারপর থেকেই সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে আছে তাদের দুই পরিবারের মধ্যে।

এই সেই মহুয়া!—রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে একবার ভাবে পল্লব। পরক্ষণেই চা-লুচি নিয়ে এসে হাজির হয় ঘোষাল-গিন্নী। পরিবেষণের পর সেখানেই সে বসে পড়ে পাশের মোড়াটি কাছে টেনে নিয়ে।

নাও খেয়ে নাও, তুমি কি ভয় পেয়ে গেলে নাকি পল্লবদা?—তাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে প্রশ্ন করে মহুয়া।

না, ভয় কিসের?

তাহলে অমন চুপ করে আছো কেন? সম্পূর্ণ ভালো হয়েই দুমাস আগে আমি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছি।

হাঁ ভাই, মহুয়া ঠিক বলেছে। তুমি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়েই ডানহাতের কাজটা সেরে ফেলতে পারো। এই তো সেদিনও ওকে পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে এলুম। ও এখন পুরোপুরি সুস্থ, তবে মুখে হাসিটি ফুটলেই এতো বড়ো একটা অসুখ যে হয়েছিলো তা আর বুঝতেই পারা যাবে না।—নিজের চায়ের কাপটি মুখের কাছে তুলে ধরতে ধরতে বন্ধুকে এ কয়টি কথা বলেই চায়ে চুমুক দেয় ঘোষাল। আর ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই গিন্নী গর্জে ওঠে।

থাক থাক, আমার মুখের হাসির জন্যে তোমার আর অতো ভাবতে হবে না। তুমি চুপ করে থাকো।

সে কি, তুমি এমনিভাবে চটে উঠলে কেন মহুয়া? কোনো অন্যায় কথা তো বলেনি অমৃত!—এই কিঞ্চিৎ তিরস্কারের পরেই এক টুকরো লুচি আপন মুখে পুরে দিয়ে পল্লব খুশি করে মহুয়াকে।

অন্যায় বলবো কি হে, ন্যায় বলে পার পাওয়াই

যে মুস্কিল! তবু তো তোমার সঙ্গে একটু হেসে কথা বলছে। তাতেই যথেষ্ট আনন্দ হচ্ছে। তবে আমার বেলায় এতো অকরুণ হবার যে কী কারণ আজো পর্যন্ত তা বুঝে উঠতে পারছি না। অথচ মহুয়া-মা'র ছেলে হয়ে আমি যে সব কাণ্ডকারখানা, যে সব পাগলামি করেছি সে সব গল্প শুনলে তোমারও হাসি পাবে —ঘোমটা মাথা নেড়ে নেড়ে রসিকতার সুরে উত্তর দেয় পল্লব।

পল্লব ভয় পায়, বন্ধু তার আবার কিছু টের পেয়ে গেলো নাকি!

না সত্যি সত্যি বলছি পল্লবদা, তোমার খাওয়ার যে নমুনা দেখছি তাতে একটা সংকোচ ও অনিচ্ছার ভাব বেশ স্পষ্ট ভাবেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর চেয়ে একেবারে না খাওয়াই ভালো। তোমার এটুকু অন্তত বুঝতে পারা উচিত ছিলো, আমার যদি টি. বি-ই থাকতো তা হলে তোমাকে অন্তত নিজের হাতে আমি কখনো খাবার তৈরি করে এনে দিতাম না।—একটা অভিমানের সুর বেজে ওঠে মহুয়ার কথায়। বলতে বলতে গলার স্বরটা যেন ধরে যায়।

এর পর আর কোনো কথা চলে না। গড়িমসি করাও চলে না। সব কটা লুচি পটল-ভাজাই চায়ের সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে ফেলতে হয় পল্লবকে।

মহুয়ার ভারি আনন্দ তাতে। এবং তার শেষ কথাটিই বাড়ি ফেরার পথে বার বার পল্লবের কানে ধ্বনিত হতে থাকে, 'আমার যদি টি. বি-ই থাকতো তাহলে তোমাকে অন্তত নিজের হাতে আমি কখনো খাবার তৈরি করে এনে দিতাম না।'

আজো তাহলে পল্লবকে তেমনি ভালোবাসে মহুয়া!

চিত্রশিল্পী মনীষী দে

অমল ঘোষ

আঁকাতে গড়াতে তফাত কী? প্রশ্ন করেন আচার্য। শিষ্য হাঁ করে থাকে। উত্তর করবে কী, গুরুর মুখের দিকে তার বিমুগ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ।

গুরুর যেন তর সয় না। নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দেন :

"গড়ি চার দিক, আঁকি এক দিক।"

পাঠশালা বা কলেজের ক্লাশের প্রশ্নোত্তর নয়। আচার্য অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কন পীঠের গুরু-শিষ্য সংবাদ।

গুরুদেব অবনীন্দ্রনাথ। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের তো অনেক শিষ্য। এই শিষ্যটি কে? অনুমান করা কঠিন বটে। কে আর। নন্দলাল হবেন নিশ্চয়। না। নন্দলালবাবু নন। এ শিষ্যটি নন্দলালের সমগোত্রীয় হলেও অন্য ধাঁচের।

গুরুদেব জানতে চান—ছবি হয় কোথায় কোথায়?

শিষ্য এবারও উত্তর করতে অপারগ।

স্বীয় জিজ্ঞাসার উত্তর স্বয়ং দেন আচার্য অবনীন্দ্রনাথ :

"ঘরে, কোণে, মনে হয় ছবি।"

আচার্য প্রশ্ন করেন : রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কোন দান, বলতো?

শিষ্য এবারে চটপট উত্তর করে :

"গান"

পেরেছে, পেরেছে এবারে! বেশ তো দান আর গানে মিলে গেছে।

এমনি অসংখ্য কথার উড়োপাখীদের মেলা বসেছে গুরু-শিষ্যের জীবনের ঘাটে মাঠে। সে মেলার রূপ-রঙ রেখা-রসে জারিয়ে ধরে রাখবে কে?

ধরে রাখবার জন্ত চাই তেমন শিল্পীদের যাঁরা বলতে পারেন:

"হাত যদি না-থাকত, কনুই দিয়ে আঁকতাম। কনুই না-থাকলে পা দিয়ে আঁকতাম। পা না-থাকলে আঁকতাম মন দিয়ে।"

আচার্য অবনীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য শ্রীমনীষী দে ঠিক ওই জাতের শিল্পী। আঁকা ছাড়া তাঁর কথা নেই। নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এই পঞ্চাশোত্তর পর্বেও তিনি এঁকে চলেছেন। একটি রেখার খোঁজ মনের আভাসে পেলেই হলো। ওই রেখাকে কেন্দ্র করে ছবি আত্মপ্রকাশ করতে লাগল যেমন করে আত্ম-প্রকাশ করে ফুলের-কুঁড়ি থেকে ফুল, ফুল থেকে ফল—অবিকল তেমনি। তবে ফুলের কুঁড়ির আবির্ভাবের জন্তে তো প্রকৃতির নানা পর্যায়ের কার্য কারণ আছে—ছবির রেখা ফুটবার প্রাক্-পর্বেও আছে অবশ্যই অঙ্কন আয়ত্ত করবার কঠোর শিক্ষা।

নানা দিক দিয়ে নানা ভাবে ছবিকে রূপ দেবার, রসোত্তীর্ণ করবার প্রয়াস পেয়েছেন শিল্পী মনীষী দে। অবনীন্দ্রনাথের হাতের জাদুকে আয়ত্ত করতে অসাধ্য সাধনে ব্রতী হয়েছেন তিনি।

প্রথম জীবনে একদিন আচার্য অবনীন্দ্রনাথের সমীপে এসে তরুণ মনীষী বলেছিলেন—আমাকে মানুষ করে দিন।

অবনীন্দ্রনাথ একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন তার দিকে। কী বললে ও! মানুষ করে দিন!

পরে বলেছিলেন—মানুষ হবার নাম করে কতজনে আসে, হয় বাঁদর। এত দিনে একটা বাঁদর এসেছে—যদি এটা মানুষ হয়।

ছবি আঁকার আরম্ভ তো হলো। একটা ছাগল এঁকে গুরুর কাছে সেটি নিয়ে হাজির করলেন মনীষী। এবার তাঁর নিজের কথায় এই ছাগল সম্বন্ধে অবনীন্দ্র-নাথের মন্তব্য শুনতে কেমন লাগে দেখা যাক—

"অবু দাদু তক্ষুনী সেই ছবিটির পেছনে এই কয়টি লাইন লিখে দিলেন। আজ আমার পাকা বয়সে মিলিয়ে দেখি—আর অবাক হয়ে যাই।

"ছিল এক শিশু ছাগ
সুখে পোষা বাড়ে—
হঠাৎ এক ভূত এসে
চাপ্‌লো তাহার ঘাড়ে।

ঘর ছেড়ে মাঠের দিকে
দিল সে দৌড়
বস্তি হতে লাফে লাফে গেল বহুদূর।

মরুভূমির মাঝে গিয়ে
খোঁজে সবুজ ঘাস
চারিদিকে দেখে শুধু
সোনালী নিরাশ॥"

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ মনীষীর ছবি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি প্রায়ই তাকে বলতেন কতক-গুলো স্কেচ আঁকতে যার উপরে কবিগুরুর ছিল কবিতা রচনার প্রবল ইচ্ছে। কিন্তু সেদিনকার চিরচঞ্চল মনীষী "আজ আঁকব, কাল আঁকব; এই আঁকি" করে করে জীবনে আর রবীন্দ্রনাথের সম্ভাবিত কবিতার জন্তে ছবি আঁকবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেননি। ফলে কেবল শিল্পী মনীষীই ক্ষতিগ্রস্ত হননি দেশবাসী বিশ্বকবির মনোজগতের এক অজ্ঞাত অধ্যায়ের রূপালী পরিচয় থেকে চিরবঞ্চিত হয়েছেন। দীর্ঘকাল বাদে এই দুর্ভাগ্য-কথা যখনই মনে পড়ে শিল্পী মনীষীর, তখনই তিনি দুঃখের ভারে নত হয়ে পড়েন।

মনীষী দে একরকম বলতে গেলে—জন্ম-যাযাবর। জীবনে কবির ভাষায় তিনি যে বস্তুটি একান্তভাবে কামনা করেছিলেন, সেই:—

"ধন নয় মান নয়
শুধু করেছিনু আশা
এতটুকু বাসা।"

মনীষীর কপালে জোটেনি। যদিও মধ্যে মধ্যে ধনভাগ্য তাঁর রীতিমত হিংসা করবার পর্যায়ে পৌঁচেছে তবুও এতটুকু বাসা স্থায়ীভাবে আজও তাঁর মিলেনি। একমাত্র হায়দরাবাদ ষ্টেট ব্যাঙ্কের দেওয়ালে একখানি মুরালের বাবত তিনি সমস্ত খরচা বাদে পেয়েছিলেন পনের হাজার টাকা। কিছু কাল আগে দক্ষিণ ভারতের শৈলরাণী ষ্টুডিও চিত্র প্রদর্শনীতে শ্রীমনীষী দের সাত হাজার টাকার উপরে ছবি বিক্রি হয়েছিল। দিল্লীর এক প্রদর্শনীতে ধনকুবের বিড়লা প্রায় তিন হাজার টাকা দিয়ে এই শিল্পীর একখানি ছবি কিনেছিলেন। তথাপি মনীষীকে জানবার যিনি সুযোগ পেয়েছেন, তিনিই জানেন টাকা কোনদিন শিল্পীকে ঐশ্বর্য মন্ত্রের নরকঙ্কালে নিক্ষেপ করতে পারেনি।

ছবি : মনীষী দে

শিল্পী মাত্রেই কিছুটা মেজাজী। মনীষী দে আবার মেজাজী-শিল্পী। একদকালে বোম্বাইয়ে এই মেজাজী শিল্পী কমার্শিয়েল আর্টের বিপুল ধনরাজ্যে রাজকাহিনীর নায়কের মত আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তারপর রাতারাতি তাঁর হরিদ্বারে আত্মগোপন যে মেজাজের নবরূপ প্রকাশের প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছিল, পরবর্তীকালে বাঙ্গালোরের এক জনাকীর্ণ রাস্তার উপরে নিজের ষ্টুডিও স্থাপনে তারই নবরূপান্তর ঘটেছে। অশান্ত শিল্পী জীবনের সুদীর্ঘকাল বাদে নূতন এক মেজাজে বর্তমানে ওই ষ্টুডিওতে সাধকের মত ছবি নিয়ে মেতে আছেন।

তাঁরই ষ্টুডিওতে বেশীর ভাগ সময় তিনি নতুন নতুন ছবি এঁকে কাটান। মধ্যে মধ্যে আচার্য অবনীন্দ্রনাথের যে প্রতিকৃতি মনীষী স্বয়ং এঁকেছেন তারই দিকে ধ্যানস্থ হয়ে তাকিয়ে থাকেন। এই কালজয়ী রূপকার যিনি এই পৃথিবীর রূপরস নিংড়ে নিয়ে দুনিয়াকে অপূর্ব চিত্রাবলী উপহার দিয়ে গেছেন, যাঁর অঙ্কনশৈলীর অনিন্দ্য সৌন্দর্য অরূপ রূপের সমুদ্রে রসের তুফান তুলেছে, সেই অমর চিত্রগুরুর দিকে মনীষীর নিবদ্ধ দৃষ্টি দেখলে সহজে অনুমান করা যায় যে গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণে অবিচলিত থাকতে শিল্প বদ্ধপরিকর।

আচার্য অবনীন্দ্রনাথের রঙের প্রলেপে রসের

প্রকাশকে মনীষী যুগান্তকারী বলে আখ্যাত করে থাকেন। "এমনটি আর কখনো এই পৃথিবীতে সম্ভব হবে" বলে বিশ্বাস করতে তাঁর বাধে। ঠাকুর বাড়ির গানের রাজা, রঙের রাজা, রসের রাজাদের কথা বলতে বলতে শিল্পী মনীষী দে মশগুল হয়ে উঠেন।

পঞ্চাশোর্ধে এই শক্তিমান শিল্পীর মধ্যে এমন একটি গম্ভীর অথচ স্নিগ্ধ রসের স্থিতি এসেছে যার বিকাশ নব নব রূপে, রঙে, বৈচিত্র্যে মনীষীর পরিণত বয়সের চিত্রকলাকে নিত্য নতুন সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত করছে। এমন গভীর স্নিগ্ধতা, এমন সুমধুর সৌজন্যতা ও গরিমাময় পূর্ণতম রূপের মনোমোহন প্রকাশ একালের অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে খুব বেশী সুলভ নয়। মনীষীর "ওয়াশের" ছবিগুলি সত্যিই যেন অরূপ রূপের স্বপ্নরাজ্যের রামধনুদের মর্তে আগমন।

টেকনিক-সর্বস্বতার সর্বগ্রাসী আক্রমণের কবল থেকে আত্মরক্ষা করে ভারতীয় শিল্পে আচার্য অবনীন্দ্র-ঐতিহ্য বহনকারী রূপে ও প্রকৃত সৌন্দর্য পূজারী হিসাবে শিল্পী মনীষী দে পরম ঐকান্তিকতায় এবং অশেষ নিষ্ঠায় যে চিত্রকলার সৃষ্টি করে চলেছেন —সে শুধু তাঁরই শিল্প প্রতিভার পরিচায়ক মাত্র

মাটির মানুষ — শিল্পী : মনীষী দে

নয়; ভারতের গৌরবময় শিল্প প্রয়াসের মহান নিদর্শনও বটে!

কবিশেখর কালিদাস রায় প্রণীত
সন্ধ্যামণি (কবিতা) ৫·৫০

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত
বরণীয় (জীবনী-সাহিত্য) ৫·০০

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত
শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ ৭·০০
—দর্শনে ও সাহিত্যে

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রণীত
বাঙ্‌লা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস
(১ম ও ২য় খণ্ড)

এ· মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

মাথার ওপর একটা চাল থাকার চাল অনেকেরি আছে। একখানা বাড়ী থাকায় বহু লোকেরি ঘর আকাশ-স্পর্শী হয়ে ওঠে আবার অনেকের বিস্তর কলিকাতায় যাঁদের বাড়ী নেই, ভাড়া বাড়ীতে যাঁরা থাকেন, তাঁদের বৌও আবার গোপন করে যান সে কথা। যেন কলিকাতায় বাড়ী না থাকা মস্ত অগৌরব।

সুন্দরী দিদীমার ভাসুরঝির স্বামী উকীল রিজেন্ট পার্কের সন্নিহিত অঞ্চলে ওর বাড়ী আছে শুনেছি। একদিন ওঁর স্বামীর চেহারাও দেখেছিলাম।

ভাসুরঝি বেশ মিশুকে লোক ভদ্র গহনা পরে বেড়াতে আসেন গল্পগুজব করেন নিজের সম্পদ বাখ্যা করেন আমরাও বলি, "ওঁর স্বামী মস্ত উকীল রিজেন্ট পার্ক অঞ্চলে দু' দুখানা বাড়ী। একখানা বাড়ী তো বড় রাস্তার ওপরে। প্রকাণ্ড।"

ইতিমধ্যে কলিকাতার বসন্তপ্রবেলো লোকজন বিব্রত হয়ে উঠল। রাস্তায় জল জমিয়ে পথচারীর বিপদ ঘটানো প্রকৃতির প্রিয় অভিপ্রায় হয়ে দাঁড়াল।

ভরা বসন্তে জলবাদলের মধ্যে এক অতিথি এলেন কী বর্ষা, কিংবা ভাদ্র কাদাড়ে ঠেকেছে বলে কাপড়েন আমরা তাকে আখ্যা দিলাম।

দিদীমা মাথায় বৃষ্টি-কেমিক্স দেওয়া হল, ঘরে চা খাওয়ানো হল আনন্দদের স্বাভাবিক ক্রিয়া আমরা করলাম।

চুপ চুপ হয়ে মাঝেমাঝে অবসর জানাতে লাগলেন এবং একপ্রস্থ
শুয়ে পড়লেন তাঁর সঙ্গে মাঝে

আমরা বিরক্ত হয়ে তাঁকে বিদায় দিলাম তাঁর কথাবার্তা, পরিচয় সমস্ত অকস্মাৎ বিরোধী বলেই মনে হল আমাদের সঙ্গেই অস্বাভাবিক নয়

প্রশ্ন করা হল, "এত ঘন্টা ধরে কোথায় ছিলেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "আলীপুর থেকে ফিরছিলাম।"

"এত বছর কলকাতায়?"

"আমি যেতে ওখানে যাই বেলা দশটা এগারোটার সময়ে। সারা দিন থাকি।"

"আজ তো বেলা নয়টা থেকে মোর বর্ষা শুরু হয়েছে।"

নিরুত্তর।

"আপনার বাড়ীর লোকেরা এত বলায় আপনাকে এইভাবে ছাড়লেন?"

নিরুত্তর।

"যদি কালীঘাটেই গিয়েছিলেন তবে সেখানেই আজ থাকলেন না কেন? আপনার বাড়ী কোথায়?"

"যাদবপুর।"

"এই না বলছিলেন টালিগঞ্জে?"

"হ্যাঁ, না, রিজেন্ট পার্কে আমার ভাই থাকে। ওখানেও মাঝে মাঝে থাকি কি না।"

আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলাম, এঁকে রাত্রে রাখা নিরাপদ নয়। যে দিনকাল পড়েছে। রাত্রে যদি উঠে চোরের দলকে দরজা খুলে দেন? এরকম এমন ঘটনা সম্প্রতি দক্ষিণ পাড়ায় ঘটেছে। আমরা স্থির করলাম এত বৃষ্টিতেও গাড়ী ভাড়া করে চাপরাসীকে দিয়ে ওঁকে স্বস্থানে প্রেরণই কর্তব্য।

কিন্তু ওঁর স্থান যে কোথায় সেটাই প্রশ্ন।

ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থেকে উঠে এলেন গৃহস্বামীর আশায়। বাড়ী ফিরতে ওঁকে তিলমাত্র বাধা দেখা গেল না।

আমাদের তিনি সগর্বে জানালেন যে "টালিগঞ্জের বাঁটুল উকীল আছেন না? উনি আমার ভাইএর বাড়ী ঘর ভাড়া নিয়ে বসেন।"

আমরা চমকিত হ'লাম। সুন্দরী পিসীমা দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করলেন, "কি বলছেন? বাঁটুল উকীলের নিজের বাড়ী ওখানা।" "না, ওটা আমার ভাই মোক্ষদামোহন মিত্তিরের বাড়ী।"

সুন্দরী পিসীমা ধৈর্য হারালেন, "আমার নিজের ভাসুরকির বাড়ী আমি জানি না! তার স্বামীর টালিগঞ্জে দু' দুখানা বাড়ী। একখানা নাকতলায়; একখানা রিজেন্ট পার্কে। আপনি তখন থেকে নানা এলট-পালট কথা বলে চলেছেন, আমি শুনে যাচ্ছি। আপনি লোক সুবিধার নন!"

বৃদ্ধাও ছাড়বার পাত্র নন, খনখনে গলায় শোনালেন, "আমার কথাটা লিখে রাখুন। খবর নিয়ে দেখবেন সত্যি। আমি চোর-জোচ্চোর নই।"

আমরা মধ্যে পড়লাম দু'জনের,—"থাক, থাক। এখন বৃষ্টি ধরেছে আপনাকে না হয় যাদবপুরের বাসে তুলে দি। গাড়ী তো এত জলে পাওয়া যাবে না। না হয় রিক্সা দেখা যাক।"

ভদ্রমহিলার ভিজে জামাকাপড় পুঁটলি বেঁধে দিলাম, গাড়ীভাড়া বাবদ অর্থ দেওয়া হ'ল। তিনিও যাবার জন্য ব্যস্ত হলেন।

সুন্দরী পিসীমা গজ্‌গজ্‌ করতে লাগলেন, "ধাপ্পাবাজ একটা। চালিয়াৎ।"

যাই হোক ভদ্রমহিলা বিদায় হ'লেন। চাপরাসী একটু পরে ফিরে এসে খবর দিল যে রিক্সা যেতে রাজী হল না, অন্য কোন গাড়ী পাওয়া গেল না। বাস যাদবপুরে যাচ্ছে না। মহিলা যেখান থেকে এসেছেন, সেখানেই ফিরে গেলেন।

আমি অস্বস্তি বোধ করলাম, "এই ভিজে দিনে, জলের মধ্যে অমন বুড়ো মানুষকে বাড়ীতেই রাখা উচিত ছিল।"

সুন্দরী পিসীমা তেড়ে এলেন, "অমন মিথ্যেবাদীকে বাড়ীতে কেউ ঠাঁই দেয়! ওঁর ভাইএর বাড়ী বাঁটুল ভাড়া নিয়েছে। মরে যাই। অত বড়লোকের বোন হ'লে পরের কাপড় পরে পরের পয়সা নিয়ে গেলি যে বড়! কই, ফেরত দিয়ে যাবি একবারও শুনলাম না তো?"

আমরা আর মাথা ঘামালাম না। যদিও বর্ষার তাণ্ডবের দিকে চেয়ে আমার মনে হ'ল কাজটা অন্যায়

হয়েছে। ওই শীর্ণ বৃদ্ধা এত জলে কোথায় গেলেন ?

কয়েকদিন পরে বাঁটুল-গৃহিণী এলেন। সুন্দরী পিসীমা অথর্ব হয়ে পড়ায় তিনি আর যেতে পারেন না, ভাসুরঝিই মাঝে মাঝে আসেন।

সুন্দরী পিসীমা তৈরি হয়েই ছিলেন। আমাদের বল্লেন, "এখন হাতে-হাতে বেটীর ছলনা ধরিয়ে দিচ্ছি, দেখে নাও।"

ভাসুরঝি ভালভাবে আসন নেবার আগেই সুন্দরী পিসীমা গলা ছেড়ে বলে উঠলেন, "শুনছি রিজেন্ট পার্কের বাড়ী না কি বাঁটুলের নিজের নয় ? ও-বাড়ী নাকি মোক্ষদামোহন মিত্তিরের ! ওর বোন শুনিয়ে গেল। বাঁটুল ভাড়া নিয়ে বসে। ধাপ্পাবাজ—"

বাঁটুল-গৃহিণীর মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সুন্দরী-পিসীমা কি বলতে চান শেষটা না শুনেই তিনি তাড়াতাড়ি বাধা দিলেন, "না, না। তা ভেব না কাকীমা। জামাই তোমাকে ধাপ্পা দেয়নি। মানে —আর কি—হয়েছে কি না—নাকতলায় নিজেদের বাড়ীখানা বড্ড ভেতরে। মক্কেল যেতে চায় না। তাই—এই আর কি--মানে ভাড়াই নিয়েছেন ঘরখানা। মানে—আমাদের ভাড়া বাড়ী শুনতে আরকি—তুমি নিজের বাড়ীই শুনেছ। মোক্ষদা-বাবুরই বাড়ী। জামাই বলেন বলেই—আরকি—নিজের বলা হয়।"

হাসি সংবরণ করা সকলের দায় হল সুন্দরী পিসীমার মুখভাব দেখে।

আমি শুধু ভাবতে লাগলাম, চাল থাকার চালে সেদিন বর্ষায় একজন অসহায়ের মাথার উপর থেকে চাল সরে গেল। সেই বৃদ্ধার হ'ল কি ? নিউ-মোনিয়া হ'ল কি না কে জানে !

জওহরলাল নেহরুর
প ত্র গু চ্ছ
দাম—দশ টাকা

বুদ্ধদেব বসুর নতুন বই
একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু
দাম—তিন টাকা

প্রাণতোষ ঘটকের নতুন উপন্যাস
রাজায় রাজায়
দাম—নয় টাকা

ডঃ সত্যনারায়ণ রচিত
হিমালয়ের অন্তরালে
দাম—চার টাকা

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
মহাচীনের ইতিকথা
দাম—সাত টাকা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
কাব্য-সঞ্চয়ন
দাম—সাড়ে পাঁচ টাকা

নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী সম্পাদিত
কাব্য-দীপালি
দাম—সাত টাকা

অজিত দত্ত
জানালা (কাব্যগ্রন্থ) ২·০০

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন সংকলিত
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস
প্রথম খণ্ড। দাম—সাত টাকা

সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত
পৌরাণিক অভিধান
দাম—সাত টাকা

বুদ্ধদেব বসু
কালিদাসের মেঘদূত
দাম—দুই টাকা।

দীপক চৌধুরীর উপন্যাস
ঝড় এলো
দাম—পাঁচ টাকা

অন্নদাশঙ্কর রায়ের
জাপানে ৬·৫০

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

ভবানী মুখোপাধ্যায়।

বিনু চুপ করে চিৎ হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে, মাথার নীচে হাত দুটি রেখে একমনে ভাবছে উঁচু করে রাখা হাঁটু দুটো যদি মাউন্ট এভারেষ্ট হত, আর সেই দুর্গম পথে সে যদি গিয়ে পৌঁছাত তাহলে সত্যি একটা মজা হত। হাঁটু দুটি ঐ ভাবে রাখার ফলে এক ফালি জানলার ফাঁকে ধূসর আকাশ আর কারখানার চিমনিগুলি দেখা যাচ্ছে না! জানলার ফ্রেমে যেন একটা বাঁধানো তৈলচিত্র, দিনের পর দিন সেই একই ছবি একমনে দেখে বিনু। শুধু মেঘের রঙ পালটায়, কোনোদিন বা নীল কোনোদিন বা ধূসর, কোনোদিন একেবারে অন্ধকার। এই জানলাটা যদি না থাকতো—বিনু শিউরে ওঠে!

ছোট্ট কুঠরী, এক চিলতে সরু কামরা, সিঁড়ির ওপরকার চিলের ছাত, দক্ষিণদিকে একটা দরজা, আর পশ্চিম পাশে ছোট্ট এই জানলাটা—কিন্তু জানলাটা ছোটো হলেও তার ভেতর দিয়ে পাওয়া গেছে সীমাহীন আকাশের ইশারা। এই কি কম লাভ। এই ঘরে একা থাকে বিনু। ঠিক একা নয়, কড়ির ফাঁকে কয়েকটা চড়াই পাখীর বাসা আছে, তারা ঘরময় ঘুরে বেড়ায়। বিনুকে গ্রাহ্য না করেই মাকড়সা ধরে, কাছে গেলে হালকা হাওয়ায় গা ভাসায়, যেন বিনুকে একটু করুণার চোখে দেখে। ওরাও ত' বিনুর মতই একা।

ওরা যখন ঘর ছাড়িয়ে মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়ায় তখন যে ওরা কি ভাবে, বিনুর কাছে তাও অজানা নয়। বিছানায় শুয়ে ওদের ভাষা সে দখল করে ফেলেছে। ওরা তার আপন জন।

সামনে সমস্ত দিন পড়ে আছে, এই রকম আরো আঠাশটা দিনও কাটবে। একই তাদের আকৃতি। অতি পরিচিত, বৈচিত্র্যবিহীন ক্লান্ত বিষণ্ণ দিন। আশা নেই, আশ্বাস নেই, আনন্দ নেই। গরমের ছুটি এই ভাবেই কাটবে—সকালে ফেরিওয়ালারা হাঁকবে কলা আর শশা, বোম্বাই চাদর,দই চাই দই; দুপুরে দুটোর পর ঝাঁকা মুটের মাথায় পেতলের বাসন চড়িয়ে কাঁসারি একটা ঘোলা কাঁয়দা করে তালে তালে বাজাবে, তারপর চিনাবাদাম,—ওদের যেন বাঁধা রুটিন আছে। বিনু পায়ের শব্দ শুনে চোখ বুজিয়ে বলতে পারে এবার কে যায়।

মা বাড়ীর কাজ করছেন, হয়ত রান্নাঘরে হাঁড়ি চড়িয়ে ছুটো ময়লা কাপড় জামায় সাবান দিচ্ছেন, নয় কয়লা ভাঙছেন, কিংবা কয়লার গুঁড়ো দিয়ে গোলা পাকাচ্ছেন, সকালের ধোয়া ঘর এখন একবার ভালো করে মুছছেন, আর মাঝে মাঝে বিনুকে স্নান করার তাগিদ দিচ্ছেন। খেয়ে নিয়ে যা হয় কর, কেন মিছিমিছি দেরী করিস। বাবা সেই সাতসকালে উঠে, অভাবের একঘেঁয়ে ফিরিস্তি আর একবার আউড়ে অফিসে দৌড়েছেন। নতুন সাহেব নাকি ভয়ানক কড়া, দশটা বাজলে আর খাতা থাকে না। লাল কালির দাগ পড়ে, তারপর অপমান, গালাগাল, মাইনে কাটা ইত্যাদি।

বিনু ভাবে বড়ো হয়ে আর যাই করুক চাকরী সে করবে না। যাতে মানুষকে অপমানিত হতে হয় সে কাজ মানুষ করে কেন? নিরালায় বসে বিনু আপন মনে ভাবে, তার ভাবনার অংশী নেই; কোনো অজ্ঞাত কারণে তার আর একটিও ভাই বোন নেই যে তাদের ঘুম পাড়াবে, বা তাদের নিয়ে একটু খুন-সুটি করবে। মাকে প্রশ্ন করে কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় না। তাই এখন আর সে কিছু জানতে চায় না। এই অদৃষ্টের সঙ্গে আপোষ করে নিয়েছে। পরাজিত কিন্তু বিস্ময়ের ঘোর কাটে নি—যেখানে খুসী সে ছুটতে পারে, কোথাও হারিয়ে যাওয়ার বাধা নেই, আকাশের মেঘের গায়ে হেলান দিয়ে ভেসে বেড়াতেই বা কে মানা করবে?

পায়ের ওপর পা চাপিয়ে তার ওপর ধামসানো বিছানার চাদরটা চড়িয়ে ভালো করে তুষারাবৃত মাউন্ট এভারেষ্ট তৈরী করল বিনু, কল্পনার পক্ষীরাজ যেখানে খুসী যেতে পারে; এই তার মস্ত সুবিধে। কিন্তু শুধু পর্বতশৃঙ্গে উঠে তেনজিংয়ের লাভ করে কি সুখ। একটা সজীব সাথীর প্রয়োজন, কারো তাঁবে নয়, শুধু বিনুর একমাত্র আজ্ঞাবহ বশংবদ ভৃত্য, বন্ধু

অনুবাদ সাহিত্য

ডাক্তার জিভাগো ● পাস্টেরনাক

অনুবাদ—মীনাক্ষী দত্ত ও মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতার অনুবাদ—বুদ্ধদেব বসু

সম্পাদনা—বুদ্ধদেব বসু

১৯৫৮ সালের সুধাবরপ্রাপ্ত বিশ্ববিশ্রুত উপন্যাস। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। দুচার কয়েকজন আগে পাস্টেরনাক বলেছিলেন, "আমি আমার বুকের রক্ত দিয়ে 'ডাক্তার জিভাগো' লিখেছিলাম।" তেরো ও বুক-এর পরে অন্য কোন রুশ লেখকের রচনায় মানিয়ের দয়া এমন ঈশ্বরভাবে অনুভূত হয়নি। এই উপন্যাসের দশ লক্ষ কপি বিক্রী হয়েছে আমেরিকায় আর সাড়ে তিন লক্ষ কপি ব্রিটিশ কমনওয়েলথে। ॥ দাম বারো টাকা পঞ্চাশ ন.প. ॥

★

শেষ গ্রীষ্ম ● পাস্টেরনাক

অনুবাদ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'ডাক্তার জিভাগো' ছাড়া যদিও পাস্টেরনাক একটি মাত্র উপন্যাস লিখেছিলেন, সেটি 'শেষ গ্রীষ্ম'। এই গ্রন্থের মূল আখ্যানের ঘটনাকাল ১৯১৩ সালের গ্রীষ্ম ঋতু; মানবিকতা শাশ্বতি ও স্বাধীনতার সেই গ্রীষ্মই শেষ, তবুও স্বাক্ষির প্রতি শ্রদ্ধা ছিলো ঈষানের, চুমার চেয়ে ভালোবাসাই ছিলো সহজ ও স্বাভাবিক। ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক উভয় দিক থেকেই 'শেষ গ্রীষ্ম' মহনীয় গ্রন্থ। ॥ দাম তিন টাকা ॥

★

সুখের সন্ধানে ● বারট্রাণ্ড রাসেল

অনুবাদ—পরিমল গোস্বামী

বর্তমান কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী হিসাবে স্বীকৃত বারট্রাণ্ড রাসেল মানুষ কিভাবে সুখান্বিত করে তুলতে পারে তা আলোচনা করেছেন এই গ্রন্থে। ॥ দাম পাঁচ টাকা ॥

★

স্তেফান জ্বোয়াইগের গল্প-সংগ্রহ [প্রথম খণ্ড]

অনুবাদ—দীপক চৌধুরী

বহু প্রতিষ্ঠার স্রষ্টাকারে তাঁদের কৃতক কথাশিল্পী হলেন স্তেফান জ্বোয়াইগ। বিশ্বসাহিত্যের আসরে সমধিক সমাদৃত। নিপুণ সুষমার উৎকর্ষে, চরিত্রচিত্রণের নিপুণতায় ও কাহিনীর মনোহারিত্বে স্তেফান জ্বোয়াইগ-এর এই গল্প-সংগ্রহের প্রতিটি রচনাই চিরকালীন সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ। ॥ দাম পাঁচ টাকা ॥

রূপা

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী

১৫, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩-১২

সহসা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিনু। সেই দীর্ঘশ্বাস সারা ঘরটাকে যেন ছেয়ে ফেলে, যেমন সকালের প্রভাতী আলো মুদিত চোখের পাতায় এসে আছাড় খায়। অন্ততঃ একটা কুকুর যদি থাকতো, এই পাশেই থাকতো তার বিছানা, দুজনে একই সঙ্গে ঘুম ভেঙে উঠতো। আজ্ঞাবাহী ভৃত্যের মতো মুখের সামনে চুপ করে বসে থাকতো আর লেজ নাড়তো। একান্ত ভাবে তারই কুকুর। দুজনে কত নতুন পরিকল্পনা করা যেত। পথে, ঘাটে, রেল-লাইনের ধারে বা পার্কে দুজনে একত্রে বেড়িয়ে বেড়াত। অন্য লোকে ঈর্ষাভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকতো। আকাশ যেখানে মাটির সঙ্গে এসে মিশেছে, জলার সেই শেষতম প্রান্তে বেতবনের পাশে দুজনে একসাথে গিয়ে, নীরবে বসে সূর্যাস্ত দেখতো। কত আনন্দ পেত বিনু, মাকে ফিরে এসে কত গল্পই না বলা চলতো, কি মজাই হত।

কিন্তু যা চাওয়া যায় তা পাওয়া যায় না। এমন একটা সহজ, সরল এবং সামান্য প্রার্থনা তাও পূরণ হয় না। কত দিন সে মাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে, মার কিন্তু সেই এক কথা, কুকুর পোষা সহজ নয়।

বিনু বলে—মা উমারা আমাকে একটা সুন্দর বাচ্চা দেবে বলেছে, কিছু খরচা নেই, ছোট্ট বাচ্চা, আমিই সব করবো, তোমাকে কিছুই করতে হবে না। আনি না মা—

মা বলতেন,—ছিঃ বিনু। আমাদের জায়গা কম ওপর নীচে এই ত' আড়াইখানা ঘর, কুকুর থাকবে কোথায়? আমাদের কি বাগান আছে? কুকুর খেলা করবে কোথায়? শহরে কুকুর পোষা শক্ত—

বিনু বলত—কেন মা, অনেকেরই ত' রয়েছে, উমাদের দুটো, দুলুদের একটা, পাটুদের তিনটে,—

বাধা দিয়ে মা বলতেন—আর তোমাকে হিসেব দিতে হবে না, ওদের আছে বলেই ভালো, কি খাওয়াবে কুকুরকে? পোষা কুকুরের হাঙ্গামা অনেক রে বিনু, অনেক ঝক্কি!

বিনু উৎসাহভরে বলে ওঠে—আমার খাওয়া থেকে অর্ধেক দেব মা, সে তুমি দেখে নিয়ো, তোমার কাছে চাইব না। মা হেসে বলতেন—আর তুই আধপেটা খেয়ে আরো রোগা হবি? তা ছাড়া তুই ত খাস ডাল ভাত, কুকুরের চাই মাংস, কাঁচা মাংস। রোজ মাংস তুই পাবি কোথায়?

এর পর বিনুকে চুপ করতে হয়। সে চুপ করে ভাবে।

ধীরে ধীরে বিছানা ছেড়ে দাঁড়ায় বিনু। হাফ প্যাণ্টটি বদলিয়ে গায়ে পেঞ্জিটা পরে নেয়। পথের কলরব আর আকাশের রোদ একই তালে বাড়ছে, চারিদিকে জীবনের জয়গান, কিন্তু বিনুর কাছে তা করুন ক্রন্দনের মতো শোনাচ্ছে, সবাই যেন এক সঙ্গে গলা ছেড়ে কাঁদছে। কি বিশ্রী কাণ্ড।

বিনু কিন্তু এই কান্নায় যোগ দেবে না, সে মহাশূন্যের অধিবাসী, সেখানে কলরব নেই, ক্রন্দন নেই, আছে শুধু অখণ্ড আকাশ আর সেই নীল আকাশের নীরবতা।

উমাদের বাড়ীর দিকেই ছুটলো বিনু। বাগানে দাঁড়িয়ে উমা তাচ্ছিল্যভরে রবারের বল ছুঁড়ে দিচ্ছিল আর উমার কুকুর ল্যাসিটা সেই বল কুড়িয়ে এনে এমন একটা মুখের ভঙ্গী করছে, যেন এইমাত্র একটা যুদ্ধ জয় করে বাড়ী ফিরেছে। উমার এমন একটা কুকুর থাকাটা যেন স্বাভাবিক কাণ্ড, কিন্তু বিনুর থাকতে নেই। তাহলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে।

উমার কুকুর আছে, মনে ফূর্তিও আছে, উমা বিনুকে দেখে খুশী হয়েছে, বলল—চল বিনু পার্কে এক পাক ঘুরে আসি, ল্যাসিটারও বেড়ানো হবে। দুজনের আগে ভাগে ছুটে চললো ল্যাসি, আর উমা বকবক্ করে ল্যাসির বুদ্ধি এবং গুণপনার বিশদ ব্যাখ্যা করে। বলে—ল্যাসিটার একটা শুধু দোষ চান

করতে চায় না, মা যদি বলে ল্যাসি চান করবি, অমনি মানুষের মতো হাঁচে, মানে আবার ঠাণ্ডা লেগেছে, চান করতে বোলো না।

দুজনে পথের ধুলো আর কাঁকর উড়িয়ে চলছে, একটু বড়ো ঢেলা পা থেকে ছিটকে গেলেই ল্যাসি সেটা কুড়িয়ে আনছে, এমনই হাজার বার। পথের ধারে বেড়াল দেখলেই ল্যাসি তাকে তাড়া করছে, উমা আর বিনু হেসেই গড়াগড়ি। ল্যাসির দুঃসাহসে তাকে আদর করা হচ্ছে।

বিনু হঠাৎ বলে ওঠে—উমা, তোমাদের ল্যাসিটা যেন আমারই কুকুর। অন্ততঃ অর্ধেকটা ত' তাই, সত্যি আমি যা বলি শোনে। শিস দিলে এগিয়ে আসে, এই আমার কুকুর পোষা হল। দেখ শিস দিলেই কেমন ছুটে আসবে।

উমা শুধু বলে—এ আর আশ্চর্য কি। অনেক দিন দেখছে ত'। ওরা মানুষ চেনে। কে কেমন তা জানে, বুঝতে পারে কিনা।

বিনু বলল—ঠিক বলেছ উমা, আমি একটা বই-এ পড়েছি, ওরা সবই বোঝে, সব জানতে পারে, কথা বলতে পারলে ওরাও মানুষ হত।

উমা হেসে বলল—তাহলে আর কি হত। কুকুর মানুষ হলে ত' আর কুকুর থাকতো না, মানুষ নিয়ে কি আর খেলা করা যায়? তাকে কি বলা যায় দৌড়ো, বল কুড়িয়ে আনো, এদিকে এসো, ওদিকে যাও?

বিনু এইবার একটু সাহস সঞ্চয় করে বলে—আচ্ছা তুমি একটু আড়ালে যাও, দেখি আমার কাছে থাকে কিনা?

উমা একগাল হেসে পার্কের মধ্যিখানে পুকুরের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। উমার কুকুর ল্যাসি কি একটা গবেষণায় মত্ত, এটা শুঁকছে, ওদিকে গিয়ে পা দিয়ে মাটি খুঁড়ছে, অকারণে দৌড়ে আবার হঠাৎ থমকে থামছে। উমার চলে যাওয়াটা লক্ষ্য করে নি। বিনু হাসল, তৃপ্তির হাসি। কিন্তু এই সুখ ক্ষণস্থায়ী। অনেক দূর থেকে উমার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুনে ল্যাসি নিদারুণ অবজ্ঞাভরে বিনুকে ত্যাগ করে সে দিকেই ছুটলো, পিছন ফিরে একবার তাকালো না।

একা আনমনে বেড়ায় বিনু। এদিকে ক্ষিদেও একটু যেন পাচ্ছে, বেলা বাড়ছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে উমাকে যখন আবিষ্কার করল, তখন দেখা গেল উমা ল্যাসিকে কোলে তুলে আদর করছে। মুখে তার অধিকারের আনন্দ, চোখে গর্বিত হাসির ক্ষীণ রেখা। নীরবে দুজনে পুকুরধারে কিছুক্ষণ বেড়ালো।

সেই রাতে হ্যারিকেনের সামনে সেলাই-করা কাঁথাটা বেশ করে গায়ে জড়িয়ে দুলে দুলে পড়া মুখস্থ করছিল বিনু, আর মাঝে মাঝে মার মুখের পানে তাকাচ্ছিল। তিনি কাঠকুটো দিয়ে তোলা উনুনটায় আগুন দিয়ে লোহার ইস্ত্রিটা তাইতে চাপিয়ে গরম করছেন। বিনুর জামা প্যাণ্ট ইস্ত্রি করতে হবে। বিনু সেই দিকে চোখ রেখেছে।

মা হঠাৎ বিনুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন—হ্যাঁ রে বিনু, আজ কি রকম বেড়ানো হ'ল কিছু বললি না তো?

—ভালো মা।

—কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলি?

—পার্কে।

—তোদের ঐ একঘেয়ে পার্কে! নতুন কোথাও যেতে পারিস না, ঐ যে কি একটা নতুন রাস্তা বেরিয়েছে, প্রকাণ্ড চওড়া। সেখানে গেলেই পারিস।

—সেদিকে যেতে ভালো লাগে না মা, তেমন লোকজন নেই এখনো।

—তোর কি হয়েছে রে, এমন মনমরা হয়ে আছিস?

—না তো মা।

—কিছু হয়েছে একটা, বল না আমাকে—

—কই, কিছু না তো।

কল্পনানেত্রে বিনু দেখে উমার পাশ ঘেঁসে ল্যাসি

হয়ে আছে, উমার মুখের দিকে তাকিয়ে। উমা মাঝে মাঝে মুখে হাতে আদর করছে আর পড়া মুখস্থ করছে, মাঝে মাঝে ল্যাসির কান মলে দিচ্ছে, ল্যাসি তাতেই খুশী হয়ে আনন্দে লেজ নাড়ছে, হাই তুলছে, আবার ক্লান্ত হয়ে চোখ বুজছে। সেই উদ্বাস্ত বিনু এখানে বসেই অনুভব করছে। একটা নিদারুণ ঈর্ষায় সমস্ত মন বিষিয়ে উঠলো বিনুর তার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করছে, ইচ্ছে করছে চীৎকার করে কাঁদে। উমাটার যদি কুকুর না থাকতো! শুধু কুকুর! উমার একটি ছোট্ট ভাই আর বোন রমাও রয়েছে। ঈশ্বরের কি বিচার আর উমার এই সম্পদে তার কোনো অধিকার নেই শুধু উমার অনুমতি পেলে ল্যাসির গায়ে মাথায় হাত বুলোতে পারে। আর কখনো উমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে না বিনু। পরের কুকুরকে আদর করা নিরর্থক। উমার বেশ অহঙ্কার আছে, ল্যাসির জন্যে মনে মনে একটু গর্ববোধ করে উমা। আর কোনোদিন উমাদের বাড়ী যাবে না বিনু, কিসের খাতির, একটা কুকুরের জন্য এত।

তিনদিন বাড়ী থেকে বেরোল না বিনু। গলির মোড়ে গেলে পাছে উমার সঙ্গে দেখা হয় তাই মা কিছু কিনতে দিলে, অনেকখানি ঘুরে, স্কুল-বাড়ীর পাশ দিয়ে গিয়েছে। উমার ছায়া মাড়ানো হবে না। কিন্তু আজ আর থাকতে পারলো না বিনু, চারটে বাজতেই উমাদের বাড়ী ছুটে গেল। দোউড়িতে একা চুপ করে বসেছিল উমা ম্লান মুখে। কি যেন একটা হয়েছে, ল্যাসিটা জিভ বার করে হাঁফাচ্ছে না—

বিনুকে দেখে উমা সচকিত হয়ে ওঠে, একটু চমকে উঠে শুকনো গলায় বলে—কিরে বিনু, ক'দিন আসিস নি কেন?

—এমনই। তোমার ল্যাসি কই?

সে কথার জবাব না দিয়ে উমা বলে—চলো পার্কে যাই, অনেকদিন পার্কে যাই নি।

নীরবে দুজনে পার্কের দিকে চললো, চটি-জুতোর তাড়নায় পথের সমস্ত ধুলো উড়িয়ে।

অনেক পরে উমা অতি করুণ গলায় বলল—আমাদের আর কুকুর নেই বিনু। আকাশটা অত্যন্ত পরিষ্কার, যেন শরতের মেঘমুক্ত আকাশ, পার্কেও ফুল ফুটেছে প্রচুর। এমন একটা উজ্জ্বল মধুর দিনে একি দুঃসংবাদ। আমাদের কুকুর নেই!

চটি-জুতোর মুখের দিকটা হাঁ হয়ে গিয়েছে, বুড়ো আঙুল বেরিয়ে পড়েছে, সেই বুড়ো আঙুল দিয়ে একটা ছোট্ট ঢিল তুলে নেয় বিনু। তার এত আনন্দ কেন, উমার যন্ত্রণায় সে এত খুশী হয়ে উঠলো কেন? একমনে ভাবে বিনু। গলায় সমবেদনার সুর এনে বিনু প্রশ্ন করে—কেন রে, কি হয়েছিল ল্যাসির?

—টুটুলকে কামড়ে দিয়েছিল, বাবা তাই ওটাকে বিলিয়ে দিয়েছেন। ল্যাসির কোনও দোষ নেই, টুটুল ওর লেজের ওপর পা দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, কারো দোষ নেই। আমাদের বাড়ীটাও তো ভাই তেমন বড়ো নয়, তাই বাবা রাগ করে ল্যাসিকে তাড়িয়ে দিলেন—

উমার কণ্ঠে রাজ্যহারা অনাথার আর্তনাদ।

নিঃশব্দে দুজনে পুকুরের ধারে বসে আনমনে ঢিল ফেলতে থাকে। মাঝে মাঝে উমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর কাঁদে, বিনু সান্ত্বনা দেয়।

—কি রকম ভাবে বল কুড়িয়ে আনতো মনে আছে বিনু? কত বুদ্ধি ছিল ল্যাসির।

বিনু মাথা নাড়ে।

—ল্যাসিটাকে নিয়ে বড়োই আনন্দে দিন কেটেছে আমাদের, কি বলিস বিনু।

—নিশ্চয়ই।

—তুই না এলে ল্যাসি বেশ ছটফট করতো। তোকে ও ভারী ভালোবাসতো। একটা হলদে মাছরাঙা জলের ধারে এসে বসলো। বিনু সেই

দিকে তাকিয়ে রইল। হয়ত সত্যি কথা। উমা অকারণে মিছে কথা বলবেই বা কেন। স্নানের দিকে তাকিয়ে সমগ্র অবস্থাটা বোঝবার চেষ্টা করে বিনু।

বিনু বোকার মত প্রশ্ন করে—ল্যাসি আমাকে ভালোবাসে বলে তোমার রাগ হতো না উমা?

—দূর পাগল রাগ হবে কেন? তবে এখন আর আমাদের কিছুই রইল না। কুকুর না থাকার কি কষ্ট রে বিনু। তোকে কি বলবো—

বিনু বিজ্ঞের মতো বলে—সে আর বলতে।

দুজনে নীরবে কুকুর-হীন জীবনের অভিশাপ চিন্তা করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

অনেকক্ষণ পরে উমা বললো—এখন আর বাড়ী ফিরতে ইচ্ছে করছে না বিনু, আমার কুকুর নেই। টুটুলটাও ডাক্তারখানায় গেছে, কি যে করি!

আজ উমাকে ক্ষমা করে বিনু। আমার কুকুর বলে যতটুকু আনন্দ পায় পাক উমা, কুকুরের শোক যে কি মর্মান্তিক তা বুঝেছে বিনু।

সে ধরা গলায় বলে—আমাদের বাড়ীতেই না হয় চল। আমাদের বাড়ীতে দু তিনটে ঘর। তাছাড়া মাকে দেখে আসবি। মার কাছে তোর কথা অনেক বলেছি উমা। আমার ঘরটাও দেখে আসবি?

—তোর নিজস্ব একটা ঘর আছে?

—দুজনেই চুপচাপ। বিনুর ঐশ্বর্যে বিস্মিত উমা, আর বিনু সহসা বুঝেছে যে এই সংসারে সেও সম্পদবিহীন নয় তারও কিছু আছে।

উমা গম্ভীর গলায় বলে—তোর নিজের জন্য একটা আলাদা ঘর। তোর বরাতটা ভালো বিনু।

এখন আর কুকুর-হীন জীবনের বিষণ্ণ অন্ধকার বিনুর মনকে ছেয়ে নেই সে রিক্ত নয়। সত্যি বরাতটা খারাপ কি।

উমা আবার বলে—বেশ আনন্দে আছিস—না রে বিনু?

বিনু একগাল হেসে বলে—কি জানি ভাই, আনন্দ কোথা দিয়ে আসে, আর কোথা দিয়ে পালায় কে জানে।

উমা হয়ত বুঝলো, হয়ত বুঝলো না।

পথের ধুলো উড়িয়ে দুজনেই মহা উৎসাহে বিনুর ঘর দেখতে চলেছে, ল্যাসির কথা এই মুহূর্তে মন থেকে ধুয়ে মুছে গেছে।

আলোর রেখা

(গল্প)

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

অমর ভাবছে। তার সামনে অগাধ অন্ধকার সমুদ্র। এখন সে কি করবে? সেও কি দীপকের মতো এই পৃথিবী থেকে নিজের চিহ্ন মুছে দেবে? স্রেফ বালি ব্রীজের ওপর থেকে গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে! না, তাতে দীপকের মৃত্যু হয়েছে বটে, অমরের হবে না। অমর স্কুইমিং কম্পিটিশানে চ্যাম্পিয়ন হয়ে সোনার মেডেল পেয়েছিল! সে মেডেলের সোনাটুকু খাঁটিই ছিল, নইলে ছোটদির কানের ঝুমকো আর জলমদার আংটি তা দিয়ে তৈরী হতে পারত না। ছোটদির বিয়েতে আরো খুচরো কিছু কিছু সহায়তা অমরকে দিয়ে সন্তুষ্টপর হয়েছে। তার মধ্যে অবশ্য দীপকের দেওয়া একশটা টাকাও ছিল। আচ্ছা, অমর আত্মহত্যা করলে ছোটদির ডিস্টিবিউশান অনুষ্ঠানটা বাড়বে না ত? ছোটদি বড় ভালো মেয়ে, ওর কোনো ক্ষতি হবে এমন কাজ অমর অন্ততঃ জেনেশুনে করতে পারবে না।

কিন্তু কি করবে সে তাহলে! তাহলে কি ক'রে বেঁচে থাকবে? দাদা, মেজোদা দাদা, তার চেয়ে অনেকই আর বয়সে বড়! ওই ত চাকরির হাল। তাতে ক'রে কোনো রকমে দিন কেটে যায়, তাও মাসের শেষে কিছু ধার-দেনা হয়ে পড়ে। এর ওপর যদি অমরের পিছনে হস্টেল-চার্জ, কলেজের মাইনে ইত্যাদি জোগাতে হয়! পারবে না, দাদার পক্ষে এতখানি ভার বওয়া আদৌ সম্ভব। মাথা নাড়ল অমর।

তাহলে কি আর একবার প্রিন্সিপ্যালের কাছে গিয়ে কাকুতি-মিনতি করবে সে! অবশ্য তিন-চার বার বলেছে, অন্য প্রফেসার যাঁরা অমরকে স্নেহ করেন তাঁদের দিয়েও বলিয়েছে। কিন্তু প্রিন্সিপ্যালের মনটা কেরো-কংক্রীটের মশলা দিয়ে গড়া, এতটুকু নরম হবার নয়। তাঁর এক কথা, 'আয়িরবোধ যাদের এই বয়সে এত কম, বয়স বাড়লে সেটা আরো বাড়বে। লায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন নয় এমন মানুষের ওপর ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ ভরসা ক'রে দেওয়া চলে না। একটা বছর পেনাল্টি দিয়ে এসব ছেলেকে মজবুত করতে হবে।' অতএব, পরীক্ষার ফলাফল যতো ভালোই হোক না কেন, সেটা প্রমোশনে কিছুমাত্র সহায়ক হয় নি। অমর তাদের বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেও প্রোমোশন পায় নি। স্কলারশিপও বন্ধ হয়ে যাবে হয়তো।

লায়িত্ব! মনিটর হিসেবে দীপকের খবর অমরের

রাখা উচিত ছিল। সে যেদিন বাড়ি গেল সেদিন ব'লেও গিয়েছিল। বাড়ি যাওয়া মানে অমরদের বাড়ি। কলকাতায় সময়ই ছিল দীপকের স্থানীয় অভিভাবক। কাজেই, রাত্রে দীপক যখন ফিরল না তখন নিয়মমাফিক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট-এর কাছে খবর দেওয়ার কর্তব্যটা পালন করে নি অমর। দীপক তার অতিরিক্তম বন্ধু, দীপকের নামে কমপ্লেন করার কথা যে কল্পনাতেই আনা যায় না। তাছাড়া দীপক বেচারী এমনিতে অমরদা মুখচোরা ছেলে, বাড়ির আদরের ওপর তার লোভ একটু বেশি। অমর ভেবেছিল, হয়তো একটা দিন বাড়িতে থাকার বায়না দিয়েছে দীপক। কিন্তু পরের দিনও দীপক ফিরল না। ক্লাসে মন বসাতে পারে নি অমর। ছটফট ক'রে বিকেলের দিকে সুপারের কাছে 'অফ' নিয়ে বেরিয়ে গেল। দীপকের এই এলানো-ছড়ানো চালচাল মনিটর হয়ে অমর বরদাস্ত করবে কি ভাবে? তাকে যে জবাবদিহি করতে হবে!

সন্ধ্যের সময় তাকে দেখে সমর একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল। মা বললেন—তা আজকের রাতখানা ছুটি নিয়ে এসেছিস তো? তোর আজ জরুরি, তাহলে একটু পায়েস করি! আহা দীপুটা থাকলে বেশ হ'ত, পায়েস খেতে বড় ভালোবাসে!

অমর বলল—তাহলেই পায়েসটা খাইয়ো, আমার থাকা চলবে না।

—অমনি বাদুর গোনা হ'ল।

—মা, মা ওর জন্যে বলেছে আমার জন্যেই হয়ে যাবে। কাল থেকে বাদু বেপাত্তা! তা কখন গেলেন তিনি?

মা বললেন—কেন? সে তো কালই সন্ধেবেলা চলে গেছে।

—তার মানে! আজ সে বাড়িতে আসে নি?

সমর বসেছিল চৌকিতে, অমর দরজা ধরে দাঁড়াল—দাদা!

মা বললেন অপ্রসন্ন সুরে—ওরো বড় বজ্জিস ওরো কি তাড়াতাড়ি ফিরে যাচ্ছিস? বলি, বেরুবার সময় শিল্প তাকতে নেই তাও ভুলে মেরে দিয়েছ। সমু, একটু বসে যা—

দাদা অমরের তীব্র কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে বলে—কি রে! কি হয়েছে?

—দাদা, দীপুটা গেল কোথায় বলতে পারো?

সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে সমর বলল—চলো এখন থানায় একটা খবর দিয়ে হাসপাতালগুলো খোঁজ করা ছাড়া আপাতত: কিছু করার নেই। পরের ছেলের দায়িত্ব!

থানা, হাসপাতাল এ সবের কাজ চুকিয়ে ওরা দু'জনে ফিরে চুপচাপ বসেছে, হঠাৎ একবার খোঁজ করল। মৃদু। শেষে প্রিন্সিপ্যাল আলোপাত্র শুনে গম্ভীর হয়ে মনিটর অর্থাৎ অমরের নামে একটা কড়া 'কালো' দাগ মেরে দিলেন।

...সেই দিনের সব কথাই আজ নতুন ক'রে মনে পড়ছে অমরের। মনটা এমনই অস্থিরের হয়ে ছিল যে এর বাপাল আজো গেল না অমর ইচ্ছেটা তাই দীপকের পথ ধরে চলে যাবার জন্য উদ্গ্রীব। দীপক মরেছে। তার সেই লাশ দেখে শিউরে উঠেছিল অমর। তার 'অস্তিত্ব আজ' বন্ধু কি এই দীপকের মতো হতে পারে? বিশ্বাস হয় না, কিন্তু—আজ অমর যদি আত্মহত্যা করে তাহলে তার এই 'ফাইন এ্যাথলেটিক ফিগার'টাও ও এই রকমই হয়ে যাবে!

আরো একটু ভালো ক'রে গভীর ভাবে ভেবে দেখা দরকার। অমর না ভেবে, নিজের অজ্ঞাতসারে ওর হাতে ধরে ফেলে। একবার ভাবলে—এই যে দীপকটা হঠাৎ ক'রে মরল, এখন যে ওর মাকে কাঁকের এ্যালাইলামে রাখতে হচ্ছে, এই খবরটা পেলে অথবা অনুমান করতে পারলে দীপক নিশ্চয় মরার সাহস হারাত। মা। অমরেরও মা আছেন।

অমর সুইসাইড করলে তিনিও কি পাগল হয়ে যাবেন! কিন্তু অমরের দাদার এত টাকা নেই—আর তাই যদি থাকত তাহলে পয়সার অভাবে পড়াশুনা ছাড়ার দুঃখে কি ওই সুইসাইডের জন্য মাথা খারাপ?—অতএব অমরের সাধ্য হবে না মাকে ইমোশোনাল ব্লাকমেল করে ভাই করে খরচ চালানো। তা ছাড়া অমর-সমরের মাকে যখন ওদের বাবার মৃত্যুই পাগল করতে পারে নি তখন আঘাত যতো দুঃসহই হোক না কেন মা সামলে নিতে পারবেন! তা যদি না-ই হবে তবে কি করে পাঁচটা কচি-কাঁচা কোলে-কাঁখে নিয়ে আটশ বছর বয়সে বিধবা হয়ে, তাদের বাঁচানো, মানুষ করা তাঁকে দিয়ে হতে পারতো? না; দীপকের মায়ের সঙ্গে অমরের মায়ের তুলনাই করা চলে না।

দীপকের মা তো বড়লোকের মেয়ে ছিলেন। জীবনে কখনো আঘাত পান নি। না, পেয়েছিলেন! না, পান নি। তিনি আঘাত হেনে ছিলেন।...একটা অন্ধ আক্রোশে অমর মাটির ওপর জোরে-জোরে তিনটে ঘুষি মারল।

মিথ্যে কথা। বরাবর তিনি মিথ্যে কথা বলে এসেছেন ছেলেকে। জলজ্যান্ত একটা মানুষকে—যে মানুষ সুস্থ, সবল দেহে মাদ্রাজ, বোম্বাই থেকে কলকাতা অনায়াসে একুশা করে ফেরেন তাঁকে স্বচ্ছন্দে মেরে রেখেছিলেন দীপকের মা। তাঁর ছেলেকে কি ক'রে এতবড় একটা ধাপ্পায় ভুলিয়ে রেখে দিয়ে একুশ বছর কাটিয়ে ফেললেন!

তাই বুঝি সত্য চরম প্রতিশোধ নিল! সত্য যখন সত্যরূপে দেখা দিল তখন ছেলের জীবনটা পৃথিবী থেকে মুছে গেল। সে নিজে হাতে মিথ্যেকে মিথ্যে ক'রে দিয়ে চলে গেল। কিছুই ভাবল না।

দীপক যা পেয়েছে অমর তা ভাবতে পারলেও এতোখানি কাজে করতে পারবে কি?

কিন্তু দীপকের মৃত্যুর মধ্যে প্রচণ্ড অভিমান ছিল, প্রয়োজনের অনিবার্যতা আদৌ ছিল না। অমরের যে উপায় নেই, সামনের পথটা গভীর অন্ধকার—অন্ধকারের চেয়েও সুনিশ্চিত গভীরতর একটা গহ্বর। সে যদি বেঁচে থাকে তবে দুঃসহ মূর্তিমান সমস্যা হয়ে তাকে জীবনটা বইতে হবে। কি চেয়ে ছিল আর কি হতে চলেছে। বড় হয়ে, মানুষের মত একটা মানুষ হয়ে দাদার হাত থেকে সংসারের দায়িত্বটা নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার বড় সাধ ছিল অমরের। কিন্তু দীপক হঠকারিতা করে একেবারে সব তচ্‌নচ্‌ করে দিয়ে গেছে।

এই মুহূর্তে ইচ্ছে করছে দীপককে হাতের কাছে পেলে খুন করতে।...হাসিও পেল। সত্যি কি খুন করতে পারত সে। অতোদূর যাবার দরকারই হ'ত না। কেন না দীপক বেঁচে থাকলে আজ অমরকে মরবার কথা ভাবতেই হ'ত না। প্রিন্সিপ্যালের 'কালো ছাপ' তাকে স্পর্শ করতে পারতো না।

একটা আদুরে ছেলের খামখেয়ালের মাশুল গুণতে হচ্ছে হতভাগা এই গরীব বেচারাকে। আরে বাপু তোর অতো মাথা খারাপ করার কি গরজ পড়ল! আচ্ছা সেই লোকটা না হয় তোর বাবা—সত্যিই তোর জন্মদাতা পিতার সঙ্গে এইভাবে হঠাৎ মিলন যদি ঘটেই গেল, তাতে তোর কতো খুশি হবার কথা। আর যেমন-তেমন বাবা ত নন তিনি অত্যন্ত বিবেচক মানুষ। তিনি ত তোর ভালো করবার জন্যে অষ্টপ্রহর মুকিয়ে রয়েছেন। এমন সুযোগ কটা ছেলের কপালে জোটে! কই, অমরকে ত এরকম একটা—! নাঃ, সবই নসীবের খেলা। যার থাকে তার অমনি অনেক থাকে। বড়লোক দাদামশাই-এর একমাত্র মেয়ে হয়ে জন্মায় তাদের মায়েরা।

চিন্তায় বাধা পড়ল। গলাটা কেমন শুকিয়ে আসছে অমরের। ও-পাশে সাগরটা ঘটা ক'রে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। উঠে পড়ল অমর। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে চক্‌-চক্‌ ক'রে খেয়ে ফেলল।

এই ঘরে দীপক ছিল। সাগর ছিল না। দীপকের জায়গাটা ফাঁকা হয়ে যাবার পর তিন রাত্তির ঘুমোতে পারে নি অমর। কেমন গা ছমছম করল। তবু লজ্জায় কথাটা সে কাউকে বলে নি। তার মুখচোখের চেহারা দেখে সুপার আন্দাজ করেই সাগরকে এই ঘরে বদলি করে দিয়েছিলেন। সেই থেকে সাগর আছে। আছে ঐ পর্যন্তই—অমর বিশেষ কথাটথা বলে না, নেহাৎ দরকার ছাড়া। সে আজকাল এমনিই কম কথা বলে। বলবে কি, ভালো লাগে না।

বারান্দায় একবার চক্কর দিয়ে ঘরে এসে শুয়ে পড়ল অমর।

না, এভাবে আর পারা যায় না। যা হোক একটা কিছু সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলতে হবে। সিদ্ধান্ত করার কোনো গড়ের মাঠ পড়ে নেই, সিদ্ধান্ত যা হবার তা ত হয়েই গেছে। এখন বাকী কেবল সংকল্পটা কাজে লাগিয়ে ফেলা। ওই প্রশস্ত সুইসাইড। তবে মরবার আগে সে একটা 'স্টেট্‌মেন্ট' লিখে রেখে যাবে, মনে মনে খসড়াও তৈরী হয়ে আছে। 'আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী আমার ভাগ্য। নইলে, পরীক্ষায় সব সাবজেক্টে অদ্বিতীয় মার্কস্ পেয়েও কেন আমি প্রোমোশন পাই না! আমার উন্নতির পথ এইভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়াতে মৃত্যুকে ডেকে নিতে বাধ্য হয়েছি। যাঁরা আমাকে ব্ল্যাক-লিস্টে ফেলেছেন তাঁদের কাছে সবিনয় নিবেদন এই যে, ভবিষ্যতে কোনো ছেলের এতবড় সর্বনাশ করবার আগে তাঁরা যেন পরিণামের কথাটা চিন্তা করেন। এটা আমার অভিযোগ নয়, অনুরোধ।'

সে মরলে দাদা আঘাত পাবে কিন্তু অমানুষিক একটা অর্থসমস্যার হাত থেকে মুক্তিও পাবে ত!

দাদা! দাদা বড় ভালো ছেলে। ভালো ছেলে না হলে কি কেউ সেধে পরের ছেলের দায়িত্ব ঘাড়ে নেয়। গ্রাম-সম্পর্কে পিসিমা, অমন পিসিমা ত লোকের গণ্ডায় গণ্ডায় থাকে ···কিন্তু দাদার মনটা বড় নরম। দীপক মারা যাওয়ার পর দাদা কেমন উদাস হয়ে গিয়েছিল। দাদাকে দেখলে মনে হ'ত যেন দীপককে সে-ই খুন ক'রেছে—এমন অপরাধীর মতো লুকিয়ে লুকিয়ে কাটাতো। সে ধাক্কা এখনো দাদা ষোল-আনা সামলে ওঠে নি। এর ওপর যদি—! না, এত ভাবতে গেলে কোনো কাজে এগোনো যায় না।

ওসব কিছু ভাবা চলবে না। ভাবনার দিকে একেবারে—মানে ফেয়ার-কাট্‌ দিয়ে মনের দুর্গকে আটক করতে হবে।

ঘুম। এবারে ঘুমিয়ে পড়াই ভালো। নইলে সংকল্পের প্রাচীরে ফাটল দেখা দিতে পারে। মা, দাদা, ছোটদি কখন যে কে বানচাল করে দেবে!

মাথা নাড়ল অমর। না, আর কেউ নয়—আসলে সে নিজেই দুর্বল, ভীরু, মরতে সে ভয় পাচ্ছে। তাছাড়া অন্য কোনো ধারণা করা ভুল। নিজের ভীরুতাকে সে এই ভাবে আড়াল করতে চায়—এ ত স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ···ধিক্কার দিল নিজেকে। হত্যার মধ্যে নীচতা, বর্বরতা, হিংসা এমন কি কাপুরুষের অমানুষতা আছে। কিন্তু আত্মহত্যার জন্য মায়া, মমতা, লোভ সব ছাড়তে হয়—সেই ত্যাগের ঔদার্য তার নেই।

দীপক হাসছে।

···আচ্ছা অমর, তোর আর আমার সমস্যা এক জাতের একথা ভাবতে পারলি! তুই ত ভারি ছেলেমানুষ!

হাসিটা হঠাৎ কঠিন গম্ভীর এক ভ্রূকুটিতে রূপান্তরিত হ'ল:

এ কে!

কেন, এও ত দীপক! হাঁ, দীপকই বটে। কিন্তু এই দীপককে অমর কখনো ভাবে নি।

দীপক বলল—তুই কেন, দুনিয়ার কেউই জানে না আমি নিজেই যা কতক্ষণ দেখতে সাহস পেতাম? ভয়ঙ্কর মনে হ'ত তাই পারতপক্ষে নিজের কাছেও মনটাকে লুকিয়ে রাখতে চাইতাম। মা, মা, আমার মনের এই সঙ্কীর্ণ, কুটিল চেহারাটা দেখবার মতো ছিল না ভাই—নইলে তোর কাছে অন্তত লুকোতাম না। জানিস, যেদিন কলেজ থেকে চলে এলাম বাড়ি যাচ্ছি ব'লে সেদিন আয়নায় মুখ দেখি নি। কি জানি আমার বিশ্বাস হয়েছিল যে রাতারাতি আমি বুঝি বুড়ো হয়ে গেছি—ভেবে ভেবে। দেখেছিস নিশ্চয় বাবার চিঠিখানা। আচ্ছা তুই বল, বাবা আমার কতো ভালো। না, না, মাকে আমি খারাপ বলছি নে—মা যে আমাকে চোখের আড়াল হতে দেখলে চোখে আঁধার ভাবেন! কিন্তু একটা কথা তুই জানিস না, আমার বাবা যে বেঁচে আছেন এ খবরটুকু পর্যন্ত টের পেতে দেন নি আমার মা, আমার দাদামশাই! জানিস অমর, আমার বাবাকে তাঁরা সবাই মিলে এমন অপমান করলেন যে, সইতে না পেরে বাবার মতো মানুষ এক-কাপড়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে বিদেয় হ'লেন।···আসলে আমি অপয়া। আমি জন্মেছিলাম অশুভ লগ্নে। নইলে, আমাকে নিয়ে এত বড় একটা বিবাদ বাধতেই পারতো না। বিশেষ ক'রে আমার বাবার মতো মানুষের সঙ্গে—! ভাবছিস কি অমর! তুই বুঝি মনে করছিস দীপকটা সেন্টিমেন্টাল! সত্যি তা নয় ভাই। বাবা যদি তেমন স্বার্থপর হতেন তাহলে মায়ের কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে আনাটা, এমন কি দাদুর কাছ থেকে মাকে-আমাকে একসঙ্গে কেড়ে আনাটাও তেমন কঠিন কাজ ছিল না। কিন্তু তিনি ত তা করেন নি, তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন···

দীপক যেন হাঁপিয়ে পড়েছে। আপন মনেই সে বলল—সিগারেট আছে? একটা দে না ভাই, কতোদিন সিগারেট খাই নি।

অমর হাসল—পাগল! তোর পয়সায় মাঝে মাঝে শখ করে সিগারেট খেতাম। এখন ধোঁয়া খাবার শখ হ'লে শান্টিং ইয়ার্ডে গিয়ে ইঞ্জিনের ধোঁয়া খেয়ে আসি। পয়সা কই যে শখ করব।

খবরটা দীপকের না-জানার কথা নয়। তবু যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তার চোখ দুটোয় যেন কোনো ভাষা নেই। সেইভাবে অমরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ হো-হো ক'রে হেসে উঠল। হঠাৎ হাসিতে ব্রেক কষে সে বলল—মা আর টাকা পাঠাবে না। না পাঠাক। আমি চাই নে। বাবার কাছে চাইব। বাবার এ পক্ষে তিনটে মেয়ে, তারা নাকি কেউ বাংলা বলতে পারে না। না পারুক, ওরা আমাকে ভালোবাসে। ওরা সবাই তেলুগুতে কথা বলে, রং ময়লা, দেখতে ভালো নয়। তা হোক, তবু তারা আমার ছোট বোন। আর সেই মা, মানে বাবার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—তিনি দেখতে কেমন আমি জানি নে, তাঁর কথা জিগ্যেস করতে কেমন লজ্জা করল। বাবার সঙ্গে আমার জীবনে মাত্র একবারই দেখা হয়েছে। সেদিক দিয়ে তিনি অপরিচিত বয়স্ক ভদ্রলোক, তাঁকে ত আর জিগ্যেস করা চলে না, হ্যাঁ মশাই আপনার স্ত্রী দেখতে কেমন! ···কি বললি! বাবার সঙ্গে দেখা হ'ল কেমন ক'রে? কেন উনি ত মাঝে মাঝে আমাকে চিঠি লিখতেন। অবিশ্যি গোড়াতেই সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, তাঁর চিঠির কথা দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি যেন টের না পায়। তাহলে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ বন্ধ ক'রে দেবার চেষ্টা হবে। এর আগে কেবল জানাতেন, তোমার জন্যে অমুক দোকানে টাকা পাঠানো হয়েছে দরকারী দ্রব্য সেখানে গিয়ে এই রসিদ দেখিয়ে নিয়ে নেবে। এই প্রথম তিনি জানালেন, কলকাতায় এসেছি, তোমাকে এর মধ্যে চার-পাঁচ বার দেখেছি। অবশ্য এর আগেও বহুবার তোমার স্কুলে পড়ার কালে আমি তোমাকে দেখে

এসেছি—যাই হোক, তুমি একবার দেখা করো নীচের ঠিকানাতে। অনেক ভাবলাম। দেখা করা কি ঠিক হবে! তার আগে দৌড়ে গিয়ে মায়ের কাছে এই লোকটির সম্বন্ধে সব কথা মন খুলে বলে এলে ভালো হ'ত না! কিন্তু আমার বোকামীর জন্যে নিজের কাছেই লজ্জা পেলাম। মা এতদিন যেটা মনে গোপন রেখে এসেছেন, এবং জানেন আমি কিছুই জানি না—সেই ব্যাপারে তাঁর কাছে পরামর্শ চাইতে গেলে কি তিনিই খুশি হবেন আমার ওপর!

অমরের মুখ থেকে সে যে চোখ সরায় নি, এতক্ষণ একভাবে তাকিয়েই ছিল—সেটা অমর খেয়াল করে নি, তন্ময় হয়ে সে দীপকের কথাই শুনছিল। দীপকের মায়ের কথা উঠতে সে একটু অস্বস্তি বোধ করে, মনে পড়ে যায় পিসিমা পাগল হয়ে গেছেন, তিনি এখন রাঁচীতে বন্দিনী। আচ্ছা, দীপক খবরটা জানে? প্রসঙ্গটা এড়াবার জন্যে অমর অন্যদিকে চাইল। কিন্তু কানটা ঠিক খাড়া থেকে সব কথা শুনছে।

……গেলাম। আমি খুঁজে বার করবার আগেই তিনি আমাকে ডাকলেন। প্রথমে খাওয়ালেন। তারপর জামা-জুতোর দোকানে নিয়ে গিয়ে এক প্রস্থ সব কিনে দিলেন, কোনো আপত্তি শুনলেন না। তারপর তিনি তোদের বাড়ির গলির মুখ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। এর মধ্যে অনেক কথা হয়েছে। আমি কিছু বলবার ফুরসংই পাই নি। উনিই এক তরফা বলেছেন। যাবার আগে বললেন—ছাখো হেমেন্দ্র! (উনি এই নামেই আমাকে ডাকেন। আমি জন্মাবার আগেই ওঁর বাবা আমার এই নাম রেখে গেছেন—সুরেন্দ্রের ছেলে হেমেন্দ্র! আমার মা সেই নামটুকু পর্যন্ত সইতে পারেন নি! আশ্চর্য) হ্যাঁ হেমেন্দ্র, তুমি আর যা-ই করো বড়লোকের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ ক'র না। একথা বলছি কেন জানো? ইদানীং তোমাকে কোনো এক বড়লোক ব্যবসায়ীর বাড়িতে মাঝে মাঝে দেখাসাক্ষাৎ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তুমি আজকাল সেখানে গিয়ে থাক। খবর? খবর আমি পাই। খবর পাবার ইচ্ছে থাকলে কেউ তা রুখতে পারে না। তোমাদের কোনো নিকট-আত্মীয় যিনি বরাবর যোগাযোগ বজায় রাখতে সাহায্য ক'রে এসেছেন তিনিই—! যাক গে, সেকথা এখন জানা তোমার উচিত হবে না। শুধু এইটুকু অনুরোধ যে, নিজের বিবেচনা-বুদ্ধি প্রয়োগ করবে—সব কাজেই করবে। তবে বিশেষ করে বিয়ের বেলাতে অন্তের জোর জুলুমটা বরদাস্ত ক'র না। এই কথাটুকু বলবার জন্যেই আমি এবার মাদ্রাজ থেকে ছুটে এসেছি। আমাকে ভুল বুঝো না। আমার কোনো স্বার্থ নেই, এক-মাত্র স্বার্থ তোমাকে সুখী দেখার স্বপ্ন।……কেন একথা বললাম সেটাও বলে রাখা ভালো। তুমি, আমি, তোমার মা। আমরা তিনজনে সেবার পুজোর সময় তোমার দাদুর কাছে নৌকো ক'রে এলাম। তোমাদের ওখানে ঘটা ক'রে পুজো হয়। বিয়ের পর নতুন জামাই, হ্যাঁ বছর দুই বিয়ে হলেও জামাই হিসেবে আমি নতুনই ছিলাম। যাক গে, সব কথা তোমার শোনার দরকার নেই। যেটুকু আসল সেটা বলি, আমাদের গয়াবের বাড়ি। গরু ছিল একটাই। সেটার দুধ কমে যাওয়াতে তোমাকে যতোটা দুধ দেওয়া উচিত ততোটা জোটানো যেত না। এক বছরের ওপর বয়স হয়েছে। তাই ভাতও দেওয়া হ'ত। তাতে নাকি তোমার পীলে বড় হয়ে গেছে। তুমি যে বাঁচো এটা নাকি আমাদের বাড়ির কেউ চায় না—এসব কথা ঘাট থেকে ঘরে ওঠার মুখেই তোমার মা তাঁর বাবার কাছে, ফলাও ক'রে শোনালেন: সেখানে পাড়ার লোক, অন্য আত্মীয় পরিজন সবাই ছিল। সবাই শুনল। তাতেও আমি তেমন

কিছু মনে করি নি। কিন্তু পুজো, লক্ষ্মী পুজো চুকে যাবার পর আগের কথা মতো শ্বশুরমশাইকে বললাম—এবার আমাদের ত যেতে হয়। ওদিকে—আমার কথা শেষ হবার আগেই তিনি ভাতমাখা হাতখানা উঁচুতে তুলে বললেন—'যাওয়ার কথা রাখো।' তাঁর মেয়ে কাঁদো কাঁদো সুরে বললেন—'বাবা এবার আমাকে পাঠালে আর কোনোদিন তুমি নাতির মুখ দেখতে পাবে না।' তিনি সাফ জবাব দিলেন—'আগে ছেলেকে খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচাবার মতো অবস্থা করো তারপর ত তাকে নিয়ে যাওয়ার কথা ওঠে।' সে আমলের বড়লোকের বাড়ি, আত্মীয়-আশ্রিতেরা সব ফোড়ন কাটল। আমি বাবা আর সহ্য করতে পারলাম না। খাওয়া ছেড়েই উঠে সটান বেরিয়ে পড়লাম। তাঁরাও বাধা দেন নি। যাক গে, সে সব অনেক কথা। আজ আমি পর, আমার কোনো দাবি নেই। তাঁরা ত আমাকে মেরেই ফেলেছেন। আমি আর কারও কাছে বাঁচতে চাইনে। শুধু তুমি হেমেন্দ্র আমার পুত্র, তোমার কাছে বেঁচে থাকার আশাটা কোনদিন ছাড়তে পারি নি। ভেবেছি আমার ছেলের গায়ে আমার রক্ত আছে! দেখতে চাই বড়লোকের মেয়ের ছেলে তুমি—না গরীবের ছেলে!

বুঝলি অমর সেই হ'ল কাল! একদিকে মা, আমার এতদিনের জীবন আর একদিকে বাবা! বাবাকে যতদিন চোখে দেখি নি ততদিন যন্ত্রণা এত তীব্র ছিল না।

কিন্তু তারপর যেন আমার গায়ে কে আগুন লাগিয়ে দিল। আমি জ্বলতে শুরু করলাম। আমাকে আমি পোড়াচ্ছি। মা! মায়ের মুখের দিকে আমি তাকাবো কি ক'রে! কতো উদ্ভট চিন্তা। তোদের বাড়ি থেকে সেই রাতেই বেরিয়ে গেলাম। সারা শহরখানা টহল দিয়ে ঘুরে ঘুরে শেষে ঠিক করলাম পালাবো। সবার চোখের আড়ালে নিয়ে যাব নিজেকে। তারপর ত—। তাই বলছি, তোর ত মাত্র একটাই সমস্যা—টাকার অভাব। তা এক কাজ কর, আমার বাক্সে বাবার চিঠি আছে তাতে ঠিকানাও পাবি, লিখে দে তাহলে তিনি নিশ্চয় টাকা পাঠাবেন।

বাক্স টানাটানির শব্দে সাগরের ঘুম ভেঙে গেল। সাগর দুঃসাহসী। সেইজন্যেই সে অমরের ঘরে থাকতে রাজী হয়েছে, দীপকের সীটে। অন্ধকারে একজোড়া তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি চোখ নিমেষে ব্যাপারটা বুঝে ফেলে, চট্ ক'রে সে উঠে গিয়ে খপ্ ক'রে দুখানা হাতই ধরে ফেললে, অস্ফুট স্বরে সাগর দাঁত চেপে বলল—শালা! চোর!

তারপর সে চিৎকার করে ডাকল—এই অমর! অমর ওঠ্ তো! আলোটা জ্বাল ত, আজ জাদুকে পোলাও খাওয়াচ্ছি।

সাগরের মুঠোর বজ্রচাপে অমর আর্তনাদ ক'রে ওঠে—দীপক! ছাড়, ছাড় লাগে। বড্ড লাগছে। দীপু, ছাড় ভাই!

—কে? কে! অমর তুই! তোর এই কাজ!

তার হাত ছেড়ে দিয়ে সাগর আলো জ্বালল। অমর তখনো তেমনি ভাবে বাক্সের কাছে দাঁড়িয়ে। চোখে আলোর ধাক্কা লাগতে অমর বলল—সাগর! ভাগ্যে তুই আলোটা জ্বাললি। নইলে দীপক আমাকে মেরে ফেলত। হ্যাঁ রে, সে এসেছিল। আমাকে সুইসাইড করতে বারণ ক'রে সে নিজেই খুন করতে যাচ্ছিল।

একটা ঘৃণাতিক্ত দৃষ্টিতে সাগর তাকাল অমরের দিকে—রাবিশ! আমাকে কি গাধার চেয়েও বোকা ব'লে মনে করো তুমি!

কথাগুলো ব'লে তার প্রতিক্রিয়াটুকু লক্ষ্য করবার জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য ক'রে সাগর অপ্রতিভ হয়ে বলল—কি রে, কি হয়েছে তোর অমর! অমন ক'রে কি দেখছিস?

—না তোকে দেখি নি। তোর আর দোষ কি!

—আয় বস দেখি আমার কাছে।

অমরের হাত ধরে টানল সাগর।—কি হয়েছে বল তো।

—কিছু না।

অন্যমনস্কতার ঘোর অমরের তারায়-তারায় প্রতিফলিত।

সাগর বলল—ওখানে কি করছিলি!

—বললাম ত দীপক এসেছিল। ওর বাক্স থেকে চিঠি বার করতে বলল—

হাত নেড়ে হতাশ ভাবে সাগর বলল—একটা ছেলের বোকামীতে একজন পাগল হ'ল, আর তোর মতো একটা ব্রিলিয়্যান্ট ছেলে—! না, না, তুই শক্ত হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা কর অমর। আই সে—! একটা ভূতের কাছে আমরা এতগুলো ইয়ং ম্যান কিছুতেই হার স্বীকার করব না।

শক্ত মুঠোয় সে আবার অমরের হাত ধরল। অমর নিজের শিথিল হাতখানার দিকে তাকিয়ে বলল—সত্যি! ভরসা দিচ্ছিস। তাহলে—তাহলে আমি পারব। ভরসা চাই।

TELEVISION!

FOR THE FIRST TIME IN INDIA
We have introduced

TELEVISION SET

for a Commercial Demonstration purpose.

ENQUIRIES FROM UNIVERSITIES,
COLLEGES AND EXHIBITIONS SOLICITED

SOUND & TELEVISION

: Agents :

THE G. S. EMPORIUM (Agency) LTD.
9, ROYAL EXCHANGE PLACE, CALCUTTA-1.

Phone : 22-6367 Gram : Energetic

ক্যালকাটা বুক হাউস : ১/১ কলেজ স্কোয়ার, কলি-১২ টেলিফোন নম্বর : ৩৪-৫০৭৬

বাংলার লোক-সাহিত্য

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রণীত

বাংলার লৌকিক সাহিত্যের সাম্প্রিক ইতিহাস

মূল্য ১০·৫০

বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস

সমালোচনা গ্রন্থ

অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত, এম.এ. প্রণীত

মূল্য ৮·০০

ডক্টর সুকুমার সেন বলেন : ...বাংলায় সাহিত্য সমালোচনার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রকাশন।..... অপর্ণাবাবুর এই সুলিখিত বইখানি কৌতূহলী পাঠকদের পড়ে দেখতে অনুরোধ করি।

নাট্যকবিতায় রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র-নাট্যকাব্যের সমালোচনা গ্রন্থ

অধ্যাপক হরনাথ পাল প্রণীত

মূল্য ৩·০০

রস ও কাব্য

ডক্টর হরিহর মিশ্র প্রণীত

মূল্য ২·৫০

দেশ বলেন : ...বাংলায় এই রসবিচার প্রণালীর সুযোগ্য আলোচনা গ্রন্থ বেশী নাই।...ডক্টর মিশ্র আলোচ্য গ্রন্থে সরল ভঙ্গিতে অথচ বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

সীতার স্বয়ংবর

ডক্টর শচীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত

মূল্য ২·০০

Amrita Bazar বলেন : ...Those who love humour, juicy dialogues and non-complexity in a novel will love to turn over the pages of this book.

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী

অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত

মূল্য ১২·৫০

দেশ বলেন : ...এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থে শ্রীভবতোষ দত্ত সুসম্পাদনা এবং সাহিত্যিক মূল্যায়নের একটি আদর্শ স্থাপন করেছেন।

আনন্দবাজার বলেন : ...এই অর্থের আধার গ্রন্থটির কাজে প্রকাশকও তাঁর অধ্যবসায় পরিচয় দিয়েছেন। এই বইটি যে-কোন বইয়ের শেলফের সম্পদ বৃদ্ধি ত করবেই, অনেকখানি শোভাবর্ধনও করবে।

সাত সমুদ্র

ডক্টর শচীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত

মূল্য ৩·০০

জয়শ্রী বলেন : ...পরিণত ভাষা এবং রচনার পারিপাট্য তাঁর লেখার দুটি প্রধান গুণ এবং তাঁর লেখা যে সাবলীল হয় তার কারণ ইনি চিন্তাশীল, বিদগ্ধ এবং সুসংস্কৃত।

উত্তরাপথ

সমর গুহ প্রণীত

মূল্য ৩·০০

Hindusthan Standard বলেন :---A book that is really a 'tour-de-force' and one of the very best literary contributions to the Bengali travel literature...

যুগান্তর বলেন : '...নগাধিরাজ হিমালয় তাহার বন্ধুর দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ পথ, তুষারমৌলি শিখরমালা, অজস্র নদ-নদীর দুর্বার কলোচ্ছ্বাস গতিমুখরতা ও সেই নদী-পর্বত সংবেষ্টিত বিচিত্র তীর্থভূমিতে বিচিত্র মানুষের মেলা... লেখকের মনোরম লেখনীর মুখে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।...'

সেদিন পলাশপুরে

শ্রীতারা দাশ প্রণীত

মূল্য ৭·৫০

স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় লিখিত সুবৃহৎ উপন্যাস।

একটি কোনের ঘর

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

বারান্দার রেলিংএ ভিজে শাড়ি মেলতে এসে প্রভাতী থমকালো একটু। জোড়াভুরু কুঁচকে গেল। রাস্তার ওধারের বাড়িটার দোতলার কোণের ঘরের অন্দরে সরাসরি দৃষ্টি চালিয়ে দিয়ে দাঁড়ালো একটু।...কি বেহায়া রে বাবা লোকটা! আরো যেন সুবিধে হল তার। হাঁ করে চেয়েই আছে।

ধীরে সুস্থে গম্ভীরমুখে প্রভাতী শাড়ি মেলে দিল। তাকে দেখে আলসের খুপরি থেকে শাদা-কালো পায়রা দুটো হাতের কাছে রেলিংএ এসে বসল। প্রচ্ছন্ন অসহিষ্ণুতায় হাতের শাসনে প্রভাতী পায়রা দুটোকে উড়িয়ে দিল। চোখের সমুখ থেকে দূর করে দিল যেন। তারপর বক্র কটাক্ষে ওই কোণের ঘরটার দিকেই তাকালো আবার।

তাকালে ঘরটার ভিতর পর্যন্ত দেখা যায়। খাট-পালঙ পর্যন্ত। বাড়িটা তিরিশ-চল্লিশ গজের মধ্যে হবে। কিন্তু দোতলার এই বারান্দা থেকে দোতলার ওই কোণের ঘরটা আরো কাছে মনে হয়।

প্রভাতীর বক্র কটাক্ষ আর বক্র থাকল না। সোজাসুজিই তাকালো আবার। সাহস দেখে গা জ্বলে যাচ্ছে।

লোকটা এদিকে চেয়ে হাসছে মিট মিট করে। প্রভাতী স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, হাসছে।

ঘরের মধ্যে নিরঞ্জন বসে কাগজ পড়ছিল। প্রভাতীও সামনে এসে বসল। আজ বলবে কথাটা...।

পনের-বিশ দিন হয়ে গেল এই এক ব্যাপার লক্ষ্য করছে। বলতে গেলে ওই বাড়িটা দখল হবার পর থেকেই দেখছে। প্রথম দু'চার দিন খেয়াল করে নি। কারা এলো পাড়ায়, এত টাকা দিয়ে অমন একটা গোটা বাড়ি কে ভাড়া নিল, সেই মেয়েলী কৌতূহলই বরং বেশি ছিল। তিন-চার বন্ধু মিলে বাড়িটা ভাড়া নিয়েছে জেনে কৌতূহল গেছে। তেমন কেউ নয় তাহলে।

কিন্তু এই বিদঘুটে ব্যাপারটা লক্ষ্য করল পাঁচ-সাত দিন না যেতেই।

খাটের ওপর ছোট একটা জলচৌকি পেতে বসে লোকটা। সোজাসুজি এই বারান্দার দিকে মুখ করেই বসবে—রোজ, প্রত্যহ। হাতে কলম থাকে, জলচৌকিতে কাগজও থাকে। কিন্তু লিখতে বড় দেখে না। সারাক্ষণ এই দিকেই চেয়ে আছে। এই বারান্দার দিকে। প্রভাতীর সঙ্গে অনেকদিন

চোখোচোখি হচ্ছে। কিন্তু একটু সংকোচ যদি থাকত লোকটার। চেয়ে আছে তো আছেই। একেবারে ওপর চাউনি।

দিনের মধ্যে কতবার যে এই বারান্দায় আসতে হয় প্রভাতীকে ঠিক নেই। নিজের জামা কাপড় মেলে দেওয়া, রোদ থেকে তোলা, খোকার জামা কাঁথা তোষক বালিশ ঘণ্টায় ঘণ্টায় শুকোতে দেওয়া আর তোলা, পায়রা দুটোকে তিন-চার দফায় ঘর-গম খেতে দেওয়া, এ-ছাড়া হাতে কাজ না থাকলে ফিরে যাবার জন্যে বারান্দার রেলিংধরে একটু দাঁড়ানো, রাস্তা দেখা, লোক-চলাচল দেখা, বিকেলে গা ধুয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেওরদের সঙ্গে একটু গল্প-গুজব করা—বলতে গেলে একটা ঘরের থেকে এই একটা বারান্দায় আনাগোনা অনেক বেশি অপরিহার্য। কিন্তু আসতে যেতে চলতে ফিরতে সারাক্ষণ যদি একটা লোক হাঁ করে চেয়ে থাকে, কেমন লাগে।

তার ওপর আজ আবার হাসছিল। প্রভাতী নিজের চোখে দেখেছে, স্পষ্ট দেখেছে। পায়রা দুটোকে উড়িয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েই হাসতে দেখেছে।

অভিযোগটা কি, সঠিক বুঝে উঠতেই নিরঞ্জনের সময় লাগল একটু। কাগজ ফেলে স্বচক্ষে উঠে এসে দেখতে। দেখল। মিথ্যে নয়, এদিকেই চেয়ে আছে বটে লোকটা। চেয়েই আছে।

এরপর দিনে পাঁচ-সাতবার করে এই একই ব্যাপার লক্ষ্য করল নিরঞ্জন। মনে মনে লোকটার ওপর বিরক্ত একটু হল হয়ত। মুখে প্রভাতীকে ঠাট্টা করল, এই জন্যেই দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার করে তোমার বাইরে এসে দাঁড়ানো!

প্রভাতী রাগ দেখিয়েছে, দাঁড়াও, এবার থেকে যতবার বারান্দায় যাব, একটা ঝাঁটা হাতে নেব।

নিরঞ্জনের ঠাট্টার দরুনই হোক, আর প্রভাতীর উষ্মার ফলেই হোক—ব্যাপারটা দেওররাও জানল এবং দেখল। তারা বরদাস্ত করতে চাইল না। নতুন বয়সের ছেলে সব, সহ্য হবেই বা কি করে! মেজাজের মাথায় তারা প্রথমে ঠিক করল, রাস্তায় একদিন ধরে বেশ মোটাকতক কাঁকুনি দিয়ে দেবে, কিন্তু নিরঞ্জনের তাতে বিশেষ আপত্তি। কোনো গণ্ডগোলের নামেই অস্বস্তি তার। নিজের ঘরে বসে যে যেদিকে খুশি চেয়ে থাকবে, তাই নিয়ে হামলা করতে গেলে উল্টে অপদস্থ হওয়ার সম্ভাবনা।

দেওরদের অভিলাষে প্রভাতীরও আপত্তি। এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলেই পাঁচ কান হবে, পাঁচ বাড়ির ভদ্রলোক ভদ্রমহিলারা উঁকি-ঝুঁকি দেবে—লজ্জার ব্যাপার না? তাছাড়া লোকটা কি স্বীকার করবে নাকি যে নিজের ঘরে নিজের খাটে বসে অন্য বাড়ির একটি মহিলাকে দেখার জন্যে এভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে। সবাই ভাববে বাড়াবাড়ি। প্রভাতী সন্ত্রাসে দেওরদের চোখ রাঙিয়েছে, কেউ কিছু বলতে গেছ কি আস্ত রাখব না বলে দিলাম।

অতএব দেওররা শেষে নির্বাক দ্রষ্টা-ভক্তটিকে ছেড়ে প্রভাতীকে নিয়েই পড়ল। ঠাট্টা তামাসার খোরাক পেল তারা। প্রভাতী বারান্দার দিকে পা বাড়ালেই তারা টিপ্পনী কাটে, এ-সময় আবার তোমার কি দরকার পড়ল ওখানে? কখনো বলে, লোকটা যে ঠায় হাঁ করে চেয়ে বসে আছে বউদি তখন থেকে—একবারটি এলো! কখনো বা বলে, লোকটা নিশ্চয় কবি, তোমাকে দেখে দেখে রোজ একটা করে কবিতা লেখে।

রাগ করুক আর যাই করুক, মনে মনে ওই কোণের ঘরের লোকটার প্রতি প্রভাতীরও কৌতূহল ছিল একটু। লোকটা কে! কি করে? কাগজ কলম নিয়ে বসে কেন! লেখক বা কবিটবি কিছু নাকি। কি করেই বা জানবে, কেউ তো

বাড়ির বাইরে বেরুতে দেখে নি এই তিন সপ্তাহের মধ্যে। আসলে কিছুই করে না, কিছুই দেখে না—তবু একটি। দেখার ভান করে শুধু। চলে কি করে? বউও তো আছে একটা দেখা যায়, দেখতে-শুনতেও মন্দ নয়—তবু, চরিত্র দেখো লোকটার! বেশিক্ষণ ঘরে দেখা যায় না বউটাকে, কাজে-কর্মে ব্যস্ত থাকে বোধহয়, সোয়ামীর এই গুপনা জানেও না হয়ত। বউটার সঙ্গে দিব্যি হেসে হেসে লোকটাকে কথাও বলতে দেখেছে প্রভাতী—কত যেন ভালো মানুষ! নির্লজ্জ কোথাকার—

কিন্তু ওই নির্লজ্জ লোকটাকে কেন্দ্র করে নিজের স্বামী আর দেওরদের হাসি ঠাট্টা বিদ্রূপ সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে একটা পরিবর্তন উপলব্ধি করছিল প্রভাতী। সেটুকু বিশ্লেষণ সাপেক্ষ।

প্রভাতীর বয়েস সাতাশ-আটাশ। বিয়ের সময় শ্রী ছেড়ে বেশ সুন্দরীই ছিল বলা যেতে পারে। লম্বা মোহারা চেহারা ছিল। বেশ ফর্সা। এখন মোটা হওয়ার দরুন আরো বেশি ফর্সা দেখায়। আর মুখখানা এখনো ভর-ভরতি মিষ্টি। কিন্তু প্রভাতীর মস্ত খেদ, নিজের একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই সাত-আট বছরে সে দিব্যি মুটিয়ে গেছে। প্রথমে অত খেয়াল করে নি, ভালই বরং লাগছিল। কিন্তু খেয়াল করল যখন তখন অনেক চেষ্টা করেছে। অনেক ওষুধ খেয়েছে, চুপিচুপি অনেক উপোস করেছে। কিন্তু কিছুতে কিছু হয় নি। তনু-তনিমা স্বেচ্ছাচারীর মত নিজের ইচ্ছায় স্ফীতি লাভ করেছে। প্রভাতী হাল ছেড়েছে শেষ পর্যন্ত। দেওররা এই নিয়েও অনেক ঠাট্টা ইয়ারকি করেছে। নিরঞ্জন কখনো সেই ঠাট্টায় যোগ দিয়েছে, কখনো বা নিরিবিলিতে অনুযোগ করেছে, এমন হচ্ছে কেন—।

তারপর যথানিয়মে এই প্রসঙ্গ পুরনো হয়েছে একদিন।

ও-বাড়ির ওই কোণার ঘরের নির্বাক দর্শন-পর্ব থেকে এ-বাড়ির লোকেরা আবার নতুন করে আবিষ্কার করল যেন প্রভাতীকে। ঠাট্টার ফাঁকে ফাঁকে দেওরদের মনে হল, তাদের বউদির মুখখানা মিষ্টিই বটে। এমন কি নিরঞ্জনও ওই কোণার ঘরের লোকটার চোখ দিয়েই দেখতে চেষ্টা করল প্রভাতীকে। চেষ্টাটা দুরূহ নয় এমন কিছু। তারও ভালো লাগল, মিষ্টি লাগল। মোটা হলেও এমন বে-খাপ্পা মোটা কিছু নয়—তারাই একটু বেশি বাড়াবাড়ি করেছে। বাড়িসুদ্ধু লোকের এই পরিবর্তনটুকুই প্রভাতী উপলব্ধি করেছে। করছে।

কিন্তু সেদিন কোণাঘরের ওই হাঁ-করা লোকটার ওপর বিষম চটেছিল প্রভাতী।

বাড়িতে একটা উপদ্রব জুটেছে। একটা আকাশী রঙের পায়রা। পুরুষ-পায়রা। কোথা থেকে এসে জুটেছে কে জানে। বারান্দার আলসের পাকা-বাসিন্দা পায়রা দুটোর তাতে ঘোরতর আপত্তি। কিন্তু আগন্তুক পায়রাটি নাছোড়বান্দা—এখানকার পুরুষ-পায়রাটার জায়গা দখলের মতলব। প্রভাতী সেদিন এই নতুন আপদটাকে তাড়াবে বলে বদ্ধ-পরিকর। আকাশী রঙের পায়রাটা বেহায়ার মত বেশ খানিক যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত গৃহকর্ত্রীর তাড়নায় হাল ছেড়ে আকাশে উড়তে বাধ্য হল।

পায়রা তাড়িয়ে প্রভাতী এদিক পানে ফিরেই থমকে দাঁড়াল।

কোণাঘরের লোকটা এদিকে চেয়ে দাঁত বার করে হাসছে একেবারে।

প্রভাতীর ইচ্ছে হল বড় করে মুখ ভেংচে হাসির জবাবটা দেয়। ওই বেহায়া পায়রাটার মতই এই বেহায়া লোকটাকে শিক্ষা দিতে ইচ্ছে করছিল তার।

কিছুই না করে ঘরে বসে ফুঁসতে লাগল। এমন নির্লজ্জও হয় পুরুষগুলো।

তিন সপ্তাহ পরে।

সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়েছে।

সব থেকে নামী সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রের একটা গল্প নিয়ে দেওরদের মধ্যে হাসিখুশির ছটলা চলেছে। গল্পের নাম কপোত-কপোতী। লেখক সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রায় নবাগত। কিন্তু গল্পটির পাশে সাহিত্যিক-পরিচিতিতে গল্পটির অজস্র প্রশংসা করেছেন সম্পাদক বাংলা-সাহিত্যে এমন গল্প বিরল নাকি। নিখুঁত অন্তর্দৃষ্টি এবং বিশেষ পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা ভিন্ন দুটি পায়রার প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার এই গল্প রসোত্তীর্ণ করে তোলা দুরূহ বলেই তাঁর অভিমত।

গল্পটিও পড়েছে দেওররা। ভালো লেগেছে। বিস্ময়ে পুলকে হতভম্ব তারা। কারণ, লেখকটিকে তারা চিনেছে। গল্পটাও যে তাদের বারান্দার আলসের পায়রা দুটোর গল্প তাতে কোনো ভুল নেই: সরু আধ-হাত আলসেতে একটার পিছনে আর একটার ঘোরা ফেরা চলার ভিতর দিয়ে পায়রা দুটোর যে প্রেম-প্রীতি মান-অভিমান আবিষ্কার করেছেন লেখক—তা এমন সুন্দর, যেন দুটি মেয়ে-পুরুষকে নিয়েই লেখা। গল্পের মধ্যে প্রভাতীর উল্লেখও আছে, অবশ্য নামের উল্লেখ নয়—যার হাত থেকে পায়রা দুটো নিঃশঙ্কে এসে খাবার খায়, তার কথা। নতুন একটা পুরুষ-পায়রার দস্যুর মত এসে এই সুখের কপোত-নীড়ের ঘরণীটিকে দখলের প্রয়াস এবং সন্ত্রস্তা গৃহকর্ত্রীর হাতে তার নির্যাতন ও বিতাড়নের চিত্তাকর্ষক প্রহসনে কাহিনীর সমাপ্তি। গল্পটা যত না অভিনব, তার থেকে অনেক বেশি মর্মগ্রাহী লেখকের সুপটু বাচনা আর বিন্যাস।

দেওররা বৌদিকেও ঘরে এনে গল্পটা শুনিয়েছে। তারপর হাসা হাসি করেছে।—ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে লোকটা এই দেখত চেয়ে চেয়ে! আমরা ছট করে গিয়ে সত্যিই যদি পাঁচ কথা শুনিয়ে আসতাম, কি বিচ্ছিরি হত বলো তো!

প্রভাতীও তাদের সঙ্গে না হেসে পারে নি।

নিরঞ্জন বাড়ি ছিল না। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠেই ভাইদের মুখে মজার খবরটা শুনল। এক ভাই সাপ্তাহিক পত্রটা এগিয়ে দিল। ভাইদের ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গল্পটা শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেলল নিরঞ্জন। তারপর হাসতে লাগল সেও।

হাসতে হাসতেই নিজের ঘরে এলো।

ঘরের আলোটা নেভানো।

কিছু না ভেবেই আলোটা খট করে জ্বালল সে। তারপরেই থমকালো একটু।

বিছানায় প্রভাতী শুয়ে। বাহুতে মুখ ঢাকা। আলো জ্বালতে ঈষৎ বিরক্ত হয়ে মুখ থেকে হাত সরালো।

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করল, মাথা ধরেছে নাকি?

স্ত্রীর মাথা-ধরা রোগ আছে।

হুঁ। বাহুখানা আবারও চোখের ওপর উঠে এলো প্রভাতীর।

কিন্তু স্ত্রীর এই মাথা-ধরাটা যে তুচ্ছ নয়, নিরঞ্জনের খেয়াল ছিল না। সহাস্যে বলল, কি কাণ্ড, পড়েছ গল্পটা?

সঙ্গে সঙ্গে অসহিষ্ণু রাগে যেন ফেটে পড়ল প্রভাতী। চোখ থেকে হাত নামিয়ে সে ঝাঁকিয়ে উঠল, কাণ্ড রেখে তুমি আলোটা নেভাবে এখন?

হকচকিয়ে গিয়ে নিরঞ্জন তাড়াতাড়ি আলোটা নিভিয়ে দিল।

দুপুরের ডাকে নন্দিনী খান তিনেক চিঠি পেলো। রয়ে-সয়ে পড়বে বলে ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে তুলে রাখলো। চিঠি পেয়েই পড়ে ফেলতে তার ভালো লাগে না। পুরনো আচারের মতো তারিয়ে তারিয়ে চেখে চেখে একটু একটু করে আস্বাদ করেই তার আনন্দ। অবশ্য, সব চিঠির ক্ষেত্রে তার ব্যবহার একই ধরনের নয়। আত্মীয়-স্বজনদের চিঠি পেলে, চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বিকেল পাঁচটায় পড়তে বসে। বন্ধু বান্ধবীদের চিঠি পেলে বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়ে। মোটা চশমার কাঁচের ভেতর দিয়ে তার দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দেয় তখন। আর, এর-ওর চিঠি পেলে সবচেয়ে আগে চোখ বুলিয়ে প্রায় অবজ্ঞাভরেই চিঠি-গুলোকে একপাশে ফেলে রাখে।

ঠিক টিফিন-ছুটির সময় একগাদা চিঠি নিয়ে আসে ইস্কুলের পিয়ন। সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় কাড়াকাড়ি পড়ে যায় টিচার্সরুমে। রেবার নতুন বিয়ে হয়েছে। বর থাকে কৃষ্ণনগরে। রেবাই সবচেয়ে কম আগ্রহ দেখায়। তবু, ওর নামেই চিঠি আসে বেশী। সঙ্গিনীদের মধ্যে কেউ চিঠি বেছে রেবার হাতে তুলে দেয়। স্মিত-হাসিতে মুখটিতে পলাশের আভা ছড়িয়ে, সে চিঠিগুলো হাতে নেয়। তখন একবার দেখেও না কে লিখেছে চিঠি; কোন্ ডাকঘরের ছাপ রয়েছে তাতে। নিশ্চিন্ত হয়ে নিরুদ্বেগে সে চিঠি পড়ে।

রেলওয়ে স্টেশন থেকে পাকা তিরিশ মাইল দূরে বেনাপুর গ্রামে বছর কয়েক হলো,—গার্লস্ হাইস্কুল হয়েছে। সবেমাত্র ভুনিয়ার হাইস্কুলের বেড়া ডিঙিয়েছে তরঙ্গিণী উচ্চ বিদ্যালয়। মায়ের নামে ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন গ্রামের বর্ধিষ্ণু কৃষক শক্তিপদ হাজরা। তাঁরই চেষ্টাতে বেনাপুর পর্যন্ত বাস সার্ভিস-ও খুলেছে। বিদ্যালয়টিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তাঁর অবিরাম চেষ্টা। সে চেষ্টা ধীরে ধীরে ফলবতীও হচ্ছে। ছাত্রীদের সংখ্যা বাড়ছে ক্রমশঃ। হোস্টেলেই এখন পঞ্চাশজন ছাত্রী থাকে। কিন্তু শিক্ষয়িত্রীদের কোয়ার্টার্স প্রায়ই খালি পড়ে

থাকে। কেউ এক মাস, কেউ দু-তিন মাস, কেউ-বা পনেরো দিন কাটিয়ে একবার যদি বেনাপুরের বাইরে পা বাড়ান তাহলে সহজে আর বেনাপুরে ফেরেন না। কিছুদিন হলো এই অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু তবুও কখন কি হয়, কখন কে চলে যায়, তার কোন ঠিক নেই। শক্তিধর হাজরা যথাশক্তি তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। এই সুদূর গ্রামে এসে সবাই যাতে তুষ্ট থাকে, তার দিকে তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি সজাগ রয়েছে।

শিক্ষয়িত্রীদের সকলেই এসেছেন শহর থেকে বা আধা-শহর থেকে। রেবার বিয়ে হলো কৃষ্ণনগরে। শক্তিধর হাজরা জানতেন এর পরে রেবা আর ফিরে আসবে না। কেনই বা আসবে? তবু, ঠিক একমাস পরে সে যখন ফিরে এলো মাথায় সিঁদুর চড়িয়ে, তখন হাজরা মশাই একটু আশ্বস্ত হয়েছিলেন।

অন্যের শিক্ষয়িত্রী সুনয়নী রায় এঁদের মধ্যে একটু বয়স্কা। ইনিও বিবাহিতা। সঙ্গে বছর তিনেকের একটি ছেলে। স্বামী কোন এক চটকলের কেরানী। ইতিহাসের শিক্ষয়িত্রী হেনাঙ্গিনী সরকার বিধবা। এঁদের নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা নেই শক্তিধর হাজরার। এমন কি হেড্‌মিস্ট্রেস রমা লাহিড়ীর সিঁথি তাঁর কৌমার্যের সাক্ষ্য বহন করছে দেখেও তাঁর ভাবনা নেই। মাইনের খোঁটায় তাঁকে প্রায় বেঁধে রেখেছেন শক্তিধর হাজরা। কিন্তু এই সব মন্দা-কুন্তলা-নন্দিনীদের নিয়েই তাঁর চিন্তার অন্ত নেই। এরা এক জায়গায় বাসা বেঁধে থাকতে চায় না। অবশ্য, একটি নীড় তৈরী করার অবকাশ পেলে, সুযোগ পেলে যেখানে হোক এক জায়গায় স্থিতিলাভ করতো হয়তো। শক্তিধর হাজরা লক্ষ্য করেছেন এই জাতীয় কুমারী শিক্ষয়িত্রীরা সহজে কেউ বাঁধন মানতে চায় না। এমনিতে বেশ ভালো। ছাত্রীদের নিয়ে নাচ-গান-সভাসমিতি, হৈ-হল্লা করে কাটাচ্ছে সবাই; কাজ-কর্মের কোন ত্রুটিই নেই। কিন্তু এরাই হয়ত হঠাৎ একদিন ভেগে পড়লো। কেউ পদত্যাগপত্র দাখিল করলো; কেউ-কেউ ছুটি নিয়ে সেই যে গেল, গেলই। চলে গেলে দুর্ভোগ ভুগতে হয় হাজরা মশাইকে। বার বার শিক্ষয়িত্রী পরিবর্তনও বিদ্যালয়ের সুনামের পক্ষে ভালো নয়। তাছাড়া এই গহন গ্রামাঞ্চলে সহজে কি কেউ আসতে চায় নাকি?

মাইল খানেক দূরে কুমারধাঁধা গ্রামে ছেলেদের হাইস্কুল আছে। বেশ বড় স্কুল। শক্তিধর হাজরার ইচ্ছে এই মেয়েদের ইস্কুলটাও একদিন বেশ বড় হয়ে উঠবে। সে দিক দিয়ে প্রচেষ্টার অন্ত নেই তাঁর।

এই বেনাপুর গ্রামের প্রনীলারাজ্যের নন্দিনী-মন্দা-কুন্তলাদের বয়স বাইশ থেকে ছাব্বিশের কোঠায়। সাজসজ্জায় সবাইকে ষোড়শী বলেই মনে হয়। নন্দিনী এমনিতেই একটু রোগা-রোগা। গায়ের রঙটা বেশ ময়লা। মুখের গড়নটা সুন্দর না হলেও একটা শ্রী আছে তাতে। চোখে কাজল পরা তার প্রাত্যহিক অভ্যাস। বান্ধবী শিক্ষয়িত্রীরা মাঝে মাঝে ওকে ক্ষেপিয়ে তুলে মজা দেখে। বাজারে প্রচলিত একটা গানের কলি গুন গুন করে গেয়ে ওঠে—'চোখের নজর কম হলে আর কাজল দিয়ে কী হবে।' নন্দিনী চোখ টিপে হাসে। ওকে নাকি তার কোন এক সম্পর্কের দাদা ঘন ঘন চিঠি লেখে। এই কারণেই মন্দার বেশ একটু ঈর্ষা আছে নন্দিনীর ওপর। সে চিঠিতে যে কি লেখা থাকে তা মন্দা জানেও না; তবু আঁচ করে নিতে কতক্ষণ। মেয়ের কাছে পুরুষের চিঠি যদি ঘন ঘন আসে তা হলে তার চেয়ে ঘনিষ্ঠতার লক্ষণ আর কি থাকতে পারে! তা ছাড়া আভাসে-ইঙ্গিতে নন্দিনী তো প্রায় সকলকেই জানিয়ে দিয়েছে যে তার জীবনের

কৃষ্ণদের নিজের নয় সেজন্যে

কথা সেজন্যেও ওদের

মেয়েদের কথা মেয়েরাই

মঞ্জু-কৃষ্ণলালা একটা বেরাই বুঝেছিল মঞ্জু চিঠি

লেখাতে চায় না কিন্তু কৃষ্ণলা মাঝে মাঝে বলে,

চোখ মুখ উজ্জ্বল করে বলে এমনিতে লেখাও না

ভাই চিঠিগুলো। তুমি জানতে চাইছ বলে, কি লেখে

পুকাষরা। নন্দিনী বলে, মা, তোমার কি চিঠি

আসছে চিঠি কি লেখে আমাকে লিখিয়ে কৃষ্ণলা কোন

দিন কোন প্রেমপত্র পায় নি, তাই আমাদের প্রেমপত্র

লেখাতে চায়। এরই মধ্যে বেশ হয়েছে বলে,

এর চেয়ে বেশী কিছু বোধ হয় চায় না

ইস্কুলের ছুটি হলে সবাই দল বেঁধে হৈ-হৈ করে

ফিরে আসে বাড়িতে ঢুকে সবার নিজের মুখ হাত

ধুয়ে টুয়ে বসে সবাই কাজে বসেছে। এ নিয়ে মায়ে

ঝিয়ে খুব ঝগড়া হয়ে গেছে। তবে মায়ের সঙ্গে মেয়ের ঝগড়াটা

খুবই স্বাভাবিক কথা। ঝগড়া করতে করতে। হয়ে পড়ে যা

মায়ের কোল ছেলে সময় থাকলে, আশেপাশের

মেয়ে পাবে বেড়াতে বেরোয় এবং মায়ের এই

স্বাস্থ্য নিয়ে ঠাট্টা করে মেয়েরা। তখন মেয়ে

মায়ে মায়ে প্রায়ের ঝগড়াটা খুব জমে

মায়ের প্রাণ্টিকতা না আছে আনন্দ না আছে

বৈচিত্র্য। কিন্তু উপায় কিছু বৈচিত্র্য। কিছু

আসে, তাই-ই ওদের ভাল লেগে যায়। যাদের

বিয়ে হয়েছে, তাদের মধ্যে যে বেশ

দলে বড় বেড়ে ওঠে না সবাই মেয়েরা

মাঝে মাঝে বলেন যে ওদের জীবনে যেন কিছু

বৈচিত্র্য এখন আর নেই। সত্যিই তাই। বেশ

খুব খুব টুকে টুকে হয়ে মেয়ে মায়ে একটা কাজে

জানতে চায়—কেমন লাগছে নিয়ে করে, তা হলেও বেশী ভরসা দেয় না। হাসে। একদিন নন্দিনী বেশ হয় ঠাট্টা করেই বেবাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল: কেমন লাগছে বল তো? কোন তেমনি হেসে হেসে বলেছিল: সুখের স্বাদ কি মোটে মেটে? নন্দিনীর মনে হলো বেবা বোধ হয় কথাটা তাকেই লক্ষ্য করে বলেছে। মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করেও সে হাসতে পারে নি।

দুপুরের ডাকে চিঠি পেয়ে, চিঠিগুলো ব্যাগের মধ্যে পুরে, ছাদে গেল নন্দিনী। একটা চিঠি পোস্টকার্ডে লেখা আর ছুটো খামের মধ্যে। খামের একটা চিঠি যে তার বাবা লিখেছেন নবদ্বীপ থেকে, তা ঠিকানা লেখার ধরণ দেখেই সে বুঝেছে। পোস্ট-কার্ডে লিখেছে তার মাসতুতো বোন শীলা। কেমন আছো—ভালো আছি-র মামুলি চিঠি। আর একটা খামে কুশলদার লেখা আছে নিশ্চয়ই। কুশলদার বাঁকা বাঁকা করে ইংরেজী লেখার সঙ্গে তার পরিচয় অনেক দিনের। ঠিকানাতে হাতের লেখা দেখেই সকলের অজ্ঞাতসারে ঠোঁট উল্টালো নন্দিনী। গতানু-গতিক নিরুত্তাপ চিঠি।

ইস্কুল ছুটির পরে নিজের ঘরে ঢুকে বিছানার ওপর পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো নন্দিনী। তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে চিঠিগুলো বার করলো। আবার এসে শুয়ে পড়লো টান দিয়ে। পুরু কাঁচের চশমার সামনে পোস্টকার্ডটা তুলে ধরলো আগে। একবার আগেই পড়া হয়ে গেছে ওটা। তবু আর একবার পড়লো। তারপর শুয়ে শুয়েই পোস্টকার্ডটাকে ছুঁড়ে দিল কোণের টেবিলটার দিকে।

নন্দিনী এবার উবু হয়ে শুলো। বালিশটাকে বুকের তলায় চেপে তার বাবার লেখা খামটাকে ছিঁড়ে একটা চিঠি তুলে আনলো আঙুল দিয়ে টেনে। বাবার সেই এক ধরনের লেখা। বেশ বড়ো লাগে পড়তে। কল্যাণীয়াসু মা—। বাবার মুখে মা ডাক শুনতে খুব ভালো লাগে তার। সুনয়নীদি বলেন ওঁর ছেলে যখন মা বলে ডাকে, তখন সে নাকি আনন্দে ফেটে পড়ে প্রায়। নন্দিনী ভাবলো: সত্যি, ছেলের মুখে মা ডাক শোনা—। চিঠিটা এবারে পড়লো সে। না, বিশেষ কিছু নেই। শরীরের ওপর যত্ন নেবার উপদেশ। মায়ের বাত এখনো কমে নি। ছোট ভাই বাদলের পরীক্ষা চলছে। পা ছুটোকে অকারণেই আছড়াতে লাগলো নন্দিনী। তারপর ধীরে ধীরে ঢোলা দিতে লাগলো নিজেকে। একটু পরেই নন্দিনী বুঝতে পারলো একটি মৃদু, মনোহর পুলক তার সর্বাঙ্গে স্পর্শ দিয়ে বেড়াচ্ছে। নন্দিনী চোখ বন্ধ করলো। চোখ বন্ধ করতেই গত রাতের একটি কথা তার মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে পড়লো যে আর একটা চিঠি এখনো খোলা হয় নি। থাকগে, একটু দেরি করেই খুলবে। নতুন কি আর থাকবে ওতে। অন্তত পক্ষে চিঠির মধ্যে একটু দুঃসাহসিক সুর থাকলেও না হয় চিঠি খুলে আনন্দ পেতো। যদিও কুশলদাকে প্রশ্রয় সে দিতো না।—আঃ, চিঠিটা যদি অন্য কারুর হতো! অন্য ধরনের হতো! শুধু চিঠি পড়েই যাতে সে উষ্ণ হয়ে উঠতো; একটু উষ্ণতা, এতোটুকু—এতোটুকু—। নন্দিনী একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে গতরাত্রের একটি অভূতপূর্ব স্বপ্নকে তার স্মৃতির পেটিকা থেকে আস্তে আস্তে খুলে বার করলো। একটি উষ্ণতাপের চিঠির মতোই এই স্বপ্নকেও বুঝি বারবার পড়া যায়। একবার পড়েই তৃপ্তি হয় না। এখন শুয়ে শুয়ে, বেশ নরম করে হয়তো বা চোখে-মুখে একটু উজ্জ্বলতা এনে, বুকে একটু স্পন্দন নিয়ে, স্বপ্নটিকে ভাবলে কেমন হয়!

তবু, অত সহজে সেই স্বপ্নের কথাটিকেও ভাবা যাচ্ছে না। ভয় ভয় করছে। পাছে কেউ তার

চিন্তার গোপনতাটুকু কেড়ে নিয়ে যায়। তার ওপর দিনের আলোতে ও ধরনের স্বপ্নকে বাইরে টেনে আনতে ভালো লাগে না।

নন্দিনী চুপ করে শুয়ে থাকলো। চোখ খোলে নি।

স্বপ্ন আর কিছু সত্যি নয়। কিন্তু সে কথা ভাবতেই এত রোমাঞ্চ! —না থাক্, ওকে নির্জন শয্যায় টেনে আনা যাবে। কেউ জানতে পারবে না, কেউ না।

নন্দিনী চোখ খুলে, বিছানা থেকে উঠে বসলো এবার।

সামনের জানলার ফ্রেমে শূন্য ক্ষেতের ছবি। একটু দূরে গ্রাম। গ্রামের পর গ্রাম। আরো গ্রাম। সবুজ রঙের ছোপ দিয়ে আঁকা। নন্দিনী দেখতে পেলো ছবিতে কাজল-ধূসর ধীরে ধীরে দিনান্তের দিকে এগুচ্ছে। এ সব দেখে খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগলো নিজেকে। বড্ড অসহায় মনে হলো। বহুবারই এ রকম অনুভূতি তার হয়েছে। মাঝে মাঝে নারকেল বনের ভেতর থেকে যখন 'চোখ গেল' বলে পাখিদের আর্তনাদ সে শোনে, তখন তার মনে হয়, তার বুকের ভেতরটা ঠিক যেন নৌকোর ছই-এর তলার ফাঁপা খোল।

নন্দিনী বসে বসে সূর্যাস্ত দেখলো। মেঠোপথ দিয়ে একটা গোরুর গাড়ি কাঁচকোঁচ্ শব্দে আর্তনাদ করতে করতে চলেছে। চাকায় তেল নেই। তবু চলছে। গাড়ির এ আর্তনাদের সঙ্গে গভীর একাত্মতা অনুভব করলো নন্দিনী। তার জীবনের চাকাও কেমন যেন অতৈলাক্ত; কেমন যেন কাঁই-কাঁই তবু ভালো, কুণালদার চিঠি সে পায়। সবাই জানে কুণালদা তার প্রেমাস্পদ। আভাসে-ইঙ্গিতে

সকল প্রকার সারের জন্য

ইণ্ডিয়ান ফার্টিলাইজার্স প্রাঃ লিঃ

৬, মিশন রো, কলিকাতা-১

ফোন : : ২৩-৫৪২৭

এ কথার সমর্থন সে নিজেই যুগিয়েছে। কিন্তু আসল খবর তো সে নিজে জানে। কুণালদার সঙ্গে তার আলাপ আজকের নয় ছোটবেলা থেকেই। একই পাড়ার। কুণালদার ওপর কোন মোহ নেই তার। একসঙ্গে বেড়াতে যায়, সিনেমাও দেখেছে। তবু সে ভালো ভাবেই জানে, কুণালদাকে সে প্রেমাস্পদের আসনে বসায় নি আর কুণালদাও এমন কিছু স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় নি যে সে নন্দিনীকে ভালোবাসে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নন্দিনী বোঝে, তার ওপর কুণালদার এক ধরনের দুর্বলতা আছে। তেমন দুর্বলতা তার নিজেরও আছে কুণালদার ওপর। এতে মোহ ঘনিষ্ঠ হয় না, কিন্তু নারী-পুরুষের পারস্পরিক সান্নিধ্যে কিছুটা রহস্য বা বৈচিত্র্যের রঙ আছে। সেই জন্যই একটি পুরুষের সঙ্গ হিসাবেই কুণালদার সঙ্গ তার অবাঞ্ছনীয় হয় নি। তা ছাড়া মাস দুয়েক আগে সিনেমা দেখতে গিয়ে পাশাপাশি সিটে বসেছিল তারা। নন্দিনীর মনে হলো কুণালদা ইচ্ছে করেই তার আঙুলের ওপর আলগোছে নিজের আঙুল ফেলে রেখেছিল। নন্দিনী সাড়া দেয় নি বলেই বোধ হয় কুণালদা আর কিছু করতে সাহস করে নি। অবশ্য কুণালদা এমন ভাব দেখিয়েছিল, যেন সে জানেই না যে নন্দিনীর আঙুলে তার আঙুল ঠেকেছে।

ভাবতে ভাবতে নন্দিনী আবার বিছানার উপর গড়িয়ে পড়লো। শরীরটা বিশেষ ভালো নেই বোধ হয়। আবার উঠলো সে। চা দিয়ে গেল না তো! দেরি হচ্ছে কেন? নন্দিনী চা খেতে চললো। বাকী চিঠিটা বিছানাতেই পড়ে আছে। থাক্ এখন। কুণালদার চিঠি পেতে এমন কিছু আগ্রহ নেই তার। তবু পেলে স্বস্তি পায়, না পেলে খুঁতখুঁত করে মনটা। কেমন একটা অভ্যেস। কী-ই বা থাকে চিঠিতে। তার অফিসের কথা,—কোথায় কবে ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে গেছলো,—কেমন সব ছেলেমানুষের মতো লেখা।—তবু ভালো। একজন অনাত্মীয় পুরুষের লেখা চিঠি সে পাচ্ছে।

চিঠিটা প্রায় অনাদৃত অবস্থাতে বিছানার ওপর পড়ে রইলো। নন্দিনী রুম থেকে বেরুলো। আচ্ছা, ঐ স্বপ্নটার মানে কি?—নন্দিনীর বেশবাস অবিন্যস্ত হয়ে পড়েছে। শাড়ির আঁচলটা লুটোচ্ছিল। তুলে কাঁধের উপর ফেললো। তারপর এলোমেলো অবস্থাতেই খাবার ঘরে ঢুকলো। রেবা-মন্দা-কুন্তলা তখনো বসে চা খাচ্ছিল। সুনয়নী রায় সেইমাত্র চা খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে এলেন। দোর গোড়ায় নন্দিনীকে দেখেই মুচকি হেসে একটু রসিকতা করলেন: এমন এলোমেলো করলে কে? নন্দিনী জবাব দিল না। শুধু একটি আবেশভরা হাসি ঠোঁটের ডগায় টেনে আনলো। ঘরে ঢুকতেই ওকে দেখে মন্দা আর কুন্তলা খিলখিল করে হেসে উঠলো। রেবা মুখ টিপে টিপে হাসলো।

কি হলো, হাসছো যে বড়?—নন্দিনী জিজ্ঞাসু চোখ দুটো ওদের দিকে তুলে ধরলো। বেঞ্চের ওপর বসলো সে। ওকে দেখে কি রান্নাঘর থেকে এককাপ চা আর কয়েকটা বিস্কুট দিয়ে গেল। নন্দিনী আলগোছে একটা বিস্কুট তুলে নিল আঙুল দিয়ে। মন্দা হেসে বললো: তোকে কেমন দেখাচ্ছে জানিস? ঠিক যেন—। বলেই জিভ কাটলো। না বাবা, বলবো না।

কি বল না? নন্দিনী অবাক হচ্ছে,—এমনি একটা ভাব দেখালো। তারপর চায়ে চুমুক দিয়ে বললো—: আমাকে কি রকম লাগছে? ডাইনীর মতো, পেত্নীর মতো? শাঁকচুন্নীর মতো?

আজ্ঞে না মশাই—। তোমাকে দেখাচ্ছে ঠিক যেন—। মন্দা এবারেও শেষ করলো না কথাটা।

কুন্তলা বললো: আমিই বলে দিচ্ছি।

নন্দিনী ছোট্ট খুকীর মতো আবদারের কণ্ঠে বললো : বলে ফেল না ভাই তাড়াতাড়ি।

কুন্তলা অনুচ্চ কণ্ঠে বললো :—ঠি-ই-ক যেন ধর্—। না ভাই বলবো না, তুমি আবার রাগ করবে।

বলছি তো রাগবো না। নন্দিনী এবার আর আগ্রহ দেখালো না।

কুন্তলা বললো : বাকীটুকুতে তুমি হচ্ছ 'সীতা'। ধরিত্রী।

কথাটা এমন ভাবে উচ্চারণ করলো কুন্তলা যে —সবাই হেসে উঠলো।

নন্দিনী রাগলোও না, হাসলোও না। চায়ে চুমুক দিয়ে বললো : ওঃ এই কথা!—তারপর মুখে এক পোঁচ বিমর্ষতা টেনে এনে বললো : চিঠি পেয়ে মনটা বিশেষ ভালো নেই ভাই।

কেন? কেন? কে লিখেছে? কি লিখেছে? বাবা লিখেছেন?—মন্দা আর কুন্তলা জানবার জন্ত দারুণ আগ্রহ দেখালো। রেবা কিছুই বললো না।

নন্দিনী এবার গুছিয়ে বসলো। রেবার দিকে তাকালো একবার। বেশ প্রশান্ত উজ্জ্বল মুখ রেবার। বয়সটাও ওদের চেয়ে কম। সিঁথির দীপ্তিতে দীপ্ত হয়ে আছে যেন।

নন্দিনী রেবার দিকে তাকিয়েই বললো : কুণালদা লিখেছে। নন্দিনী দেখলো, রেবার কোন ভাবান্তরই হলো না; তেমনি মুখ টিপে হাসলো শুধু।

মন্দা একবার ঢোক গিললো। কিছুটা ঈর্ষা জমলো তার বুকের মধ্যে। তবু মুখে যথাসম্ভব প্রসন্নতা ছড়িয়ে, শালিক পাখির মতো ঘাড় বেঁকিয়ে বললো : নন্দি ভাই—বল না—। তুমি তো কোন দিনই বললে না কিছু। আমাদের বুঝি ইচ্ছে করে না।

কুন্তলা বললো : খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু কে কার বলছে বল। সবাই লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ায়।

তারপর আবার বললো : আমি কিন্তু ঠিক ধরেছি। নন্দিনীর মানসে-ও ঝড় বয়ে গেছে তাহলে! না হয়, এমন এলোমেলো হলো কি করে?

রেবা হাসলো শুধু।

নন্দিনী জবাব দিল না কুন্তলার কথার। রেবার দিকে আর একবার তাকালো। তারপর মনে মনে চটে উঠলো প্রায়। কি ভেবেছে রেবা? কি পেয়েছে ও? বিয়ে হয়েছে বলে দেমাক কত? যেন আকাশের চাঁদ পেয়েছে? স্বর্গের চাবি পেয়েছ? সাপের পাঁচ পা দেখেছে?—শুধু মুখ টিপে টিপে হাসছে। তার কুণালদার কথা যেন কথাই নয়। একটু জানবার আগ্রহ পর্যন্ত নেই!

তারপর চায়ের শেষটুকুতে চুমুক দিয়ে বললো : ওঃ, কি চা-ই না করেছে।

রেবা হঠাৎ মুখ খুললো, তেমনি হাসি মুখেই বললো : কেন, চা তো ভালোই হয়েছে।

নন্দিনী শুকনো মুখে বললো : কি জানি ভাই, কার মুখে কেমন লাগে।

নন্দিনী এবারে প্রায় চমকে দিল সবাইকে। বললো : শরীরটা মোটেই ভালো লাগছে না। চলি।

কেউ কিছু বলবার আগেই নন্দিনী উঠে পড়লো।

নিজের রুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে টান দিয়ে শুয়ে পড়লো সে। সন্ধ্যে হতে দেরি আছে। ফাল্গুনের শেষ রোদ এখনো গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঝিলমিল করছে। আকাশটা ঘন নীল। এ সময়টা শুয়ে থাকার সময় নয়। তবুও শুতে হলো নন্দিনীকে। শুয়ে শুয়ে ভাবলো—মন্দা-কুন্তলা-রেবা সবাই বুঝি ওকে বিদ্রূপ করে। আর রেবাই বোধ হয় সবচেয়ে বেশী করে। কুণালদার ওপর খুব রাগ হতে লাগলো হঠাৎ। লোকটা চিঠি লিখতেও জানে না। একটু আধটু প্রেমের কথা বললে কি সে বাধা দিতো নাকি? চিঠিগুলো তেমন তেমন

হলে ওদের পড়িয়ে আসতো নন্দিনী। কিন্তু এ সব চিঠি পড়তে গেলেই তো তার সম্মান থাকবে না। সবাই বলবে: ওঃ এই চিঠি! এর জন্য এত?—আশ্চর্য, কুণালদা কী? এরকম মেনিমুখো পুরুষ তার পছন্দ নয় মোটেই।

ইস্! সন্ধ্যে হয়ে গেছে! কি এসে কড়া নাড়ছিল। নন্দিনী দরজা খুলে দিল। দিদিমনি রাতে ভাত খাবেন কিনা জানতে এসেছিল। মন্দা বুঝি বলেছে তার শরীর খারাপের কথা! কিকে বিদেয় করে নন্দিনী সন্ধ্যার অন্ধকারে বসেই আলোটা জ্বালবে কি জ্বালবে না ভাবছিল। হঠাৎ গত রাতের সেই স্বপ্নটির কথা আবার মনে পড়লো। নন্দিনী এই অন্ধকার মুহূর্তটিতে স্বপ্নটিকে পাঠ করতে শুরু করলো। কিন্তু কোন দিন কোনও দিন কি সে এসব ভেবেছিল নাকি! তবুও কেন এমন স্বপ্ন দেখলো সে!

স্বপ্নলোকের সে জায়গাটাও নন্দিনী চেনে না। তবে কোন শহর হবে নিশ্চয়ই! শহর থেকে একটা রাস্তা বেরিয়ে গেছে। ঘন কালো পিচের রাস্তা। রাস্তার দুধারে ছায়াঘন গাছ। দুপাশে ক্ষেত।

নন্দিনী স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে জায়গাটা। সময়টা বোধ হয় বিকেলই হবে। কেমন যেন মেঘ-মেঘ আকাশ। রোদ নেই। না, ঠিক মেঘ-মেঘ আকাশ নয়। বোধ হয় সূর্য ডোবার আগের সময়টা। একটা রিক্সাতে পাশাপাশি বসে ওরা যাচ্ছে। নন্দিনী ভালো করে সেই দৃশ্যটা ভাববার চেষ্টা করলো। কোমর থেকে জানু পর্যন্ত একটা পাশ প্রায় মিশে গেছে ওদের। অদ্ভুত একটি ঘনিষ্ঠ অবস্থিতি।—এমন ঘনিষ্ঠতার কথা সে কোন দিন কল্পনাও করেছে বলে তার মনে পড়ছে না। এমন একটি উষ্ণ সান্নিধ্য—এমন একটি—। নন্দিনী প্রায় ঘেমে উঠলো। রিক্সা চলেছে। দৃশ্যটাকে বার বার চোখের সামনে তুলে ধরলেও তৃপ্তি আসে না। বাকী দৃশ্যটুকু আর তুলে ধরতে চাইছে না সে। বাইরে টেনে আনলেই যেন তার শুচিতা নষ্ট হয়ে যাবে। তবু নিরুপায় নন্দিনী একের পর একটি দৃশ্যপট দেখে যেতে লাগলো, চোখ বন্ধ করে, অন্ধকারে। অদ্ভুত সেই শেষের মুহূর্তটি। পাশের মানুষটি তার আঙুলে আঙুল জড়িয়ে—। ইস্!—আবার শিউরে উঠলো সে।

রিক্সাতে কুণালদাই ছিল গোড়ার দিকে। রিক্সা যত এগুচ্ছিল, কুণালদার মুখটা ততো বিশ্রী লাগছিল। এমনিতেই কুণালদার চেহারাটা ভালো নয়। প্রায় হাড়গিলে চেহারা। ও চেহারাকে ভালোবাসা যায় না।—নন্দিনী এর পরের দৃশ্যটি দেখার জন্য, অনুভব করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিলো। কুণালদা আর রিক্সাতে নেই। নন্দিনীর বুক ওঠানামা করতে লাগলো। দেখলো: তার পাশে কুমারবাঁধা স্কুলের বাঙলার শিক্ষক মুরারিবাবু বসে আছে। বেশ ছিমছাম চেহারা। কয়েকবার আলাপ হয়েছে ট্রেনে, কোলকাতা যাবার পথে। বেশ মিশুক লোক। বয়সটা তিরিশের কোঠায়। কিন্তু হলে কি হবে—লোকটা যে এতো অসভ্য তা কি নন্দিনী জানতো আগে। ভদ্রলোকের হাতটা ঢের বেশী অবাধ্য আর অস্থির।

নন্দিনীর রোমাঞ্চ দেখা দিল। তারপর সে কি লজ্জা! নিজের নির্জন রুমেও লজ্জা-লজ্জা করতে লাগলো তার।

রিক্সা চলেছে। রাস্তাটা হঠাৎ একটু উঁচু হয়ে গেছে। সামনে একটা চড়াই। রিক্সা চড়াই ভাঙতে পারবে না।—রাস্তার মাঝখানে একটা সাঁকো। সন্ধ্যে হয়ে গেছে তখন। রিক্সা ছেড়ে ওরা এগিয়ে গেল। নন্দিনীর বেশ মনে আছে—, মুরারিবাবু বলেছিল: কোথাও কি একটু নির্জন জায়গা পাওয়া যাবে! চলুন, ওই সাঁকোর তলায় যাই।

নন্দিনী এই কথা ভাবতে গিয়ে আর একটা

কথা ভাবলো। তার ঠিক মনে পড়ছে না, সে সাঁকোর তলায় যেতে রাজী হয়েছিল কি না! বোধ হয় সাঁকোর তলাতে যাবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না তার। প্রতিবাদও করেছিল নাকি! না:, মনে পড়ছে না। হয়ত করেছিল, কিন্তু তবুও কি করে সে সাঁকোর তলায় গেল, এখন তা চেষ্টা করেও মনে করতে পারলো না নন্দিনী। ওরা গিয়ে সাঁকোর তলায় একটা মরা খালের ওপর দাঁড়ালো। ওখানে কোন লোক থাকার কথা নয়। কিন্তু একটা লোক ওখানে ছিল। বাধা হয়ে আর একধারে সরে যেতে হলো ওদের। মুরারিবাবুই তার হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর—। নন্দিনী চোখ বন্ধ করলো ভয়ে-ভয়ে। তারপর সেই ভয়ংকর মুহূর্তটি। নন্দিনীর চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গিয়েছিল ভয়ে। কোত্থেকে যে একটা বিরাট কুকুর ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো মুরারিবাবুর ওপর, কে জানে? নন্দিনী সত্যিই অস্ফুট চিৎকার করে উঠেছিল স্বপ্নের মধ্যে:— তারপর আর কিছু নেই। তবে কুকুরটার মুখের সঙ্গে শক্তিধর হাজরার মুখের মিল আছে যেন। ছিঃ—হাজরা মশাই এতো ভালো মানুষ যে তাঁর সম্পর্কে এমন কথা ভাবাও যায় না।

নন্দিনী উঠে হ্যারিকেনটা জ্বাললো।

চিঠিটা পড়ে আছে এখনো। খোলা দরকার। খুললো। হ্যারিকেনের আলোতে নিয়ে পড়লো আগা-গোড়া। হাতটা কেমন যেন কেঁপে উঠলো একবার। চিঠিটা কুণালই লিখেছে। স্তম্ভিত হয়ে গেল নন্দিনী। এ চিঠি গতানুগতিক নয়। এ চিঠিতে বৈচিত্র্য আছে। কুণাল লিখেছে: এই মাসেই আমার বিয়ে। পাত্রীকে তুমিও চেন। আমাদের পাড়ার হরগোবিন্দবাবুর মেয়ে করবী। বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র যথাসময়ে পাবে। এসো কিন্তু!

দাঁতে দাঁত টিপে বরফাহতের মতো নিস্পন্দ হয়ে গেল নন্দিনী। করবীকে সে চেনে। আই-এ পড়ে। তার সৌন্দর্যের খ্যাতিও আছে। কিন্তু ছিঃ ছিঃ, হরগোবিন্দবাবু আর পাত্র খুঁজে পেলেন না! ওই বিশ্রী চেহারার কুণাল রায়কেই পাত্র ঠিক করলেন তিনি? ভীমরতি আর কাকে বলে!

তারপর কুণাল রায়ের ওপর তার সমস্ত আক্রোশ গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবার। তার মনে হলো কুণাল রায় তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কবে যে সে কুণাল রায়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তা খুঁজে বার করবার চেষ্টাও করলো না নন্দিনী।

খামের মধ্যে চিঠিটাকে পুরে, ক্ষুব্ধা বাঘিনীর মতো নিশ্বাস ফেলতে লাগলো নন্দিনী। চিঠিটার গলা টিপে মারার জন্য ওটাকে হাতের মুঠোর মধ্যে দলা পাকাতে লাগলো সে।

রেবা এসে ঘরে ঢুকলো। বললো: শরীর কেমন আছে নন্দিনি! জ্বরটর নেই তো।

নন্দিনী রেবার মুখের দিকে তাকালো। রেবার মুখে কোনরূপ বিদ্রূপের চিহ্ন নেই—নন্দিনী বুঝতে পারলো। রেবার মুখে একটি অনাবিল আনন্দের উজ্জ্বলতা যেমন সব সময়ই থাকে, তেমনি মুখটি এখনো।

রেবা ফিস্ ফিস্ করে বললো: কি হলো নন্দিনি—?

নন্দিনী ততোক্ষণে সামলে নিয়েছে নিজেকে। মুখে একটু ম্লান হাসির রেখাও ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে। বললো: খুব রাগ হচ্ছিল। কুণালবাবুর স্পর্ধা দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি।

রেবা জানতে চাইলো আজ। বললো: কি হয়েছে?

নন্দিনী হঠাৎ গিয়ে হ্যারিকেনের শিখাটা একটু কমিয়ে দিল। তারপর প্রায় রেবার কানের গোড়ায় মুখ নিয়ে গালে গাল ঠেকিয়ে বললে: আমার কাছে বিয়ের কথা তুলেছিল। এত সস্তা পেয়েছে আমাকে? নন্‌সেন্স!

নন্দিনী চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো রেবার সামনে। রেবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো। স্থির দৃষ্টিতে দেখলো। নন্দিনীর জন্য ভারী দুঃখ হলো তার। কিন্তু কিচ্ছু বললো না। কিচ্ছু জানতেও চাইলো না আর। শুধু তার মনে হলো, এই কথাটুকু বলার জন্য নন্দিনী তার গালের ওপর গাল না রাখলেও পারতো।

ADOX

cameras

films

papers

THE BEST THAT MONEY CAN BUY

Due to drastic cuts in our Import Licences Adox Photographic materials are in short supply. Use them sparingly.

L. C. SETT & CO. PRIVATE LTD.
Calcutta-13 Madras-2 Bombay-18

R-157

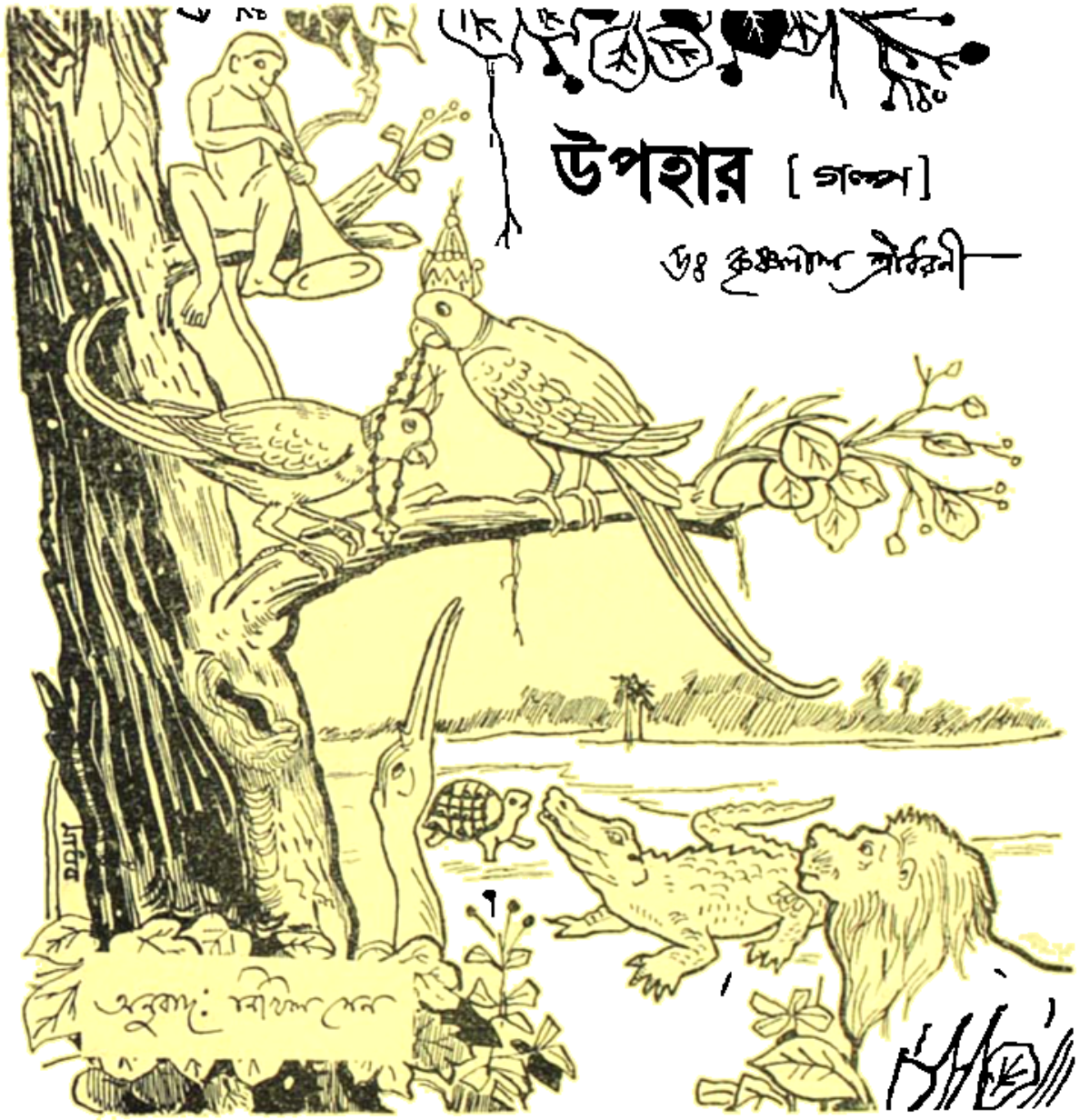

সেই আদ্দিকালের কথা।

লেকের ধারে ছিল প্রকাণ্ড এক বট গাছ। আর তার ঘন ডাল-পালায় এসে বাসা বেঁধেছিল রাজ্যের যত সব টীয়ে আর টীয়ে। বটের ফুলগুলিও ছিল টীয়ে পাখির ঠোঁটের মত লালে লাল। তাই দেখে রাজ্যের লোক বলাবলি করত : গাছ নয় গো যেন বনের অগ্নিশিখা!

লেকের ওধারেও ছিল তেমনি আর একটা বটগাছ। আর তার ঘন ডাল-পালার মধ্যেও বাসা বেঁধেছিল রাজ্যের যত টীয়ে পাখি। তাদের মধ্যে একটি পাখি ছিল দেখতে ভারী সুন্দর। লেজখানা ছিল বেশ লম্বা আর রঙের কি বাহার! যেন বন আলো-করা রাণী!

চাঁদনী রাতে আকাশ যখন রূপালী জ্যোৎস্নায়

ভরে ওঠে, ওপারের টীয়ে পাখি তখন গান গেয়ে ওঠে ওপারের টীয়ে পাখিকে শুনিয়ে শুনিয়ে :

লেজটি তোমার রাণীর পোষাক পারা
চক্ষে তোমার দুটি মুক্তা-তারা।
আমি তোমায় খুঁজে মরি জীবন ভোর।
তোমায় আমি খুঁজে বেড়াই প্রিয় মোর।

ওপার থেকেও তখন লেকের দমকা হাওয়ায় ভেসে আসে এমনি এক সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর :

রাজার মতন দেখতে তোমার লেজের বাহার
গানেও তোমার হয় না ভুল।
তোমার আমার মিলন কথা জানে সবাই
নিও, নিও, আমায় নিও, যেন হয় না ভুল॥

লেকের দু'ধারের দু'গাছের দু'বাসিন্দার মনের সাধ পূর্ণ হোল।

একদিন ঘটা করে টীয়ে-কন্যা আর টীয়ে-কুমারের বিয়ে হয়ে গেল। আর বিয়েতে যারা নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল তাদের অনেকের মধ্যে ছিল বটগাছেরই বাসিন্দা এক বানর, লেকের জলের এক কুমীর আর তার গিন্নী, কাছিম ভাই আর লম্বা ঠোঁটওয়ালা এক ধনেশ পাখি। বনের রাজা সিংহমশাইও অবশ্য বাদ গেলেন না। তিনিও মাননীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিয়ের উপহারস্বরূপ ওরা তখন সবাই উপহার দিয়ে গেল নিজ নিজ বন্ধুকে। আর তাই পেয়ে টীয়ে দম্পতির তো আনন্দ ধরে না। ভাবলে, হায়দরাবাদের নিজাম কোন ছার! তাঁর চেয়েও মস্ত ধনী হোল ওরা এই বন্ধুর লাভ করে।

দিন যায়।

কিছুদিন পর টীয়ে-গিন্নী সাদা চকচকে চারটি ডিম পাড়লে আর যথাকালে ডিমগুলি ফেটে চারটি ছোট ছোট টীয়ের ছানা বেরিয়ে পড়ল।

ছানাগুলি দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠল। তবে উড়তে শেখেনি এখনো।

এমন সময় একদিন হোল কি, কোত্থেকে দুই শিকারী এসে উপস্থিত হোল লেকের ধারে মাছ ধরতে। মাছ ধরতে যেই না জলে নামা, অমনি এক ঝাঁক মশা এসে ঝেঁকে ধরল দু'জনকে। মশা তাড়াতে গিয়ে ওরা তখন জ্বালাল খানিকটা আগুন। আগুনের ধোঁয়াটা তখন গোলাকার হয়ে উঠতে লাগল ওপরের দিকে আর এসে লাগল কচি ছানা-গুলোর চোখে। যন্ত্রণায় ছানাগুলি কেঁদে উঠল কিচমিচ স্বরে। ওদের কান্না শুনে শিকারী দুজন মুখ তুলে তাকাল।

কি সৌভাগ্য! — শিকারী দু'জন একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল।—সারাদিন টো টো করে খালি ঘুরে মরলাম। একটা কিছু যদি জুটত। তাই তো লেকের জলে মাছ ধরতে আসা। আগুনটা জ্বেলে ভালই হোল। রোস্ট খাওয়া যাবে ছানাগুলোর।

টীয়ে আর টীয়ে-গিন্নীর কানে গেল কথাগুলো। ছানাগুলোকে রক্ষা করবার জন্য ওরা ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু ওরা করে কি? হঠাৎ তাদের তখন মনে পড়ল, বিয়ের দিনের সেই আজব উপহারের কথা। টীয়ে পাখি তখনই পাখা ঝাপটিয়ে ছুটল লম্বা ঠোঁটওয়ালা সেই ধনেশ পাখির কাছে। বলল :

'মহা বিপদে পড়েই ছুটে এলাম ভাই। কোত্থেকে দু'জন শিকারী এসে আমাদের বটগাছের নীচে আগুন জ্বালিয়ে বসেছে, আর বলাবলি করছে আমাদের ছানাগুলোকে খাবে রোস্ট করে।'

টীয়ে-গিন্নী শিউরে উঠল। আবার বলল : 'এখন তোমাদের যা করবার কর ভাই।'

তা শুনে ধনেশ পাখি বিকট গলা খাঁকারি দিয়ে উঠল। বলল :

'তুমি নিশ্চিন্ত থেকো টীয়ে-গিন্নী। যা কিছু করবার আমিই করছি।'

এই বলে ধনেশ পাখি উড়ে চলল লেকের মধ্যিখানে। তারপর দিল ডুব। আর লম্বা ঠোঁটে করে বারে বারে জল নিয়ে এসে ছিটিয়ে দিতে লাগল শিকারীদের আগুনের উপর। সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে উঠল :

ঠোঁট ভর্তি জলের ছিট্
শীতল হোল অগ্নি-পীঠ !

শিকারী দু'জন তখন করে কি ? গাছে চড়ার কাস্ত দিয়ে আগুন আপাতেই ব্যস্ত হয়ে উঠল।

ধনেশ পাখি একটু ক্লান্ত হয়ে উঠতে না উঠতেই কাছিম ভাই তখন ছুটে এল। বিয়ের দিনের সেই আজব উপহারের কথা তার তখন মনে পড়ল। এসেই সে লেক থেকে গাদা গাদা কাদা নিয়ে এসে ছড়িয়ে দিতে লাগল আগুনের উপর। আর সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে উঠল :

গাদায় গাদায় কাদা
আগুনে দিলেম বাধা।

কাছিম দেখে শিকারীরা এদিকে টীয়ের ছানার কথা ভুলে গেল। কাছিমের তাজা মাংস ছেড়ে কে আর পাখির ছানার পিছু ছোটে !

কাছিমটাকে ধরতে তাই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। কাছিম ভায়াও সেয়ানা কম নয় : শিকারী-দের চোখে ধুলো দিয়ে সেও ছুটোছুটি করতে লাগল এদিক-ওদিক। কিন্তু শিকারীদের সঙ্গে সে কি আর এঁটে ওঠে ? ওরা তাকে বুঝি এই ধরে ফেলল। ঠিক এ সময় এসে হাজির হলেন বনের রাজা সিংহমশাই। টীয়ে পাখির বিয়ের সেই উপহারের কথা তাঁর মনে পড়ল।

সিংহমশাই তাই এগিয়ে এসে প্রকাণ্ড এক হুঙ্কার ছাড়লেন। আর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন :

এ নহে শুধু পশুরাজের গর্জন।
জ্বালয় জ্বালয় এ স্থান কর বর্জন।

তাই শুনে শিকারীদের পিলে উঠল চমকে। যে যেখানে ছিল সেখান থেকেই ভিজে কাপড়েই প্রাণ বাঁচিয়ে ওরা দিলে ছুট। আর মুখে শুধু এক রা : চাচা আপন বাঁচা !

যাক, ঠাঁক ছেড়ে বাঁচা গেল।

টীয়ে পাখি আর গিন্নী, ধনেশ পাখি, কাছিম ভাই আর সিংহমশাই—চার বন্ধুতে মিলে তারপর কত হাসাহাসি, গলাগলি আর আদর-আপ্যায়ন !

তারপর বিদায় নিয়ে যে যার বাড়ি গেল। আর বলে গেল : আপদে-বিপদে, সুখে-দুঃখে একে অপরের কথা যেন না ভোলে।

গল্পটি লেখক ঃ কৃষ্ণলাল শ্রীবাস্তব Upside Down Tree-র একটি গল্প থেকে অনুবাদ করেছেন—শ্রীনির্মল সেন।

সত্যসস্তায়-মৌলিকতায়-আধুনিকতায় ও নিপুনতায় নির্ভরযোগ্য!
মনোরম বিবাহের বিছানা
শৈলনাল মণিলাল
১৬৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২ ••• ফোন : ৩৪-২১৬
মনোমত অর্ডারী পোষাক

দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে একটার পর একটা তাঁবু পড়েছে। কিন্তু ওগুলো তাঁবু নয়। মুরগী রাখবার এক একটা দোচালা ঘর। পোলট্রি ফার্মের ভাষায় বলে 'পেন'। প্রত্যেক পেনের নম্বর আছে। সব সময় মোরগ আর মুরগীদের মিলিত কলরবে মুখরিত থাকে প্রত্যেকটি পেন।

সকালের রোদ সোনার আলোর নত করে ঝরে পড়ছে পোলট্রির মাঠের দিকে দিকে। লীলা, রেবা, হেনা, সুলেখা আরও সব এগ-ট্যাপাররা প্রত্যেকটি পেনে ছুটোছুটি করে ডিম সংগ্রহ করছে।

—লেডিস বক্সের ঢাকনা তোলো তো লীলা, বহুদিনের পুরনো অভিজ্ঞ এগ-ট্যাপার সুলেখা বলল।

পেনের পাশেই যে ছোট খাঁচায় মুরগীরা ডিম পাড়ে তার ঢাকনা তুলল লীলা। দেখা গেল, সদ্যপ্রসূতি একটি হোয়াইট লেগহর্ণ মুরগী গম্ভীর ভাবে তার ডিমে তা দিচ্ছে!

—মুরগীটার পায়ে-বাঁধা টিকিটের নাম্বারটি নোট কর লীলা, বলেই মুরগীটাকে তাড়িয়ে দিয়ে ডিমটা তুলে নিল সুলেখা।

—ত্রিশ নম্বর মুরগী সুলেখাদি!

—পেন নাম্বার একশো সত্তর। তাহলে ডিমটার গায়ে পেন্সিল দিয়ে লেখ একশো সত্তর, তার নীচে টান দিয়ে লেখ ত্রিশ, তার নীচে আবার টান দিয়ে লেখ আজকের ডেট—চোদ্দই জুলাই। সুলেখার নির্দেশমত লীলা ডিমের গায়ে পেন্সিল দিয়ে লিখল সব। ওদিকে রেবা আর হেনা পেনের পর পেনে ছুটে ছুটে ডিম কুড়োচ্ছে, একজন পেন নম্বর, মুরগীর নম্বর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে আর একজন বিদ্যুতগতিতে লিখে চলেছে। চোরা চোখে লীলার ঢেঁড়া ঢেঁড়া বেগুনী শাড়ি পেঁচিয়ে পরা দীর্ঘল চেহারাটার দিকে তাকিয়ে বলল রেবা—দেখ হেনা, ও এগ-টেস্ট ঘরে যাওয়ার জন্য কি রকম ছটফট করছে!

—হ্যাঁ। ওর সঙ্গে সুলেখাদি বৃথাই বক বক

বর্ণ সৌরভে উজ্জ্বল
উৎসব সমারোহ
দূরত্বের আত্মীয়
পরিজনের সান্নিধ্য
উজ্জ্বলতর হোক....

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

MEDIUMISE-P60

করছে। কাজ শিখতে ওর ভারী বয়েই গেছে—

—ও এসেছে তো ঐ করতে! তীব্র বিদ্রূপ ভরে হেসে উঠল রেবা। খোলা মাঠের সোঁ সোঁ হাওয়ায় ভেসে আসে রেবার হাসি। হাসিটা যেন লীলার বুকে তীরের মত বিঁধে যায়। যন্ত্রণায় চোখ বেয়ে জল এসে পড়ে। ওরা সেই প্রথম দিন থেকে তার পিছে লেগেছে কেন? সে ওদের কি করেছে!

বেলা বাড়ে। লীলার টুকরি ডিমে বোঝাই হয়ে ওঠে। কাছে দূরে সব পেন থেকে এগ-টাপারদের খুক খুক হাসির ফাঁকে ফাঁকে টুকরো টুকরো কথার গুঞ্জন শুনতে পায় লীলা। নিশ্চয়ই তাকে নিয়ে কথা হচ্ছে। সে ডিমের টুকরি নিয়ে কড়ের মত এগ-টেস্টিং রুমে এল।

—তড়িৎদা, কিছু মনে করো না। আমি এখানে চাকরি করতে পারবো না। কান্নার আভাসে ভারী হয়ে উঠল তার গলার স্বর।

হাইপাওয়ার ইলেকট্রিক বালবের জোরালো আলোর সামনে একটা ডিম ধরে রেখে চোখ কুঞ্চিত করে কি দেখতে দেখতে বলল তড়িৎ—দেখেছো লীলা, ডিমটার গায়ে কত অসংখ্য ব্লাড স্পট, রক্তের এত ছিঁটে ফোটা দাগ—

—আমি তোমাকে কি বলছি তড়িৎদা শুনছো?

চমকে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল তড়িৎ। খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলো একটু চুলকে বলল—প্রথম প্রথম ওরকম একটু হয়ই লীলা। পরে দেখবে একবারে ফ্যামিলির মত হয়ে যাবে! আবার ডিম পরীক্ষায় মন দিল তড়িৎ।

এই মানুষটার সঙ্গে কথা বলাও যা দেওয়ালের সঙ্গে কথা বলাও তাই! একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সদ্য সংগ্রহ করা ডিমগুলোকে সাজিয়ে রেখে লীলা বলল—আমি যাচ্ছি তড়িৎদা।

কোন উত্তর দিল না তড়িৎ। লীলা নিঃশব্দে চলে গেল।

আলোকনগর কলোনীর শেষ প্রান্তে একটা হেলে-পড়া মাটির ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল লীলা। ছুটে এল ছোট ছোট দুই ভাই বোন। বলল, দিদি কি এনেছিস?

—লীলা, আমার জন্য একটু আফিংয়ের খোঁজ নিয়ে আসবি—কথা ছিল, রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠল গিরিবালা। লীলার হঠাৎ মনে হল, সে যেন এই অভাবের সংসারটার চাকা ঘোরানোর একটা যন্ত্র মাত্র! ওরা মনে করে ওদের অভাব অভিযোগ তার কাছে পেশ করলেই একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই!

—আজ ফার্মে বড় কাজের ভিড় ছিল মা। আফিংয়ের খোঁজ নিতে পারি নি!

—লীলা, তোদের কি ডেলী বেসিসে মাইনে দেয় না কি রে? উঠোনের এক কোণে বসে খবরের কাগজের ওপরে কলমের স্ট্রাগেসের উল্টো দিক দিয়ে পার্টির পোস্টার লিখতে লিখতে উঠে এল লোকেন। মুখখানা করুণ করে বলল—আমাকে আট আনা পয়সা দিবি লীলা?

লীলার বিষাদভরা চোখে চাপা হাসির আলো ফুটে উঠল। অস্ফুটস্বরে বলল—দেব দাদা।

হঠাৎ অসময়ে বাইরে রাস্তায় হুতোর শব্দ বেজে ওঠে। মিষ্টি হেসে অভ্যর্থনা করে গিরিবালা। গলা চড়িয়ে ডাকে—ওরে লীলা, এদিকে আয় তোর তড়িৎদা এসেছে—

তড়িৎদা এখন! বুকের ভেতরটা দুলে উঠল লীলার। সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই তড়িৎ বলল—তুমি না কি আর চাকরি করবে না বলে এসেছ হুলেবাদিকেও?

—হ্যাঁ তড়িৎদা। তোমাকেও তো বলেছি। ওরা—

—না, না এমন সর্বনাশ করো না লীলা। ভেব না তোমার এটা কেবল এগ-ট্যাপারের চাকরি। হাঁস মুরগীর ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানো, সেই বাচ্চাকে রেয়ারিং করা অর্থাৎ পোষা, আবার মুরগীগুলো থেকে ডিম উৎপাদন ইত্যাদি পোলট্রির ট্রেনিং দেওয়াই আমাদের ফার্মের উদ্দেশ্য। ভবিষ্যতে—

—থামো থামো হয়েছে। রাতদিন শুধু পোলট্রি আর পোলট্রি। একটু থামল লীলা। হাসি-মাখা অপলক দুটো চোখে তার ঘামভেজা মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখে।

তড়িৎ বলে—কি দেখছ অমন করে?

—দেখছি তোমাকে। তুমি কি কিছুই বুঝতে পারো না তড়িৎদা। আমার জন্যই ফার্মে তোমার বদনাম হয়ে যাবে—

বদনাম! যেন এমন বিচিত্র কথা কোন দিন শোনেনি তড়িৎ। কয়েক মুহূর্ত বিস্মিত চোখে লীলার গম্ভীর মুখখানার দিকে তাকিয়ে আবার বলে—তোমার ভালোর জন্যই বলছিলাম। আর—আরও কি যেন বলতে চেয়েছিল তড়িৎ। কিন্তু বলল না। মাথা নীচু করে চলে গেল।

—তুই কি সাপের পাঁচ পা দেখেছিস লীলা! গিরিবালা বিরক্ত হয়ে বলে, তড়িৎ কত চেষ্টা করে তোর চাকরি করে দিয়েছে। সরকারী চাকরি। লোকে মাথা খুঁড়লে পায় না। একটু থামল। হাসি হাসি মুখে আবার বলল—তুই তো সবই বুঝিস লীলা! তড়িৎ শুধু দেশের লোক, এক গ্রামের লোক বলে নয়; ও তোকে ভুল—

—হয়েছে মা থামো—থামো—লীলার কণ্ঠস্বরটা কেমন করুণ শোনালো। ভাবল, পরের ঘরের বৌ হয়ে গেলে কে এদের খাওয়াবে!

বিখ্যাত "শঙ্খ ও পদ্ম" মার্কা গেঞ্জি
ব্যবহার করুন
★ ★ ★
ডি. এন. বসুর হোসিয়ারী ফাক্টরী
৩৬।১।এ, সরকার লেন, কলিকাতা-৭
ফোন—৩৫-২৯৭১

রিটেল ডিপো হোসিয়ারী হাউস
৫৫।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোন: ৩৪-২৯৯৫

একশো আশি নম্বর পেনে ডিম আনতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল লীলা। এখানে রোড আইল্যাণ্ড রেড জাতের একটা মোরগ আর দশটা মুরগী থাকে। এগ-ট্যাপাররা বলে এক রাজার দশ রাণী। পেনের বাইরে একটা উঁচু ঢিবির ওপরে সম্রাটের মত দৃপ্তভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রয়েছে মোরগটি। আর দশটা মুরগী একসঙ্গে তার মাথায় গায়ে পায়ে আদর করে ভালবেসে ঠুকরে ঠুকরে একেবারে অস্থির করে তুলেছে। একটি প্রণয়ীকে ঘিরে প্রণয়িনীদের তৃপ্তিহীন অফুরান গুঞ্জনে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠেছে। প্রণয়বিহ্বল পক্ষীকুলের দিকে তাকিয়ে লীলার চোখদুটোর দৃষ্টি মুগ্ধ হয়ে গেল। সকালের নরম রোদে ধোয়া এই পৃথিবীকে, পোলট্রির ঘন সবুজ মাঠকে তার বড় ভাল লাগল।

—দেখেছো লীলা, কক্‌টাকে নিয়ে কি রকম করছে ওরা! সুলেখা বলল। লীলা তার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল।

আশ্চর্য! সুলেখার চোখের দৃষ্টিও সুন্দর হয়ে উঠেছে। তার মুখখানা কঠিন হয়ে গেছে যেন সুদূরকালের কোন দুঃস্মৃতির পীড়নে। মৃদু অস্ফুটস্বরে বলল—ওরাও আমাদের মত পুরুষকে বড় বেশী খাতির করে।

সুলেখার ধূ-ধূ রুক্ষ সাদা সিঁথির দিকে তাকিয়ে তার বুকের ভেতরটা শির শির করে উঠল।

—তুমি খুব আঘাত পেয়েছো সুলেখাদি!

শান্ত একটা হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ল সুলেখার মুখে। বলল, একশো আশি নম্বর পেনে কয়টা ডিম পেলে লীলা?

রেবা হেনাদের তীক্ষ্ণ ঠাট্টা বিদ্রূপকে অগ্রাহ্য করেও লীলা এগ-টেস্টিং রুমে আসে। কাজের প্রয়োজনটুকু শেষ হয়ে গেলেও তড়িতের আত্মনিমগ্ন মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে।

কোন কোনদিন হয়তো তড়িৎ ডেকে বলে—এসো তো লীলা, যে সব ডিমের হ্যাচেবিলিটি রয়েছে, সেগুলো টেবল-এগ থেকে আলাদা করে রাখবে—

—মানে?

হো হো করে হেসে ওঠে তড়িৎ। লীলার এই অজ্ঞতাই যেন একটা মস্ত বড় বোকামী।

—দেখবে যে ডিমটির সেলটা মানে খোলাটা খুব পাতলা এবং চক্‌চকে, রঙটা একটু রক্তাভ এবং ওজনে বেশ ভারী, সেই ডিমগুলো থেকে বাচ্চা ফোটানো সম্ভব। তাকেই বলে হ্যাচেব্‌ল এগ—

—বা রে? কোনদিন এসব কথা বলেছো—শিখিয়ে দিয়েছো? বলেই লীলা কোমরে আঁচল জড়িয়ে মুখে কিকিমিকি হাসি ফুটিয়ে ডিম পরীক্ষা করতে বসে। ওর কাজের প্রতি তন্ময়তা দেখে তড়িৎও খুব খুশি হয়। বলে—লীলা, তুমি আর আমি যদি দুজনে মিলে একটা পোলট্রি ফার্ম করি। তাহলে—

—নিজেই খেতে পাই না ভাল করে মুরগী পুষবো কি করে তড়িৎদা?

কিন্তু লীলা এড়িয়ে যেতে চাইলেও পোলট্রি ফার্মের চিন্তাটা তড়িৎকে যেন একেবারে পাগল করে তোলে।

দিন কাটে। পেনে ঘুরে ঘুরে ডিম সংগ্রহের কাজে আর লাইটের আলোয় হ্যাচেবিলিটি পরীক্ষা করতে সুদক্ষ হয়ে ওঠে লীলা।

—ওর কী! আগে থেকে তড়িৎবাবুর সঙ্গে একটা রিলেশন করেই এসেছে! হিংসায় চক চক করে রেবার চোখদুটো।

—কয়দিন থেকে লক্ষ্য করছি। রোজ বিকেলে ওরা একসঙ্গে বাড়ি যায়।

—তার মানে—হয়ে গেছে আর কি! ভ্রূদুটো নাচিয়ে বিচিত্র একটা মুখভঙ্গী করে রেবা।

সব কথাই কানে আসে লীলার। প্রথম প্রথম

ওদের যে বিদ্রূপভরা কথা শুনে বুকের ভেতরটা জ্বলে যেত, এখন সেই কথাগুলোই তার মনের গোপন কোণের একটা আশাকে রঙীন করে তোলে। আবার ভয়ও হয়। হয়তো তার অবয়বহীন অন্ধকার জীবনে যে রামধনুর কিলিমিলি ফুটেছে, তা নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাবে! শুধু সত্য হয়ে থাকবে বিষাক্ত আর কুৎসিত ঐ কথার জ্বালা! তার হাত পা অবশ হয়ে আসে। বুকের ভেতরটা কাঁপে।

একদিন তড়িৎ বলল—লীলা আমি কাল বিকেলে চৌহাট্টি বলে একটা জায়গা—এই কলকাতা থেকে বাইশ তেইশ মাইল দূরে যাবো।

—কেন, চাষীদের পোলট্রি ট্রেনিং দিতে?

—কতকটা তাই বলতে পারো। তিনটা রিফিউজি পরিবারকে পঁচিশটা করে হাঁস ও মুরগী দিয়েছিল আমাদের ফার্ম। ওদের ডিম পরীক্ষা করতে যেতে হবে। একটু থেমে লীলার কানে কানে কি যেন বলতেই অসহ্য একটা লজ্জায় বিচিত্র রূপে রূপবতী হয়ে উঠল লীলা। স্বপ্ন নেমে এল তার চোখে। তড়িৎ সেই স্বপ্নাচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেও স্বপ্নাতুর হয়ে ওঠে। বলে—কি ভাবছো লীলা!

কিছুক্ষণ কথা বেরোয় না তার মুখ দিয়ে। পরে কতকটা যেন আপন মনেই বলে, সব পারবো—তুমি পাশে থাকলেই সব পারবো তড়িৎদা!

তড়িৎ আর কোন কিছু না ভেবে মেতে ওঠে পোলট্রি ফার্ম নিয়ে। নিজের কাজের ফাঁকে ফাঁকে কাগজের ওপরে পেন্সিল দিয়ে অঙ্কের পর অঙ্ক কষে চলে। ডিম জমা দিতে এলেই লীলাকে ডাকে।

—শোন লীলা, ফার্মের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বলেছেন, পঁচিশটা খুব হেলদি আর প্রোডাক্টিভিটি

ফোন : ২২— {৭১৩১ / ৭১৩২} গ্রাম : গ্লাস ভ্যারাইটি

উচ্চশ্রেণীর নানাবিধ কাঁচশিল্প প্রস্তুতের একমাত্র বিশ্বস্ত কারখানা—

অশোক গ্লাস ওয়ার্কস

৯নং এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১

অশোকের বিশেষত্ব :

- নিত্য নূতন ডিজাইন
- সস্তা ও মজবুত
- স্বচ্ছ কাঁচের তৈয়ারী
- নিখুঁত প্যাকিং

—: সত্বর সরবরাহ :—

শো-রুম—

৫, লুকাস লেন, কলিকাতা—১

কারখানা—১৮৯, গিরীশ ঘোষ রোড—বেলুড় (হাওড়া)

ফোন : ৬৬-২২৫৫

করছে এমন মুরগী আমাকে দেবেন। আর মোরগ দেবেন তিনটা—

—কোন্ জাতের দেবেন, রোড আইল্যাণ্ড রেড?

—হ্যাঁ। তাহলে তিনটা ককের ফ্যামিলির জন্ত তিনটা পেন আমাদের বানাতে হবে। তারপরে তাদের চিকেনগুলো রাখবার জন্ত জাল দেওয়া ঘর মানে ক্রডার-ও তৈরী করতে হবে। উৎসাহে তড়িতের চোখছুটো জলজল করে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মুখে চিন্তার ছায়া নামে। বলল—মুরগীর ঘর বানাতেই বহু টাকার দরকার লীলা। কোথায় পাবো টাকা—

—সেসব ব্যবস্থা হবে তড়িৎদা। তুমি পঁচিশটা মুরগী নিয়ে এস তো আগে।

অশোকনগর কলোনীতে রাত নেমেছে ঘন হয়ে। ঘুম নেই লীলার চোখে। কাগজের ঠোঙ্গা বানাতে বানাতে ঘুমে এলিয়ে পড়েছে গিরিবালা। পা টিপে টিপে উঠে এসে টিনের সুটকেসটা খুলল লীলা। ল্যাম্পের ছায়া-কাঁপা আলোয় ঝকমক করে উঠল একজোড়া কঙ্কন! অভাবের সংসার থেকে বহু কষ্টে তিল তিল সঞ্চয় করে সে তৈরী করেছিল। কঙ্কন ছুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। ঐ ছুটো পরেই সে একদিন বিয়ের বেশে সাজবে ভেবেছিল! তা হোক। ওর ফার্ম করার স্বপ্নই সফল হোক। সে বরের সোনা পরবে।

রাত আরও গভীর হলো। লীলা ঘরের কালি-ঢালা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তড়িৎ আর তার পোলট্রি ফার্মের কথাই একমনে ভাবতে লাগল। কোন্ খাদ্য খেলে মুরগীরা বেশী ডিম দেয়, বাচ্চারা ডিমের খোলা থেকে বেরিয়ে আসার পরই কত ডিগ্রী টেম্পারেচারে রাখা দরকার, তারপরে তাদের টিকা দেওয়া থেকে শুরু করে সব কাজ এত সুন্দর জানে তড়িৎদা! ও ফার্ম করলেই নির্ঘাত লাভ হবে। তারপর? একটার পর একটা রঙীন ছবি ভিড় করে এল মনে। একটু একটু করে চোখ ছুটোও ঘুমে জড়িয়ে আসতে লাগল। ঘুমের ঢেউ এসে টুকরো টুকরো সোনার স্বপ্নগুলোকে যেন ফুলের ঢেঁড়া ঢেঁড়া পাপড়ির মত দূরে—বহুদূরে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তলিয়ে নিয়ে গেল।

কয়েকদিন পর। তড়িৎ অশোকনগর কলোনীর সামনেই এক বিঘা জমির ওপরে পেন তৈরী করতে শুরু করল। পোলট্রির জন্ত মুরগী দেওয়ার সময় সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হেসে বললেন—তড়িৎ, তুমি তাহলে স্বাধীনভাবে পোলট্রিই খুলছো? চাকরি আর করবে না তো? তড়িৎ হাসে। আর দাড়ি চুলকোয়। সলজ্জ-ভাবে বলে—এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখি। যদি পেটের ভাতটা—থেমে যায় তড়িৎ। হয়তো মনে পড়ে যায় লীলাকে। পেট একটা নয়। ছুটো। এগ-গ্রেডিং আর এগ-ওয়াশিং সেকশনে কাজ করে সুকুমার। সে টিপ্পনী কাটল—বৌকে এগ-ট্যাপারের চাকরি থেকে ছাড়িয়ে নিও না। পার্ট টাইম এখানে কাজ করালে দেখবে বৌ বেশ কামধেনু গাভীর মত—

—বৌ কে সুকুমার?

—আহা ন্যাকা যেন। বাবা তুমি যতই পোলট্রি-পাগল হও, ডুবে ডুবে জল খেতে ওস্তাদ আছো—

পোলট্রির কাজে তড়িতের এই অসম্ভব মনোযোগ-টাকে সহকর্মীরা কেউ সহ্য করতে পারে না। কেউ কেউ তড়িৎকে একটু বোকাও মনে করে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শুধু বলে, হ্যাঁ, পোলট্রির কাজ শিখতে হলে ঐ তড়িতের মত হতে হবে। বার্ডসের ওপরে কী সিম্প্যাথি ওর!

সেই একশো আশি নম্বর পেনের সামনে দাঁড়িয়ে রোড আইল্যাণ্ড রেডদের উচ্ছ্বসিত প্রণয় চাঞ্চল্যের

দিকে তাকিয়ে বলল সুলেখা—তোমরা দেরি করছো কেন লীলা? এসব ব্যাপার এত ডেলিকেট!

—ফার্মটা একটু চালু হোক সুলেখাদি।

—দেখ—দেখ লীলা কক্‌টা কি রকমে ছুটছে! আর তেইশ নম্বর হেনটা ওকে ধরার জন্য কি রকম করছে! ছেলেমানুষের মত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে সুলেখা। কিন্তু লীলা কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। কক আর হেনের ছুটোছুটির ঐ ইঙ্গিতটা কেন দিল সুলেখাদি?

তড়িৎদা এখন বুঝি আর পাত্তা দিচ্ছে না। হাওয়ায় ভেসে এল হেনা রেবাদের টুকরো টুকরো কথা। তীব্র একটা ব্যথায় যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল তার বুকটা। কেমন একটা হীনমন্যতায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠল তার মন। ওরা কি ভাবে, সে-ই ন্যাংলামি করছে তড়িতের সঙ্গে!

তারপর একদিন কেটে গেল। লীলা কাজে এল না। এল না তারপরের দিনও। কি হলো লীলার! এগ-ট্যাপাররা পেন থেকে ডিম সংগ্রহ করে আর তড়িৎ আর লীলাকে নিয়ে আলোচনা করে।

রেবা। তড়িৎদার মা-বাবা কেউ নেই। ছোট্ট একটা বোন শুধু। লীলা খুব সুখীই হবে।

হেনা। ধুর! মেয়ে হয়েও পুরুষকে স্টাডি করতে ভুল করিস। এগ-টেস্টিং করা ছাড়া তড়িৎদা বিশ্ব-সংসারে আর কিছু বোঝে না কি? একেবারে ব্লাণ্ট!

সুলেখা। যতই 'ব্লাণ্ট' হোক, তড়িৎ ওকে ভালবাসে। বিয়ে ঠিকই হবে। তোমাদের না দিক—আমাকে একটা খবর না দিয়ে পারবে না লীলা।

কিন্তু সুলেখাকে বিস্মিত করে দিয়ে একেবারেই তাকে না জানিয়েই লীলা বিয়ে করতে পারল!

একমাস পর। সুলেখা লেয়িং বক্স থেকে ডিম নিয়ে নিয়ে টুকরিতে রাখছে। একশো আশী নম্বর পেনে আসতেই লীলার কথা তার মনে পড়ল। হয়তো সুখীই হয়েছে লীলা! বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—সুলেখাদি!

কে! লীলা! বেশ যা হোক। বিয়ে করলে আমাকে একটা খবর পর্যন্ত দিলে না! সুলেখা অনুযোগ করল। কিন্তু লীলার মুখের দিকে তাকিয়ে তার চোখের স্থির দৃষ্টি মুগ্ধ হয়ে গেল। পাউডার পমেটের প্রলেপে উজ্জ্বল মুখখানায় হাসি ঝিকমিক করছে। মস্তবড় কালো গম্বুজের মত খোঁপায় রজনীগন্ধার কুঁড়ি হাসছে। যেন কিসের একটা সুখের আবেগ ওর মনের ভেতরের সব জ্বালা যন্ত্রণা জুড়িয়ে দিয়ে চোখদুটোর দৃষ্টি কী স্নিগ্ধ করে তুলেছে!

—তেইশ নম্বর হেন এখনও রোড আইল্যাণ্ড রেডের ককটাকে ধরার জন্য ছুটোছুটি করছে সুলেখাদি? ধারালো আর গর্বিত একটুকরো হাসি জ্বলজ্বল করে লীলার ঠোঁটের কোণে।

লীলা চলে যাওয়ার পরই কেটে পড়ল রেবা হেনাদের দলটা—ওর বিয়ে হয়ে ও যে সুখী হয়েছে তাই জাঁক করে দেখাতে এসেছিল, বুঝলে সুলেখাদি! একটা চ্যালেঞ্জ!

গল্প এখানেই শেষ হতে পারতো। কিন্তু গল্প লেখার বাঁধা নিয়মে জীবন চলে না। মানুষের মন খুব জটিল ও দুর্জ্ঞেয় বলেই জীবনের গতিপথও জটিল।

তিনমাস যেতে না যেতে স্পষ্ট বুঝতে পারল লীলা, রেবাদের আশঙ্কা ব্যর্থ করে দিয়ে বেশ একটা চ্যালেঞ্জ দিয়ে তার একান্ত ভালবাসার যে মানুষটির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিল, সেই মানুষটির মনে মুরগী ছাড়া আর কোন কিছুর প্রতি কোন মমতা নেই, আকর্ষণ নেই!

ভেঙ্গে পড়ার মেয়ে লীলা নয়। ওর প্রতি তড়িতের নির্বিকার উদাসীনতাকে বেশ হেসে হেসে

সঙ্গ করে এক মনে নবনির্মিত পোলট্রির জন্ত উদয়াস্ত পরিশ্রম করে আর আশা করে একদিন তড়িৎ স্বীকার করবে তার অফুরন্ত ও নিবিড় ভালবাসাই তার একমাত্র স্বপ্নকে সার্থক করেছে! কিন্তু—

কিন্তু যখন গভীর রাতের নিরালায় পৃথিবীর দিকদিগন্ত শ্বেতচন্দনের মত জ্যোৎস্নায় স্নান করে, ঘরে ঘরে প্রিয়ার কণ্ঠলগ্ন হয়ে মানুষ কত মিষ্টি স্বপ্নের জাল বুনে বিনিদ্র রাত্রির প্রহরগুলোকে মধুময় করে তোলে তখনো তড়িতের মুখে ঐ সেই পোলট্রির কথা শুনলেই লীলার বুকের ভেতরটা জ্বলে যায়। ছ-ছ করে ওঠে মনটা। তার কাজলপরা চোখ দুটোর মোহমাখা দৃষ্টি, তার মনের গভীর আন্তরিক প্রীতি, এমন কি তার এত সাধের দেহটাও কি ওর মন থেকে এক মুহূর্তের জন্ত মুরগীর চিন্তাকে মুছে দিয়ে একটু চাঞ্চল্যের সাড়া জাগাতে পারে না!

এই জ্বালা-ধরা দুশ্চিন্তাটা দিনের পর দিন লীলার মনকে বিষাক্ত কীটের মত কুরে কুরে খেয়ে ফেলতে লাগল।

সরকারী ফার্ম থেকে যে পঁচিশটা মুরগী দিয়েছিল তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আজ দেড়শোরও ওপরে। কিন্তু তড়িতের মনে আক্ষেপের শেষ নেই। মুরগীরা ডিম বেশী দিচ্ছে না কেন; কেন বাচ্চাগুলো রিকেটি হয়ে জন্মাচ্ছে? তার বিশ্বাস সব দোষ লীলার। দুটার ছাড় বেশী করে মিশিয়ে ওদের খাদ্যের ফরমুলা অনুযায়ী খাবার তৈরী করে না, খেতেও দেয় না। এ সবই যদি করবে, তাহলে বাপের বাড়িতে খেয়ে ছোট ছোট ভাই বোন দুটোর তদারক করবে কে? তড়িৎ নিজের মনেই গজ গজ করে, মুরগীর বাচ্চা পোষা অত সোজা নয়। ওদের ওপর দরদ চাই। হ্যাঁ, চৌহাট্টির রিফিউজি মেয়েরা জানে কি করে পুষতে হয়!

কিছু বলে না লীলা। বুকের ভেতরটা তার পুড়ে যায়। তবুও শুকনো মরা অদ্ভুত একটা হাসি হেসে বলে—যতটুকু পারছি, ততটুকু তো করছি। আর—

কি যেন বলতে চেয়েছিল। পারল না। না, যাকে সে একদিন ভালবেসে বিয়ে করেছে তাকে আঘাত করতে পারবে না!

মাদ্রাজ আর অন্ধ্র থেকে ডিমের চালান আসে কলকাতার বাজারে। সাইজে বেশ বড় বড় সেই ডিমের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারে না তড়িতের ফার্মের ডিম। আর রোগা, হাড় জিরজিরে চিকেনগুলোর দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না! ব্যবসার অবস্থা যত মন্দা হয়, তত খিটিমিটি বেড়ে যায় তড়িতের।

ওদিকে লীলার মা বলে—বিয়ের পর একদিন তোর মুখে হাসি দেখলাম না লীলা। ভালবেসে বিয়ে করলি!

—না, না মা—শরীরটা খারাপ কি না! একটু থেমে বলে, আমি ওর ফার্মের সব কাজ জানি বলে কী ভালই বাসে আমাকে! মুখে হাসি টেনে বলে। কিন্তু জলে ভাসে চোখদুটো।

একদিন তড়িৎ মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। চৌহাট্টি রিফিউজি পোলট্রি ফার্ম থেকে ফিরে এসে ডিমের খোলা ভেঙে সদ্য বেরিয়ে আসা চিকেনগুলো রাখবার জন্ত জাল দিয়ে ঘেরা ঘরটার দিকে তাকিয়ে প্রথমটা তার মুখ দিয়ে কথা সরল না। দুহাতে বুক চেপে ধরে বসে পড়ল মাটিতে। বুকের ভেতরে থ্রম্বোসিসের স্ট্রোকের মত যেন নিদারুণ একটা ব্যথা পাক দিয়ে উঠছে। ঘরের এক কোণে ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল লীলা। তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় যেন জ্বলে পুড়ে বলল—আমাকে তুমি এমনি করে তিলে তিলে দগ্ধে না মেরে একেবারে মেরে ফেল খুন করো। উঃ, বলেই ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তারপরেই একটা বদ্ধ উন্মাদের মত চীৎকার করে বলল—বল আটটা বাচ্চা কি করে মারা

"কলম্বিয়া"

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

GE 25026 [illegible]

[illegible]

গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

GE 25017 [illegible]

[illegible]

পান্নালাল ভট্টাচার্য

GE 25018 [illegible]

[illegible]

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়

GE 25019 [illegible]

[illegible]

প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

GE 25020 [illegible]

[illegible]

গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়

GE 25021 [illegible]

[illegible]

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

GE 25022 [illegible]

[illegible]

গীতা দত্ত [illegible]

GE 25024 [illegible]

[illegible]

গায়ত্রী বসু

GE 25025 [illegible]

[illegible]

কীর্তন কলানিধি রথীন ঘোষ

GE 25026 [illegible]

[illegible]

কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়

GE 25027 [illegible]

[illegible]

"হিজ মাষ্টার্স ভয়েস"

কুমার শচীন দেব বর্মণ

P 11931 [illegible]

[illegible]

সতীনাথ মুখোপাধ্যায়

N 82887 [illegible]

[illegible]

উৎপলা সেন

N 82888 [illegible]

[illegible]

তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

N 82889 [illegible]

[illegible]

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

N 82890 [illegible]

[illegible]

সনৎ সিংহ

N 82891 [illegible]

[illegible]

নির্মলেন্দু চৌধুরী

N 82892 [illegible]

[illegible]

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

N 82893 [illegible]

[illegible]

ইলা বসু

[illegible]

[illegible]

মান্না দে

[illegible]

[illegible]

নির্মলা মিশ্র

N 82894 [illegible]

[illegible]

শ্যামল মিত্র

[illegible]

[illegible]

'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' ও কলম্বিয়া

গেল! ওদের হুড়োহুড়ি বন্ধ দেখছি কেন বাইরে নেই?

– ক্রসবারের তারের বেড়ায় ফুটো ছিল; তার ভেতর দিয়ে বোধ হয় বিড়াল কি শিয়াল গিয়েছিল!

সন্ধ্যা দিন গেল। রাত এল। বহু সাধ্যসাধনা করেও লীলা তাকে খাওয়াতে পারল না, নিজেও খেল না। হাসে ক্রসবারের পাশে ঘাসের উপরে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে রইল তড়িৎ। ঘরে গেল না।

বাইরে থেকে ঘরের ভেতরে কাঁপিচালা অন্ধকারে বিছানার শুয়ে থাকা ঔপোষী লীলার চাপা কান্নার শুরুগম্ভীর শব্দ শুনে বেশ আনন্দ পেল তড়িৎ। নিশ্চয়ই ও ঘরদুয়ার ফেলে রেখে বাপের বাড়ি গিয়েছিল। তার শাস্তি! কিন্তু কেঁদে কেঁদে লীলা কি সঙ্কল্প করল তা জানতে পারল না তড়িৎ।

পরদিন ভোরে রোড আইল্যাণ্ড রেড কক্‌টার ডাকে খুব ভোরেই তড়িতের। দেখল দরজা হাট করে খোলা। কোথাও নেই লীলা!

মুহূর্তের জন্য তার মনে হল গলায় দড়িটড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করল না কি! কিন্তু চিঁ চিঁ করে চিকেন-গুলো ডেকে উঠতেই ছুটল ওদের খাওয়াতে। খুব কঠিন অসুখের রোগীকে যেমন সব সময় চোখে চোখে রেখে সেবাযত্ন করতে হয় ঠিক তেমনি এ্যাটেনশন প্রয়োজন হয় মুরগীর বাচ্চা পুষতে। কেন যে লীলা তা বোঝে না!

পোলট্রি এলাকার তারের বেড়ার কাছে একটা কামরাঙ্গা গাছের আড়ালে দাঁড়ালো লীলা। তখনো ভোরের আলো ভাল করে ফোটেনি। এখুনি কেয়ারটেকার আসবে। পেনের দরজা খুলে দিয়ে মুরগীদের খেতে দেবে। সুলেখাদি তো এসে পড়ল বলে। কি বলবে সুলেখাদি হেনা রেবা! বিদ্রূপ আর করুণার হাসি হাসবে। হাসুক।

—এ কী লীলা, তুমি! কখন নিঃশব্দ পায়ে এসে দাঁড়িয়েছে সুলেখা, তার পিছনে এসেছে রেবা হেনা আরও সব এগ-ট্যাপাররা। লীলার শুকনো উপোষী মুখ, কালি-পড়া চোখ ছুটোর করুণ দৃষ্টির পাশেই ওর সেই পাউডার পমেটের প্রলেপে উজ্জ্বল, আত্ম-প্রসাদদীপ্ত মুখখানা ওদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ওদের কাছে সব যেন জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। মুখ তুলতেই লীলা দেখল তাকে ঘিরে রয়েছে সহানুভূতিতে নরম জোড়া-জোড়া চোখের দৃষ্টি।

—আবার চাকরি করবে বুঝি লীলা? সুলেখা বলল। কোন কথা বলল না লীলা। মাথাটা বাঁকালো। দৃঢ় একটা সঙ্কল্প তীব্র একটা আবেগ অনুভূতির মত ছড়িয়ে পড়ল তার শিরায় শিরায়। আবার সে চাকরি করবে। মাইনের টাকাটা দিয়ে চৌহাট্টি রিফিউজি পোলট্রি ফার্ম থেকে মুরগী পুষতে এক্সপার্ট একটা লোককে রাখবে। সে দেখবে, আশা করবে শেষ পর্যন্ত, যতদিন না ওর অসম্ভব মুরগী প্রীতিকেও ছাপিয়ে তার ভালবাসাটাই জয়ী হয়। হার সে মানবে না! যন্ত্রণায় চিবুক চোয়াল ঠোঁট দুমড়ে উঠল।

—লীলা, আমরা তোমার চাকরির জন্য চেষ্টা করবো, বলল রেবা হেনারা।

আশ্চর্য! কাউকে শোক পেতে দেখলে, দুঃখ পেতে দেখলে সামান্য আর ছোট, হিংসুটে লোক-গুলোও কত মহৎ, কত উদার হয়ে যায়।

বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে সে হাসতে চাইল। পারল না। আচমকা চোখ ফেটে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়ল।

সপর্যটিত কিংবদন্তী ও অন্ধবিশ্বাস

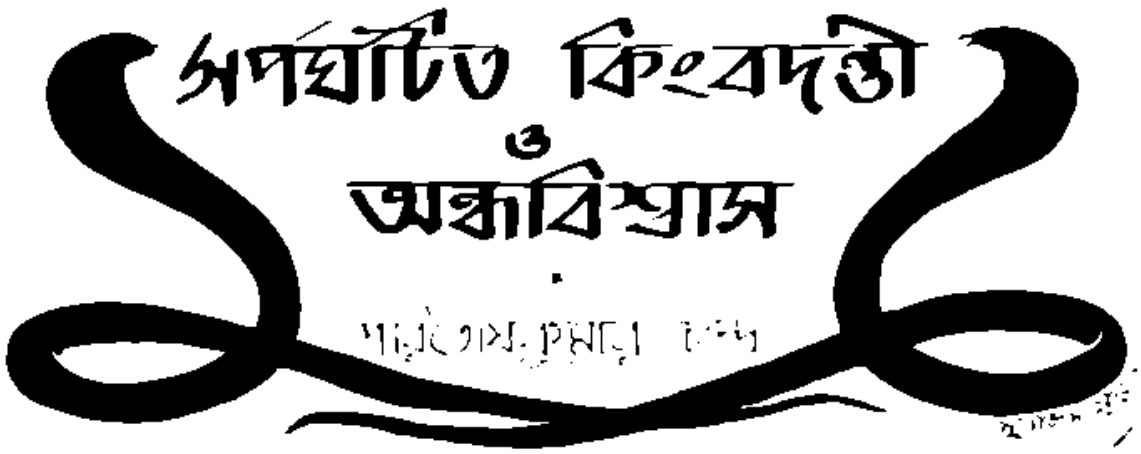

(গল্প

পশ্চিম বাংলাতেই অনেকে বিশ্বাস করে যে, গোখুরাসাপুনের মিলনের কালে যদি তাদের কাছে এক টুকরো কাপড় বা রুমাল ফেলে দেওয়া হয় এবং সর্পমিথুন আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় গড়াতে গড়াতে সেই কাপড়ের টুকরোটির ওপর ওঠে, তবে ওটি নাকি অলাউদ্দীনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো অদ্ভুত গুণসম্পন্ন হয়,—অর্থাৎ সেই কাপড়ের টুকরোটি সঙ্গে রেখে যে কাজেই হাত দেওয়া হোক না কেন তা সাফল্যমণ্ডিত হবেই হবে; কিন্তু যদি সর্পমিথুন তার ওপর না ওঠে, তবে সেই কাপড়ের টুকরোটি যে ফেলেছিল তার বংশে বাতি দিতে কেউই নাকি বেঁচে থাকবে না,—অর্থাৎ সে নির্বংশ হবে। এই ভয়ের ভয়েই বোধ হয় কেউই আজ পর্যন্ত এমন একটি সর্বকার্যসফলকারী অমূল্য দ্রব্যটি সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেনি। এই দেশেই মফস্বলে অনেক পুরানো গৃহস্থ বাড়িতে গোখুরা সাপকে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। এই সব সাপ 'বাস্তুসাপ' নামে অভিহিত হয়। সেই সব গৃহস্থ বাড়িতে এই বাস্তুসাপের উপস্থিতি মঙ্গল সূচিত করে। এই সাপ কেউ মারে না, কারণ মারলে নাকি গৃহস্থ নির্বংশ হয়।

এবারে কয়েকটি কিংবদন্তীর কথা বলা যাক। যদি কেউ সাপের স্বপ্ন দেখে তবে তার কোনো আত্মীয়ের নাকি সন্তান-সম্ভাবনা হয়। আবার কেউ যদি স্বপ্ন দেখে যে তাকে সাপে কামড়েছে তবে সে নাকি কোনোদিনই সর্পাঘাতে মরবে না। যদি কোনো গোখুরা সাপকে একেবারে না মেরে কেবল আহত করা হয়, তবে সেই সাপটা নাকি একদিন না একদিন আঘাত-কারীকে দংশন করবেই। আবার মারার পর যদি সাপটাকে পুড়িয়ে না ফেলা হয়, তবে হাওয়া লেগে সাপটা নাকি বেঁচে উঠবে এবং সুযোগ পেলেই আঘাতকারীকে কামড়াবে। গোখুরা সাপকে যদি দ্বিখণ্ডিত করা হয়, তবে তার পুচ্ছাংশ একটু একটু করে বেড়ে গিয়ে আবার আগের মতো পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায়। গোখুরা সাপ ছোবল মারলেই তার ল্যাজ নাকি একটু ছোট হয়ে যায়। এই ভাবে প্রতি ছোবলে একটু করে ল্যাজ ছোট হতে হতে সাপটা নাকি একেবারে ঝেঁড়ে মেরে যায়। আমাদের দেশে গ্রামবাসী অনেকেই মনে করে যে, গোখুরা সাপ মাত্রই স্ত্রীলিঙ্গ এবং নিরীহ দাঁড়াস বা ঢেমনা সাপ মাত্রই পুংলিঙ্গ। তাই কদাচিৎ এই দুই জাতীয় সাপের মধ্যেই মৈথুনমিলন ঘটে; কিন্তু এই মিলনের ফলে কেবলমাত্র দাঁড়াস (পুং) বা কেবলমাত্র গোখুরা (স্ত্রী) সাপই জন্মায় না, দাঁড়াস ও গোখুরা দুই জাতেরই সাপ জন্মায়।

মানব জাতির সৃষ্টির সেই আদি যুগ থেকেই সর্পপূজা প্রচলিত হয়েছে। বিষধর সাপের দংশনে মৃত্যু হয় এটা জেনেই সর্পদংশনে মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবার আশায় সাপের সন্তুষ্টির জন্যেই বোধ হয় সর্পপূজার প্রচলন হয়েছিল। আমেরিকার আদিবাসী রেডইণ্ডিয়ানদের মধ্যে, গ্রীসে, থাইলাণ্ডে, ইন্দোচীনে, বর্মায়, মিশরে এবং আমাদের এই ভারতবর্ষে কিছুকাল আগেও সর্পপূজার চলন ছিল। ভারত-বর্ষের অনেক স্থানে, বিশেষ করে দাক্ষিণাত্যে, নাগ দেবতার উদ্দেশ্যে নির্মিত বহু মন্দির আজও দেখতে পাওয়া যায়। পঞ্জিকাতে 'নাগপঞ্চমী' বলে যে বিশেষ দিনটির উল্লেখ আছে সেই দিনটি নাকি সর্পপূজার পক্ষে খুবই প্রশস্ত। ভারতবর্ষের অনেকস্থানে এখনও অনেকে সাপের পূজা করে। পশ্চিম বাংলায় অনেক স্থানে ভাইফোঁটা ও রথযাত্রার দিন মনসা দেবীর যে পূজা দেওয়া হয় সেটাও সর্পপূজার প্রকারভেদ। মা মনসা সর্পকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সুতরাং তাঁর তুষ্টিতে সর্পকুলও তুষ্ট হবে।

এবারে ওঝা-রোজা নামধারী তথাকথিত সর্পবিদ চিকিৎসকদের সম্বন্ধে কিছু বলা হলো। পৃথিবীর সব দেশেই, বিশেষ করে ভারতবর্ষে, আজও এমন লোক অনেক আছে যারা অজ্ঞতা বা অন্ধবিশ্বাসের জন্যে ওঝা-রোজাদের প্রভাব এড়াতে পারে না। এই সব লোকের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ওঝা-রোজারা সর্পদংশনের চিকিৎসার নামে অবাধে বুজরুকি চালিয়ে যাচ্ছে। রোজাদের পারদর্শিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলে তাদের ক্ষমতায় বিশ্বাসী যারা তারা বলে, এই যে মাঝে মাঝে প্রায়ই শোনা যায়, অমুক রোজা অমুক সাপে কাটা রুগীকে চিকিৎসা করে সারিয়ে দিয়েছে,—এসব কি তবে একেবারে বাজে কথা? অমুক গ্রামের কলানা সাপের কামড়ে মরেছিল বলে নদীতে তার মৃতদেহ ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। অমুক রোজা দেখতে পেয়ে সেই মড়া তুলে বাঁচিয়েছে। এটা আমার মামাশ্বশুরের বেয়াই-এর স্বচক্ষে দেখা। সেটাও কি অবিশ্বাস করবো? রোজাদের সম্বন্ধে লোকের এই যে বিশ্বাস সেটা কি এমনিতেই হয়েছে? সব রোজাই সব রুগীকে

আমাদের প্রকাশিত সকল পুস্তকই প্রতি গৃহে, প্রতি স্কুলে, প্রতি কলেজে, প্রতি পাঠাগারে রাখবার মতো

শ্রীনারায়ণ সান্যাল প্রণীত

বাস্তু-বিজ্ঞান মূল্য

Building Construction in Bengali
(For Contractors, B. E. Students, Overseers and General Public.)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত

মুক্তির সন্ধানে ভারত মূল্য ১০৲

(পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ৩য় সংস্করণ)

শ্রীসুপ্রকাশ রায় প্রণীত

ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস মূল্য—১০৲

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ প্রণীত

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য মূল্য—৭৲

শ্রীমৃণালকান্তি দাশগুপ্ত প্রণীত

পরমারাধ্যা শ্রীমা মূল্য—১৲৫০ নঃ পঃ

(পরিবর্ধিত ৩য় সংস্করণ)

শ্রীমৃণালকান্তি দাশগুপ্ত প্রণীত

মুক্তপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ মূল্য—৬৲

W. T. Webb, M. A. প্রণীত

EVERYBODY'S LETTER WRITER মূল্য—২৲

Revised 27th Edition, contains 500 Letters

ডঃ সুধীরকুমার নন্দী প্রণীত

দর্শন-চারিত্র্য

ভারতী বুক ষ্টল ঃ প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতা

৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট ঃ কলিকাতা - ৯

ফোন নং : ৩৪-৩১৩৮
গ্রাম : Granthalaya

হয়তো ভালো করতে পারে না, কিন্তু কয়েকটিকেও তো সারায়? কিন্তু একটা ভুল না থাকলে লোকে ওঝাদের ডাকবে কেন? এর উত্তরে বলবো, হ্যাঁ, সারায়। তবে কি ধরনের সাপে কাটা রুগীকে এরা বাঁচায় তা জানা দরকার।

ভারতবর্ষে উনত্রিশটি বিভিন্ন জাতের বিষধর সামুদ্রিক সাপ দেখতে পাওয়া যায়। বিষধর হলেও এরা খুবই নিরীহ প্রকৃতির হয় বলে এদের কামড়ে লোকের মৃত্যুর কথা খুব বেশী শোনা যায় না। এই সামুদ্রিক সাপ বাদে ৩০টি বিভিন্ন জাতের স্থলচর সাপের সন্ধান আজ পর্যন্ত এ দেশে পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে নির্বিষ জাতের সংখ্যা হলো ২৩১ আর বিষধর সাপের সংখ্যা হলো মাত্র ৩০টি। নির্বিষ ও বিষধর সাপের সংখ্যা দুটির আনুপাতিক হিসাব করলে দেখা যাবে যে, প্রতি একশটি সাপের মধ্যে বিষধর সাপের সংখ্যা হবে প্রায় পনেরোটি। নির্বিষ বিষধর নির্বিশেষে যদি সবগুলি সাপই কামড়ায় তবে প্রতি একশটি সর্পদংশনের মধ্যে বিষধর সাপের কামড়ের সংখ্যা হবে ঐ পনেরোটি। নির্বিষ সাপ সাধারণতঃ কামড়ায় না, তবে বিষধর সাপের তুলনায় নির্বিষ সাপের সংখ্যা প্রায় ছয়গুণ বলে কিছু সংখ্যক লোক যে নির্বিষ সাপেরও কামড় খায় তাতে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না।

ভারতবর্ষে দৈনিক গড়ে একশটি লোক সর্পাঘাতে মরে। এই একশটির মধ্যে একশটিই যে সাপের বিষে মরে তা নয়, বেশ কিছু সংখ্যক লোক মরে নির্বিষ সাপের কামড় খেয়ে সেরেফ আতঙ্কে। নির্বিষ সাপের কামড় খাবার পর সঙ্গে সঙ্গেই যারা আতঙ্কে না মরে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় থাকে, রোজারা চিকিৎসার নামে নানা ভড়ং করে তাদেরই ভালো করে রোজগার বাহাদুরি নেয়। তাছাড়া লোককে কামড়াবার আগে বিষধর সাপ অন্য কোনো প্রাণীকে কামড়াবার জন্যে বিষ নিঃশেষিত হলে বা বিষের মাত্রাল্পতা ঘটলে, অথবা পরিধেয়ের ওপরে ছোবল দেওয়ার ফলে কাপড়ে বিষ লেগে গেলে, অনেক সময় দংশনক্ষতে আদৌই বিষ সঞ্চারিত হয় না বা হলেও তা মারাত্মক হয় না। এই রকম সর্পদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসা করে সারিয়ে দেবার জন্যেও রোজারা জনসাধারণের কাছে বাহবা পায়।

ওঝা-রোজারা পারতপক্ষে জাত সাপের বিষের প্রভাবে মৃতকল্প রুগীর চিকিৎসা করতে রাজী হয় না। লোকের পেড়াপীড়িতে যদি নেহাতই রাজী হয়, তবে সর্পদষ্ট লোকটি যখন ঘরে যায় তখন 'কালিন্দী', 'কালনাগিনী' বা 'কালসাপ' নামধারী কোনো এক সাংঘাতিক মারাত্মক জাতের সাপ লোকটিকে কামড়েছে, যার বিষের চিকিৎসা করার সাধ্য ওদের নেই, ইত্যাদি অনেক কিছু বলে তারা সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখে মনে মনে সরে পড়ে। লোকেও তাদের সেই সব কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে এবং ভবিষ্যতে দরকার হলে তাদের আবার ডাকেও।

সাপের বিষ কাটবার, নামাবার বা টেনে নেবার ক্ষমতা-বিশিষ্ট যে সব শিকড়-বাকল প্রভৃতি ওঝা-রোজারা ব্যবহার করে সেগুলির কোনোটিরই সর্পবিষ প্রতিষেধক কোনো গুণই নেই। বোম্বাই-এর হাফ্‌কিন ইন্সটিটিউট ও অন্যান্য কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর গবেষণাগারে কমপক্ষে পাঁচশটি তথাকথিত সর্পবিষের মহৌষধি বিষের-সাপ-দ্বারা-কই-করা জীবদেহে প্রয়োগ করে দেখা গেছে এই সব ওষুধের কোনোটিরই সর্পবিষ নিরোধ করার সামান্যতম ক্ষমতাও নেই। ওঝা, রোজা ও সাপুড়েরা অনেক সময় 'বিষপাথর' নামে ছোট্ট একটা পাথর সর্পদষ্ট রুগীর চিকিৎসার সময় ব্যবহার করে। এই পাথরটির নাকি সাপের বিষ টেনে নেবার বিশেষ ক্ষমতা আছে। এটি যে যথার্থই এই গুণের অধিকারী তার চাক্ষুষ প্রমাণ দেবার উদ্দেশ্যে রোজারা সেই পাথরটিকে সর্পদংশনক্ষতে লাগিয়ে দেয়। সেটা সেখানে কিছুক্ষণ আটকে থেকে আপনা থেকেই এক সময়ে পড়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গেই রোজারা বলে, পাথরটা বিষ টেনে নিয়েছে, তাতে আর বিষ নেই। থাকলে পাথরটা খসে পড়তো না। দেখে শুনে দর্শকবৃন্দ একেবারে চমৎকৃত ও মুগ্ধ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই পাথরটিরও কোনো গুণই নেই। রোজারা এই পাথরটি নিয়ে যা করে তা অমিশ্র ভাঁওবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে এটি অসংখ্য সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট কামাজাতীয় একরকম পাথর। কোনো আর্দ্রস্থানে লাগালে সেটি সেখানে ততক্ষণই আটকে থাকে যতক্ষণ না সেটির ছিদ্রগুলি রসে ভরে যায়। সোজা কথায় এটি ব্লটিং কাগজের মতোই কাজ করে।

কিভাবে রোজারা সর্পদষ্ট রুগীর চিকিৎসা করে থাকে তা-সেদেনি তাদের অবগতির জন্যে কিছু বলা হলো। সাপে

কামড়ালেই দংশনক্ষতের কিছুটা ওপরে তাগা বেঁধে দিতে হয়, এটা আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই জানে। এই তাগা বাঁধলে সর্পবিষ ক্ষতমুখ থেকে দেহের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। এটাও তারা জানে রোজারা এসে প্রথমেই এই তাগার বাঁধন খুলে দিতে বলে। তারা বলে যে তাগা না খুললে বিষ নামানো যাবে না। আর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাগা বাঁধার উপকারিতা বুঝেই যারা সেটা বেঁধেছিল, রোজার নির্দেশ মতো তারাই আবার সেটা খুলে দেয়। এটা খুললে কতখানি যে বিপদ হতে পারে সেটা তারা যেন তখন বেমালুম ভুলে যায়। নির্বিষ সাপের কামড়ে এই বাঁধনের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই, সুতরাং সেটা খুলে দিলেও কোনো ক্ষতি হয় না; কিন্তু বিষধর সাপ হলে এবং দংশনক্ষতে যারাত্মক মাত্রায় বিষ ক্ষরিত হয়ে থাকলে সেই রুগীকে বাঁচাতে শিবের বাবাও পারবে না।

তাগা খোলা হলেই রোজারা, কোন্ জাতের সাপে কামড়েছে তা জানবার উদ্দেশ্যে, সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে নিমপাতা ও কোনো মিষ্টি জিনিস খেতে দেয়। তারা বলে যে, রুগীর দেহে যদি বিষ ঢুকে থাকে তবে নিমপাতা লাগবে মিষ্টি আর মিষ্টি লাগবে তেতো। আমি ওঝা-রোজাদের ত্রিশ চল্লিশটি সর্পদংশনের চিকিৎসা করতে দেখেছি, কিন্তু নির্বিষ বা বিষধর যে সাপেই কামড়ে থাকুক না কেন,—কোনো ক্ষেত্রেই সর্পদষ্ট ব্যক্তি নিমপাতাকে তেতো ও মিষ্টিকে মিষ্টি বলেনি। সব কটি ক্ষেত্রেই সর্পদষ্ট ব্যক্তি কেন এমন বলেছিল তা নিয়ে আমি অনেক ভেবে দেখেছি। আমার মনে হয় যে, যে সাপই কামড়াক না কেন সেটা বিষধর বলে ধরে নিয়ে তারা আতঙ্কে এতোটা অভিভূত হয়ে পড়ে যায় জন্যে তাদের অনুভূতি জ্ঞান নষ্ট হয়ে যায়। তাই তাদের যখন নিমপাতা খেতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় সেটা মিষ্টি লাগছে কিনা, অথবা মিষ্টি খেতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় সেটা তেতো লাগছে কিনা—তখন তারা এ দুটি জিনিসের নিজস্ব স্বাদ বোঝবার একটুও চেষ্টা না করেই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই বলে, নিম লাগছে মিষ্টি আর মিষ্টি লাগছে তেতো। এই দুটি জিনিসের উল্টো স্বাদ বলার পেছনে, আতঙ্কে-নষ্ট-অনুভূতি-জ্ঞান ছাড়াও, আরো একটি কারণ আছে বলে আমি মনে করি। নিমকে মিষ্টি না বলে তেতো বললে এবং মিষ্টিকে তেতো না বলে মিষ্টি বললে তাকে নির্দিষ্ট সাপে কামড়েছে বলে ধরে নিয়ে রোজারা তার চিকিৎসা বন্ধ করে দেবে আর সে তখন বিনা চিকিৎসায় মরে যাবে। আমার মনে হয় সর্পদষ্ট ব্যক্তি এই আশঙ্কাতেও এই দুটি জিনিসের স্বাদ উল্টোপাল্টা করে বলে।

এবারে সাপুড়েদের সম্বন্ধে প্রচলিত কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণার কথা এখানে বলা হলো। অনেকেই বিশ্বাস করে যে, সাপুড়েরা এমন এক মন্ত্রশক্তির অধিকারী যার দ্বারা তারা গোখুরা ও শঙ্খচূড় সাপের মতো সাংঘাতিক বিষধর সাপকেও বশীভূত করতে পারে। এই ভ্রান্তধারণায় যারা বিশ্বাসী তারা হয়তো অসন্তুষ্ট হবে, তবু বলবো সাপুড়েদের সর্পবশীকরণ মন্ত্র বলে কিছুই নেই। মন্ত্র আওড়ানোর নামে তারা যা বলে তা থেকে আবোল-তাবোল ছাড়া অন্য কিছুই নয়। এই যে বিড়বিড় করে বকা, এটা দর্শকদের ধোঁকা দেবার জন্যেই। তাদের মন্ত্র হলো বিভিন্ন জাতের সাপের সম্বন্ধে তাদের অসাধারণ জ্ঞান আর সেই সঙ্গে অতীব ক্ষিপ্র হস্ত-চালনা। সবশ্রেণীর সাপের ওপর ঝাড়ের যে সত্য সত্যই অদ্ভুত প্রভাব আছে এটা তারা দর্শকদের কাছে হাতে হাতে প্রমাণও দেয়। ঝাঁপি থেকে গোখুরা সাপ বের করে দেখা দেখাবার সময় সাপটা ফণা বিস্তার করে দুলতে দুলতে মাঝে মাঝে সাপুড়েকে লক্ষ্য করে ছোবল মারে। এক সময় তারা মাথার পাগড়ী থেকে বা কুলি থেকে একটা শুকনো শেকড়ের টুকরো বের করে উদ্যতফণা রুগীর মাথার কাছে নিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই সাপটা ফণা গুটিয়ে মাথা নীচু করে ঝাঁপির ভেতর ঢুকে পড়বার চেষ্টা করে। তা দেখে দর্শকরা অবাক হয়ে যায় আর মনে মনে ভাবে, সত্যি শেকড়টার কি আশ্চর্য শক্তি! গোখুরো সাপও নেতিয়ে পড়লো! শেকড়টির যে আসলে কোনো গুণই নেই একথা বললে কেউই তা বিশ্বাস করবে না। চোখের সামনেই তারা দেখেছে শেকড়টা সাপের মাথার কাছে নিয়ে যেতেই সাপটার লম্ফঝম্ফ শেষ হয়ে গেছে, সুতরাং তারা কোন্ আক্কেলে শেকড়টার শক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হবে।

লোকে বিশ্বাস করুক বা না করুক, শেকড়ের টুকরো নিয়ে সাপুড়েরা যা করে তা নেহাতই ম্যাজিক বা ধাপ্পাবাজি। এটা তারা কি করে সম্ভব করে এবারে সে সম্বন্ধে বলা হলো। সাপুড়েরা গোখুরা সাপ ধরার পর তার বিষদাঁত

ছেড়ে দেয়। এখানে বলে রাখা ভালো যে, বিষদাঁত দুটি ছেড়ে দিলেও সাপুড়েরা সময় মতো সে দুটো ভেঙে দেয়। এই ভাবে বারবার বিষদাঁত গজায় আর সাপুড়েরা প্রতিবার সেগুলি ভেঙে দেয়। যাহোক, বিষদাঁত ভেঙে দেবার কয়েকদিন পরে সাপুড়ে সাপটাকে শিক্ষিত করবার উদ্দেশ্যে সেটাকে ঝাঁপি থেকে বের করে। বের করেই সাপটা তার স্বভাবগুণে ফণা বিস্তার করে ফোঁস করে সাপুড়েকে লক্ষ্য করে ছোবল মারে। কিন্তু সেই ছোবল দেওয়ার পরিবর্তে পড়ে সাপুড়ের হাতে সাঁড়াশি দিয়ে ধরা লাল-করে-পোড়ানো এক টুকরো লোহার ওপর। ফলে সাপের মুখটি ঝলসে যায়। এই ভাবে কয়েকদিন ধরে সাপুড়েরা এই প্রক্রিয়া চালায় যতদিন না তার উদ্দেশ্য সফল হয়। বার বার মুখে আঘাত তপ্ত লোহার ছ্যাঁকা খেতে খেতে সেই তপ্ত লোহাটির সম্বন্ধে সাপটার মনে এক সময়ে এমন একটা আতঙ্ক জন্মায় যখন তপ্ত লোহার পরিবর্তে যে কোনো একটা জিনিস তার মুখের কাছে নিয়ে গেলেই সে ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। সাপুড়েদের ব্যবহৃত তথাকথিত সর্প-বশীকরণ দুটোই তপ্ত লোহারই প্রতিভূ। শেকড়টির সর্প-বশীকরণের কোনো ক্ষমতা না থাকলেও এটির অন্য ধরনের কিছু একটা ক্ষমতা আছে। তা মানতেই হবে। সাপের ওপর এটির অদ্ভুত প্রভাব চোখের সামনে দেখার পর দর্শকদের মধ্যে অনেকের মনে এটি সংগ্রহ করবার আগ্রহ এই শেকড়টিই জাগিয়ে তোলে, ফলে সাপুড়েরাও এই ফাঁকির জিনিসটি বিক্রী করে বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নেয়। এটা কি শেকড়টির একটি বিশেষ ক্ষমতার পরিচায়ক নয়?

অনেকের ধারণা সাপ মাত্রই, বিশেষ করে গোখুরা জাতীয় সাপেরা বাঁশীর সুর শুনতে খুবই ভালোবাসে। সাপুড়েরা গোখুরা সাপ নিয়ে খেলা দেখাবার সময় লাউয়ের খোলা ও কঞ্চি দিয়ে তৈরী বিশেষ ধরনের বাঁশী 'তুবড়ি' বাজিয়ে সুমিষ্ট সুর তোলে, আর সেই সুরের সঙ্গে তাল রেখে গোখুরা সাপ ফণা বিস্তার করে ডাইনে বাঁয়ে মাথা দোলায়। এটা দেখেই বোধ হয় লোকের মনে সাপের সঙ্গীতপ্রীতি সম্বন্ধে এই ধারণা জন্মেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ধারণা একেবারেই ভুল। সাপেদের কান বলে কিছুই নেই, তাই তারা আমাদের মত বায়ুচালিত কোনো শব্দই শুনতে পায় না। আমরা যেটাকে কান বলি সেটি আসলে শব্দগ্রহণকারী বহিঃকর্ণ মাত্র। কথা বললে বা অন্য কোনো শব্দ করলে বাতাসে একটা শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি হয়। বায়ুচালিত সেই শব্দতরঙ্গ বহিঃকর্ণের মাধ্যমে যখন অন্তঃকর্ণ বা মূল শ্রুতিযন্ত্রে পৌঁছয় তখনই আমরা শুনতে পাই। সাপেরা ঠিক এই ভাবে শুনতে পায় না। বাতাসের মতো মাটিরও কিছুটা পরিবাহী গুণ আছে। মাটিতে কোনো শব্দ করলে তাতেও একটা তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। মাটির দ্বারা বাহিত হয়ে সেই তরঙ্গ এক সময়ে সাপের দেহে পৌঁছয়। তারপর সেটা সাপের ত্বকে বিস্তৃত বিশেষ এক শ্রেণীর স্নায়ুর মাধ্যমে যখন মূলশ্রুতিযন্ত্রে পৌঁছয় তখনই সাপ সেটা শুনতে পায়, অর্থাৎ, অনুভব করে। পাড়াগাঁয়ে অন্ধকার রাত্রে পথ চলবার সময় সাপ তাড়াবার জন্যে অনেকে হাততালি দিতে দিতে যায়, কিন্তু এতে যে কোনো কাজই হয় না তা বলাই বাহুল্য। সেই পরিস্থিতিতে যারা মাটিতে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে যায়, তারা বুদ্ধিমানের মতো কাজ করে, কারণ লাঠি ঠুকলে মাটিতে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তাতেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

বহিঃকর্ণের অভাবে যেটুকু অসুবিধা ভোগ করে তার কিছুটা ক্ষতিপূরণের জন্যেই বোধ হয় সাপের দৃষ্টিশক্তি খুবই প্রখর হয়। সাপের এই প্রখর দৃষ্টিশক্তির কথা পুরাকালের মনীষীরা জানতেন বলে মনে হয়, কারণ সেকালের অনেক সংস্কৃত পুস্তকে সাপকে 'চক্ষুশ্রবা' বলে উল্লেখ আছে। প্রখর দৃষ্টিশক্তির জন্যেই বোধ হয় সাপেরা এমন আচরণ করে যাতে মনে হয় তারা চোখ দিয়েও শুনতে পায়। যাহোক, সাপের এই দৃষ্টিশক্তি অচল কোনো জিনিস দেখার পক্ষে মোটেই কার্যকরী নয়, তা সেটা যত বড়ই হোক বা যত কাছেই থাকুক; কিন্তু কোনো জিনিস, তা যতদূরেই থাকুক বা যত ছোটই হোক, যদি সচল হয় তবে সাপেরা তা দেখতে পায়, অবশ্য সেটা যদি তাদের দৃষ্টিপথের মধ্যে থাকে। এই কারণেই সাপের সামনে পড়লে সঙ্গে সঙ্গেই যদি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়া যায় আর মাটিতে কোনো শব্দ করা না হয়, তবে সাপ কোনো কিছুই না করে নিজের পথে চলে যায়।

তুবড়ি বাজবার সময় সাপ যে মাথা দোলায় তা সে যে সুর শুনে করে না একথা বোধ হয় আর বলতে হবে না।

পথ চলার আনন্দ

Bata

বাটা সু কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড

দুবড়ি বারবার সাপুড়ে সেটা অনবরত ছাইদানে ঘষে নাড়ে আর দুবড়ির সেই আস্ফালনের সঙ্গে তাল রেখেই সাপও ছাইদানে ঘষা খেতে থাকে। সাপ খেলাবার সময় সাপুড়ে দুবড়িটা ছাইদানে ঘষতে ঘষতে মাঝে মাঝে দুবড়িতে মুখ রেখে একটা ফোঁৎ আওয়াজ করেই হঠাৎ সেই দানাটা ভিতে নামিয়ে দেয়, আর সাপটাও দুবড়ির ভিতরই ফণা তুলে অনুসরণে ফোঁস করে ছিটে ছোবল মারে। সাপ এই করে দুবড়ির গতি দেখে, দুবড়ির ফোঁৎ আওয়াজ শুনে না, যদিও সাপুড়ে দর্শকদের সেটাই বোঝাতে চায়। কেন ও মনে করে জানীয় সাপুড়েরা সাপ খেলাবার সময় কোন বাদ্য বাজায় না। তার পরিবর্তে তারা সাপের সামনে হাঁটু ব হাত নাড়ে, আর সাপ তার সঙ্গে তাল রেখে মাথা দোলায়।

বেজি ব নেউল সম্বন্ধেও অনেক লোকের মনে যে সব ভ্রান্ত ধারণা আছে এবারে সে সম্বন্ধে কিছু বলবো। অনেকের ধারণা সাপের এক নম্বরের শত্রু বেজির এমন এক স্বাভাবিক অনাক্রম শক্তি আছে যার জন্যে সাপের বিষ তার দেহে ঢুকলেও তা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। সোজা কথায় সাপের বিষ তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। আবার অনেকে বিশ্বাস করে বেজি সাপের বিষের প্রতিষেধক ওষুধ জানে এবং প্রয়োজন হলে সে সেই ওষুধ ব্যবহার করে; কিন্তু দুটোর বিষয় এই দুই ধারণাই একেবারে ভিত্তিহীন।

বেজিরা অবিশ্বাস্য রকমের ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন জীব। সাপের সম্মুখীন হবামাত্রই সাপ তার জাতশত্রু বেজিকে ছোবল মারে, কিন্তু সেই ছোবল বেজির দেহের পরিবর্তে পড়ে মাটিতে, কারণ তার দেহে ছোবল পড়বার আগেই বেজি ঝট্ করে সরে যায়, আর সাপটা মাথা তোলবার আগেই সে এক লাফ দিয়ে সাপের ঘাড়ে পড়ে একটা কামড় দিয়েই সাপের পেছনে লাফিয়ে পড়ে। সাপটাও চক্ষের নিমেষে ঘুরে গিয়ে দ্বিগুণ রাগে আবার তাকে ছোবল মারে। এবারেও ছোবল পড়ে মাটিতে, আর সাপটা মাথা তোলবার আগেই বেজিটা আবার আগের মতো সাপের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে কামড় দিয়েই লাফ মেরে সাপের পেছনে চলে যায়। এই ভাবে বার বার মাটিতে ছোবল মেরে মেরে এবং সেই সঙ্গে ঘাড়ে মাথায় বেজির কামড় খেয়ে খেয়ে সাপটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে ও রক্তস্রাবে এক সময়ে কাবু হয়ে পড়ে ও রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। এই সুযোগেই বেজি পেছন থেকে সাপের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে ও তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে কেটে মাথাটা ধড় থেকে আলাদা করে ফেলে। ক্ষুধার্ত বাবলে বেজি তার মৃত প্রতিদ্বন্দ্বীকে অনেক সময়ে খেয়েও ফেলে।

সাপের সঙ্গে যুদ্ধ চলা কালে বেজি অনেক সময় বলপ্রয়োগ ছেড়ে আশপাশের ঝোপের আড়ালে চলে যায়। সর্প-নেউল সংগ্রাম দেখবার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে তারা মনে করে বেজিটা সাপের বিষের ওষুধ খেতে যায়, কিন্তু এ ধারণাটা যে একেবারেই ভুল তা আগেই বলেছি। আমার মনে হয় বেজি এ রকম করে শত্রুকে অসতর্ক করে। যুদ্ধে হেরে বেজিটা পালিয়ে গেছে মনে করে সাপটা যখন ফণা ফেলে নিশ্চিন্ত মনে নিজের গন্তব্যস্থলে চলে যাবার উদ্যোগ করে তখন বেজিটা তার অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে এক মোক্ষম কামড় দেয়। যে সাপের সঙ্গে বেজি লড়াই করে সেটা যদি যথার্থই বিষের সাপ হয়, আর যদি তার ছোবলের সঙ্গে বিষ ক্ষরিত হয়ে বেজির দেহে প্রবেশ করে তবে সে যে মরবেই তাতে কোনো সন্দেহই নেই। অনেক সময় সুযোগ পেলে সাপ বিদ্যুৎগতিতে বেজিকে জড়িয়ে ফেলে এবং চাপ দিয়ে তাকে মেরে ফেলে। আবার অনেক সময়ে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকেই মরতে দেখা গেছে।

অন্ধকার যুগ শেষ হয়ে গেছে,—এখন এটা বিজ্ঞানের যুগ চলছে। এই যুগেও যে লোকের মনে এই ধরনের ভ্রান্ত-ধারণা বাসা বেঁধে আছে,—এখনও জনসাধারণ অন্ধবিশ্বাস-গুলিকে আঁকড়ে ধরে আছে, এটা খুবই আশ্চর্যের এবং সেই সঙ্গে বিশেষ পরিতাপের বিষয়। যে সব ভ্রান্ত ধারণা ও অন্ধবিশ্বাস মনে পোষণ করার জন্যে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত জনসাধারণের কাছে একমাত্র হাস্যাস্পদ হওয়া ছাড়া শারীরিক বা আর্থিক কোনো লাভই হয় না, উপরন্তু সেগুলি যখন অর্থ, স্বাস্থ্য, এমনকি প্রাণ নষ্টের কারণ হয়,তখন লোকের মন থেকে সেগুলি যত শীঘ্র দূর হয় ততই মঙ্গল।

ক্যামেলিয়া

রনজিৎ কুমার সেন
(গল্প)

ডেহরি-অন্-শোন্। একটু আগেই ডাউন বোম্বে মেইলটা হুস্ ক'রে বেরিয়ে গেল ব্রীজের উপর দিয়ে। ভূমিগর্ভের স্পন্দন এখনও থামে নি। মুহূর্তের জন্যে একবার স্থির হ'য়ে দাঁড়ালো দয়াল : জয়ন্তীরাম দয়ালরাম ক্ষেত্রী। হাতের মুঠোয় তার লক্ষ্মীবাঈয়ের নরম আঙুলগুলো অলক্ষ্যে একবার চঞ্চল হ'য়ে উঠ্লো। লক্ষ্মীবাঈ ত্রিপাটি। অপ্সরী না হ'লেও সুন্দরী। অন্যান্য মেয়েদের মতো নাকে সে নথ পরে না, হাতের আঙুলে পান্না আর মুক্তোর ঔজ্জ্বল্যে আংটি দু'টো অনামিকা আর কনিষ্ঠার সমৃদ্ধি বাড়িয়েছে। জংলা রঙের জরিপাড় শাড়ি-খানি বিচিত্রভাবে জড়িয়ে আছে সারা দেহটাকে। যুবতী পাইনের মতো কমনীয় আভায় প্রশান্ত দেহখানি। পায়ে ফিন্‌ফিনে জড়োয়ার কাজ করা নাগ্‌রা। লক্ষ্মীবাঈ ত্রিপাটি। হাতের মুঠোর মধ্যে তার নরম আঙুলগুলোকে কিছুটা চেপে নিয়ে একেবারে সোজা নিম্নভূমিতে নেমে প'ড়লো দয়াল। দু'পাশে পাহাড়ের মতো উঁচু উঁচু পাথরের গা কেটে কেটে রচনা হ'য়েছে জলপ্রপাত আর বন্যজন্তুর জঙ্গলাকীর্ণ পার্শ্বের পরিবেশ। তার আড়াল থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসে লেপার্ড আর রয়াল টাইগারের।

ভোরের মিঠে রোদে চোখ মেলেছে ডেহরি-অন্-শোন্। নানা জায়গায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টানেল আর অরণ্য-ঐশ্বর্য দেখাবার জন্যে লক্ষ্মীবাঈকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ডেহরির এই নিম্নভূমিতে এসে দাঁড়িয়ে প'ড়েছে দয়াল। আবহ পরিবেশটা মিলিয়ে গয়া থেকে মুঘল-সরাই অবধি বিস্তৃত অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত পরিক্রমা। অনেক দিনের সাধ : কৌতূহল আর উদ্দীপনায় মনের চাঞ্চল্য প্রশমিত করা ক্রমেই শক্ত হ'য়ে উঠেছিল লক্ষ্মীবাঈয়ের পক্ষে। দয়ালই শেষ পর্যন্ত ভারটা নিলো, দয়ালই টেনে আন্‌লো তাকে এপথে। জল নির্গত হ'চ্ছে সহস্র ধারায়, উৎসারিত জলপ্রপাতে উচ্ছল হ'য়ে উঠেছে কোথাও কোনো নিম্নভূমির খণ্ড খণ্ড অংশ। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখ্‌ছে লক্ষ্মীবাঈ। দূরে পাথরের গা বেয়ে আঁকাবাঁকা শান্ত স্রোতের মতো এগিয়ে যাচ্ছে বিরাটকায় একটা পাহাড়িয়া সাপ। সেদিকে চোখ

প'ড়তেই সমস্ত দেহটা একবার পাক খেয়ে উঠ্‌লো লক্ষ্মীবাঈয়ের। নিজে থেকেই ইচ্ছে ক'রে তার নরম আঙুলগুলো দিয়ে শক্ত ক'রে চেপে ধ'রলো সে দয়ালের হাতখানিকে। ব'ল্‌লো: 'চলো, কাজ নেই আর এখানে থেকে। দেখ্‌চো না কি ভয়ঙ্কর জিনিষ! শরীরের ভেতরটা আমার কেমন যেন ক'রছে!' কথার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্রুতগতি অনুভব করা গেল লক্ষ্মীবাঈয়ের।

মৃদু হেসে দয়াল ব'ল্‌লো: 'এত কষ্ট ক'রে এসে এত তাড়াতাড়িই সাধ মিটে গেল? এ তো কেবল সুরু। সামান্য একটা সাপকে দেখেই যদি ঘাব্‌ড়ে যাবে, তবে এলে কেন?'

—'এলাম ব'লেই এখন সাপের মুখে প'ড়তে হবে?' চকিতে একবার রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌লো লক্ষ্মীবাঈয়ের সারা দেহের রোমকূপগুলো।

—'পাগল, তা কেন পড়্‌বে? ওদের গায়ে কেউ আঘাত না দিলে ওরা কাউকে কামড়ায় না।'

নিজের মধ্যে একবার রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ছিল দয়ালও। এম্‌নি একটা পরিবেশেরই হয়তো প্রয়োজন ছিল লক্ষ্মীবাঈকে একান্ত নির্জনে কাছে পাবার, কাছে পেয়ে মনের কথাটাকে খুলে তার কাছে ব্যক্ত ক'রবার। আজ একেবারে তার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে প'ড়েছে লক্ষ্মীবাঈ। এখান থেকে যাত্রা ক'রতে পারে তারা সুদূর আরাবল্লী কিম্বা ত্রিবাঙ্কম রাজ্যে। দু'জনে মিলে রচনা ক'রতে পারে একটা সুখের নীড়। কিন্তু সকলের চোখ এড়িয়ে সমাজকে ফাঁকি দিয়ে তেমন কিছু পলাতক হবার বাসনা নেই আপাতত দয়ালের। সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোর একটা আলাদা মর্যাদা আছে—যদিও নানা কুসংস্কারের বেড়াজালে ঘেরা তাদের সামাজিক আবহাওয়া। তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্নটা বড় নয়। আপাতত প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে লক্ষ্মীবাঈকে নিয়ে; লক্ষ্মীবাঈ যদি তার প্রস্তাবে রাজি হয়!

থেমে দয়াল একবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে।—'একটা কথা ব'ল্‌বো, রাখবে?'

—'কি কথা, বলো।' রোমাঞ্চিত দেহের শিরায় শিরায় দোলা লাগ্‌লো একবার লক্ষ্মীবাঈয়ের।

—'যেমন ক'রে আজ ছুটে এলাম এখানে এই প্রকৃতির কোলে, ঠিক এম্‌নি করেই তো দূরে কোথাও সমুদ্রতীরে গিয়ে ঘর বাঁধতে পারি আমরা! কতদিন আর মনের ভালবাসাকে এম্‌নি ক'রে চেপে রাখবে, বলো তো?' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অনেকক্ষণের জন্য চোখ দু'টোকে স্থির রাখলো দয়াল লক্ষ্মীবাঈয়ের বিভাময়ী চোখ দুটির দিকে।

কিন্তু কেন যেন লক্ষ্মীবাঈ এবারে আর স্বাভাবিকভাবে চোখ তুলে তাকাতে পারলো না দয়ালের দিকে। অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য ক'রতে লাগ্‌লো সে সাপটাকে। ধীরে ধীরে নাতিশীর্ষ একটা পাহাড়ের গা বেয়ে ঘনসন্নিবিষ্ট জঙ্গলের আড়ালে চ'লে গেল সাপটা। দয়ালের কথা নিয়ে ভাববার শুধু কিছুটা সময় পেলো সে। ব'ললো: 'এতদিন এই কথাটাই শুধু বলা বাকী ছিল তোমার?'

—'কথা বলারও কিছু একটা পরিবেশ আছে বৈ কি!' দয়াল ব'ল্‌লো: 'যেমন বন্দীশালার মতো ঘর আমাদের, তাতে হাওয়া ঢোকবারই পথ নেই, কথা কোন্ ছার! বাড়িগুলো আমাদের যাই বলো, সত্যিই খুব

পরিকল্পনা ও সমৃদ্ধির সোনার কাঠি

[illegible]

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক

অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস : ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

[illegible]

আপনার ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যভার গ্রহণে প্রস্তুত

কণ্ডিসন্ড নয়। ক্রন্দন সেখানে কি এক তিলও ভিজোতে পারে?'

আলোচনাটাকে এই ফাঁকে একবার ঘুরিয়ে নিতে চেষ্টা ক'রে লক্ষ্মীবাঈ ব'ললো, 'তোমার খুব আধুনিক ব'লে গর্ব আছে, দেখ্‌তে পাচ্ছি।'

—'আছে বৈ কি!' দয়াল ব'ললো: 'তোমার সম্মতি পাই তো নতুন বাড়ি তুলে দেখিয়ে দেবো—আমাদের বাপ-ঠাকুর্দাদের চাইতে কত প্রগতিশীল আমি। শুধু তোমার মুখের একটা কথা, তুমি আমার হবে! তোমার গানের সুরে মুখর হ'য়ে উঠ্‌বে বাড়িটা, আর ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবো আমি। সেদিন হবে আমাদের প্রথম দেয়ালী উৎসব। বলো, কথা দাও।'—দু'হাতের বন্ধনের মধ্যে একবার আকর্ষণ ক'রতে গেল দয়াল লক্ষ্মীবাঈকে।

বাধা না দিয়ে খানিকটা সামনের দিকে এগিয়ে দাঁড়ালো লক্ষ্মীবাঈ—যেখানে নিম্নভূমির গুহা থেকে চকিতে একটা চমা উড়ে গেল আকাশে। নবারুণরশ্মিতে সপ্তদিগন্ত তখন আলোকিত হয়ে উঠেছে। উষার কমনীয় আভা কেটে গিয়ে দেখা দিয়েছে কঠিন উজ্জ্বলতা। একটু একটু ক'রে তপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ছে চেহ্‌রি-অন্-শোনের মাটি।

কেমন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো চকিতে একবার সমস্ত শরীরটা শিউরে উঠ্‌লো লক্ষ্মীবাঈয়ের। প্রথম দিনের প্রথম দর্শনেই দয়ালকে ভালো লেগেছিল তার; ভালোবাসে সে দয়ালকে। কিন্তু দয়ালের সংসার-রচনার ক্ষেত্রে তার ইচ্ছেটাই কি সব? শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্রুতগতিতে মুহুর্মুহু আন্দোলিত হ'তে লাগ্‌লো লক্ষ্মীবাঈয়ের বুকখানি।

কেমন একটা দুর্বল চোখের চাহনি মেলে এতক্ষণ তাকিয়ে ছিল দয়াল লক্ষ্মীবাঈয়ের দিকে। আর একবার কথাটাকে তুলে ধরলো সে: 'বলো, তোমার মত আছে, বলো, কথা দাও।'

নীরবে কথাটাকে এড়িয়ে যাওয়া এবারে দুঃসাধ্য হলো লক্ষ্মীবাঈয়ের পক্ষে। খানিকক্ষণ অদ্ভুত এক নরম দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে দয়ালের মুখের দিকে, তারপর ব'ললো: 'বাবাকে চেনো তো, আমাদের পাল্টা ঘর ভিন্ন কাজ করতে তিনি রাজি হবেন ব'লে ভরসা কম। বাবাকে ব'ল্‌তে গেলে যদি তিনি বেঁকে বসেন, তবে?'

মনে মনে খানিকটা আঘাত পেলো এবারে দয়াল। ব'ল্‌লো: 'তোমার তবে নিজের ইচ্ছে ব'লে কিছু নেই? বয়সের হিসেবে এখন তুমি নিজের কাছে পুরোপুরি স্বাধীন। তুমি রাজি হ'লে তোমার বাবা কেন, কোনো আইনেরই সাধ্য নেই আট্‌কাতে পারে আমাদের। বলো, ভালোবাসার জন্যে তুমি মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে পারবে যে কোনো বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে?'

কথা না ব'লে এবারে মাথাটাকে নিচু ক'রে নিল লক্ষ্মীবাঈ। শ্বেতশুভ্র মুখখানি তার দেখ্‌তে দেখ্‌তে লাল হ'য়ে উঠেছে। যে তার মনের কথাটাকে এত ক'রেও পেলো না, কেমন ক'রে মনটাকে খুলে ধরবে সে তার কাছে? দয়ালকে কি কম ভালোবাসে সে? যাকে ভালোবাসা গেল, তাকে সে ছোট ক'রে দেখবে কেমন ক'রে? দয়াল কেন বুঝতে পারছে না এটুকু? চেষ্টা করলো সে একবার সহজভাবে তাকাতে দয়ালের দিকে।

সেই মুহূর্তে একটা বিপত্তিকর পরিস্থিতি। মানুষের গন্ধে শ্বাপদের চোখ জ্বলছে

নেপথ্যে। নর-রক্তের একটা তরঙ্গ আকর্ষণে তখন সামনের অরণ্যভূমির অন্তরালে প্রলুব্ধ হ'য়ে উঠেছে কোনো লেপার্ড। তার গম্ভীর ধ্বনি এসে আছড়ে প'ড়ে সহসা কাঁপিয়ে তুলছে পাশাপাশি টিলা আর পাহাড়কাটা অসমতল শিলাখণ্ডগুলিকে। এ শব্দ নতুন নয় লক্ষ্মীবাঈয়ের কাছে।

সহসা একটা সচকিত আর্তনাদে সমান্তরাল ভাবে তার দেহটা এসে ঝুঁকে পড়লো দয়ালের বুকে। দু'বাহুতে তাকে আকর্ষণ ক'রে হেসে উঠ্‌লো দয়াল, ব'ললো: 'জানি, ভালোবাসা জয় করা সম্ভব নয় তোমার পক্ষে। চলো, ফিরে যাই।'

লক্ষ্মীবাঈ এবারে চেষ্টা ক'রেও বলতে পারলো না—'চলো।' ঠোঁট দু'টি তার তরঙ্গ বেগে কাঁপছে, যেমন ক'রে কাঁপে পাহাড়তলীর কনকনে শীতে। এ কি ভয়ে না ভালোবাসার আবেগে, বুঝতে পারলো না দয়াল।

—ভাবতে গেলে এখনও নিজের কাছেই বিস্ময় বোধ হয় দয়ালের। অতিক্রান্ত দিনগুলোর সবল পদক্ষেপে স্মৃতির উপর দিয়ে তারপর একে একে জ'মে উঠেছে অনেকগুলো বছরের ধূসর চিহ্ন। দিনগুলো কেমন অদ্ভুত ভাবে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু সেই একটি কথা বুঝতে পারে না সে আজও। হৃদয়ের মরা কান্নার সুরে কেমন ক'রে সেই মনোরম দিনগুলো একে একে ঝরে গেছে জীবন থেকে। টানেলের সঙ্কীর্ণ গুহামুখি পথ ধ'রে তারপরও হেঁটেছে সে কতবার, কিন্তু সেই যে চ'লে গেল লক্ষ্মীবাঈ, আর এলো না। মিথ্যে বলেছিল না সেদিন দয়াল। ভালোবাসাকে জয় ক'রে ওঠা দুঃসাধ্য ছিল লক্ষ্মীবাঈয়ের পক্ষে। মুখে শুধু সেটুকু স্বীকার ক'রে নিতে পারেনি সে। আজ বর্তমান জীবনে কলকাতায় ফোন ক'রে ব্যবসা জগতের ইতিহাস ঘাঁটছে দয়াল: জয়ন্তীরাম দয়ালরাম ক্ষেত্রী। সুপুরী আর আখরোটের চালানী ব্যবসা। মাদ্রাজ-কোস্ট থেকে সিঙ্গাপুর আর মালাবার থেকে কাবুল। মাল আসছে জাহাজ আর ওয়াগনে, সঙ্গে সঙ্গে রিটেইলার আর হোলসেলারদের চেক এসে যাচ্ছে তার গদিতে। এই নিয়ে কলকাতার বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে মোহনচাঁদ ধুধোরিয়া আর শীলভদ্র কাপুরের সাথে। অনেককালের পুরণো ব্যবসা মোহনচাঁদের, তার সাথে আছে কাঠের চালানী আর মাঠরের কারবার। শীলভদ্র এসে সম্প্রতি নতুন ডেকে ব'সেছে স্ট্রাণ্ড্ রোডে। দু'দিন এসে আলাপ ক'রে সাহচর্যের দাবীতে পান আর চুরুট খাইয়ে গেছে। লোক খারাপ নয়। যুবা বয়স, প্রায় দয়ালেরই সমবয়সী হবে। ফূর্তি আছে মনে, ব্যবসাটাও বোঝে ভালো; তবে মাল-ইম্পোর্টের ব্যাপারে এখনও কিছু সুবিধে ক'রে উঠ্‌তে পারে নি। ফলে একবার হেল্‌ছে সে দয়ালের দিকে, আর একবার মোহনচাঁদের দিকে। স্থান রাখতে গিয়ে কুল ভাঙ্‌তে সে রাজি নয়, কুল রাখ্‌তে গিয়েও তেমনি তার স্থানের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এই নিয়ে কথা হ'য়েছিল সেদিন মোহনচাঁদের সঙ্গে দয়ালের।

ব্যবসার বাজারের এই এতকিছু ঝামেলার মধ্যে আজ সময় কোথায় দু'দণ্ড নিশ্চিন্তে ব'সে লক্ষ্মীবাঈয়ের কথা ভাববার! জীবন থেকে যে দূরে স'রে গেল, সুখে থাক্ সে স'রে গিয়ে। আজকের জীবনটা আপাতত কর্মমুখর থাক্ মোহনচাঁদ আর শীলভদ্রের সঙ্গে ব্যবসার ইতিহাস ঘেঁটে। উপস্থিত ক্ষেত্রে কাজ চালিয়ে

নেবার মতো সঙ্গে রয়েছে সোমত্থা বয়সের অল্প বয়স্ক একটি ছোকরা : বৈজুনাথ। বেয়ারার কাজ থেকে রান্নার কাজ পর্যন্ত দেখেশুনে সে-ই সব করে। দু' পয়সার বাজার আর এক পয়সার ছোলাভাজা দিলেই তারি খুশী। মাঝে মাঝে আখরোটের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বিল আর ক্যাশমেমো নিয়ে উঠে পড়ে গিয়ে ট্রামে, ফিরে এলে তার শেঠজীর সামনে টিকিন এগিয়ে ধরে : ঘিউকা পরাটা অউর হালুয়া। কর্মব্যস্ত জীবনের ফাঁকে এইটুকুই যা অবকাশ।

কিন্তু হালে এসে ব্যবসা কিছুটা মন্দীভূত হ'য়ে প'ড়েছে। একেই বলে অদৃষ্ট। আকস্মিক বন্যায় কোথায় বাঁধ ধ্বসে গিয়ে রিভার রুটে বিপত্তি ঘ'টেছে। দু'সপ্তাহের উপরে জাহাজ আসছে না সিঙ্গাপুর আর মাদ্রাজ-কোস্ট থেকে। চেম্বার-অব-কমার্সে এই নিয়ে হুলুস্থুল প'ড়ে গেছে। সেখানে শুধু আখরোট আর সুপুরীই নয়, আরও বৃহত্তর কিছুর সমস্যা জড়িয়ে আছে। দু'বার ক'রে দৈনিক 'তার' ক'রছে চেম্বার। তবু যদি তাড়াতাড়ি কিছু সুরাহা হয়! মাদ্রাজের 'সুখন ভাই এ্যাণ্ড্ কোং'কে এখনও এ্যাড্ভান্স দেওয়া আছে পুরো পাঁচটি হাজার টাকা। খিদিরপুরের ঘাটে জাহাজ এসে নোঙর না করা পর্যন্ত সুপুরীর অর্ডার সব আপ্সেট্ হয়ে আছে। দুশ্চিন্তায় মাথাটা কেমন গুলিয়ে গেল দয়ালের।

হঠাৎ পাশ থেকে সশব্দে একবার টেলি-ফোনটা বেজে উঠ্লো : ক্রিং···ক্রিং···ক্রিং... ।'

—'হ্যালো!' রিসিভারটাকে কানের কাছে তুলে নিয়ে দাঁড়ালো দয়াল।

—'আমি মোহনচাঁদ কথা বল্ছি। খবর কিছু শুনেছেন?'

—'কেন, কি ব্যাপার!' খানিকটা উৎকর্ণ হ'য়ে উঠ্লো এবারে দয়াল।

মোহনচাঁদ ব'ললো : 'ব্যাপার খারাপ। দু'টো ব্যাঙ্ক আজ ফেল প'ড়েছে, দু'টোই সিডিউল্ড্। আমার মাথায় বাড়ি পড়েছে। জোয়ারদার ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন উঠে গিয়ে আমার এগার হাজার টাকা মেরে গেল। কি করবো কিছুই ভাবতে পারছি না।'

—'বড় বিপদের কথা তো তবে! আমিও শেষ পর্যন্ত সর্বনাশের পথে না বসি!' বুকের ভেতরটা একবার চিপ্ চিপ্ ক'রে উঠ্লো দয়ালের। দুর্দিনের দুঃসময়ে ব্যাঙ্কগুলোও আজ একে একে লালবাতি জ্বালাচ্ছে। দু'দিন আগে শেয়ার মার্কেটের অবস্থাও খারাপ শুনেছিল সে। বাজার ক্রমেট হেলে পড়ছে। এদিকে মাল আসা বন্ধ। এবারে কি নিজের ঘরেও তবে তালা বন্ধ ক'রতে হবে?

মোহনচাঁদ ব'ল্লো : 'ফোনে তো আর কাউকে পাবেন না, পথে বেরিয়ে একটু খোঁজ খবর নিন। আর নিয়েই বা কি হবে। অবস্থা যা দেখ্ছি, তাতে তো ক'রবার মতো কিছু আছে ব'লে মনে হয় না। শীলভদ্র বরং এদিক দিয়ে খুব হুঁশিয়ার লোক। গোড়া থেকেই সে একেবারে পোস্টাল একাউন্ট্ ক'রে রেখেছে।'

—'লোক যে হুঁশিয়ার, তাতে সন্দেহ কি!' থেমে দয়াল ব'ল্লো : 'আচ্ছা, ফোন ছেড়ে দিচ্ছি এখন। রাম রাম ভাই।'

—'রাম রাম।'

ফোন ছেড়ে দিয়ে বৈজুনাথের উদ্দেশে একবার হাঁক দিল দয়াল।

কাছেই কোথায় আড়ালে দাঁড়িয়ে দু'টান বিড়ি টেনে নিচ্ছিল বৈজুনাথ। বিড়ি খাওয়াটা তার একেবারেই হালে শেখা। সাড়া পেয়ে

এবারে সে তার শেঠজীর সামনে এসে দাঁড়ালো।

—'আমি এক্ষুণি একবার কাজে বেরোচ্ছি। এদিকে যেন লক্ষ্য থাকে।' দয়াল বল্‌লো: 'আমার দেরী দেখ্‌লে তুই খেয়ে নিস। কখন্ ফিরি ঠিক নেই।'

নীরবে ঘাড় নেড়ে গদী আগ্‌লে বসলো বৈজুনাথ।

একরোকা দুশ্চিন্তার ভার মাথায় নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লো দয়াল। নিউ-এজ-ব্যাংকিং-ব্যুরোতে তার টাকা খাটছে আগা-গোড়া। দেড় হাজার টাকা মূলধন নিয়ে একদিন ঘর ছেড়ে এসেছিল সে কল্‌কাতায়, আজ মূলধন দাঁড়িয়েছে চল্লিশ হাজারে। এর মধ্যে বিভিন্ন পার্টির এ্যাড্‌ভান্স পেমেন্টও র'য়েছে কিছু। সত্যিই যদি উঠে গিয়ে থাকে 'নিউ-এজ' তবে সর্বস্বান্ত হ'য়ে পথে দাঁড়াতে হবে তাকে। এ ক্ষতি তবে আর তার জীবনে পূর্ণ হবে না।

এসে দেখ্‌লো—অক্ষতভাবেই টিকে আছে এখনও ব্যাঙ্কটা।

ম্যানেজার ব'ললো, 'আপনার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমাদের যদি যেতেই হয়, তবে আপনাদের হিসেব মিটিয়ে দিয়েই তবে যাবো। এটুকু বিশ্বাস অন্ততঃ রাখতে পারেন আমাদের উপর।'

এ বিশ্বাস রেখেই তো এসেছে আগাগোড়া দয়াল! দুশ্চিন্তার মধ্যে খানিকটা যেন আশার আলো দেখতে পেলো সে। কিন্তু এ আলো মরীচিকা নয় তো? মোহনচাঁদ যতবড় ক'রেই ভয়টা ধরিয়ে দিক না কেন, শীলভদ্রের কথাটা একেবারে মন্দ বলেনি সে। কোনো ব্যাঙ্কই আজকাল আর নিরাপদ নয়। শীলভদ্রের মতই সমস্ত টাকাটা নিয়ে পোস্টাল-একাউন্টে রাখলে মন্দ কি! অনেকক্ষণ ধ'রে কথাটা নিয়ে চিন্তা ক'রলো দয়াল। পোস্টাল ব্যবস্থাকেই শেষ পর্যন্ত মনে মনে স্বীকার ক'রে নিয়ে গদীতে ফিরলো সে।

শীলভদ্র এসে অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা ক'রছিল তার জন্য। এমন ক'রে এই মুহূর্তে যে তার সাথে দেখা হ'য়ে যাবে দয়ালের, একথা সে ভাবতেই পারেনি।

নিজেদের দেশোয়ালী ঢঙে সম্ভাষণ জানিয়ে স্মিতহাস্যে শীলভদ্র ব'ললো, 'বহুক্ষণ থেকে এসে ব'সে আছি দাদা। ব্যবসার কিছু প্রয়োজন নয় এখন, নিতান্তই সাংসারিক ব্যাপার। কাল আমার বিবাহবার্ষিকী। প্রতিবছর এই দিনটিতে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে একসঙ্গে খানাপিনা ক'রে একটু আনন্দলাভ করি। কাল সন্ধ্যার পর কিন্তু আপনি আমার ওখানেই খাবেন।'

—'আচ্ছা, এ তো বহুৎ খুসীকা বাৎ।' দয়াল ব'ল্‌লো, 'খানাপিনার মধ্যে কি আছে, যাবো, নিশ্চয়ই যাবো। পাঁচজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হবে, এর চাইতে আনন্দের কথা আর কি আছে!'

—'আচ্ছা, আসি তবে এখন, নমস্তে।' হাত জোড় করে উঠে দাঁড়ালো শীলভদ্র, তারপর পথের জনতার মধ্যে কোথায় একদিকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

ব্যবসা-জগতের বিচ্ছিন্ন চিন্তাগুলি কেমন যেন হঠাৎ টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে খসে পড়লো মাথা থেকে। নতুন ক'রে একটা চিন্তা দানা বেঁধে উঠ্‌লো দয়ালের মনে। যা অনায়াসেই হ'তে পারতো জীবনে, যে-জীবনের উপর দাঁড়িয়ে সে একদিন শান্তির সেতু রচনা ক'রতে

পারতো, অলক্ষ্যেই তা করে জীবন থেকে ঝরে গেছে। বিস্মৃত দিনগুলোর আড়াল থেকে আচমকা একটা বিদ্যুৎ-ঝলকের মতই সহসা একবার চোখের উপর দিয়ে ভেসে গেল লক্ষ্মীবাঈ, —লক্ষ্মীবাঈয়ের নরম মুখখানি। কেমন একটা অদ্ভুত দুর্বলতায় সারা দেহ লুটিয়ে পড়তে চাইল দয়ালের। জীবনে যে সুখের ভিত্তিতে শীলভদ্র এসে আজ সাদরে নিমন্ত্রণ করে যেতে পারলো তাকে, সে-সুখ থেকে একেবারেই বঞ্চিত দয়াল। ব্যবসার ক্ষেত্রে শীলভদ্র তার কাছে একেবারেই শিশু, অভার বুকিং আর মাল-ইম্পোর্টের ব্যাপারে একেবারেই অসহায় সে, কিন্তু সুখের রাজ্যে সে অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর, তার রাজ-সিংহাসনের সম্মুখে সামান্ত দৌবারিক মাত্রও নয় দয়াল। সামনের পথে জনতার দিকে লক্ষ্য ক'রে কৌতূহল বশেই আর-একবার দেখতে চেষ্টা ক'রলো সে শীলভদ্রকে, কিন্তু বৃথা। সামনের আকাশের দিকে একবার লক্ষ্য ক'রে দেখলো সে—রোদের ঝলকানি ক্রমে কেটে গিয়ে ধীরে ধীরে মেঘ জমে উঠছে সেখানে। হয়তো এক্ষুনি বৃষ্টি এসে যাবে!

বৈজুনাথ ব'ললো: 'স্নান তো সেই তোর থাকতেই ক'রেছেন, খাবার দিই এখন?'

আসলে সেও না খেয়েই ব'সে আছে এত বেলা অবধি। বেলাও কি ব'সে আছে, প্রায় বিকেল হ'য়েই এলো। শেঠজিকে সম্ভ্রম করে ব'লেই যে এতক্ষণ সে খায়নি, তা নয়; শেঠজির জন্ত মনে মনে সে মমতা বোধ করে কম নয়। শেঠজিকে ফেলে তাঁর আগে আগে তাই খেতে ইচ্ছে হয়নি বৈজুনাথের।

—'তুই খেয়ে নিয়েছিস তো?' জিজ্ঞেস ক'রলো দয়াল।

এবারে জবাব না দিয়ে মাথা নিচু ক'রে নিল বৈজুনাথ। তারপর পুনরায় ব'ললো, 'খাবার দিই এখন?'

বুঝতে পেরে দয়াল বললো: 'হতভাগা কোথাকার, বলে গেলাম যে খেয়ে নিস, তবু বসে আছিস ক্ষিদে চেপে? এমন মমতা নিয়ে কতকাল আর আগলে থাকবি তুই আমাকে? যা, তাড়াতাড়ি ক'রে খাওয়া দাওয়া সেরে নে।'

এতক্ষণে উঠলো বৈজুনাথ। উঠে আগে তার শেঠজিকে তামার বাসনে খাবার সাজিয়ে দিয়ে পরে নিজের জন্তে নিয়ে বসলো। দু'খানা পরোটার সঙ্গে কিছু ভাত, শুক্তো, ভাজা, কাল-তরকারী একটা, চাটনি আর দই: আরামের খাওয়া।

অবেলায় হয়তো খাওয়াটা কিছু বেশীই হ'য়ে গেল। খেয়ে উঠে দয়াল বললো: 'ও বেলা শুধু তোর নিজের জন্তে কিছু রেঁধে নিস, আমি আর খাবো না! এতেই আমার আজকের মতো হ'য়ে গেল।' তারপর টান টান হ'য়ে শুয়ে পড়লো গিয়ে বিছানায়। ঘর আর কারবারী গদীর মধ্যে পার্থক্যটা তার সামান্তই; পুব আর পশ্চিম মিলে পাশাপাশি দু'খানি ঘর। এতেই স্বচ্ছন্দে চলে যায় তার।

বৈজুনাথ বললো: 'বাড়িওয়ালা এসেছিল ভাড়ার তাগিদ দিতে।'

অতর্কিতে জিভে একটা কামড় পড়লো দয়ালের। আজই সকালে বৈজুকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবার কথা ছিল ভাড়াটা। মোহন-চাঁদের ফোন পেয়েই মাথা থেকে সব কিছু ঘুলিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দিল সে বৈজুনাথকে: 'যা, টাকা দিয়ে রসিদ

নিয়ে কিছুক্ষণ বরং বাইরে থেকে ঘুরে আয় গে। যেমন মেঘ করেছে, এক্ষুনি আবার বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে না যায়!'

উত্তরে কিছু একটাও আর না ব'লে টাকা হাতে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লো বৈজুনাথ। নিছক ঘুরে আসার জন্য বেরোনো তার বড় একটা হ'য়ে ওঠে না। মনটা তাই অনেকখানি উৎফুল্ল হয়ে উঠলো তার এবারে।···

ধীরে ধীরে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার ছায়া নেমে এলো কলকাতার রাজপথে। তার সাথে নেমে এলো আকাশ ভেঙে বৃষ্টি। দুপুরের মেঘ জল হয়ে গড়িয়ে পড়লো এতক্ষণে। ভেসে গেল রাজপথ, ভিজে গেল সবকিছু! মনটাও তেম্‌নি ভিজে গেল দেখতে দেখতে।

ভেবেছিল—ঘুমোবে দয়াল, একঘুমে রাতটা কাটিয়ে দেবে দু'চোখ বুজে অনেকক্ষণ ধরে, তাই ঘুমের সাধনা ক'রলো সে। কিন্তু দু'চোখের কোথাও ঘুমের চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া গেল না। কেমন একটা অস্বস্তিতে মনটা তার বিষিয়ে উঠ্‌লো। বাইরে অবিরাম বৃষ্টির ধারা ঝম্-ঝম্ ঝমাঝম্। মেঘলোক থেকে পৃথিবীর প্রস্তরভূমির উপর সশব্দে এসে ফেটে পড়ছে বৃষ্টি। মেঘমল্লার জেগে উঠেছে সেই শব্দ থেকে। এমন মুহূর্তে এমন নিঃসঙ্গতা দুঃসহ। অতীতের ছিন্নবিচ্ছিন্ন ঘটনা প্রবাহ এসে বার বার চিত্তপটে ঘা দেয়। উতলা ক'রে তোলে সারা হৃদয়টাকে। কাকে বোঝাবে একথা দয়াল! বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ বড় করুণ এই মুহূর্তটা।—মাথায় তাকিয়াটাকে ঘাড়ের নিচে অবধি একবার ভালো ক'রে চেপে নিল দয়াল। স্মৃতিসমুদ্র থেকে কতকগুলো বিক্ষিপ্ত বুদ্বুদকণা এসে ধীরে ধীরে ফেনায়িত ক'রে তুল্‌লো তার সমস্ত মনটাকে।—

···ঠাকুর্দার আমলের আসল বাড়ি তাদের লক্ষ্ণৌ। কিন্তু তার বাবা এসে নতুন ক'রে বাসা বাঁধলেন একদিন ঝুমরিতিলাইয়ায়। লক্ষ্ণৌ থাকতেই তাদের জাতব্যবসা ছিল কাশ্মীরী শাল, কাপড় আর জর্দার। তার নতুন একটা শাখা এলো এবার ঝুমরিতিলাইয়ায়। সঙ্গীতে ছিল বাবার অসাধারণ দক্ষতা। লক্ষ্ণৌ থাকতে ওস্তাদ রেখে একসময় গান শিখেছিলেন তিনি: সরযুবাস জয়ন্তীরাম ক্ষেত্রী। ঝুমরিতিলাইয়ার সুসজ্জিত কক্ষে একদিন ঝ'রে উঠ্‌লো তাঁর গানের আসর। লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত গায়িকা হীরা বাঈজীর বংশধর সীতারা গীতশ্রী এসে তানপুরা হাতে নিয়ে বস্‌তো সুরের আলাপে। টাকা দিয়ে রেখেছিলেন তাকে বাবা। দোকান থেকে জর্দা এনে খিলি ক'রে পান তৈরী হতো তার জন্যে; তার সঙ্গে আস্‌তো আতর আর গোলাপ নির্যাস। ছোট থেকে এই পরিবেশের মধ্যেই মানুষ দয়াল। নামের আদিভাগে পিতার নামের উপর গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে ব'লে পুরোপুরিটা দাঁড়িয়েছে জয়ন্তীরাম দয়াল-রাম, আসলে সে দয়াল: দয়ালরাম ক্ষেত্রী। বড় হ'য়ে দেখেছে—লোকসমাগমের অন্ত নেই তাদের বাড়িতে। নানা জাতের লোক, স্ত্রী আর পুরুষ দুইই। গানের সমঝদার তারা, সীতারা গীতশ্রীর আকর্ষণটাও একেবারে কম নয়। যৌবনের প্রতিমূর্তি। দেখলেই মন আকৃষ্ট হ'তো। মানুষের তাই আসার বিরাম ছিল না। বাবা নিজেও গাইতেন মাঝে মাঝে, পাল্লা দিতেন তিনি সীতারা গীতশ্রীর সঙ্গে।

ঠিক এম্‌নি দিনে নতুন এক ভদ্রলোকের আবির্ভাব লক্ষ্য করা গেল আসরে। সুন্দরলাল ত্রিপাটি। সঙ্গে তাঁর মেয়ে লক্ষ্মীবাঈ। শোনা গেল—বাড়ি তাদের মধ্যপ্রদেশের কোনো এক

সহরে কি একটা আত্মীয়তাসূত্রে ঝুমরি-তিলাইয়ায় এসেছেন কিছুকালের জন্য। রোজই আসতেন সুন্দরলাল। প্রথম দিন এসেছিলেন নিজের তাগিদে। তারপর থেকে তাগিদটা আসতো লক্ষীবাঈয়ের পক্ষ থেকে। অনেকটা সীতারা দেবীর মতই দেখতে, চোখ কলসে যায় তাকাতে গেলে। গানের গলাও তেমনি। 'ঠুমরী টোড়ী' গেয়ে পুরস্কার পেয়েছিল একবার যোধপুর রাজার কাছে। প্রসন্ন মুখে সারঙ্গের টীপ্পি। এ রূপ দেখে ভুলে গেল দয়াল। ক্রমে আলাপ হ'লো। আবহাওয়াটা অনুকূল হ'লেই আলাপে দেরী হলো না। তারপর? তারপর তার উপসংহার ঘটলো একদিন ডেহরি-অন্-শোনের গৃহমুখি পথে দাঁড়িয়ে। কলকাতার কর্মমুখর জীবনে আজ বিস্মৃতির অতলে চাপা প'ড়ে গেছে অতীতের এতবড় একটা ইতিহাস।

কমকম্ কমাকম্। আরও জোরে চেপে এলো এবারে বৃষ্টিটা। মনে হ'চ্ছে সারারাত্রির মধ্যে আর বিরাম হবে না বৃষ্টির। আকাশের স্তরে স্তরে জমে উঠেছে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। আকাশ ছাপিয়ে মনের মধ্যে এসেও বাসা বেঁধেছে সেই মেঘের ছটা। নিঃসঙ্গ শয্যায় কেমন একটা অদ্ভুত অস্বস্তিতে বিবিয়ে উঠেছে দয়াল; অনেকদিনের মধ্যে এমন অস্বস্তি বোধ করেনি সে। মনে প'ড়লো তার—সেদিনের সেই আকস্মিক ব্যাঘ্রভীতিকে কেন্দ্র ক'রে তবু একটা খণ্ডকালের জন্য তার দু'বাহুর মধ্যে এসে ধরা দিয়েছিল লক্ষীবাঈ। হোক্ সে মুহূর্তকালের ইতিহাস, তবু অনন্তকালের মধ্যে সেই মুহূর্ত-টুকুর মূল্যই বা একেবারে কম কি! তারপর শোনা গেল একদিন মেয়েকে নিয়ে ঝুমরি-তিলাইয়া ছেড়ে চলে গেছেন সুন্দরলাল। লক্ষীবাঈয়ের পক্ষ থেকে কিছুমাত্র আপত্তি ওঠেনি তাতে। তার কিছুদিন আগেই বাবার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে দেশের দিকে রওনা হ'য়ে গেছে সীতারা শীতশ্রী। অনিশ্চিত একটা মুহূর্তে এসে সমস্ত ঝুমরিতিলাইয়া হঠাৎ যেন কেমন থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তানপুরার তারগুলো আস্তে আস্তে থেমে এলো বাবার হাতে। এই একটা অবকাশ। ভেসে পড়লো দয়াল: জয়ন্তীরাম দয়ালরাম ক্ষেত্রী। তারপর এই কলুটোলার গলী। হাসি পেলো একবার অদৃষ্টের কথা চিন্তা ক'রে। মানুষ তার নিজের ভাগ্য সম্বন্ধে একেবারেই অচেতন, কবে যে অদৃষ্টচক্র কোথায় তাকে নিয়ে যায়, এ সে নিজেই জানে না।···

জোলো হাওয়ায় কেমন যেন শীত শীত করছিল অনেকক্ষণ থেকে। একটা চাদর টেনে নিয়ে গায়ের উপর দিয়ে জড়িয়ে নিল দয়াল; তারপর কখন্ যে ঘুমিয়ে প'ড়লো, তা সে নিজেও জানলো না।

সকালে উঠে গদীতে এসে বসতেই আবার তাকে ফোন ক'রলো মোহনচাঁদ ধুধোরিয়া: 'রাম রাম ভাই।'

—'রাম রাম, খবর কি বলুন?'

—'যা বৃষ্টি, জ'মে একেবারে বরফ হ'য়ে গেছি। ঠাণ্ডা লেগে নাক দিয়ে আর শ্বাস টানতে পারছি না।' থেমে মোহনচাঁদ ব'ল্লো, 'শুনলাম মাদ্রাজ কোস্ট থেকে জাহাজ ছেড়েছে, তবে সোজাপথে না এসে তাকে ঘুরে আসতে হবে ভিজিয়ানাগ্রামের উত্তর-পূব দিয়ে। হুণ্ডা-খানেক আরও ধ'রে রাখুন।'

—'ধ'রে আর রাখবো কি! ডুবে আছি, ভাসবার কোনো পথ পাচ্ছি না।'

—'পাবেন, পাবেন, এবার তো আপনার

চুটিয়ে ব্যবসা! আমার মতো তো আপনাকে আর সর্বস্বান্ত হ'তে হয়নি!'

মাঝে মাঝে মোহনচাঁদের এই ধরনের জাংলামি অসহ্য হ'য়ে ওঠে দয়ালের কাছে। তবু তাকে শুনতে হয়, তবু তাকে কথার পৃষ্ঠে কথা ব'লে ব্যবসাদারী সৌজন্য রক্ষা ক'রতে হয়। এবারও তা-ই ক'রতে হ'লো।

—নিজের ব্যবসাকে চারদিকে ছড়িয়ে নিয়ে আছেন কিনা, ব'লতেই তো পারেন! মুখ আছে, ব'লবেন বৈ কি!'

—'তা যাক্।' মোহনচাঁদ ব'ললো: 'শীলভদ্রের ওখানে আজ আপনার নেমন্তন্ন আছে তো?'

—'হ্যাঁ, আছে। গেলে আপনারও দেখা পাবো নিশ্চয়ই!'

—'তা তো যেন পাবেন, কিন্তু খাওয়া নিয়ে একটু চিন্তায় প'ড়ে গেছি যে!' কণ্ঠস্বরে খানিকটা চিন্তাক্লিষ্টতা ফুটে উঠ্‌লো মোহনচাঁদের!

—'শত হ'লেও শীলভদ্র আমাদের জুনিয়ার, স্নেহের পাত্র; একেবারে খালি হাতে গিয়ে খেয়ে আসাটা কেমন বিশ্রী দেখায় না?'

কথাটা উল্লেখ ক'রে দয়ালকেও খানিকটা সংশোধন ক'রে দিল বটে মোহনচাঁদ! একেবারে খালি হাতে গিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে আসাটা সত্যিই যেন কেমন অভদ্রজনোচিত! ব'ললো: 'এ যে আমাকেও চিন্তায় ফেললেন দেখ্‌ছি। অথচ কীই বা দিতে পারা যায়, বলুন?'

—'তা হ'লে এখনও কিছু ঠিক করেননি আপনি?'

—'না ঠিক আর করলাম কখন?' দয়াল ব'ললো, 'শরীরটাও কাল থেকে বিশেষ ভালো যাচ্ছে না। বিকেলের দিকে কালকের মতো যদি আবার বৃষ্টি আসে, তবে হয়তো শেষ পর্যন্ত ঘর থেকে আমার বেরোনোই হয়ে উঠ্‌বে না!'

—'না, না, তা কেন!' কণ্ঠের উপর খানিকটা জোর দিয়ে মোহনচাঁদ ব'ললো, 'আপনার চাইতে বরং আমিই বেশী অসুস্থ। না যেতে পারলে আমিই বরং রক্ষা পাই।'

হঠাৎ কট্ ক'রে কানেক্‌শনটা কেটে গেল টেলিফোনের। অন্য সময় হ'লে অপারেটারদের উপর বিরক্তিতে মনে মনে অজস্র গালিগালাজ ক'রতো দয়াল, কিন্তু এখন কেন যেন খানিকটা প্রসন্নই হ'লো সে। রিসিভারটাকে রেখে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বস্‌লো দয়াল। কেন যেন গদীতে ব'সে কাজে মন দিতে আজ আর এতটুকুও উৎসাহ পাচ্ছে না সে। মানুষের জীবনে বর্ষার অধিকাংশ বড় বেশী স্বাস্থ্যকর নয়। দেহ এবং মন দু'টোকেই সে সমান-ভাবে নাড়া দিয়ে যায়—যেমন ক'রে যায় অরণ্যকে, মাটিকে। দেশে দেশে তাই সমস্ত কাব্যকে ছাপিয়ে উঠেছে বর্ষার রূপ। সীতারা গীতশ্রীর কণ্ঠেও সে লক্ষ্য ক'রেছে এই বর্ষাকে। তার দরবারি কানাড়া, ঠুংরি আর দেশী টোড়ীকে ছাপিয়ে উঠেছিল মেঘমল্লার। মানুষের চেতনার উপর বর্ষার প্রভাব অসামান্য। সারা রাত্রি তার মনের উপর দিয়ে ভেসে গেছে এই মেঘ আর বৃষ্টি, আজ তার নিজের কাছেই নিজেকে কেমন সাঁতসেঁতে লাগ্‌ছে—যেমন লাগ্‌ছে সাম্‌নের পথ আর পাশাপাশি বাড়িগুলোকে।

ধীরে ধীরে অতিক্রান্ত হ'তে লাগ্‌লো দিনের এক একটি প্রহর। জড়তা ত্যাগ ক'রে সন্ধ্যার আগে আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে প'ড়লো দয়াল! মোহনচাঁদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হবার পর শীলভদ্রের অনুষ্ঠানে গিয়ে

উপস্থিত না হওয়াটা আরও বেশী অভদ্রতা। তার জন্য কিছুটা প্রস্তুতিও অপরিহার্য। তার সামনে মোহনচাঁদ উপহার তুলে দেবে শীলভদ্রের স্ত্রীর হাতে, আর সে নির্বিকার দর্শকের মতো শুধু বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে দেখবে, এ অসহ্য, অপমানজনকও বটে। ট্রামে উঠে মিউ মার্কেটটা একবার ঘুরে এলো দয়াল।...

শীলভদ্রের ঘরে এসে যখন পৌঁছলো, দেখলো—উপহার আর উপঢৌকনের অন্ত নেই। দামের দিক দিয়েও কোনোটাই তার তুচ্ছ নয়। এত কিছুর তুলনায় তার উপহারটা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। মাত্র একগুচ্ছ ক্যামেলিয়া—অর্থকরী মূল্যের দিক দিয়ে যার দাম পাঁচ টাকার ঊর্ধ্বে নয়। শীলভদ্র অবশ্য এই নিয়েই অনেকখানি উল্লসিত হ'য়ে উঠলো। —'বাঃ, চমৎকার ফুল তো!' কিন্তু লক্ষ্য ক'রে দেখলো দয়াল—পাশে ব'সে গর্বের হাসি হাসছে মোহনচাঁদ ছুধোরিয়া। ব'ললো: 'এসে অবধি অপেক্ষা ক'রছি আপনার জন্যে।'

—'সৌভাগ্য আমার।' কথাটা না ব'ললেও পারতো দয়াল, তবু উপস্থিত মতো ব'লতে হ'লো। লক্ষ্য পড়লো তার—মোহনচাঁদের হাতে অয়েল পেপারের মোড়ক করা সিল্কের শাড়ি: তার সিনিয়রিটির চিহ্ন। একগুচ্ছ ক্যামেলিয়ার মূল্য এখানে কতটুকু?

পাশের ছোট্ট ঘরখানিতে তখন মিসেস কাপুর শীলভদ্রের স্ত্রীকে নিয়ে মুখর হ'য়ে উঠেছে নানা বয়সের মেয়েরা। হাসিঠাট্টা থেকে গান পর্যন্ত—অপূর্ব একটা প্রাণাবেগ।

দয়াল এসে দাঁড়াতেই অবগুণ্ঠনের অন্তরালে মুখখানিকে অনেকখানি নিচু ক'রে নিল মিসেস কাপুর। পরিচয়ের সূত্র টেনে শীলভদ্র ব'ললো: 'লজ্জা ক'রছো কেন, বাইরের অপরিচিত কেউ ন'ন, আমার বন্ধু মিঃ ক্ষেত্রী। ব্যবসা-ক্ষেত্রে আমার অন্যতম সহায়ও ব'লতে পারো।'

নমস্কার জানিয়ে স্মিতহাস্যে এবারে ক্যামেলিয়া শুদ্ধ হাতখানিকে মিসেস্ কাপুরের দিকে এগিয়ে ধ'রলো দয়াল: 'আজকের শুভ-দিনে আমার এই সামান্য উপহার—'

ব'লতে গিয়ে অসমাপ্ত থেকে গেল কথাটা। এরকম সব পরিবেশের সঙ্গে বিশেষ কখনও পরিচিত নয় দয়াল, কথার আপেক্ষিক গুরুত্বে তাই কেমন শৈথিল্য এসে যায় নিজের অজ্ঞাতেই। মাথার উপর থেকে এবারে ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠন সরিয়ে নিয়ে মুখ তুলে তাকাতে চেষ্টা ক'রলো মিসেস্ কাপুর, চেষ্টা ক'রলো যুক্ত হাতে একবার প্রতিনমস্কার জানাতে, কিন্তু সেই মুহূর্তেই অকস্মাৎ তার সারা মুখের উপর দিয়ে কেমন একটা ঝড়ের সঙ্কেত ব'য়ে গেল।

আবেগ মিশ্রিত কণ্ঠে হঠাৎ দয়াল ব'লে উঠলো: 'লক্ষ্মী, লক্ষ্মীবাঈ, তুমি?'

উত্তর আকাশটা বুঝি ঝড়ের মেঘে একবার আলোড়িত হ'য়ে উঠলো হঠাৎ। সেই আলোড়িত আলোড়নে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই মিসেস কাপুরের দু'চোখের মধ্যে চ'মকে উঠলো লক্ষ্মীবাঈ—যেমন দুরন্ত ভূমিকম্পে অকস্মাৎ চমকে ওঠে শিশু পাইন।

বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে গেছে তখন সমস্তটা কক্ষ।

চোখ নামিয়ে নিয়ে হাতের ক্যামেলিয়া-গুচ্ছের দিকে একবার তাকাতে গেল দয়াল। ফুলের বর্ণচ্ছটা কখন নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েছিল! মনে হ'লো—হাতে তার সুরলোকবন্দিত কমনীয় ক্যামেলিয়া নয়, রক্তময় ধূসর পৃথিবীর একগুচ্ছ কাঁটা। সেই কাঁটায় অনবরত বিদ্ধ হ'চ্ছে দয়াল: জয়ন্তীরাম দয়ালরাম ক্ষেত্রী।

ভীমচন্দ্র নাগ

৬-৮, ওয়েলিংটন স্ট্রীট • ফোন-৩৪-১৪৬৫
৮, বিবেকানন্দ রোড • কলিকাতা-৬

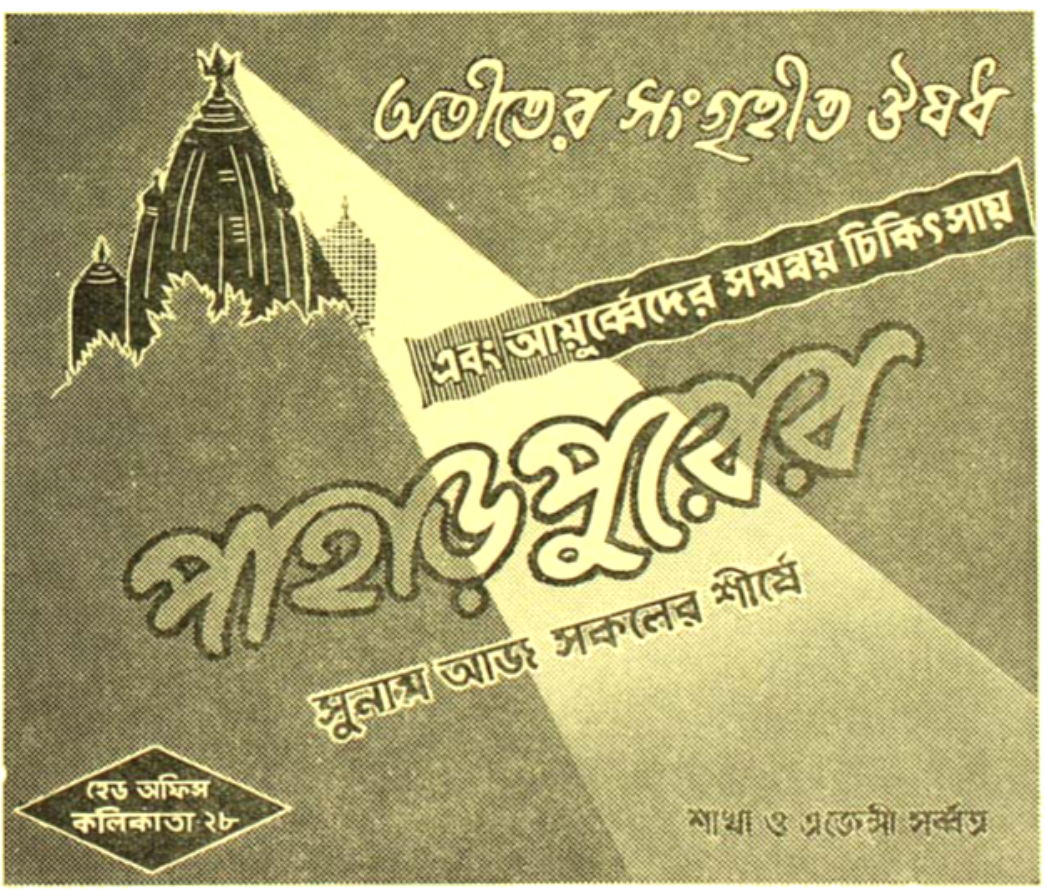

সন্ধ্যের পরে কত রাত জানে জগৎ। এই আদিম পৃথিবীর প্রথম প্রহর তারে দরজাটা খুলে টেবিলে কাগজপত্র নিয়ে বসেছে মিহির। মুখে অন্ধকার জমিয়ে মেয়েটি এল। হাতে এক পেয়ালা চা আর আলেপাতার মোড়কে মুড়ি ভেলে-ভাজা। চায়ের পেয়ালা টেবিলে নামিয়ে দিয়ে, খাবার গুছিয়ে দিতে দিতে থমথমে গলায় ঘোষণা করল—আমি আর তুর কাজ করব নাই।

মিহিরের মুখের হাসি উবে গেল। আলুর বড়াটা গলায় আটকে গেল —কেনে। কেনে, তু, করবি নাই

মুখটাকে উপর দিকে উলটে দিয়ে— কেমন এক উদাস ভঙ্গিতে বললে—মন করে না, তাই।

মিহির অবাক হয়ে চেয়ে রইল। এই সাঁওতাল মেয়েটি এসে পর্যন্ত অস্বস্তির জন্ম ছিল না। সাধারণ কামিনের কাজে এসেছে। কিন্তু চাল-চলনে যে কী আছে, যা ওকে অন্য মেয়ে থেকে বিশিষ্ট করে রেখেছে। বলতে হয় ভদ্র ঘরের মেয়ের মতন ওকে দেখতে। যদিও, ভাল লেগেছিল, বিদেশে ঘর-ছাড়া একক জীবনের মধ্যে একটি তরুণীর প্রাণ-কাড়া ব্যবহার।

কিন্তু এই ভাল লাগার পরেই একটা শঙ্কার ছায়া কাঁপত মিহিরের চোখের সামনে। বলা যায় না, মেয়েটির মনে কি আছে। স্বৈরিণী সাঁওতাল মেয়ে। বিপদেও ফেলতে পারে। হয়ত তারই জন্য এতখানি মন ভুলানো মিষ্টি ব্যবহার। বেশ কিছুদিন বিব্রত বোধ করেছিল মিহির। স্পষ্টই বলে দিয়েছিল—নিজের কাজ নিজেই করে নিতে পারবে। কিন্তু কৌশল্যা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে নি। কোন কথার জবাব পর্যন্ত দেয় নি। খাবার সময় খাবার, স্নানের সময় বালতি ভরে জল, কাপড় ময়লা হলে ঠিক সময়ে কেচে দিয়েছে। নূতন জায়গা, মিহিরের শঙ্কা বেড়েছে। মেয়েটির বয়স অল্প। একটু সাবধানই হতে হয়। মাঝে মাঝে বলেও ফেলেছে কৌশল্যাকে- এই শোনো, আমার কোন কাজ তোমাকে করতে হবে না। তুমি

তোমার নিজের কাজ করো। কিন্তু, কৌশল্যা শোনে নি।

সাঁওতাল কন্যা হলেও, ঠিক কৃষ্ণকলি নয়। নরম অথচ ঝকঝকে বাঁধুনীর শরীরে শ্যামল রং। দেহের গড়নে সতের থেকে কুড়ি বছরের আবর্ত থমকে গেছে। মেয়েটার ঠোঁটের টান-টান ঢেউয়ের তলায় যেন সব সময় সূক্ষ্ম এক লহর হাসি ডুবে ডুবে ভেসে ওঠে। মাঝে মাঝে কড়ির মত দাঁত, ঠোঁটের ফাঁকে ভাসে—কিন্তু সে খুব কম। জলের কিনারে ঝকঝকে বালির রেখা ধরে যেন একসার কড়ির ভিড়। সে খুব কমই দেখা যায়।

মেয়েটির নাম কৌশল্যা রেখেছিল কে, কে বলবে? ওনামে ওকে যেন মানায় না। তাই মিহির ওকে কোন নামেই ডাকে না।

জায়গাটার নাম পিয়ালদিহা। মেদিনীপুরের মধ্য অঞ্চল। সবুজ ঘাসের আ-দিগন্ত প্রান্তরে লাল রক্তের পাথরের নুড়ি ছড়িয়ে আছে। আকারে টিকটিকির ডিমের মত। নানা বর্ণের নানা চেহারায় বিচিত্র কুচা-পাথর।

স্থানীয় লোকে বলে, মোরাম পাথর, লুহার পাথর। যতদূর চোখ যায় যেন নিরন্ত শালের জঙ্গল, মহুয়া, কেঁদ পিয়ালের ছায়া জড়ানো পথ, প্রান্তর—এমনি একটা জায়গা। সারা জায়গাটা আগে জঙ্গলে, পতিত ছিল—এখন কয়েক হাজার মানুষের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে। এখানে ক্যাম্প গড়ে উঠেছে। পিয়ালদিহা ট্রানজিট ক্যাম্প। ঘর-হারানো নিঃস্ব মানুষগুলো এখানে এসে অস্থায়ী ঘর-বেঁধেছে। সংসার পেতেছে।

মিহির এই ক্যাম্পটির বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের কনট্রাক্ট নিয়ে এসেছে। ক্যাম্পের উদ্বাস্তু এবং সাঁওতাল কুলি কামিন খাটিয়ে তাকে কাজ করতে হয়। কুয়া খোঁড়ার কাজে ক্যাম্পবাসীদের চেয়ে সাঁওতাল কুলিরাই বেশী পটু। কৌশল্যা এদের সঙ্গেই এসেছিল। আরও এসেছে জনা দশেক কামিন। পাথরের মত মসৃণ শরীর এদের গুরু-পরিশ্রমেও ক্লান্ত হয় না। কাজ করছে কাঠফাটা রোদে—আর সেই স্বেদাপ্লুত মুখের ঝকঝকে দাঁতের হাসি হাসছে তো হাসছেই। সারাদিনের কাজ শেষ হলে আছে ঘরের কাজ। সাঁওতাল মাঝিগুলো তখন বেরিয়ে পড়ে কাছেপিঠের নেশার আড্ডার সন্ধানে। মেয়েগুলো তখন গা ধুয়ে, পরিচ্ছন্ন হয়ে জল আনে, কলসী মাথায় চাপিয়ে। তারপর সারা সংসারের কাজে মগ্ন হয়।

মিহিরের কাজগুলো এতদিন যারা করে ছিল তারা কেউ বাঁধাধরা ছিল না। ভারী বা পানিওয়ালা-বুড়োটা জল এনে দিত, কাপড় কতক নিজে, কতক দু'একজনা যেচে এসে কেচে দিত, কতক ধোপার বাড়ী যেত। দিনের আহার ক্যাম্প সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সাহেবের বাড়ীতেই হত। কিন্তু কৌশল্যা এসে সব ব্যবস্থা পাল্টে দিয়েছে।

প্রথম প্রথম রান্নার ব্যাপারে মিহিরের শঙ্কা জেগেছিল। ক্যাম্প সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সাহেবের কাছে অনেক ভূমিকা করে কৌশল্যার নিজের হাতের রান্নার কথাটা পাড়তে হয়েছিল। কিন্তু, রঙ্গভূমিতে কৌশল্যা নিজেই সব মুস্কিল আসান করে দিল। বললে—বাবুজি, রান্না হামি করলে জাত যাবে নাই। হামি বরা, সাপ, ব্যাং খাই না। ক্যাম্প সুপারিনটেণ্ডেণ্ট খোস মেজাজী মানুষ। মুচকি হেসেছিলেন শুধু। বলেছিলেন তোর রান্না বাবুজি খেতে না পারলে—তোর চাকরী যাবে। বাবুজিকে তুই আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলি মনে থাকে যেন।

কৌশল্যার মুখের অর্ধেক লজ্জার ঢেউয়ে ভেঙে পড়েছিল। চট করে পালিয়ে গিয়েছিল সামনে থেকে।

মিহিরের বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। যখন অতি পরিচিত স্নাসের ডিমের খোল, ভাজা, ডাল দিয়ে খেয়ে উঠল। খুসিতে হেসে মিহির বলেছিল—এত সব রান্না তুই জানলি কি করে।

কিছুই বলেনি মেয়েটি। শুধু টান টান ঠোঁটের চাপে একটা সূক্ষ্ম হাসি ফুটিয়েই মিলিয়ে গিয়েছিল।

আরও বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল বিকালে চা-করে খাওয়ানো। পরটার সঙ্গে আলু পেঁয়াজ ডিম ভেজে আনল।

খুসিতে মিহিরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—শুধুন কৌশল্যা দেবী।

কৌশল্যা নম্র মন্থর পায়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। তখন বেলাটা পুরোপুরি ঢলে পড়েছে। সাঁঝ আলোর আয়োজন একটু একটু চোখে পড়ছিল। মেয়েটির দিকে চেয়ে অবাক হল মিহির। ভদ্রলোকদের মত ও সাবান দিয়ে গা মেজে এসেছে। মুখে তাজা সরের লাবণ্য। হাওয়ায় যেন একটু একটু সুগন্ধ ছাড়ছে। কিসের? পরিচিত প্রসাধনের কি! অভিভূত মিহির নিজেকে সামলে নিল। বললে—আজ চন্দ্রকোণার হাটে যাচ্ছি। কি কি আনতে হবে বলে দাও।

সংসারের টুকিটাকি সমস্ত জিনিষের একটা হিসেব কাগজে লিখে দিয়েছিল কৌশল্যা। অবাক হয়েছিল মিহির। বাংলা স্কুলের পড়া মেয়ে এখানে এই কামিনের কাজ করতে এসেছে।

মিহির বললে—বাংলা লেখা শিখলে কোথায়?

স্পষ্ট পরিষ্কার কণ্ঠে কৌশল্যা বললে—প্রাইমারী স্কুলে। কর্ণেল গোলার স্কুলে বাবা পড়িয়েছিলেন।

—কতদূর পড়েছ।

—ক্লোর পর্যন্ত পড়েছি। বাবা হঠাৎ সাপের কামড়ে মারা পড়লেন। তারপরে—

হঠাৎ থেমে গেল।

মিহির বললে—তারপরে কি হল।

খলখলিয়ে হেসে উঠল কৌশল্যা।—দূর ছাই বলব না। বলেই পালিয়ে গেল।

চন্দ্রকোণার হাট থেকে একটা শাড়ী এনে দিয়েছিল মিহির। সাবান আর গন্ধ তেল। খুশিতে অপরূপ হয়ে উঠেছিল ও। এরপরে মিহিরের একক সংসারে পাকাপাকি ভাবে সব দায়িত্বই কৌশল্যা নিয়েছে।

এ হল এক পক্ষকালের ঘটনা মাত্র। মিহির চমকে উঠল কৌশল্যার কথা শুনে। বারবারই একটা কথা বলে চলল মিহির—ক্যানে, তু, চলে যাবি কেনে, বল।

কৌশল্যা অবশ্য চলে যায়নি। দুপুরের খাওয়ার পরে মিহির সেদিনকার খবরের কাগজটা সবে খুলে বসেছে। ঝাঁকড়া চুল কাঁধের সীমা পর্যন্ত ঝুলান বলিষ্ঠ মধ্যবয়সী একজন সাঁওতাল এসে দাঁত বার করে হাসল। রাঙ্গা চোখ, হলদে দাঁত। সারা গায়ের চামড়া ফাটা ফাটা। মিহির মুখ তুলে তাকাতেই, লোকটা বললে—কুশল্যা হামার বহু আছে। উকে লিয়ে যাব ঘর।

মিহির লোকটার ভাবে-ভঙ্গিতে একটা উদ্ধত ভাব দেখে খুবই বিরক্ত হল। একটু ধমকের সুরে বললে—তোমার ঘর কোথায়?

লোকটা আঙ্গুল দিয়ে একটা দিক লক্ষ্য করে বললে—ওই, ওদিকে। চন্দরকোণা।

বলেই উবু হয়ে বসে শালের কাঁচা পাতা মুড়ে চটা বানাতে বসল।

কাগজটা একবার দেখে নিয়ে মিহির বললে—যাও, কৌশল্যাকে ডেকে নিয়ে এস।

লোকটা একগাল হেসে উঠে গেল। একটু পরেই কৌশল্যা এল। স্বামীসন্দর্শনের কোন সুখকর ছাপই তার মুখে দেখা গেল না। ম্লান বিষণ্ণ মুখে গভীর থমথমে ভাব; সেই পরিচিত কড়ির হাসিটি মুখে নেই।

মিহির কাগজের লেখায় চোখ রেখেই বললে—তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছে।

কৌশল্যা কোন কথা বলল না। যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। লোকটাও সঙ্গে সঙ্গে গেল। একটু পরেই কৌশল্যা এল। সঙ্গে সেই লোকটা নেই।

মিহির বললে—মাঝি কোথায় গেল?

ঠোঁট উলটে কৌশল্যা বললে—গেল মরতে, নেশার আজ্ঞায়।

মিহির বিস্মিত হল ভয়ানক। বললে—নিতে এসেছিল—যাবে না।

বিচিত্র এক চড়া সুরে কৌশল্যা বলে উঠলো—না। হামার মন করে না। উকে টাকা দিয়ে দিইচি। দুদিন আর আসবেক নাই।

মিহিরের যে বয়স—তাতে এ একটা প্রচণ্ড বিস্ময়। বস্তুতঃ তেইশ চব্বিশ বছরের তরুণের অভিজ্ঞতায় এ ধরণের ব্যাপার একেবারে অতি বিস্ময়কর তো বটেই।

মিহিরের আগেই রাগ হয়েছিল কৌশল্যার স্বামীদেবতার ভাবে-ভঙ্গিতে। এবারে কৌশল্যার এই আচরণটায় যেন একটা মানবিক সঙ্গতিই খুঁজে পেল মিহির। বর্বর নেশুড়ে লোকটার হাত কিছুতেই কৌশল্যার দেহ ছুঁতে পারে না। মিহির কথাটা জোরেই বলে উঠলো—না। অর্থাৎ এ ব্যাপারে রায় দেওয়ার ক্ষমতা একান্তই যেন মিহিরের।

কৌশল্যা চমকে উঠলো। বললে—কি বলছিস রে বাবু—

মিহিরও কম চমকাল না। মেয়েটির কাছে নিজের দুর্বলতা কিছুতেই প্রকাশ করা চলবে না। গম্ভীর গলায় বললে—সকালেই তো বললে—আর কাম করবে না। চলে যাবে। আবার এই মুহূর্তে মত বদলালে।

—হামি গেলে, তুকে দেখবে কে?

—এই কথা। আমি দেখব আমাকে। তুই আসার আগে আমাকে কে দেখেছে?

বিচিত্র সংলাপ। কৌশল্যার চোখ বুঝি ঝাপসা হয়ে উঠল। বললে—হামি, আর যাবনা, যাবনা, যাবনা।

—বলিস কি। তোর মরণটা যে আমার আসবে।

—আসুক। ফিরিয়ে দেব।

মিহির বললে—তারপর, আমি তো আর চিরদিনের জন্য এখানে থাকছি না। তখন কি করবি?

—কাঁসাইতে ডুবে মরব। অর্থাৎ কংসাবতীতে ডুবে মরবে।

বিচিত্র এ মেয়ের মন। দুর্ভাগ্যের তাড়া খেকে বুঝি কোনদিনই ওর রেহাই নেই বলেই কাঁসাইতে ডুবে মরার বাসনা। ঐ যে মাঝি—ঐ লোকটার সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারবে না বলেই কৌশল্যাকে চাতুরীর আশ্রয় নিতে হবে। ঘুষ দিয়ে ফেরাতে হবে। তারপরে যখন সে পথও থাকবে না—তখন মরতে হবে মেয়েটাকে। জীবিত অবস্থায় ঐ মাঝিটার বৈধ স্বামীর তাকে তাড়া করে ফিরবে। অবশ্য

সাঁওতাল সমাজের কানুন মিহির জানে না। মিহিরের মনের কোথায় যেন একটা বেদনা জমতে আরম্ভ করেছে। যে বেদনার জন্ম মিহির পালাতে পারবে না এই অঞ্চল থেকে। এই ভাবে উঠিয়ে হয়তো পাকাঘরই একদিন গড়ে তুলতে হবে। বোধ করি সেই ভাবনাটারই নিরক্ষর সুতার টানা হেঁটে চলেছে মিহির উড়ানীদের মতো।

বিকেল গড়িয়ে তখন সন্ধ্যা ঘন হয়েছে। কৌশল্যা পরিচ্ছন্ন একটি মেয়েলীর মত সুগন্ধ ছড়িয়ে, মাথায় কুচি ফুল গুঁজে দেখা দিল। হাতে তার সন্ধ্যা-বাতি।

মিহির ডাকল—কৌশল্যা।

—উ। মৃদু ঠোঁট মুচকে জবাব দিল কৌশল্যা।

কৌশল্যার ঠোঁটে হাসির ঢেউটা দুলছে। পাশে এসে দাঁড়াল। সাঁওতাল মেয়ের শাখা বলয়িত নিটোল কব্জিটা আলতোভাবে ধরে ফেলল মিহির। তারপরে ভাবতে লাগল কি সে বলবে। ভাবছে, কারণ বলাটা যে একজন নয় দুজন সম্বন্ধেই। অবশেষে জোর করে বলেই ফেলল মিহির, আমি কালই চলে যাব।

মেয়েটি একবার চমকে উঠে মিহিরের চোখের দিকে তাকাল। তার পরেই মান দেওয়া গলার হাসির আওয়াজটা যেন ফুটেও ফুটল না। হাসির ধাক্কাটা ওর শরীরে লহর তুলতে লাগল।

কী যেন বলতে গিয়েও ও বলল না। শুধু আপত্তির প্রবল ভঙ্গিতে মাথা একদিকে হেলিয়ে বলল—উম্।

ওর ঠোঁট দুটি যেন উপচে পড়া পানের রস সামলাচ্ছে।

বিস্মিত মিহিরের চোখে আর পলক পড়ছে না। আবার বললে ও—আমি চলে যাচ্ছি, কাল কি পরশু। এখানে আর থাকা হবে না আমার।

—উঃ মুরোদ কত, বলেই আর দাঁড়াল না। যেন ছুটেই পালিয়ে গেল মেয়েটি।

ঘরে একরাশ গন্ধ আর 'মুরোদ কত' কথাটায় নানান সুরের অর্কেস্ট্রা বাজতে থাকল মিহিরের কানের কাছে। মিহির ভেবে দেখল, সত্যি তার এত সহজে এ জায়গা ছেড়ে যাবার শক্তি নেই। দুজনের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সত্ত্বেও মিহির যে মেয়েটির মোহে ক্রমশঃ জড়িয়ে যাচ্ছে এতে আর কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু, তবুও মিহিরের এখন অন্য কোথাও যাওয়া চলবে না। কোম্পানীর কাজে তাকে এইখানেই থাকতে হবে।

কথাটায় মিহিরের বিবেক সান্ত্বনা পেল।

আসন্ন রাত্রির জন্য ওর মনে সুরসপ্তক ঝঙ্কার দিয়ে উঠতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটার ভাগ্যের জন্য ওর মনে বেদনার সঞ্চার হতে লাগল। দুইয়ের মিশ্র অনুভূতিতে রক্তে যেন কিসের প্রেরণা ঠেলে ঠেলে ওঠে। বোধহয় মেয়েটার দুর্ভাগ্যের দলিলটাকে ছিঁড়ে ফেলে নূতন করে লিখতে চায় ও। রাত্রিটা বুঝি তারই জন্যে এগিয়ে আসছে।

এ বাড়ীর ছাদ থেকে ও বাড়ীর রজনী-গন্ধার গুচ্ছটা বেশ দেখা যায়। আর তাই দেখে হেসে ওঠে মায়া, মিন্টু, বুলু। সে হাসিতে সুজাতাও যোগ না দিয়ে পারে না।

তাহলে তোর বুদ্ধদেবটা সত্যিই একটা বুদ্ধু, বুলু বলে।

তুই তোর ইতিহাসের বিদ্যে সকল জায়গায় খাটাতে যাসনে, বুঝলি। আসলে লোকটা হয় তো কবি,—দর্শনের ছাত্রী মিন্টু প্রতিবাদ করলে।

কবি না আমার মাথা! আসলে একটা বদ্ধ পাগল। সারা দিনরাত ঘরময় পায়চারি করে, কি সব বিড় বিড় করে আর ঐ রজনী-গন্ধার দিকে তাকিয়ে থাকে,—সুজাতা প্রতিবাদ করে।

তা' পাগল যদি সত্যিই হয়ে থাকে তা হলে তোর জন্যেই হয়েছে। মিন্টু তার পরাজয়টা এবার পূরণ করে নিতে চায়। বুলু, মায়া এ ওর গায়ে হেসে ঢলে পড়ে।

তবুও মিন্টুর মন ভরে না। বলে, এই বিশ বছরে আর কত জনকে পাগল করবি রে। কলেজে তো শুনি ডি.বি. এখন অধ্যাপনা ছেড়ে কবিতার বই লিখছেন আর ঘরে গিন্নীর গঞ্জনা সইছেন।

আর বলিসনে ভাই। মিন্টুর কথাগুলো কেড়ে নিয়ে সুজাতা বলে, গরমের ছুটির দিন ইডিয়টটা আমাকে কি বললে জানিস, বললে, অনেকদিন তো কলেজ বন্ধ, তুমি বরঞ্চ আমার সঙ্গে বাইরে কোথাও দেখা করো, তোমার অনার্সের একটু সাহায্য করব।

বুলু এতক্ষণ শুধু হাসছিল, এবার সেও মুখ খুললে, বললে, সাবজেক্টটি নিশ্চয়ই ইংরাজী নয়—

শেষটুকু মায়া যোগ দিল—লাভ এ্যাফেয়ার্স নিশ্চয়ই।

সুজাতাও মৃদু হাসির গুঞ্জনটুকু থামিয়ে বললে, ওসব আমার কপাল ভাই, যত সব—

কপাল! গুড লাক বল। সব মেয়েই তো চায় তাদের এ্যাডমায়ারার বাড়ুক, কিন্তু তোর মত এমনি ক' জনে পায় বল তো— মিন্টু যেন একটু আপশোষ করে বললে।

আচ্ছা, সত্যিই বলনা, সুভ্র, সত্যিই কোন দিন কাউকে ভালবেসেছিস? বুলু যেন কাউকে ভোলবার শেষ চেষ্টা করবার জন্য প্রশ্নটা করলে

ধেৎ, যত সব বাজে কথা। দাঁড়া, বেশী তো আশিসনে, দেখি একটু চা-টার ব্যবস্থা করি গিয়ে। সুজাতা যেন প্রসঙ্গটা এড়াবার জন্য সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। বিকেলের পড়ন্ত রোদে তাকে ঠিক বোঝা গেল না। শুধু বুলু, মায়া, মিন্টুর ঔৎসুক্যের ঘর-স্রোতে কে যেন অবাঞ্ছিত এক সীমারেখা টেনে গেল।

ভালবাসা! নির্বোধের মত লোকে কেন প্রশ্নগুলো করে! ক্লান্ত দুপুরে ছায়াবিবিড় শান্তিটুকু কার না ভাল লাগে? চলতে চলতে পথে রজনীগন্ধার গুচ্ছ কেউ যদি তাতে দিয়ে বলে, 'হে বন্ধু, মনে রেখ'—কার না ভাল লাগে। সে যে শুধু কথা নয়। সে যে ব্যথাও। তবুও বন্ধুরা বলে, তোর এত রূপ, তুই কি কখন ভালবেসেছিস? কি বলবে সুজাতা! বলবার মত তো কিছুই নেই। যে প্রশ্ন করে সে উত্তর জেনেই করে। শুনতে ভাল লাগে, তাই প্রিয় কবিতাটির মত বারবার রোমন্থন করতে চায়। অলক্ষ্যে দীর্ঘশ্বাস—

ও বাড়ীর জানলার পরে রজনীগন্ধার গুচ্ছটা কেঁপে ওঠে। বাতিটা জ্বলে ওঠে। এতক্ষণে বুঝি বুদ্ধদেব বাবু ফিরলেন।

পাশাপাশি দু'খানা বাড়ী। একটি পূর্বে আর অপরটি পশ্চিমে। একটির ছায়া পড়ে অপরটির গায়ে সকালে, আর অপরটির ছায়া পড়ে একটির গায়ে সন্ধ্যায়। এর পূরবী ওর

"জনম অবধি হম রূপ নেহারনুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল—"
—বিদ্যাপতি

যুগে যুগে সৌন্দর্যের এই-ই
শাশ্বত স্বীকৃতি

আতরণ আর আবরণীতে সজ্জিতা হলেও পূজোর সমস্ত আনন্দের বিকাশ আপনার মুখে—আপনার মুখখানিকে অবিস্মরণীয়, অনিন্দ্যসুন্দর ও সুষমা মুরভিত রাখবে বোরোলীন।

বোরোলীন
পরম প্রসাধন

জি. ডি. ফার্মাসিউটিক্যালস্ প্রাইভেট লিঃ
বোরোলীন হাউস • কলিকাতা-৩

বিভাসকে আশীর্বাদ করে যায়। মাঝখানে ব্যবধান শুধু একটা আঁকাবাঁকা গলির। সন্ধ্যাবেলা চানাচুরওয়ালাটা যখন রাস্তা দিয়ে হেঁকে যায়, সুজাতাও সচকিত হয়ে ওঠে। ও পাশের বাড়ীর ঘরের আলোটা জ্বলে ওঠে, একগুচ্ছ রজনীগন্ধা হাতে ঘরের মালিককে এবার দেখা যায়। কেউ নেই ভদ্রলোকের। কেমন যেন মায়া হয় সুজাতার। কিন্তু, রাগও হয়; কেন এত সিগারেট খান ভদ্রলোক। সুজাতার মনে হয়, সে গিয়ে বলে, এত সিগারেট আমি খেতে দেব না!

ওমা সে কেন বলতে যাবে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। বাবা কি ভাববে, পিসিমা কি বলবে, পাড়ার ছোঁড়াগুলো যে হাসবে! না, সে তো সত্যিই আর বলতে যাচ্ছে না। নিজের কৈফিয়তে নিজেই হেসে ওঠে সুজাতা।

আচ্ছা, এই তো এতদিন বাস করছে পাশাপাশি, একদিন তো কথা বললে হয়। না, নিশ্চয়ই একদিন কথা বলবে সুজাতা।

কি বলবে? কেন কত কথাই তো বলার আছে। ইচ্ছে থাকলে শুধু হ'ল। হয় তো ঘুঁড়িটা ওবাড়ীর ছাদে আটকে বলবে, দয়া করে একটু ছাড়িয়ে দেবেন, মশাই। ব্যাস, তারপর লাট্টাটা ফেলে ঘরে এসে খিল দিয়ে পড়ে থাকবে।

না, বেশ ভদ্রলোকটি। ছাত্ররা আসে—প্রণাম করে। জানলার কোণে লুকিয়ে লুকিয়ে সব দেখেছে সুজাতা। মনে হয়েছে ওদের সঙ্গে মিশে যদি একটা প্রণাম করে আসা যেত!

পিসিমার সন্দেহী চোখ সমস্ত বুঝে নিয়েছে। বাবা বলেন, তা' আর দু'দিন বাদে বিয়ে দিলেই তো চুকে যাবে, দিদি। সিঁড়ির মোড়ে কথাটা কানে যেতেই চমকে উঠেছে সুজাতা। খবরের কাগজটা আজ বাবার ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয়ে ওঠেনি।

পড়বার ঘরে বই খুলে কাটিয়েছে সারাটা দিন। মন বোঝে না। সেকি অন্যায় করছে? তবে কেন বাবার এ অযাচিত করুণা? হঠাৎ ওবাড়ীর দিকে চোখ পড়ে। বাড়ীটা যেন তার জীবনের নিশ্চল একটা প্রশ্ন।

বৃদ্ধদেববাবু ফুলদানিটার জল পালটে দিচ্ছেন। দীর্ঘ অদর্শনের পর প্রেমিক যেমন করে তাকায় তার প্রিয়ার দিকে তেমনি প্রশান্ত নিবিড়তায় বৃদ্ধদেববাবু তাকিয়ে রয়েছেন, ফুলগুলির দিকে। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ফুল ভালবাসেন? সুজাতা ঠিক করলে সেও রজনীগন্ধা রাখবে।

কেন? রাগ হ'ল সুজাতার। ঐ রজনীগন্ধাগুলোই তো তার কাল। সারাক্ষণ বৃদ্ধদেববাবু যে সেই দিকেই তাকিয়ে থাকেন। কি যে যাদু জানে ফুলগুলো। সুজাতার মনে হয় এ এক বিধাতার নির্মম অভিশাপ। নারীর গর্ব খর্ব করবার জন্যই বোধহয় বিধাতা পৃথিবীতে ফুলের বন্যা বয়ে এনেছেন।

পিসিমার কথা মনে পড়ছে সুজাতার। বুড়ী নিশ্চয়ই বাবাকে ধুতি চাদর পরিয়ে পাত্র খুঁজতে পাঠাবে এবার। দিনকয়েক বাদে হর্ণ বাজিয়ে একটা গাড়ী এসে থামবে—নামবে কয়েকটা সন্ধানী চোখ। আই. বি.দের চেয়েও তাদের অনুমান করবার ক্ষমতা বেশী। এদের কাছে মন ভোলাবার পরীক্ষা দিতে হবে সুজাতাকে। আর বাবাকে করতে হবে মাথা হেলানোর প্রতীক্ষা। বিশ্রী লাগে, তবু বাবার জন্য সবই তাকে করতে হবে।

তবু জানলার পরে ফুল রেখেছে সুজাতা।

ছাড়া রজনীগন্ধার গুচ্ছ ছুঁড়ে বাড়িয়ে আকাশ হয়ে চলে। নীল আকাশ, গভীর গহন সে আকাশ—কেউ তা জানে না।

ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল বৃদ্ধদেব বাবুর। এতদিন ডাক্তার, নার্স, ছাত্র, সহকর্মীদের ভীড়ে ও বাড়ীর ঘরটা সকল সময় ভরা থাকত। প্রথমে তো কিছুই বুঝতে পারেনি সুজাতা; পরে ঐ জানলার কোণে দাঁড়িয়ে সব দেখেছে, শুনেছে, রজনীগন্ধার গুচ্ছ শুনেছে। কি জানি কেমন যেন সারাক্ষণ ভয় করত সুজাতার। কিন্তু কি করবে সে? একদিন তো কিকে বলেই ফেললে। কিও রাজী হয়ে গিয়েছিল। না থাক, বলে সুজাতা চলে গিয়েছিল।

ওবাড়ীর রজনীগন্ধার গুচ্ছটা প্রতিদিন শুকিয়ে যায়। ঝরে ঝরে পড়ে। সুজাতার মনে হয় নীল আকাশ ভরেছিল পূর্ণিমা চাঁদে, প্রতিদিন ক্ষয়ে ক্ষয়ে গিয়ে একদিন হয় তো আসবে অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি। তারপর সবসুই অন্ধকার। কিন্তু না, এমনি দিন যেন সত্যিই না আসে। তার যা কিছু আছে, সে সবসুই দিতে পারে, কিন্তু এমনি দিন যেন না আসে। কিকে দিয়ে রজনীগন্ধা পাঠাতে চেয়েছিল সুজাতা। কিন্তু না, সে পাঠাবে না। নিজের এ বেদনা অনন্ত হোক। নিজের কথা একান্তই নিজের হয়ে থাক।

তবুও মন বোঝে না। মনে হয় একগুচ্ছ রজনীগন্ধা নিয়ে ওবাড়ীর জানলাটার পরে যদি রাখতে পারত, সব অসুখ সেদিন ভাল হয়ে যেত। যেত না? নিশ্চয়ই যেত।

শরৎ এসেছে আকাশ ছেয়ে। নরম রোদে ভরেছে দিগন্ত। বেতারে বাজছে মাঙ্গলিক। দেহ অত্যন্ত দুর্বল, তবুও জানলার ধারে দাঁড়িয়েছেন বৃদ্ধদেব বাবু। এই সোনার সকালে, ওপাশের বাড়ীর রজনীগন্ধাগুলোকে যেন আরো সুন্দর লাগছে। কতকাল যেন রজনীগন্ধা দেখতে পাননি—কতকাল যেন। মনে পড়ে! কিছুই কি মনে পড়ে! জীবন ভরা ছিল একখানি গানে, আজ তার স্মৃতিটুকু আছে, কথাটা যেন কোথায় হারিয়ে গেছে।

সুজাতাও ধীরে ধীরে এসে দাঁড়িয়েছে রজনীগন্ধার পাশে। মুখোমুখি, চোখোচোখি, সামনা সামনি। কোন ভয় নেই, লজ্জা, দ্বিধা, সামান্যতম সঙ্কোচ কিছুই নেই।

আচ্ছা, তুমি যখন রজনীগন্ধা আনবে, আমার জন্য এক তোড়া আনতে পারবে না? অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে বললেন বৃদ্ধদেব বাবু।

অপ্রত্যাশিত ঐ প্রশ্ন। কিন্তু মনে মনে শুধু এইটুকুই কামনা করেছে সুজাতা। সুবোধ বালিকার মত মাথা নেড়ে একছুটে পালিয়ে গেছে।

কলেজে এসেছে, কিন্তু চঞ্চলতা যায় নি। সারাক্ষণ শুধু মনে হয় বাতাস তো শুনেছে, সে বুঝি বলবে আকাশকে, আকাশ বলবে মহাশূন্যকে, মহাশূন্য বলবে মহাবিশ্বকে। কলঙ্ক? কলঙ্কিনী চাঁদ হয়ে রইবে সে শুক্লপক্ষের অন্তবিহীন আকাশে।

মায়া জিজ্ঞাসা করে, কি রে তোর অসুখ করেছে?

ঠোঁট পাতলা মিষ্টু বলে, অসুখ না করুক এ বয়সে বিসুখ তো করতে পারে।

সুজাতা শুধু হাসে।

উৎসাহিত হয়ে উঠে ওরা। বলে, আর তোর সেই হিরোটির খবর কি? সেই যে প্রফেসার কাম পোয়েট-এর।

মনে মনে শিউরে ওঠে সুজাতা। কি জানি সকালের খবরটা কি পেয়েছে এরা। বাইরে তবু হাসি হাসি মুখ করে বললে, শুনছিলাম তো তাঁরও অসুখ করেছে।

অসুখ করেছে। হ্যাঁ তা হলে সিকোয়েন্স তো ভুল হয়নি। অমনি তুই একদিন রাত্রে গিয়ে বলবি, আমি এসেছি এবার তোমার সব রোগ ভাল হয়ে যাবে। মিন্টু পাশ থেকে যোগ করলে, তোমার ঐ পায়চারী করা থেকে পাগলামী করা পর্যন্ত, প্রাণেশ্বর!

বুলু বলে, তোদের যত বাজে কথা। আচ্ছা, লোকটা কি কোনদিন তোর দিকে তাকায়নি। এই ধর, তুই যখন জামা কাপড় ছাড়িস—

কি যে বলবে সুজাতা ভেবেই পায় না। মেয়েদের কৌতূহল ও বোঝে। তাই রাগ করলে না।

কলেজ থেকে চলে এল নিউ মার্কেটে। তিনটাকা দিয়ে দু' ডজন রজনীগন্ধা কিনলে। কাগজে জড়িয়ে দিচ্ছিল দোকানদার, সুজাতা সেগুলো জড়িয়ে নিল নিজের আঁচলে, তারপর সোজা বাড়ী চলে এল।

দুপুর চলেছে, প্রহর কাঁপছে। রজনীগন্ধা দুলছে। বাবা আফিসে, পিসিমা ঘুমিয়েছে।

এই তো অবসর। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে সুজাতা। এক পা বাড়াল আবার পিছিয়ে এল। আচ্ছা চিঠী কোথায়? অবসর বুকে সেও বুঝি পালিয়েছে। সুজাতা নেমে এল। বুকের মধ্যে রজনীগন্ধা দুলে উঠল, তারপর এ বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল বৃদ্ধদেব বাবুর ঘরে।

ফুল নেবেন না? এই যে ফুল এনেছি —গলাটা বুঝি একবার কেঁপে উঠল, তবু ডাকল সুজাতা।

ও তুমি। বা বেশ ফুলতো। বসো ঐ চেয়ারটায়, বৃদ্ধদেব বাবুর চোখে মুখে ফুটে উঠেছে প্রতীক্ষার প্রাপ্তি।

সুজাতাও আর দাঁড়াতে পারছিল না, সেখানেই বসে পড়ল।

তুমি দেখছি পড়াশুনা কর না? কোন ইয়ারে?

ফোর্থ ইয়ারে; ইংরাজীতে অনার্স, সুজাতা বলল।

ফোর্থ ইয়ার, ইংরাজীতে অনার্স। কথাটা আপনমনে বার কয়েক আবৃত্তি করে নিলেন বৃদ্ধদেব বাবু।

ওকথা বলছেন কেন, পালটে প্রশ্ন করলে সুজাতা।

অনেকদিন আগে একটি মেয়ে প্রতিদিনই আমাকে রজনীগন্ধা দিয়ে যেত। সেও ফোর্থ ইয়ারে পড়ত, ইংরাজীতে অনার্স ছিল।

সেই থেকে বুঝি আপনি ফুল রাখেন? একটু স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে সুজাতা।

হ্যাঁ; সেই থেকে। সে আমাকে বলেছিল আবার যদি কোনদিন মনে পড়ে তবে ঐ রজনীগন্ধার মধ্যে আমাকে খোঁজ করো, ওখানে আমি থাকব।

ছোট একটা নমস্কার করে নিজের ঘরে চলে এল সুজাতা। নিজের ঘরের ফুলদানির রজনীগন্ধাগুলো তখনও বাতাসে দুলছে, হাসছে। সেদিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে নিল। তারপর দূর করে ফেলে দিল বাইরে।

নিজের ঘর থেকে পিসিমা ডাকলেন, ওরে কে কি ভাঙলে রে?

সেই থেকে আর ফুল রাখেনা সুজাতা, পূবের ও জানলাটাও কোনদিন খোলেনি? কেন? কেউ তা জানে না।

পাঞ্জাবিটি তো তোমার গায়ে খাসা ফিট করেছে কবি।

করতেই হবে। কে কেটেছে জান?

কে—শুনি!

এও আবার তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে!

বুঝেছি, চাঁদনী থেকে করিয়েছ।

ছাই বুঝেছ! আচ্ছা রমাপতি, তুমি গল্প উপন্যাস লেখ কি করে! তোমার তো দেখছি রসবোধই নেই!

রক্ত চোষায় রস চুষে খেলে বোধশক্তির আর দোষ কি বলো।

ইজম্ শুরু করলে তো?

বেশ, মুখ না হয় বন্ধই করছি। কিন্তু পাঞ্জাবিটি কোত্থেকে করালে?

ঐ যে বললুম।

কি বললে?

যা বলার ঠিকই বলেছি। আসলে গল্প লিখে লিখে তোমার মগজের ঘিলু ভোঁতা হয়ে গেছে। এবার থেকে কবিতা লিখতে চেষ্টা করো।

পেছু হাঁটতে বলছ! তাও যদি কবিতা লিখতে বলতে।

কবিদের অবস্থা আরও শোচনীয় হে। তারা তোমার চেয়েও শুষ্ক কাষ্ঠ—

আর রসের রসিক বুঝি তুমি একা?

না—রস-বৃন্দাবনে ললিতা বিশাখাও আছেন। তাঁদের বাদ দিয়ে আর রস জমে কি করে। আচ্ছা ঔপন্যাসিক, তোমার স্ত্রীরত্নটি এখন কোথায়? বাপের বাড়ি, না—

বুঝেছি—বুঝেছি, পাঞ্জাবিটি তা হলে বৌদি স্বয়ং কেটেছেন।

এতক্ষণে মগজে ঢুকলো! বলিহারি তোমার বুদ্ধি!

রসিকজনের সংস্পর্শেই হয়তো।

আলবৎ—একশো বার। কবিতাই জীবন-রসায়ন। গল্প তো শুধু কথার কচকচি।

সত্যি, তুমি ভাগ্যবান কবি।

সে কথা বলতে। স্ত্রীভাগ্যই ভাগ্য। এই যে পাঞ্জাবিটি দেখছ, এটি শুধু কেটেই খালাস নন। নিজের হাতে কেচেছেন, ইস্ত্রি করেছেন, গায়ে পরিয়ে দিয়েছেন।

রমাপতি এতক্ষণ হালকাভাবেই রসিকতা করছিল। কিন্তু এবার ওর দু'চোখ ছানাবড়া হয়। এ সব কি বলছে কবি!...

কবি বলেই যায়, তোমার বোধ হয় আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না। কিন্তু সত্যি বলছি, উনি যে কি চোখে আমাকে দেখেন তা বলে বোঝাতে পারবো না। সকালে সবার আগে ঘুম থেকে ওঠেন। আমার লেখার টেবিলটি ঝেড়ে পুঁছে নিজের হাতে গোছান। ফুল ভালবাসি বলে দু'বেলা ফুলদানিতে ফুল পালটে দেন। তারপর চলে যাবার তৈরীর ধুম। লুচি, হালুয়া, পাঁপর ভাজা, যেদিন যা অভিরুচি। সর্বশেষ চায়ের জলটি উনুনে চাপিয়ে চুপি চুপি এসে আমার ঘুম ভাঙান। বলেন, কবি উঠুন। মুহূর্ত সমাগত। সাদার ওপর সবুজের আঁচড়ে সোনালী প্রভাতকে রূপ দিন।...

রমাপতির পক্ষে হাসি চেপে রাখা দায় হয়ে ওঠে। মনে হয় আস্ত একটি পাগলের সঙ্গেই পথ চলছে ও। হতবাক হয়ে এক পলক তাকায় মাত্র কবির দিকে।

কবি বলেই যায়, সময় সময় ওঁর সেবা যত্নে বড় সংকোচ বোধ করি। ওঁকে বাধা দিতে যাই। কিন্তু উনি কোন বাধা মানেন না। বলেন, সাকী ছিল বলেই ওমর নিখিল-বিশ্বকে রোবায়েৎ উপহার দিতে পেরেছিলেন। আমি এটুকু না করলে তুমি লিখবে কি করে?... সত্যি রমাপতি, আমার কবিতার উৎসই উনি।...

বাধা দিয়ে রমাপতি বলে, রাত কম হলো না কবি। চলো ট্রামে উঠে পড়ি। বৌদি হয়তো বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করছেন।

সে কথা বলতে। এতক্ষণে হয়তো ঘর-বার শুরু হয়ে গেছে। হয়তো দু'চোখের কোণ ভিজে উঠেছে। হয়তো—

তবে আর দেরী করে কাজ নেই। চলো, সামনের স্টপেজ থেকেই উঠে পড়ি।

দূর বোকা, এত শঙ্কিত হবার কি আছে! মাত্র দুটো ছত্র—

আকাশে দেখেছি চাঁদ পূর্ণিমার রাতে—

প্রেয়সীর মুখ শোভা কিন্তু নাহি তাতে।—বুঝলে রমাপতি, মাত্র এই দুটো ছত্র অধর টিপে উপহার দেবো, গলে জল হয়ে যাবেন। কি করবেন ভেবে পাবেন না। এই পূর্ণিমার রাতে ট্রামে বাসে উঠতে যাবো কেন! রাস্তাই বা কতটুকু। চলো, হাঁটতে হাঁটতেই এগুনো যাক।

রমাপতি ফাঁপরে পড়ে। ভাবে, আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে। ওর সাকী ওর সঙ্গে কি করবেন তা ও জানে। কিন্তু আর দেরী হলে যে মীনার মা কুরুক্ষেত্র বাধাবে। কবি, সাহিত্যিকদের বৈঠক সম্বন্ধে ওর দারুণ ঘৃণা। ওর হিসেবে, বৈঠকের নামে শুধু চলে মেয়ে-পুরুষের ঢলাঢলি। মীনার মার মুখখানা মনে পড়তে আতঙ্কে শিউরে ওঠে রমাপতি। কিন্তু কবিকে কিছুতেই পাশ কাটাতে পারে না। পায়ের পর পা ফেলে চলতে হয় ওর সঙ্গে।

চলতে চলতে এক ফাঁকে প্রশ্ন করে রমাপতি, আচ্ছা কবি তোমাকে একটা কথা বলবো?

বিলক্ষণ, একটা কেন সারা রাত তুমি যা বলবার বলতে পারো। তোমার সঙ্গে প্রাণ খুলে দুটো কথা বলবো বলেই তো হাঁটছি। নাও সিগারেট ধরাও।

সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে রমাপতি বলে, আচ্ছা, সভা-সমিতিতে তুমি যে এভাবে সেজেগুজে আস, বৌদি কিছু ভাবেন না?

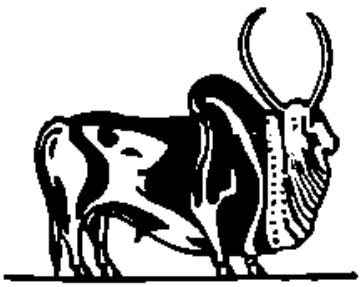

পাঁচ হাজার বছরেরও আগে যে কেশতৈল প্রবর্তিত হয়েছিল

মহেঞ্জোদারো আর হরাপ্পার প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষে
অনুপাতি ব্যাবীয় তামা, ব্রোঞ্জ, লোহা আর কপার যে সব
শিল্পসম্ভার পাওয়া গিয়েছে তাতে পাঁচ হাজার বছরেরও বেশি
আগে ভারতবর্ষে সভ্যতা কত উন্নত ছিল তার পরিচয় মেলে।
পরবর্ত্তী ইতিহাসে অবশ্য অনেক কিম্বদন্তী পাওয়া যায় না।
সেই সুদূর অতীতেও তুলসীপাতা গাছ গাছড়ার তৈরী
কেশতৈল উচ্চশ্রেণীর অভিজাত মহলে ব্যবহৃত হ'ত।

এখন আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণায়
এমনি বিশেষ গুণসম্পন্ন ভেষজ কেশতৈল
আবার আবিষ্কৃত হয়েছে, সেটি হ'ল
কেয়ো-কার্পিন। এতে কোন
কৃত্রিম রং থাকে না।

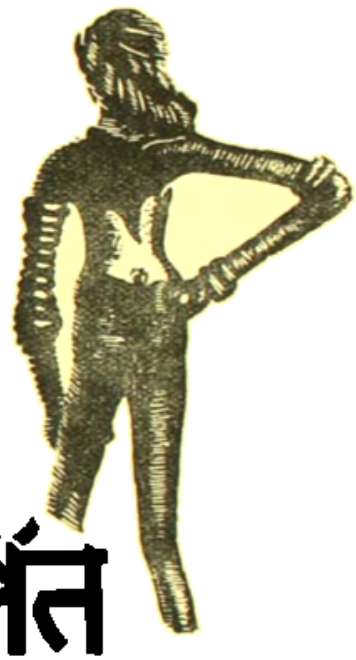

মনোরম গন্ধযুক্ত কেয়ো-কার্পিন চুলের গোড়ায়
স্বাভাবিকভাবে অফুরন্ত প্রাণশক্তি যোগায়।

কেয়ো-কার্পিন

ফলপ্রদ ভেষজ কেশতৈল

দে'জ মেডিকেল ষ্টোরস্ প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা • বম্বে • দিল্লী • মাদ্রাজ
পাটনা • গৌহাটী • বটক

রমাপতির কথায় কবি হো হো করে হাসতে থাকে। বলে, সভা-সমিতিতে আসবো তা সেজেগুজে নয়তো না-সেজে নাকি? উনি তো নিজের হাতে আমাকে সাজিয়ে দেন। কোন্ কবিতাটি পড়বো তাও নিজের হাতে বেছে দেন। আর তুমি তো জান, এসব ব্যাপারে আমার খেয়াল বড্ডো কম।

রমাপতি অবাক হয়েই আবার শুধোয়, তা না হয় হলো। কিন্তু এই যে রাত করে বাড়ি ফিরছ এ নিয়ে কিছু বলবেন না!

তুমি আমায় হাসালে রমাপতি। রাত করে বাড়ি ফিরছি তাতে কি হয়েছে। উনি বলেন, কবিরা হচ্ছেন নিরঙ্কুশ। ছক-কাটা পথ তো ওঁদের জন্য নয়। তাছাড়া বলবার আছে কি!

হেসে রমাপতি বলে, আছে হে আছে। আমাদের সমিতিতে তো বেশ কয়েকটি ডাইনী আছে। আর তুমি তাদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টিও কম করো না। বৌদির কানে কথাটা নিশ্চয় যায়নি।

যায়নি মানে! উনি তো এ নিয়ে রীতিমতো গর্ব অনুভব করেন। বলেন, আমি সৌভাগ্যবতী। আমার কবির দিকে কে না-চেয়ে পারবে!

বলো কি!

ঠিকই বলছি। উনি জানেন, আমি ওঁর—উনি আমার।

রমাপতি আর কোন প্রশ্ন খুঁজে পায় না। মনে মনে নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে থাকে।

কবি বলে যায়, রমাপতি উনি যে আমার কাছে কি আকর্ষণ তা তোমাকে বোঝাতে পারবো না। আমাদের সমিতির মেয়ে কেন, স্বর্গের উর্বশী মেনকা এলেও আমার কোন ভয় নেই।

রমাপতি থ বনে যায়। সিগারেট টানতে টানতে চৌমাথার মোড়ে এসে থামে। এখান থেকেই দু'জনের পথ আলাদা। রমাপতি সেই আজিই পেশ করে।

কবি বাধা দেয়, কি আর এমন রাত হয়েছে হে! চলো না, পার্কে গিয়ে একটু বসি। এমন বসন্ত পূর্ণিমা জীবনে কটি পাবে?

পূর্ণিমার চাঁদ সাকীর চোখে চোখ রেখেই দেখগে কবি, আমি চললুম। আর দেরী করতে পারবো না, রমাপতি বাঁ দিক কেটে পথ ধরে। মীনার মা হয়তো এতক্ষণে ঘুমে ঢোল।

সেদিন প্রকাশকের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে একাকী আউটরাম ঘাটে এসে বসে রমাপতি। একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে থাকে, তাই তো জীবনে পেলাম কি? খ্যাতি, মান, অর্থ কিছুই তো নয়। মীনার মারট বা দোষ কি! তেল আনতে নুন নেই। আজীবন সংসারের এই চাল! লেখক না হয়ে কোন সদাগরি অফিসের কেরানী হলেও এর চেয়ে সুখ হতো।...

রমাপতি ভাবতে ভাবতে খেই হারিয়ে ফেলে। পেছন দিক থেকে কবি এসে কাঁধের ওপর হাত রাখে। সহাস্যে শুধোয়, কি হে রমাপতি, উপন্যাসের 'প্লট' খুঁজছ নাকি?

রমাপতি আঁতকে ওঠে। পেছন ফিরে দেখে, কবি একা নয়—যুগলে। হ্যাঁ, সাকী ওঁকে বলা যায়। রূপ রুচি দু-ই বর্তমান। কবি সত্যি ভাগ্যবান। ...হাতের সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ায় রমাপতি।

কবি পরিচয় করিয়ে দেয়, ইনিই বিখ্যাত রমাপতি বিশ্বাস—ঔপন্যাসিক ও গল্পকার। আর এঁর কথা বোধ হয় তোমাকে—

নমস্কার বৌদি, কবি কথা শেষ করার আগেই রমাপতি সম্ভাষণ জানায়।

কবি-জায়া প্রতি-নমস্কার জানিয়ে উচ্ছ্বসিত হন, আপনার উপন্যাস আমার খুব ভাল লাগে। আসুন না একদিন আমাদের বাড়িতে।

নিশ্চয় যাবো। তার আগে আপনারা একদিন আসুন অধমের গরীবখানায়।

না, আগে আপনি আসুন তারপর। হ্যাঁ, মীনার মাকে কিন্তু সঙ্গে করে আসবেন।

নিশ্চয়। কবি-জায়াকে সম্মতি জানিয়ে মনে মনে ভাবে রমাপতি, তবেই হয়েছে, ওকে যাবার কথা বললেই তো শাড়ী গয়নার খোঁটা উঠবে।

কবি-জায়া বলেন, কি ভাবছেন? চলুন, নৌকোয় খানিকটা হাওয়া খাওয়া যাক।

আজকে আমাকে মাপ করতে হবে বৌদি।

কেন হে, ভরা গঙ্গায় নৌ-বিহার বুঝি তোমার পছন্দ নয়!—কবি-জায়াকে ডিঙিয়ে কবি প্রশ্ন করে।

নৌ-বিহার কবির পক্ষেই উপযোগী। শুধু গল্পকে সঙ্গে টানলে রসভঙ্গই ঘটবে শুধু। বৌদি, আমার এক আত্মীয়া বিদেশ যাচ্ছেন। হাওড়া স্টেশনে ওঁকে 'সি অফ্' না করলেই নয়।

হেসে কবি-জায়া উত্তর দেন, তা হলে আর জোর করতে পারিনে। কিন্তু কবে আসছেন? এই রোববারেই আসুন না?

চেষ্টা করবো।

চেষ্টা নয়, নিশ্চয়ই আসবেন।

আচ্ছা, নমস্কার। কবির নৌ-বিহার সার্থক হোক, রমাপতি আর দাঁড়ায় না। এক রকম ছুটে পালিয়ে আসে। ইডেন গার্ডেনে ঢুকে একটা বড় গাছের আড়ালে এসে বসে। নিজের ভাগ্য নিয়ে জল্পনা কল্পনা শুরু করে। কবি-জায়া তো এমন কিছু দামী শাড়ী গয়না পরেননি। অথচ কেমন হাসিখুশী। মীনার মা এরকম সাদাসিধে হলে ওরাও তো ঘুগলে বেড়াতে বার হতে পারে।...সন্ধ্যার শেষে একরাশ অন্ধকার বুকে করে বাড়ি ফিরে আসে রমাপতি। হাওড়া স্টেশনে তো সত্যি আর ওর কোন কাজ নেই। শুধু পালিয়ে আসার ছুতো মাত্র। রমাপতি আজ বড় বিচলিত।

ঠিক কথা মতো কবির বাড়ি যেতে পারে না রমাপতি। যেতে পারে না মীনার মার অবর্তমানেই। দূর-সম্পর্কের এক ভাইয়ের বাড়ি বেড়াতে যাবে ও। তাও আবার একা যাবে না। রমাপতিকে সঙ্গে যেতেই হবে। রমাপতি নিরুপায়। সঙ্গে না গেলে সন্দেহ-বাই মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। ঘরে থাকা দায় হবে। একান্ত অনুগতের মতোই স্ত্রীর পদানুসরণ করে রমাপতি। কবি-জায়ার আমন্ত্রণ শিকেয় ওঠে।

পরদিন কবি আসে অনুযোগের সুর নিয়ে, তুমি কি বলতো রমাপতি! প্রথম কিস্তিতেই ফেল করলে! তোমার বৌদি কত আয়োজন করে বসে ছিলেন।

একটা অনিবার্য কারণে যেতে পারিনি। আমি শীগ্‌গীরই একদিন গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসবো।

হ্যাঁ, তাই যেয়ো। তোমাকে উনি খুব শ্রদ্ধা করেন।

যাবো—নিশ্চয় যাবো। তারপর এখন কোথায় চলেছ?

কোথাও না, তোমার খোঁজেই এসেছিলাম।

বলো কি, অধমের এত সৌভাগ্য!

সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য বুঝিনে। যা সত্যি তাই

যে সব বই পড়ে আনন্দ পাওয়া যায়

ছোটদের ভালসা — মনোজিৎ বসু

বালুচর রাউশীলা যাত্রা — মনোজিৎ বসু

শ্যামলপুরের সাকো — গোপাল বসু

ভারতভক্ত নেতাজী — অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটদের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ — শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাঙলার ইতিহাস — [illegible]

চিচার্স বুক সউল

প্রকাশক, পুস্তক-বিক্রেতা ও মুদ্রাকর

৬৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

জাতির অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন :—

সবল মন :—জাতির মনকে সবল করে তোলে লেখকের মৃত্যুঞ্জয়ী লেখনী।

সঠিক পথ :—সবল মনকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যায় রাষ্ট্রিক নেতার অমোঘ বাণী।

সুঠাম দেহ :—সবল মনের আধার সুঠাম দেহ। সুস্থ, সবল দেহ সৃষ্টি হয় পুষ্টিকর ঔষধ সেবনে।

জাতির জন্য পুষ্টিকর ঔষধ সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত

এলবার্ট ডেভিড লিমিটেড

১৫, চিত্তরঞ্জন এ্যাভেন্যু : কলিকাতা—১৩

বম্বে, মাদ্রাজ, গৌহাটি, নাগপুর, দিল্লী, কাশ্মীর, বিজয়াবাদ, এলাহাবাদ

বললাম। হ্যাঁ, ভাল কথা, চলো না নিউ মার্কেট থেকে ঘুরে আসি। তোমার বৌদির জন্ম একখানা শাড়ী কেনা দরকার। একা একা হয়তো পছন্দ করে উঠতে পারবো না।

কিন্তু আমি তো এখন যেতে পারবো না কবি। আমার একটু কাজ আছে।

কাজ তো প্রকাশকের ঘাড়ে চাপা।

না চাপলে যে আমার ঘাড় থেকে ভূত নামে না। তুমি এস কবি, আমি এর ভেতরেই তোমাদের ওখানে যাচ্ছি।

অগত্যা। কিন্তু দেখো, ভুলো না যেন।

না-না-না। তুমি এগোও।

কবি চলে যায়। রমাপতি উদাসভাবে নিজের কথা ভাবতে থাকে। ভাবতে থাকে, কবিতা লিখে আর কবির শাড়ী কেনার পয়সা জুটছে না। কে পড়ে ওর বস্তাপচা কবিতা। আসলে সরকারী চাকরীটাই ওর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উৎস। সময়কালে যদি একটা চাকরিও নিতাম।…

মনটা খুবই খারাপ রমাপতির। মীনার মা কাল ওকে শাড়ীর খোঁটাই দিয়েছে। সাধারণ একখানা আটপৌরে শাড়ীর। বিকেলে পরবার মতো ট্রাঙ্কে একখানাও শাড়ী নেই। রমাপতি সাধ্য মতো চেষ্টা করেছিল। কিন্তু প্রকাশক ওকে নিরাশ করেছে। পাওনা অপেক্ষা হিসেবে নাকি ওর দেনাই দাঁড়িয়েছে। এরপর আর রমাপতি কি করতে পারে? কলমবাজি ছাড়া তো আর কোন বিদ্যাই ওর জানা নেই। তাতে যদি চাহিদা না মেটে তাহলে ও নাচার…মনের দুঃখে বিকেলের চা না খেয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। রাস্তায় চলতে চলতে কবির কথাই মনে হয়। হ্যাঁ, এই ভাল। কবি আর কবি-জায়ার সান্নিধ্যেই আজকের সন্ধ্যাটা কাটাবো। এতে আর কিছু না হোক, জীবনের একটা সন্ধ্যা অন্তত হাসিখুশীতেই কাটবে। দুটো মিষ্টি কথা শুনতে পাবো।…রমাপতি কবির বাড়ির দিকেই পা চালিয়ে দেয়।

লেক রো'র দোতলার ফ্ল্যাটে থাকে কবি। খুঁজে পেতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। রমাপতি সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হবার মুখে মুখে এসে হাজির হয়। সদরে 'নেমপ্লেট' রয়েছে কবি কল্পনাপতি রায়। কড়া নাড়ার কোন দরকার হয় না। সদর খোলাই আছে। একটা সবুজ পর্দা ঝুলছে মাত্র। রমাপতি কবির নাম ধরেই ডাকতে যায়। কিন্তু সুরসত পায় না। ভেতর থেকে চেনা কণ্ঠের ঝংকার কানে আসে। ভেসে ওঠে সেদিনকার সেই আউটরাম ঘাটের পরিমার্জিত মুখখানি। যে মুখের আহ্বানে রমাপতি আজ এখানে এসেছে। রমাপতি বুঝতে পারে না, কার ওপর ক্রুদ্ধ কবি-জায়া। সদরের এক পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে। ভেতরের গর্জন এবার সপ্তমে ওঠে। স্পষ্ট শুনতে পায় রমাপতি, কেন—কেন তুমি দর্জির টাকা না মিটিয়ে নিত্যি নতুন জামা পরে ফষ্টি নষ্টি করো! লজ্জা করে না তোমার। ছাই ভস্ম লেখোই বা কেন? বাজে সময় নষ্ট না-করে অফিসে ওভার-টাইম করলেও তো কিছু আসে।…

রমাপতি দাঁড়িয়েছিল, বুঝি বা মাথা ঘুরে পড়ে যায়। এবং দমকা হাসিও পায়। একবার ভাবে, সোজা ঢুকে কবির হয়ে প্রতিবাদ করে। আবার আপন মনেই মিইয়ে যায়। কবি যে একটা কথাও বলছে না। ওর গায়ে কি মানুষের চামড়া নেই!…

না না, ঐ তো কবির কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। কবি এখন প্রতিবাদের ভাষা নয়। এযে নেচক অনুরোধ অনুগতের আকুল আর্তি, দোহাই তোমার, চুপ করো কেউ শুনবে।...

শোনে শুধুক। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, কাল থেকে ফের যদি তুমি খাতাপত্র নিয়ে বসো আমি আগুন ধরিয়ে দেবো। কবি-ভাড়ার কণ্ঠ আরও উচ্চগ্রামে গর্জে ওঠে।

ক্ষীণ কণ্ঠে কবি সায় দেয়, আচ্ছা।—আচ্ছা তাই হবে। তুমি এখন স্থির হও—দোহাই তোমার।...

রমাপতি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নীচে নেমে আসে। রাস্তায় চলতে চলতে কবির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানায়, কবি—সত্যি তুমি কবি। তোমায় নমস্কার।

শারদ সম্ভাষণে

নবশক্তি প্রেস

মুদ্রক

স্বত্বাধিকারী :

নবশক্তি নিউজ পেপার্স কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা-১৪

প্রথম দৃশ্য

[কলিকাতা হাইকোর্টের একটি বিচার-কক্ষ। ব্যারিষ্টার, অ্যাটর্ণীজোকেট, কাগজের রিপোর্টার ও সাধারণ দর্শকে ঘরটি ভর্তি। একদিকে জুরীরা বসে আছেন। মাননীয় বিচারপতি জাষ্টিস্ জয়প্রতাপ সিংহ সিবিষ্ট করে কেস্ শুনছেন ও মাঝে মাঝে কিছু নোট্ করে নিচ্ছেন। প্রসিকিউটার্ কাউন্সেল্ হিসেবে দাঁড়িয়েছেন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার সীতাংশুমোহন সান্যাল। ডিফেন্স লিড করছেন কলকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার অমিতাভ রায়গুপ্ত। আসামীর কাঠগড়ায় বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী কাননিকা দেবী বসে আছেন। দৃশ্য উঠলে দেখা যাবে প্রসিকিউটার্ কাউন্সেল্ শ্রীসান্যাল কেস্ ওপন্ করে বক্তৃতা দিচ্ছেন—]

প্র. কা.——যাক্···যে কথা বলছিলাম—পুলিসে প্রথম ঘটনাটার খবর দেন ডাঃ প্রথম সেন—কাননিকা দেবীর গৃহ-চিকিৎসক। টেলি-ফোনে অফরি আলম পেয়ে রাত প্রায় দুটোর সময় তিনি কাননিকা দেবীর ২৩নং লর্ড সিন্‌হা রোডের একতলার ফ্ল্যাটে এসে হাজির হন। ফ্ল্যাটের সামনের দরজা খোলা দেখে তিনি সোজা ঢুকে পড়েন সিটিং-রুমে এবং সেখানে একজন বেয়ারাকে দেখতে পেয়ে তার সঙ্গে লাইব্রেরী ঘরে যান। সেখানে মেঝেতে শৈবাল মজুমদারের লাঞ্ছিত দেহের প্রতি তাঁর নজর পড়ে। ওর মাথার কাছে বসে দুহাতে মুখ ঢেকে কাননিকা দেবী ফুলে ফুলে কাঁদছিলেন ··· এর দ্বারা অবশ্য আপনারা ভুল ধারণা করবেন না—কাননিকা দেবী একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী একথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। সে যাই হোক, ডাক্তারের উপস্থিতি জানতে পেরেই বিমলেশ মজুমদার হিস্টিরিয়া রোগীর মত ব্যবহার করতে সুরু করেন—কখনও কান্না···কখনও পাগলের মত চীৎকার ইত্যাদি। ডাঃ সেনকে রোগীর পালস্ পরীক্ষা করতে দেখে বলে ওঠেন—"না,

না, ও মরে নি—এভাবে ও মরতে পারে না। বলুন ডাঃ সেন, ও মরে নি……নাহলে আমাকেও মরতে হবে……কেউ আমাকে আর বাঁচাতে পারবে না," ইত্যাদি। ডাঃ সেনই পুলিশকে প্রথম খবর দেন। পুলিশ আসবার সঙ্গে সঙ্গে মিসেস মজুমদার যেন আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন—বিশ্রীভাবে ইনস্পেক্টর চক্রবর্তী ও তাঁর সহকারীদের অশ্লীল গালাগালি দিতে সুরু করেন—ওঁরা টেলিফোন করতে গেলে বাধা দিতে চেষ্টা করেন এবং কখনও চীৎকার, কখনও কান্না কখনও বা পাগলের মত হাসতে সুরু করেন। ডাঃ সেন পরে মত-প্রকাশ করেন যে এই সময়টায় কাননিকা দেবীকে প্রায় উন্মাদ বলে মনে হয়েছিল। যাই হোক ওঁর বিবৃতির ওপর নির্ভর করেই পুলিশ সেদিন আর ওঁকে গ্রেপ্তার করে নি। তাছাড়া এমন কোন প্রমাণও তখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি যার ফলে ওঁকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়। (একটু থেমে, চশমাটা একবার মুছে, তারপর সমস্ত ঘরটার দিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে নিয়ে) কিন্তু দু-এক দিনের মধ্যেই পুলিশের হাতে এমন কতকগুলো সাক্ষ্য প্রমাণ এল যার ফলে বোঝা গেল ব্যাপারটাকে ঠিক অ্যাকসিডেন্ট বলে উপেক্ষা করা চলে না, এবং আরও তদন্তের পর পুলিশ স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে কাননিকা দেবীই স্বিরমস্তিষ্কে শৈবাল মজুমদারকে গুলি করে হত্যা করেছেন—বলা বাহুল্য যে সঙ্গে সঙ্গেই কাননিকা দেবীকে গ্রেপ্তার করা হোল। সরকারের তরফে যে-সব সাক্ষ্য প্রমাণ আছে একে একে এবার তাঁদের মাননীয় বিচারপতি মহোদয় এবং জুরীদের সামনে তাঁদের বক্তব্য পেশ করতে বলব। এর থেকে অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণিত হবে যে মৃত শৈবাল মজুমদারের পক্ষে নিজেকে নিজে গুলি করাটা অসম্ভব ছিল। সে ক্ষেত্রে কে গুলিটা ছুঁড়ল? ঐ সময় ঐখানে আর একজন মাত্র উপস্থিত ছিলেন—কাননিকা দেবী। এই সিদ্ধান্তেই যদি আসতে হয়, তবে বিচার করে দেখতে হবে যে গুলি করাটা কি ইচ্ছাকৃত, না অ্যাকসিডেন্টাল? আপনাদের আগেই বলা হয়েছে যে এর পূর্বেও দাম্পত্য কলহের সময় কাননিকা দেবী আর একবার গুলি ছুঁড়েছিলেন। জুরী মহোদয়গণ! যে কোন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোক এ ঘটনার সাক্ষ্য প্রমাণাদি শোনবার পর নিঃসন্দেহে বুঝতে পারবেন যে কাননিকা দেবী ডেলিবারেটলি মিস্টার মজুমদারকে গুলি করে হত্যা করেছেন—

[সমবেত দর্শকদের মধ্যে প্রথমে গুঞ্জনধ্বনি এবং পরে বেশ গোলমাল সুরু হবে।]

জাস্টিস্ মিত্র—(টেবিলে হাতুড়ির ঘা দেবেন এবং গোলমাল থেমে যাবে) If there is any more of this, the whole court shall be cleared. (ব্যারিস্টার সান্যালের প্রতি) Continue…

প্র. কা.—আমার প্রথম সাক্ষী ডাঃ সেনকে আমি অনুরোধ করব Witness Box-এ আসতে।

[ডাঃ সেন Witness Box-এ এসে Oath নেবেন।]

প্র. কা.—আপনার নাম ডাঃ প্রণব সেন?

ডাঃ সেন—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

প্র. কা.—এই হত্যাকাণ্ড ঘটবার কতক্ষণ পরে আপনি কাননিকা দেবীর বাড়ীতে হাজির হন?

ডিফেন্স কাউন্সেল—[লাফিয়ে উঠে] My Lord, I object—বিচারের সুরুতেই ব্যাপারটাকে হত্যাকাণ্ড সংজ্ঞা দিয়ে জুরীদের প্রভাবিত করার চেষ্টা আইনসঙ্গত নয়।

জাস্টিস্ মিত্র—I agree.

প্র. কা.—I withdraw—আচ্ছা ডাঃ সেন, আপনি ঐ বাড়ীতে যাবার কতক্ষণ আগে শৈবাল

মজুমদারের মৃত্যু হয়েছে বলে আপনার মনে হয় ?

ডাঃ সেন—আমার মনে হয় পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে এক-ঘণ্টার ভেতর।

প্র. কা.—মৃতদেহ দেখে আপনার কি মনে হয় নি যে মৃত্যুটা অস্বাভাবিক ভাবে ঘটেছে ?

ডাঃ সেন—অস্বাভাবিক ত বটেই ! কাননিকা দেবীর কথা শুনেই তো জানতে পেরেছি যে ব্যাপারটা অ্যাকসিডেন্ট্যালি ঘটেছে।

প্র. কা.—আপনার কি মনে হয় নি যে শৈবালবাবুকে গুলি করা হয়েছে ?

ডাঃ সেন—না, সে প্রশ্ন আমার মনে আসে নি।

প্র. কা.—কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে ঐ ভাবেই অর্থাৎ গুলি করেই তাঁকে হত্যা করা হয়েছে—

ডাঃ সেন—হ্যাঁ, তাও হতে পারে, আবার অন্য ভাবেও অর্থাৎ অ্যাকসিডেন্ট্যালিও ব্যাপারটা ঘটে থাকতে পারে।

প্র. কা.—এ সম্বন্ধে আর যদি কিছু আপনার জানা থাকে আমাদের বললে পরে সুবিচারের সাহায্য করা হবে।

ডাঃ সেন—আমার এই বিষয়ে আর কিছুই বলবার নেই।

প্র. কা.—My Lord, এই সাক্ষীকে আমার আর কোন প্রশ্ন নেই।

[প্রসিকিউসান্ কাউন্সেল্ জোরে বসে পড়বেন এবং ডিফেন্স কাউন্সেল্ উঠে দাঁড়াবেন]

ডি. কা.—আপনি কত বছর ধরে কাননিকা দেবীর পারিবারিক চিকিৎসক ?

ডাঃ সেন—(একটু ভেবে) তা বছর পাঁচেক হবে বোধ হয়।

ডি. কা.—শৈবাল মজুমদারকে আপনি কতদিন থেকে জানেন ?

ডাঃ সেন—আগে কাননিকা দেবীর ওখানেই মৌখিক পরিচয় হয়। তারপরে আমি বছর খানেক ধরে—ওঁদের বিয়ের পর থেকে।

ডি. কা.—আপনার সঙ্গে এঁদের পরিচয়টা বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল কি ?

ডাঃ সেন—কাননিকা দেবীর সঙ্গে আগে থেকেই যথেষ্ট আলাপ ছিল। আর অল্প দিনের আলাপ হলেও মিস্টার মজুমদার আমাকে বন্ধু বলেই মনে করতেন।

ডি. কা.—আচ্ছা এঁদের বাড়ীতে এই দম্পতিকে একসঙ্গে তো প্রায়ই দেখেছেন ?

ডাঃ সেন—অনেক সময়েই দেখেছি।

ডি. কা.—এঁদের দেখে কি কখনও আপনার মনে হয় নি যে এঁদের মত সুখী দম্পতি সচরাচর চোখে পড়ে না ?

ডাঃ সেন—আপনি ঠিকই বলেছেন। চিকিৎসার ব্যাপারে বহু বাড়ীতেই আমাকে যেতে হয়—কিন্তু শৈবালবাবু এবং কাননিকা দেবীর মধ্যে পরস্পরের যেমন একটা মধুর সম্পর্ক দেখেছি এমনটা কোথাও আমার চোখে পড়েনি।

ডি. কা.—গৃহচিকিৎসক এবং পারিবারিক বন্ধু হিসেবে ওঁদের সঙ্গে আপনার যে ঘনিষ্ঠতা ছিল তাতে করে ঐ দম্পতির জীবনে সত্যিকার অসন্তোষ থাকলে সে কথা তো আপনি নিশ্চয় জানতে পারতেন ?

ডাঃ সেন—তা পারতাম বৈকি।

ডি. কা.—ধন্যবাদ, আর আমার কোন প্রশ্ন নেই।

[ডিফেন্স কাউন্সেল্ বসে পড়বেন এবং ডাঃ সেনও সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে বেরিয়ে আসবেন। প্রসিকিউসান্ কাউন্সেল্ আবার উঠে দাঁড়াবেন।]

প্র. কা.—পুলিশ ইনস্‌পেক্টার হরধর—

[মিঃ হরধর সাক্ষ্য দিতে এগিয়ে আসবেন এবং ধর্মাধিকরে oath নেবেন।]

প্র. কা.—শৈবাল মজুমদারের হত্যাকাণ্ড বা অস্বাভাবিক মৃত্যু সম্বন্ধে কবে, কখন এবং কিভাবে আপনি খবর পান ?

হরধর—গত ৩০শে ডিসেম্বর রাত প্রায় দুটোর সময় লর্ড সিন্‌হা রোডের ২৩নং বাড়ী থেকে টেলি-ফোন আসে যে রিভলভারের গুলিতে মিস্টার মজুমদার বলে এক ভদ্রলোক মারা গেছেন এবং আমরা যেন তখুনি সেখানে উপস্থিত হই।

প্র. কা.—কতক্ষণ বাদে আপনারা সেখানে হাজির হন ?

প্রত্যয়—আমি একজন সহকারী এবং জন দুই পুলিশ নিয়ে মিনিট কুড়ির মধ্যেই পৌঁছই।

প্র. কা.—গিয়ে কি দেখেন?

প্রত্যয়—লিভিং-রুমের মেঝেতে একটা রিভলভার পড়ে থাকতে দেখি এবং পাশের ঘরে গিয়ে মিঃ মধুসূদনের মৃতদেহ দেখতে পাই।

প্র. কা.—মিসেস মধুসূদন তখন কি করছিলেন?

প্রত্যয়—তিনি খুবই বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন এবং ডাঃ সেন তাঁকে শান্ত করবার চেষ্টা করছিলেন। আমাদের দেখে তিনি কিন্তু হঠাৎ চীৎকার করে ওঠেন—"ডাঃ সেন, ওদের এখান থেকে দূর করে দিন—এখানে ওদের আমি সহ্য করতে পারছি না।" ডাঃ সেন বলেন যে আমাদের investigation-এ কোনরকমেই বাধা দেওয়া হবে না—কিন্তু তারপরেই আমি থানায় ফোন করতে গেলে মিসেস মধুসূদন উঠে এসে আমার হাত থেকে ফোনটা ছিনিয়ে নেন।

প্র. কা.—ব্যাপারটা দেখে আপনার কি মনে হয়েছিল? Accidental death না murder?

প্রত্যয়—(একটু ভেবে) Murder—কারণ মিসেস মধুসূদন যে ভাবে ব্যবহার করছিলেন তাতে তিনি যে নির্দোষ নন—এই কথাই প্রমাণিত হচ্ছিল।

প্র. কা.—ধন্যবাদ, আর আমার কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। (বসে পড়বেন)

ডি. কা.—(উঠে দাঁড়িয়ে) আপনাকে যখন ফোনে প্রথম খবর দেওয়া হয়—কে আপনাকে ফোন করেন—কোন পুরুষ না কোন মহিলা?

প্রত্যয়—পুরুষ, ডাঃ সেনই ফোন করেন বলে পরে জানতে পারি।

ডি. কা.—তিনি কি আপনাকে ফোনে জানিয়েছিলেন যে মিঃ মধুসূদনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে?

প্রত্যয়—না।

ডি. কা.—তিনি বুঝতে পারলেন না অথচ এই মাত্র আপনি বললেন ব্যাপারটা দেখে আপনার মনে হয়েছিল হত্যাকাণ্ড—কি এমন সাক্ষ্য প্রমাণ পেয়েছিলেন?

প্রত্যয়—আমার তাই অনুমান হয়েছিল।

ডি. কা.—(হেসে উঠে) তাই বলুন, আপনার অনুমান হয়েছিল—কোন প্রমাণের উপর নির্ভর করে বলেন নি।

প্রত্যয়—তাছাড়া মিসেস মধুসূদন আমাদের সঙ্গে যেরকম বিশ্রী ব্যবহার করছিলেন—অত slight provocation এ……

ডি. কা.—Slight provocation! তাই বটে! (একটু ভেবে) আচ্ছা, রিভলভারে কোন আঙুলের ছাপ পেয়েছিলেন?

প্রত্যয়—না—ছাপ থাকলে তা অত্যন্ত অস্পষ্ট।

ডি. কা.—Just as one would expect following a struggle—আর আমার কোন প্রশ্ন নেই।

[সাক্ষী ধীরে ধীরে কাঠগড়া থেকে বেরিয়ে আসবেন এবং রিপোর্ট বাইবেল হাতে পড়বেন]

প্র. কা.—আমার পরের সাক্ষী মিস্টার ভি.এস. পার্থসারথি।

[মিঃ পার্থসারথির নাম ডাকা হবে এবং তিনি ধীরে ধীরে সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে উঠবেন—বয়স-বছর মাঝারী—বোটানোটা চেহারা, oath নেবেন]

প্র. কা.—আপনার নাম তো মিঃ ভি. এস. পার্থসারথি?

পার্থসারথি—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

প্র. কা.—২নং লর্ড সিনহা রোডের বাড়ীর দোতলার একটি ফ্ল্যাটে আপনি থাকেন?

পার্থসারথি—হ্যাঁ, প্রায় দুবছর ধরে ওখানে আমি আছি।

প্র. কা.—শৈবাল মধুসূদন এবং কানন্দিকা দেবীকে আপনি জানতেন?

পার্থসারথি—তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও পরিচয় ছিল।

প্র. কা.—শৈবাল মধুসূদন যেদিন গুলির আঘাতে মারা যান—আপনি কখন সে কথা জানতে পারলেন?

পার্থসারথি—রাত প্রায় দুটো হবে—আমার স্ত্রী বললেন নীচে যেন কিসের হৈ চৈ হচ্ছে—দেখে এস।

প্র. কা.—আপনি কি নীচে গিয়েছিলেন?

পার্থসারথি—হ্যাঁ, নীচে নেমে দেখতে পাই মিঃ মজুমদারের ফ্ল্যাটের দারোয়ান দরজা খোলা এবং বসবার ঘরে পুলিশ ও অন্যান্য লোকে ভর্তি। ভেতরে ঢুকে মিঃ মজুমদারের মৃত্যুর কথা জানতে পারলাম—পুলিশ ইনস্পেক্টর আমাকে পরদিন থানায় যেতে বলেন এবং সেই অনুসারে পরদিন ওখানে গিয়ে আমার বিবৃতি দিই।

প্র. কা.—মাসখানেক আগেও একবার এঁদের স্বামীস্ত্রীতে গোলমাল লাগে এবং সেদিনও একটা গুলি ছোঁড়ার ব্যাপার ঘটে। এবিষয়ে আপনি কি জানেন?

পার্থসারথি—সেদিন ব্যাপারটা ঘটে রাত প্রায় বারটার সময়। আমরা সিনেমা দেখে একটু আগেই ফিরেছি—হঠাৎ একতলার ফ্ল্যাটে ভয়ানক চেঁচামেচি শুনে নীচে নেমে দেখি ওঁদের স্বামীস্ত্রীতে খুব গোলমাল হচ্ছে—ও-বাড়ীর আরও কয়েকজন লোক আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলাম যে এক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে গোলমাল থামানোর চেষ্টা করাটা যুক্তিযুক্ত হবে কিনা। এমন সময় ওঁদের সিটিং-রুমের দরজা খুলে গেল—দেখি দরজার কাছে মিস্টার মজুমদার দাঁড়িয়ে। এই সময় কাননিকা দেবীও ওঘরে ছুটে এলেন এবং চীৎকার করে উঠলেন—"I will shoot—I will shoot". তারপরেই একটা গুলির আওয়াজে আমরা চমকে উঠলাম—কিন্তু রিভলভারটা তাঁর দিকে তাগ্ করা থাকলেও গুলিটা লক্ষে গিয়েছিল—এরপর মিস্টার মজুমদার এসে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। আমরা—যাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলাম—সবাই হতচকিত হয়ে গেলাম। তারপর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করলাম এসব পারিবারিক কলহের মধ্যে না যাওয়াই ভাল। পরে অবশ্য আমি মিস্টার মজুমদারকে একদিন বলেছিলাম যে রিভলভারটিকে সরিয়ে রাখতে, তিনি অবশ্য আমার উপদেশ তেমন গায়ে মাখলেন না। বললেন, মিসেস মজুমদার ভয় দেখাবার জন্যই ওভাবে গুলি করেছিলেন। ওঁকে গুলি করবার ওঁর কোন অভিপ্রায়ই ছিল না। আমি অবশ্য ওঁকে জানিয়েছিলাম যে রিভলভার ওঁর দিকেই তাগ্ করতে আমি দেখেছি—সেকথা তিনি হেসে উড়িয়ে দিলেন। সেদিন যদি আমার কথা শুনে রিভলভারটা সরিয়ে রাখতেন তাহলে এভাবে ওঁকে মরতে হোতো না।

প্র. কা.—অনেক ধন্যবাদ—আর আমার কোন প্রশ্ন নেই।

ডি. কা.—(উঠে দাঁড়িয়ে) আচ্ছা, মিস্টার পার্থসারথি, আগের বার যখন কাননিকা দেবী গুলি ছোঁড়েন তখন তো আপনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন যে শৈবাল মজুমদারকেই তাগ্ করে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল।

পার্থসারথি—হ্যাঁ, আমি তাই দেখেছিলাম। এমন কি fire করবার সঙ্গে সঙ্গে puff of smokeও দেখেছিলাম—

ডি. কা.—তার আকৃতিটা কত বড় হবে?

পার্থসারথি—সেটা হবে……(ভুরু কুঁচকিয়ে)…

ডি. কা.—(দুহাত দিয়ে একটা বিবৃতি দেখিয়ে) এত বড় হবে কি?

পার্থসারথি—না, অত বড় নয়।

ডি. কা.—তবে কত বড়?

পার্থসারথি—(হাত বিস্তৃত করে দেখিয়ে) এই রকম আর কি।

ডি. কা.—এতটা?

পার্থসারথি—হ্যাঁ, অতটাই হবে।

ডি. কা.—আচ্ছা, আপনি কি জানেন যে কাননিকা দেবীর রিভলভারের কার্তুজগুলো ছিল cordite cartridges?

পার্থসারথি—না, তা জানতাম না।

ডি. কা.—আর এও জোর দিয়ে জানেন না যে cordite cartridge থেকে কোন smoke হয় না?

[কোর্টের ভেতর একটা গুঞ্জনধ্বনি চলবে]

পার্থসারথি—না, তা কি করে জানবো?

ডি. কা.—আচ্ছা, আমার আর কোন প্রশ্ন নেই—আপনি যেতে পারেন—

[ডিফেন্স কাউন্সেল বসে পড়বেন এবং পার্থসারথি witness box থেকে নেমে যাবেন।]

জাস্টিস্ মিত্র—আজকের মত কোর্টের কাজ এইখানেই শেষ হোলো। কাল আবার কেসের hearing হবে।

[সবাই উঠে দাঁড়াবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য সবাইও বেরিয়ে আসতে থাকবে এবং ধীরে ধীরে ঘরটি খালি হয়ে আসবে।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ব্যারিষ্টার অমিতাভ ঘোষদস্তিদার বাড়ীতে তাঁর লাইব্রেরী ঘরে বসে মিষ্টার ঘোষদস্তিদার তাঁর জুনিয়ারদের সঙ্গে এই কেস সম্বন্ধে আলাপ করছেন। তিন ভিন্নাই। অমিতাভ ঘোষ কামনিকা দেবীর বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী প্রিয়জন হিসেবে উপস্থিত আছেন। ঘরের চারপাশে বুক-সেলফ্-গুলোতে থাকে থাকে আইনের বই সাজানো রয়েছে।]

অমিতাভ—(অনিরুদ্ধের প্রতি) আপনি চিন্তা করবেন না মিষ্টার বোস। আমাদের পক্ষে যা সম্ভব তা আমরা করব। তাছাড়া একটা কথা বোধ হয় জানেন না—মার্ডার ট্রায়ালের ডিফেন্সে। হাত্তির নেবার আগে, একটা কথা আমরা খুব ভালভাবে ভেবে দেখি। Accused নির্দোষ একথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে পারলেই তবে আমরা তার কেস হাতে নেই। এক্ষেত্রে কামনিকা দেবী যে নিরপরাধ সে বিষয়ে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই—আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমার যথাসাধ্য আমি করব।

একজন অ্যাডভোকেট—আচ্ছা, মিষ্টার বোসকে আমাদের তরফ থেকে সাক্ষী হিসেবে খাড়া করানো যায় না?

অমিতাভ—তাতে বিশেষ কিছুই লাভ হবে না—বরং complications-এর সৃষ্টি হতে পারে। কেসটা হচ্ছে—রিভলভারের গুলিতে শৈবাল মজুমদার মারা গেছেন। সরকার পক্ষ থেকে প্রমাণ করবার চেষ্টা হবে যে কামনিকা দেবী হত্যা করবার জন্যই শৈবাল মজুমদারকে ইচ্ছাকৃতভাবে গুলি করেছেন। আর আমাদের defence তরফের argument হবে—দুজনে পিস্তলটা নিয়ে কাড়াকাড়ি করবার সময় আচমকা গুলি ছুটে গিয়ে মিষ্টার মজুমদারের মৃত্যু হয়। সরকার পক্ষের সাক্ষীরা deliberate shooting-এর প্রমাণ হিসেবে যে সব কথা বলবে সেগুলিকে খণ্ডন করে দেওয়াই হল আমাদের একমাত্র কাজ।

আর একজন অ্যাডভোকেট—পার্থসারথি যে এভাবে বাজে-হাল হবে একথা কিন্তু কেউ ভাবতে পারেনি স্যার।

অমিতাভ—এক ধরণের লোক আছে, যারা ঘড়টা দেখে তার থেকে ঢের বেশী করে কল্পনা করে নেয়। প্রথমতঃ কামনিকা দেবী আগের রাতে যদি সত্যি সত্যিই শৈবাল মজুমদারের দিকে ভাগ্ করে গুলিটা ছুঁড়তেন, তবে সে গুলিটা মাথার উপরে অতটা উঁচুতে সিলিং-এর কোণে গিয়ে লাগত না। কিন্তু ঐ কথাটা নিয়ে argument করবার কোন দরকারই হল না যখন পার্থসারথি ঐ অদ্ভুত উক্তিটা করে বসল যে সে গুলির সঙ্গে সঙ্গে puff of smoke দেখেছে।

প্রথম জুনিয়ার—Finger print-এর কথা সরকারের তরফ থেকে প্রথমটায় তুললই না—আপনি ব্যাপারটা তোলাতে আমি একটু আশ্চর্যই হলাম। Finger print থাকলে কিন্তু কেসটা আমাদের পক্ষে একটু গোলমেলেই হয়ে উঠত।

অমিতাভ—তা যদি থাকত তা হলে ওদের দিক থেকেই সেকথা আগে তুলত। আমি জানতাম এ ক্ষেত্রে finger print থাকতে পারে না এবং সেটা আমাদের defenceএ যথেষ্ট

সাহায্য করবে। আচ্ছা মিঃ ঘোষ, আর আপনার কিছু বলবার আছে? আমরা এবার নিজেদের মধ্যে কয়েকটি বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করব……

অনিরুদ্ধ—(উঠে দাঁড়িয়ে) আর কিছু টাকা কি দিয়ে যাব?

অমিতাভ—ও বিষয়ে যখন যা দরকার হবে আর্টনিই আপনাকে সময় মত জানাবেন।

অনিরুদ্ধ—(নমস্কার করে) আচ্ছা, আসি (এঁরা সবলে হাত তুলে প্রতি-নমস্কার করবেন ও অনিরুদ্ধ বেরিয়ে যাবেন)

অমিতাভ—আচ্ছা অতীন, এই বইটা থেকে ফ্ল্যাগ-করা পাতাগুলো আমাদের পড়ে শোনাও তো…

২য় দুনিয়ার—[পড়তে থাকবে] There is the safety device on most good hammerless…

[ধীরে ধীরে আলো কমে আসবে এবং যবনিকা]

তৃতীয় দৃশ্য

[পরের দিন কোর্ট খুব—কার্টেন উঠলে দেখা যাবে যে—এডিশিটনাল্ কাউন্সেল্ দাঁড়িয়ে উঠে বক্তৃতা দিচ্ছেন]

প্র. কা.—এবার দুজন বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্য আমরা কোর্টের সামনে উপস্থিত করব। আমার প্রথম সাক্ষী কলকাতার বিখ্যাত প্যাথলজিস্ট ডাঃ গোবিন্দলাল ঘোষ।—

[পেয়াদা ডাঃ ঘোষের নাম করে ডাকবে এবং তিনি সাক্ষীর কাঠগড়ায় গিয়ে oath নেবেন।]

প্র. কা.—ডাঃ ঘোষ, শৈবাল মজুমদারের দেহে গুলির যে আঘাত লাগে, তাইতেই কি তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে আপনার মনে হয়?

ডাঃ ঘোষ—এ বিষয়ে কোন সন্দেহেরই অবকাশ নেই।

প্র. কা.—আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে আত্মহত্যা করবার জন্য শৈবাল মজুমদার নিজেই নিজেকে গুলি করেছেন?

ডাঃ ঘোষ—আমি একটা skeleton-এর উপর নানাভাবে experiment করে দেখেছি—নিজে গুলি করলে, গুলির গতিপথটা ওভাবে হত না এবং রেকর্ডের যে জায়গায় গুলিটা আঘাত করেছে, সে ভাবে আঘাতটা হত না।

প্র. কা.—তা হলে ব্যাপারটা সুইসাইড নয়—?

ডাঃ ঘোষ—না—

প্র. কা.—আচ্ছা, আর আমার কোন প্রশ্ন নেই।

(বসে পড়বেন)

ডি. কা.—(উঠে দাঁড়িয়ে) কি ভাবে বুলেটটা ছোঁড়া হয়েছিল তা নির্ধারণ করতে গিয়ে অন্য একটি skeleton-এর উপর আপনাকে পরীক্ষা করতে হয়েছিল?

ডাঃ ঘোষ—হ্যাঁ, ব্যাপারটা ঠিকভাবে বোঝবার জন্য অন্য একটি skeleton-এর উপর আমাকে experiment করতে হয়।

ডি. কা.—আচ্ছা ডাঃ ঘোষ,—formations-এর দিক থেকে প্রত্যেক মানুষের দেহেই একটা অসাধ্য দেখা যায়, নয় কি?

ডাঃ ঘোষ—তা যায়—

ডি. কা.—ধন্যবাদ, আর আমার কোন প্রশ্ন নেই।

[বসে পড়বেন এবং সাক্ষী কাঠগড়া থেকে বেরিয়ে আসবেন]

প্র. কা.—এর পরের সাক্ষী অস্ত্র-বিশেষজ্ঞ শ্রীমোহিত-চন্দ্র ব্যানার্জি।

[পেয়াদা সাক্ষীর নাম ডাকবে এবং ধীরে ধীরে মোহিতবাবু এসে সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠবেন ও oath নেবেন।]

প্র. কা.—মোহিতবাবু, যে রিভলভারের গুলিতে শৈবাল মজুমদার নিহত হয়েছেন, সেটাকে আপনি ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন তো?

মোহিত—তা দেখেছি বৈকি।

প্র. কা.—আচ্ছা, অস্ত্রটিকে আপনার বেশ নিরাপদ বলে মনে হয়েছে?

মোহিত—নিশ্চয়! It's one of the safest revolvers ever made.

প্র. কা.—যথেষ্ট শক্তি ব্যবহার করে ট্রিগার টিপলে, তবেই এটা থেকে ফায়ার করা যায়—নয় কি?

মোহিত—আপনি ঠিকই বলেছেন।

প্র. কা.—সেক্ষেত্রে accidentally ট্রিগারে একটু চাপ পড়ল, আর অমনি গুলি ছুটে গেল—এমনটা হওয়া কি সম্ভব বলে মনে হয়?

this is one of the safest
weapons made?

safety device

safety device

hammerless revolver

safety device

safer.

কোর্টরুমে বারবার এই আওয়াজটার ফলে একটা অদ্ভুত পরিবেশের সৃষ্টি হবে)

ডি. কা.—কই মোহিতবাবু, ট্রিগার টিপতে তো এমন কিছু muscular strength-এর দরকার হচ্ছে না—ছেলেদের 'খেলনা-বন্দুকের' থেকে একটু বেশী জোর লাগছে যাত্র।

মোহিত—প্রথম যেভাবে ধরেছেন, কাড়াকাড়ির সময় অস্ত্রটাকে অত শক্তভাবে ধরা সম্ভব ছিল না—আর সেক্ষেত্রে ট্রিগারও অত সহজে টেপা যেত না। রিভলভারটা একটু আল্‌গা করে ধরলেই বুঝতে পারবেন……

ডি. কা.—তাই বুঝি ? (রিভলভারটা আল্‌গা করে ধরে আবার ট্রিগার প্রেস করতে থাকবেন এবং চারদিকে হাত ঘুরিয়ে দেখাবেন—ক্রমাগত ক্লিক্ ক্লিক্ করে শব্দ হতে থাকবে।) কই মোহিতবাবু, আপনার সুচিন্তিত অভিমতের সঙ্গে তো ব্যাপারটা একেবারেই মিলছে না। (বারবার ট্রিগার টিপে ক্লিক্ ক্লিক্ আওয়াজ করে যাবেন, যার ফলে জজসাহেব, জুরি থেকে আরম্ভ করে সবার কাছেই স্পষ্ট হয়ে যাবে যে এ রিভলভারের ট্রিগারে একটু চাপ পড়লেই অতি সহজে গুলি বেরিয়ে আসবে। এরপর পিস্তলটা সামনের টেবিলে রেখে আসবেন।)

ডি. কা.—আচ্ছা, মোহিতবাবু, শৈবাল মজুমদারের মৃত্যুর পর, এই রিভলভারটায় পরপর কিভাবে কার্তুজ সাজানো ছিল মনে আছে ?

মোহিত—আছে।

ডি. কা.—এই রকম ভাবে ছিল না কি—discharged, live, discharged, live, live, live…… ?

মোহিত—হ্যাঁ, এই রকম ভাবেই ছিল।

ডি. কা.—ডিস্‌চার্জড্ কার্তুজ দুটো থেকে বোঝা যায় যে দুবার গুলি ছোড়া হয়েছিল।

মোহিত—তা যায়।

ডি. কা.—এটাও বোধ হয় লক্ষ্য করেছেন যে discharged কার্তুজগুলোর মধ্যের চেম্বারে একটা live কার্তুজ ছিল ?

মোহিত—তা করেছি।

ডি. কা.—এই রিভলভারের আরেকটি বৈশিষ্ট্য নিশ্চয় নজর করেছেন—ট্রিগারটায় অর্ধেক টান পড়লেই সিলিণ্ডারটা ঘুরে যায় ?

মোহিত—নজর করেছি।

ডি. কা.—করেছেন ? তাহলে এও লক্ষ্য করেছেন বোধ হয় সেক্ষেত্রে সিলিণ্ডার ঘুরে গেলেও গুলি ছুটে যায় না ?

মোহিত—তা হতে পারে।

ডি. কা.—তা থেকে কি এই মনে হয় না যে প্রথম দিনের গুলির পর দ্বিতীয় দিনে প্রথমে ট্রিগারে অর্ধেক টান পড়াতেই সিলিণ্ডার ঘুরে যায় এবং দ্বিতীয় চেম্বারের গুলি সেই জন্যই সাইড্ থাকে ?

মোহিত—কোনো কারণে সিলিণ্ডারটা আগেই ঘুরে গিয়েছিল এবং সেই জন্যই ও চেম্বারের গুলি ফায়ার হয় নি।

ডি. কা.—তা বটে, তা বটে ! (এগিয়ে গিয়ে আবার পিস্তলটা তুলে নিয়ে কয়েকবার ট্রিগার টিপে ক্লিক্ ক্লিক্ আওয়াজ করবেন।) আচ্ছা মোহিতবাবু, ধরুন একজন লোকের হাতে এই রিভলভারটা রয়েছে—এমন সময় আর একজন এসে সেটা কেড়ে নিতে চেষ্টা করল—এই ধস্তাধস্তিতে লোডেড্ রিভলভারটা থেকে কি গুলি ছুটে যেতে পারে না ?

মোহিত—তা পারে।

ডি. কা.—বিশেষতঃ রিভলভারের বল্‌ট যদি সেই ব্যক্তির দিকে ফেরানো থাকে ?

মোহিত—সেক্ষেত্রে সে নিশ্চয় মারা যাবে।

ডি. কা.—ধন্যবাদ, আর আমার কোন প্রশ্ন নেই। (বসে পড়বেন এবং সাক্ষী কাঠগড়া থেকে বেরিয়ে আসবেন।)

জাস্টিস মিত্র—আর কোনো সাক্ষী আছে ?

প্র. কা.—(উঠে দাঁড়িয়ে) আমাদের তরফে এই শেষ সাক্ষী। (বসে পড়বেন)

বি. কা.—(উঠে দাঁড়িয়ে) My Lord, accused-এর ইচ্ছানুসারে আমি তাঁকেই এবার সাক্ষ্য দিতে অনুরোধ করব।

[আদালতের কাঠগড়া থেকে কামনিকা দেবী এবার সাক্ষীর কাঠগড়ায় গিয়ে উঠবেন। ধীরে ধীরে শুরু করবেন—]

কামনিকা—সে দিনটা ছিল গত বছরের ডিসেম্বর মাসের তিরিশ তারিখ—এক বান্ধবীর বাড়ীতে রাত্রে ডিনার খেয়ে প্রায় দশটার সময় আমি বাড়ী ফিরি—তারপর পোষাক বদলিয়ে গায়ে একটা ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে আমি আমার studyতে আসি। শৈবাল যে নূতন নাটকটা লিখছিল সেটাকে নিয়েই আমি কাজে ব্যস্ত ছিলাম—আজও সমস্ত ঘটনাটা আমার চোখের ওপর ভাসছে। ঘটনাটা পর পর ঠিক এইভাবেই ঘটেছিল—

[ষ্টেজ ব্ল্যাক—ধীরে ধীরে আলো ফুটে উঠবে এবং শেষে রঙ্গ দিয়ে ষ্টেজের কামনিকা দেবীর বাঁয়ের তলার ফ্ল্যাটটা পড়বার ঘর। চারিদিকে সোফা, কাউচ, টেবিল, ইত্যাদি—দু-একটা মুভেবেল্ চেয়ার। ঘরের মেঝেতে দামী কার্পেট। কিছুক্ষণ ঘরটা খালি থাকবে। একটু বাদে কামনিকা দেবী ঘরে ঢুকবেন, হাতে শৈবাল মজুমদারের নতুন নাটকের স্ক্রীপ্ট। কামনিকা দেবী রকিং-চেয়ারের কাছে এসে রিডিং ল্যাম্প জ্বালিয়ে দেবেন এবং ঘরের সাধারণ আলোটা নিভিয়ে দিয়ে রকিং-চেয়ারটায় এসে বসে স্ক্রীপ্ট পড়তে থাকবেন। পাশের টেবিলটা থেকে ওষুধটা খুলে তার ভেতর থেকে একটা চাবি বের করবেন। এদিকে ঘিরে সাহেবের বড় টেবিলের ড্রয়ারটা চাবি লাগিয়ে খুলবেন—প্রথমেই চোখে পড়বে রিভলভারটা। সেটা তুলে নিয়ে দেখবেন এবং আবার আগের জায়গায় রেখে দেবেন। ড্রয়ার থেকে একটা লাল-নীল পেন্সিল তুলে নিয়ে ড্রয়ারটা বন্ধ করবেন। চাবিটা কিন্তু ড্রয়ারেই লাগানো থাকবে। কামনিকা দেবী আবার ফিরে এসে রকিং-চেয়ারটায় বসে স্ক্রীপ্টটা পড়তে থাকবেন এবং লাল-নীল পেন্সিলটা দিয়ে জায়গায় জায়গায় কি সব মোট করবেন। স্ক্রীপ্টটা টেবিলের ওপর রেখে দেবেন এবং নাটকের সংলাপ মনে মনে বলবার চেষ্টা করতে থাকবেন, এই প্রসঙ্গে তাঁর ঠোঁট দুটি নেচে উঠবে। কেমন যেন বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াবেন—নজর পড়বে টেবিলের ওপর রাখা একটা চিঠিতে—চিঠিটার খামটা খোলা অর্থাৎ আগেই চিঠিটা পড়া হয়ে গেছে। আবার সেই চিঠিটাকেই বের করে নিয়ে জোরে জোরে পড়তে থাকবেন।]

কামনিকা—(চিঠি থেকে) নাটকের শেষ অঙ্ক কিছুতেই মাথায় আসতে পারছি না। অথচ কথা আছে নাটকটা শেষ করে তবে ফিরবো। মধুপুরের শীতকালটা যে কত সুন্দর তা নিজের চোখে না দেখলে বোঝানো যায় না। কিন্তু এ সৌন্দর্য ঠিক মন প্রাণ দিয়ে উপভোগ করতে পারছি না। প্রথমত নাটকটা আয়ত্তে আনতে পারছি না—আর বারবার মোনালিসার রহস্য-মাখানো হাসি-হাসি মুখখানা মনে পড়ে যাচ্ছে—(চিঠিটা ভাঁজ করে খামে ভরবেন এবং মুখে 'মোনালিসা স্মাইলটা' ফুটে উঠবে) মোনালিসা! (বড় আয়নাটার কাছে গিয়ে) সত্যিই কি আমার হাসিতে আর সেই বিশ্বমোহিনী মোনালিসার হাসির মধ্যে কোন মিল আছে?

[ধীরে ধীরে দরজার খড়খড়িটা খুলে যাবে এবং ঘরে ঢুকবেন শৈবাল, হাতে পোর্টফোলিও, এদিকে পেছন করে থাকাতে প্রথমটায় কামনিকা শৈবালকে দেখতে পাবেন না—ঘুরে দাঁড়াবেন এবং দুজনে চোখাচোখি হবে।]

শৈবাল—মোনালিসা!

কামনিকা—(এগিয়ে এসে হাত ধরে) শৈবাল! এত রাত্রে? অথচ লিখেছ নাটক শেষ না করে……

শৈবাল—পরশু যখন চিঠি লিখি তখন ভাবতেও পারি নি এভাবে নাটকটা শেষ করতে পারব। তারপর হঠাৎ যেন লেখাটা অদ্ভুত ভাবে সহজ হয়ে এল। সেই রাত্রেই লেখাটা শেষ করে ফেললাম। (একটু থেমে) বর্ধমানের কাছে লাইন খারাপ ছিল—না হলে অনেক আগে এসেই পৌঁছতে পারতাম। নেহাল সিং জেগেই আছে—ওকে ওদিকের ঘরে মালপত্র তুলে রাখতে বলেছি। এখন রাতও তো কম হল না—তুমি বসে বসে কি করছিলে?

কাননিকা—তোমার নাটকের থার্ড এ্যাক্ট অবধি নিজে নিজেই রিহার্স করছিলাম।

শৈবাল—নাটকটার শেষটায় এমন একটা টার্ন দিয়েছি—নায়িকার চরিত্রটি এবার তোমাকে যা suit করবে—

কাননিকা—আজই শেষ অঙ্কটা শুনবো—তার আগে তোমার খাবার বন্দোবস্ত করে আসি—

শৈবাল—আমি স্টেশন থেকেই খেয়ে এসেছি—

কাননিকা—তাহলে কফি করতে বলি···(কলিং-বেল টিপবেন এবং শৈবাল এগিয়ে এসে ওকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে কার্পেটের ওপর ওর পায়ের কাছে বসবেন। হাতের পোর্ট-ফোলিও খুলে স্ক্রীপ্টটা বের করবেন।)

কাননিকা—শেষ অঙ্কটা খুব জমে উঠেছে তো?

শৈবাল—শুনলেই বুঝতে পারবে। The whole play has power and truth. লেখবার সময় নায়িকার প্রতিটি সংলাপের ভেতর দিয়ে তুমিই যেন মূর্ত হয়ে উঠছিলে। এই নাটকটাই হবে আমাদের সবচেয়ে সেরা কাজ।

কাননিকা—আমাদের নয়—তোমার।

শৈবাল—Nonsense. তোমার শিল্প-মানসের ছোঁয়াচ পেয়েই তো আমি সত্যিকার নাটক লিখতে শিখলাম। আমার আগেকার নাটক-গুলোতে স্ত্রী-চরিত্রগুলো হয়ে উঠতো death masks.

[বেয়ারা ঢুকবে]

কাননিকা—এ নাটকটা যাতে হিট করে এজন্য আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। এতদিন আমি টাকা পেয়েছি অভিনয় করে। আর তুমি নাটক লিখে। এই আমরা প্রথম অনিরুদ্ধ বোসের সঙ্গে joint producers হিসাবে ছবির কাজে নামছি—আমি আমার প্রাণ দিয়ে অভিনয় করব·····তিন মাসে যদি বইটা শেষ করা যায়। তারপরে আমাদের গ্র্যানমত দু'মাসের জন্য Europe-এ ঘুরে কাটিয়ে আসব। (একটু থেমে) শেষ অঙ্কটা তাহলে পড়তে শুরু কর।

শৈবাল—(হাতে স্ক্রীপ্ট রয়েছে, কিন্তু সেদিকে নজর নেই—মুগ্ধের মত এতক্ষণ কাননিকার মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন—হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে—) না, on second thoughts, নাটকটা এখন পড়বো না।

কাননিকা—কেন বলতো?

শৈবাল—আজকের এই সময়টার জন্য যেন উৎসুকভাবে প্রতীক্ষা করছিলাম—Let's forget the actress and playwright. Let's just be—us—Lovers.

[বেয়ারা কফির পট ও কাপ নিয়ে আসবে এবং টেবিলের ওপর রেখে চলে যাবে]

কাননিকা—(কফি ঢালতে ঢালতে হাসির সঙ্গে) একবছর বিবাহিত জীবনের পরও আমাদের প্রেমে কি কোনও ভাঁটা পড়েছে? অথচ সাধারণ লোকে ভাবে চিত্র-জগতের প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রেম বেশীদিন টেঁকে না।

[দুজনে কফি পান করতে থাকবে]

শৈবাল—(কাষ্ঠ হাসির সঙ্গে) কিন্তু ঝগড়াঝাঁটিও তো প্রায়ই হয়—

কাননিকা—হয়—কিন্তু প্রায়ই হয় না।

শৈবাল—(ভ্রূকুটির সঙ্গে) আমার তো মনে হয় আমরা অতিরিক্ত ঝগড়া করি—সেদিন যেভাবে উত্তেজিত হয়ে ঘরের মধ্যে গুলিটা ছুঁড়লে—

কাননিকা—তোমার কি মনে হয় রেগে গেলে আমি তোমাকেও গুলি করতে পারি?

শৈবাল—আমাকে গুলি করবে না জানি, কিন্তু ও ধরণের রাগকে চণ্ডালের রাগ বলে। রাগের চোটে হয়তো নিজেকেই গুলি করবে। সেদিন চাকর-বাকর এবং অন্যান্য ফ্ল্যাটের লোকেরা কে কতটা দেখতে পেয়েছিল জানি না। সিঁড়ির কাছের দরজাটা

ছিল খোলা—সেলফোনে ওদের ফ্ল্যাটের পাশাপাশি বাড়ি নেবে এসেছিল। আরও দু'একজন বাড়ি ছিল—আমাকে পরে পাশাপাশি বসলে যে চশমার কাচে ও দেখেছিল আমাকে তাই, তারই বাড়ি তুমি গুলি করেছিলে। আমি প্রতিবাদ করতে বললে: মিস্টার মজুমদার, আমি আর কারোকে কিছু বলবার না, কিন্তু রিভলভারটা বাড়ীতে রাখবেন না।

কামনিকা—কি সর্বনেশে লোক বলত!

শৈবাল—ভদ্রতার চাকরেরা কি বলে বেড়াচ্ছে জানি না—তাই জন্যেই বলছি আর আমরা এভাবে ঝগড়া করব না।

কামনিকা—তুমি কি ভাব আমারই এসব ভাল লাগে! তোমাকে আঘাত দিলে পরে আমার কিরকম অনুশোচনা হয় জান?

শৈবাল—জানি বলেই তো বলছি, এখন থেকে আমরা বাজে কথা নিয়ে কখনও কথা কাটাকাটি করব না। It's wrong, Monalisa. It's evil! We love too deeply.

(কামনিকা স্বপ্নাচ্ছন্নভাবে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকবেন—শৈবাল ওঁর দিকে ফিরে বলবেন—) কি ভাবছ?—

কামনিকা—প্রথম যে দিনটায় তোমার সঙ্গে আলাপ হল স্টুডিয়োতে রিহার্সাল দিচ্ছি—তুমি এলে—অনিরুদ্ধ বোস তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। (হেসে উঠে) তোমার সঙ্গে মেয়েদের নিয়ে এর আগে স্টুডিও মহলে কত গল্প শুনতাম—ভেবেছিলাম চেহারাটা হবে……

শৈবাল—(অল্প হাসির সঙ্গে) কন্দর্পের মত—খুব আশাহত হয়েছিলে তো?

কামনিকা—চল্ জুয়ানের সঙ্গে চেহারার তেমন সাদৃশ্য না থাকলেও চোখে ছিল মেফিস্টোফিলিসের মত আকর্ষণী শক্তি।

শৈবাল—(একটু জোরের সঙ্গে) আমিও কিন্তু বহু গুজব শুনেছিলাম তোমার পূর্বতন প্রেমিকদের সম্বন্ধে—

কামনিকা—যেমন?

শৈবাল—যেমন অনিরুদ্ধ বোস সম্বন্ধে।

কামনিকা—কিন্তু সে সম্বন্ধে আমি তো তোমাকে সব কথাই বলেছি।

শৈবাল—অনিরুদ্ধ যে খুব পূত চরিত্রের লোক এরকমও কেউ বলে না। শোনা যায়, অনেক চিত্রাভিনেত্রীকেই এগিয়ে আসবার জন্যে অনিরুদ্ধের সাহায্য নিতে হয়েছে—আর বিনা স্বার্থে যে তারা সাহায্য পেয়েছে এরকমও কেউ বলে না।

কামনিকা—তার জন্যে তারা নিজেরা কতটা দায়ী এবং অনিরুদ্ধ কতটা দোষী সে কথাও কেউ বলতে পারবে না। আমার নিজের সম্বন্ধে শুধু বলতে পারি যে career build করবার জন্যে একসময় হয়তো অনেক কিছুই আমি সহ্য করে নিতাম—কিন্তু অনিরুদ্ধ আমাকে সেভাবে কখনও চায় নি। আমার কাছে সে বিয়ের প্রস্তাবই করেছিল…

শৈবাল—তার প্রস্তাবে রাজী হলেই পারতে!

কামনিকা—কি পারতাম আর কি পারতাম না এখন আর সে কথা ওঠে না। তবে আমার অতীত সম্বন্ধে যে তোমার একটা অপরিসীম মেয়েলী কৌতূহল আছে তা আমি বেশ বুঝতে পারি—এটা তোমার একটা অত্যন্ত morbid obsession!

শৈবাল—Obsession? যাক্‌গে—আমার কিন্তু যা avoid করবো ভাবছিলাম… …

কামনিকা—হ্যাঁ, এসব আলোচনা করতে গেলেই যখন গোলমাল হয়… …

[দরজার বেল-এর শব্দ।]

কাম্ ইন!

[ডিরেক্টর অনিরুদ্ধ বোস ঢুকবেন।]

অনিরুদ্ধ—(এগিয়ে আসতে আসতে) কয়েকটা music take করতে studioতে দেরী হয়ে গেল। ফেরবার পথে ভাবলাম একটুপরর নিয়ে যাই।

কামনিকা—কদ্দি যাবেন তো ?

অনিরুদ্ধ—(বুঝতে পারবেন তাঁর এঘরে আসাটা শৈবাল খুব পছন্দ করে নি) না, এখন আর বসবার সময় নেই। (শৈবালের প্রতি) I wanted some news of the big play. ভাবছিলাম কামনিকা দেবী নিশ্চয় আপনার চিঠি পেয়েছেন—Well, how's it coming ?

শৈবাল—এই কোনরকমে, আর কি……

কামনিকা—একটু বসুন মিস্টার বোস (টেবিল থেকে সিগারেটের টিন এগিয়ে দেবেন। অনিরুদ্ধ বসবেন এবং একটা সিগারেট ধরাবেন।) তুমি বসবে না শৈবাল ?

অনিরুদ্ধ—আপনাকে কিন্তু খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছে !

শৈবাল—আমি সত্যিই খুব শ্রান্ত।

কামনিকা—এ নাটকটা নিয়ে ওকে খুবই খাটতে হয়েছে—লেখা শেষ করে আজ এত একটু আগে এসে পৌঁছেছে।

অনিরুদ্ধ—শেষ অঙ্কটা হয়ে গেছে ? অত্যন্ত সুখবর ! করে শোনাবেন ?

শৈবাল—দেখুন, দিন দুই বাদে—

কামনিকা—দিন দুই বাদে কেন ? আপনি বসুন মিস্টার বোস—এখনই আমাদের শেষ অঙ্কটা পড়ে শুনিয়ে দাও না শৈবাল !

শৈবাল—(বিরক্তভাবে) না, না……এখন আমি কিছুতেই ও নাটকটা পড়তে পারব না—আর আমার মনে হচ্ছে লেখাটা অন্যায় বিশ্রী হয়েছে।

অনিরুদ্ধ—লেখবার অত্যধিক strain-এর জন্যই আপনার এই reactionটা হয়েছে। আমি আপনাকে বলছি—This play's the finest thing you've done. আর নায়িকার চরিত্রে কামনিকা দেবী একটা sensation create করবেন বলেই আমার বিশ্বাস। It'll be a triumph for you both, wait and see. আচ্ছা, good night.

(অনিরুদ্ধ ঘরে ঢোকে। কিছুক্ষণ একটা বিশ্রী নীরবতা বিরাজ করে।)

শৈবাল—এরকম অদ্ভুতভাবে এত রাত্রে এখানে আসবার কোনো মানে হয়!

কামনিকা—যে কারণে এসেছিলেন তা তো বললেন। তোমার নাটকটা কতদূর এগোল, কোনো চিঠি এসেছে কি না···

শৈবাল—সেই হচ্ছে আসল কথা। এখানে এসে আমাকে দেখতে পাবে ভাবতে পারে নি।

কামনিকা—(ভেতরে ভেতরে হেসে উঠলেন এবং কোনো-রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে) আমার কাছে আসতে হলে মিস্টার বোসকে দিনক্ষণ বিচার করে আসতে হবে এ ধারণা তোমার কোথা থেকে হল? (একটু থেমে) ওঁর মত হিতাকাঙ্ক্ষী আমার জীবনে আর আমি পাই নি। তাছাড়া কিন্তু-লাইনে আমার যা কিছু সাফল্য তা অনিরুদ্ধ বোসের উপদেশ নির্দেশেই সম্ভব হয়েছে।

শৈবাল—(আহতভাবে—ব্যঙ্গভরে) তা ত নিশ্চয়!

কামনিকা—তোমার ওপর নির্ভর করেই আমার সব কিছু হয়েছে—একথা বললেই বোধ হয় খুব খুশী হতে?

শৈবাল—নিজের প্রতিভার জোরেই সাফল্য পেয়েছ—একথাটা বললেই সবচেয়ে বেশী আনন্দ পেতাম। সে কথা থাক্, আমি বাইরে থাকার সময়টায় উনি বোধহয় রোজই একবার করে রাত এগারটা, সাড়ে এগার-টার সময় তোমার কাছে আসতেন?

কামনিকা—(শ্লেষভরে) সময় পেলে নিশ্চয় তাই আসতেন। একদিন অবশ্য এসেছিলেন, এবং রাত একটা-দেড়টা অবধি বসে আমরা গল্প করেছিলাম।

শৈবাল—আমার নাটকটা কতদূর এগোল, শেষ হল কিনা, এসব বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করেন নি?

কামনিকা—ছিঃ শৈবাল, যার সাহায্য পেয়ে আজ এতটা উঠতে পেরেছ—তোমার এতগুলো নাটক যার direction-এ হিট্ করল·····

শৈবাল—ওই নাটকগুলো অনিরুদ্ধের সঙ্গে আলাপ হবার অনেক আগেই লেখা। যে কোনো ভাল ডিরেক্টারের হাতে পড়লেই·····

কামনিকা—আগেও তো তোমার দুখানা বই ভাল ডিরেক্টারের পরিচালনাতেই flop করেছিল·····

শৈবাল—অতএব অনিরুদ্ধ বোসের যথেচ্ছ ব্যবহার আমাকে সব সহ্য করে যেতে হবে!

কামনিকা—কি করতে চাও বলত?

শৈবাল—ওকে বলে দেবে এভাবে তোমার সঙ্গে মেশামিশিটা বন্ধ করতে হবে।

কামনিকা—তার মানে!

শৈবাল—মানে আবার কি—এ বিষয়ে এই আমার শেষ কথা।

কামনিকা—শেষ কথা! কি বলতে চাও তুমি?

শৈবাল—(উত্তেজিতভাবে) হ্যাঁ, হ্যাঁ,·····এই আমার শেষ কথা—না বোঝবার মত তো কিছু বলি নি। হয় আমার সঙ্গে সব সম্বন্ধ এইখানেই এই মুহূর্তে শেষ করে ফেল, না হয় তো অনিরুদ্ধ বোসের সঙ্গে মাখামাখিটা বন্ধ করতে হবে।

কামনিকা—তোমাকে আমি বলছি, অনিরুদ্ধকে বাদ দিয়ে তোমার এবং আমার কারোরই কোন উন্নতি করবার বা এগিয়ে আসবার কোনই সম্ভাবনা নেই।

শৈবাল—ঐ একই কথা বারবার বোলো না—এ লাইনে এখন দুজনেই আমরা well established. আমার তিন-চারখানা বই হিট্ করেছে—আর তুমি তো এখন বাংলার চিত্রাভিনেত্রী-দের প্রথম তিনজনের একজন।

কামনিকা—কিন্তু তুমি তো বেশ ভালভাবেই জান আমাদের দুজনেরই এই সমস্ত খ্যাতির মূলে রয়েছে অনিরুদ্ধের পরিচালনার কৃতিত্ব।

শৈবাল—ঘুরে ফিরে ঐ এক কথা—অনিরুদ্ধ···অনিরুদ্ধ··· অনিরুদ্ধ! ওর সংস্রব তুমি তাহলে ছাড়বে না?

কানিকা—না···না ···না। কোনো অপরাধ ও করে নি। নিজের অতীতটা একটু ভেবে দেখো—আমার সঙ্গে মেশবার আগে কি ছিলে। তাছাড়া আজও মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার কি কম দুর্বলতা আছে!

শৈবাল—তাই নাকি! তোমার অতীত সম্বন্ধেও আমার কানে কম কথা আসে নি।

কানিকা—কিন্তু তুমি যে আজও শোধরালে না। ওই যে মারাঠী মেয়েটা, তোমার বইয়ের হিন্দী রাইট যিনি কিনেছেন, গত মাসে তাঁকে নিয়ে কতবার কত জায়গায় নৈশ অভিযান করেছ, সে সব আমার কানে আসে নি ভেবেছ?

শৈবাল—তোমার espionage system-এর প্রশংসা না করে পারলাম না—যাবতীয় খবরাখবর যোগাবার সঙ্গে দেখা করবার দরকার হয়। এ বাড়ীতেই আলাপ আলোচনা হতে পারতো—কিন্তু মাস দুয়েক আগে এই ঘরে বসেই কিভাবে তাকে অপমান করেছিলে, মনে আছে?

কানিকা—করব না! যেভাবে বেহায়ার মত গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে সেদিন তিনি খ্রীষ্টের আলোচনা করছিলেন তোমার সঙ্গে···

শৈবাল—ওটা তোমার হিস্টিরিয়াগ্রস্ত বিকৃত মনের একটা নোংরা ধারণা।

কানিকা—ওঃ, আমার সব কিছুই বুঝি বিকৃত এবং নোংরা বলে মনে হচ্ছে আজকাল! তাহলে যাও না ওই শকুন্তলার বাড়ীতে—এখানে বসে রয়েছ কি জন্য?

শৈবাল—আসলে তোমার মনটা অত্যন্ত নীচ·····বেশ, আমি উঠলুম।

কানিকা—যাও, কিন্তু ফিরে এসে আমাকে আর দেখতে পাবে না।

শৈবাল—কেন অনিরুদ্ধ বোসের বাড়ীতে চলে যাবে নাকি?

কানিকা—সেদিনকার কথা মনে আছে? রিভলভারটায় কিন্তু এখনও অনেকগুলো তাজা কার্তুজ আছে।

[শৈবাল কিছু না বলে সাহেবের টেবিলটার কাছে এগিয়ে যাবে। বড় ড্রয়ারটায় চাবি লাগানো দেখে ড্রয়ারটা খুলে রিভলভারটা বের করে নিক]

শৈবাল—যাক্ ড্রয়ারটা খোলা থাকাতে সুবিধেই হল। এটা আমি নিয়ে চললাম (দরজার দিকে এগোতে থাকবে)।

কানিকা—(ছুটে ওকে ধরতে যাবে) খবর্দার, আমার রিভলভার দিয়ে যাও। আমি মরি কি বাঁচি, তাতে তোমার কি?

[শৈবালের হাত ধরে কানিকা টানতে থাকবে এবং শৈবাল তাকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে পাশের সিটিং রুমের দিকে নিয়ে যাবে। এরপর থেকে ওদের দুজনের কথা কাটাকাটি শোনা যাবে···কিছুক্ষণ বাদেই গুলির শব্দ হবে এবং দুজনের মিশ্রিত চিৎকার কানে আসবে·····তার পরে পেটে হাত চেপে শৈবাল ঘরে ঢুকবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আসবে কানিকা। তার মুখে চোখে এমন একটা বিহ্বলতার ভাব কি ঘটেছে কিছুই সে বুঝতে পারবে না।]

শৈবাল—(কোনো রকমে থেমে থেমে বহু কষ্টে কথা বলবে) শিগ্‌গির·····ডাক্তার সেনকে···টেলিফোন কর। অন্ততঃ তাঁকে ব্যাপারটা বলে যেতে পারব·····যাও·····দেরী করছ কেন?

কানিকা—[যন্ত্রচালিতের মত এগিয়ে গিয়ে টেলিফোন ডায়াল করবে] কে? আমি ২৩নং লর্ড সিনহা রোড থেকে কানিকা দেবী বলছি। ডাক্তার সেনকে বলুন এখানে একটা accident হয়েছে—আমার রিভলভারের গুলিতে শৈবাল মজুমদার সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়েছেন·····না, না, তাঁর সঙ্গে আর কথা বলবার দরকার নেই। তাঁকে দয়া করে এখুনি একবার এখানে আসতে বলুন।

[টেলিফোন নামিয়ে রেখে ছুটে আসবে। শৈবাল ততক্ষণে মাটিতে শুয়ে পড়েছে। তার জামা একেবারে লাল হয়ে উঠেছে। তার মুখ চোখে অসহ্য যন্ত্রণার ভাব·····কানিকা দৌড়ে গিয়ে একটা টাওয়েল নিয়ে আসবে এবং সেটা ওর পেটের ওপর চাপা দেবে।]

কানিকা—খুব কি যন্ত্রণা হচ্ছে?

শৈবাল—ডাক্তার সেন দেরী করছে!

(কানিকা ওর মাথা ও কাঁধ ধরে আস্তে আস্তে নিজের কোলে শুইয়ে নেবে।)

কানিকা—এই তো কোর করলাম। এখুনি এসে পড়বেন। কিন্তু এ কি হয়ে গেল শৈবাল!

[শৈবালের দেহ ধরার মুঁকে পড়ে উঠবে—তারপর তার দেহ নিথর হয়ে যাবে। কানিকা চিৎকার করে উঠবে—]

শৈবাল!

[হল, ঘরে আলো নিভে যাবে এবং মঞ্চ ঘুরে আগের কোর্টরুমের দৃশ্য ফিরে আসবে—সাক্ষীর কাঠগড়ায় কানিকা দেবীকে আগের অবস্থায় দেখা যাবে]

কানিক—ঠিক এমনি ভাবেই সে রাত্রে ব্যাপারটা ঘটে। তাঃ সেনকে এই কথাটাই জানাবার জন্যে শৈবাল তাই বোধ হয় মৃত্যুর আগে এতটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। আমি বুঝিনি কিন্তু নিজের জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও সে নিশ্চয় পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছিল যে আমাকেই তার মৃত্যুর জন্য দায়ী করা হবে। (একটু থেমে) আর আমার কিছু বলবার নেই।

[সমস্ত কোর্টের ওপর একটা থমথমে ভাব বিরাজ করবে।]

জাস্টিস মিত্র—আচ্ছা, আপনি আপনার আগের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ান।

[কানিকা আসামীর কাঠগড়ার দিকে ফিরে যাবেন।]

প্র. কা.—(উঠে দাঁড়িয়ে) মাননীয় বিচারপতি মহাশয় এবং জুরি মহোদয়গণ! শৈবাল মজুমদারের অস্বাভাবিক মৃত্যু সম্বন্ধে সাক্ষীদের বক্তব্য এবং আসামীর বিবৃতি আপনারা শুনলেন। মিঃ পার্থসারথি, ডাঃ ঘোষ এবং অস্ত্র-বিশেষজ্ঞ মিঃ ব্যানার্জি প্রভৃতির প্রত্যেকেই নিরপেক্ষ সাক্ষী। মিঃ পার্থসারথি স্বচক্ষে দেখেছেন যে এই ঘটনার আগে আর-একবার কানিকা দেবী শৈবাল মজুমদারকে ভাগ্ করে গুলি ছুঁড়েছিলেন। ডাঃ ঘোষ বলেছেন যে শৈবাল মজুমদারের মৃত্যুটা যে আত্মহত্যা নয় সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। মিঃ ব্যানার্জি অস্ত্রের ব্যবহার বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ। তাঁরও মত এই ধরনের রিভলভার থেকে হঠাৎ accidentally গুলি ছুটে যেতে পারে না—অতএব বোঝা যাচ্ছে যে কানিকা দেবী deliberately মিঃ মজুমদারকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন। এর আগের বারে যখন তিনি গুলি করেন তখন বাইরে থেকে মিস্টার পার্থসারথিও শুনতে পেয়েছিলেন যে কানিকা দেবী চিৎকার করে বলছেন—"I will shoot you." আর আসামীর evidence-এ তিনি যা বলেছেন, আমরা আগে থেকেই জানতাম, ঠিক এই ধরনের একটা আজব কাহিনীই তিনি আমাদের শোনাবেন—করুণরস মিশিয়ে তিনি অতি সুন্দরভাবে তাঁর বিবৃতি দিয়েছেন সত্য, কিন্তু ব্যাপারটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারেন নি। (একটু থেমে) আসামী যে কত slight provocation-এ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারেন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণও পুলিশ ইন্সপেক্টরের সাক্ষ্যে আপনারা পেয়েছেন। জুরি মহোদয়গণ! আসামীর এই উদ্ভট অবিশ্বাস্য কাহিনীতে যদি আপনারা বিশ্বাস করতে পারেন, তাকে নির্দোষ মনে করা সম্ভব। But if you weigh the evidence carefully and dispassionately, I submit that you will find the accusation proved. (বসে পড়বেন)

ডি. কা.—(উঠে দাঁড়িয়ে) মাননীয় বিচারপতি মহাশয় এবং জুরি মহোদয়গণ! হত্যার বিচারে আসামীর বক্তৃতা দেওয়া এবং নাটকীয় ভঙ্গীতে কথা বলাটাই যেন প্রথা এবং রীতি দাঁড়িয়ে গেছে। They may be amusing, but we are not in this court to amuse. প্রসিকিউসনের তরফ থেকে যেভাবে

আগাগোড়া ব্যাপারটাকে বিকৃতভাবে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে···আমি জানি ···তার দ্বারা আপনারা এতটুকু প্রভাবিত হন নি বা হতে পারেন না। পুলিশের ইন্সপেক্টর এবং প্রসিকিউসন্ কাউন্সেল্ বলেছেন যে slight provocation-এর জন্য কানন্বিকা দেবী যেমন বিশ্রীভাবে পুলিশদের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন এবং তাদের কাজে বাধা দিতে চেষ্টা করেছেন, তাতেই বোঝা যায় কত সহজেই তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারেন এবং এর থেকেই ইঙ্গিত করেছেন যে ঐ অবস্থায় কাউকে গুলি করে মারাটা কানন্বিকা দেবীর পক্ষে অসম্ভব নয়। এই slight provocation-এর ব্যাপারটা একটু পরীক্ষা করে দেখা যাক্—ঘটনার রাত্রে তখনকার পরিস্থিতির কথাটা আপনারা একবার ভেবে দেখুন দিকি—সদ্য একটা ভয়ঙ্কর accident হয়ে গেছে, স্বামীর মৃতদেহ পড়ে রয়েছে চোখের সামনে, সান্ত্বনা দেবার মত আত্মীয়-স্বজন কেউ কাছে নেই—পুলিশের তরফ থেকে ঐ অবস্থায় কানন্বিকা দেবীকে তাগিদ দেওয়া হচ্ছে থানায় গিয়ে বিবৃতি দেবার জন্য—এই সমস্ত মিলেও ব্যাপারটাকে যদি slight provocation বলা হয়—(একটু থেমে) I wonder what provocation they would claim as serious. (আবার থেমে) পুলিশের সাক্ষ্যে আপনারা শুনেছেন যে রিভলভারে কোন আঙুলের ছাপ পাওয়া যায় নি। এখানে প্রশ্ন ওঠে, তবে কি শুধু accused-এর দোষ প্রমাণ করবার বেলাতেই আমরা আঙুলের ছাপের সাক্ষ্য কাজে লাগাব? কানন্বিকা দেবী যদি সত্যি সত্যিই deliberately হত্যা করবার জন্য স্বৈরাল মজুমদারকে shoot করে থাকতেন, তবে রিভলভারে আঙুলের ছাপ পেতে পুলিশের কোনই অসুবিধা হত না। কিন্তু রিভলভারটা নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে গুলি ছুটে গেছে বলেই কারো আঙুলের ছাপ ওতে স্পষ্টভাবে পড়তে পারে নি। ছুরি মহোদয়গণ! There are cases in which advocates feel in such despair that they are driven to plead for mercy for their clients and to urge that they are entitled to the benefit of the doubt. (উচু গলায়) I am going to do nothing of the sort. I am not going to ask you for the benefit of the

শ্রীঅশোক সেনের লেখা দু'খানি উল্লেখযোগ্য বই

ওয়েটিং ফর গোডো

স্যামুয়েল বেকেট

অনুবাদক : অশোক সেন

এ যুগের ইউরোপ ও আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজসমস্যামূলক নাটক।

মূল্য : ১'৫০ নঃ পঃ মাত্র

রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ধরণের নাটকের সুনিপুণ সমালোচনা। প্রসঙ্গক্রমে য়ুরোপীয় নাট্যসাহিত্যের সহিত রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য : ৩'০০ টাকা মাত্র

এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, : : কলিকাতা-১২

doubt. I am going to satisfy you that there is no doubt. I am going to show you that there is no evidence at all. (একটু থেমে) পুলিশ ইন্সপেক্টর মৃতদেহ দেখবামাত্রই অনুমান করে নিয়েছেন যে ব্যাপারটা হত্যা-কাণ্ড—অথচ এই অনুমান করবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ তিনি দেখাতে পারেন নি: গৃহ-চিকিৎসক ডাঃ সেন কিন্তু একবারও মনে করেন নি যে ব্যাপারটা হত্যাকাণ্ড। এরপর মিঃ পার্থসারথির সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। তিনি বলেছেন, তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন যে প্রথমবারে যখন গুলি ছোঁড়া হয় তখন শৈবালবাবুর প্রতি রিভলভার তাগ্ করা ছিল। তাই যদি হত তবে গুলিটা মাথার অনেক ওপরে সিলিং-এ গিয়ে লাগত না—আসলে সেদিন আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে কাননিকা দেবী ইচ্ছে করেই সিলিং-এর দিকে গুলিটা ছুঁড়েছিলেন। আর তাছাড়া সত্যিই যদি তিনি শৈবালবাবুকে লক্ষ্য করে গুলিটা ছুঁড়তেন তাহলে শৈবালবাবু কখনই আর ওই বাড়ীতে কাননিকা দেবীর সঙ্গে থাকতে সাহস পেতেন না। আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করবেন—মিঃ পার্থসারথি প্রভৃতি আরও অনেকে ব্যাপারটা দেখলেন এবং জানলেন—অথচ কেউই এটা কর্তব্য মনে করলেন না যে ব্যাপারটা পুলিশে report করা দরকার। তাছাড়া মিঃ পার্থসারথির সাক্ষ্য কতটা বিশ্বাসযোগ্য তাও আপনারা বেশ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছেন। তিনি বলেছেন তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন firing-এর সঙ্গে সঙ্গে a puff of smoke···তার সাইজ পর্যন্ত বর্ণনা করলেন; অথচ কাননিকা দেবীর রিভলভারে যে কার্তুজ ব্যবহার করা হয়েছিল তা থেকে smoke বের হতে পারে না—কারণ কার্তুজগুলো ছিল cordite cartridges। পুলিশের কাছে বিবৃতিতে মিঃ পার্থসারথি বলেছিলেন যে প্রথমবারে গুলি ছোঁড়বার আগে কাননিকা দেবী চিৎকার করে উঠেছিলেন—"I will shoot you"—কিন্তু কোর্টে সাক্ষ্য দেবার সময় ঐ বিষয়ে বলতে গিয়ে বললেন—কাননিকা দেবী চিৎকার করেছিলেন—'I will shoot··· I will shoot'. I will shoot you এবং I will shoot-এর মধ্যে কতটা তফাৎ সে আপনারা সবাই জানেন। (একটু থেমে) Pathologist মিঃ গোবিন্দলাল ঘোষের সাক্ষ্য সম্বন্ধে শুধু এই কথাই বলব —He gave no shred of evidence to suggest that Saihal Mazumder's death could not have been caused in the way that Kananika Devi has always said it was. He did not affect my case. I had no questions to ask him. এর পরের সাক্ষী অস্ত্র-বিশেষজ্ঞ শ্রীমোহিতচন্দ্র ব্যানার্জি। মোহিতবাবু তাঁর সাক্ষ্যে বলেছিলেন যে এক্ষেত্রে ব্যবহৃত রিভলভারটি হচ্ছে—One of the safest revolvers ever made অথচ আপনাদের চোখের সামনে আমি প্রমাণ করে দিয়েছি কত সহজেই এটাকে fire করা যায়। রিভল্-ভারটিতে কোনো safety device ছিল না তাও আপনারা দেখেছেন। সুতরাং কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে যে হঠাৎ গুলি ছুটে যেতে পারে এরকম আমরা বিশ্বাস করব না কেন? রিভল-ভারের চেম্বারগুলিতে কি ভাবে পর পর গুলি সাজানো ছিল সে বিষয়েও মোহিত-বাবুকে cross examine করবার সময়

বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কাড়াকাড়ির সময় ট্রিগারে অর্থেক টান পড়তেই একটা discharged কার্তুজের পরের কার্তুজটা ছিল live—কারণ fired হবার আগেই সিলিণ্ডারটা ঘুরে গিয়েছিল। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হচ্ছে যে রিভলভারটা মিঃ মজুমদারের হাত থেকে কাননিকা দেবী কেড়ে নিতে গিয়েছিলেন—এর ফলে একটা ধস্তাধস্তি হয় এবং তার থেকেই কোনো রকমে রিভলভারটা ছুটে যায়—নইলে শৈবালবাবুকে গুলি করে মারবার কোনো উদ্দেশ্যই কাননিকা দেবীর ছিল না। এমন কি—ওও হতে পারত যে গুলির আঘাতে সে রাত্রে কাননিকা দেবীই মারা যেতে পারতেন এবং সেক্ষেত্রে হয়তো তাঁর জায়গায় হত্যার অপরাধে শৈবালবাবুরও আজ এখানে বিচার হতে পারত। Members of the Jury, I claim that on the evidence that has been put before you Kananika Devi is entitled as a right to a verdict in her favour. I ask you, as a matter of justice, that you should set her free. (বসে পড়বেন)

আশিস মিত্র—Members of the Jury, হত্যাপরাধে অভিযুক্ত কাননিকা দেবীর বিচারে সমস্ত সাক্ষীর বক্তব্য, জেরা, আসামীর evidence, সরকারী এবং আসামী পক্ষের আইনজ্ঞের ভাষণ সমস্তই আপনারা শুনলেন। ডিফেন্স কাউন্সেলের ভাষণ সম্বন্ধে এতটুকু দ্বিধা না করে আমি বলব—We have listened to a great forensic effort. I am not paying compliments when I say it is one of the finest speeches that I have ever heard delivered at the Bar. নিজের বক্তব্য তিনি সহজ সরল ভাষায় বিশ্লেষণ করে আপনাদের কাছে তুলে ধরেছেন—ভাবাবেগের দ্বারা আপনাদের বিচারবুদ্ধিকে অভিভূত করে দেবার এতটুকু চেষ্টা করেন নি। সাক্ষ্য প্রমাণাদির ওপর নির্ভর করে যদি আপনারা মনে করেন যে এক্ষেত্রে কাননিকা দেবী স্বেচ্ছায় শ্রীশৈবাল মজুমদারকে হত্যা করবার জন্য গুলি করেছিলেন এবং সেই গুলির আঘাতে শৈবাল মজুমদার মারা গেছেন—তবে—দিনা দ্বিধায়, দয়ামায়া প্রভৃতি হৃদয়ের কমল বৃত্তিগুলি দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে, নিজেদের কর্তব্যবুদ্ধি অনুসারে কাজ করবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে এ কথাটাও ভেবে দেখতে হবে—সাক্ষ্য প্রমাণাদির সঙ্গে যদি অসঙ্গতি না পাই তবে কাননিকা দেবী যেভাবে এই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন তাই বা আমরা অবিশ্বাস করব কেন? যেহেতু এক্ষেত্রে তিনি নিজেই অভিযুক্ত, সুতরাং তাঁর বিবৃতিকে অসত্য বলে অগ্রাহ্য করব—এ ত' কোন যুক্তি নয়! আর একটি বিষয়ে আপনারা ভেবে দেখবেন—অভিযুক্তের তরফের আইনজ্ঞ বন্ধু manslaughter বিষয়ে কোনো উল্লেখ করেন নি। এ বিষয়ে আইনের যা নির্দেশ আছে তা হচ্ছে এই: —Manslaughter is the unlawful killing of another without any intention of either killing or causing serious injury. তার মানে হল—আসামী যদি আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে থাকেন (মনে রাখবেন আত্মহত্যাটা আইনের কাছে একটা অপরাধ) এবং মৃত ব্যক্তি তাতে বাধা দিতে গিয়ে রিভলভারটা ছিনিয়ে নিয়ে থাকেন এবং

দেট: ফিরে পেতে দিয়ে আসামী তাঁর সঙ্গে ঝাড়াঝাড়ি করবার সময় গুলি ছুটে গিয়ে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তবে আসামী manslaughter-এর অপরাধে অপরাধী এবং তার জন্য আইন অনুসারে শাস্তি পাবার যোগ্য। এবার আপনারা নিজেদের মন্ত্রণা-কক্ষে যেতে পারেন।

[জুরিরা retire করবেন। কোর্টের ঘড়িতে দেখা যাবে চারটে বাজতে মিনিট দশেক বাকী। জজসাহেব ও অ্যাটর্নিরাও নিজের নিজের ঘরে চলে যাবেন। কোর্টের দুজন অফিসার ডক থেকে কামনিকা দেবীকে বাহিরে নিয়ে হেফাজতের দিকে যাবেন। দর্শকেরা বসে থাকবেন।

আস্তে আস্তে স্টেজের আলো নিবতে নিবতে একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে। আবার সব আলো জ্বলে উঠবে যেখানে ঘড়িটার দেখা যাবে পাঁচটা বেজে দশের মিনিট হয়েছে। জুরিরা তাদের box-এর সামনে এসে দাঁড়াবেন। কোর্টের অফিসারেরা তাড়াতাড়ি করে এসে বসবেন। অ্যাটর্নিরা নিজেদের জায়গায় আসবেন। জাস্টিস মিত্র এসে বসবেন—কামনিকা দেবীকে আবার ডক-এ দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে।]

জাস্টিস মিত্র—(জুরিদের প্রতি) ইচ্ছাকৃত হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত কামনিকা দেবীকে আপনারা দোষী না নির্দোষ সাব্যস্ত করেছেন?

জুরিদের প্রধান—নির্দোষ।

[সমস্ত কোর্টের লোকেরা যেন একসঙ্গে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়বে।]

জাস্টিস মিত্র—Manslaughter-এর অপরাধে অভিযুক্তকে আপনারা দোষী না নির্দোষ সাব্যস্ত করেছেন?

জুরিদের প্রধান—নির্দোষ।

জাস্টিস মিত্র—জুরিদের সঙ্গে একমত হয়ে শৈবাল মজুমদারের হত্যাপরাধে অভিযুক্ত তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী কামনিকা দেবীর প্রতি আমি মুক্তির আদেশ দিলাম।

[কোর্টের কর্মচারী, জুরিরা এবং জজসাহেব চেম্বারে চলে যাবেন। দর্শকের লোকেদের মধ্যে উল্লাসের ধ্বনি উঠবে। ডক থেকে হাতে ধরে কামনিকা দেবীকে বাহিরে নেওয়া হবে। অনিরুদ্ধ ঘোষ এসে তাঁকে নিয়ে ব্যারিস্টার চেম্বারের দিকে নেতে থাকবেন এবং ধীরে ধীরে কামনিকা নেমে আসবে।]

প্রসন্ন আকাশের ছাদিটুকু হঠাৎ কেমন মিইয়ে এল। অথচ সকাল বেলা ঘুম ভেঙেই দেখেছিলাম আলোয় ছেয়ে আছে রুপোর সারা আকাশ। চারদিকের পাহাড় থেকে মেঘেরা বলছে যাই যাই। গ্যাংটক যাবার জন্য এমনই একটা দিনের প্রতীক্ষা করছিলাম। দিন স্বচ্ছ না হ'লে কাঞ্চনজঙ্ঘার ধবলচূড়ো না দেখেই ফিরে আসতে হবে। আর বৃষ্টি যদি একবার করতে সুরু করে তো গুঙ্গা তিয়ার পার্ক কিছুই দেখা হবে না। তাই সকালবেলার আলো আমাদের উল্লসিত ক'রে তুলেছিল। কিন্তু 'মর্নিং শোজ্ দি ডে' কথাটি যে কত মিথ্যে তা সেদিনই প্রথম বুঝলাম। আর পাহাড়ে ব'সে যে কোন দিনেরই ওয়েদার ফোরকাস্ট করতে গেলে আমাদের এখানকার আবহাওয়া দপ্তরকেও ত' হার মানাবে।

বাড়ীর সামনে দিয়ে কালিম্পঙ্—গ্যাংটক হাইওয়ের যাত্রীবোঝাই বাস্ যাতায়াত করছে। যাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই লেপ্চা আর বাকী সবাই নেপালী, সিক্কিমী এবং ভুটিয়া। বাঙালী কিংবা অন্যান্য প্রদেশ থেকে আজকাল যে সব টুরিস্ট গ্যাংটকের দিকে বেড়াতে আসেন তাঁরা অধিকাংশই সরকারি জীপে যাতায়াত করেন। আবহাওয়া দেখে আমরাও সেদিন খুসী মনেই বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের জীপ্ যখন চার হাজার ফিট ছাড়িয়ে উঠেছে তখনও চারদিকের দুর্গম পাহাড়গুলো বেশ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলাম। পাহাড়ের গায়ে চষা জমিগুলোর ওপর রোদ এসে পড়েছে। তারই কাছাকাছি দুটো একটা বাড়ী। তারপর বহুদূর পর্যন্ত অরণ্য রাজ্য। ভোর অবাক লাগছিল কি ক'রে হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল বনস্থলীর মধ্যে দুটো একটা পরিবার নিশ্চিন্ত ভাবে বসবাস করে। পাহাড়ের গায়ে এমনি অনেক দূর পর পর ছিটোন বস্তী। লোকালয় থেকে এরা বহুদূরের। তবে নীচে লোকালয়ে হাট-বাজারে এদের প্রতিদিনই নেমে আসতে হয় সদরের জোকা নিয়ে। কেউ আনে চাল। কেউ মকাই। কেউ আনে ভেড়ার মাংস ও লোম। কেউ দুধ মাখন। তাছাড়া হরী কমলালেবু বন্য ইত্যাদি বিভিন্ন পণ্য পিঠের ঝুড়িতে নিয়ে আসে দূর দূর অঞ্চলের মেয়েরা। পাকে চলার পথ এখনও ঐ সব পাহাড়ে তৈরী হয়নি। তাই এরা নেমে আসে খচ্চরের পিঠে চ'ড়ে নয়তো বা ঘোড়ার পিঠে অশ্বারোহণ করে।

গ্যাংটক বাজারের কাছে নেমেই মন খারাপ হ'য়ে গেল। আধুনিক একটি শহরের মধ্যে দিয়ে যেন শহরের রূপ দেখছি। চারদিকের পাহাড় আরও বেশী ভয়াবহ আরও দুর্গম বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এতো শুধু কুয়াশার জাল নয়। প্রথম বর্ষার মেঘ। পাহাড়ে পাহাড়ে বর্ষা নেমেছে। দূরের পাহাড় একেবারেই ঢেকে ক্রমে অস্পষ্ট হ'য়ে গেল। তারপর মেঘ গড়িয়ে এসে আমাদেরও যেন একজনকে আর একজনের কাছ থেকে আড়াল ক'রে দিতে চাইল। এইবার বর্ষণের পালা। তা হ'লে আজ আমার গুঙ্গায় যাওয়া হবে না? ভাবতে ভাবতেই বৃষ্টি। কাছাকাছি এক লেপ্চা বাড়ীর বারান্দায় আমরা ৫।৬ জন এইলাম দাঁড়িয়ে। কিন্তু যে বৃষ্টির হাত থেকে মাথা বাঁচাবার জন্য আমাদের

এই সময় এল,—সেই মাথার ওপরেই টুপ্‌টাপ্‌ বৃষ্টি অবিরাম হারে পড়তে লাগল। কারণ ওপরে টিনের চাল ছিল একেবারে বং ধরা। একটু বৃষ্টি ধরো ধরো হতেই নেমে পড়লাম রাস্তায়। এবার সোজা রাজবাড়ীর পথ ধ'রে ওপরের দিকে চলা। সিকিমের রাজপ্রাসাদ অবশ্য এভারেস্টের চেয়ারের মত নয়। আমাদের দেশের যে কোন ধনীর বাড়ী হাকে লজ্জা দেবে। আমাদের আগ্রহ প্রাসাদ শুদ্ধাই দেখার। ভিক্ষত কোনদিন যাওয়া হবে কিনা জানি না। কিন্তু তিব্বতের ধর্ম ও সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র এই গুম্ফাগুলোর নমুনা আমরা সিকিমেই যাচ ক'রে নিলাম।

পাঁচ হাজার ফিট্‌ ওপরে গুম্ফার কাছাকাছি এসে প্রথমেই যে জিনিস চোখে পড়ল তা হ'ল অসংখ্য শুভ্র তিব্বতীয় পতাকার অভিনন্দন। এর আগে দার্জিলিং-এর মহাকালে এবং সিকিমেরও অন্য জায়গায় এ ধরণের পতাকার সারি দেখেছি। এগুলোর গায়ে তিব্বতী ভাষায় স্তোত্র লেখা। বড় বৃষ্টিতে হয় পতাকা ছিঁড়ে গেছে। তবু গায়ের লেখা মুছে যায় নি। সবার শুভ ও কল্যাণকে পতাকা আহ্বান জানাচ্ছে।

গুম্ফার বাইরেটা তিব্বতী স্টাইলে তৈরী। প্রকাণ্ড দরজার কাছে একজন লামা ছিলেন ব'সে। আমরা ভেতরে যেতে চাই শুনে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। ভেতরে ঢুকে প্রথমটায় কিছুই দেখতে পেলাম না। চারদিকে অন্ধকার। বেশ খানিকটা ঢুকে গিয়ে তারপর দেখলাম কয়েকটি ঘিএর বাতি জ্বলছে দেবদেবীর আসনের সামনে। তারই আলোয় ঘরটির একাংশ আলোকিত। কাঠের মসৃণ মেজে অন্ধকারেও যেন চক্‌ চক্‌ করছে। দেওয়ালগুলোতে নানা ডিজাইনের ফ্রেস্কো-করা। বহু দেবদেবীর চিত্র। কিন্তু সুস্পষ্ট চেহারার কোন দেবদেবী চোখে পড়ল না। ঐ বিকট দেবতাদের দেখিয়ে লামা নমস্কার জানিয়ে বল্লেন—এই দেবতারাই সকল রকম অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে চলেছেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল অশুভ শক্তির সম্বন্ধে তিব্বতীদের সংস্কারের কথা। ভূত-প্রেত প্রভৃতি অপদেবতাকে ওরা বড় বেশী মানে। সমাজ জীবনেও এদের অপদেবতার ভয় আছে। কারও বাড়ীতে যে কোন খারাপ পরিস্থিতি দেখা দিলে এর জন্য দায়ী করে অপদেবতাদের। এই সব শক্তিকে যারা দমন করেন সেই দানবশক্তি দেবতাদের প্রতি তিব্বতীদের অপরিসীম শ্রদ্ধা।

গুম্ফার মাঝখানটিতে আছেন পদ্মসম্ভব, পুনাহা আর তারাদেবী। এই সব দেবমূর্তির সামনে ছোট বড় নানা আকৃতির বাটি-ভর্তি জল। চোদ্দটি বড় বাটি ও একশোটি ছোট বাটিতে এই জল সাজানো আছে। আরও বেশী জলও দেওয়া যায় তবে একশো চৌদ্দ বাটির কম হ'লে চলবে না। লামা বললেন—এই জল যত বেশী দেওয়া হবে তেত্রিশ কোটি দেবতার তত আশীষ বর্ষিত হবে। এক মাস নিয়ম ক'রে জল দিলে দেবতার আশীষ পাওয়া যাবে সুনিশ্চিত। শুনলাম পাত্রভর্তি জল থাকার সঙ্গে সিকিমের আর্থিক ভাগ্যও জড়িত। সিকিমীদের বিশ্বাস—যে বৎসর জলে পাত্র পূর্ণ থাকে—সে বৎসর দেশে সমৃদ্ধির সূচনা হয়। কিন্তু জল কমলে দেশে দারিদ্র্য অনিবার্য।

—'তিব্বতীদের যে কোন মঠে গেলেই আপনি দেখবেন সেখানে অহোরাত্র ঘিএর বাতি জ্বলছে। এই বাতি কখনও নিভতে দেওয়া হয় না। উৎসবের দিনে আরও এরকম অসংখ্য বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।' লামার মুখে একথা শুনে মনে পড়ল এক নেপালী ভদ্রলোকের কথা। শিয়াংসিতে তিনি বহুদিন কাটিয়ে এসেছেন। তিনি বলছিলেন—'জানেন, তিব্বতী মঠগুলোতে সারা বৎসর যে পরিমাণ ঘিএর বাতি জ্বলে, আমার মনে হয় সেই খরচে একটি রাজ্য চালাবার খরচ উঠে যেতে পারে।'

গুম্ফার মাঝখানে মুখোমুখি দুটো গদীওয়ালা আসন। সুন্দর তার কাজ। সীটের পেছনে হেলান দেওয়ার জায়গায় মাঝখানটিতে তিব্বতী চক্র। এটি হেড লামার আসন। নীচে একপাশে লাল মখমলের গালিচায় ঢাকা আসন। সেখানে অন্যান্য লামারা বসেন আর ঠিক পেছনেই একটি বড় আসনে বসেন মহারাজ। যুবরাজের জন্যও আসন নির্দিষ্ট করা আছে। দেওয়ালের গায়ে অসংখ্য তিব্বতী গ্রন্থ। এই সব পেটিকা দেখাতেই লামা ব'লে উঠলেন—'তেন্‌জুর'। গুম্ফার ওপরতলায় বারান্দা দিয়ে যাবার সময় দেখলাম একজন লামা মেঝেতে ব'সে এই তেন্‌জুরের কপি ছাপছেন।

গুম্ফার মধ্যে বিচিত্র বাজনা সাজানো। এক জায়গায় সার দেওয়ানো রয়েছে মস্ত বড় বড় শিঙা। আর আছে

বুকল্যান্ডের বই

ক্লাসিক সাহিত্যের ক্লাসিক আলোচনা

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

কালিদাসের কাব্যে ফুল

মূল্য : ৫·০০

"ভারতবর্ষের কোন্ ফুল মহাকবি কালিদাসের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে কেমনভাবে স্থান পেয়েছে এবং তারা মহাকবির মানসলোকের ঐশ্বর্য কেমনভাবে রূপে রসে সঞ্জীবিত করে তুলেছে, তারই একটি অনুপম সার্থক বর্ণনা পাওয়া যায় এই গ্রন্থটিতে। বাস্তবিকপক্ষে গ্রন্থকারের এই প্রয়াসকে এক সুপরিচ্ছন্ন নিপুণ শিল্পকর্মের সঙ্গে তুলনা করা চলতে পারে।" —যুগান্তর

গোপালদাস চৌধুরী ও প্রিয়রঞ্জন সেন সংকলিত

প্রবাদ-বচন

মূল্য : ৬·০০

"সকল ভাষাতেই প্রবাদ-বচন আছে যা শুনতে ভালো, বলতে সরস। আমাদের বাংলাদেশে প্রাচীন বিখ্যাত কবিদের লেখার অংশ লোকের মুখে মুখে প্রবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।...প্রবাদ-বচন বাংলা প্রবাদের এক বিশিষ্ট গ্রন্থ।"

—আনন্দবাজার

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী ৩·০০

নিখিল দাসের

মধুসূদনের কবিজীবন ২·৫০

ধীরানন্দ ঠাকুর সম্পাদিত

জগদানন্দের পত্রাবলী ৩·০০

বাংলা উচ্চারণ কোষ ২·০০

সোমেন বসুর

বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী ৩·০০

বৈষ্ণব সাহিত্যের অসাধারণ গ্রন্থ

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি

পূর্বরাগে দর্শন ও শ্রবণ, রূপানুরাগে দৃষ্টি ও প্রতীপের আরতি, আক্ষেপানুরাগে বেদনাগ্রন্থির আত্মবোধন, মিলনে এক রাত্রির দীপান্বিতা, রসোদ্গারে স্মৃতিতর্পণ, প্রেমবৈচিত্ত্যে অন্তর্মুখীন ভাবোদ্বোধন, মাথুরে নিশাগাহন, এবং ভাবোল্লাসের নিত্যবৃন্দাবন,—'শাশ্বতভাবে আধুনিক' বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশ্লেষণে লেখক এইভাবে নানা রসপর্যায় ধরে বিশ্লেষণ করেছেন। সার্বভৌম সাহিত্যিক আদর্শের মানদণ্ডে বৈষ্ণব সাহিত্যকে বিচার করতে চেয়েছেন লেখক এবং সুধীমহলের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত। তাতে তিনি সিদ্ধকাম। চণ্ডীদাস সর্বাঙ্গীণভাবে আধ্যাত্মিক কবি এবং বিদ্যাপতি মধ্যযুগের ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি,—লেখকের এই মূল সিদ্ধান্ত। আশ্চর্য ভাষায় এবং তীক্ষ্ণদীপ্ত মননশীলতার সাহায্যে লেখক তাঁর সিদ্ধান্ত প্রমাণে অগ্রসর। এক কথায়, বৈষ্ণব সাহিত্যে এমন গ্রন্থ আর ইতিপূর্বে লেখা হয়নি, একথা সাহসের সঙ্গে বলা যায়। মূল্য : ১২·৫০

ভূদেব চৌধুরীর সর্বজনপ্রিয় ও পরিচিত গ্রন্থ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

১ম, ২য়—৮·৫০, ১২·০০

বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৭·০০

অহীন্দ্র চৌধুরীর

বাংলা নাট্য বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র ৪·০০

নটসূর্য লিখিত নটগুরুর প্রতিভা ও কীর্তির ইতিহাস

বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড

১ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬

ফোন—৩৪-৪০৫৮ গ্রাম—বাইবিহার

ডাঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুবিখ্যাত গ্রন্থ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য

মূল্য : ১০·০০

বাংলাদেশের এক যুগের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্বন্ধে বহু উচ্ছ্বসিত মন্তব্যের অংশ—

"বইটির প্রধান গুণ এটি সহজ সুখপাঠ্য। লেখক প্রথম থেকেই আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে পাঠকমনে এমন আকর্ষণ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন যে,প্রায় এই পর্যন্ত পড়ার এই বইটি একটানা পড়ে যেতে ইচ্ছে হয় ...

"সুনিপুণ বিষয়-বিন্যাসে বইটির অন্যতম গুণ ....

"তথ্য সন্নিবেশ ও বিষয় বিশ্লেষণের ব্যাপারেও বইটির বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, এবং এক্ষেত্রে গবেষক ও আলোচনাকারী সকলের গ্রহণীয় আদর্শ এতে আছে .....তাঁর আলোচনায় তথ্য ও সন মন্তব্য অনুপস্থিত ...সাংস্কৃতিক ইতিহাসের আলোচনায় বস্তুনিষ্ঠা ও বিশ্লেষণের কাঙ্ক্ষিত কিন্তু কদাচিৎ দৃষ্ট সমন্বয়ের উল্লেখ্য উদাহরণ হয়ে থাকবে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বইটি।" আনন্দবাজার

ডাঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত নবীনচন্দ্র সেনের

রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস

মূল্য : ৮·০০

গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর

বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প

মূল্য : ৩·০০

"বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পী মানসকে সমগ্রভাবে বিশ্লেষণ করে বোঝবার চেষ্টা এমন অন্তরঙ্গভাবে আর কেউ করেছেন কিনা জানি না।...মানব-চেতনা ও শিল্পপ্রকরণ, মোট মুটি এই চারদিক দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে লেখক বিভূতিভূষণের শিল্প সত্তাকে প্রায় সম্পূর্ণ আবিষ্কার করতে পেরেছেন।" যুগান্তর

হাতীর দাঁতের প্রকাণ্ড শঙ্খ। টুলো বা বড় পুজোর সময় বড় বড় ড্রামের মত তিব্বতী বাজনা, নাগরাই, শিঙা বাজানো হয়। অত বড় শিঙা যে কী করে এক একজন হাত দিয়ে তোলেন আমরা তো তা ভেবেই পেলাম না। সবাই একবার ক'রে হাত লাগালাম—কিন্তু হাত গুটিয়ে নিতে হ'ল। লামা হাসলেন। তারপর নিজেই অক্লেশে শিঙাটাকে মুখে লাগিয়ে সুন্দর একটা ভঙ্গীতে ফুঁ দিতেই গুম্ফার প্রচণ্ড নীরবতা গেল ভেঙে। চারদিক থেকে যেন সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হ'ল অনেকক্ষণ।

ওপরতলাতেও সেই একই দৃশ্য। দেবদেবীদের গায়ে চাঁদি সোনা মুক্তো আর রকমারি পাথরের অলঙ্করণ। তিব্বতী আর্টএর ছড়াছড়ি গুম্ফার প্রতিটি আসবাবে। টেবিলের ওপর একটি লম্বা আকারের বক্সুক কেস্ জাতীয় বাক্স। তার গায়ে লাল নীল সবুজ হলুদ বিচিত্র রঙে সুন্দর চিত্র শোভা। ওপরে জালির কাজ। সেই জালির ফাঁকগুলোতে সুগন্ধি ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। মহারাজা ও কুমারের আসনের সামনে সুদৃশ্য টেবিল। টেবিলের গায়ে লাল নীল, সোনালী সবুজে ড্রাগন আঁকা। তার সঙ্গে নানা বিকট দৈত্য দানব। উৎসবের দিনে মহারাজা এখানে বসেই চা পান করেন। তিব্বতী ধর্ম-মন্দিরে দাদাপিনা বা ভোজের কোন বাধা নেই।

গুম্ফায় এসেছিলাম আরও একদিন। সে দিন বোধহয় কোন উৎসব। দলে দলে লামারা মঠে ঢুকছে। কয়েকটি তিব্বতী মেয়ে খিএর বাতি সামনে জেলে দিচ্ছে। শুনে গেলাম সেদিনে দুশো বাতি জ্বলছে। তাছাড়া অন্যান্য টেবিলে আরও অসংখ্য বাতি। সেদিন গুম্ফার ভেতরটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। দেখলাম একদিকে তিনজন লামা একসার হ'য়ে ব'সে সামনে খাঁটা একটি ছিপ্ট সমস্বরে পাঠ করছেন। মাঝে মাঝে পড়া থামিয়ে প্রথমজন ডান হাতে একটি ডুগ্‌ডুগি এবং বাঁহাতে একটি ঘণ্টা বাজাচ্ছেন। দ্বিতীয়জন সেই সঙ্গে বাজাচ্ছেন খঞ্জনী বা করতাল। আর তৃতীয় লামা তাঁর পাশে ঝোলানো খুব বড় একটি ড্রাম জোরে জোরে বাজাতে লাগলেন। দেবতার সামনে সেদিন অনেক অর্ঘ্য অনেক উপচার। টেবিলের ওপরে অনেকগুলো ছোট বাটিতে ও থালায় আতপ চালের নৈবেদ্য। ছোট ছোট বাটিভর্তি জল এবং সমবেত চিনি ছাঁচে ঢেলে শিবলিঙ্গের মতো ক'রে কি সাজানো। অনেকগুলো লামা একসারে দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠান দেখছে। আমরা বেরিয়ে আসার সময় দেখি, অসংখ্য মেয়ে, পুরুষ, শিশু ডান দিক ঘ'রে ঘ'রে গুম্ফা প্রদক্ষিণ করছেন। গুম্ফা থেকে আমাদের বেরোতে দেখে একজন বৃদ্ধা কি বললেন। আমরা তাঁর ভাষা কিছুই বুঝলাম না। তখন তিনি ইশারা ক'রে তাঁদের সঙ্গে প্রদক্ষিণ করতে বল্লেন।

তিস্তার পার্কের মধ্যে এসে দেখি সেখানে তিব্বতী মেয়ে ও শিশুর ভিড়। অপরূপ বেশে সবাই সেজে এসেছে। কিন্তু কি সেদিনের উৎসব অনেক জিজ্ঞাসা ক'রেও তা বুঝতে পারি নি।

পার্কের মধ্যে পাথর জমানো কৃত্রিম পাহাড়ে বহু বিচিত্র অঙ্কিত। সাজানো বাগানটিতে রঙ বেরঙের অজস্র পুষ্প সম্ভার। এদিকে মেঘ আর রোদে লুকোচুরি খেলা কখন শুরু হ'য়ে গেছে। এই মেঘ—এই আলো। আবার কখনও কুয়াশা। সুউচ্চ তিস্তার পার্কের বাঁধানো চতুষ্কোণ জায়গাটিতে ব্রঞ্জের একটি সুউচ্চ বুদ্ধমূর্তি। নীচে কয়েক ধাপ সিঁড়ি। তারই ওপরে ব'সে রইলাম আমরা অনেকক্ষণ। একটু পর একজন তিব্বতী বৃদ্ধা এসে ঘাসের ওপর ব'সে পড়লেন। গায়ের চামড়া ঝুলে পড়েছে। পরনে আলখাল্লার মত তিব্বতী পোশাক। সাদা চুলের বিনুনী তাঁর মাথা ঘিরে রয়েছে। বাঁহাতে মালা জপতে লাগলেন। ডানহাতে তাঁর রুপোর একটি ডুগডুগি। গায়ের সঙ্গে শেকল। ওপরটি গোলাকার। গায়ে সুন্দর কারুকাজ করা। নীচের হাতলটি তিনি সমানে ঘুরিয়ে চল্লেন আর মুখে একটানা মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ।' মণিপদ্মের ভেতর লক্ষবার এই মন্ত্র লেখা। গুম্ফা থেকে আসার সময় যাদের প্রদক্ষিণ করতে দেখেছিলাম তাদের মধ্যে অনেকেরই একহাতে ছিল ভিক্ষাপাত্র আর অন্যহাতে মালা। তিব্বতী-দের মধ্যে অনেকে আজ উদ্বাস্তু হ'য়ে দেশ ঘর ছেড়েছেন—কিন্তু কেউই বোধহয় প্রাণ থাকতে ছাড়তে পারেন নি তাঁদের জপের মণি চক্রটিকে।

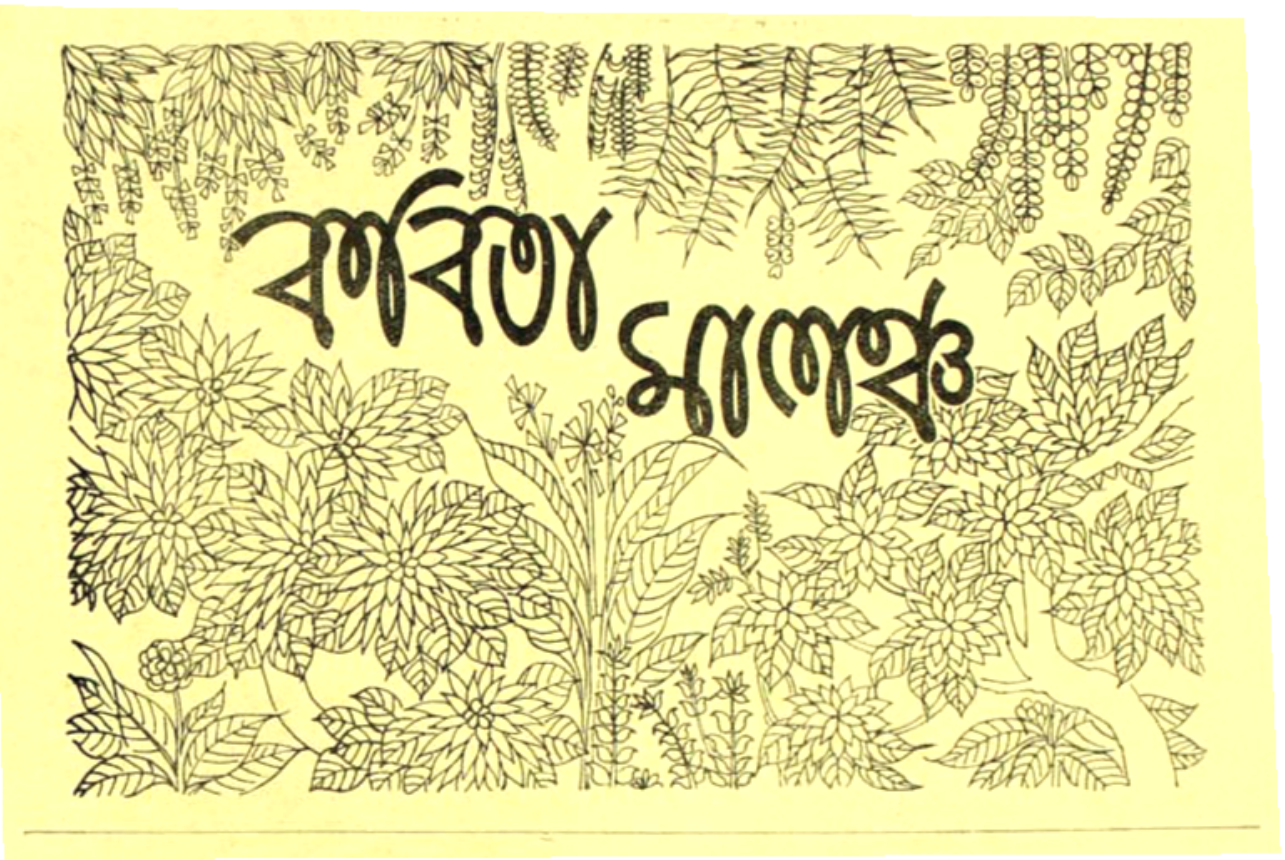
কবিতা মাসিক

বিদ্যোদয়ের বই

অলিম্পিকের বছরে প্রকাশিত হল

অলিম্পিকের ইতিকথা ॥ শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত ২৫·০০

প্রচুর ছবি, ডট্-প্লট্, বিশ্ববিদ্যাত অলিম্পিক-বিশেষজ্ঞ ও ক্রীড়াবিদ্‌গণের ছবি ও অটোগ্রাফের যথাযথ প্রতিলিপি এবং প্রায় একশটিক পৃষ্ঠা সম্বলিত, সুপ্রাচীন কাল থেকে অত্যাধুনিক যুগ (রোম অলিম্পিক : ১৯৬০) পর্যন্ত অলিম্পিক সম্বন্ধে জানবার যাবতীয় তথ্য। এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি সম্পর্কে **শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত** বলেছেন, "....I wonder how a young man of Sri Shantiranjan Sen Gupta's age could write single-handed a voluminous book like **Olympiker Itikatha** packed with facts, figures and records. .....He has really done a masterly job...."

চিত্রদর্শন ॥ কানাই সামন্ত ২৫·০০

প্রবীণ শিল্প-সমালোচক **শ্রীঅজিত ঘোষ** অমৃতবাজার পত্রিকায় বলেছেন, ".....The contents—a collection of essays on fundamental and important aspects of Indian art and on some great artists of Bengal—bear the stamp of a thoughtful and discerning mind, of wide reading and complete grasp of each subject dealt with.....The author presents with considerable acumen a gallery of enchanting art for the reader to appreciate and admire...."

মানব-বিকাশের ধারা ॥ প্রফুল্ল চক্রবর্তী ১২·০০

কুপ্রস্তর-সমাজ স্তরের বৃহৎ ও পূর্ণাঙ্গ এই গ্রন্থখানি সম্পর্কে সাহিত্যিক-সমালোচক **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের** অভিমত : "...বস্তুর বিশ্লেষণে তাঁর (লেখকের) আলোচনা জটিল হয়ে ওঠে নি, সুন্দর ও সরলভাবে গ্রন্থটিকে তিনি এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বিশেষজ্ঞদের কথা জানি না, তবে সাধারণ পাঠকেরা এই বই পড়ে যেমন আনন্দিত, তেমনি উপকৃত হবেন। শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর সাহিত্যিক লেখনী বইখানিকে সরসপাঠ্যতা দিয়েছে।...." বিভিন্ন তথ্যের উদাহরণ-স্বরূপ অর্ধ-শতাধিক অটু প্লেট সংযোজিত।

পরিভাষা কোষ ॥ সুপ্রকাশ রায় ১০·০০

ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব ও দর্শন—এই পাঁচটি বিষয়ের ইংরাজী পরিভাষা, তাদের বাংলা প্রতিশব্দ, বাংলা ও বিশেষজ্ঞগণের অভিমত সম্বলিত। **অমৃতবাজার পত্রিকা** বলেছেন, "...By bringing out this compilation the author has tilled the virgin soil. ...One must have to go through this book to understand books written in Bengali on science and arts subjects. ...It will help all scholars to find out what they have been seeking so long...."

কেরল সিংহম্ ॥ কে. এম. পানিক্কর ৬·০০

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত মুখাক্ষরে বলেছেন, "...মূল লেখকের ভূমিকাটা নিঃসংশয়ে প্রশংসনীয়। কিন্তু তার চেয়ে কম লক্ষণীয় নয় অনুবাদকের কৃতিত্ব। তাঁর ভাষার স্বচ্ছন্দ প্রবাহ, বর্ণনা ও সংলাপ-রচনার শিল্পিক কুশলতা, সর্বোপরি আখ্যানিকার গঠন-পারিপাট্য অল্প ক'জনার মতো মাত্রাজ্ঞান বাস্তবিকই দুর্লভ।..." মূল মালয়ালম্ থেকে অনুবাদ করেছেন **বোম্মানা বিশ্বনাথম্**।

বক্তব্য ॥ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৫·০০

ধূর্জটিপ্রসাদের মতো মনীষা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। সমাজ, ইতিহাস, রাজনীতি, রবীন্দ্র-প্রতিভার বিভিন্ন দিক, কাব্য, সংগীত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁর এই ২৫টি মননশীল বুদ্ধিদীপ্ত প্রবন্ধের সংকলন-গ্রন্থখানি সম্পর্কে **যুগান্তর** বলেছেন, "...বক্তব্য কোথাও নীরস নয়, কোথাও তার আকর্ষণ শিথিল নয়, একবার শুরু করলে শুনতেই হয় শেষ পর্যন্ত এবং প্রতি বক্তব্যের শেষেই কিছু পেলাম এ প্রত্যয় মনে জাগে।..."

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯

শব্দ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সারা দিন কথার জনতা
অন্তচ্ছ আবিল ঘৃণি গ্লানির জঞ্জাল রেখে যায়

তারপর কখনো কখনো
মেঘানের নীল নীরবতা।

একটি হয়ত ক্লান্ত শব্দ তখনও খুঁজে ফেরে নীড়।
একটি কথার তারা চোখ মেলে প্রাণের গভীরে:
একটু মর্মর তোলে কোন দূর কান্তার স্মৃতির।

তারই মাঝে হৃদয়ের স্পন্দনে ধ্বনিত
সৃষ্টিমূল আকুলতা আজো অকথিত।

সমস্ত শব্দের মাঝে
যে বিদ্যুৎ-চঞ্চল শূন্যতা:

তাই যদি খুঁজে পাও
উদ্ভাসিত চেতনায় নিরর্থক সব মুখরতা।

দেখা

হরপ্রসাদ মিত্র

সলজ্জ সংবেদে যা দেখিনি তাই
আড়ালে হারায়, তার স্মৃতিও হারাই।
হলুদ, গোলাপী, শাদা, সোনালী, নীল—
ঘেঁষাঘেঁষি রঙে রঙে মিলছেই মিল।
হে কাপ্‌সা রূপবোধ,—তোমাকে জানাই
দুচোখে কেবলই হোলো দৃশ্যে বোকাই!

আজকে এসেই দেখি অজানা গাঁয়েতে
পাকা ফসলের আলো চাষীর গায়েতে।
তাহলেও গোরু, মোষ, চাষীরা সবাই
প্রাণের দড়িতে বাঁধা কালেরই জবাই।
তালগাছ দাঁড়িয়েছে বাঁধের উঁচুতে।
একটু মেঘের পাঁজ তুলোর মতন।
কয়েকটি চিল ওড়ে, কয়েকটি দিন—
ক্ষণ আয়ু মানুষের, ক্ষণিক জীবন!
আমি তাঁকে দেখলুম তিনিও আমাকে
হয়তো দেখেন নানা না-দেখার ফাঁকে।

নীড়

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

অনেক প্রত্যাশা নিয়ে মাটি-খড়ে গড়ে তুলি নীড়।
উপরে উন্মুক্ত থাকে আকাশের বিস্তার নিবিড়,
নিম্নে খরস্রোতা নদী, নক্ষত্রের প্রাচুর্য আলোর
চন্দনের মত যেন ললাটে-শরীরে সিক্ত ওর।
দিনে খর সূর্যদাহ, সন্ধ্যায় উজ্জ্বল হয় চাঁদ।
আমাদের করতলগত বুঝি আস্বাদ আহ্লাদ।
তবুও অপূর্ণ থাকে হৃদয়ের অনেক কিছুই—

একদিন ভরে যায় নীড়-মধ্যে মেকালিকা, ছুঁই।
সমুদ্র-ঢেউয়ের মত আকাঙ্ক্ষার শেষ বুঝি নেই।
এক গেলে আর লয়ে অভ্যস্ত যে জাল বুনতেই।
অঙ্কুর উদ্গত হয় উজ্জীবিত কত অভীপ্সার,
মানে না ছন্দের বাধা দুর্নিবার অগ্রগতি তার।
বিচূর্ণিত হলে নীড় পল্লবিত আবার নতুন,
শরৎ-হেমন্ত গেলে উদ্ভাসিত উদ্বিগ্ন ফাল্গুন।

ছাখো এই মুহূর্তগুলোকে

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

ছাখো এই মুহূর্তগুলোকে। শূন্যগর্ভ অন্ধকারে
সহসা ঝলসে ওঠে এইসব দীপরশ্মি রেখা
হৃদয়-গুমোট ভেঙে। নীলকান্ত স্রোতের জোয়ারে
বিরল সমুদ্রপাখী স্নান করে। ছায় যেন দেখা

প্রত্যাশার সিক্ত ঢেউ। ক্ষীরকের মতো স্বপ্ন জলে
জীবনের নিভৃত ছায়ায়। বহে ও বিছাতে ঢেউ
সাড়া আনে অনন্ত শিকড়ে। দৃঢ়বদ্ধ হাতে কেউ
আকাঙ্ক্ষায়-আকাঙ্ক্ষায় স্ফীততর করে পলে-পলে

সুপ্রথিত প্রেরণাকে : উষ্ণতায় অনন্ত স্পন্দনে
এইসব মুহূর্তেরা সঞ্চারিত করে ভালোবাসা
বুকের গভীর কোণে। অন্তরালে বিক্ষিপ্ত মননে
রেখে যায় মুঠি-মুঠি কোতজয়ী মুকুলিত আশা।

সর্বদা সক্রিয় নয়, মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎ-রেখায়
কালোর গুমোট ঠেলে চেনা যায় মুহূর্তগুলোকে :
আর্তিতে স্পন্দিত মুখে নবারুণ আশা দেখা যায়,
সকল মুহূর্তগুলো রাখে সই সারা বিশ্বলোকে।

এইসব মুহূর্তেরা আছে তাই পৃথিবী, আকাশ
প্রেমিকের ভালো লাগে, নাবিকের হৃদয়ে আশ্বাস ॥

দূরের বন্ধু

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

সে রজনীগন্ধা আজো থেকে গেল চেনার আড়ালে।

অথচ সুগন্ধে তার প্রতিদিন ঘরের উঠোন
ভোরের আলোর স্পর্শে সে ফুলের পায় নিমন্ত্রণ :
অচেনা দূরের বন্ধু, তাই নিয়ে কী সুর বাজালে!

কতোবার দেখা হোলো পথে পথে মেঘের আভাসে
স্টেশানের কোনো প্রান্তে, শিরীষের সবুজ ছায়ায়
কতো মানুষের ছবি সারাদিন মুছে, নিভে যায় :
একটি পরম ছবি, মৃত্যুহীন আমার আকাশে।

সেদিন দেখেছি আমি দীর্ঘদিন অরণ্য সঞ্চয়
বিছানো পিঠের পরে, চোখে যেন নিবিড় বেদনা
প্রার্থিতকে খুঁজে খুঁজে পেয়েছে সে অথবা পেল না :
সমগ্র যৌবন যার সমুদ্রের উদার বিস্ময়!

সে গোপন দেখা থেকে বড়ো ক্লান্ত আমার জীবন
কী করুণ গন্ধ দিয়ে ভরে আছে, আমি জানি, তাই
পৃথিবীর ভালবাসা দিল না যে কোনো সান্ত্বনাই,
শুধু এক বিরহের অন্তহীন শ্রেষ্ঠতম ধন।

অচেনা দূরের বন্ধু থেকেছে যে চেনার আড়ালে
একটি নিভৃত দীপ সন্ধ্যাবেলা সে-ই শুধু জ্বালে।

মর্ত্যে ও ত্রিদিবে

আবুলকাশেম রহিমউদ্দীন

সমস্ত ফুটপাথ জুড়ে সে-লোকটারই একক বসতি :
মাথার ওপরে শুধু বর্ণভিক্ষু আকাশের মুখ
ঝড়-বৃষ্টি, রৌদ্রের কুটিল ভাষ্যে কলহ-মুখর !
সামনে ও পেছনে তার দুরেক জন্তুর বাসি শব
নারীকে অর্পণ করে কটুগন্ধে দীর্ঘ পরমায়ু,
এবং পাশের নালা টেনে আনে দূষিত তরল
বনেদী অঞ্চল থেকে, যেন কোনো বারোয়ারী নারী
যৌবনের পঙ্কমাখে দেহ পোতে সুলভ নরকে
প্রত্যহ লেহন করে ইতরের নির্লজ্জ কামনা !

দিন যায় ; সে-লোকটা জঞ্জালের বিকল্প শয্যায়
শুয়ে থাকে, ব'সে থাকে ; তার ক্ষত-নিঃসৃত কাতর
নেশায় বেহুঁস হয়ে পান করে তান্ত্রিক মাছিরা।
ওকে দেখে দয়ায় অথবা দম্ভে কিছু পথচারী
কখনো কৃপণ মুদ্রা ফুটপাথের পাথরে বাজালে—
তা' দিয়েই বাসি রুটি, সামান্য পচাই কিংবা তাড়ি
সে আনে মাটির ভাঁড়ে ; তারপর নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায়
সে নিজেরই শ্রাদ্ধে ব'সে জীবনের পিণ্ড ভোগ করে।

ঠিক পর-মুহূর্তেই সম্মুখের বিশাল আকাশে
সজ্জিত শিখর তুলে যে-প্রাসাদে মর্ত্যের ত্রিদিব—
তরুণী রাত্রির হাত আলো জ্বালে ঝকে ঝকে তার।
স্মিত কটাক্ষের মতো ঠিকরে পড়ে শিখার উদ্ভাস
সারি সারি স্বর্গমুখ জানালায় ; অলক্ষ্যে কখনো
আঁচল হাওয়ায় তুলে নগ্নবাহু অপ্সর-দুহিতা
দাঁড়ায় বারান্দা মেঁসে, কিছুক্ষণ চোখের কৌতুক
বাইরের আঁধারে ছুঁড়ে স্পর্শ করে রাত্রির যৌবন ;
তারপর চলে যায় কেশগুচ্ছ হেলায় নাচিয়ে !

তখনই সে-লোকটার নেশাতুর চোখের ভ্রমর
চকিতে ধাবিত হয়, চুমু আঁকে অপ্সরীর কেশে ;
আনন্দ ফুলের মতো জন্ম নেয় মৃত ইচ্ছা তার ;
মুহূর্তেই মনে হয় : সে-ফুটপাথ উদ্যানের মতো
সুশোভিত ; রাশি রাশি আবর্জনা ফুলের বিস্তার,
এবং পাশের নালা কোনো এক পৌরাণিক নদী।

মন তার উড়ে চলে মেঘে মেঘে, নক্ষত্রের দেশে ;
তখন সে মনে করে : অপ্সরীর পেয়েছে নাগাল ॥

দু'চোখ

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

দু'চোখ বুজলে খোঁজে একা ঘরে স্বপ্ন !
কাকে যেন চায় দু'চোখ জড়িয়ে দেখতে :
রাত্রি নামলে প্রবল অন্ধকার।
দু'চোখ নিমিষ এ-দু'চোখ বলো কার !

আকাশ তাকালে কাপসা পৃথিবী উজ্জ্বল !
পৃথিবী তাকালে ঝলমল চায় দেখতে !
দিনের প্রবাহে স্মৃতিকণা—রোদ্দুর !
দু'চোখ তাকায় সে-চোখে কদর !

ঘুমিয়ে পড়লে দুটি চোখ ঠায় চেয়ে।
সারা পৃথিবীর কত বর্ণালী চোখ
সুখনিশিঘোরে পলক হারিয়ে ফেলে :
এ-দু'চোখ নাকি লাখো চোখ দেয় মেলে !

চোখে চোখে খুঁজে স্মৃতি ফেরে একা একা :
রাত্রি অন্ধ দিনের ফেনিলতা।
পলে পলে তাই কেঁদে মরে এই মন।
চোখ খোলে বোজে, দৃষ্টি-বিভ্রমণ ॥

রক্তক্ষরা

বটকৃষ্ণ দাস

না আমি যাবো না। যদি অন্য কেউ যেতে চায়, যাক।
আমাকে থাকতেই হবে। নিরাশ্বাস, নিঃসঙ্গ প্রান্তরে
পরিকীর্ণ শূন্যতায়—দুঃখে, শোকে যন্ত্রণার জ্বরে
আমাকে ফোটাতে হবে একটি ফুল অতন্দ্র, নির্বাক
সন্তানবৎসলতার ডালে। রক্তক্ষরা, নিষ্ঠুর শপথে
আমি যে আবদ্ধ বাঁধা তার কাছে অসম্ভব ব্রতে।

আশৈশব দিন কাটে। একটু অন্যমনস্ক হ'লেই
অনিবার্য শাস্তি তার। কালের রাজত্বে নেই ক্ষমা।
অথচ একাগ্র ধৈর্য, আন্তরিক যত্নের সুষমা
দিয়ে গাছ বাঁচালেও,—অমর্ত প্রতিভা ছাড়া সেই
গাছ তার, নিজেকে নিঃশেষ ক'রে যন্ত্রণায়, ফুল
ফোটাতে পারবে না। তাই প্রতিদিন ব্যর্থতা বিপুল।

তবুও নির্মম দাবী কখনো ভোলে না মায়াবিনী,—
বলে: দাও, ফুল দাও। বহু কষ্টে যে-গাছ বাঁচিয়ে
রেখেছি, দেখে না তাকে। বলি আমি: রক্তমূল্য দিয়ে
যে-ফুল ফোটাতে আজও ব্যর্থ আমি, এবার মালিনী
তুমিই ফোটাও তাকে আশ্লিষ্ট তোমার স্বরাজে—
ব্রত-উদ্যাপনে আমি অসমর্থ, অবসন্ন সাঁঝে।

অথবা আমাকে তুমি ফুল করো। বিশাল মৃত্যুর
উজ্জ্বল, গভীর রক্তে অন্ধকারে সান্দ্র স্তব্ধতায়
আমাকে ফোটাও আজ সমুদ্রের ঐপদী হাওয়ায়,
স্নিগ্ধ নক্ষত্রের জলে। আমার ব্যর্থতা করো দূর।
আমাকে সম্পূর্ণ করো। মৃত্যুহীন প্রতীকে মেশাও।
একবার ফুল হই। তারপর ছিঁড়ে তুলে নাও॥

সেদিনের সেই রাতে ওরা এসেছিল

লিওন দামাস

অনুবাদ : সৌমেন দত্ত

সেদিনের সেই রাতে ওরা এসেছিল,
আমাদের 'টমটম' (যখন)
ছন্দ এবং ছন্দের
দোলায় মাতাল
দোলায় মত্ত ছিল।
(এই) দুচোখে ছিল নেশার ঘোর
দুহাতে ছিল পাগলামি,
শুধু থামল চরণ—'স্ট্যাচু'র মত স্থির!

সেই সেদিন থেকে,
কত জনই যে মরেছি আমরা—হিসেব নেই।
যেদিনের সেই রাতে ওরা এসেছিল,
আমাদের 'টমটম' (যখন)
ছন্দ এবং ছন্দের
দোলায় মাতাল
দোলায় মত্ত ছিল।
(এই) দুচোখে ছিল নেশার ঘোর
দুহাতে ছিল পাগলামি,
শুধু থামল চরণ—'স্ট্যাচু'র মত স্থির!

[কবিতাটিতে আফ্রিকার এক উৎসবমুখর রাত্রির স্বতঃস্ফূর্ত নৃত্যোল্লাসকে ছন্দের মধ্যে দিয়ে ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ঔপনিবেশিকবাদীদের অতর্কিত আগমনেরও ইঙ্গিত চিত্রিত হয়েছে—এর দ্বিতীয়াংশের আকস্মিক ছন্দপতনে।]

স্বতন্ত্র নাম

গোবিন্দ চক্রবর্তী

থাক সেই কিম্বদন্তী :
কবে বা কোথায়
অকস্মাৎ ভরা পথ নৌকাডুবি হ'ল—
কোন্ সে অতল থেকে
মৎসকন্যা নিয়ে গেল নাবিকেরে ডেকে :
তারপর কী কৌশলে,
লুঠ ক'রে রাজার ঐশ্বর্য
এবং সে কুন্দশুভ্র কন্যার যৌবন
পাতাল-ফেরার ফের ফিরলো বন্দরে।

তারও পর
রাজা হ'য়ে—সাম্রাজ্যের সাথে
বহালো রক্তের বন্যা অবাধে-অগাধে
দেশে-দেশে, নগরে-নগরে :

এবং সম্রাটই হ'ল।

থাক সেই কিম্বদন্তী—
শেষ যার পরিত্যক্ত
শুচতুর শিরস্ত্রমায়।

আমি জানি—ইতিহাস
এর থেকে দুঃসাহসী ঢের,
খোলানেলা আদ্যোপান্ত প্রচ্ছদ ও কাহিনী :
সুপ্তি-সুপ্তি দুইই যার জানা।
রাত্রির অনন্ত পটে—
এ কেবল দু'একটি না খদ্যোতবিলাস
আঁধার বাড়ানো আরও
ধাঁধানো দু'চোখ।

নির্জন প্রার্থনা

পরিমল চক্রবর্তী

হৃদয় থেকে প্রণয় নিয়ে করুণাঘন রাতে
হে মনোলীনা, গাও না সুরেলা গান :
দেখবে অনেক ব্যথার প্রপাত
দেখবে হাজার স্মৃতি-পারিজাত
করবে কেবল—করবে পূত মনের বাগান ॥

প্রণয় থেকে হৃদয় নিয়ে দিনের রাঙা হাতে
হে মনোলীনা, পরাও না শ্বেতশাখা ;
দেখবে অনেক দূরের আকাশ
দেখবে গভীর মায়াবী আভাস
ডাকবে তোমায়—প্রাণের পটে স্বপ্ন হ'বে আঁকা ॥

হৃদয়ে নেখে স্মৃতির সুর
ঠেকছে যেন কতোই দূর
তোমার প্রেম, বাধাবিধুর
গহীন চেতনায়—
প্রণয়ে তবু সুখের কড়
কাঁপিয়ে মেরে বুকের পর
হারানো কোনো গভীর বেদনায় ॥

ছিলো, ছিলো
এ গল্পেরও কোনো এক লুপ্ত পূর্ণচ্ছেদ।
বিদ্যুৎচকিত ক'টি লাঙলের ফালে
কী আবেগ উৎক্ষিপ্ত সহসা
লিখেছে নোতুন নাম ক্রান্তির অক্ষরে—
আজও যার চিহ্ন-অবশেষ
উষার সংকেতে জ্বলে নিশীথ আকাশে
সেই স্মৃতিরেই যেন
দীপ্তি দিতে চায়।

যতই রঙীন হোক ঝিনুক-প্রবাল—
শংখের স্বতন্ত্র নাম
সর্বত্রবিদিত।

চিত্রণ

সুলেখা ঘোষ

ছিলিমি পাতার গলি, ঘনকৃষ্ণ তমসায় ভরা
মনে হয় বহুযুগ রক্তরশ্মি দেয়নিকো ধরা,
দুধারে দাঁড়িয়ে বুঝি প্রতীক্ষায় রত
লোনাধরা মাটি মাটে ইটেগাঁথা বাড়ীগুলি যত।
ভেন্টালের তাইলের মাঝে
অন্ধকার চারাগাছ এখানে ওখানে হয়ে আছে।

সরু গলি দুই পাশে তার
জমে আছে আবর্জনা নেই যার কিছু দরকার।
ভাঙাটিন, ছেঁড়াকাঁথা, উনুনের গাদাকরা ছাই
দীর্ঘ পথ করেছে বোঝাই।
মাঝে মাঝে লঘুকা বাতাসে
তুপীকৃত জঞ্জালের সোঁদা সোঁদা গন্ধ ভেসে আসে।

আকাশের নীলিমাকে ঢেকেছে সেথায়
উঁচু বাড়ী আর বুঝি উনুনের পাকখাওয়া
পীতাভ ধোঁয়ায়।
বহুগলি, রুদ্ধ ঘরে কেটে যায় বেলা
আশার তরঙ্গে বুঝি আজও ভাসে তাহাদের
জীবনের ভেলা।

'দুঃসহ যন্ত্রণানীল মুখে
তাদেরই সন্তান ঘরে খোঁকে বুঝি কঠিন অসুখে—'
রিক্ততার হাহাকারে জোটে না ওষুধ
তারপর কোথা ওঠে মরণের ক্ষণিক বৃদ্বুদ।

মরেও বাঁচতে চায় ওরা তবু হায়:
গড়ে কি সোনালী স্বপ্ন জীবনের শ্মশান শয্যায়!
জানি না কী তাহাদের মৌনমূক বাণী,
বিশ শতাব্দীর এরা হতভাগা দরিদ্র কেরাণী।

পুরস্কার

মাণিক মুখোপাধ্যায়

সেদিন বিদগ্ধদের এক সভা
চন্দন পুষ্পস্তবক আর
সম্মানের স্তোকবাক্যে
যখন সেই ঘৃণ্য স্বৈরাচারীকেও
'বিদগ্ধতম' বলে
জয়ের মালা পরিয়ে দিলো,—
হায়, তখন হঠাৎ মেঘগুলো
অযৌ লজ্জায় মিলিয়ে গেলো শূন্যে···
আর সেই মনুষ্যত্বের বিকৃতিকে
ধিক্কার দিতে দিতে
ক্রুদ্ধ প্রকৃতি তার
অদৃশ্য হাত দুটো বাড়িয়ে বল্লে:
এই নাও
হে মানুষ, তোমার
বিদগ্ধ শঠতার পুরস্কার—
এই চিন্তার মরুভূমি॥

শিল্পসুধা

শংকর চট্টোপাধ্যায়

কে গোপনে অঙ্গে থাকে, রক্ত মধ্যে স্রোতধারা, প্রেম?

ভেসেছে মান্দাস জলে, দূরতীর্থে কেউ কী যাবে না
তাহার নিলয় কোথা, রক্তছায়া, তিন্দার্ধ বসুধা
বিমুখ করো না তারে কুলদল বনভূমি বিনা
কেমনে লুকাবো বলো কৃতপাপ, বাভিচার, ক্ষুধা।

সম্ভোগে মাতাল কেউ, পুণ্য লোটে মুখোস মিছিলে
তারা আনে রণশয্যা, মহামারী, চতুর্দিকে পাপ
গরলে ভাসায় ভূমি, মরণার্থী মগ্ন থাকে একা
কোটায় বিষণ্ণ শান্তি, নষ্টশোক, মৌন পরাজয়
অনায়াসে সঙ্কা খোলে অশ্রুসিক্ত নিহত হৃদয়।

তাহারে ফিরায়ে লহ স্রোতধারা অসীম অঙ্গনে।

উত্তরঙ্গ

মায়া বসু

কিছুতে পারিনা আর এ অবুঝ মনটাকে নিয়ে !
সীমাহীন তরঙ্গের এ উদ্দাম দুর্বার প্রবাহ—
থামাই কী দিয়ে ?

আকাঙ্ক্ষার ফুলগুলি তারা হয়ে ফুটে ওঠে—
নিকষ আকাশে—

বাসনার সোনাঝরা রাতগুলি ঝরে ঝরে যায়—
উদাস বাতাসে !

সে হাওয়ায় কোন সুর সুমধুর বাজে বারে বারে ?
বসন্ত পরজে আর কোমল গান্ধারে ?

তারি তালে তাল দিয়ে কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মত—
এ দুরন্ত উধাও সতত।

তুমিও ডেকো না তাকে ! থামায়ো না তার
সে গতিকে
—বাড়ায়োনা জীবনের বিরতির অলস যতিকে।

যদি পারো নিয়ে এসো প্রত্যাসন্ন ঝড়ের আবেগ,
মুছে নিতে মুহুর্মুহুঃ এ সত্তার সংশয়ের মেঘ !
পারো যদি ভেঙে দাও,—হৃদয়ের দুই উপকূল
আশ্লেষের বন্যা আনো, তীব্র বেগ তরঙ্গ বিপুল।
শূন্য বুক ভরে আনো বৈশাখের—
প্রজ্বলন্ত প্রেম প্রতিশ্রুতি।
আসন্ন বর্ষার মেঘে এ অন্তর—
হোক অঙ্কুরিত।

সায়কের তীক্ষ্ণ ক্ষতে শতধারে নামুক বর্ষণ,
রন্ধ্রে মৃত্তিকা বক্ষে মৌসুমীর তীব্র আকর্ষণ।

তুমি আছ

চিত্তরঞ্জন মাইতি

সারাদিন কর্মক্লান্ত
তারপর ফিরে আসি আপনার ঘরে,
মনে হয় তুমি যেন আছ
মৌন দৃষ্টি মেলি আজো পথের উপরে।
তুমি আছ এই মমতায়
আমার সমস্ত শ্রান্তি কোথায় লুকায়।

ফুল আমি ভালবাসি তাই
রেখে দিতে সাজিভরে রোজ ফুল তুলে,
আজো যেন ভুলে
মনে হয় গন্ধ তার পাই।

আজো যেন শাঁখ বাজে আসন্ন সন্ধ্যায়
তুমি আছ সংসারের কর্মব্যস্ততায়।
এই ছবি সমস্ত সময়
আমি দেখি মুগ্ধ অনুভবে
তুমি যেন করে
দিয়ে গেছ মন ভরে অশেষ সঞ্চয়।

বর্ষার মেঘে মেঘে করে যেন ঝরেছিল জল
হেমন্তের মাঠ ভরে তারই স্মৃতি সোনার ফসল।

অঙ্কুরের উদ্যত জিজ্ঞাসা,
মূর্ত হয়ে ভরে দিক ফসলের পরম প্রত্যাশা।
শান্ত হোক বল্গাহীন দুরন্তের—
এ উদ্দাম গতি—
উত্তরঙ্গ এ অন্তর অচপল—হোক স্থিরমতি।

———

এবং এই ভালোবাসা

মলয়শংকর দাশগুপ্ত

তথাপি এই মনের শিকড় অনেক দূর
ছড়িয়ে গেছে—অনেক দূর ছড়ানো সুর
মাটির বুকে মন রেখেছে, মুখ লুকিয়ে
শান্তি পায়: শান্তি পায় তোমার কোমল বুকের সোহাগ
স্পর্শ পায়: পদ্মপাতায় ভাবনা দোলে, বলো কী-এ !

যন্ত্রণারই বিপুল দানে সৃষ্টি হবে এ বিশ্বাসে
সম্ভবনা পায় অদ্ভুত জীবন, কী নিঃশ্বাসে
ভাবনামাখা টুকরো কথার আধাল পাতাল
ছড়িয়ে পড়ে, ছড়িয়ে পড়ে, অনুভবেই হৃদয় মাতাল
মনের সেতু ভালোবাসার রূপের রাগে

পাশাপাশি পাশাপাশি . তথাপি এই মনের শিকড়
তোমার নরম মাটির বুকে ছড়িয়ে পড়ে ছড়িয়ে পড়ে
সম্মিলিত ভাবনা দোলে ছায়া পড়ে, এ-ঘর ও-ঘর

তোমার ভালোবাসার প্রেমে আমার
ভালোবাসার সোনা
ঊর্ধ্ববাহু অগ্নিকণায় সৃষ্টি করে স্বর্গ সীনা :
হৃদয়ে ঢেউ সমুদ্রেরই, অদ্বিষ্ট স্বাদ যতই নোনা
হোক না তবু, আমার হৃদয় মধ্যকূলের প্রেমেই মাতাল।

বাসনা সফল হোক

শান্তশীল দাস

বাসনা সফল হোক—এ আমি চাই না কোনদিন ;
চাওয়া-পাওয়া শেষ হ'লে এ জীবন রূপরসহীন
হয়ে যাবে একেবারে ; সে যে বড় বিবর্ণ ধূসর ;
অর্থহীন দিনগুলি অপচয় করা শুধু—
মৃত্যু হতে আরো ভয়ঙ্কর।

নানা রঙ দিয়ে ভরে বাসনার ডালি,
প্রতিদিন এক একটি কামনার গন্ধদীপ জ্বালি'
রব আমি। শেষ নয়, চাই নাকো শেষ ;
এ আমার পথচলা হোক না অশেষ ;
এই পথ কোনদিন যেন না ফুরায়।

দিন আসে, দিন কেটে যায়,
রাত আসে, শেষ হয় রাত ;
এমনি এমনি করে চলুক না। যবনিকাপাত
কোনদিন এ নাট্যের নাহি যেন হয় ;
কভু যেন সেই দুঃসময়
নাহি আসে—আমার সকল চাওয়া-পূর্ণ-করা ক্ষণ
সে লয় ভীষণ !
অন্তহীন বাসনার পথ বেয়ে বেয়ে
চলুক চলুক ছুটে এ আমার অভিসারী
অতৃপ্ত জীবন।

তুমি যখন কাছে এলে

সিদ্ধার্থ গঙ্গোপাধ্যায়

তুমি যখন কাছে এলে তখন আর হৃদয়ে রং নেই,
দেবদারুর দীর্ঘো-ঘেরা ছায়া-করুণ শীর্ণ মেঠো পথ,
ভরে না আর এপ্রিলের স্তব্ধ শোক
ফুলের সম্ভারে,
সোনায়-আঁকা সম্ভাবনা দেয় না দেখা
প্রাকার পেরোলেই।

তুমি যখন কাছে এলে তখন সব অনুভবের নদী
অনেক দূরে অচিন কোনো গল্পে-শোনা
তেপান্তর মাঠে
হারিয়ে গেছে ; স্তিমিত-ফণা সাপের মতো
আমার এই মনে
লুটিয়ে আছে যৌবনের তুলিতে-আঁকা নানা
রং-এর স্মৃতি।

তুমি যখন কাছে এলে তখন সব ভালোলাগার
গান
ফুরিয়ে গেছে ; তখন এই ছায়ায়-ঘেরা
তমালতরু দেহ,
শীতের মরা ডালের মতো অনেক উঁচু
আকাশ-ভরা নীলে
হাত বাড়াল, হারিয়ে গেলো মেঘের ভিড়ে,
সুদূরে হোল ম্লান।

অশ্রুমতী

সত্যব্রত চক্রবর্তী

এ ঘাটে রোজই তো দেখি সেই এক অশ্রুমতী মেয়ে
নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে। এ নদীর কাকচক্ষু জলে
কি এক আশ্চর্য ছবি
ওই দুটো ভীরু চোখে মগ্ন হয়ে দেখে চেয়ে চেয়ে
কান্না তার দুই কূলে শব্দহীন প্রতিধ্বনি তোলে।

কে তুমি অজ্ঞাত কন্যা ভাঁটার প্রহর গোন
এ ঘাটের ঢালু কাকচরে ?
এখানে ঢেউয়ের নীলে দেখোনিকি আকাশের ছবি,
স্রোতের গভীরে থেকে কি করে সে যন্ত্রণায় কাঁপে !
আবারও দেখবে যদি দিন শেষে সন্ধ্যে হলে পর
এখানে দাঁড়িও এসে।

আশ্বিনের সোনা শস্যে নৌকা তার পূর্ণ করে নিয়ে
এখানে ভাঁটার মুখে যে নায়ক হারিয়ে গিয়েছে
বৃথাই প্রতীক্ষা তার ; উন্মুখ দাঁড়িয়ে থাকা মিছে।
সে গেছে অনেক দূরে এ নদীর অন্তর ঘাটে
এখানে আগল টেনে পেছনের স্মৃতির কপাটে।

ফিরে চলো অশ্রুমতী এইবার নীড়ের সময়,
নদীর সান্ত্বনা শুধু—সুরভিত যন্ত্রণার জয়।

অসমাপ্ত

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

পথে যেতে যেতে থেমে, পেছনের নিস্তব্ধ অতীতে
তাকালে হঠাৎ কিছু অবিমিশ্র স্মৃতি মনে আসে।
যে চঞ্চলতা—চিত্র বুকে বহে ভোরের চড়াই
জানালায় ছুটে আসতো সূর্যের সংবাদ জেনে নিতে—
কিংবা দূর কৈশোরের শিউলীতলার অবকাশে
নির্ভার গন্ধের মুগ্ধ সাজি হাতে একা ছুটে যাই :
—সব মনে আছে, থাকে, যেন এই রক্তে দাবী তার
গতির আড়ালে রাখে কিছু স্থির সাহসী উদ্ধার।

অভিজ্ঞ শরীর আজ কোন পথে যেতে হ'বে বলো !
এই স্বেচ্ছা-নির্বাসন গতির গভীর পরিণাম
মুহূর্তের অন্ধকারে পরাস্ত করেছে চেনা আলো।
যে সমস্ত অভিজ্ঞতা শুধুমাত্র প্রেমে মনোনীত
—কাহুন কেমন শিল্প ! পথে যেতে কোথা তার নাম
তীব্র হয়ে উচ্চারিত ! যদি দুঃখ অগভীর, ভীত !!

তোমাকে পেলাম

দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

মনটি বড়ই ভার আজ সারাদিন,
কিছুই লাগে না ভালো। ইটের খাঁচায়
বিষণ্ণ বন্দীর চোখ শুধু দুই বেলা
তোমারেই চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়ায়।

খুঁজিতে খুঁজিতে শ্রান্ত হলো চোখ দুটি :
কোথায়, কোথায় তুমি ? বন্দির শহর
আমারে ঘিরিয়া হাসে দেয় না উত্তর :
এ গোলক-ধাঁধা হতে কবে পাব ছুটি ?

হঠাৎ পেলাম ছুটি সত্যি একখানে।
হঠাৎ সবুজ হলো সেখানে পৃথিবী।
ঘাসের জাজিম পাতা তরুছায়াতলে
শ্রান্তি-হরা সমীরণে, পতঙ্গের গানে

কি শান্তি পেলাম আহা ! সহসা চাহিয়া
দেখি তুমি সেইখানে আছ দাঁড়াইয়া !

সে শুধু আসে না

প্রফুল্লকুমার দত্ত

হাসপাতালে কাটে দিন, দীর্ঘ দিন ধরে একটানা :
নিয়ম ওষুধ আর একই পথ্য নিত্য খেয়ে বাঁচা
মৃত্যু থেকে। এক তিল অনিয়মও একেবারে মানা ;
শারীরিক ক্ষত সারে, মানসিক ক্ষত হয় কাঁচা !

ভিজিটিং আওয়ার্স গুলো প্রত্যহ-ই সঙ্গে করে আনে
দু'একটি সুহৃদ-মন ; যার জন্যে মরে বেঁচে ওঠা
সে শুধু আসেনা ! সব সংবাদ সে গোড়া থেকে জানে—
লুব্ধ পথে দৃষ্টি রেখে সন্তোতক ব্যর্থ মাথাকোটা !

ভিজিটিং আওয়ার্স যায় ! ঘুমহীন এই অন্ধকূপে
যাকে চাই সে আসেনা—বুঝি না এ-রহস্যের মানে :
অথচ ঘুমেরই মত কখন যে অতি চুপে চুপে
সে এসে স্বস্তির হাত বুলোবে কপালে, কে তা জানে !!

বৃষ্টি

তারাপদ রায়

রাত্রি অন্ধকার, তুমি বলেছিলে, বলেছিলে,
পথে অন্ধকার
আকুল বৃষ্টির রেখা আর্দ্র আষাঢ়ের ধারাজলে
নিশ্চিহ্ন পথের সীমা এই রাত্রে এই ঘোড়ো
উদ্দাম বাদলে
কোথাও যাওয়ার নেই, কোথাও যাবে না
কেউ আর।

কোথাও যাই নি আমি, রোদ বৃষ্টি মগ্ন কুয়াশায়
এই ঘরে চিরকাল শ্রাবণের ব্যাকুল মাধবী
বর্ষ-শেষ রজনীতে রেখে গেছে এক-ই ম্লান ছবি
সুদূরে বিচ্ছিন্ন মেঘ বার বার ভেসে গেছে
বিজন হাওয়ায়।

ধুলোর পুরনো গন্ধ, মৃত বকুলের ভালোবাসা
স্তব্ধ জলে স্মৃতি হয়ে বৃন্তবদ্ধ কুমুদকহ্লার
কবে বৃষ্টি নেমেছিল বসন্তে শরতে বারবার
অতর্কিত আশঙ্কায় তবু ঘরে ফিরে ফিরে আসা॥

নতুন বন্দরে

প্রীতিভূষণ চাকী

ছেদি ছেলের ঘুমের মতো
ঢেউগুলো শান্ত হ'য়ে এলো;
হিংস্র ভয় দূরের দ্বীপে নির্বাসিত।
আলোর শিউরা বন্ধ করেছে
পুতনার মতো অন্ধকার—

গুণ টানো মাঝি!
ঐ তো বন্দর!
তোমার বিন্দু বিন্দু ঘামে
সূর্যের চুম্বন তোমাকে আত্মহারা করছে না!

ঐ তো শোনা যাচ্ছে
সাঁওতালদের উঠোনে মাদলের শব্দ,
হাওয়ার হাতে আনন্দ-শঙ্খ!

ওরা এখুনি উঠবে নেচে।
এবার পৌঁছুবই নতুন বন্দরে!

স্মৃতির রেখা ২·৫০ শ্রীযুক্তা মহাদেবী বর্মার 'স্মৃতি কী রেখায়ে' পুস্তকের অনুবাদ অনুবাদক : মলিনা রায়	**মুসাফিরের ডায়ারি** ২·৫০ নরেন্দ্রনাথ রায় **কথা নয় কবিতা** (উপন্যাস) বনফুল প্রণীত

এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

এষণা

হরেন ঘোষ

আমার এষণা তুমি। বাসনার সুনীল বসনে
বসেছ যখন গিয়ে দিন-শেষে বেলভেডিয়রে—
আকাশ নেমেছে যেন, মনে হয়, তোমার শিয়রে।
ডালিয়া ফুলেরা যেন তারা হয়ে জ্বলে আনমনে।

বুকের ওপরে কাঁপে যে-ইশারা চোখের তারায়,
চুলের গোপন ঝড় দক্ষিণের এনে যে-বাতাস
স্পর্শের সঙ্কেত দিয়ে মিলনের জানায় উল্লাস—
বাসনার নীলনদে সেইরূপ, সে-রঙ হারায়।

আমার বিলাস নয় ছদণ্ডের। শুধু রক্তস্রোতে
দেখেছি আমার মুখ ধমনীতে নিত্য রেখে মুখ;
যতোই বসন্ত-ঝড় উল্লসিত তোমাতে জাগুক,
প্রাণের পূর্ণতা আমি জ্বেলে রাখি হৃদয়-আলোতে।

তোমার বাসনা যদি জ্বলে ওঠে। শিখা দীপ্ত হয়।
আমার হৃদয়-গঙ্গা সে শিখাকে করে ছন্দোময়।

উৎস

দুর্গাদাস সরকার

পৃথিবীর প্রেম যেন আশ্চর্য গোপন সুরে বাঁধা
মানুষের মনের এস্রাজে। তাই তার যদি ছিঁড়ে
অন্ধকার গাঢ় হয়—বেদনায় তখন গভীরে
না-বলা কী কথা যেন বাজে। একা মনে মনে কাঁদা
কখনো হবে না শেষ। উড়ন্ত পেঁচার শব্দে ধাঁধা
হয়তো লাগতে পারে মন থেকে অস্থির শরীরে।
তবুও প্রাণের কান্না প্রেমের ভেতরে ঘুরে ফিরে
কী যেন সন্ধান করে, তারি জন্যে সুরে জাল ফাঁদা।

সে-সুরে আরেক মূর্তি গড়ে ওঠে সকলের মনে,—
সে কথা বোঝে না কেউ, কবি থাকে তারি সাধনায়।
কোন কালে এসেছিল সেই কবি কা'র শান্ত স্নেহে,
ভালবাসা কবে এলো, আদিতে তা কোথায় গোপনে
ছিল একা, সমুদ্র-তরঙ্গে কিম্বা গাছের পাতায়,—
সে-কথা জানি না বলে খুঁজি তাকে আমিবার দেহে।

রাত্রির ঝিঁঝিরা

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

আশার-আগুনে ঝিকমিকে জ্বলা কত চোখ
রাত্রিতে জ্বলছে :—জ্বলছে ঝিঁঝিরা অনর্গল,
একটু খানিক আলোর আভাস সচঞ্চল
জীবন গভীরে, নীল তারা ভরা রাত্রি হোক।

হৃদয় ভরিয়ে মুগ্ধ মনেরই প্রশান্তির
টিপ্‌টিপে জ্বলে হাজারো তারার রঙ্‌কুঁড়ি,
আগুনের নীল চকমকি ঠোকা ফুলঝুরি :—
ইচ্ছারা দ্বিগুণ চাঁপ ছেড়ে বাঁচে কি ক্লান্তির।

দু একটা পেঁচা ডানা ঝাপ্‌টাবে লালসার,
ছোট ছোট প্রাণী সেখানে হারাবে জীবনটা ;—
মনের ভয়েতে গুড়িগুড়ি মারা কারণটা
দিনের ভারেতে হারিয়ে যাবেই হতাশার।

হাসি আনন্দের চিক্‌চিকে চোখে চাইবেই
হৃদয়ের কোনে সামনে যেমন আলোকিত
গভীর দেশের তারার আকাশ অতলিত
ঝিঁঝিদের ভরা ফুলঝুরি রাত জ্বালবেই।

মুক্তি

সুশীলকুমার গুপ্ত

বল, বল, কোথায় তোমার মুক্তি ?
তুমি যদি এক কাজল মেঘের রূপে
আকাশের গোলক ধাঁধায়
উড়ে চলে যাও,
আমি এক দুঃসাহসী ঝড়ের পোড়ায় চেপে
ধ'রে আনব তোমাকে ;
প্রাণের প্রসন্ন শস্যক্ষেতে
বৃষ্টি হ'য়ে মিশে যাবে তুমি ॥

আবার কখনো যদি তুমি এক রুপালী শুক্তির মধ্যে
একটি নিটোল মুক্তা হ'য়ে
মোহিনী সমুদ্রগর্ভে
লুকিয়ে থাকতে চাও,
আমি এক ডুবুরীর মতো
ঢেউয়ের চক্রান্ত ভেদ ক'রে
তোমার ঠিকানা খুঁজে বার করবই ;
তারপর মনের আংটিতে
গেঁথে রাখব তোমাকে ॥

আর যদি এক অত্যাশ্চর্য হরিণীর মূর্তি ধ'রে
দুর্গম অরণ্যের অন্তঃপুরে
তুমি নিরুদ্দিষ্ট হ'তে চেষ্টা কর,
আমি এক শিকারীর বেশে
কামনার বিসর্পিল ফাঁদে
বেঁধে ফেলব তোমাকে ;
হৃদয়ের বিস্মিত বাগানে
তুমি হবে শৃঙ্খলিত ॥

আকাশে জলে বা স্থলে
আমার প্রেমের হাত থেকে
কখনো তোমার মুক্তি নেই ॥

কাল সকালে

দিব্যেন্দু পালিত

কাল সকালে তোমার মৃত্যু হবে।
তুমিই আমার প্রথম প্রতিবেশী :
দীপান্বিত আঁধারে উৎসবে—
প্রিয় আমার, দুরন্ত অন্বেষী !

সঙ্গোপনের জ্বালা অনেক ; বায়ু
সম্বরণের অনেক জাদু জানে।
ভাগ্যবলে জন্মকোষেই রাহু—
চন্দ্রাতপেও প্রলয়-পাবক হানে।

কিন্তু কেহ সুখের পরিচয়ে
অন্ধকারে আঁচলে কাঁচ বাঁধে :—
আহা, অমল জীবন ভয়ের ভয়ে
অবশেষে পৌঁছবে ঠিক কাঁদে !

পান্থশালায় বৃদ্ধ আবাসিক
ছি-ছি কাঁপায় প্রবল শঙ্করবে।
যাদের অমন জীবন তাদের ধিক্ :—

মৃত্যুতেই বাঁচি তো গৌরবে ॥

আকাশ বিহঙ্গ

কণপ্রভা ভাদুড়ী

সন্ধ্যাবেলা নীড়ে ফিরে আসে
ক্লান্তপাখা ভীরু বিহঙ্গম।
অস্তাচল আভার লাল গোধূলি পলাশ,
দিগন্তে সমুদ্র সঙ্গম।
সাগরনী পাখীর ডানা
নীড়ের নিশ্চিন্ত গুহায়।
আতঙ্কে প্রহর গোণে
নিঃসাড়ে শর্বরী পোহায়।
অবশিষ্ট অবতরণিকা
পাখীর স্মরণে বুঝি অস্পষ্ট নিশ্চেত।
নিঃস্বত্বের হিম কুজ্ঝটিকা
বাষ্পাচ্ছন্ন বেদনানুভব।

আকাশ বিহঙ্গ ডাকে
রুদ্ধ কণ্ঠ অন্বেষা আকুল।
অন্ধকার সমুদ্রের একূল ওকূল।
অতলান্ত তিমির মন্থনে
সমুদ্রিক প্রস্রবনে
প্রশ্নোত্তর লুপ্ত হয়ে যায়।
রুদ্ধ পাখী ডানা ঝাপটায়।

অতন্দ্র পৃথিবী আর রাত্রি শ্যামাঙ্গনা।
কৃষ্ণপক্ষ নক্ষত্র রজনী।
কৃষ্ণচূড়া বৃক্ষান্তরালে
রক্তাম্বুক পুষ্প পরিমলে
পবনধূ চুম্বিত পরাগে।
জাহ্নবী-জীবন জাগে তন্দ্রা তমিস্রায়।
লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী প্রাণ জাগে
মহা শূন্যতায়।

এত প্রাণ, এত মধু জীবন প্রত্যয়
পরস্পর একাত্ম সত্তায়।
আশ্চর্য প্রদীপ জ্বলে চোখের নীলায়,
মানুষ পাখীর আর প্রকৃতির
প্রস্তুপ্ত লীলায়।
সে নীলার বৈদূর্য বিভায়,
আত্মের লাভায়,
তন্দ্রাচ্ছন্ন পক্ষী শাবকের
বক্ষচ্যুত সাদা পালকের
পুঞ্জীভূত সঞ্চয়ের স্তূপে,
কোটরাশ্রিত প্রাণ দগ্ধ হয়
কার অভিশাপে?

তিলে তিলে পলে পলে
সময়ের জ্যামিতি নির্ণয়ে,
হাসি কান্না সমন্বয়ে
জীবনের সমস্ত প্রত্যাশা
শেষ হয়ে যায়।
আকাশ বিহঙ্গ শুধু—
অন্ধকারে ডানা ঝাপটায়

তৃষ্ণা আছে জল আছে
চঞ্চল চাতকী প্রাণ আছে
নেই শুধু কূলার নিভৃতি
নেই সেই ছায়াঢ় প্রকৃতি।

পাখীর ডানার মত কোমল পেলব
পাখীর ডানার মত একান্ত সুলভ।

দুর্বোধ্য

মন্মথ রায়

[একটি পার্কের জনবিরল কোণে একটি বেঞ্চ।
সূর্য ও সন্ধ্যা।]

সন্ধ্যা ॥ এতদিন পর হঠাৎ আবার আমাকে স্মরণ করেছো যে?

সূর্য ॥ সে তুমি যা-ই বলো, আমি ভাবিনি যে তুমি আসবে!

সন্ধ্যা ॥ তুমি এমনি ক'রে আমাকে আসতে বলায় সত্যি-ই আমি অবাক হয়েছি কিন্তু!

সূর্য ॥ আমার দুঃসাহস বলতে পারো। কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছিলো আমি ডাকলে তুমি না এসে পারবে না সন্ধ্যা। বিশেষ এই পার্কে। আমাদের জীবনের অনেক স্মৃতি মাখা এই পার্কে।

সন্ধ্যা ॥ কি বলবে বলো! তোমার সঙ্গে আমাকে এখানে এভাবে দেখলে লোকে হাসবে। সেটা দুঃসহ।

সূর্য তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছে, একথা সত্য। কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদের আইনে এমন কোনো বিধান আছে কি যে ভূতপূর্ব স্বামী এবং ভূতপূর্ব স্ত্রী এদের পরস্পরের মুখ দেখা নিষেধ, এমন কি কথা বলাও নিষেধ?

সন্ধ্যা ॥ না, তা নেই বটে; কিন্তু এমন একটা দৃশ্য দেখলে লোকে হাসতে পারবে না—এ বিধানও নেই। কি জন্যে আমাকে ডেকেছো বলো!

সূর্য ॥ নিউইয়র্ক থেকে চন্দ্রা তোমার ঠিকুজি পেনের একটা ওষুধ পাঠিয়েছে ওষুধটা নাকি অব্যর্থ লিখেছে, তার এক বন্ধুকে কথায় কথায় তাকে বলেছিলো। এই ওষুধ-

টায় তার কলিক্ পেন একেবারে সেরে গেছে। তখন তার মনে পড়েছে তোমার কথা। বেচারি এখনো জানে না, তার বৌদি তার দাদাকে ছেড়ে চলে গেছে।

সন্ধ্যা ॥ জানে না, জানিয়ে দাও। সেই সঙ্গে ওষুধটাও ফেরৎ পাঠিয়ে দাও।

সূর্য ॥ কলিক্ পেনটা তবে তোমার সেরে গেছে?

সন্ধ্যা ॥ তোমার এ প্রশ্নের এখন আর কোনো মানে হয় না। আমি সেরে গেছি কি মরেছি তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামানো একটা হাসির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় না কি?

সূর্য ॥ কেন?

সন্ধ্যা ॥ পরস্ত্রীর জন্যে এই দরদ তোমার নিজের স্ত্রী সইবেন না। এর চেয়ে আর একটু বাড়াবাড়ি হলে এ-স্ত্রীও তোমার যাবে।

সূর্য ॥ সব স্ত্রী-ই তোমার মত নয়।

সন্ধ্যা ॥ জানি না। নিজের কথাটাই জানি। আমাকে লুকিয়ে রমলাকে অত দরদ দেখিয়েছিলে, সেটা আমি সইতে পারিনি একথা সত্য। তাও যতদূর সহ্য করা সম্ভব, করেছিলাম। কিন্তু যখন দেখলাম যে, আমার কলিক্ পেনের চেয়ে রমলার ব্লাড-প্রেসারটাই তোমার কাছে বড় হয়ে দাঁড়ালো, তখনই তোমার ঐ ব্যভিচারটা আর সইতে পারলাম না। সেটা যে ব্যভিচার সেকথা শুধু আমি বলিনি, আদালতে রমলার স্বামীও হলফ্ করেই বলেছিলেন।

সূর্য ॥ রমেনটা মানুষ নাকি? একটা ব্রুট। স্ত্রীর চিকিৎসা দূরে থাক, তাকে মার ধোর ক'রে তার গয়না ছিনিয়ে নিয়ে মদ খেতো। পাশের ফ্ল্যাটে এই অঘটন রাতের পর রাত ঘটছিলো—সইতে পারিনি আমি সেটা। আর তুমিও আমাকে তাই সইতে পারলে না। যাক্ গে, সে কথা। কিন্তু একি, তুমি অমন করছো যে!

সন্ধ্যা ॥ (যন্ত্রণায় বিবর্ণ হইয়া) আমার সেই কলিক্ পেনটা—উঃ! আঃ!

সূর্য ॥ (পকেট হইতে পিল জাতীয় একটা ওষুধের ফাইল বাহির করিয়া তাহা হইতে একটি পিল লইয়া) হাঁ করো তো—হাঁ করো—হাঁ করো—(সন্ধ্যা হাঁ করিলে পিলটি তাহার মুখে ফেলিয়া দিয়া) চিবিয়ে খাও—হ্যাঁ হ্যাঁ, গিলে ফেলো।···ব্যথাটা একটু কমেছে কি?···হ্যাঁ, মনে হচ্ছে একটু কমছে। কমতেই হবে। চন্দ্রা লিখেছে ওষুধটা ম্যাজিকের মত কাজ করে। মনে হচ্ছে কথাটা মিথ্যে নয়।···ব্যথাটা গেছে, কেমন?

সন্ধ্যা ॥ (শান্তভাবে) অনেক ধন্যবাদ। চলি।

সূর্য ॥ ওষুধের শিশিটা নিয়ে যাও!

সন্ধ্যা ॥ না, থাক।

সূর্য ॥ চন্দ্রা লিখেছে, রাত্রে ঘুমোবার আগে রোজ একটা পিল খেতে। তবে নাকি কলিক্ পেন আর হবেই না।

সন্ধ্যা ॥ তুমি যে আজ আমাকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছো, আমার জন্যে ওষুধ এনেছো, রমলা তা জানে!

সূর্য ॥ নিশ্চয়।

সন্ধ্যা ॥ হুঁ।

সূর্য ॥ কি ভাবছো?

সন্ধ্যা ॥ আমি চলি।

সূর্য ॥ ওষুধটা নাও—নিয়ে যাও।

সন্ধ্যা ॥ না।

নিউ এজ-এর বই বলতে বোঝায় :: সেরা লেখক :: সার্থক রচনা :: সুলভ মূল্য

আবহমান

বীণা চক্রবর্তী

শহরের আকাশের প্রখর-দুখে বাংলার খনীন সুলতান দুর্ধর্ষ দুর্দান্ত উজ-বীন্ তোগ্রাল-এর এক বিস্ময়কর প্রেম কাহিনী। কেমন করে এক বাঙালী বন্দীর প্রেমের কাছে সুলতানের সিংহাসন তুচ্ছ হয়ে গেল তারই ঐতিহাসিক-ভিত্তিক কাহিনী এই আবহমান। শহরের হাওয়ের যে বিশ্বাস চিত্র এই নবীন লেখিকা চিত্রিত করেছেন তা আধুনিক বাংলা উপন্যাসে অভিনব। লেখিকা নবীন হলেও তিনি এই উপন্যাসের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে শিল্প-সম্ভাবনার এক বিপুল স্বাক্ষর এঁকেছেন। ৪·০০

বাঙালীর ইতিহাস

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

বাঙালী আদিবাসী নয়, তার প্রধান উৎস নীহাররঞ্জন রায়ের অমর গ্রন্থ "বাঙালীর ইতিহাস"। এ বিরাট আকারের গ্রন্থটিকে সাধারণ পাঠকের কাছে সংক্ষেপে সহজ করে পরিবেশন করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। "বাঙালীর ইতিহাস"-এর এই সহজপাঠ্য বইখানা প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে রাখিবার মত। মূল্য—পাঁচ টাকা।

কত অজানারের পর আর এক অজানা! একটি উপন্যাস, না কাহিনী, না গল্প, না অন্য কিছু! ২য় সং: ৩৲

যা বলো তাই বলো

শংকর

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

১৯৩৯ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত লিখিত তাঁর সমুদয় কবিতার সংকলন। ৬৲

বিমল মিত্র
- সাহেব বিবি গোলাম ৭·৫০
- মিথুনলগ্ন ৩·৫০
- মন কেমন করে ৫·৫০

সৈয়দ মুজতবা আলী
- দেশে বিদেশে ৫·০০
- চাচা কাহিনী ৩·০০

বুদ্ধদেব বসু
- তিথিডোর ৮·০০
- কালের পুতুল ৩·৫০
- ঘুসর গোধূলি ৭·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র
- উপনায়ন ৩·০০
- ছায়াবাড়ি ৩·০০

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
- প্রাণবন্যা (২য় সং) ৪·০০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে

প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক শৈলজানন্দের অভিজ্ঞতা অভিনব কত বহু স্মৃতি-কথা। এ গ্রন্থে লেখক যে অতীত দিনের স্মৃতি-মন্থন করেছেন তার মধ্যে তাঁর বাল্যবন্ধু কাজী নজরুল ইসলাম এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। বড় হলো। ৪·০০

শংকর-এর নতুন উপন্যাস

পদ্মপাতায় জল

কত অজানারের লেখক শংকর বাংলার সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকাদের এবার আর এক অপরিচিত পৃথিবীর সঙ্গে পরিবেশন করবেন। পাঠকদের এক নতুন-বিদেশী ওয়ার্ল্ড সেলসম্যান সেই পৃথিবীর রাজ্যবিস্তার। বিদেশিনীর নির্মোহ হাতে তাঁকে কলকাতায় আসতে হয়েছিল এবং সেইখানেই এই কাহিনীর শুরু। শীঘ্র ২৲ টাকা। দ্বিতীয় সংস্করণ বার হলো।

ধীরাজ ভট্টাচার্য
- দুষ্টিপাত ৩·০০ জলান্তিক ৩·০০
- নিলম নদীর তীর ২·০০

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
- মনে এলো ৪·০০

আশাপূর্ণা দেবী
- মিত্তির বাড়ি (২য় সং) ৩·৫০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
- হলুদ নদী সবুজ বন ৩·০০
- ছন্দপতন ২·৫০
- লেখকের কথা ২·৫০

সুবোধ ঘোষ
- কিংবদন্তীর দেশে (৩য় সং) ৫·০০

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য
- মটী (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৩·০০
- ঝাঁসির রাণী ৫·০০

খড়ির লিখন

গল্প

শিক্ষিকার আত্ম-কথা

মূল্য—২৷৷০

Recent Publication

INDIA WITHOUT SENTIMENT
MARION BARWELL
Price Rs. 6/-
A book about India from a non-Indian pen. An unusual and most interesting autobiography.

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
- তুমি সন্ধ্যার মেঘ ৫·৫০
- চিড়িয়াখানা ৩·০০
- সদাশিবের তিন কাণ্ড ১·৭৫

বরনারী

জাবালি

স্বামীর স্বামীরা ও স্বামীরা বাড়ীর জীবন আলেখ্য এবং মর্ম-কথা। ২·০০

তরুণকুমার ভাদুড়ীর
- মরু প্রান্তর (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৪·০০
- অভিশপ্ত চম্বল [যন্ত্রস্থ]

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর
- নায়কের কৈফিয়ত ৩৲

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের
- আমার দেখা রাশিয়া ৩৲

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

২২, ক্যানিং ষ্ট্রীট : ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট : কলিকাতা :: গোল মার্কেট, নতুন দিল্লী-১

না। কেন সন্ধ্যা?
একদিন আমি ছিলাম তোমার একান্ত নিজস্ব কিন্তু আজ আর আমি তা নই। এখানে যে আমাকে দয়া করতে এসেছো সেটাও হলপার নয়।

সুব তুমি বলছো কি সন্ধ্যা?

সন্ধ্যা কেন যেন কেবলি মনে হচ্ছে চুপি চুপি এসে চোরের মত যদি ঐ অমৃতটা আমার হাতে তুলে দিতে, আমি নিতাম।

সুব সে কি?

সন্ধ্যা হাঁ, তাহলেই মনে হতো তোমার জীবনে আমি এখনো বেঁচে আছি। আমি চললাম।

সুব ॥ সন্ধ্যা, শোনো—

সন্ধ্যা ॥ বলো। কেন তুমি আমাকে এমন করে ডাকছো? কেন ভুলে যাচ্ছো, আর আমি তোমার নই, তোমার নই—। তুমি তোমার স্ত্রীকে জানিয়ে আমার জন্যে ওষুধ নিয়ে এসেছো। আমি আমার স্বামীকে গিয়ে বলছি, সে ওষুধ আমি নিইনি—নিইনি।

সুব ॥ (সন্ধ্যা চলিয়া গেলে) এরা যে সব কা, আজো বুঝলাম না।

॥ যবনিকা ॥

মন্মথ রায়ের অবিস্মরণীয় নাট্যাবদান

...ন্মথ রায়ের নতুন অভিনয়ের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক এবং বিশেষ করে তাঁর একান্ত নিজস্ব বিস্ময়কর কোতুকরসের ঘারোয়ারিকতাকে অনুসরণ করলে একক মন্মথ রায়কেই একটি যুগ বলে আখ্যাত করা যেতে পারে।
—আনন্দবাজার পত্রিকা : ৫-৫-৫৭

"একাঙ্ক নাটকার ক্ষেত্রে তো তিনি আজও সম্রাট।" দেশ : ২১-৫-৫৭

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ অভিনীত কৌতুকনাটক **'কোটিপতি নিরুদ্দেশ'** এবং তৎসহ :

বিদ্যুৎপর্ণা—রাজনটী—রূপকথা

[প্রতিটি নাটকে একটিমাত্র দৃশ্যপট। বিখ্যাত নাট্যচতুষ্টয় : একত্রে]	৩·০০
নব একাঙ্ক [৮টি আধুনিক একাঙ্ক নাটক সংকলন]	৩·০০
একাঙ্কিকা [একুশটি প্রসিদ্ধ একাঙ্ক নাট্যগুচ্ছ]	৫·০০
ছোটদের একাঙ্কিকা [ছোটদের বারোটি একাঙ্ক নাটক]	২·০০
কারাগার—মুক্তির ডাক—মহুয়া [সুপ্রসিদ্ধ নাটকত্রয়, একত্রে]	৩·৫০
মীরকাশিম—ময়তাময়ী হাসপাতাল—রঘুডাকাত [একত্রে]	৩·০০
জীবনটাই নাটক—আরও নাটক [নব সংস্করণ]	২·৫০
ধর্মঘট—পথে বিপথে—চাষীর প্রেম—আজব দেশ [চারিটি পূর্ণাঙ্গ নাটক, নব নাট্য আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত, একত্রে]	৪·০০
মরা হাতী লাখ টাকা [শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ অভিনীত]	১·০০
চাঁদসদাগর—অশোক—খনা—সাবিত্রী [প্রত্যেকটি]	২·০০

ও, আর, সি, এনএর

কুমারেশ

লিভার ও পেটের পীড়ায়

নিয়মিত **কুমারেশ** সেবনে লিভার সুস্থ থাকে অজীর্ণ, অক্ষুধা, পেটফাঁপা প্রভৃতি রোগে ভুগতে হয় না ; খিট্‌খিটে মেজাজ, উৎসাহের অভাব, সহজে ক্লান্তি প্রভৃতি উপসর্গও দেখা দেয় না।

দি ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ অ্যাণ্ড কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী লিঃ। শালকিয়া হাওড়া

ধাপার মাঠের ধোপানী—উপন্যাস। রসরচন রায়। লঘু সাহিত্য-সত্র, ৩৩।৩বি, প্রেমচন্দ রায়চাঁদ স্ট্রীট, কলিকাতা নয় (তবে কোথায়?)। ডিমাই ৭৯৭ পৃষ্ঠা, দাম ১৭৲।

ভাল উপন্যাস বলিতে যাহা বোঝায় যাঁহারা তাহা জানেন তাঁহারা এই মহান্ গ্রন্থখানিতে সে সব গুণ দেখিয়া পুলকিত, বিস্মিত এবং ক্ষণে ক্ষণে স্বেদাক্ত বোধ করিবেন। আর যাঁহারা তাহা জানেন না তাঁহারাও কম বিস্মিত হইবেন না। ইহার প্রচ্ছদ চিত্রখানি বাঁধাইয়া রাখিবার মতো, চোখ ধাঁধাইয়া দিবার কোন কৌশলের কমতি নাই (তবে যদি বাড়িতে উঠতি বয়সের বালক-বালিকা না থাকে)। এটিক কাগজে লাইনো টাইপে ছাপা—স্বচ্ছন্দে যে কোন জায়গা হইতে পড়িতে আরম্ভ করা এবং যেখানে খুশী থামা যায়, তাহাতে পাঠকের কোন কষ্ট হয় না, গল্পেরও কোন গতিভঙ্গ হয় না। বই-এর ছাপা বাঁধাই সবই উচ্চাঙ্গের, সে তুলনায় মূল্য সুলভ হইয়াছে বলা চলে।

'ধাপার মাঠের ধোপানী' আধুনিক বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। প্রত্যেক সাহিত্য-রসিকের, সাধারণ গ্রন্থাগারের এবং যাঁহারা লঘুসাহিত্য-সৃষ্টিতে উৎসাহী সকলেরই একখানি কেনা উচিত।

এই পর্যন্ত সমালোচনা লিখিলেই সচরাচর কাজ চলে। কিন্তু পাছে সমালোচকের পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞানের ব্যাপ্তি বিষয়ে পাঠকের সন্দেহ জাগে তাই আর দু-চার কথা অ্যাড্ করিতেছি।

ল্যাপলাণ্ডের বিশ্ববিশ্রুত ঔপন্যাসিক হোক্স্ তাঁহার অসামান্য রচনায় যে রঙ্কিনীর চিত্র অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বঙ্গো মহাদেশের চিন্তা-নায়ক নালন্দা যাহার আভাস মাত্র দিয়াছেন, কামস্কাটকার বিদ্রোহী কবি স্পিকটি নট তাঁহার

গাথার মধ্যে যে রজকিনীর কামনা বাসনার বাস্তব ছবি ফুটি ফুটি করিয়াও সম্পূর্ণ ফুটাইতে পারেন নাই, 'ধাপার মাঠের ধোপানী' গ্রন্থের নায়িকা কালোশশী তাহা করিয়া ছাড়িয়াছে। বলিতে গেলে কালোশশীর তুলনা নাই। আমাদের বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস ও রামী ধোপানীর প্রেমগাথা ইহার কাছে তুচ্ছ। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বেনারসী বাঈ', শরৎচন্দ্রের 'ঠানদি', রবীন্দ্রনাথের 'পথের পাঁচালী' গ্রন্থের নায়িকা এবং বিভূতিভূষণের 'কুমুদিনী', অবধূতের 'এলা' এবং সমরেশ বসুর 'কমল' কালোশশীর কাছে কিসস্থ না। কামনা কোথায় প্রেমে পরিণত হইয়াছে রোমা রোলাঁ ব্যতীত এমন ভাবে আর কেহ তাহা বুঝাইতে পারেন নাই, আবার প্রেম কোথায় কামে আসিয়াছে লরেন্স ব্যতীত এতখানি সাহসের সঙ্গে তাহার বাস্তব চিত্রও আর কেহ দেখাইতে ভরসা পান নাই। আমরা রাসভ-রঞ্জনকে এজন্য সহস্র ধন্যবাদ জানাইতেছি। সঙ্গে সঙ্গে কবিগুরু পুরস্কার কমিটি, রাষ্ট্রীয় সাহিত্য-কলুয়ন কমিটি প্রভৃতি সকল গুণীজনের দৃষ্টি এই মহৎ ও বৃহৎ গ্রন্থখানির দিকে আকর্ষণ করিতেছি।

গ্রন্থখানিতে বাহান্নটি পর্ব আছে, বৎসরে বাহান্নটি সপ্তাহের সঙ্গে তাহা তুলনীয়। 'ধাপার মাঠের ধোপানী' বাংলার ঘরে ঘরে সম্বৎসর পঞ্জিকার মত নিত্য পাঠ্য হউক ইহাই কামনা করি।

—স্নেহচন্দ্র সেন

(সমালোচক)

রয়েল কলেজ (গভঃ রেজিস্টার্ড)

বর্তমানে ভারতের বৃহত্তম বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

প্রধান কার্যালয় : ২২, পাঁচু গোপালদা লেন, শিয়ালদহ, কলিকাতা-৯

ফোন : ৫৫-৩৮১৭

মিস্ এমিলি ডি সিল্ভা ১৯৫৮ সালে প্রতি মিনিটে ১২০, ১৪০ ও ১৫০টি শব্দ লিখিয়া ভারতের ইউনিভার্সাল অল টাইম শর্টহ্যাণ্ড চ্যাম্পিয়নের একমাত্র অধিকারিণী হইয়াছেন।

ইহা একটি বিশ্বমান

কমার্স বিভাগ

১, ২ ও ৩ মাসে ইংরাজী ও হিন্দী টাইপ এবং শর্টহ্যাণ্ড শিখন সাফল্য সুনিশ্চিত

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ

এ, এম, আই, ই (ইণ্ডিয়া), মেকানিক্যাল ফোরম্যান, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ওভারসিয়ার, ড্রাফটস্‌ম্যান (সিভিল-মেকানিক্যাল) ইলেকট্রিক্যাল, সুপারভাইজর এবং ওভারম্যান, বি ও এ টি, রেডিও।

ডাকযোগেও শিক্ষা দেওয়া হয় (প্রসপেক্টাস—১০ টাকা)

টিউটোরিয়াল বিভাগ

সুল ফাইনাল, আই-এ, আই-এস-সি, আই-কম, বি-এ, বি-এস-সি, বি-কম ছাত্রদের বিশেষ যত্ন-সহকারে পড়ান হয়। হস্তাক্ষর, হিসাব, ধারবন্ধ ইঞ্জিনিয়ারিং ও বি, ও, এ, উহা ছাড়া চাকরিপ্রার্থীদের জন্য বিশেষ ক্লাসিক ব্যবস্থা দ্বারা ছোট ছোট দলে প্রস্তুত করান হয়। ভিন্ন ভিন্ন স্থানেও নকল দেওয়া হয়। মেয়েদের জন্য ভিন্ন স্কুলের ব্যবস্থা আছে। প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। কালোচিত পরীক্ষা নির্বাচিত করা হয়। ইংরাজী বলা ও লেখা শিক্ষার বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা আছে। যে কোন দিন ভর্তি হওয়া যাইতে পারে

সাক্ষাৎ করুন

শাখাসমূহ : (১) ৪১১, পাঁচু গোপালদা লেন ; (২) ১৪।১৭, কলেজ ষ্ট্রীট ; (৩) ১৩৮, সার্কুলার রোড ; (৪) ৪১, আপার সার্কুলার রোড ; (৫) ষ্টেশন রোড, হাওড়া ; (৬) ৬৭, নেতাজী সুভাষ রোড, বেহালা (বাজারের পাশে)

মা আসছেন ! তাঁর হাস্যোজ্জ্বল
নয়নে রয়েছে 'বরাভয়' । আনন্দময়ীর
আগমনে আপনাদের সকলের জীবনেই সুখ ও
নিরাপত্তা আসুক ।

জীবন বীমার কোন বিকল্প নেই

॥ ১ ॥

আকাশে জটাপটি মেঘ। মেঘ নেমেছে শ্রাবণ রাতির গা ভাসিয়ে, চোখ ধাঁধিয়ে। এ মেঘের যেন রূপ নেই, রঙ নেই আর। কালো আর কালো। নিরছিপ কালো। অমাবস্যের সই লাগে না এ রাতের মেঘের। ছপাশের পাড় দেখা যায় না, চর দেখা যায় না। পায়ের নীচের নদীকেও আঁধার খানায়। কালো মেঘ নেমেছে আকাশে। জলের ফুলরি ফুটিয়ে মেঘ নেমেছে। দিশারা হারিয়েছে দিগন্ত। গল গল করে শব্দ হচ্ছে নদীর বুকে। ফুলছে ফুলছে—ফুঁপছে নদীর জল। কালীয় নাগ যেন আজ তার কালো ফণায় ফণায় দিক ছেয়ে দিয়েছে। কালিদহ ছেড়ে এসে পাক দিচ্ছে হুগলীর মোহানায়।

হুগলীর মোহানা!

কলকাতার পরে মীরপুর, কাশীপুর, পীরসাহাজা পেরিয়ে গেরোখালি। নাগিনী গঙ্গা, ভয়ঙ্করী করালী গঙ্গা, ভাগীরথী সেজে কাঁদেন। আহা! কি দুঃখে চোখ ভেসে গেছে গঙ্গার। কালি-কাঁকড়া ভাসিয়ে ওঁরে কাঁদেন। বুকের নাচনি বাড়ে। সাগরের দমকা লাগে। কোঁড়ন মোহানা ফল-ফলিয়ে ওঠে জোয়ারের ঠেলায়। বুকের বেদনা গুমরে ওঠে ভাগীরথীর। ছপাশের বনবাসক কাউর-ঝাড়। মেলো-নামাল-বিষকাটারির শাখাপল্লব প্রাচীর তুলে ধরেছে দু পারে। গরাণ-গামা উঁচু হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাথাভারি কেয়ার ঝুপসি লুটিয়েছে পাঁচ হাত নদীর জলে। আ মা জাহ্নবী! কার জাদু হতে বেরিয়েছ মা! নাগিনী, ভয়ঙ্করী-করালী-রাক্ষসী নদী। হুগলীর মোহানা।

তিনদাঁড় বাইশ হাত-বাড়াড়ি নৌকো উধাও হয়ে হারিয়ে গেছে এই চোখ-ঝোজা অন্ধকারে। একটু আগে হারিয়ে গেছে। পর পর তিনদাঁড় চলেছে, এইটুকু পথর জানে ছয়। আর কিছু দেখা যায় নি। সাঁই সাঁই বাতাস হাঁকছে। কানের পাশ দিয়ে চাবুক কষে ছুটছে বাতাস। জলের ঝিনকি আছে বাতাসে। পাঁটা দিয়ে জলো বাতাস কপ চাছে। একটু আগে উত্তর থেকে বেরিয়েছিল, কলকাতার

কাছাকাছি কোথাও থেকে। তারপর খুব, তারপর দক্ষিণ। কেরোসিন কেবাসের কোপ সামলে বারোজন দাঁড়ি ছুটছে। কেউ নজর নেই, অবসর নেই। গ্রামের ভয় আছে। জল-পুলিশ আছে। নৌকোর মাঝি আছে। গাধাবোটের সারেঙ আছে। ফেলে ফেলবে, দিয়ে ফেলবে। 'শ্যালা!' মুখ ফিরে দিব্যি বেরিয়ে গেল ছমন সর্দারের।

'এ—খু-উ—' এক ফুঁয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকারে ছিটিয়ে দিলে ছমন। হালটা করে ধরলো। সোজা দক্ষিণে চলেছে বাছাড়িগুলো। হ্যাঁ, হ্যাঁ—ওই দেখা যাচ্ছে গেঁয়োখালির আলো। সিকরেল লেইট। তার মানে সিগন্যাল। জাহাজী ভাষার আলো। ওর অনেক দূর বাঁক দিয়ে দক্ষিণ পরগনার পাড় ঘেঁসে সাঁ সাঁ করে বেরিয়ে যেতে হবে। যেন কেউ টের না পায়। নদীর আওড়ে প্রাণ না যায়।

নিকটে কোথাও আওড় আছে। বোঝার বিয়ে লেগে জল ঘুরি দিচ্ছে। ছিটকে চলেছে বাতাসে। মুখে আবার নোনা জলের চিকচিকানি ভেসে ওঠে। আবার এক গাদা থুতু ফেললে ছমন—খু।

অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। কিন্তু বাঘ-চোখ মেলে পরিষ্কার দেখতে পায় ছমন সর্দার। তাই সে আগ-বাছাড়ির হাল ধরে। সুড় সুড় করে এগিয়ে যায়। বাকি চেলারা তারই নৌকো লক্ষ্য করে পেছনে ছোটে। ছমন ছোটে সামনে। সাঁ করে বাঁক দিয়ে ঘুরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনখানা বাছাড়িরও মুখ ঘুরলো।

'আওড়, বেচে যা—'

জবাব নেই। কেউ জবাব দেবার জন্যে প্রস্তুত হলো না। প্রশ্ন করলো না, কোথায়? বেঁকে গেল। কাজ হয়ে গেল। আওড় কাটিয়ে, ঘূর্ণি পেরিয়ে ওদিকে সামলে নিলো। ছমন দেখছে ঐ—ঐ দেখা যায়,—গেঁয়োখালির সিকরেল লেইট। তারপর তামমণ্ড হারবার। এঁকিবেঁকি বিজলী বাতি উঁকি দিচ্ছে আকাশে। জাহাজের আলো, কারখানার আলো, শহরের আলো ঝাপসাঝাপি গিজ গিজ করছে সেখানে। রাতারাতি সেখানে পৌঁছতে হবে।

হেই-আঁ—হেই-আ—হেই—

চাপাচাপি, দাঁড়ির মুখে দাঁড় বাওয়ার শব্দ বাজছে। ঝাপাঝাপি ঘন ঘন শব্দ। জলের দোয়ার কাটিয়ে শব্দ বেশী শোনা যায় না। জোয়ারের ফণার সঙ্গে মেঘ-বাতাসের আসানির সঙ্গে এ শব্দ মিশে যাচ্ছে।

খড়্গধার একটা বিদ্যুৎ চমকে গেল। মেঘ ডাকার শব্দ হলো—হুম্-গুম্-গুড়ুম্-গুম্-ম্। নদীর মোহানা—দূরের ঝুমও যেন তার জবাব দিলো—উম্-গুং-ম। ভয়ঙ্কর শব্দ। যেন শ্রাবণের ভেরী বাজিয়েছেন ঘূর্জটি। দূর দূর সুরটা কাঁপছে পৃথ্বী পৃথিবীর। নগর-গ্রামের মানুষের। কাঁপছে, দুলছে মোহানা-নদীর জল। কে তাকে ঢাক দিয়েছে, নাড়া দিয়েছে আজ।

হেই-আঁ—হেই-আঁ—

বাছাড়ি নৌকো ছুটছে। তীর বেগে ছুটছে উত্তর কিনার ঘুর ঘেঁষে, দক্ষিণ কিনার ঘেঁষে। ঢেউ ভাঙছে, চাপড়ির ওপর দিয়ে বাতাস শাসানি ছুটিয়ে ছুটলো। সোঁ করে সাপটা লাফিয়ে গেল। ঘচাং করে একটা শব্দ হলো। বাছাড়ি নৌকো। বাইশ হাত বাছাড়ি নৌকো। পিচ্‌পান কাঠের বেবাক তৈরী। যেন হালকা তুলট কাগজের। উলটি-পালটি খেতে যায়। সাড়ে তিন হাত গর্ভকোষটা আগাগোড়া 'কৌতে'র মালে ভরা। লুট করেছে লুটিয়ারা। কলতার এই পারে তিন-সন্ধ্যার সময় চড়াও করে মহাজনী নৌকো একটা লুটে এনেছে তারা।

আকাশে ঘন মেঘ ছিল। নৌকোর মাঝি ছিল না। বারোজন দাঁড়ির তিনজন নেই। বাকি বজন ছিল। নৌকোয় মাল অনেক ছিল। একা ছিল নৌকো। সঙ্গী হারিয়ে বুকিয়ে পেছিয়ে পড়েছিল। হয়তো অপেক্ষা করছিল শাকরের। নৌকোর ঝাঁক বেঁধে বেরুতো। হয়ত সাহস ছিল, তাই একা এসেছিল। কিন্তু উপায় আর রইলো না। লুটিয়াদের হাতে পড়ে বুঝি হারিয়ে গেল দাঁড়িদের। সব দাঁড়ি হাবাচাকা। একজন কন্দি আঁটি-ছিল। ছমন সর্দারের গুঁতি খেয়ে উল্টে পড়ে গেল জলে। তারপর নির্বিবাদে মাঝি এসে পড়ার আগেভাগে মহাজনী নৌকোটা লুট করলো ছমন সর্দার। তিনখানা বাছাড়ি নৌকো বেবাক বোঝাই। তারপর কেউ দেখেনি তারা ছুটে এসেছে। তারা জানে বুনো ওঁইসের মতো মাঝি এসে ছুটবে কলতা থানায়। পুলিশ আসবে। জল-পুলিশ 'টহল' দিয়ে ছুটবে। আলো আছে সে সব লঞ্চগুলোর মাথায়।

সার্চ-লাইট বসানো আছে। এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে পাবে। দেখতে পেলে আর উপায় নেই। মাল যাবে। মান যাবে। নৌকো যাবে। তুমি লোকের দাউক বাস নির্ঘাৎ তখন। লুটতরাজ প্রাণে মরে যাবে তাহলে। ঘরে বউ বসে কাঁদবে। কাঁদতে কাঁদতে একদিন পরের ঘরে গিয়ে উঠবে। গলে গিয়ে বেমাত পাবে। মোহানা চরসীর করালী রাক্ষসী ঢেউ ফুৎকার দিয়ে বলে, কানের কাছে চিৎকার করে আগুনা-বাওয়া দোহনা বাতাস বলে—লুটতরাজ, তোর ঘর-দোর-দায় সব গেল। সাবধান, খুব সাবধান! আমার বুকে টিকে থাকতে হলে তোকে সাবধানে থাকতে হবে। দক্ষিণের আগুনা আর জল-পুলিশের কারেন্সি তোকে বাঁচিয়ে রাখা টিকতে হবে আমার বুকে। চোরা ঘূর্ণির ফাঁদ পেতেছি। রাশি রাশি মাতলা ঢেউকে কিল-বিলিয়ে ছেড়ে দিয়েছি তোদের বাহাদুরির সামনে। ক্ষ্যাপা বাতাসের ঝাপ্টানিতে মাঝি চাবুক। মেঘ আমার বুকে রাতেবিতে গড়গড় করে ডাকে—। বাছা রে, তোদের মাতৃস করতে। তোরা আমার বুকে লুটতরা সেজে ঘুরে বেড়াস। জেলে বাইতি-রাজবংশী পাড়ার মতো তোদেরও দিনকাল পড়েছে পারাল। আমি কি বুঝি না? বড় বড় টাকাওয়ালা মহাজনের মালভর্তি নৌকোকে তোদের দিকে এগিয়ে দিয়ে আমি ওপটি মেরে শুয়ে থাকি। গুড়গুড় করে আমি প্রহর গুণি। তোদের বুকে দাপাদাপি ছোটে। বউয়ের কোমরে ঝাঁপি ওঠে। বুকে হাসি ফোটে। বেদেনী মেয়ের হাসির মতো তোদের ঘরের ঐ সঙ্গিনীদের হাসি আমি দেখতে খুব ভালবাসি। আমি হাসি বলছি। ওদের খিলখিল হাসি আমাকে মিছে কয়। আমাদের দুজনের হাসি বড় হিংস্র, বড় নির্মম। তাই না?

জানো? হিংসেই সংসারের ধর্ম। পাহাড় ফুঁড়ে আমি বেরিয়েছিলাম। মহানন্দা আমাকে গড় করে গো নিত্য। যমুনা বলে কথা—সইব গলায় সুতো পরিয়ে বাঁধলাম গলায় গলায়। শোন-কুশী-সোমউকে বললাম—ধামো। থামলো তারা। কত কীর্তি ভাঙলাম—গড়লাম—কীর্তি-নাশা আমার নাম। তারপরে আমি কতদূর পদ্মা। কতকের মালা পরে আমি কাপালিকা সেজেছি কালিকে।

উত্তর হাওড়ার
শ্রেষ্ঠ প্রেক্ষাগৃহ **পারিজাত** সিনেমায়
পূজার আকর্ষণ
হসপিটাল ঃ সহরের ইতিকথা ঃ
স্মৃতিটুকু থাক ঃ
শরতের আনন্দময় দিনগুলিতে
বেলা ৩ টা, সন্ধ্যা ৬ টায় এবং রাত্রি ৯ টার
'পারিজাতে' আপনাদের শুভাগমন কাম্য।

কালী আমার নাম ধরণী। এর পর্জনে আছড়ে পড়ি সাগর-বিছানো বালুচরে। বালুচর আমার আশ্রয়। কালালিকার কপিলাস্ত্রম।

আবার বিজলী চমকে গেল। গুম্-গুম্ করে মেঘের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়লো আকাশে বাতাসে। দাঁড় টানার শব্দ ছেড়ে গেল বাছাড়ি নৌকোর মাঝিদের। যেমন করেই হোক রাত দুই প্রহরের আগে আমরা হারবারের কিনারে পৌঁছতে হবে। হেই-আঁ—হেই-আঁ।

লুটেরাদের কালো শরীর। বাছাড়ি নৌকোর গায়ে গায়ে যেমন পিচের বা আলকাতরার ছোপ মোটা কালো রঙ ধরেছে, শরীরটা তাদের তেমনি নিকষ কালো। খুব সুবিধে হয়েছে। বেআলুম অন্ধকারে মিশে যাওয়া যায়। কালিঝুল মাখ করে মাখতে হয় না। গায়ের রঙ কালো, চুল কালো —চোখ কালো। কোমরের নীচে নেংটি যারা গামছাটা বা একটু কিছে হয়। তা না হলে বাঘাম্বর মানুষগুলোকে চেনাই যেতো না। ঘর বৈঠা চালিয়ে মানুষগুলো ক্রমশ অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। রাতারাতি দূরে এড়িয়ে ছুটছে। উত্তরের নদীর মোহানা পাড়ি দিতে হালকেরারা দাঁড়ি-মাঝি সমানে হাল ধরেছে। দাঁড় মারছে—হেই আ—।

শ্রাবণের মেঘ বড় ভারী। নদীর মোহানা ডাকছে সাগরকে। হলদীর মেওড়ে শব্দ হচ্ছে ঘন ঘন। এপারে ঝিকছে হলদি। ওপারে বড়তলা আর জামরা নদী তাক পাতিয়েছে। জলনারায়ণের বুকে রাশি রাশি ফেনার বনমল্লিকা হলদী মোহানায় আসছে। কী জানি, কোন্ নিয়মণে মেতেছে আজ এই রাতের ভাগীরথী।

দূর থেকে পেঁয়োখালির সিগন্যালটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আকাশে মেঘ ঘন হয়েছে। দমকা বৃষ্টিও একবার দুবার হয়ে গেল। আবার বাতাসের শাসানি বাড়লো। দূরের গাছ-গাছালির ডালপালা থেকে ঝড়ের গ্যাঁটা-খাওয়া সাঁই সাঁই শব্দ শোনা যাচ্ছে। সিগন্যাল দেখা যাচ্ছে। পেঁয়োখালির দূরে লাল আছে। ও অঞ্চলের নৌকো হিজলী যায় ঐ পথে। শরৎগঞ্জের নৌকো বেশী ঐ পথ ধরে। ক্যানেল ধরে খুব শর্টে উধাও হয়ে যায়। কিন্তু যারা কাকদ্বীপ পেরিয়ে আরো কিনারে ধরে যাবে ডাইনে-বাঁয়ে, তাদের না এগিয়ে উপায় নেই। সমুদ্র তাদের বুকে নেবার জন্যে হাত দিয়ে পথ চেয়ে বসে আছে। মোহানা পেরিয়ে হাজারমণী মহাজনী নৌকো পাড়ি দেয় সমুদ্রে। গহন-গভীর বিষয় সমাধান সমুদ্র। বাসুকীর ফণা ওখানে নাচছে। শুধু তার নেই মারামারির। ঢেউয়ের চূড়োয় নাচতে নাচতে তারা এগিয়ে যায়। লোকে দেখে। লোকে দেখে, শুধু শুধু করে এগিয়ে যাচ্ছে পাউকে পাল্‌সি। মালভরা মহাজনী নৌকো ফেলে ফুলে ঘোলাজল ঘুলিয়ে তীর-লোভা বেরিয়ে গেল। বাছাড়ি নৌকো তখন নিশ্চুপ ঘুমুচ্ছে ঢেউ-এর তালে তালে। কি আরামের ঘুম! এতগুলো দাঁড়ি-লোক-লস্করের কেউ নেই। একটি মাত্র কালোপানা মানুষ জাল হাতে নৌকোর চাতালে ঘুরছে। কিন্তু কেউ কি দেখলো বুকটা দুর-দুর করছে ওদের সবাইর। মা জাহ্নবী, আমাদের বাঁচাও মা। ডাঙা থেকে এসেছি ডাঙার-মানুষ। সেইখানে নিয়ে চলো মা। তোর বুকে ভেসেছি বড় দুখে। দুখ তো বুঝিস মা—মানুষের দুখ, পতিতপাবনী মা আমার। মারামারি কাটার। সারেঙ-এর বুকটা দুরুদ্ দুরুদ্ করে। লুটেরারা শুধু তাকায় এপার ওপার।

বিজলী আবার চমকে গেল। দপ্‌দপে আগুন যেন আকাশের বুকে। ছাই-চাপা আগুন বাতাসের মেঘের দোষ পেয়ে আজ এঁকেবেঁকে চমকাচ্ছে। অনেকদূর পর্যন্ত দেখা গেল। পাড়ের গাছপালা-মাখা-ভার কেয়ার ঝোপ—ন্যাড়া খেজুর, তালের গাছ অন্ধকারে প্রহর গুনছে, দেখা গেল। কালো নদীটা চকমকিয়ে উঠলো হঠাৎ। লঞ্চের আলো দেখা যাচ্ছে। লাল আলোটা ঘন অন্ধকারে যেন পাহারা দিচ্ছে।

পেছনের বাছাড়ি থেকে কে যেন কথা বললো, 'ওই লঞ্চের লেইট দেখা যায় না?'

হরীরের কথায় কথা বলে না হিমু। একটু পরে বলে, 'আর এট্টুস এইগে চল বিনি। টায় পাবি। লৌকোর লেইট দেখতে পাবি—'

বুড়ো হিমুর চোখ অন্ধকারেও বিলিক দেয়। তেমন কিছু দেখতে পায় না। যা একটু দেখতে পেত, চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছে বিদ্যুৎটা। একেবারে আঁধো করে দিয়েছে ধরবয়সী বুড়ো হিমুকে। ক্ষিপ্র হাতে দাঁড় টেনেছে বুড়ো। নিবিরাম টানছে। তিন কুড়ি পাঁচ বছরের জীবনে হাত পাকিয়েছে হিমু। হাড়ে শান দিয়েছে। বয়সের তাঁটা

পড়েছে—। চোখে তেমন দেখে না। কালো চামড়ার ঝাঁকরাক মন হয়েছে। কানে-বুকে-মুখে মন মোটা চুল কড়ক উঠেছে। কড়ক এলমও হয়েছে। তবু অন্ধকারে ওদের বিশেষ মালাম হয় না। অন্ধকারেই নিজের কিসমত খুঁজে পায় হিমু। খাটো চেহারার মানুষ। বয়সের ভারে টনকে যেন ভাগড়া জোয়ান। সাবাস্ হিমু—ছদন সর্দার চাপড়ায় হিমুর গোড়-খাওয়া পিঠে। আর সর্দারের দিকে ফিরে বলে, 'আর শালা সব ছাপ্, মানুষটাকে ছাপ্। যেমন মুগর লিটে গড়া। আমার হেথে গড়া। আগুনার মুখে দাঁড় ঠেলেছে। হাল ধরে কোমর করেছে। কোমর বাঁকে নি। বার বাঁক জল ঠেলে উঠে হেঁড়িয়েছে সিধা। তবা পারবি? তিন বাঁক দাঁড় ধরতে কোমর বেঁকে তবের কাঁড়ে (ধনু)। বেবাক পানচা-পান্সা সেইয়ে তুদের মানুষ করেছে মাঝে। বুকের রক্ত জল করে ঝিয় ফুটান্ নি: পারবি কেমনে সব বলরামের ছাতি। বেবাক তো তবা ছাপী বনে গিচিস।'

ছদন সর্দার। ছদন গোরো। গাইদার হলো ডাকনামে গোরো। লুটিয়াদের সর্দারই আছে—শুদ্ধি বলা। সেই শুদ্ধি চালায় আগে গাইদার। গাইদার শুপি দিয়ে যে নৌকোকে ইশারা করবে, সে নৌকোর আর নিস্তার নেই। ইশারা মতো কাজ করে যাবে বাকী দলের লোক। দা-সড়কি-কুপি-ছেনদা নিয়ে লাফিয়ে পড়বে। লাঠি দিয়ে করবে সাঁড়াশির। মাস্তুলের গায়ে আগে বাঁধবে মাঝিকে। তিন নৌকো ঘিরে ফেলে মাল লুটে নেবে লুটিয়ারা। তারপর মিশেকে তন্ন তন্ন করে নদীর বুক চেঁছে পালাবে। পাড়ের মানুষ টের পাবে না, অন্ধকারে গা ঢাকিয়ে কোন্ পথে তারা উধাও হয়ে গেল। পলক পাতের মধ্যে দেখতে দেখতে অদিশ্। লুটিয়াদের যাতায়াত। তাদেরকেও টের পায় না, কখন যায় আসে তারা। শুধু টের পায় হগলী। হগলীর জোয়ানরা ছেঁচাল আর হোগলা জঙ্গলে—বনবাদাড় আর কাউর কাড়ে-ঝুসড়িতে তারা বুকের দুরুমি ছেড়ে বাঁচে। হাত পায়ের পেশীতে পাকিয়ে পাকিয়ে বেড়ির তেল ঘসে। গায়ের বাসা মারে। প্রাণ পেয়ে ঠিক ছাড়ে লুটিয়ারা। শুদ্ধিকে ভজন

ফোন : ২২-৬৬৮৭

এস, মুখার্জী এণ্ড কোং

[কাগজ ও মুদ্রণের কালি বিক্রেতা]

পি, ২২-৪, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

পরিবেশক :

টিটাগড় পেপার মিল্‌স্ কোম্পানি লিমিটেড

এবং

হুগলি ইঙ্ক কোম্পানি (প্রাইভেট) লিমিটেড

নেই। ঘর ছেড়ে বসত গেড়েছে মানুষ। একেবারে নদীর পাশে পাশে। লাল হেঁতেছে জেটির। নৌকোর ভিড়। মাঝিমাল্লা-লস্করের গায়ে-গায়ি। কারখানার চোঙ উঠছে আকাশে মুঠি তুলে। ধুলো হয়েছে। যেন শাসাচ্ছে মানুষ। ফলতা পেরিয়ে কাশীনগর ভবানীপুরের দিকে যায় না বড়। লোকজনের বড় ভিড়। হুগলীর পশ্চিম কিনারে তারা আশ্রয় নেয়। ভাসতে ভাসতে আবার এগিয়ে আসে। তাইনে হাতছানি দেয় গুলকুনিয়ার খাল—চোরপালি—দায়েরখালি। ঝিলই আর রাইমঙ্গলের মোহানা। দুলদুলিতে ছিল অনেক ভাল ছয়ন মাঝি। ঘর বেঁধেছিল—বিয়ে করে বউ তুলেছিল ঘরে। সে ঘর গেছে গোসাবার আগুনায়। ছয়ন মাঝি গোসাবার আগুন ঠেলে ঘর থেকে যে বেরিয়েছিল আর ঘরে ফেরেনি। এখন ছয়ন আর মাঝি নয়, গেরো—গাঁইয়ার। লুটেরিয়ার বহর চালায় সে। হুগলীর মোহানায়—গোরাপালির জটলা-পাকা জঙ্গলে ঘর পেতেছে। জলের ওপর হোগলা আর বন-বাসকের জঙ্গলের আড়ে আবডালে তিনখানা বাছাড়ি নৌকো বাঁধা থাকে তার। ওদিকে আগে আগে ভিড়ান দিত ছয়ন গেরো। দুলদুলিতে রেঁধে-বেড়ে খেত। রাতটা কাটিয়ে আসতো। এখন সে আস্তানা নেই। চব্বিশ পরগণার খালকটাও বুজে এসেছে। কোলকাতা মানুষের রাশি রাশি রদ্দি টেনে টেনে ইছামতী বুজলো। ভাটপাড়ার নয়ানজুলি বুজলো। হালনাবাদের তলায় তলায় দাঁড় পাকে লুটছে—তার খবর রাখো? ডায়মণ্ড হারবার আড়ে প্রস্থে বাড়ছে। কাকদ্বীপে কুলপীতে শহর বসেছে। হলদিয়ায় হলো গঞ্জ। কোথায় যাবে লুটেরিয়ারা? না হুগলী। হুগলীর পশ্চিম পাড়ে—গোরাপালি বরাবর জঙ্গল ঝুলে এসেছে নদীর জলে। শুঁড়ি খাল চৌদ্দ মেরে ডাঙার দিকে ঢুকে গেছে। আওড়ের সৃষ্টি হয়েছে। ঐসব বিল-বিলের আচালে গা ছাপায় ডাকাতে নৌকো। লুটেরিয়াদের নৌকো। মা ভাগীরথী বাঁচায় না, কোলে করে বাঁচায় মোহানা হুগলী। ঐ হুগলীর মোহানায় কালকূট উদ্গেরেছে কালনাগ—বিষ। বিষ-বেদেনীর ঘর বেঁধেছে ওরই কিনারে। আর ঘর বেঁধেছে—টালির ঘর ঐ বিষণ গেরো। বিষণ এখন গেরো নয়—এককালে গেরো ছিল। এখন টাকাকড়ি জমিয়ে বসে গেছে। ঐ ছয়নের দেশের লোক—দুলদুলি ঘর।

বিষণ কারবার খুলেছে। পাইকেরী কারবার। লুটেরিয়ারা মাল পেলে গুছিয়ে দিয়ে আসে বিষণের কাছে। বিষণ চালান দেয় কটিকচাঁদের দোকানে। কটিকচাঁদ এককালে নিজে ঘুরে ছিল। এখন দোকান খুলেছে ডায়মণ্ড হারবারের বাজারে। মদলাপাতি-ঘুনিহারি দোকান। সবরকমই রেখেছে কটিকচাঁদ। লুটেরিয়ারা যা পায় তাই এনে তোলে দোকানে। হুল্কার লোক আনে কোলকাতা থেকে মাল আনায় কটিকচাঁদ। দালালরা মাল আনিয়ে দেয়। কিন্তু ভেতরে ভেতরে কালোবাজারি খুলেছে কটিকচাঁদ। কে তার খবর রাখে।

বাছাড়ি তিনটি রাত দুই প্রহরের আগে বিষণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। তবে নগদ টাকা ক'টা পাবে। ছয়ন ভাবছিল, খালি গেরোখালি পেরুলেই হয়। তারপর জাহাজের হালে চালে গিয়ে কাশীমপুরের বাঁক ঘুরে সোজা গিয়ে উঠবে ডায়মণ্ড হারবারের কিনারে। গঞ্জের আওতা থেকে অনেক দূরে নদীর কিনার ঘেঁসে বিষণ গেরোর ঘর। টালিছাওয়া ঘর। চিনতে অসুবিধে হবে না। খবর দিলেই মাল খালাস হয়ে যাবে কয়েক মুহূর্তে। নগদ টাকা কিছু মিটিয়ে নেবে—যা দেয়। তারপর মোহানা টপকে যে যার ঘরে উঠবে। আবার দিনক্ষণ দেখে বেরুবে লুটেরিয়ারা। শুধু কি তারা? কত কোথায় আছে। কোন্ দিকের নদীতে, কত গভীর মোহানায়, খোপে খাড়ে—কে কোথায় ছড়িয়ে ছড়িয়ে আছে কে তার হদিশ রাখে। তবে লুটেরিয়া বাছাড়ি বোঝে অপর লুটেরিয়া বাছাড়িকে। চিহ্ন দেখে, হাব-ভাব দেখে বুঝে নেবে। ঠিক চিনে নেবে। ইশারা দিয়ে জানিয়ে দেবে, আমরা এখানে আছি, এসো না। এলে বিপদ হবে।

গড়-গড় করে মেঘ ডাকলো। বুড়ো হিমুর গলা কেঁপে গেল, 'ঠাকুরের নাম নে ধবীর, আমরা খান এইসে যাই। শালার চৈত্যে তো কিছুই দেখি না—' খাঁখা চোখ তোলে হিমু।

ধবীর বললো। যোয়ান ছেলে যা বলে তাই বললো ও, 'ঠাকুর তুমার ইয়ে করেছে। বয়েস বাড়লা, বাত-কেনা মানুষ তুমি, রেতে ছাখ না। তাতে ঠাকুর কি করবে?'

'ঠাকুর কী করবে?' দাঁড় ছেড়ে ঘুরে বসেছিল হিমু। বলে, 'শালা আমার সুমুদ্দির গ'—দেখবি দেখবি—'

আমাদের শারদীয় অভিবাদন

গ্রহণ করুন

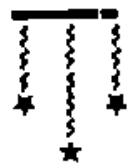

এন, কে, গসেন এ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

ফটো, অফসেট ও লেটার প্রেস প্রিণ্টার্স

৭।১, গ্রাণ্ট লেন, কলিকাতা-১২

ফোন :
লেটার প্রেস বিভাগ
২২-১১১৪

ফোন :
ফটো-অফসেট বিভাগ
২৩-৬০২৩

তার মানে ভাল করে চেঁচিয়ে দিতে পারে দুরন মেয়েকে বকেটা বলে উঠল। দুমদাম করে দুটো অন্ধকারের পিঠের ওপর পড়ে যাবে তাহলে। মাঝুর চেহারার নামে অমন বিশ্রী কথা বলবে, তার জন্ম হাতে-হাতে পাওনা যাবে। ঘরে সাজা হবে দুরন সর্দার।

আলোর বহুটি থেকে গোপীর গলা শোনা গেল, 'ডাঙ্গাতে কত, ই কিন্তু বরাবর দেখে হয়। উই তো দেখা যায় খেয়াঘাটির লাগো লেইট।'

চুপ, আর চুপ—।'

দুরন মেয়ের ধমক। চুপ মারলো গোপী। কাঁচা বয়সী মেয়ের কি করে বুঝবে, সিধা বরাবর না যাওয়ার কারণ কী? আর এইটা যে লাগের আলো তা যা কেন? ফুর্তিবাজ মাঝিমাল্লাদের অমন আলো যখন তখন রাতেবিতে জ্বলবে ইটাই স্বাভাবিক। পরতেকো মানুষকে কালগ্রাসে ঠেকে মেরে তাক পাতে মায়াবিনীরা। তবে দেখেশুনে যেতে হয় আলোর প্রতি-প্রকৃতি দেখতে হয়। লগের লাইট বড় হবে লাল হবে। ঘন লাল নয়, মাখা লালচে। ঘন বহুরের ছেলে নিতাইকে দুরন মেয়ো শেখাতো, 'হা হা উই যে দেখছিস লেইট, নইড়ে না, চইড়ে না—আসবেনের শুকতারার মতন চেইয়ে আছে এক সাইটে—উই লগের লেইট। আর দেখবি, যে লেইট লাল নয় হলদে, নীলচা হাবর—বাবারেটা দেখতে সোন্দর, এট্টুস নইড়ে-চইড়ে তুমার সঙ্গে সঙ্গে চইলেছে—জানস্, উর মতি মোদ্দ। তবের ভিরকুটি দেখিয়ে ঘাড় মটকাবার তর খুঁজছে শয়তানী। তুই নৌকো ভিড়াস না কেতাই। সাবধান!'

দুরন চোখের পলা খুলে অন্ধকারে তাকিয়ে আছে। আলোটাকে একটু সন্দেহ হয়েছে তার। অনেক দূর এগিয়ে এলো তারা। বাদাড়িগুলো জাহাজের হালে পড়েছে। তবু আলো তেমনি জ্বলছে সমান দূরে। 'ও দিনু, ভবীর, গোপীরা —উরা মেইয়ে যা—' দুরন মেয়ো শিস ফোটালো বাতাসে।

তিনখানা বাদাড়ি নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে গেল। বারোজন দাঁড়ি। সবাই তাকিয়েছে বরাবর। কেউ আলোটা দেখছে। কেউ এখনও সবটা দেখে নি। আশ্চর্য, আলোটা ছিটিয়ে গেল সবাইর নজর পড়ার আগেই। ধীরে ধীরে ছিটিয়ে গেল।

দুরন গুমরে উঠলো, 'দেখলি, দেখলি,—ব্যাটা দেখলি—'

গোপী বললে, 'হঁ দেখলুম।' ঘোঁত করে নিশ্বাস ছাড়লো সে। অনেকেই ছাড়লো। সবাই বুঝলো, লগের আলো এমনও দেখা যায় নি। এ আলো ডাঙার ডাকিনীর।

দুরন বললো, 'ঘর দাঁড় ঘর। চেইলে যা যাওক্ষণ না লগের লেইট না দেখি। বুঝলি'—সবাই বুঝলো। দাঁড় ধরেছিল তারা। আরও ঘাপটে ধরলো দাঁড়। জল কাটার শব্দ হলো। গজরায় দুরন মেয়ো—'শালারা দাঁড় মারতে শিখে নি। কৌতের বাসে আইচে? ঘুইরে মার দাঁড়, যান শব্দ না হয়—'

শব্দ হলো না। তিনখানা বাইশ হাত বাদাড়ি নৌকো। গুণটি মেরে সাপের পিঠের মতো ভাসতে ভাসতে হারিয়ে গেল। তর্ তর্ করে অন্ধকার চিরে এগিয়ে গেল।

গুম্-গুম্-গুম্। মেঘ ডাকছে। ঝলকা বিজলী চমকে গেল। ঝাপটা এলো। পুব থেকে, দক্ষিণ থেকে। মোহানা নদী ফুলছে, ফুঁসছে। নাগমতী হলদী নাগকন্যা ছড়িয়ে দিয়েছেন দশদিকে। ফণাকাঁপী নাগিনী। রাশি রাশি ফটলা পাকাচ্ছে চোখের সামনে। যেন রাত্রিটা জমে গেছে। কঠিন হিম নির্মম অন্ধকার। অন্ধকারের মানুষ কটি এগিয়ে গেল। তর তর করে এগিয়ে গেল।

॥ ২ ॥

রাত্রির আর দুই প্রহর, কি দুই প্রহর গড়িয়ে গেছে।

গেঁয়োসালির সীমানা জঙ্গল-জলার এলাকা পেছু ফেলে তিনখানা বাদাড়ি নৌকো ভাসমত হারবারের দিকে এগিয়ে গেল। জাহাজের হালে পড়েছিল নৌকো তিনটে। দুরন মেয়ো সরিয়ে নিলো নদীপারের কেয়াঝুপসিগুলোর ফিমার ঘেঁসে। একটু আগের বর্ষা থেমে গেছে। বাতাস একটু বয়েছে। মেঘছাওয়া আকাশের গায়ে দু-চারটে তারা এখানে ওখানে মুখ খুলেছে। ঘন মেঘ, মহিষ কালো মেঘ এখনও জমে আছে। হোগলা আর কেঁদাড়ের জঙ্গলের দীঘল সারি ছিটিয়ে ধানক্ষেতের জল নদীর গড়ানে নামছে। কলকলিয়ে নামছে। বাতাসে জলের গন্ধ, পচামাটির গন্ধ ঘনকে উঠছে। পাড়ের পাশের জল ঘন কালো। দু-চারটে জোনাকির চোখ জ্বলছে হারিয়ারি।

নৌকো তিনটে এগিয়ে গেল বিষণ গেরোর টালিঘরের দীমানায়। সাপে কোথাও ঘাঁচ খেয়েছে। মৃত্যুকান্না তুলেছে কালনাগিনীর শিকার। ঝিম্ ঝিম্ করছে তামসী শ্রাবণ রাত্রি। যেন জীবন্ত সে।

শেষ বাছাড়িতে পঞ্চমণির অন্ন হলো। টিনটিনে বেরিকেন একটা জ্বালালো। বাতি নিয়ে বাছাড়িটা এগিয়ে এলো সামনে। ছখন গেরোর বাছাড়ি বোঝা গেল। নদীর পাড়ে নেমে গেল আগে ছখন, 'তোরা কথাটা কইস না। আমি আসচি।'

কথা নয়। একটি প্রশ্নও কেউ করলো না। কোথায় যায় ছখন সর্দার। যায়, আবার ফিরেও আসে। লোক আসে সঙ্গে তার, পাউকে নিয়ে। বাছাড়ি-ভরা লুটের মাল তারা নিয়ে যায়। কত টাকা আসবে যাবে, তার হিসেব তাদের জানবার কথা নয়। জানে ছখন। সব বোঝে ছখন। তিন দিনের পর সব টাকা পাইকেরের কাছ থেকে নিয়ে তাদের ভাগ-বখরা চুকিয়ে দেয় গেরো তাদের।

কিন্তু কত ভাগ অংশ? রাতের আঁধারে যে মাল তারা তোলে তার পরিমাণটা জানা আছে তাদের। কিন্তু যারা তা নেয় তারা তার পুরো দাম দেয় না। আর দেবার কথা নয়। চোরাবাজারি মাল। দাম তখনকে সস্তা না হলে কিনবে কে? তাছাড়া মাঝে আছে মানুষ। গেরো,—ফড়ে দালাল—আড়তদার দোকানী। এরা মোটা লাভটা নেবে। লুটতিয়া-দাঁড়িদের কপালে কাইতানি-সাঙ্গাল, পোষ-পোড়া রয়েছে। কার্তিকের অভাবের দিন, আর পৌষ-মাঘের গঙ্গায় মরসুম নামে—পোষ-পোড়া। লুটতিয়ার চোরাবাজারি জীবনের ওপর এ দুটো মরসুম পড়তি যায়—দুর্দিন, খাঁটি দুর্দিন থাকে বলে। কত্তালীর কালিকা কুঁপেন। দক্ষিণে বাতাসের নিশাও হয়। তানা ঝাঁপিয়ে আসে উত্তরে হাওয়া। নদীতে কুয়াশা হয়। মহাজনী মাল-বোটের মাঝি রাতে নৌকো ছাড়ে না। রাতের সুবিধে নেই। সুতরাং লুটতিয়ার কপাল ভাঙে। দিনেমানে লুট চলে না। সারেঙের খালাসী আছে, জল-পুলিশ আছে। ঘিরে ফেলবে তা হলে। ধরলে মরণ নেই, ধরলেই মরণ।

মরণ নিয়ে কারবার খুলেছে লুটতিয়ারা। তাদের মরন বাতুলে জলে মেশেছে। রাতদিন জলের ওপর জীবন। এ জীবন থেকে পরিত্রাণ নেই এই দিকহারা মানুষগুলোর।

ছখন গেরোর গোষ্ঠীতে বারোজন দাঁড়ি। লুটতিয়া-দাঁড়ি। দাঁড় ধরে, দরকার হলে গুণও টানে; আবার ভাসান দিয়ে কুমীর-কামঠের জিম্মের ওপর দিয়ে বাছাড়ি নিয়ে ছোটে। কোথায়? না, ঐ যে মাল-ভারি নৌকোটা আটকে গেছে বোঝায়,—তা নয় জাহাজী-হালে বেতে বেতে পাশটি মেরে বসে গেছে নদীর বক-চড়ায়। চড়াই-খাওয়া নৌকো। মাঝি জানে, চড়া তাদের বাঁচায় না, মারে। একেবারে প্রাণে মারে। জলের জীবনে তার জলই দরকার। গভীর গহীন গাঙ। বাঁও মারলে বাঁও ডুবে যাবে। মাল-ভারি হাজারমণী বোট তা হলে চলবে। এই গহীন গাঙ চায় মহাজনী বোটের মাঝিরা। কিন্তু লুটতিয়া মাঝি—গেরো, চায় অন্য জিনিস। সে জল চায়—গভীর হোক, অগভীর হোক তার চলবে। কিন্তু বক-চরগুলোকে চেনে সে সব। বোঝাগুলোকে গুণে রেখেছে। ঐগুলো তাদের ভারি প্রয়োজনের। বক-চরে—বোঝায় মাল-নৌকো আটকা পড়ে। এটা তো তাদের দরকার। কত্তালী মা, গোটা নদীটা বক-চর আর বোঝায় ভরে দিও মা! তা হলেই হয়েছে। চড়াই-খাওয়া নৌকো লুট করে, বাছাড়ি—তাদের সাড়ে-চার ইঞ্চি জলের ওপর দিয়ে চড়াই ডিঙিয়ে পালাবে। ভয় নেই, লুটতিয়া বাছাড়ির আটকা পড়বার ভয় নেই। ভয় শুধু কাইতি-সাঙ্গাল আর পোষ-পোড়াকে। ওরাই আটকায়। প্রাণে মারে লুটতিয়াদের।

তবে প্রাণে মরে না গেরো। ছখন জানে, দাঁড়িগুলোর অবস্থার আর শেষ থাকে না। তবু তার চলে। আর যে দুটো মাল-নৌকো পায়, তাতে তারই লাভ সবচেয়ে বেশী। কেন না, ধারে মাল দিতে হয় তখন ফড়েকে, আড়তদার ব্যাপারীকে। পৌষ পেরিয়ে মাঘের দিকে এখানে-ওখানে মেলা বসে। বড় বড় মেলা—বারোয়ারি। মাল বিক্রি করে ব্যাপারী সেই ফিরবে ফাগুনের দিকে। তখন টাকা। এক মাস জল-কাদা পেটে দিয়ে ধুঁকবে লুটতিয়ারা। তবে, ধার হলো মাহ—। ধারে টাকা দিয়ে কপয়সা আসলে পায় গেরো? আর গেরো যা পায়, কত আর দেবে লুটতিয়া-দাঁড়িদের! সব টাকাই প্রায় শেষে

ছেলে মেয়ে। তবে আর একটা ব্যাপার আছে—পঞ্চ-সপ্তর বেলার ব্যাপার নয়। কিন্তু হয়। লুটিয়া ঝিনির বন্ধুদের ঐ একটা দিনে মোহানা হলদীর কাছ থেকে দুটি করে মাছ পায়। শুধু মাছ না, অন্যান্যও কিছু থাকে। এমন কি ঐ সময় একটু বেশী করে লুটিয়া ঝিনি-মানুষ। মেঘলা সকালে একটা ডোঙ্গা নেয় ছয় মেয়ে ঝিনির তারা বেরোয় থাকে। একটু দূরে হয় ঐ সময়। মহাজনের ঘরে-তৈরী কাঁটায় তারা মোহানা হলদীর পারে গিয়ে পড়ে জানবার এইবার ঝাঁচাল মা জাহ্নবী! গঙ্গার ঘাটের অভ্যন্তরী ঘাটে ঘটে বুঝি ঝিনি না, মুলদীঘাটের দুর্দিন করিয়ে দে। মাছিও এক ছটাক নেমি না বন্দরটী। কোথে মহাজনীও নেই যে মনিহারী দোকান খুলে বসে কাপড়ী হই ছেলে-কৈবর্ত, মেয়ে-বেলাজিও নই ম। সকাল করে হয়ে চালান নেমে সাথ টাকার পাশের দাঁড়িয়ে হয়ে বেড়াইনে। সামান্য লুটিয়া মেয়ে ডোঙ্গা তুলে এসে বসে রেখেছি। বড় অসম মানুষ মা আমরা। দেবার মানুষ নই, আনা মেয়ে। আধা মেয়েদের আলা তো সব বুঝিস্ না জাহ্নবী!

বুকের নীচের রক্তস্রোতের মতো জোয়ার-ভাঁটা আসছে যাচ্ছে গঙ্গায়। হলদীর মোহানার ভাঁটায় যেন জোয়ার বেশী পায়ের জল ভাঁটিতে না ভাঁটিতে নদীর জল গিয়ে ঢুকতে পড়লো মোহানায়। ফুল ছাপিয়ে আবার জোয়ার উঠলো। উজান ছুটলো জোয়ার, ওপরের দিকে। আসলে ওটা গাঙের জলের ঠেলায় ধমকে-দাঁড়ানো নদীর জল। এই ধমকে-দাঁড়ানো বেশীক্ষণের নয়। আবার জোরের বেগ বাড়বে। নদীর মোহানার দিকে জল নামবে। নাম ভাঁটা। এই জোয়ার-ভাঁটার লীলায় মোহানা নদী যাতে। আর যাতে এপারে হলদী আর ওপারের আমরা আর যাতলা নদী। রাইমঙ্গলেও জোয়ার শুনেছি প্রখর।

সুধাম জানে, প্রখর মানে, খুব প্রখর। ছয় মেয়ের একছেলে চোখের মণি ঐ নিতাই। ঐ নিতাইর বন্ধু হলো সুধাম। সুধাম আগে গল্প করে বলতো, 'না না এ তুমা কথা নয়, চৈতের গাথা। বয়জান নগর আমার ঘর আছিল কিনা —ঐ রেইমঙ্গলের পাশ।'

নিতাই গভীর চোখ মেলে মোহানা সুধামকে দেখতো। কালো দেখতে তার বন্ধু। তবে রূপ আছে। মাথার বাবরি চুল আছে। নাকটা নিরোলা সরু। চোখের ভ্রূ জোড়া। বেঁটে চেহারার মানুষ। গায়ে গভর খুব। যেন একটা জলহাতির গড়ন। বন্ধুকে ভালবাসে নিতাই। যে বাড়াডিতে দাঁড় ধরে সুধাম, তাতে হাল ধরে নিতাই। বন্ধু তার দাঁড় ধরেই হালের কাজ সেরে যায়। শুধু হাল ধরে বসে থাকে নিতাই। হাল ধরে বন্ধুর মুখের গল্প শোনে। শুনে বিভিরে পড়ে নিতাই। কথা বলে না।

সুধাম বলে, 'যাখন তাখ জুয়ার তাকে রেইমঙ্গলের, আমি নিশি রাইতে চিঠি ভাইসা একলাটাই সিধি। ডরডার ছিনু কিনা। না গিয়া করমু কি। ডরের কথা ভাবলে তো আমার চলবে না বন্ধু। ওটা মানুষকে আমাকেই চলাইতে হইত যাইত দিন। ডেকাইতের বড় আড়ত ঐ সব ঠাই। চাইর গণ্ডা চৌকিদার রইত নদীর আড়বাকে। বেবাক ঘাটুলায় পাহারা দিবার লেইগে। শালারা বেবাক ঘুমাইত। আমি তখারক করতাম।'

'খুব খুবে ছিলি না রে সুধা—' নিতাই বন্ধুর দিকে তাকাতো। গভীর চোখ মেলে তাকাতো।

'খুব?' সুধামও চোখ তুলে বলতো। বলতো, 'খুবের নাম লওনের কাম নাই মিতা। অখন সেই খুবের কথা মনে পড়লে পরানটা পীড়ায়। রমজাননগরের দিনমান ফুলদিন জেওনে আর আসব না। সে সব দিন গেছে মিতা। তবে কি জান বন্ধু, আইজকাল সেই সব দিনের কথা মনে পড়ে।'

'কিন্তন সে সব দিন যে আর নাই'—নিতাই বলতো।

'নাই, সে আমি জানি। তবে তর লাগান বন্ধু পাইছি। এইঠা আমার সুখ। আর তো বেবাক ভাইসা গেছে রেই-মঙ্গলের আশ্‌নায়। বাপ-মাও-বইন ছুড় ভাইঠা—বেবাক তো গেছে—। আর তাবে আমিও ভাইসছি হুগলীর মোহানায়। আমার আর কে আছে বন্ধু! অখন তো তর কাছেই আমি বান্ধা।'

নৌকোর হাল ছেড়ে উঠে আসতো নিতাই। নৌকোর ঘুর থাকতো না। দাঁড়ের পাখনা তাসিয়ে রাখতো সুধাম। জানে সে, বন্ধুকে জানে। নিতাই বড়ো ভালবাসে তাকে। তারই তরসায় হাল ছেড়ে ছাছাড়িতে বসে থাকে সে। সুধাম বাঁক দিয়ে দাঁড় ঘুরিয়ে নিতো। সোজাসুজি বাদুড় উঠে

এসে গলা জড়িয়ে ধরতো মিতাই। বলতো,'সুধা, তুই কি বলবি তাই। আমরা কোথায় লাগে। তুই বাপু মা, বাপু না- তুই আমার বন্ধু।'

বড় স্বস্তির চোখ মেলে দুজনে দুজনকে বাচতেদিনে দেখেছে। জাতের মুখে বাহাদুরি নিয়ে ছুটেছে। দুরন গেরোর নৌকোর পাশেই পাল্লা দিয়ে চালিয়ে নিয়েছে বাহাদুরি। গোপীর বাহাদুরি পেছিয়ে পড়তো সাত হাত। দুরন প্রশংসা করেছে ছেলেকে, হালদারি মিতাইকে প্রশংসা করে বলেছে, 'সাবাস বাপু, আমি মরলে গেরোর মান রাখিস তুই। আমার হালকাঠ তর হাতে দিয়ে যাব—রে মেতাই।' দুরন গেরো প্রশংসা বা করুক নিজের ছেলের। কিন্তু প্রশংসা গিয়ে পড়তো সুধামের ওপর। মিতাই জানে, মনে প্রাণে জানে বন্ধুর দয়ায় বাহাদুরি ছুটেছে তার। তবু মুখ তুলে কিছু বলতো না। হয়তো বাপ বিরক্ত হবে। সুধাম তখন আঘাত পাবে মিছামিছি। তবে এক কথা। সুধামকে ছাড়া হাল ধরেনি মিতাই। জানে, ভাল করেই জানে বন্ধুকে ছাড়া চলবে সে পারবে না কিছুতেই। মাত্র তিন বছর আগের ব্যাপারটাও তো মনে আছে মিতাইয়ের। উনিশ বছরের বয়সী ছেলেকেও গাঁড়ি দিয়ে তেড়ে মারতে এসেছিল দুরন। দুমাস চুমাস করে পিঠে লাথি মেরেছে,—'শালার পো আমার, গাঁড়াল হয়ে জন্মেছেন। যা গো' চাইলা বলব পোষ পো না। ইয়ানে কমনে আইছিল হাত মেরতে গেরোর নৌকায়। যা ভাগ—।'

মিতাই জানে এই অপমান থেকে ওকে বাঁচিয়েছে সুধাম। বন্ধু ওকে বাপের দুর্ব্যবহার প্রশংসার ভাষা করেছে। কিন্তু মিতাই এক কথাও বলে নি। কেমন যেন সুধাম, কেমন যে সে মানুষ—চিনেছে মিতাই বন্ধুকে সে মিশেছে চিনেছে।

বন্ধু বসে আছে অন্ধকারে। গলুইর ওপর হাল ছেড়ে এখনও বসে আছে। দুরন গেরো নেমে গিয়েছে বাহাদুরি থেকে তার। বাপের বাহাদুরির পাশেই নিজের গাঁড় ঠেকিয়ে দূর গাছের দিকে তাকিয়েছিল মিতাই। এই ঠাণ্ডা বাতাস। মোহানা নদীর জল-পিয়া হিমেল বাতাস। একটু আগে ঝড় থেমেছিল। ঝাপটি দিয়ে নদীটা ফুঁসে উঠেছিল। পাড়

ESTD. 1882 Phone : 44-4118

Specialists in

* FRUIT PLANTS, FOLIAGED PLANTS
* FLOWERING SHRUBS
* BULBOUS PLANTS, ROSES
* CHRYSANTHEMUMS
* DAHLIAS, ETC., ETC.,
* VEGETABLE & IMPORTED FLOWER SEEDS A SPECIALITY

Catalogues free on request.

Winners of :

VARIOUS PRIZES, CUPS, MEDALS & CERTIFICATES, ETC.

THE IMPERIAL NURSERY

9, RAI CHARAN PAL LANE. CALCUTTA-14

[illegible] এখনও কাটে নি। [illegible] ঘুঘুনি বেয়ে ঘন ঘন রক্ত ঝরছে। হাত ছেড়ে উঠে গেল নিতাই সুধাময়ের কাছে, 'অমন হাত কত হবে সুধা?'

হাত স্থির কত থেকে ঘরে না। ডাইনে বামে ঘন কালো অন্ধকার। পুবদিকে মেঘলার গুরুগুরু। মেঘুরের ঝড় উঠবে অকাশ ছুঁয়ে। ঐ দিকে মেঘটা আকাশে কিছু কম জমাট। ছোট দুই তারা দেখা যাচ্ছে। পশ্চিম দক্ষিণের আকাশের মেঘ ঘন গাঢ়। সুধাময় বললে, 'সন্ধ্যে ঝিকিং পর হইতে হাইত দুই পহর গেছে জানি। তার কাল উই লেক ঝিকা কইছিল শুনছি।'

নিতাই একটু ঘাবড়ায়। দেখে বন্ধুর বুকে রক্তলেখা রাখা। ব্যথা এখনও করছে। পরণের কাপড়টা এখনও ঘরে আছে সুধাময়ের পরিষ্কার বোঝা গেল। নিতাই কাছে এসে বললো। বললো, 'সুধা, মানুষকে ঠিকা চিনা যায় অমন কাম তো—বিপদে পড়লে। আর লুকা ঢেলা যাবে না। তারে ধরা যায়—'

'কাল অন্ধরে কি দেখলি?' এত কাছে বলেছে নিতাই হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়। গামছাটা খুলে মুখ পুঁছলে সুধাময়। পুঁছতে পুঁছতে কথাটা বললো।

নিতাই বললো সুধাময়ের দিকে তাকিয়ে, 'আমি ভরে বিলকের চিন্ন দেখছি—তরে চিনছি। আমার বন্ধু তুই সুধা।'

'বন্ধু যদি, তবে বন্ধুর বুকের ব্যথা বুঝ?'

'বুঝছি সুধা।'

সুধাময়ের দিকে এগিয়ে গেল নিতাই। ঘেঁসে গিয়ে বললো, 'আমি মাস খানিকের মধ্যে যাই হোক কিছু একটা ব্যবস্থা করব। তিন বাড়াড়ি দরকার।'

'না-না। দুইটা অপর চাইলে হয়। বাকী পিছন চ্যাটা কইরা দেবন্। তুই আর আমি যদি চাষ্টা করি তো বাছাড়ি দিতে কতক্ষণ?'

সুধাময়ের বুকের ব্যথাটা চোখের সামনে মূর্তি নিয়ে নাচছে। পাঁচ বছর আগে রহমানগঞ্জ ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল তারা। ছোট গাঁ ঠাঁকা করে তারা পালিয়ে এসেছিল। ফকালার ছিল সুধাময় রহমানগঞ্জের জোয়ার। ফকাদোরি চলে গেল সুধাময়ের। দুনিয়াদারী ছিল না সুধাময়ের চরে বসে যায়। গরীব অভাবি মানুষ। গাঁয়ের অনেকে যাচ্ছে লুকিয়ে ছাপিয়ে। তারাও চলে এসেছিল একদিন রাতের অন্ধকারে। পাকিস্তানের বর্ডার টপকে এল কুড়ঘাট। বুড়োবাপ আসতে গিয়ে পথে পড়লো মারা। বয়সী বোন আর ছোট ভাইটার হাত ধরে এসে উঠেছিল শিয়ালদায়। শিয়ালদা থেকে ভায়মণ্ড হারবার। রায়মঙ্গলের জোয়ারের ঠেলায় যেন খড়কুটোর মতো ভাসছে মানুষ। গাঙের জোয়ার এসে ঠেলে দিয়ে যায়। নদীর স্রোতের মোচড় এসে আবার ঠেলে নিয়ে যায় মোহানায়। রহমানগঞ্জের মাটি ছাড়ার পর মাটি আর কুড়িয়ে পেলো না সুধাময়। গঙ্গার ঘাটে কুলি হয়ে খেটেছে। ঘাট-পুলিসের লাঠি খেয়ে পিঠ বেঁকে গেছে সুধাময়ের। ছুতোর, বলে এক আড়তদারের কবায় চলে এসেছিল ভায়মণ্ড হারবারে। বয়সী বোনটাকে নিয়ে ছোট ভাইটার হাত ধরে ভায়মণ্ড হারবারে এলো সুধাময়। ইস্টেশনেই কাটালো কয়েকটা দিন। ফেরীটাকা রোজ আয়। চলতো। তাতেই দিন কতক চালিয়ে নিয়েছিল সুধাময়। মাস তিন। তারপর একটু আয় বাড়াতে চেয়েছিল সুধাময়। সাড়ে চার টাকা আয় করতে গিয়ে মাল চুরির অপরাধটা জোটা এসে পড়লো তারই ওপর। সঙ্গের মারা ছিল তারা অপরিচিত। তারা নসদ ঘাটতে যায় আড়তে। সবাই বাতলে দিলে সুধাময়ের নাম। মালের বস্তাটা নাকি সেই চুরি করে ভরে এনেছে। আড়তদার ডেকে এসে কান ধরে ফেলেছিল তার। এত লোকের মাঝে তার অপমান। সোজা করে গলাটা ধরে ঠেলে দিয়েছিল সুধাময় আড়তদারকে একেবারে মেটির নীচে। তারপরে আরও কিছুক্ষণের ব্যাপারটা তার মনে পড়ে।

হাতাহাতি ধরা পড়েছে চোর। কত দিন হাজত হবে? ফাটক-বাস একমাস-দুমাস নয়। পুরো পাঁচ বছর। সাজা হয়ে গেল। কিন্তু সেরাস্তা কি হলো মানুষটা। তার খোঁজ কে নেবে? মানুষের মন! তুমি পেটো, দিনরাত পেটো তার ওপর। একদিন সেরানা ইস্পাত হয়ে যাবে। মৃত্যুর ভয় তাকে দেখালে—আর মৃত্যু তার থাকে না। সে মরে নিত্য। ইস্পাত হয়ে গেছে সে। কিন্তু গলাও—গরম কর মানুষকে, একেবারে তরল হয়ে গলে যাবে। তা

দিয়ে যা খুশি বানাও। মানুষ তাতে রাজী। কিন্তু মানুষ বুঝবে কেন এত সহজ কথা। ইস্পাত গড়ে সে গর্ব করে। এ সংসারের নিয়ম।

পাঁচ বছর পরে ডায়মণ্ড হারবারের জেটির ওপর বসে গোপনা বাতাস খেতে এলো সুধাময়। দাঃ, সংসারের একটা বড় ঝামেলা চুকে গেল। ভাইটা ছিল, কোথায় পালিয়েছে। বয়সী বোন কি আর পাঁচ বছর বসে থাকে? গিয়েছে কোথাও, অথবা অপরূপের হাটে বড়া দামে বিক্রিয়ে গেছে। এই নিয়ম, সংসারে কিছুই পড়ে থাকে না। সুন্দর অসুন্দর সবাই যাচ্ছে। তারপর শেষ পর্যন্ত কানা কলসি হয়ে পড়ে থাকে না কেউই। কিন্তু ভালভাবে জানে সুধাময়, সোনা —ঐ যে তার বোনটা নেহাৎ খারাপ দেখতে না। তবে বয়সের দিনে পেতে পারেনি বোনটা। তাই শুকিয়ে গিয়েছিল। ভাইটার গাল তুবড়ে গিয়েছিল —ঘুরে ঘুরে বেড়াতো এখানে ওখানে। শেষ পর্যন্ত, মা জাহ্নবী গো, কোথায় ছুটিয়েছিস মা তাদের। বেইমানে রাখিস বাঁচিয়ে রাস মা। বাপ-মাকে চোখের ওপর দেখেছি খেতে। দুঃখ হলেও আপসোস নেই। কিন্তু আপসোস! এদের যেন আমার চোখের ওপর থেকে কেড়ে নিস নি মা! কিন্তু মা করালী —তাই যদি নিয়েও ছিস তারা যেখানে থাকে বাঁচিয়ে রাখ মা। তাই আমি, আমার মনটা তো বুঝিস মা। আমি আর এর চেয়ে কি চাই।

মাস ছয়েক পাঁতি পাঁতি করে খুঁজেছে সুধাময়। না, হারানো ভাই-বোনের খবর কিছু নেই। একদিন সন্ধ্যায় জেটির ঠিক সেই রকে বসে গোপনা বাতাস খাচ্ছিল সুধাময়। রাত অনেক হয়েছে। গরমির দিন। জেটির পাশে পড়ে অনেকে ঘুমিয়েছে। রকে শুয়েছে কত মানুষ। ঘর-হারা মানুষের দলে মিশে গিয়েছিল সুধাময়। হুগলীর মোহানায় জলতরঙ্গ বাজে। ছলাৎ ছলাৎ জলের শব্দ ওঠে। জেটির পাশে—ক্যারাকে—হামারে এসে জল লাগে। শব্দ ওঠে ঘন ঘন। মোহানা নদীর মহিমা দেখতে দেখতে—জলের শব্দ শুনতে শুনতে—সমুদ্রের নোনা-গাওয়া গোলা বাতাসের স্বাদটা খেতে খেতে রায়মঙ্গলের কথা মনে পড়ে সুধাময়ের। রাতটা অন্ধকার। একটা নৌকো—ছিপ-টিপ হবে বোধ হয়, একটা হেরিকেন জ্বালিয়ে জেটির দূর রাকে গিয়ে উঠলো। নৌকোয় দুটি লোক। একটা টর্চের লাইট দেখা গিয়েছিল মাত্র একটিবার। তারপরই নিভে গেল। হেরিকেন নিয়ে কি যেন খোঁজাখুঁজি করছিল তারা। পায়ের বাঁচ দিয়ে তরতর করে জোয়ারের জল বয়ে যাচ্ছে। টর্চের আলোটা ঐখানে হারিয়ে গেছে। জলে পড়ে গেছে কিছু বোধ হয়। দুটি লোক জলে নেমে ঝাঁক ঝাঁক খুঁজছে। সুধাময় গিয়ে কথা না বলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জলে। ব্যাপারখানা সে বুঝেছে। গড়ানে গিয়ে পড়েছিল টর্চটা, ডুবে তুলে দিয়েছিল। নিতাই সেদিন চেনা লোক নয়। একটা টাকা বকশিস দেয় করেছিল নিতাই। নেয় নি সুধাময়। শুধুমাত্র চোলাচোলি হয়েছিল স্পষ্ট।

সেদিন না, নিতাইয়ের সঙ্গে দেখা আর একদিন। দুদিন গেছে সেদিন নৌকোয় নেই। তিন বাচ্চাকে ভাসিয়ে সন্ধ্যায় কোথাও শহরের দিকে গিয়েছে সে। নিতাই ছিল, বুড়ো হিমু ছিল—গোপী ছিল। আরও কয়েকজন ছিল মনে আছে সুধাময়ের। হঠাৎ বান ডাকলো মোহানায়। শ্রাবণের দিন। একাদশীর পর তিথিতে তিথিতে আগুনের ঢেউ

With best Compliments of :—

N. K. SOM & CO.
(EXPORTERS & IMPORTERS.)
1, CHITTARANJAN AVENUE
CALCUTTA-13

Phone : 22-4175. Cable : PULPODUCT
CALCUTTA.

বড় বাড়ি, জলের মধ্যেকার ঢুকে গেছে। সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ছিল না। বাড়ি হঠাৎ এসে পড়লো। বান এলো —ভয়ঙ্কর বান-চড়া বান। আড়াআড়ি তিন বাড়াতির একখানা ছিল—ওই ছিঁড়ে গিয়ে পড়লো জাহাজের হালে। ছুপাশে কয়াবেতি বাঁধা লম্বা জাহাজে, ইঁটিমার জাহাজ, ছোপড়ি জাহাজ বড়ো জাহাজও ছোট্ট গাঁয়ে বসেছে। যদি ধাক্কা লাগে তো উপায় থাকবে না। ঢেউয়ের জোড়, গাছে উঠেই ঐ মোটা জলেছিল হাতে হেরিকেন জ্বালিয়ে। যদি ছুটিয়ে নেয় তেও জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে গিয়ে উঠবে সমান সমান—

এ সময়ের বাইশ হাত বাড়াতি নৌকোর টাল? সবল কেমন সে? ফোস দিয়ে জল ছুটছে ওপরে। চলছে চলছে, চলতে চলতে নদীর বারদিনার—ওঠকোষ ভরিয়ে ছাপিয়ে ঢেউ-টেউ আগুনার জোড় কত নদীর। ফুলি দিয়ে ফোলা জল ছুটছে। প্রবলে অবতীর্ণ মা জহ্নুসুতা জাহ্নবী! বাড়তি ছুটছে বানের আগ্ ঠেলে। সামাল।

কিন্তু কেউ নেই সামলাবার। ছমন নেই। হিমু চোখে দেখে না। নদীর গোঙানি কাঁপছে। হঠাৎ জেটির ওপর থেকে কলরব করে সব হলো। একটি লোক ঝাঁকড়া চুল তার—কালো কপাল তার ওই দেখা যায় বানের গায়ে গা ভাসিয়ে ছুটছে। ঢেউ উঠছে ঝড় ঝড় কখন দেখা যায় মানুষটা। কখন দেখা যায় না। ঢেউ গেল, গেল। লোকটাকে দেখা যায় না। না, না আবার দেখা গিয়েছে। ওই ঢেউয়ের চূড়োয় ভাসছে।

সে পরম বাড়াতি ধরলো লোকটা। বৈঠার হাল থেকে ফাড় হয়ে গিয়েছিল। ওঁটে বাঁধলো আড়াআড়ি। একলাই ঠেলে জেটির কাছে ফিরে এলো। ছমন সেরো তখন ফিরে এসেছে। চমকে করছে সেই অন্ধকারে ছমন সেরোর চোখ। নিতাই চেয়ে চেয়ে দেখছে। সবাই—যারা ছিল, অবাক। বাড়াতির আড়ি এসে বাঁধলো নিতাইর আগ্ বাড়াতির হালে।

ছমন সেরো তুলও প্রশংসা করেছিল সেদিন, 'সাবাস, বাপ সাবাস—'

কি বলে, সাবাস! সাবাসি সুধাম কল্লীকে দিতে হবে না। সুধাম কল্লীর ঘর জমজমাট্। প্রত্যেকদিন কিন্তু বাইশ বাঁক জল ছেটে—বানের আগ্ ঠেলে বাঁচি পাহারা দিতে হতো তাকে। অবলীলায় পার হয়ে গেছে তরাতরার মোহানা। বর্ষাকালের সমুদ্রের হামার তোলা মাতলার বক্-চর থেকে কতবার চোর তাড়িয়েছে সে। তরা কোটালের রায়মঙ্গলের কোলে পাড়ি জমিয়েছে। নিশুতিরাতে নিজে ডুবে গিয়ে একলাটাই চোরাই মাল তুলেছে। সেই সুধাম। এই গুণেই এককালে রমজাননগর মৌজার হকদার সে হয়েছিল, সে কথা কি জানে কেউ!

নিতাই এসে জড়িয়ে ধরেছিল প্রথম সুধামকে, 'তুমিই সেদিন আমাদের ঘর উদ্ধার করছিলে না? আজ ফের তুমি বন্দরে এলে!'

মোটা গা তিজে গিয়েছে। কাপড়-চোপড় ভেজা। নিতাই নিজের গামছা দিয়েছিল সুধামকে। সুধামকে ফেরার সময় নিজের ঘরে নিয়ে এসেছিল সে। ছমন সেরো অবশ্য বাধা দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই ছেলে তার সুধামকে নিয়ে নৌকোয় উঠেছে। সব কথা পরে ভুলে গেছিল সুধাম। কেউ নেই তার এ দুনিয়ায়। ছমনের বাড়াতিতে গিয়ে বসলো তারপর সুধাম। তারপর এক বছর পুরো কেটে গেছে। বাড়াতির হালে গিয়ে বসেছে অবশ্য নিতাই। কিন্তু ধরে ঠেলেছে সুধাম। আগ-বাড়াতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে ছুটছে।

ছমনের সঙ্গে ঠিক যেন বনিবনা নেই সুধামের। ছমন যেন নিজেই ঈর্ষা করে বেশী। এককালে অবশ্য গায়ের গতর দিয়ে কড়াই করতে পারতো ছমন। এখন আর সে গতর নেই। গলে গেছে মানুষটা। তবে পুরনো হাড়ের গুণ আলাদা। চোরের হাড় কথা কয়। চাঁদনী রাতে ভোঁদড় দেখতে পাও। কিন্তু অন্ধকারে কি হলো? এখন মানুষও আছে নাকি—যে অন্ধকারেও চোখ জেলে তাকায়। পরিষ্কার দিনমানের মত স্পষ্ট দেখতে পায়। ঐ দেখো,—ছমন সেরো পারে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। লুটতরা-বন্দর পরিচালনা করতে হলে অন্ধকারেই চোখ জ্বালতে হয়। তা নয়, দিনের কাজ এ সব নয়। বয়স হয়ে মানুষ বুঝছে। তুমি পারবে না।

ছমন সেরো এই বয়সেও ভয় করে না। সুধাম গিয়ে আগলায়। ছমনের সঙ্গে গভরে-পাথারে টেক্কা দিতে চায়।

সুধাম কি করবে। বয়সের ধর্মই তাই। নিতাই বন্ধুকে চেনে। তাই নীরবে থাকে সে। শরীর তার ছিপছিপে। শক্ত নয় কোনকালে। ছমন গেরোর বেটার মত বেটা হতে পারে নি সে। নিতাই নিজেও জানে। তাই আপসোস তার তাতে নয়। বরং বন্ধুকে দেখে খুশি হয় নিতাই। ভাবে, বন্ধু আমার গেরো হবে একদিন।

ভাগের কড়ি গন্ডা পায় না। শাস্ত্রে আছে, পরমন্ত্র মানুষ বলে গেছেন। সুধাম একথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। লুটতরাজের ভাগের কড়ি খুব সামান্যই আসে তাদের হাতে। বেশীর ভাগই যায় ছমন গেরোর ট্যাঁকে। নিতাইকে গেরো করে যেতে পারে নি ছমন। তাই সন্তানের জন্যে সম্পদ জমিয়েছে ধরবয়সী প্রৌঢ় মানুষ ছমন। নিতাইর মা নেই। থাকলে যা দেখাশোনা করতো। ছমন ভেবেছে, যাবার আগে একটা হিল্লে সে করে দিয়ে যাবে। গেরো হতে পারবে না নিতাই—একথা জানে ছমন ভাল ভাবেই।

কিন্তু নিতাই ভাবে অন্যকথা। বন্ধু তার গাবে-গতরে পুষ্ট মানুষ। গরাণ কাঠির মতো সিঁটো শক্ত। হাল ধরতে পারে। দাঁড় বইতে পারে কোটালের আগুনায়। ঘটে বুদ্ধিও আছে পুরোদস্তুর। এমন বন্ধু সংসারে হাতের লাঠি। গা ভর দিয়ে দাঁড়ানো যায়। বিশ্বাস করা যায়। বাঁচতে হলে এমন মানুষ পাশে চাই।

আর তাছাড়া ভালবাসা বলে জিনিসটা আছে। মেয়েকে ভালবাসা—সে অন্য। তাতে মোহ থাকে প্রায় সবখানি। কিন্তু এ ভালবাসায় মোহ নেই—মায়া নেই। নিছক প্রাণে প্রাণে মিল, মনের মিল। আর জানো? বন্ধুত্বের বাড়া সম্পর্ক আর কিছু নেই। আমার ভালমন্দ মন্দভাগ, পাপ-তাপ বোধ, ভালমন্দ নিয়ে আমি মানুষ। তোমার মনপ্রাণ আমারই মত একছাঁচে গড়া। তাহলে এসো, আমরা দুজনে পা ফেলি একসঙ্গে। বন্ধুকে নিতাই বলে—ঠিক এই কারণেই। দুজনে দুজনের প্রতি বিশ্বাস আছে, প্রেম আছে, প্রীতিও আছে। তাই বন্ধু।

'বিবাহী মন বলে এক পদার্থ আছে এ সংসারে। তারা বলে, এ আবার কোন্ বালাই। মেয়েমানুষ নয় যে রস পাবার কথা। মনের আকুলি-বিকুলি মিটবে। তবে মিল কিসের? পুরুষ মানুষের আবার বেশী গলাগলি কিসের! হলেই বিপদ। সাঙ্ঘাত হলো সিঁদেল চোর। এ হিসেবী মানুষের কথা।

কিন্তু সংসারে তেমন হিসেবী মন ক'জনার? বেহিসেবী যে বেশী। কড়ায় গন্ডায় অঙ্ক মেলাতে পৃথিবীতে আসি নি। ওসেছি স্বাদ নিতে। ভোগবতী পৃথিবীর যা কিছু মিঠে,—প্রীতি-প্রণয়-বন্ধুত্ব—সবটার স্বাদ নেবো। তবে মানুষ। তাই এ পৃথিবী ভাল লাগে।

নিতাই ভালবাসে তাই তার বন্ধুকে। বন্ধু সুধাম ভালবাসে নিতাইকে। একেবারে সো-বেচারী ভাল মানুষ ছোকরা:—

পাশাপাশি বসেছিল সুধাম আর নিতাই। সুধাম একটা বিড়ি ধরালো। শেষ-রাছাড়িও কেউ বিড়ি ধরিয়েছে। অন্ধকারে দীপিয়ে উঠেছে অগ্নিমুখ বিড়িগুলো। হাত কিরিয়ে কেউ কেউ টানলো তাও টের পাওয়া গেল। অনেকদূরে গঞ্জের আলো দেখা যাচ্ছে। মালার মতো বিজলী বাতি। অন্ধকার আকাশের নীচে গাপটি মেরে রয়েছে যেন আলোর পাহারাদার।

অন্ধকারের স্রোত বয়ে চলেছে। প্রহরের পর প্রহর রাত্রি। দুপাশে স্রোত বইছে। ঘাতাস লেগে আকাশের মেঘও বুঝি সবল হয়ে উঠেছে। তিন রাছাড়ি এই চলমানতার মধ্যে অচল হয়ে রয়েছে। আলোহীন অন্ধকারে হারিয়ে গেছে যেন তারা।

হঠাৎ পাড়ের বালিবাঁকে খচ্‌মচ্ শব্দ হলো। একটা ঘুমন্ত তারা যেন ঝলসে উঠলো হঠাৎ। টর্চের আলো। ছমন গেরো টর্চ নিয়ে যায় নি। একটা হেরিকেন নিয়ে গিয়েছে। শুওরাং—। 'এই সুধা—' নিতাই ডাকলে নীচু গলায়। বড় ত্রস্ত গলায়।

সুধাম কথা বলে না। বিড়িটা চাক্ করে জলে পড়ে গেল। আলোটা সেও দেখেছে। বুড়ো হিমু গাছড়া বিছিয়ে পাটাতনে গড়িয়ে পড়েছিল। লোকী বুঝতে পারে নি ব্যাপারটা। বংশী নৌকোর গলুই থেকে উঠে এলো। কানে মুখ গুঁজে বললে: 'না, আমার কেমন সন্দ হয়। কী বলছ নিতাইদা।'

নিতাই সুধামের দিকে তাকিয়েছে। লোকটা আগে দফাদার ছিল—পুলিশের লোক। নিয়ম-কানুন আপন-

আদ্ধকার পরিবেশ সম্বন্ধে তাদের মোটামুটি ধারণা আছে। ফুল করে আবার আলোটা জ্বললো। কিন্তু বলবে নাকি সুলভ। বন্ধু কি ভয় পেল! টিপ্ টিপ্ করছে তার বুকটা।

সুলভ বললো, 'নোঙর তোল্ নৌকোর। মালারা টাকা পাইছে। নিতাই, তুমি তো এইবারের লেইটটা।'

'না, দেবদি সুলভির পুজোর ব্যাপার, তাই না গ' বন্ধু—'

লণ্ঠনটা তুলে পলাস্ করে নৌকোর ভুলোয় ওপরে। নৌকো দাঁড় টেনে ছুটল উলুবে। জোয়ার নিচ্ছে। সুলভ বললে, 'আর একটু বউয়ার তাইরের লগে আসতে দে। চন্দ্রাইল ঘাটে দেব বেবাকগুলার। ছুখন পেয়ে নেই,—তাই আন্ধার পাইয়ে শয়তানগুলা—'

কোথাও, অউকিরে জঙ্গল—বাদীরাছ দাঁড়িয়েছে নদীর। ওপারে ঘন বিল বনঝাড়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রাবণের মেঘলা ধরেছিল। অন্ধকারে তারা একসাইট মিশে গেছে। কাল ভেদে এলো অপরিচিত, 'এই, আগুন মিলবে গ মাঝি?'

জোর টানে মোড় ঘিরে বাছাড়ি ভেসে গেল নদীর মাঝে। সুলভ খুশিতে হাসলো—হ গ বউয়ার তাইরে একিবারে দুখেই আগুন দিব কাল-উলায়। আসো—'

খুশিতে মন ভেসে আর কথা বাড়ায় না লোকগুলোন। কাল মেঘে আবার কোথাও চলে গেল। আলো আর দেখা যায় নি। ডাকে আর শোনা যায় নি।

ভোরবেলাতে ছুখন গেরোর গলা শুনে চমকে উঠলো সুলভ-নিতাই। ছিনু বললে, 'এইরে রাত যে আর নাই। পেরতি তারা উঠ্‌লা।'

'উঠুক'—পাড়ের দিকে নির্নিমেষ চোখ মেলে ধরেছে সুলভ। নিতাই পাশে ঘুমিয়ে পড়েছে। ছুখন ডাকছে—'হেই—নেতাই—সুলা—আ-আ—'

কোন জবাব কেউ দিলে না। দেবার নিয়ম নেই। ঘিরে নেই লুটেরিয়া দাঁড়িয়ের। নীরবে তিনখানা বাছাড়ি নৌকো সুলভের বরাত মতো এগিয়ে এলো দূর বাঁক দিয়ে। সন্ধেবেলার জায়গাটা তারা ধার দিয়ে এসেছে। ফেব্রিকেনের আলোতে ছুখনকে অবশ্য চেনা যায়। সঙ্গে তার আরো জন কয়েক রয়েছে। পাড়কে তাদের ক্রমশ এগিয়ে এলো। বিষণ গেরোর নৌকো।

রাত তিন প্রহরের সময় নৌকোর মাল পালাস করে টাকে টাকা গুঁজে আবার মোহানা নদীতে ভাসলো ছুখন গেরো। তার তিন বাছাড়ি নিয়ে ভাসলো। বিষণ গেরোর নৌকো ব্যাপারীদের নিয়ে গঞ্জের দিকে হারিয়ে গেছে। লুটের সাম্রাজ্য লুটে নিয়ে গেছে। যে ক'টি টাকা—সে যেন আসল দাম নয়। যেন মোহানা হলদীর মেহনৎ ময়ার দাক্ষিণ্য এটুকু।

॥ ৩ ॥

এখন শ্রাবণের মরসুম। মোহানা হলদীতে নৌকোর যাতায়াত একটু বেশী। উত্তর থেকে ভাউলের পর ভাউলে ভাসিয়ে ব্যাপারীদের মাল চালান যাচ্ছে। সবরী আম—আখ গুড়ের ভাগা যাচ্ছে। কোলকাতার ঘাটে বোঝাই হয়ে আছে মলমলপাতি-চিটেভামাক-চিনি-মসলার বস্তা—স্টেশনারী জিনিসপত্র। ফলতায় উঠবে—বজবজে নামবে—কাশীমপুরে থাকবে। গেরোপালির সঙ্গে ঝদে থাকবে দুদিন। মহাজনী নৌকো বেশী জমলে তবে অগতির গতি। গেটপাস হবে। আর কতক সোজা চলে যাবে ডায়মণ্ড হারবার উত্তরে—কাকদ্বীপ-কুলপী-লক্ষ্মীকান্তপুর। বেটপুরের খাল পেরিয়ে পাথরপ্রতিমার দিকে যাবে। গঙ্গাধরপুরের দিকে যাবে। রামনগরের কড়ে দোকানীর মাল তুলবে। যারা পশ্চিম থেকে এসেছে, তারা যাবে অনেকদূর। হলদী পেরিয়ে তালপাটি। তালপাটিতে মেয়ে-মেয়ে সেটুয়ার মোহনায় 'পারা' কেরবে। পারা হলো নোঙর। আবার কতক ছুলপুট পেরিয়ে মৌলার আড়বাঁকের দিকে এগিয়ে যাবে গঞ্জের গমনে।

গঞ্জ থেকে গ্রামের দিকে নৌকো যাবে। যাবার সময়ই বেশী নজর রাখে লুটেরিয়ারা। পেটেন্ট মালের দিকে তাদের ঝোঁকটা বেশী। কাঁচামাল নিয়ে কি হবে। তাতে মুনাফা ষোল-আনায় দু'আনা। চৌদ্দ-আনা মনে প্রাণে কামনা করে লুটেরিয়ারা। লুটেরিয়া কেন মানুষ মাত্রেই। লাভটা বেশী চাই। লোকসান নিয়ে কি করবো। ছেঁড়া ঝুলি নিয়ে শিবসন্ন্যাসী সাজতে সংসারে কেউ আসে নি।

গাঁয়ের ঘাটলা থেকে—হাটবাজার-গোদামঘর থেকে শহরের দিকে পাখনা উড়িয়েছে মানুষ। ভাউলে ভাসিয়েছে,

পানসি নিয়ে যাচ্ছে, মহাজনী বোটের ওপর-নীচ ভরে দিয়েছে। কাঁচা শণপাট যাচ্ছে, পান যাচ্ছে, নারকেল যাচ্ছে—এ সবে-মূলো-কাউন যাচ্ছে। আর সবাইর নীচে লুকিয়ে লুকিয়ে চালের বস্তাও যাচ্ছে।

'আর কি আছে হে মাঝি ?'—

'আর কিছু নেই বাবু—এই মাত্তর'—জলপুলিশের বা গেট-তল্লাসীর প্রশ্নের জবাবে নৌকোর মাঝিমাল্লা ভাসা ভাসা চোখ তুলে ধরে।

'শুধু খড় নিয়ে চলেছ ?'—

'আপের যা হালচেল বাবু—' মাঝি হাত মোচড়ায়। চোখ ফেরায় অন্যদিকে। এবার বোঝ ব্যাপারটা। এককালে ধানচাল নিয়ে যেত খোলাখুলি। ধরপাকড় ছিল না। এখন ধরপাকড় চলেছে। তাই খড়ের তলার নিচে চালের বস্তা সিল-আঁটা হয়ে যাচ্ছে। বেশী কিছু বললে—দু-দশটাকা ট্যাক থেকে বের করলেই হলো। জলপুলিশ-গেটকিপার বাবু হয়ে যাবেন তখন। ঘরে গেল কর্তব্যরক্ষা। টাকার কাছে কর্তব্য আবার টেকে কই ?

মোহানা নদীতে পথ আগলে বসে আছে লুটতিয়ারা। রাতদিন জলের ওপর জীবন ভাসিয়ে দিয়েছে। তোমরা যাবে শহরের দিকে,—যাবে যাও। ফেরার সময় দেখা হবে।

কলতা পেরিয়ে আরো উত্তরে এগিয়ে আসছে ছয় পেয়োর বাছাড়ি। বজবজ পেরিয়ে যাবে নাকি। কি যে মতলব। কোথাও একটু থেমে দাঁড়াবার উপায় নেই। নদীর দুপারে শহর মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে। শহর-গ্রাম মিশে কোথাও আধা-শহরের বসত পড়েছে। গঞ্জ হয়েছে যেখানে সেখানে। নদীর কিনার পর্যন্ত একেবারে পান বাঁধা। ট্রাক-বাস-লরী ভিড় করছে। গরুর গাড়ী-রিক্সা দাঁড়িয়েছে। মন চায় নিতাইর একবার উঠে দেখে। রিক্সায় চাপে।

'রিক্সায় বসিস নি কুনদিন ?'—সুধাম বন্ধুর দিকে চেয়ে হাসে।

একপাল হারলা হাসি হেসে নিতাই বলে, 'এইবার বসব রে সুধা—তরে নিয়ে একদিন শহর দেখতে যাব।'

'আমি বহুত ঘুরছি। ঘুইর‍্যা আর তেমন জুত পাই না তুরে—' সুধাম বলে।

'কান কান, শহর বলে কথা—?'

'ঐ হয়। সেথম ঐ হয়। দু-চাইর বার ঘুরলে আর জুতের কাম নাই। আমি তো ঘুরছি—আমার জানা আছে।'

বন্ধুর অভিজ্ঞতার কাছে আত্মসমর্পণ করে নিতাই। প্রায় তারা একবয়সী। তবু একটু পাকির করে নিতাই-সুধামকে। নিতাই বলে, 'তরে নিয়ে যাব একদিন। ঘুইরে দেখাব আমার দেশারি কমন সিদিরপুরের ডক, আলিপুরের চিড়িয়াখানা—সুকসাইট। আরও কত কি যে রইছিলি সেদিন।' সুধাম হেসে বন্ধু নিতাইর চোখ ঝলমল করে।

জেলেদের নৌকোর সঙ্গে মিশে গিয়েছে তাদের ছিপ-বাছাড়ি। জেলেদের নৌকোর গলুইতে উঁচু করে দাঁড় বাঁধা। কাঁড়ারে জাল শুকচ্ছে। ছইতে জাল টানা আছে। কতক দাঁড়ানো হচ্ছে পালের কাছিতে টাঙিয়ে মাস্তলের গায়। কেউ পাটাজলে ফেলছে। সেইজাল তুলছে। ইলিসের মরসুম কিনা। উত্তর থেকে বাগ-বাজারি বজরার মতো ডোঙা-ডিঙি-পানসি-বাছাড়ি ভাসিয়ে মাছ ধরতে এসেছে রাজবংশী মানুষ। কালো কালো দেহতে। গাঙ-খাল-নদীতে ঘুরে ঘুরে জলে ডুবে পলিমাটি ছেনে রঙ পোড়ামাটির মতো চিকন কালো। আর কালো বাছাড়ি ভাসিয়ে কালো লুটতিয়া মানুষগুলিও মিশে গেছে। জেলেদের সঙ্গে গলাগলি ভাব। জেলেদের দেখাদেখি তারাও বেরিয়েছে। জাল তাদেরও দু-একটা আছে। তবে ওটা নমুনা। ঐ নমুনা দেখিয়ে লেবেল আঁটে লুটতিয়ারা মহাজনী নৌকোয়। কে বুঝবে তাদের মতিগতি। মানুষের মন দেবতা পারেন না বুঝতে। মানুষ কেমন করে পারবে ?

আলিপুর পেরিয়ে ছয় পেয়ো নৌকো আর কোনদিন উত্তরে ঠেলে না। আলিপুরের এলাকায় নদীর পশ্চিম পাড় থেকে কোন কোন উত্তুরে-হাওয়া বিকেলে অথবা ভর সন্ধ্যায় নৌকোর 'আড়' মারে। নোঙর পোতে অর্থাৎ 'আড়' করে। খাঁধা-বাড়া করে খেয়ে রাত এক প্রহর গড়িয়ে আবার কলতার দিকে ভেসে যায়। গেরোপালির টঙে গিয়ে পৌঁছতে পেরিয়ে যায় রাত দুই প্রহর।

আলিপুর সবাই বলে। নিতাই জানে ওটা আসলে কোলকাতা। কোলকাতা তারপর এগিয়ে এগিয়ে ঐ ঐ দেখা যায়। রাত্রে বিশেষ কিছু দেখা যায় না। শুধু আলো জ্বলছে। এত আলো! বিজলী বাতির দেশ!

পশ্চিম পারের দিকে চলে যাচ্ছিল দুই তিন দুরে নৌকোর বহর। তাদের ডাকছে। এপারে ঘাটের কিনারা চন্দননগর এলাকা। তিন বন্ধুতে মিলে নৌকোর পড়ল। 'আয়' বাঙলো সবাই। অন্য-বন্ধুদের ধনুই যেতে চাইল নেমে গেল দুজন, ওই নেপাই-টিনু তারা ফেরে-যেতে না। আমি যাব নি রাতে কাজ আছে, ঘুরিয়ে আসি এই।'

নিতাই বাপের কথায় বিশেষ গুরুত্বই দিয়েছে। সহজ ভাবে কথাটা নিতে পারে নি। কিন্তু টিনু নির্বিবাদে বললে, 'তোর হাত ঘুরিয়ে আসিস নি যাদু, খেয়াল থাকে।'

যেন খাপছাড়া। অন্য সময় হলে দুজনকে একথা বলা যেতো না। কিন্তু এই বিশেষ মুহূর্তে পারা যায়। টিনু জানে, রাত একপ্রহরে বিশেষ এই জায়গায় কেউ যায় দুজন। কেউ রাতে ফেলে সাধারণত আসে না। আসবে কাল সকালে ডেডবডি লাশ করে নিয়ে। এবারে বোধ ব্যাপারটা। কিন্তু সোজা দুজন। টিনু একবগ্গা ইয়ারের মানুষ। টিনু ছাড়া ছাই টিনের কথা বলবে কে? অপরে তো পারে না।

ইঙ্গিত দিয়ে যারা চালিয়েছে খেয়া-বাছাড়ির পাছায়। গুন গুনিয়ে গান ধরেছে। আকাশে মেঘ তেমন নেই। তৃতীয়ার চাঁদ হাজাগুড়ি দিচ্ছে বাতাসের উজানে—সাদা সাদা চকচকা ধান কতক মেঘের পাশেপাশে। গঙ্গুইতে গড়ছে জনকতক। বারোজন বাঁড়ির এদিক ওদিক জনকতক অন্য-বাছাড়িতে তাস নিয়ে বসেছে। সামনে টিমটিমে হেরিকেন জ্বালা। দুইয়ের মুখোমুখি বসেছে তারা।

সুলাম উঠে এলো নিতাইয়ের কাছাকাছি। বললে, 'তর বাপ কিরবে কখন কৈ ত' নিতা?'

'ক্যান—' নিতাই বন্ধুর দিকে তাকালে।

বন্ধু সেজেগুজে এসেছে। বাছাড়ির খোলে একটা সুটকেস রয়েছে সুলামের। তাতে মহাজনী থাকে তার। ভাল সাকাই কাপড় একখানা থাকে। একখানা সার্ট—পরিষ্কার ধপ ধপে। গন্ধতেলের শিশিও রেখেছে সুলাম। সব পরে মোটা চটি পায়ে দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে সে ফিট্ ফাইন হয়ে। নিতাই বন্ধুকে দেখলে।

'এই, কাম ছিল। আমি এই, ঘুইরা আসতে যামু।'

'কখনে-কে'—নিতাই ব্যাপারখানা ভালও বোঝেনি। ভাবে, বন্ধু আবার এমন সেজেগুজে যাবে কোথায়। অবশ্য আলিপুরের কথা অনেকবার বলেছে সুলাম। তার দেশের লোক কে যেন আছে আলিপুরে। তবে সুলামের সঙ্গে আলিপুরের শহরের দিকে কোনদিনই পা বাড়ায় নি নিতাই। বাপ তার বাধা দিয়েছে। বলেছে, 'ও শহর আমার কি দেখবি ঘুরে। দূর থাকতে ত দেখচিস। দেখবি কি কের ক' দিনি?'

বাপের কথায় জবাব আর দেয় নি নিতাই। তবে গেঁয়োবাসির বাজার ঘুরে দেখেছে সব বড় বড় গো-ডাউন। মাল এসে জমা হয়েছে। চারপাশ গোল। কোন্‌খানে তার মুখ খোলে, বুঝতে পারে নি নিতাই। তবে একালের ছেলে। বয়স বাড়ছে, সাহস বাড়ছে। শেয়ানা হচ্ছে মন। মন আড়-চাড় করে। মন বলে নিতাইয়—যাবো একদিন বন্ধুকে নিয়ে,—শহর দেখতে যাবো। গোটা ঘুরে ঘুরে দেখে আসবো। কিন্তু বন্ধু কোথায় যাবে আজ?'

সোজাসুজি জবাব কোন দিল না সুলাম। শিঙের চিরুনী দিয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললে, 'আমি যামু, তুই যাবি আয়।'

'কখনে-কে?'

হ্যাঁরে বোকা! বুঝতে পারিস নি ওই যে দেখা যায় গঙ্গার ওপারে শহর। ওই গাছপালার এপাশ-ওপাশ জলের ধার থেকে সার-সার বিজলী বাতি দেখছিস। বাস-লরী-মোটর চলেছে। ট্যাক্সি ছুটছে—ট্রাম ছুটছে। মানুষের ব্যবস্থার অন্ত নেই। মেয়ে-পুরুষের গাদাগাদি, ওই শহর। ওখানে এমন সব রাস্তা আছে—একেবারে জমাট অন্ধকার। দু-চারটে আলো—খুপরি-ছাওয়া টালি-ছাওয়া ঘাওয়ার পাশে জ্বলছে টিপটিপিয়ে। বাকী অন্ধকার। ভাকনীরা ঘুরছে ওখানে। মানুষ যাচ্ছে, আসছে। তাদের ভয় নেই। খিল খিল হাসছে, মাতামাতি করছে। পুরুষের মুখের ওপর বিড়ি টেনে ওখানে দাঁড়িয়ে কী সব কথা। জল পাওয়া যায় পাশেই। দেশী মদের দোকান। আগে গলা চুকিয়ে মদ খেতে হয়। তাড়ের দোকান, গাঁজার দোকান। বারোমাসি বাসিন্দা যারা ওখানকার—তারা নীচতলায় ঘর বেঁধেছে। সেঁতসেঁতে মেঝে, বাঁশের মাচানে শোয়। মাজারী কারবারী মানুষের মতো হাটুরে তাদের অভ্যেস। চরিত্রের বাপ-মা নেই। মেয়ে মানুষ সস্তা, মদ সস্তা। একখিলি পান এমনি

পাওয়া যায়। মুখে কি সব মেখে তারা নাকের ওপর গন্ধ ছড়ায়। হাতের ওপর হাত দিয়ে পুরুষকে ডাকে, মুখ তুলে হেসে কথা কয়। মাথায় কাপড় নেই, হাতে শাঁখা নেই। অথচ বয়সী সব মেয়ে। তোমাকে ডাকবে। তোমার সঙ্গে মেচে কথা বলবে। থমকে দাঁড়ালে জবাব দিতে হবে, কোথা যাবে। কথা না বললে, কাঁটা মারবে তোমার ঘুমে।

ওখানকার বাতাসে কড়কড়ে তোলা নোট আর কাঁচা টাকা ওড়ে। বোঝ তা হলে ব্যাপারটা। খালি হাতে গেলে কিছু পাওয়া যায় না। আদর না, খাতির না। ওরা আসে না কাছে।

সুদাম দু-টাকার একখানা নোট কোমরে বেঁধে তবে উঠে এসে দাঁড়িয়েছে নিতাইর কাছে। 'আমি নিতা ধরব বেপারে। বেইগ্যা নিয়া আসতম—রাতারাতি।'

বাপ কোথা গিয়েছে টের পেয়েছে নিতাই। বুকটা ধক্ করে ওঠে। সুদামের উপায় আস্থানটাকে উপেক্ষা করতে পারলো না সে কিছুতেই। অথচ—মুখ তুলে বলতে একটু দেরি করছে। এর আগে একেবারে সোজাসুজি যায় নি কিনা শহরে।

দেরী দেখে সুদাম বললে, 'তাবিদ কিরে, যাবি তো আয়। ভয় নেই, তরে কাউ চিন্তা করব না—তুই লুটিছিয়া-বয়স চালাস—ছদ্দ মেয়েরে পোলা তুই আয়—'

বন্ধু ডাকছে, আয়। 'কিছন যদি বাপ এইছে পড়ে—' তারপর নিজেই বাতলে নিতাই বললে, 'অবশ্যি ঠনার আসতে রাত ভোর হয়—সে আমি জানি।'

'তবে তো হইছে, আমরা তেনার আগে আইস্যা যামু। আয়—'

ছেলেদের ডিঙি রয়েছে আরেপাশে। সেগুলো ডিঙিতে নেমে গেল নিতাই। ডেবিকেনের আলো নিয়ে ইতু দাঁড়িয়ে ছিল। কোমরে বোতামটা নিতাইর ঝকঝক করছে। হাতে আছেটা। তবে জামা-কাপড় তেমন দামী নয় নিতাইর। ইতুকে বলে গেল ঘরের আগলে থাকতে হবে।

রমাঁ রোলাঁর

বিমুগ্ধ আত্মা

[দুই বোন ॥ সুরের পিয়াসী ॥ মা ও ছেলে]

দাম : ১৫৲ ও কাগজের মলাট ১৩৲

পাবেল লুকনিৎস্কীর

নিশো

[উপজাতি জীবনের উপর সুবৃহৎ উপন্যাস]

দাম : ৭·৫০

ডঃ মূলকরাজ আনন্দ-এর

একটি রাজার কাহিনী

[Private Life of an Indian Prince]

দাম : ৭·৫০

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

ছিটি এসে চলবার ঘটে গিয়ে উঠলো সুলাম আর নিতাই। চাঁদ উঠছে আকাশে, সন্ধ্যার চাঁদ। চাঁদ যেন ফেনা আইকা পড়েছে শহরে। এতো আলো। কাছাকাছি উঠিয়ে যাচ্ছে হয় নিতাইর। ভাবে, আর বন্ধুর লগায় কি যে ছিলি সে লেখলো! তারই কেবল সোনার বোতাম নয়। শহরের প্রায় সব মানুষের বোতাম সোনার গড়া। মাথায় কিস্তী-চওড়া তেল-মাখা চুল। কাপড় পরার কি বাহার! মেয়েদের প্রতিটি সাজানো গুছানো। নিতাইর মনে হলো, যেন অভিনয়ে বেরিয়েছে তারা। আর কি চমৎকার তাদের গয়না-পাতি! হাতের বালা, গলার হার। চোখে সুর্মা পরেছে।

'হাপ, এঁক কাই কথা কয় না—' নিতাই বললো।

'চুপ, চুপ। এখন চুপ কে, পরে বলবি।'—সুলাম কনুইয়ের খোঁচা করে বন্ধুকে থামায়।

হাটে-গঞ্জের দোকান দেখেছে নিতাই। বড় ছোট ছোট। এত বড় বড় দোকান আছে না কি! সব ঝকঝক করছে। লাভি দোকানে শুধু শাড়িতে ভরা। মনোহারী দোকানে এত মাল! সোনা-রূপার দোকানের চারদিকে সব ঝকঝকে। নিতাই ভাবে, তারা যে মালের প্যাক লুট করে, একটিবার তো খুলে দেখে না, কি আছে তাতে। সব 'মূলান' করে ছেড়ে দেয়। ছলন সেরো তার বাপ। বাপের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মাল মিলাই করতে দেখেছে। কড়ে-ব্যাপারী দালাল ঐ কিসম সেরো 'মূলান' ধরে। অর্থাৎ মৌখিক দরদামে মাল ধরে। সেই সব মাল কি আসে এখানে।

একটা বড় দোকানের সামনে দাঁড়ালে নিতাই। গঞ্জের ব্যাপারীদের মত দোকানের কেউ তাকে ডাকলে না। পাশেই একটা দোকান। একেবারে রাস্তায় পসরা ছড়িয়ে দিয়েছে। সে বরং বললে, 'কি চাবা গ বাবু, আসুন।'

ছিট কাপড়, রেডির দোকান। রেডি-মেড, কাটা-কাপড়ের কিছু সাজ রয়েছে। কোন ইতস্তত না করে একটা রেডি পছন্দ করে বললো নিতাই। পকেটে টাকা পাঁচটা ছিল। কাঁচা টাকা। নেই। এপাশ-ওপাশ করে খুঁজলো। পেলো না নিতাই। মুখ তুলে তাকালো সুলামের দিকে। সেটি প্যাক করে সুলামের হাতে দিয়ে দিয়েছে দোকানদার।

চোখাচোখি হলো দু বন্ধুর। নিতাই বললে, 'পাঁচটা টাকা নিয়ে আসছি। কত্তনে গেল টাকা?'

'পকেটে নাই?'—

'না'—

ব্যাপারটা সহজে বুঝলো সুলাম। বললে দোকানদারকে, 'মাল আমি নিবা নি। ঘুরং লও মাল।'

'না সে হয় না। বিক্রির মাল ফেরৎ হয় না। টাকা ফেল জলদি।' দোকানী চেঁচায়। সুলামের রোখ চেপে গিয়েছিল। নিতাইও বড় বিপদে পড়ে গেছে। টাকা কটা হয় জলে গিয়েছে, তা নয় স্থলে। চোরের ওপর আবার বাটপাড়ি। শহরের মানুষ এমনি চালাক। বকাবকি করা যায় না মাঝ শহরে। শহরবাজার ঘুরেছে কিনা সুলাম। ব্যাপারখানা বোঝে। ছপাৎ করে দু টাকার নোটটা কোমর থেকে বের করে দিলে সে, 'এই লও।'

দোকানী তখনও কপ্‌চায়, 'সেই তো দিলে দাদা। অমন পিট্‌পিটি করে খদ্দিরার ভাঙালে জ্বান। যাও, যাও—'

দু টাকা সম্বল। সেনকার কাছে যাবার ঐ ছাড়পত্রটি আজ ফুরুৎ করে হাত থেকে বেরিয়ে গেল। না দিয়ে পারে নি সে। তা না হলে অপমানের একশেষ হতো। বন্ধুর মান থাকতো না।

দোকান থেকে বেরিয়ে আবার নদী কিনার পর্যন্ত আসতে দুপাশে বড় বড় সাজানো দোকান। নানান রকমের। দু-টাকার গিয়েছে একটাকা। বাকি একটাকা এখনও আছে। এতবড় শহরে কোনদিন আসে না নিতাই। নিতাই বললো, 'সুলা, আয়—মাংস অনেক দিন পাই নি। চল্ মাংস খাওয়াবি চল্।'

'কিন্তন আমি যে সরীব রে নিতা। আমার যে চলব না—'

'আয়, আমি তর বেবাক টাকা দিব—আয়।'

মাতাল হয়ে গেছে একেবারে নিতাই। ক্যাম্বিসের জুতো পরে মস্‌মস্ করে চলছে। ঝকঝকে দোকানের সামনে উঁকি দিচ্ছে। লুটতরা ছলন সেরোর ছেলে সে। ভুলে গেল নাকি সে। তবে টাকা আছে নিতাইর। তার মানে, তার বাপের। ছলন সেরোর হাতে টাকা বর্তমানে হয়েছে। সব দাঁড়ির এই বিশ্বাস।

একটা চপ-কাটলেটের দোকান। লোকে বসে এটা ওটা খাচ্ছে। দেখলো নিতাই। হঠাৎ খুব চালাক ছেলের মত ভেতরে উঠে গেল নিতাই. 'মাংস আছে—যাও দিকি। সুদা আয়—'

আশ্চর্য! নিতাইর কি জন্মান্তর হলো নাকি। একেবারে শহুরে মানুষের ভাঁটো হালচাল শিখে ফেলেছে। ভয় নেই, কোন কুণ্ঠা নেই। ধাধা তুলে কথা বলছে। কাটা-কাটা কথা বলছে।

সুদাম গিয়ে পাশে বসবার আগেই মাংসের প্লেট এসে গেল। দুজনে শেষ করলো ধীরে ধীরে। একটা টাকা বেরিয়ে গেল ফুরুৎ করে। 'আমি তর টাকা সব দিয়ে দিব সুদা—' মুচকি হাসছিল নিতাই।

ঢুমাস্ করে একটা ঘা দিলো সুদাম। বললে, 'আমি কি না বলছি? তরে চাইছে কে?'

কিন্তু সেদিকে গ্রাহ্যই করলো না নিতাই। বললে আস্তে করে, 'শহর-বাজার জায়গা। অমন মারপিট করিস নি সুদা। লোকে দেখলে কইবে কি?'

'হুঁ'—সুদাম শুধু তাকিয়েছে। তার মানে, বুঝেছি! শহরে এসে রাতারাতি একেবারে পেকে গিয়েছ। মান-অপমান বোধ একেবারে পেয়ে বসেছে তোমায়। এক নৌকোয় বসে হাল মারতে মারতে কত ইয়ার্কি করি। সব সইতে পার। আর এখানে এমন করে বলছো।

দোকান থেকে বেরিয়ে জর্দা-পাতি কড়া মশলার পান কিনে নেলে তারা দুজনে। ভুর ভুর করে উঠলো নাকের ওপায় পানের গন্ধ। কি দোসরই! শহরে এসে পানের নতুন স্বাদ খুঁজে পেয়েছে নিতাই।

তারপর দোকান দেখতে দেখতে নদীর কিনারা পর্যন্ত এলো তারা। মেনকার কাছে যাওয়া হলো না। অথচ যাবার বড় ইচ্ছে ছিল সুদামের। বড় পোড়-খাওয়া এই বুক। একদা বুকের ব্যথা গো। এই বাঁকা জীবনে আর কে আছে! সংসারে যেখানে আশ্রয় ছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছে তারা। মেনকা তার দিকে তাকিয়ে থাকে—সে জানে। বয়সী বোনটা ঐ মেনকাই মতন হয়ে থাকবে। সোনা কোথায় গেল কে জানে। কে তার হদিশ দেবে! মেনকাই দুঃখের সৃষ্টি দিয়েছে তার জীবনে। জীবনের স্বাদ।

মেনকার দিন চলে না এখানকার বাজারে। সিঙ্গিরপুরে আগে ছিল। সেইখানে তার সঙ্গে পরিচয়। ব্যবসা জমে না বলে উঠে এসেছিল আলিপুরে। আলিপুরেও নাকি জমছে না। তবে সুদাম জানে, সেখানে হোক্ জমবে। দুনিয়ায় তার মতন ঘর-ছাড়া অনেক। রূপ আছে, তবে হাতে টাকা নেই। টাকা কিছু জমলে সোনার হার—বাজুবন্ধ-বালা উঠবে গায়। বড়দার দিয়ের শাড়ি উঠলে ভাগ্য ওর ফিরে যাবে। আপনি ফিরে যাবে। মেনকার জন্যে এসেছিল সে। কিন্তু যাওয়া আর হলো না। বন্ধুর জন্যে মেনকার টাকাটা পোসমান মনের খাতাগে উড়ে গেছে তার। কিন্তু বাতাসে যে মেনকার গন্ধ ভাসে। মুখের গন্ধ, চুলের গন্ধ। কিন্তু কোন উপায় নেই সুদামের।

নদীর একেবারে ভেটির পাশে তাদের ডিঙিটা বাঁধা।

তাকাতে তাকাতে নিতাই এসে উঠলো ডিঙিতে। কাছি খুলে ঠেলে দিলো সুলাম

নিতাই বললে, 'আমিরি সুলা, আমাদের যদি অমনি একটা দোকান হইত, তাহলে—'

'তা হইলে কি ?' কথাটা টেনে ধরে সুলাম।

'দূর, ছাই। শালার এই ডোঙাইর কাম আমার আর ভালো লাগে না। শালার একটা দোকান করতম গঞ্জে। কত মানুষ উঠতো আমাদের দোকানে। কত কাঁচা পইসার কারবার করতাম সুলা।'

'তা ত ঠিকই। এই ভাইসা ভাইসা বেড়াইতে কার আর ভালো লাগে ?'

'তবি সুলা, একটা দোকান ?' নিতাই ঘনিয়ে এলো সুলামের কাছে। সুলাম হাল ধরে ছিল। তার হাত ধরলো নিতাই।

সুলাম চেয়ে চেয়ে দেখে নিতাইর দিকে। আকাশে মেঘ জমা হয়ে গেছে। শ্রাবণের আকাশের পশ্চিমে তৃতীয়ার চাঁদ চলে পড়েছে। রুপালু পৃথিবীর চারদিকে স্বপ্ন ভাসছে। নদীর জলে ঝিকিমিকি আলো। ওপারে বিজলী বাতির হালকা জলছবি এঁকেছে গাঙ্গায়। আলো আর আঁধারিতে কি মনোরম খাপ খেয়েছে।

'বন্ধু, তুই মাল মোহায়েন দিতিস গঞ্জ থিকে। তর তো সব পথঘাট চিনা। আর আমি দোকানে বইসে মাল বেচতম। একিবারে ফিক্স মুনাফা।'

'কিন্তুন তুমার বাপ ? সে তুমারে ছাইড়া দিতে কয় কি ?'

'আমি ত কইছ।'

'বেশ।'

হয়ে গেল। ভিত গাঁথতে হলে যে ক'খানা ইটের প্রথম দরকার। গাঁথা হয়ে গেল। এর পর সত্যিকার ইমারত গড়তে হবে। বুকের নিচে স্বপ্ন ফুল্ ফুল্ করছে নিতাইর। কি দেখে এলে আজ শহরে। চক্ষু পবিত্র হয়ে গেছে সে। ঘটে বুদ্ধি ফিরে এসেছে। শহরের এত কাছে এসেও ফিরে গেছে। এই শহর। কেমন ভদ্রমানুষের চলাফেরা এসব জায়গায়। কত সব দোকান। কত কাঁচা টাকার কারবার। মানুষগুলো সব টাকাওয়ালা। সবার মোলায়েম কাপড়। ঝিন্‌ঝিনে সব কাপড় পরে এসেছে। পায়ে কত দামী জুতো। গাড়ি-ঘোড়ায় চড়ছে। মেয়েমানুষ দেখেছে নিতাই। কি তাদের কাপড় পরার বাহার। খোঁপা সুন্দর করে পরেছে। তারমত হাবরার মাঝে মাঝে ফেটিতে—, তকের চরে তাদের বেড়াতে দেখেছিল সে বহুদিন আগে। শহরের মধ্যে তাদেরই যেন বেশী যাতায়াত। একে শহর বলে।

নিতাই ভাবে, বাপের দয়ায় কোন নরকগুলে এতদিন সে বাস করছে। লুটতরা দেহে রাতে-দিনে পুটের কথি এঁটেছে। পুলিশ তাদের পেছু নেয়; তকের তাল্লাসীরা লাঠি পেটা করে তাদের। জলে ভাসতে ভাসতে জীবন খুইয়ে দিয়েছে তাদের মানুষ। কিন্তু কি হয়েছে তাদের ? শহর ঘেঁটে দেখার এই গুণ। রক্তে আগুন লাগে একেবারে। বাপ তার ভাই তাকে আটকেছে বারে বারে। কিন্তু বন্ধু আজ কি দেখালে ? সুলাম না দেখালে তো আরও কতদিন বাদ্দাড়ি নৌকোর পারা ঘুরাতে হতো ভাইনে-বামে। মা জাহ্নবী, তোর মায়া কাটাতে চাইছি মা। ক্ষমা করবি মা। অধমের অপরাধ নিবি নে গো—

চাঁদ গিয়েছে ডুবে। ওপারের খেজুরের সারি, চাঁদের পাণ্ডুরাভায় স্বপ্নের ফ্রেমে বাঁধা ছবির মতো দেখা যায়। বাতাস ঘুরে গেছে পুবে। পুবের হ্যাচ্‌কা জোয়ার এবার আসবে। ভাগীরথীর বুক ভরে অকূল হতে চাইছে। গুড়-গুড় শব্দ হচ্ছে। কালো জল ফাঁপানি দিয়ে বাড়ছে। ক্রমশ বাড়ছে। বৈঠার ঘায় ঘূর্ণি ওঠে জলের। এগিয়ে গেল কোষ নাও।

॥ ৪ ॥

স্টীমার লক্ষ যাচ্ছে না। গাধাবোট হুমকি দিয়ে থেমে গেছে। চাপড়ি জাহাজের রেক বন্ধ আছে এখন। দিনের আলো ছাড়া তারা যায় না। ফচিৎ এদিক ওদিক নড়ে সরে জায়গা করে নেয়। ঘন ঘন সিটি দিয়ে সাধনের পথ পরিষ্কার করতে বলে। দাঁড়িমাঝি ঘরে ঘরে। নৌকো নামলায় আগলায়। জেটির কিনারে গিয়ে বাঁধে। একেবারে চড়াইএ গিয়ে পারা ফেলে।

নৌকো যেখানে আড় দিয়েছে, নোঙর গেড়ে রয়েছে অনেকে—ঠিক সেইখানে কোনখানে লুকিয়ে থাকে

আমাদের কয়েকখানি লাইব্রেরীর বই

Anglo-Nepalese Relations

(From earliest times of the British rule in India till the Gurkha War).

Dr. K. C. Chaudhury, M.A., LL.B., D. Phil.

An interesting and Critical history of the Anglo-Nepalese, Political, Commercial and cultural relations as well as of border conflicts—leading to the Gurkha War. 9" × 5½" Size : pp. 181. Price Rs. 10/50.

The Story of Education for all

S. C. Sarkar, M. A.

The theme of the book is an elucidation and exposition of the educational ideas as they were propounded by the Great Educators of the East and the West and practised with profit by their countless followers all over the world. 9" × 5½" Size : pp. 272. Price Rs. 8/-.

শিক্ষা, চরিত্র ও মনোবিদ্যা

শ্রীগণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মনোবিদ্যার মূল তত্ত্বগুলি জানা থাকিলে এই মানুষ করার কাজটার সুবিধা হয়। সাধারণ ছাত্র ও সাধারণ অভিভাবকের। মনোবিদ্যা-সম্মত চৌকুরুল বিধায়ক করবার জন্য এই পুস্তকটি রচিত হয়েছে। ৯" × ৫½" পৃষ্ঠা ১৩৮ : সুন্দর বাঁধাই, মূল্য ৪·০০।

শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলনীতি

শ্রীকুলদাপ্রসাদ চৌধুরী

আধুনিক মত পরীক্ষামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া অধুনাতন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্যে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে স্বল্পসময়ের মধ্যে বালকবালিকাদের শিক্ষালাভে শিক্ষা। মূলনীতি-সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের এবং শিক্ষায়তনকে সাহায্য করিবে। ইহাই বাহির হইয়াছে।

ভারতের নারী

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

একদিকে আদর্শ নারী। কয়েকটি পুণ্যচরিত্র অপরদিকে অধুনা দুর্নিবার ও ঈর্ষাসঙ্কুল আলোচনা। ৮" × ৫½" পৃষ্ঠা ১৩০ : সুন্দর বাঁধাই, মূল্য ২·০০।

এ. এল. ব্যানার্জি (সম্পাদিত)

মেঘনাদবধ কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বীরাঙ্গনা কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

পলাশির যুদ্ধ—নবীনচন্দ্র সেন

বাংলার মহাপুরুষ

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য

একাধারে ভারতের স্বাধীনতার অগ্রদূত, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বড় রাজনীতিজ্ঞ, সকলের চেয়ে বেশি কবি, মহাদার্শনিক, বড় ভাষাবিদ, সর্বশ্রেষ্ঠ সাংবাদিক, সর্বোচ্চ স্তরের সাহিত্যিক ও জনহিতের একটি ছোট জীবনী-পুস্তক। ৭½" × ৫" পৃষ্ঠা ১২০ : বহু চিত্রে শোভিত, মূল্য ১·৫০।

যুগসন্ধি

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

বাংলা ও বাঙালী জাতির নবজাগরণের উষায় পটভূমিকায় অঙ্কিত অপূর্ব বাস্তব-চিত্র। ৭½" × ৫" পৃষ্ঠা ১৩৮ : সুন্দর বাঁধাই, মূল্য ২·৫০।

শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগচী (সম্পাদিত)

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

রজনী, কপালকুণ্ডলা, সীতারাম, কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ (প্রতিখণ্ড ১·৭৫)। **চন্দ্রশেখর, দেবী চৌধুরাণী, আনন্দমঠ, কমলাকান্তের দপ্তর** (২·০০)। **রাজসিংহ** (২·৭৫)

প্রতি গ্রন্থে আছে বঙ্কিমের চরিত্রে ও রচনায় সম্পূর্ণ উপন্যাসের চরিত্র বিশ্লেষণ—মূল উপন্যাস—কয়েক ফর্মা টীকা। প্রতি খণ্ডই ৮" × ৫½" সুন্দর বাঁধাই ও ঝকঝকে মুদ্রণ।

নীলদর্পণ—দীনবন্ধু মিত্র (১·০০)

চতুর্দশপদী কবিতাবলী—মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১·০০)

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত

ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অধুনাপ্রচলিত ও বহু ছাত্রছাত্রীর সাহায্যে যাহা পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট না করিয়া বাংলা সাহিত্যের একটি সর্বাঙ্গীণ রূপ অঙ্কিতেই এই গ্রন্থের প্রয়াস হইয়াছে। প্রথম খণ্ড ৮" × ৫½", পৃষ্ঠা ১৫৫ : সুন্দর বাঁধাই, মূল্য ১২·০০।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস

শ্রীদেবেন্দ্রকুমার ঘোষ

আদি, মোটামুটি, উত্তর ও বৃহত্তরীয় এই চারি ভাগে বিভক্ত। ৮" × ৫½" পৃষ্ঠা ২৫১ : সুন্দর বাঁধাই, মূল্য ৭·০০।

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৮" × ৫½" পৃষ্ঠা ৫৯১ : সুন্দর কাপড়ের বাঁধাই, মূল্য ১২·০০।

ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও
ডক্টর শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

৮" × ৫½" পৃষ্ঠা ৩৩১ : সুন্দর বাঁধাই, মূল্য ১০·০০ টাকা।

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ

ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য

বিদ্যাসুন্দর কাব্যে ভারতচন্দ্র ও কালিকামঙ্গলে রামপ্রসাদের তুলনামূলক আলোচনা —পরিশিষ্টে ভারতচন্দ্রের সত্যপীরের পাঁচালী ও রামপ্রসাদের কালী কীর্তন ও পদাবলী রহিত বৈশিষ্ট্য। ৮" × ৫½" পৃষ্ঠা ২৭১ : সুন্দর বাঁধাই, মূল্য ৮·০০।

ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা

ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য

বাংলা, হিন্দী, গুজরাটী, উড়িয়া, আসামী, তামিল, তেলেগু, মারাঠী, কন্নড়ী এই নয়টি ভাষার বিচিত্র বারমাস্যার সংকলনে বিস্তৃত এই আলোচনা গ্রন্থ একেবারেই নূতন। ৮" × ৫½" পৃষ্ঠা ২৫২ : সুন্দর বাঁধাই, মূল্য ১২·০০।

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ

১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২ :: ফোন : ৩৪-৩১০৭

লুটিয়ারা। পাটাতনের ওপর দুই সারেঙই। ওতে সবাই শুয়ে থাকে। দাঁড়ি একজন থাকবে, নয় খুব জোর—দাঁড়ি-মাঝি দুজন। বাইশ হাত বাদ্দাড়ির তারা দুজনাই কেবল জোরদারি করে বাকিরা সারাদিন ঝিমোয়। জলেরে তারা ডরায়।

জাল আছে পাঁচ জাল জোনে। সেই জাল ফেলে। হাতে মশাল পাঁচ বাদ্দাড়ির উঁচুতে আলো ফেলে খোঁজ-খবর নেয় অন্ধকারে। তারপরে তারা একেবারে কাছাকাছি ছেড়ে আসবে। মাঝি দাঁড়িকে সাবধান করে। ওদের পেয়ে ইলিশ বসে রয়েছে তারা। অবসর চায়। অবসর পেলে ঝাঁকটি মরা বাঘের মতো ঠিক ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ঝিউরে ঝিউরে কথা বলে সন্ধ্যায় বাদ্দাড়ির মাঝি, 'এট্টু আস্তে চির গ' মাঝির পো— ও-গ মাঝি ভাই।'

বেশ ভারলে ব্যাপারটা। তুমি গাঙ-খালে যদি নতুন মাঝি হয়ে আসো, তাহলে বুঝবে কেমন করে? তুমি খুব ভালমানুষি দেখিয়ে গাঁয়ের মানুষের মতো সরল কাজটি করবে। বলবে, 'নেও—'। মাঝির নৌকো দাঁড়িয়েছে। সন্ধ্যা তখন সবে নেমেছে। বাদ্দা-বাদ্দার ঘন দিয়েছে ভাওয়ার চাঁড়ি। দলুই-এ জোড়-চাঁড়ি বাঁধছে কেউ কেউ। পাল তোলাই করছে।

আর চোখের পলক পড়েনি তিন বাদ্দাড়ি নিয়ে ঘিরে ফেলেছে লুটিয়ারা মাঝি। বাদ্দাড়ির ছাতে মোটে তিনজন ছিল, তেইশজন হয়েছে। লাঠি, সড়কি-ছেনদা রয়েছে তাদের কোমরে-হাতে। দাঁ করে ছুটে অনকতক মাঝিকে আগে বশ করে নেবে। তারপর একে একে। হালের কাছে রয়েছে জন কতক। বাকি সব পাল তুলছে। চারপাশে হোগলার জলের বেলা। জোয়ার খেলছে। শিরশিরিয়ে উঠছে ঢেউ। লালচা বাতাস হুহু দিচ্ছে। অথবা তারা নিজেরাই জোরে জোরে চাবিজারি বকা কাটাচ্ছে। দাঁড়ি-মাঝির গলা কেউ যেন শুনতে না পায়।

বজবজ পেরিয়ে ডুমুর গেরোর বহর এগিয়ে গেল কলতার দিকে। বাঁকে একবার দেখবে। তা নয় পীরসাহাজার ঘাটে দেখবে। টালির কারবার পীরসাহাজায়। দূর-দূরান্তের কত পানসি-ডিঙি এসে লেগেছে। ব্যাপারী নৌকোও আসে। ডিঙিপত্র বাজার থেকে না কিনে পাইকারি দরে কিনে নেবে ওদের কাছ থেকে। শনের দুড়ি, পাটের আঁশ, ধান-নারিকেল—চালের বস্তা। তার পর নৌকোগুলো আউটরাম ঘাটে গিয়ে লাগবে। কালীতলায় পুজো দেবে। জলার ঘাট, কুলপি ঘাট—পোস্তায় গিয়ে পস্তাবে সাতদিন। লুটিয়া বাদ্দাড়ির চেনা আছে, কোন্ নৌকো কোন্‌দিকে যাচ্ছে আসছে। বজবজের জল-পুলিশ ডুমুর গেরোর চেনা। ডুমুর গেরো মরশুমে সেলামি দেয় তাদের। মুজরানা। খাঁটি খবরটা অবশ্যমি ঐখান থেকে পায় ডুমুর। কলতার বড়োবাবু লোকটা বড় সুবিধের নয়। খাঁড়া বয়স ঝিনা, তেজ বেশি। ডুমুর জানে, কালে ঠিক হয়ে যাবে। এখন তড়পাচ্ছে শুধু শুধু।

মাল নিয়ে মহাজনী মাল-নৌকো কলতীতে ভাসলো। চার-পাঁচ নৌকো একসঙ্গে। ডুমুর বলে নিতাইকে, 'এই নেতাই, ছাদ দিনি পালারা আড় ফেলছে, না ফেলছে নি—'

হাল ধরিয়ে শেষ-বাদ্দাড়িতে উঠে যায় নিতাই। সুধায় বলে, 'খাইমা বা, আমি যেই।'

'তুই যাবি সুধা? আয়—'

উদার আহ্বানটা বর্বর গলার কলা লেগে চুরমার হয়ে গেল, 'মা—তুই যাস না সুধামিয়া।' ধমকে যায় বাধা হয়ে সুধাম। গজ গজ করতে করতে নেমে যায় নিতাই। বাপ তার কটমট করে তাকিয়েছে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি সামনে। সন্ধ্যা ঘনায় নি। ঘনিয়ে এলে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ডুমুর। নিতাই এসে খবর দিলো, 'হুঁ আড় পড়েছে নৌকোর।'

হুকুম হয়ে গেল গেরোর। গেরো কথা বলছে, বাপ নয়। বলছে, 'দে, তরা ঠিক হয়ে দে। রাত একপহরের আগে যদি ছাড়ে ত দেখবি।'

ইশারা দিয়ে সব কথাবার্তা। রাত একপ্রহর হলে মহাজনী নৌকোর মাঝি যেয়ে যেয়ে হাল ধরবে নৌকোর। রাতারাতি জাহাজের হালে ছুটবে বড় গাঙে পড়বার জন্যে। অর্থাৎ মোহানার দিকে। চার নৌকো ছাড়াছাড়ি হবে নিশ্চয়ই। সময় সুযোগ বুঝে যে কোন একটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে লুটিয়ারা।

কিন্তু ইশারা দিয়ে জানালো গেরো যখন তখন রাত দুই প্রহর। আকাশে রাশি রাশি মেঘ জমেছে। ঘন ঘন

কিছুৎ দিচ্ছে। ভাগীরথীর বুকে আজ কালীর নাগ মাথা তুলেছে। কালশিরা ছুটিয়ে ইলিবিলি ঢেউ যাচ্ছে আসছে। নৌকো তিনটে ছাড়াছাড়ি করে তেমনি বাঁধা। বাল-নৌকোর একদম কাছে জিভে এলো ছখন মেয়ের আগ-বাড়াড়ি। তবু প্রত্যুত্তর নেই। নিষেধ নেই। নৌকোর সবাই খুমিয়েছে। মাঝি ছইর মুখে শুয়েছে। ঘুম জমেছে ভাল, কড়ের বাতাসে। জনতিনেক লুটতিয়া উঠে গিয়েছিল তবু পাটাতনে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল। নৌকো তুলোর বস্তায় ভরা। অন্য ভারি মাল, দামী মাল কিছু নেই।

ঘুম গায়ড়ে ফিরলো ছখন। অযাত্রায় বড় আশা হয়েছে এবার। মাল নৌকোয় উঠেও মাল পেলো না ছখন।

ফিরে যাবে নাকি ঘর? গেঁয়োখালির পশ্চিমপারে টুঙি ছখনের। টালি-ছাওয়া টুঙি। এক বুড়ো পিসী ছাড়া টুঙিতে কেউ থাকে না। পাশাপাশি দিমু আর ইতুর সংসার। হোগলা পাতার টুঙি ছুটোয় বাস করে। মেয়ে-পুরুষ নিয়ে তাদের পাঁচ পেট খেতে। কাসেম-বংশী-গুরুজের এরাও গেঁয়োখালির পশ্চিমপারের বাসিন্দা। জানা-শোনা আছে বলে ছখনের বহরে কাজ করে। বাছাড়ি নেই তাদের নিজের কারোর। বাছাড়ি যার, বহর তার। বাছাড়ি থাকলে মানুষ জোটে, দাঁড়ি জোটে। লুটতিয়ার কাজে এগিয়ে আসে অনেকে। অন্যান্য ডিঙি নিয়ে কোষ-নৌকো নিয়ে মোহানা-নদীতে পাড়ি দেওয়া যায়। কিন্তু লুটতিয়া বহর চালানো যায় না। মজা এইখানে, বাইশ হাত বাছাড়ি নৌকো নিমেষের মধ্যে হলদীর আগুনা জলে সাঁ সাঁ করে মানুষকে লুকিয়ে দিতে পারে—উধাও করে দিতে অদিশ দিশন্তে। লস্কর সঙ্গে, চাপড়ি জাহাজের সঙ্গে রেস দিয়ে জিতবে কে? না, বাছাড়ি। আর কোন নৌকো পারে না। পিচ্‌পান কাঠের বাছাড়ি চাই। বাছাড়ি আর তাদের কারোর নেই ছখন ছাড়া। তাই গেরো মেজে ছখনের পদ্মিমা।

যখন গেরো হয়েছে ছখন, পরতে-খেতে দেবে তার বহরের মানুষকে। তাদের শুষ্টি-পেট খেতে—বউ-বাচ্চা-কাচ্চা। সবাইকে বাঁচিয়ে চলতে কি সে পারবে? ছখন মুখ বেঁকে বলে, 'কোন্ শালা পারছিল এই পিরথিমে? আমি পারব? তরা যেইট্টে যা। আর কর। আমারে কুছু কে, তরা লে। যেইয়ে যেইয়ে বাঁচ।'

হ্যাঁ, এটা সংসারের কথা। মানুষ পেটে খেতে সংসারে এসেছে। কিন্তু এত সোজা বুদ্ধি নিয়ে জন্ম থেকে মরা পর্যন্ত চললে তো চলবে না। কারণ বুদ্ধি—যাকে সহজ বুদ্ধি বলি, তাতে মানুষ বাঁচে কম, মরে বেশী। পেটে খেতে এসেছে সংসারে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মানুষ খাটবে। শরীরের রক্ত জল করে মাটি চষবে, কারখানায় চাকা ঘোরাবে। গঙ্গার ঘাটে মাল উঠছে নামছে—দিনমজুরী খাটবে। হাত-পা নিয়ে মানুষ হয়ে এসেছে পৃথিবীতে। বলতে আসনি, খাটতে এসেছে। কিন্তু খাটবে কোথায়,—কে খাটাবে? এ সংসারে শুধু খাওয়াতেই কি লাভ! মাটি এক ছটাক নেই। কারখানায় সবাইর চাকা ঘোরানোর সৌভাগ্য হয় নি। কুলি হতে গিয়ে পুলিসের খপ্পরে পড়ে গঙ্গার ঘাটে কয়েকবারই টাকানি খেয়েছে। তাহলে বোঝ ব্যাপারটা। মজুরের বুদ্ধি গেলাতে কেউ বাদ যায়নি দুনিয়ায়। কিন্তু ছোট বড় বলে সংসারে কথাটা আছে—দুখ আছে।

বড় দুঃখে লুটতিয়াদের দিন যায় গো। তুমি বুঝবে না।

যারা পথ চেয়ে আছে, তারাও বসে নেই। তারাও পাশাপাশি গাঁয়ে বড়লোকের বাড়ি খাটতে যায়। বউ-ঝিয়ের কাজ করে আসে। কিন্তু পেটের জ্বালা মানে কই? চৌকিদারকে হাতে রাখতে হয়। দফাদার এসে খোঁজখবর নিলে পুরুষের হয়ে হেসে কথা বলে লুটতিয়াদের ঘরের মেয়ে-মানুষ। টাকা দাও, তা না হলে তারা আসে। বোঝাপড়া হয়—ঘরের বউর, বাড়ী মেয়ের সঙ্গে।

পড়শী যারা তারা এসে ঘিরে ধরে ছখনকে, 'কিছু কজ দেও গ'—শোধ করব সময় পড়লে—'

'কিম্বন কর্জের টাকা কই হাতে? আয়-উপায় ত দেখচস্ চৈখে—' উল্টে প্রশ্ন করে ছখন।

নেহাত পা-হাত ধরলে কিছু অবশ্য ধার দেয় ছখন কিন্তু শোধ দিতে সময় ফুলোয় না। দিনকাল খারাপ পড়েছে। রাত্রে বিশেষ একলা নৌকো যায় না। মাঝি সব চালাক হয়ে গেছে। দালালও আজকাল ধারে বড় দেখায়। দোকানদারও বাকী রাখে না। জোর করে চাইতে পারে না ছখন। পুলিশকে হাতে রাখতে হয়। মাসে মাসে ঘাটের পুলিশকে না দিলে চলে না।

সুতরাং ফিরে কি যাবে ছকন ? ভাবছে, গেরো ভাবছে। শেষ পর্যন্ত স্থির করলে, না—হাতটা দেখে যাবে। তিন বাছাড়ি ভাসলো আবার জলে। জোয়ার এসে গেছে। দক্ষিণ থেকে মাসানি ফুটিয়ে বাতাস আসছে। জোয়ারও আসছে। সমুদ্র যেন হাত বাড়িয়ে পবত-নন্দিনী-গাঙ্গিনীকে ডেকে নিচ্ছে মুখোমুখি চুমু দিচ্ছে। কী উথল-পাথল বুক গো! যেন ধুকতে ধুকতে জান্ত ছুঁচে বেরিয়েছেন মা জাহ্নবী। ঐখানে খুশি দিয়ে স্রোত ছোটে ডাইনে-বাঁয়ে। বাসুকির অজস্র ফনা তুলে নদী আছড়ে পড়ে দু-পাশের পাড়ের গায়ে। কাদট-কুমীর-হাঙ্গর-মকর ডুবে যেতে যেতে লেজ ঝাপটি দেয় আগ্রাণ। বাছাড়ি-পানসি-পাউকে-কোষ ডিঙি ডুবতে ডুবতে বেঁচে যায়। গাধা-বোট, মোটর লঞ্চ রোক চেপে পালায়। করালী রাক্ষসী নদী মোহানায় এসে ফুলতে থাকে, ফুঁসতে থাকে। সতর্ক ইশারা দেয় জাহাজের সারেঙ। কেরোসিন-মাতির কোড় পড়ে,—নাও সামাল।

কথাটা বললে সুলাম, 'বাতাস ঘুইর‍্যা গেছে পইছিম। অগ্রাণের মুলে কত আসতে পারে।'

কথাটা মনে লাগলো নিতাইর। বন্ধু ঠিকই বলছে হয়তো। মা মেঘের অবস্থা! নদীর জলেও কেমন গড়-গড় শব্দ হচ্ছে। কটকা বাতাস কেমন বাড়ছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত। ষষ্ঠী কি সপ্তমী। কড় আসা বিচিত্র নয়। ঘোলাটে-পাঁশ-কালো আকাশের দিকে চেয়ে বাপের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলো নিতাই, 'রেতে কড় পড়তে পারে গ'। কিনারে লেব নাকি ?'

মনটা এঁটেল হয়ে রয়েছে ছকনের সন্ধ্যার পরই। কিছুই পাওয়া যায় নি আজ। বললে, 'ক্যান ডরে কে কইচে ?'

বাপের মেজাজ কড়া। নিতাই ফুঁসে ওঠে, 'ক্যাও ত কয় নি। কিয়ন কড় পড়লে দাঁড় মারবে কে শুনি ?'

'ডর বাপ'—

শোন, ছকনের কথা শোন। হাব-ভাব দেখেশুনে আর কথা বলে নি নিতাই। চুপ করে গেল সে।

ওপর গঙ্গায় বাছাড়ির ঝুপ ফেললো ছকন। গোখনা বাতাস পেছনে ছিল। তার ওপর আবার আগ্রাণ ঢেউ। দাঁড় মারে নি কেউ। পাল টাঙাতে হয় নি। বাছাড়ি ছুটে এলো। তিন বাছাড়িতে মাত্র তিনজন লোক হাল ধরেছিল। তাতেই ফলতা পেরিয়ে, বজবজ পেরিয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে রইলো তারা। পশ্চিম ছাড়া উপায় নেই। পশ্চিম কিনারে ঘেঁসে নৌকো থামাতে হুকুম দিয়েছিল গেরো তাদের।

ঝড়টা এসে পড়লো ইতিমধ্যে। তিনখানা বাছাড়ি মাঝা ঠোকাঠুকি করলো অবিরত। দুইয়ের মধ্যে গিয়ে সবাই বললো। লুটতিয়াদের ভাগ্যে দুইএর আশ্রয় নেই। হু হু শব্দ হচ্ছে। বাতাসে-জলে ঠোকর লেগেছে। সেদুর-তাল-নারিকেলের বনে—বাবলা আর ঠেঁটার বনে বনে ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ বাতাসের দোড়ানি। ঘন ঘন বিদ্যুৎ দিচ্ছে, দামড়া বাতাস—হাঁ-হাঁ করে ছুটে আসছে জলের ছিটকানি নিয়ে। অন্ধ রাত্রি জমে গেছে। প্রলয়ের ঘোর লেগেছে বুঝি ভাগীরথীর। আচমকা, আচমকা সেব বাছাড়ি থেকে শব্দ উঠলো ভয়ঙ্কর। যেন ভেঙে সেটা চুরমার হয়ে যাচ্ছে। হিমু আর গুরুদেব ছাড়া কেউ ছিল না নৌকোটায়। তারা এসে খবর দিলে গেরোকে।

শ্রাবণের রাত্রি। বড়ো রাত্রি। ভীষণ ভয়াল। কিন্তু ভয়কে তো মানুষ জয় করবে। দমন করবে সকল দুর্বলতার। এমন রাত্রিকেও মাশা পেতে নেয় লুটতিয়ারা। তারা জাগে। তাদের জাগতে হয়। শব্দ হচ্ছে। আবার শব্দ হলো। গড়-গড়-গড়—ভয়ঙ্কর শব্দ।

ছই-এর কাঁপ খুলে দেখতে এসে এক নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখি হলো ছকন, শেষ বাছাড়িখানা নেই। দুটো মাত্র পাশাপাশি ভাসছে। গা ঠেলাঠেলি করছে। জোয়ারের স্রোত বইছে। বাতাস সমানে বইছে। ঝাপটা বৃষ্টির কামাই নেই। নৌকোটা নেই।

সামনেই কোথাও হামার ছিল। কেউ দেখেনি, জলের নীচে ডুবে ছিল। ধাক্কা দিয়ে ডুবিয়ে দিয়েছে বাছাড়িটাকে। মানুষ ছিল না, খালি বাছাড়িটা প্রাবনের গঙ্গায় বসে গিয়েছে। এঁকিবেঁকি বিজলী দিচ্ছে ঘনঘন। দু-কুড়ি দশ বছরের পোক্ত চোখের নজর মেলে ছকন দেখলে সেই বাছাড়িটা নেই।

কী সর্বনাশ! ঝড় থামলো সকাল নাগাদ। সারারাত গিয়েছে ক্রুদ্ধ বাতাসের দাপাদাপি। শ্রাবণ গঙ্গার এ রূপ অচেনা নয়। কিন্তু কী সর্বনাশ, নৌকো কোথাও নেই। জায়গাটায় চিহ্ন রেখে পুবে-পশ্চিমে-উত্তরে-দক্ষিণে খোঁজা-খুঁজি চললো অনেকক্ষণ। বিকেলের দিকে বান ডাকলো

নদীর। মিতাই-সুদাম-ইন্দু দেখলে ডুবে যাওয়া বাড়িটা নৌকোর মতো কি যে দেখা যাচ্ছে জায়গাটায়। ঘোলা জল কালো দেখাচ্ছে, বেশ বোঝা যাচ্ছে। ছন্দ গম্ভীর গলায় হুকুম দিলো, 'এই সুদামিয়া, নৌকোর হালে গে' কাছিটা বেন্ধে ত। আমরা উপর দিকে টানছি।'

কাছি নামানো হলো। জলটা বড় গভীর। জলটা কেমন ঘুরছে না? কালো হয়ে রয়েছে জল। কালো। ঘুরছে, ঘুর্ণি দিয়ে ঘুরছে।

কাছি আগাছোড়া নিজের হাতে খুলে দিচ্ছে ছন্দ। '—সুদামিয়া।' ছন্দ ডাকছে।

পাতালে যেতে এমনি এক কালো পাথরের ঢাকনা খুলতে হয়। চারপাশে সাগরের জল ছুটে আসে। পাতালপুরীর ভোরণ পথে পাহারা দিচ্ছে যারা কালিদহের কালো জলে যারা থাকে। নদীর কালো জল ঘুরছে।

সুদাম রাইমঙ্গলের উত্তরচরের বাসিন্দা। মাতলা নদীতে —পাথার গাঙে-পালে এক ডুবে পাড়ি জমিয়েছে অবলীলায় শ্রাবণের রাইমঙ্গলে জলে ঢেপে নওলা আর ভাউস মাছ তুলেছে পাড়ে। ভয় তাই করে নি সুদাম। কোমরে কাপড় জড়িয়ে নিলো।

কিন্তু মিতাই ছুটে এসে কোমর চেপে ধরে সুদামের, 'সুদা তুই যাওস না—'

'ডর লাগে কেন রে—'

'কউক'—

ছন্দ মেয়ে আবার ডাকে। হাকোনি দেয়। মিতাই কোমর ছাড়ে না সুদামের। বুড়ো ইন্দু হিমৎ দেখিয়ে বেরিয়ে এলো, 'শালাদের মইদ্যে কাও মরদ আছে নাকি? যেবাক ভুলা তো মেইয়ে।' কোমরে কাছি বেঁধে ঝপাং করে জলে লাফিয়ে পড়লো ইন্দু

'ইন্দু-বুড়া—' মিতাই ডাকলো গলা ফাটিয়ে

ইন্দু শুনলো, কি শুনলো না। প্রৌঢ়-মানুষটা তলিয়ে গেল। গজ গজ করে তলিয়ে গেল। কোমরের কাছি ছন্দের হাতে একশো লুটছে। একটু পরেই কাছিটা ব্রেকের গায়ে ঢেকে উঠলো। মানুষটা উঠলো না। ঘুর্ণি দিয়ে কালো জল ঘুরছে তলাটায় ঘামে। মানুষটার দেখা নেই

Gram : SHIPMATE

Phone : 22-4922
22-6117

For Quick and Efficient Service

By SEA **By AIR**

In Shipping Clearing Forwarding
Transport of Heavy Machineries and
General Cargoes at Minimum Cost.

By LAND

Consult :

SHIPPING & CLEARING (AGENTS) PRIVATE LTD.

138, CANNING STREET, CALCUTTA-1

Warehouse : P-32, Satya Doctor Road, Kidderpore.

Phone : 45-2076

চোখের পলক আর কারোর পড়েনি। আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলো ছমন, 'ডু-পাওয়া নৌকো। পারা কেউ ধরতে যা—রে, জলদি যা—'

কয়েক মোড়ের কাছি কেটে দুই বাছাড়ি ছুটলো দুদিকে। পেছনে নজর নেই। পাশের দিকে কেউ চেয়েও দেখছে না। কালোজল চারপাশে কেউ তুলে ঘুরছে। নাচছে ঝুলছে সেই জল। যেন কাল-মহিষকে বাগ্ করে কালান্তক ফিরেছে লুটভিয়াদের। জলে মরদের মুখ দেখা যায়—করালদন্তীর সাক্ষাৎ যম।

জলের ওপর মরণ-বাঁচন লুটভিয়াদের। জলের ওপর তাদের জীবন। যারা জলের ওপর দিন কাটায়—তাদের জলের নিয়ম মানতে হয়। তাতার সংস্কার আছে। ওটা জলের সংস্কার। নদী থেকে নদীতে, এ-জল থেকে ও-জলে নজর উঠতে—রাতদিনে কত কথা মনে পড়ে। কত কত অভিজ্ঞতার কথা। তবে এ অভিজ্ঞতা যাদের বেশী তারাই মেরো হয় মেরোর ওপর মরণ-বাঁচন ছেড়ে দিয়ে দাঁড় মেরে লুটভিয়া পুরুষ। হাল ধোরায় সে। মরণ বাঁচিয়ে বিপদকে পাছায় রেখে আগ্ ঠেলে চলে সে। তাই সে মেরো। তাদের মাতব্বর মানুষ,—গাইডার। ছমন শুনেছে বিষণের মুখে। বিষণ মেরোর বহরে ডাইনে হাল ধরতো ঐ ছমন।

'বুঝলি ছমু'—বিষণ মেরো মুখ নীচু করে কথা বলতো—'সব সময় নীচ চোখে কাম করবি।' একথা বিষণ মেরো শুনেছিল তার মেরোর কাছে। সে আবার তার গুরুর কাছে। অদৃশ্য মনের পাতায় পাতায় একথা এমনি লেখা হয়ে রয়েছে।

গাইডারের বাক্য শুনেছিল ছমন। গুরু হেন গরীয়ান, নাই গুণবান—। গুরুর গুণবাক্য অপর মনোযোগ দিয়ে শুনেছিল সেদিন ছমন। পাঁচ পিঠ ডুবিয়ে যারা জলে ভাসে। তারা মানুষও না, মহিষও না—তারা বক্ষ। বক্ষ বলে কোন আলাদা কিছু না। এই জীব-অজীবের পৃথিবীতে বক্ষ আর অন্য কিছু নয়। অজীব, জীব হলে বক্ষ হয়। ডেঙার প্রাণ ছিল না, মানুষ তাকে তার খেয়ালখুশি চালাতো-নামাতো—সেটা মানুষের চোখ এড়িয়ে জীবন্ত হয়ে উঠলো রাতারাতি। নৌকোটা চলছিল, কাল সন্ধ্যে পর্যন্ত কোন হাঙ্গামা নেই। হঠাৎ রাতারাতি চড়াই পেয়ে বসলো তো —কামান দাগলেও উঠবে না। তুমি মাঝি হ'লে বুঝবে, এ কেমন বিপদ। হাজারমণী, পাঁচশমণী-বোট বলে কথা। উঠছে না কিছুতেই। ডোঙা নয় তুলে নেবে। তার ঘায়ে ত্যাগ করে পাড়ে উঠে প্রণাম করতে হয় মাঝিকে। মাঝি পুরনো মানুষ—নদীসমুদ্রের অজস্র ঢেউ উতরে চুল পাকিয়েছে সে। ঠোঁট কেটেছে নোনাজলের ছাট্ খেয়ে, সে বলবে পাড়ে উঠে, 'বাবা, রইলেন ত এইখানে। কোন দোষ করলে ক্ষ্যামা দিবেন বাবা। পাপে (প্রাণে) যেন না মরি।' মাঝি-মাল্লাদের এমন ভক্তি-ভরের কথা।

ঐ হলো ডু-পাওয়া অর্থাৎ জীবন্ত নৌকো। বক্ষ হয়ে গেছেন তিনি। এতদিন জলে ভাসছিলেন, এবার জলে ডুবে মহিমা বাড়িয়েছেন। উনি পাঁচ পিঠ ডুবিয়ে বসে আছেন। ওঁর মহিমা বোঝা ভার। ওঁর পাস দিয়ে যিনি যাবেন তার রক্ষে নেই। তিনি মানুষ খান। আবার সময় পড়লে মানুষ-মাল সহ নৌকোকেও হাতছানি দিয়ে ডেকে নেন। যাকে ডাকেন, তার আর নিস্তার নেই।

মোড় করলে, পারা পুঁতলে মাঝি মাল্লা তাই নীচু চেয়ে দেখে। জলের নীচু কি আছে দেখা যায় না। তবে তেমন জলের হালচাল দেখে বুঝতে পারে মাঝি। কাল রাতের ঝড়ের ঠেলায়—বিশেষ বুঝতে পারে নি ছমন। তাই এক বাছাড়ি সেল ডুবে। হিমু চিরদিনের মতো সেল। নদীর গর্ভে তাদের ফেলে পালাতে হচ্ছে ছমন মেরোকে। অযাত্রা। অযাত্রায় এই হয়। অযাত্রায় এই হয়।

ছমন মেরোর আগ্-বাছাড়ি নদীর তাঁটাতে ভেসে গেছে। গেছে দক্ষিণে। গেঁয়োপালি ধরে থামলো ছমন। নিতাই আর সুধাম-শুকদেবরা ছিল মাঝ-বাছাড়িতে। তারা অনেকে ছিল। দাঁড় মেরে তিন বাঁক জল তাড়িয়ে পালিয়েছে উত্তরে। উধাও পালিয়েছে।

সন্ধ্যা হলো। দিনের আলো বাপ্সা হয়ে এলো। কালিঘণ্টা বাজলো বজবজিয়ার কালীমন্দিরে। শুধু কি কালিঘণ্টা—, গম গম আওয়াজ হচ্ছে। মা অভয়ার মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টাধ্বনি। তার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। নৌকো থামলো কিছুক্ষণ। সুধাম দাঁড় ছেড়ে নিতাইর দিকে তাকালো। তখনও হাল ধরে আছে নিতাই শক্ত হাতে। নিতাই তাকালো বন্ধুর দিকে। যেন চকমকি পাথরের

ঘনঘনি হলো ঠোঁটে ঠোঁটে। কাজল দূরে সরে এসে বন্ধুর প্রশ্নটা বন্ধ করে এনেছে নিজেই। বাঙ্ময়ী এইবার মনোযোগ দেবে। কিন্তু মোটে : ও মন—সুধাময় ডাকে

নিজেই বললো, 'মোক্ষম বাঁচন বাঁচি গ'

না ভেবেই কথাটা বললো সুধাময়, 'না, তার চেয়ে চল—'

হাত ধরলো কজাকজ। হাত ছেড়েনি মনের আনন্দে নিজেই মোকো গিয়ে পৌঁছলো আলিপুরে। এইবার পশুর বিজনীর্তির সাথে কজাকজের বাঁধন আরো আরও ঘোর ঘোরালো। এই বাগানের এমন জায়গাও তেমন বাকী নেই আজ আর বাদলা এসব এ হয়েছে। ওপাশের নিজনে ও-চাকরটা মিটমিটে লাল আলো হাতে দেখিয়ে একেবারে বিশ্বজন্তুদের দিকে এগিয়ে গেল সুধাময়।

নিজেই বললো, 'কুক, বাঁচাবে গ'

সুধাময় সায় দিলো, 'যাব—'

পাশে উঠে গিয়ে একটা বাঁকা পিরিচের গুঁড়িতে কাঁধ বাঁধালো নিজেই। বাঁধাড়ি খামলো।

হাত ধরে অন্ধকারে টানিয়ে সুধাময় উত্তরে এ। ঘন ঘন্টিতে আজ যে ঘিরে ধরে। কাঁধ দিয়ে এইবার আমলে আর নিজের ছিল না। কিন্তু বন্ধু সাথে মোক্ষম ঘরে ওকে আগলে ছিল নিজেই। এ ঘরে ঢোকা পাঁচিলের আলোকময় পাড়ে পাড়ে নিজনে সুধাময় কজাকজ বাঁধাড়ি আসছে। প্রাণের শীতল হয়ে যায় আগে ছাড়া এই। কাঁধ ছিঁড়ি ছোড়া-কাঁপড়ি-আড়ার বাঁধ আছে পাকে কজাকজের বাঁধ। দূরে অনেক ইতিহাসের বিজনীর্তির আলোয় আলো আছে। চেয়ারে বাঁধন বাঁধাই একটি আধটি চুমায় মোকো। নিজের বন্ধুর দূরে নিজেই প্রাণের মতো দূরে সাথে বাঁধন মানুষ। নিজেই পাশে ঘুরছে। কজাকজ-বাঁধনে ঘর-এর দূরে নিজেই পাশের প্রাণের গন্ধ। ঘর ঘরে এই। ঘর ঘরে ঘোরে ঘর-কলিয়ে এইবার উলঙ্গ চেয়ার-এর ওপর দিয়ে যে চাঁদ ঘাঁধা-ঘড়ানো গন্ধ উঠছে হয়ে উঠেছে। ওপাশের মোকো ঘোরে ঘেউ গাইছে—

কজাকজে ভয় কর না, ও বিধুমুখী—
কালো চুলে ঘেরা চূড়া করব মালার হার নিজে

ঘন্টা এসেছিল চোখে। একটা ঘোরে ঘোর সুধাময়

Hallmark of Quality

IN OFFICE FILES

LEVER ARCH ● SEMI-LEVER ARCH ● RING ● SEMI-RING
AUTO CLIP ● DOCUMENT CASE, Etc.

EASTERN INDUSTRIES CO.

9/4, PATUATOLA LANE, CALCUTTA-9

Gram : LEVERFILE ✱ Phone : 34-4709

দিঘিনগরের পাশ দিয়ে চলে গেছে যে পথটা ওপাশে মেনকার বাসাটায় যাওয়া যায়। দিঘিপুরে পরিচয় হওয়ার পরে একবার এসেছিল সুদাম। মেনকা এসে একদিন পৌঁছে দিয়েছিল। আজ তিনদিনের হবে গেল কোন খবর নিতে পারে নি সুদাম। যেতে পারে নি ছুটির কাজ ছেড়ে। আজ একবার গিয়ে খবর নিয়ে আসবে। মেনকা বলছিল ডাকঘর হাটবারের হাটচালায় গিয়ে উঠবে। ওখানকার বাতাসে নাকি টাকা ভাসছে। কুড়িয়ে নিতে পারলে হয়। হাতে-পায়ে গয়না নেই মেনকার। সোনার গয়না। সোটের জন্যেই কুলোয় না, প্রসাধনে পয়সা উড়বে কি করে। তাই দরকার তেমন জোটে না মেনকার, শহরে দরকার। মেনকা বলছিল, ওখানকার হাটচালায় বসতে পারলে সব রকম মানুষই জুটবে। কি হলো, খবরটা নিয়ে আসবে সুদাম।

সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুনির ছন্নবেশে শমন ডেকেছিল সবাইকে। সতর্ক হয়ে সবাই হেঁচকা টানে খুব বাঁচিয়েছে। বাঁচিয়েছে তাকে নিতাই। পাশে বন্ধু ঘুমিয়েছে। লোকটা ঘুমছে না; গান ধরেছে খোলাখুলি গলায়,

অমলকমে সজনী গ' কাঁটার ঘায়ে,
বুকে জলে তুষের আগুন বিরহ বেদনা—গ'
সজনী বিরহ বেদনা॥

গানের গলা ক্ষীণ হয়ে গেল ক্রমশ। কোথাভিটিটা থেকে কোন্ সোয়ারি গেল ও দিকটায়। ও দিকটায় ঐ আলো জ্বলে। টিমটিমে হেরিকেনের আলো জ্বালা।

মনটা আর মানছে না সুদামের। নেশা ছুটিয়ে গেছে যেন গানটা। সুদাম উঠে পড়ে বংশীকে ডাকে,—'ও বংশী, চাইল-টাইল ছুটা ছুটা। প্যাটে যে পড়ে নাই কিছু। উঠ—'

বংশী এক ডাকে উঠে বসলো। উঠলো আরও জনকয়েক। কত রাত হয়েছে কে জানে! চোখ মুছতে মুছতে বংশী বলে, 'চাইল ডাল সব রয়েছে ঐ নৌকায়।'

'তবে চাইল কিনতে হবে বাজার থিকা। আয়, তরা ক্যাও আয় আমার লগে—' সুদাম নেমে গেল তাড়াতাড়ি। দোকান থেকে চাল-ডাল নুন-মসলা কিনে বংশীর হাতে পাঠিয়ে দিল সুদাম। বললে, 'আমার এট্টু কাম আছে। আমি ঘুইর‍্যা আসি—তুই যা—'

মোটা রাস্তাটা থেকে সরু গলিটা প্রায় অন্ধকারে অনেকদূর এগিয়ে গেছে পুল পেরিয়ে। যেখানে বাজার বসে—তার অনেক দূরে রাস্তাটা চলে গেছে। হনহনিয়ে এগিয়ে গেল সুদাম। বারো খানা ঘর পেরিয়ে মেনকার আস্তানা। হেরিকেন জ্বালা থাকতো, আজ কিন্তু অন্ধকারে খাঁ খাঁ করছে চৌচালা। মেনকা কি নেই?

ইতস্তত ভাবছিল সুদাম। একজন প্রৌঢ় মানুষ খবরটা দিলো, 'ও তো আইজ তিনদিন গেছে গিয়া—'

'কিন্তন গেলা কই?'—সুদামের বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। চোখে আগুন—।

'ডায়মন হেরবারে বইল্যা শুনছি।'

সর্বনাশ। আজ রাতটার জন্য মেনকাকে পাওয়া যাবে না। বুকের বাতাস আছড়ে পড়লো সুদামের। উন্মাদ তুফান যেন ভেঙে ভেঙে পড়লো রক্তে। নদীর বুকে বুঝি তারই বেদনা বাজে। ছলছল শব্দ উঠছে। সুদাম ফিরে এলো ঘাটে।

॥ ৫ ॥

আষাঢ়ের ছুটো মাসে তেমন সুবিধে হয় নি। হয়েছিল কিছু আষাঢ়ে। গোমতী-শোনকুণ্ডী-ঘুসরি নদী ভাসিয়ে পদ্মার বুক থেকে শ্রাবণ নিয়ে এসেছিল ভাগীরথী। তারপরে ছগলীতে। মোহানা ছগলীতে সেদিন হৈ-হুল্লোড় শব্দ। ঘুঘুডাঙার মা গঙ্গার। চন্দনের রঙ মেখে তিনি পাথার হয়ে এলেন মকরবাহনে চেপে। জলিতে তিনি এসে পড়েন। নতুন বেশবাস। সাড়া দিয়েই আসেন। জেলে কৈবর্ত সাড়া পায়। কাশীপুরের খালকিনারের এক মাল্লাইর মাল্লারা খবর পায়। তালতলার মানুষ দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিল, চুঁচড়ো হয়ে আসার সময় খবরটা নিয়ে এসেছে। কিন্তু আগে খবর পেয়েছে মোহানাপারের লুটভিয়ারা। হাওড়া পুল পেরিয়ে আর উত্তরে দক্ষিণ পারের সীমানা নয়। উত্তরের মানুষ তাহলে মোহনাবে। সীমা-সরহদ্দ মেনে বছর পরিচালনা করে ছদন গেরো। কারণ সে তো দক্ষিণের মানুষ। ছদন গেরো খবর পায় জল দেখে। সে জল সারা বছরের জলের মতো ফিকে হবে না। অনেক বেশী ইটকে লাল হবে। ফিকে রক্তচন্দনের মতো লাল। আর ও জলের স্বাদই হবে

আলেদা। পরিষ্কার বোঝা যাবে নদীর জল তখন সুনো নয়, বড়-মাছু মিঠা। এখন জল মোহানা নদীর হয় না। জমির শেষাশেষি বছর সাজায় ছুমন। মাবনের খবর পেলে সাজায়।

এ বছরের আষাঢ়ে কলাকল মোটামুটি সব হিসিবে ভালই। শ্রাবণের প্রথম প্রথম মন্দ যাচ্ছিল না। কিন্তু শেষ-শ্রাবণ শমন হলো ছুমনের। বাছাড়িপানা গেল। শ' ছেড় টাকার কম কি। বড় দামী পিচপানের বাছাড়ি ছিল গো ওর। মোগর পিটে গড়া কলতিয়ার মিস্ত্রীর। গেল—। আর গিয়েছে একজন দাঁড়ি। শক্ত দাঁড়ি ছিমু।

কিন্তু ছুমনের পড়শী, ছিমুর মেয়েটা-ছেলেটা-বউটা কাঁদে। ছেলে অবশ্য এখন বোয়ান হয়ে যাইতে পেরেছে। এবছর আসে নি, আগের বছর লুইতিয়া বাছাড়ির দাঁড়-কাঠ ধরবে। সুধাম হারিয়েছে মেনকাকে। বুকটা আন্‌পান্ করে। রমজাননগর ছাড়ার পর ভাই-বোন কোথায় ভেসে গেল। কিন্তু তার বদলে আপন করে পেয়েছিল সুধাম দুজনকে—মিতাই আর মেনকা। বন্ধু তাকে ভালবাসে। কিন্তু মেনকা তাকে ছেড়ে কটকা মেরে চলে গেল ভাষমণ্ড হারবারে। একটিবার জানিয়েও যায় নি শহরের কোন্ ঠিকানায় সে গিয়ে উঠলো। জীবনে বড় দাগা দিয়ে গেল মেনকা। অবশ্য নগদ অনেকগুলি টাকা তারই কাছে তার জমা ছিল অটুট বিশ্বাসে। নদীর এ কূল ভাঙে, ও কূল গড়ে। মেয়েছাওটাও অবিশ্বাসী নদীর জাত। কোথা থেকে কোথায়—তার ঠিক-ঠিকানা নেই। কোথা গিয়ে শেষ পরশ পাবে, কোন্ অকূলে। আর পুরুষকে নিয়ে তার লীলা খেলা। কাকে বাউলে করে পারে যে মানুষ কুটে—বোঝা ভার

শরীরের ওপর দিয়ে গেল পাঁচশহরী মহাজনী ঝোট গড়াগড়ি যাচ্ছে। নিদিয়ার পরিশ্রম। দাঁড় টানতে টানতে এ হিরদিনে কোমরে গিল ধরলো। মিতাইও বসে গেছে। তবু ছুমন গোরো কুটি, সমান তালে। একেই বলে ঠোড়। গোরোর ঠোড় নিয়ে সত্যি জন্মেছে ছুমন। যদি গর্ব করে থাকে, তবে মিথ্যে গর্ব করে নি ছুমন।

সাপ নেই বাছাড়িতে কেউ, গজর গজর করে মিতাই,

NEW KASHMIR & ORIENTAL TRANSPORT (P.) LTD.

H. O.—BIRHANA ROAD, KANPUR.

55, BARANASHI GHOSH STREET,

(VIVEKANAND ROAD)

CALCUTTA-7

Telegram : DESERVING Telephone : 34-5748

DAILY AND REGULAR PARCEL SERVICE BY ROAD.

Branches.	Address.	Phone.
BOMBAY	62, Donton Street, (Domergali), Bombay-9	42259
AHMEDABAD	Pachkuwa Gali	51361
INDORE	Siya Ganj	7181
DELHI	Naya Bazar	
VARANASHI	Lahartara	291
ALLAHABAD	Leader Road	5434
BALIA	Chowk	43
AZAMGARH	Balasa	65
DOHORIGHAT	Sarjoo Bank	
ALIGARH	G. T. Road	PP31
MAUNATH BHANJAN		PP123

MIRZAPUR — LUDHIANA — AMRITSAR

'বুঝলি সুধা, এই লোকা গেল, আর এ দুটো গেলে—এটা অসম্ভব হবে। আমি আর পারি না।'

'আমি কি সব পারি ভাই? আমারও অবস্থা একই—'

'তবে কইলে পারস।' সুধাময়কে বলে।

সুধাময় কাটা শেকড়ে ধরে, 'কই আর কাকে? বন্ধুর কাছে যাবার আগে বিকাইচি।'

উলটে হাসে সুধাময়।

কিন্তু বেশীক্ষণ চোখমুখ তুলে রাখলো নিতাই, বললে, 'বেশ বেশ, তারে ঘুরে বেশ কথাখান কওয়া হয় আমারে। আমি বুঝি বুঝি না?'

সুধাময় জড়িয়ে ধরে নিতাইকে। বলে, 'বন্ধু, এই হাড়-কাটনি কাম ছাইড়া তোকান খুলবে কইছিলে—তার কি হল?'

নিতাই বললো বড় আস্তানো কথায়। চেয়ে চেয়ে দেখলো সুধাময়কে। সুধাময়ের চোখেমুখে বড় পরিশ্রমের ছাপটা এখনও লাল হয়ে রয়েছে। চোখের পাতা ফুলে উঠেছে। কাল পরশুর রাত নির্ঘুম দাঁড় টেনেছে তারা। কাকদ্বীপ থেকে কলকাতা, কলকাতা ছেড়ে পীরসারেঙ্গা-সারেঙ্গল হয়ে আবার কাকদ্বীপে ফিরে গিয়েছিল। তবু কিছু পায় নি। ছুটন বলে এবারও অযাত্রা। এ মাস গোটা অযাত্রার পাতে ভরা অযাত্রার মেহনত খোয়াতে হয়েছে তাদের। হাতে-পায়ে-কোমরে ব্যথা। বুকটা টন্‌টন্ করছে। নিতাই বললো, 'আমি ত আমার মনের কথা খুইলে তুমারে কইচি। যা করার চালাকে-চতুর মানুষ তুমি,—তুমি কর।'

'কিন্তু বন্ধু, পারের কড়ি কই? কড়িটা যে দরকার আগে—'

'আমি দিব—' নিতাই বললে। 'তুই বেশ সুধা, বাপ যা কউক আমারে, এই বাছাড়ি বিক্রির করব আমি। সেই টাকায় তোকান।'

সুধাময় হো হো করে হাসে। বলে, 'তুই বেপচিস্ নাকি নিতাই? তার হইল কি, ভিটা বিকে কেউ ভিত্ গাড়ে? তার লাগান আমাদি ক'জনা?'

'তবে'—বিস্তৃত চোখ তুলে ধরলো নিতাই।

সুধাময় খোঁচানি দিয়ে আসণ বুদ্ধি বাতলে দেয়। বলে, 'পুটতিয়ার পোলা তুই, তরে বেশ নৈতুন পাঠ কি পড়ামু। আমাগো মাল হইলে হইল। মাল পাইলে তোকান খুইলা বসতে কতক্ষণ। লুটের মাল তর বাপের চৈখের ফাঁকে গুছাইতে হইব আমাদের। বুঝলি?'

বুঝলো নিতাই! হাঁ, রমজাননগরে ডাকাতি করেছিল বটে সুধাময়। কেমন ঘাড়া বুদ্ধি। কিন্তু ছেলে কথা বললো নিতাই, 'সে ত বুঝলম। কিন্তুন বাপের চোখ ত জানস্ সুধা। জলের নীচের হালকে সে দেখতে পায়।'

'পায় তো পাই,' সুধাময় বললে, 'যাদন ব্যাপারীগের কেছে যায় যুক্তা, তাদনই কামটা হাসিল্ করতে হইব। আগে থিকা ডিঙি ঠিক কইরা রাখমু। তরাতরি মালটা পরাইয়া দিতে হইব, ক্যাও যেন টার না পায়।'

কিন্তু নিতাইর কাছে কেমন খটকা লাগে। ভাবে, এত ব্যাপার সঙ্গে সঙ্গে করতে পারলে হয়! কথা বলে না নিতাই। তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে।

তারপরের দিন তেমন কিছু হয় নি। তারপরের পরের দিন একটা সুবিধে পাওয়া গেল। কাকদ্বীপ ছাড়িয়ে একবারে পশ্চিম পারে সুতাহাটা সাইটে একটা নৌকো পেয়েছিল লুটতিয়ারা। মহাজনী নৌকোটায় কেবল প্যাকিং-বাক্সই বেশী ছিল। কাচের বুড়ি অল্পস্বল্প। সব নিতে পারল না ছুটন। তার হলো, তিন বাছাড়ির এক বাছাড়ি নেই। সুতরাং ফিরে ধরতে পারে নি। নৌকো আগলে—ভয় দেখিয়ে যা পেয়েছে—তাই নিয়ে এলো ছুটন। কিন্তু আসবার সময় বড় সুবিধাটা খাটলো নিতাই আর সুধাময়ের। একটা কোষডিঙিও পাওয়া গেল কাকদ্বীপের ঘাটে। ওয়ারিশ কেউ ছিল না। টেনে নিয়ে এলো সুধাময়, কেউ বাধা দিলো না। কোষ-ডিঙিতে বড় বড় প্যাকিং কটা ভরে নিয়ে এলো তারা।

বিকেল গড়িয়ে গিয়ে সন্ধ্যা হবার মুখ। কালো ঘষার মেঘ লেপালেপি হয়ে রয়েছে আকাশে। সূর্যের বেলাশেষ আলো দেখা যায় নি। বাণি-জঙ্গলের ভেতর থেকে ছুটন বেরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল লক্ষ্য শিকারের ওপর। আট জন দাঁড়ি উঠেছিল মার-মার করে। লগি দা নিয়ে মারতে এসেছিল। কিন্তু লুটতিয়া যোয়ানদের হাতে সব রকম অস্ত্র। পারবে কেন? মাঝিকে করলো সুধাময় সমশানে বন্দী। নিতাই গুদাই চড়িয়ে দিলো মালভরা নৌকোয়। রই দিয়ে মাল নামাতে হয় নি। ছোটবড় মালের বুড়ি-

চুলচি-চোরের ওপর সাড়িয়ার বোঝা তুলে দিয়েছে। বলে, 'যা পার নিয়ে যাও, পাপে মেরো না—গ—'

ছুদন বলেছিল, 'পাপে মেরে আমার বাড়াতে আসি নি। তোমাদের মতন আমরাও অভাবী মানুষ। পাটের দায়ে তোমাদের মতন আমরাও এইসেছি। তোমাদের মেরে আমার কি লাভ? আমি মারি তেলের—তেলের অনেক আছে। গায়ে লিখে লাগাবে নি তেলের দোকান। সেই মহাজনদের মাল আমি মারি।'

রাত একপ্রহরের সময় ভাইমত হাবলাদের ঘাট ধরলো তারা। ছুদন নিজে গেরোকে পথে দিতে নেমে গেল। বাঁধা-বাড়ার দোগাড়ে চলেছে। কোমরিডিতে নিতাই মাল নামালো অনেকখানি। তারপর রশি খুলে সুদামকে বললো নিতাই, 'তুই যা সুদা। আমি গেলে টাকা পাবে বাপ—'

'কিন্তু দোকানটা কুনদিকে তা তো কইলি না?'—সুদাম চালাচালি কথা বললো।

'তা আমি জানি নি, তবে ছুদছি ফটিকচাঁদ পতের দোকান এই গঞ্জেই। খুব নামডাক আছে দোকানের।' নিতাই ঢোক গিলে গলায় বললে।

মাথার চকমকি পাথরের মতো লেগে বৃদ্ধির বিজলী খেললো সুদামের। বললো, 'আটের পুলিশরা তাহলে জানে নিশ্চয়—'

'পুলিশ!'—চমকে উঠলো ভয়ে নিতাই, 'তুই কী কইস সুদা?'

সহজ ভাবেই কথাটার জবাব দিলো সুদাম। বললে, 'আমি কইছি, ওরা ফটিকচাঁদের দোকানটা চিনে আমায় চিনাইয়া দিতে কইবু—অর কি—?'

নিতাইয়ের মুখে ভাষা সরছে না। কে জানে, একবার চুরির মুখ থেকে বাঁচিয়েছে বন্ধুকে। আবার যদি বন্ধুর কোন বিপদ হয়। মা গো, কালীঘাটের কালী মা মা। এমন যে আমার বন্ধু, তুমি তাকে বাঁচাও মা। মনে মনে স্তুতি আওড়ালো নিতাই। ওদিকে দেখছে বাপ-ব্যাটা। কিন্তু বন্ধু যে এরই মধ্যে কোনদিকে চলে গেছে। সর্বনাশ!

Ω
OMEGA
Constellation

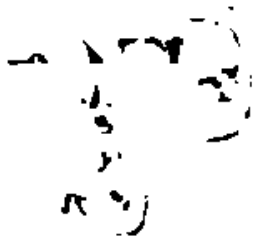

IMPERIAL WATCH CO.,
154, Radha Bazar Street, Calcutta-1

মাল-ভরা কোরনাওগুলো ঘাটের কিনারে থেমে উঠে এলো সুধাম। একটা ক্লান্তি ভরা উল্লাসে মনটা ভরে গেছে। মোহনা হুগলীর কিনার ঘেঁষে এতক্ষণ যে ঢেউ-এর ওপর দিয়ে কোরনাওটা চালিয়ে নিয়ে এসেছে সুধাম তাতে অফুরান একটা আনন্দ আছে। একটা জীবন নিয়ে খেলোয়াড়ের খুশীর উল্লাস। লুটতরা হয়ে জীবনের জল-জমা করেছে সুধাম। একটা শক্ত করে কাছি বাঁধছে ভাগ্যের ওপর সে, আবার ভাল মানুষ হয়ে উঠবে। একটা মানুষ—আধাখোড়া ভুল করে না; পেটের দায়ে পড়ে অন্যায়টা করেছে বলে অন্যায়ের কাছে তার মনুষ্যত্বকে সে বিকিয়ে বসে নি। যেদিন সুযোগ পাবে, আবার স্বাভাবিক হবে সে। যেমন ছিল তেমন হবে। জলের ওপরটা সমতল হওয়া নিয়ম। ভাগ্যের বাতাস এসে তাকে মাতায়।

পুলিনকে নিয়ে কটিকটাদের দোকান চিনলো সুধাম। সঙ্গে মালটা তারই দোকানে গচ্ছিয়ে দিলে। কড়ে একজন বলেছিল। সে বলেছিল, 'আমার দেও মালটা।'

সবাইকে শুনিয়ে কথাটা বললে সুধাম, 'না, দাদা, আমি নিজেও একজন দালাল। এই কইরা খাই আমি—ক' পয়সা মুনকা পামু তুমার দিলে।'

'তা বটে—'

লোকটা কথা না বাড়িয়ে চলে গেল। কটিকটাদের দোকান বেশ বড়। তিনজন মুহুরি রয়েছে। কুশ মুহুরীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে অর্ধেকটা মাল তাদের দোকানে মজুত রাখার কথাটা ঠিক করে নিলো সুধাম। বাকি অর্ধেকের দাম চুকিয়ে দিল ঠিকাদার। অনেকগুলি চোকাচোকা নোট গুছিয়ে কাপড়ে বাঁধলো। দোকান পেরিয়ে আসতে সামনে হাটখোলা। একেবারে নদীর কিনার পর্যন্ত চলে গেছে। গঞ্জে আসার সোজা পথ এইটাই। প্রায় সব জায়গায় অন্ধকার। শুধু নীচু চালার দোকানে গ্যাস লাইট জ্বলছে। টিনের খুপরিগুলোয় পানবিড়ি সরবতের দোকান। সামনে হেরিকেন জ্বালানো। দূরের বড় রাস্তার বাড়িতে, পাকা-বাঁধানো মেঝের দোকানে বিজলী বাতি জ্বলছে।

রাত্রি রিমঝিম করছে। হাটখোলার কিছুটা ফাঁকা—নদী দেখা যায়। মোহানা হুগলীর ওপর গাধাবোট শিস দিয়ে নীল আলো জেলে যাচ্ছে আসছে। নৌকোর পাটাতনে—কেরোসিনের লাল বাতি জ্বালিয়েছে। যেন ওরা সব দেউলে হয়ে গেছে। আরো দূরে আলোর রেখাগুলি দিয়েছে বড় বড় জাহাজ-স্টীমার-লঞ্চ।

হাটের প্রায় শেষ কিনারে যে পানসরতের দোকানে গ্যাসের বাতিটা জ্বালা, সেইখানে এসে থমকে দাঁড়ালো সুধাম। এই গঞ্জেই কোথাও মেনকা এসে পসরা পাতিয়েছে। রূপ আর যৌবনের পসরা। কোমরে টাকা বাঁধা আছে অনেকগুলি। যাবে নাকি সুধাম, একটু খোঁজ করে দেখবে। মেনকার সঙ্গে দেখা হয় নি অনেকদিন। একটা খিলি মসলা-পান কিনে খেলো সুধাম। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে একটা ওটা চায়, 'ভাল সিগারেটের প্যাকেট আছে? কত কইয়া?'

সামনে কোথাও হোটেল। খেয়ে দেয়ে কাপড়ে মুখ পুঁছতে পুঁছতে দোকানের সামনে ভিড় জমায় অনেকে। 'মিঠা মসলা আছে না? আমার সেইগা এক খিল সাজবা জুত কইয়া।' একটি মেয়ে একেবারে সুধামের ওপর এসে দাঁড়ালে সুধামের।

পান চিবুচ্ছিল সুধাম। আচমকা, আচমকা বিজলীর ঘা লেগে অসাড় হয়ে গেল সে। তারই দিকে তাকিয়ে কথা বললো মেয়েটি, 'আপনের নাম সুধাম বক্সী না?'

'কে—মেনকা?'—চমকে উঠেছিল সুধাম। তারপর নিজেই ইতস্তত করে—'না—না'—

একেবারে মুখোমুখি সরে এলো মেয়েটি। মাথায়-বুকে কাপড় নেই। সিঁথিতে সিন্দুর বলে নি। হাতে দু গাছা সোনার চুড়ি ঝলমল করছে। সরু সুন্দর একটি মুখের ওপর কি সব যেন মেখেছে, গন্ধ পাওয়া যায় কাছে দাঁড়িয়ে। চোখে সুর্মা দিয়েছে—তাকালে বোঝা যায়। মুখ তুলে মেয়েটা বললে, 'না, আমার নাম মেনকা না। মেনকা এখানেই থাকে। কিন্তুন আপনের—

'হুঁ, সুধাম বক্সী আমারই নাম।' একটু যেন আশা পেয়েছে সুধাম। মেনকার ঠিকানা পেয়েছে।

পরকতের দোকানে একপাশে ভিড় জমেছে। আর একপাশের গ্যাসের মাজা আলো ঝলসে যাচ্ছে। দোকানের একেবারে মুখোমুখি থেকে পান চিবুতে চিবুতে এগিয়ে এলো মেয়েটি সামনে। সুধামের মনের তোলপাড়ে চেনা-অচেনা

ঢোল এণ্ড কোম্পানীর
দাদ ও কাউরের
মলম
নিম-মলম
ঘা, থোঁস, পাঁচড়ার জন্য
কিউটা-টোন
ক্ষতা, বেদনা ও চর্ম্মরোগের জন্য
ঢোল এণ্ড কোং
বরানগর-কলিকাতা-৩৫

হাত দিয়ে টেনে বললো সোনা। মুখোমুখি তাকাতে গিয়ে চোখটা অকারণে নুয়ে গেল। পানের রসে, ঘষরার গালে ঠোঁট দুটি রক্তলাল হয়ে উঠেছে। পরিষ্কার দেখা গেল। গালটা কেমন বসে গেছে অনেকখানি। চোখের তারা বড় উজ্জ্বল। বর্ষা আসবে নাকি। হালকা বাতাস আসছে। হিমেল বাতাস।

সুধাম বললে, 'ইখানে কোথায় আছিস বইন। ঠিকানা কতদূর?'

'ঠিকানা আমার নাই দাদা।' আশ্চর্য, একটু থতমত খেলো না সোনা। বললে, 'এইখেনে কোথাও আছি। আবার ভাইস্তা যাবো কুথায়—কি তার ঠিকানা?'

'কিন্তুন—'

'আজ যাই দাদা—' হঠাৎ যেন অন্ধকারে ছোঁ মেরে ছুটে পালালো সোনা। একটা বিভ্রান্তির মতো চমকে দিয়ে গেল। দুঃস্বপ্নের মতো হারিয়ে গেল সোনা। সামনেই কালো গলিটা। তার ঐ অনেকদূরে আলো একটা জ্বলছে। অনেক অন্ধকার জমেছে এ গলিতে। শ্রাবণ রাত্রি তার ওপর আবার রোশনাই মাখিয়েছে। সোনা হারিয়ে গেছে সেই অন্ধকারে। দোকান থেকে সিগারেট কিনে একটা ধরালে সুধাম। গন্ধটা নাকমুখ দিয়ে মগজে ঢুকলো। সোদরই নয়, কেমন কড়া নেশামাখা গন্ধ। আমেজ আছে গন্ধটায়। সুড়সুড়ি দিচ্ছে ভেতরে কেউ। আর দাঁড়াল না সুধাম। একেবারে সরাসরি এগিয়ে এল সে।

ঘরগুলো ছোট—দুপাশে। কয়েকটা মাঝারি গোছের টিনের ছাওয়া। তারই মধ্যে দোতালাও আছে। কোনটার দরজা বন্ধ, ভেতরে আলো জ্বলছে। কোনটা আধা-খোলা। একটা দরজার মুখে বসে কয়েকজন তাস খেলছে। সুধাম গিয়ে জিজ্ঞেস করতে মেনকার নাম ধরে—একজন মাঝবয়সী লোক উঠে এল। বাকি ক'জন হাসলো মুখ ঢেকে। লোকটা ঘর দেখিয়ে দিলে, 'ঐ যে বাঁকটা, ঐ বাঁকটার পাশ।'

ঘরখানা অন্ধকার। পাশের ঘরেও আলো নেই। ওপাশের ঘরে কারা যেন কথা বলছে, শোনা যায়। কোমরে টাকা আছে অনেকগুলি। টিপে দেখলে একবার সুধাম। বাইর থেকে ডাকল, 'কই, কে আছেন গ—ভিতরে ক্যাও আছেন—'

'কে?'

'কই রমজাননগরের লোক—'

নাম ধরে মেনকার ডাকলে না সুধাম। নিজের নামও চেপে গেল। বিশেষ এ সব জায়গায় নাম ধাম এত সহজে বলা যায় না রাত্রে,—আলাগোড়া এসব বোঝে সুধাম। লোকটা চক্ষুলজ্জা করেছে কি না আসে। তাই কথা জানে। চিনতে যদি পারে কেউ, তবে ঐ কথাটুকু থেকে চিনুক। নাম সহজে বলবে না সুধাম।

অন্ধকার ঘরের ঘোর পার থেকে একেবারে কড় তুলে ছুটে এলো মেনকা,—'একি, তুমি এতেও সন্ধান করে। আস, আস।'

'এই মেনকার ঘর?' ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটু জিজ্ঞেস করে সুধাম। ঘরে তখনও সবটা ঢোকে নি। বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়েছে।

'এইসে আমার বিছানায় বস।' আগ্রহ মেখিয়ে হেরিকেনটা জ্বালাতে জ্বালাতে কথা বলে মেনকা, 'কি গ অন্ধকারে দাঁড়ালে ক্যান?'

আলো জ্বালানো হয়েছে। ছোট একটা ঘর। তিনধারে ছোট ছোট জানলা। একটা খাট পড়েছে ঘরে। আলো পড়ে চিকটা গলার চিকচিক করছে। হাতে সোনার শাঁখা। গোছা গোছা আয়না-চুড়ি। কানে কানবালা। সুধাম দেখলো, আলিপুর ছাড়ার পরে এই ক'টা দিনে মেনকার গায়ে সোনার গয়না উঠছে। কী বাহার মানিয়েছে গ্যারেটি গয়নার ঝলকে মেনকার। যেন স্বর্গের রূপসী হয়ে রূপের পসরা পাতিয়েছে মেনকা।

মেনকা বললে, 'তুমার পথ চেইয়ো রইলাম কয়টা দিন। কিন্তুন তুমার তো খাবা নেই। খাবে পিতেমর খুড়াকে কইতে নিয়া আইল ইখানে। পীতেমর খুড়া এইখেনের মানুষ। চাকরি করে আলিপুরে।'

'তবে ত ভালই—' সুধাম বললো।

খিলখিলিয়ে হাসলে মেনকা। বললে, 'কই আর ভাল গ। পরাণ বঁধু, তুমি না রইলে আমি যে আঁধার দেখি চারিপাশ। তা ত তুমি বোঝ না—'

'বুঝব, বুঝিল—আইজ না। তবে ইখানে অসুতেছে ক্যামন বল—'

মেনকা সোজাসুজি জবাব দেয় না। বলে, 'ভয় নেই গ অখন আর নড়ব না কোনদিকে। পরাণে ধাক্কা না পেলে হয়তো উঠব না কোনকালেই।'

'আইচ্ছা, তুমি সোনারে জান, ইখানে ক্যাও ঐ নামের থাকে?' হাবিজাবি প্রশ্ন করে সুধাম। যেন ভারি অন্যমনস্ক ব্যস্ত সে আজ। একটু আগে মেয়েটা দু চোখের সামনে যেন দুঃস্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেছে। সুধাম ভাবছে তারই কথা।

মেনকা তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ। ভাবে, বঁধুর মন টলাতে এখনো কি পারে নি সে। এত তরল কথার কারসাজি দিয়েও পারে নি! সোনার কথায় উদ্যত হলো মেনকা। বললে, 'তবে আর আমার কেছে ক্যান, যাও, তার কেছেই যাও—' ঝপ্ করে উঠে যাচ্ছিল মেনকা।

টেনে বসালে সুধাম মেনকাকে। একেবারে বুকে জড়িয়ে নিলো সুধাম। মেনকার নরম আউলো চুলে হাতটা গেঁথে যায় তার। ঝুলকুল করে জোয়ার নামছে মোহানা নদীতে। মাঝি টের পায়। নৌকো দুলে দুলে ওঠে। উজানী জলে নেশা আছে নদীর। নদীর বুক পাখার হয়ে ভেসে যায়। মেনকার দেহ মিশে গিয়েছে সুধামের বুকে। সুধাম বললে, 'রাগ কর না লক্ষ্মী মেয়ে, সোনা আমার আপন বইন হয়। তুমার ভয় নাই—গ—'

আচমকা, মাজা হেরিকেনের বাতিটা নিভে গেল নদীপারের হলকা বাতাসে।

॥ ৬ ॥

সারাটা আকাশ ঘিরে উজ্জ্বল রোদের আভাস। শ্রাবণের রোদ। সকালের মেঘ-ভাঙা রোদ বলে একেবারে মাজা মেজেদি। কাল যে গলিটাকে অন্ধকারে চেনা যাচ্ছিল না, এখন পরিষ্কার চেনা যায়। নদীর ধার ঘেঁসে একেবারে জেটির দিকে নেমে গেছে গলিটা। ইটের খোয়া বসানো কোন কালে ছিল। এখন গাড়ির চাকায় কাদা উঠেছে দেবে। একেবারে কোলকাতার গলির মতো, দূরন্ত গলি নয়। কাঁটার বেড়াও কোথাও রয়েছে। কলাগাছ উদ্দাম হয়ে উঠেছে। মানকচুর পাতা ঝুঁকে এসেছে খনখনিয়ে দেখা যায়। টেপাকলের আশেপাশে হিজে আর শুশনির শাক উদ্দাম হয়ে উঠেছে। শেয়াকুলের ঝুপসি একটা পাশেই।

ছোট ছোট ঘর গুলো। টিনের কোনটা, কোনটা খাপ্‌রা কিংবা গোলপাতার ছাউনি। ওপারের নদীর বাঁক দেখা যায়। নৌকোর মাস্তুল, লগিবাঁশ, গাধাবোটের ছাদ দেখা যাচ্ছে। দূরে জাহাজের চিমনি দেখা যায়, বিড়ি এপাশে ওপাশে কি সব জড়ানো। কত সব কারসাজি।

টেপাকলে এসে মুখ ধুলো সুধাম। মেনকার ঘরে রাতটা ভালই কেটেছে। রমজাননগর ছেড়ে আসার পর এই একান্ত বেদনার জীবনে তার অনেকখানি কালি-ঘা জুড়িয়েছে মেনকা। সুধাম জানে, এ বিষ দিয়ে বিষের শোধন। কিন্তু উপায় নেই। বিষের জ্বালা, কঠিন নির্মম সে কপাল, তাকে মনুষ্যকুলের বলে যে জিনিসটা আছে সে সইবে কতক্ষণ। কপালের হের-ফের হয় ভালমন্দ, কিন্তু হৃদয়ে কামনা-বাসনার বেদনা-উন্মাদনা যে সবারই সমান করে বাজে। মানুষের আসল পরিচয়টা যে ঐখানে লুকিয়ে। সে দেবতা নয়, ধনো নয়—মানুষ। মাটিতে মানুষ হয়ে জন্মেছে। মাটির যাবতীয় স্বাদ নিতে। পঁচিশ বছরের জয়ন্তির জীবনে সেই স্বাদের সন্ধান দিয়েছে মেনকা। মেনকা তাকে ভালবাসে।

মেনকা শুনেছে সব কথা সোনার। সব কথা খুলে বলেছে তাকে সুধাম। মেনকা লোক পাঠিয়ে দিয়েছিল তার সঙ্গে, সোনার চালাটা দেখিয়ে দিয়ে আসতে। পীতাম্বর খুড়োকে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

মেজেতে মাদুর পাতা। সোনা আলুথালু হয়ে ঘুমিয়েছে তার ওপর। পাশেই খাটের বিছানা। তাতে শোয় নি। এখনও পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে মেয়েটা। দরজাটা ভেতর থেকে খিল দেওয়া। মাথার পাশের জানলার কাছে ডাক দেয় পীতাম্বর, 'ও গ মাসী, উঠ না দিকি। কে তোমার লোক আসছে যে। ডাকে তোমায়।'

এক ডাকে হয় না। কয়েকবার ডাকাডাকি করতে পীতাম্বরের মাসীর ঘুম ভাঙলো। দরজা খুলে বেরিয়ে এলো সোনা। পিতাম্বরের পাশে সুধামকে দেখে ডাকে সোনা খাড়ির করে, 'আস দাদা, ঘরে আস।' যেন প্রস্তুতই ছিল সোনা দাদাকে সকালে দেখার জন্যে।

সুধাম এখনে কি না বুঝতে পারে নি। সোনা কাপড় সামলায় নি। সায়া-ব্লাউজ তেমনি পরা আছে। দেহবস্ত্র

সবটুকু নেই। সন্ধ্যা হলে যায়। চোখে কাজলের দাগ সবটা মোছে নি। মুখটা শুকিয়ে গেছে। পানের রসটায় বড় ঘোরাল হয়েছে ঠোঁট দুটো। সুহাস ইতস্তত করছিল। শীতাংশু বললো, 'আমি যাই দাদা—'

'আইচ্ছা আসি—'

শীতাংশু চলে গেল। সুহাস বিব্রত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছে। ঘরের ভেতর থেকে সোনা ডাকল, 'আয় দাদা। এই বিছানাতে বস।' কাপড় পরতে পরতে কথা বললে সোনা, 'কাল রাইতে এইখানে কুথা ছিলে?'

সুহাস কথা বললো বিছানাতে বসতে বসতে, 'কাইল ভর' সইন্ধ্যায় মাল নিয়া আসছিলাম এইখানের দোকানে। মাল দিয়া রাত চুকাইতে হইল রাইত। যাই নাই, ছেড়ে দিল। এইখানেই ছিলাম।'

একপাশে বিছানার একটুখানি ছেড়ে ছুড়ে দিলো সোনা। আর বিশেষ কোন কথা জিজ্ঞেস করলে না। কাল সন্ধ্যার কোন কথা তুললে না। কটকা ছেড়ে চলে এসেছিল, তারও কোন কৈফিয়ৎ দিলে না। খোটা চোখেমুখে একটা নির্মম হাসির ছাপ। গালের মাংস কে যেন খাবলে খেয়েছে, এমনি লাল। চুল এলো ছিল কাল রাত্রে। এখন আরও এলো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

সোনার বর্তমান জীবন কোন্ পথে চলেছে, কাল দেখা-মাত্র যা অনুমান করেছিল, তা মিথ্যা নয়। যেনকার মুখ থেকে সব কথাই শুনেছে সুহাস। জেনে শুনেই বোনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ভেতরটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠেছিল তার। হাজার হোক, যত পাতালেই তলিয়ে যাক সোনা, সুহাসকে সে চিনবে। এই এতটা কাল জীবনকে দেখেছে সুহাস। তার নিজের জীবনে একটা ঝড় বয়ে গিয়েছে—চোখের সামনে উজবুকের মতো সে চেয়ে চেয়ে দেখেছে। কি করবে? কাকে এ তাগ্যের কথা জানাবে? চোরের ক্ষুটি নেই, তবু ভাতকাপড়ের মার বড় মার জীবনে। আগে খেয়ে বাঁচো, মনে ইমারত গড়বে পরে। তিন প্রাণী জন্মেছিল রফজানসরের হোগলা-ছাওয়া এক-বন্দী ঘরে, একই মায়ের পেট থেকে। সুবল-সুহাস যুগল ভাই। সুহাস বড়ো। সোনা মেজো বোন। তিন প্রাণী ভেসে গেল রাইমঙ্গলের ঝড়ে, মাতলা আর আমুরা নদীর আগ্রাসনে—মোহানা হলদীর প্লাবনে। একেই বলে বিবর্তন। ঘূর্ণির মুখে ঘুরতে ঘুরতে বাইরের ঘা লেগে একেবারে বেজায় ঘুরে ছিটকে পড়া, তারপর যে যেদিকে পেরেছে ডাইনে-বামে ভেসে গেছে। আর দেখা হয় নি। হঠাৎ মোহানা নদীর পারে এসে আজ দেখা সাক্ষাৎ। ভাইবোনের চোখাচোখি। উভয়ে উভয়কে দেখে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। তবু সহজ করে বলতে পারছে না কেউই। সহজ ভাষাটা হারিয়ে গেছে।

পোড়া বিড়ির টুকরো, দেশলাইয়ের কাঠি পড়েছিল বাঁধানো মেঝেতে। সাফ করতে বসলো সোনা।

কথাটা খোলাখুলি বলে সুহাস, 'আমি আসছি তর কেছে। কমন আছস তুই জানতে।'

'ও তাই নাকি?' মুচকি হাসলো সোনা। বললে, 'তা ভাল আছি এখন। আগে বড় দুখ গিছে জীবনে। এখন সেই দুখ আর নাই। সুখ-দুখের ভাগ নেবারে লোক নাই। একলা জীবনে বড় ভাল আছি দাদা—'

সুহাস বললে, 'আমি জানি তুই সুখে আছস। কিন্তুন কমন সুখ সেইটা?'

গভীরে কোথায় তলিয়ে গিয়েছে সুহাস। বেদনার গভীরে জমিন খুঁজে পাচ্ছে না। ঘনীভূত গলায় কথা বলছিল সে। সোনা বসে শোনে। দাদা তার যে কথা বলছে তার জন্য তার দুখ হয়। কিশোর থেকে যখন প্রথম যৌবনে পৌঁছলে তখন কেউ কি ভেবেছিল, সোনার জীবনটা এমন হবে। এমন করুণ, দুর্বিসহ। আশ্চর্য, এমন দুর্বিসহ জীবনেও মেয়েমানুষ বাঁচে। বাঁচে, বিবাক্ত কেনা নিয়ে বাঁচে। জলে পুড়ে সে খাক হতে থাকে ভেতরে। অথচ বাইরে তার ঠাটটা বজায় থাকে।

সোনা কোমর সোজা করে উঠে দাঁড়ালো। বললো ভারী ব্যস্ত গলায়, 'আমি আসি কথা বলব দাদা, তুমি বস।'

'ক্যান তুই যাবি কই?'—

'আমি এট্টু মুখে হাতে জল দিয়া আসি ফলতলায়—' সোনা বেরিয়ে গেল সোজাসুজি। পেতলের গাড়ু একটা ফেলেছিল খাটের নীচে। নিয়ে গেল সেটা।

অনেকক্ষণ পরে ফিরে এলো সোনা। স্নান সেরে ফিরে এলো। ভিজে কাপড়—খোলা চুলে এলো। গামছা দিয়ে

চুল ঝেড়ে সাদা-কাচাই একখানা শাড়ি পরলো সোনা। দাঁতন আর জিভচোলা নিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে যেতে যেতে বললো, 'তুমি মুখ মাজ, আমি আসতে আছি এই, বাজার থিকা ঘুইরা।'

বাজার থেকে ঘেটে মালপোয়া করে জলখাবার নিয়ে এসেছে সোনা। কাচের প্লেট একখানা বের করে যত্ন করে সাজিয়ে রাখলো।

'এই সব তর কি হচ্ছে সোনা? আমি খাব নি।'

'ক্যান দাদা, আমারে ঘিরণা কইরা?' করুণ চোখ তুলে ধরেছে সোনা।

সুধাম বলে, 'না না, ঘিরণার কথা কি? তরে ঘিরণা করলে আমার নিজের উপর ঘিরণা ধইরা যায়। পাটের জ্বালায় সব কাজই আমি করছি। মানুষ মারতে করে। কিন্তুন'—এক মুহূর্ত থমকালো সুধাম। বোনের কুণ্ঠিত মুখের দিকে তাকালে বারবার। কোথাও যেন সোনারও লেগেছে। সেও ভাবছে। গভীরভাবেই ভাবছে বোঝা গেল। দাদা, যা বলে আভালে ইংগিতে সে কথা কি বোঝে নি সোনা। তবে ওটা বিষ। ঐ বিষে একবার সহজ বুদ্ধি যে কোন কারণে হোক হারালে সম্বিৎ ফিরতে অনেকদিন লেগেমানুষের। সুধাম বললে, কিন্তুন তর সামনে কি আর পথ ছিল না। তুই এই জীবনটাকে অমন কইরা মাটি করচিস। ক্যানে, পুরুষ পাওস নাই? পোষার বিয়া করতে পারতিস। ঘরের বউ হইয়া বাঁচলে কি বাঁচা হইত নি। এই জীবনে ডুইবা মরতে গেলি ক্যান কালামুখী।' চোখের জল ফেললে সুধাম। ঝরঝর করে কাঁদলে বোনের দিকে তাকিয়ে, 'বাপ মাও নাই, রইলে কি তর এই অবস্থা হইত রে সোনা! আমি ছিলম, কিন্তুন আমার কপাল, তর কুন কামেই লাগি নাই আমি। তাই হইয়া বইনের মান বাঁচাইতে পারি নাই। আমার অমন কপাল—'

হাটুর ওপর মাথা রেখে সোনাও কেমন ভলিয়ে ভাবছিল। জীবনের আগাগোড়া তোলপাড় করে ভাবছিল। তারই জন্য তাই আজ চোখের সামনে চোখের জল ফেলছে। বাপ মা থাকলে হয়তো তারাও কাঁদতো। অকূলে ভেসে গিয়েছে কোলের মেয়ে। চোখের সামনে ফেলেও বাঁচাতে পারা যায় নি। কোন্ বাপ-মা-ভাইর মনটা না আঁক-পাক করে মেয়েটার এমন অভাগোর জীবন দেখে।

কাচের প্লেটে কচুরি আর সন্দেশ রয়েছে বয়েকটা। এনামেলের গেলাসে জল। মিষ্টিতে মাছি বসলো। একান্ত কোলের কাছে উঠে আসে সোনা, 'দাদা গ আমি বড় অভাগী। অভাগী বইনটা তুমার ঘরছে অকূলে ডুবা। তুমি তারে ক্ষেমা কর দাদা।' শেষ পর্যন্ত সাধাসাধি শুরু করে দেয় সোনা—'খাও দাদা, না খাইলে আমি দুখ পামু।'

খাবার দেতে দেতে নিদারুণ কর্তব্যবোধে মাতাল হয়ে ওঠে সুধামের মনটা। বলে, 'চল্, তরে আজই নিয়া যামু, যেইখানে খুশি তর মন চায়। তর বিয়া দিমু তার লগে। যাবি ত বইন?'

'এ্যাঁ'—থতমত খায় সোনা। সারা জীবন তোলপাড় করে ফিরছে সে। এতটা বয়স পর্যন্ত বিষ খেয়ে আবার অমৃতের সন্ধানে পাড়ি দেবে সোনা? অকূল বলে কথা। তার ওপারে কি আছে কেউ জানে না। জীবনে এই মীমাংসাই হোল না। টাকা পয়সা এসব জমেছে। আগের সে পেটের চিন্তার চিহ্ন নেই। আবার পসরা গুটুবে সোনা? ঘরিদ-বিক্রির জীবন বাদ দিয়ে গুণ টানবে প্রথম থেকে? ভাবতে হয়। ভাবতে হয়, সে জীবনে হাতে স্বর্গ, মাথে স্বর্গ। মাথায় সিঁদুর এঁকে হাতে শাঁখা পরে বউ হতে পারলে কি সে আবার। স্বামীর সোহাগে—স্ত্রীর একনিষ্ঠ ভালবাসায় জীবনের যে কল্যাণীর ভাব ফুটে ওঠে, সেই মাধুরের মধ্যে ফিরে গিয়ে সুখী হবে সে। নিজেকে সার্থক করবে। এই গ্লানির জীবন—এই পাপপঙ্ক তলানির জীবনে যত বিষ—যত কদর্যতা—সবকে এড়িয়ে শ্রীময়ী গেরস্থ বউর সৌভাগ্য লাভ করবে। স্বামীকে ভালবেসে, তারই সন্তানকে জন্ম দিয়ে পরপারের কড়ি জমাবে সোনা। সেও এক জীবন। হয়তো আসল জীবন। নেহাৎ অকূলে না পড়লে সে জীবনকে কুড়িয়েই পেতো সোনা। কোন বাধা সাধনার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আজ কি পারবে?

খাওয়া শেষ করে একেবারে উঠে দাঁড়ালে সুধাম, 'তা হইলে বইন, আমি আসি তবে?'

সোনা কথা বলে না। মানুষের মন এত কি সোজা! সহজ বিহঙ্গ গতি তার হুলে চলে না। তাকে প্রায়

ওপারের কথা ভেবে, সামনে পেছনে চেয়ে হাল পরিচালনা করতে হয় এই সংসারের নিয়ম!

সুধাময় ঠোঁটটা কামড়ায়। ছাপা বাঁচাতে চায় বোনকে। একই বক্তের প্রবাহে তারা বাঁধা কিনা। বাঁচাতে হবে, তা নয় কতটা রক্ষা হবে না সংসারের। গভীর মর্মবেদনায় সুরে সুধাময় বললে, 'তুর কোন ভাবনা নাই বইন। আমি ঘরের মাইষের লাগানই তর বিয়া দিমু। বয়স হইছে তর, বেবাক ত বুই বুজস? মিছামিছি জীবনটায় ফোড়া ধরাইয়া কী লাভ বে বইন—?'

'না কোন লাভ নাই—' বাইরে রোদ উঠেছে। রাস্তাটায় লোক হাঁটছে আসছে। দূরের দিকে চেয়ে কথাটা বললে সোনা। গাঢ় গলায় বললে।

'তবে—' সুধাময় উঠে দাঁড়ালো। অনেকক্ষণ দাঁড়ালো দরজার কাছে।

যেমনি বসেছিল সোনা। তেমনি বসেই রইলো। শ্রাবণের দমকা বাতাসের মতো হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেল তার বুকের ওপর দিয়ে। জিভ চিরে চিরে যেন কথা বললে সোনা, 'আমি ভাবি দাদা, আমারে এট্টু নিরালায় ভাবতে দেও।'

'আইচ্ছা, বেশ—' সোজাসুজি নদীর দিকে বেরিয়ে গেল সুধাময়। বেরিয়ে গেল, যেন সান্ত্বনা ভরা করে বেরিয়ে গেল সে। যেনকার খবর পেয়েছে। যেনকা তার বুকের জ্বালা সবটা ছড়িয়ে দিয়েছে বাসে। আর সব খেয়ে হারানো বোনটারও সন্ধান পাওয়া গেছে। আজ পুরো পাঁচ বছর পরে সোনাকে চোখে দেখে এলো সে।

ঘাটে এসে বংশীর সঙ্গে দেখা হল সুধাময়ের। ছখন মেয়ে তার খোঁজে পাঠিয়েছে বংশীকে। নিতাই এসে বসে আছে কোষটিটিতে। বংশীকে ঘাটে বসে থাকতে বলেছে সেই। বছর কাল থেকে বেরিয়েছে মাথার ওপর বিপদের বোঝা নিয়ে। কিন্তু নিতাই জানে এ বিপদ একমাত্র তার জন্যেই। শহরের টানে মন মেতেছে নিতাইর। সেদিন কি খেয়ালে বছর! সুধাময় শহর-ঘেঁষা মানুষ। শহরের এটা-ওটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব দেখিয়েছিল সেই। শহরের বড় বড় দোকান দেখে একটা দোকান করার বড় ইচ্ছে হয়েছে নিতাইর। লুটতিরা হয়ে মাল লুট করে কচু-কুমড়োর দামে বিক্রি করে তার বাপ। একেবারে 'মুলান' ধরে ছেড়ে দেয়। ভালমন্দ—দামী-অদামী জিনিসের বাছ-বিচার তার নেই। নিতাই ভাবে, জিনিসের ঠিক দাম যখন বোঝে নি তারা—জীবনের দাম বুঝবে কি করে? অথচ শহরের দোকানী সেই জিনিসের দাম বুঝে বড়লোক হয়ে গেল। তাতকাপড়ের চিন্তা নেই। এঁকিবেঁকি দাঁড় মারতে আসে না রাতবিরেতে এই অনর্থের কাজে। ঝড় নেই, বর্ষা নেই—মাসকে মাস সবের তেল মাখিয়ে পলক ফেলে না লুট-তিয়ারা। জলপুলিশ আছে, থানা তল্লাসী ঘাটের, জেটির চাপরাশ আছে—এরা ধরলে আর কথা নেই। বি-এল কেসে কাটকে পুরবে নির্ঘাৎ। পাখা বোটের খালাসীরাও ইচ্ছেও ছেলে কথা বলে না তাদের। তবু তার বাপ ছখন মেয়ে সব সহ্য করে। সমান উৎসাহ নিয়ে বহর পরিচালনা করে। বয়স বাড়লো নিতাইর। পঁচিশ বছরের মনে মনে যৌবনের কাঞ্চনফুল ঝরে ঝরে ফুটেছে। ঝড় বেদনা লাগে মাঝে মাঝে। বাপ তার আগলে রেখেছে তাকে। শহর ঘুরে একটিবার দেখবার সুযোগ দিলে না। বলে, 'দেখবি কি ওখানে শুনি? ঐ যেমন দেখছিস দূর থিকে—ঐ ত। গাড়ি-ঘোড়া যায় দেখিস নি। মেইরে মানুষ দেখিস নি। আর শোন্, শহর বলে কথা। শহরের টান, বড় টান। ঐ যে বিষণ গেরো—অত বড় যে গেরো ছিলেন শুনি, সাত ঘেটের মাঝি তাঁর পা ছুঁয়ে পেন্নাম করত। ওঁর পেন্নামী দিয়ে বলত, বিশুবুড়া—তুমি এট্টু নজর রাখবে আমাদের পরে। তা নয়—তুমার জোরা ছাড়া সাহস পাই না। নিজের আসনে বসে মাঝিদের কথা দিয়ে কিনে দিতেন তেনি। শুনবি যে, শহরের টেনের কথা শুনবি, অমন পক্ক মানুষ তাবে বাঁধা পড়ল শহরে। টাকা পয়সা যা ছিল সব দিয়ে বাসা বাঁধল শহরে। ঘরের বউ ছিলো, আরও বে' করে মেইরে নিয়ে এলে একটা। এখন ঘরে এক গাদা ছেপলের পাল। করণ বয়ন নেই—মুখে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। বিশুবুড়া আমার দিকে মুখ করে বসে থাকে। নেহাৎ আমার পুরানো পরিচয়ের মানুষ—এককালে আমারে কাম শিখাইছিল, তাই মাল দিয়ে আসি। অখন

(শেষাংশ ৪৪১ পৃষ্ঠায়)

অমলানাথ মুখোপাধ্যায়

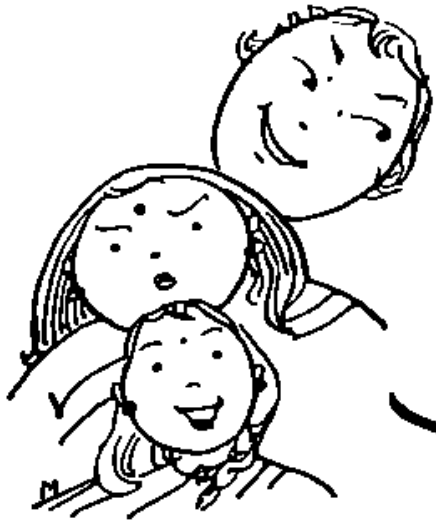

প্রেমে পড়া ভাল নয়

(রঙ্গ রচনা)

আমি জানি যাঁরা তরুণবয়স্ক তাঁরা অনেকেই হয়তো আমার সঙ্গে একমত হতে পারবেন না। তবু তাঁদের মঙ্গলার্থেই আমাকে স্পষ্টাক্ষরে বলতে হচ্ছে যে প্রেমে পড়া সত্যিই ভালো নয়। নিজের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই এ'কথা আমি বলছি। স্বামী বিবেকানন্দ এক জায়গায় বলেছেন জীবনই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় শিক্ষক। এই মহৎ শিক্ষকের কাছ থেকে তরুণদের পাঠগ্রহণ বেশীদূর অগ্রসর হয়নি বলেই আমার মত পোড়-খাওয়া প্রৌঢ়ের এই সতর্কবাণী।

এ'কথা সকলেই জানেন যে অভিজ্ঞ জনেরা বলে থাকেন প্রেমে পড়লে হৃদয় ভগ্ন হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা বলে, শুধু হৃদয় ভগ্ন নয়, প্রেমে পড়লে অস্থি ভগ্নও হতে পারে। না, আমি পরকীয়া প্রেমের কথা বলছি না। সেক্ষেত্রে তো প্রাণ নিয়েই টানাটানির আশঙ্কা। অবশ্য পরকীয়া প্রেম সম্পর্কে আমার কিছু বলা উচিত নয়। কারণ এটি ধর্মাচরণের একটি অঙ্গ। সুতরাং কিছু না-বলাই ভালো।

তবে সাধারণভাবে আমি প্রেমে পড়ার ঘোরতর বিরোধী। আমার কথা হচ্ছে বিয়ে করো, প্রজাবৃদ্ধি করো, আপত্তি নেই। কিন্তু প্রেম নয়। প্রেম যদি একান্তই করতে হয় তাহলে প্রেমে না-পড়ো। কারণ প্রেম মানুষকে সম্পূর্ণরূপে অন্ধ করে দেয়। এবং অন্ধ ব্যক্তির অন্ধকূপে পতন যে কী মারাত্মক হতে পারে তা বলাই বাহুল্য।

অবশ্য আমি জানি এ'ধরণের ভাসাভাসা কথা মোটেই ফলদায়ক নয়। আজকের দিনে ভালো রকম যুক্তি ও প্রমাণ ছাড়া কোনো নীতি-কথা বা হিতকথাই কেউ গ্রহণ করতে চায় না। সুতরাং আমারও নিজের কথার সমর্থনে যথেষ্ট যুক্তি-প্রমাণ প্রয়োগ করা প্রয়োজন। কিন্তু পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তিজাল বিস্তারে আমি চিরদিনই অক্ষম। তাই আমি শুধু এখানে সংক্ষেপে আমার তিক্ত অভিজ্ঞতাটুকুই বর্ণনা করবো। আমার মনে হয় তাতেই অনেকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হবে অবশ্য আজ প্রৌঢ় বয়সে সেই প্রেমের কাহিনী প্রকাশ করতে স্বভাবতই কিছু সংকোচ বোধ করছি। কিন্তু না-করেও উপায় নেই। কারণ

তরুণদের উপকার আমায় করতেই হবে। এবং যে-ব্যক্তি সাধারণের মঙ্গল করতে একেবারে বদ্ধপরিকর তার লজ্জাশরম সম্পূর্ণ ত্যাগ করাই উচিত। অন্তত তাই করতেই তো দেখা যায়। কিন্তু যাক সে কথা। সংকোচ ত্যাগ করে এখন সেই প্রেমের কথাই বলি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে বলেছেন—'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে।' কিন্তু কে যে সেই ফাঁদটা পাতে সে-কথা খুব স্পষ্ট ক'রে বলেন নি। তবে আমার যতদূর মনে হয় পুরুষের ক্ষেত্রে নারীই এই ফাঁদটি অত্যন্ত সুকৌশলে পেতে থাকে। কিন্তু সুখের বা দুঃখের কথা, আমার ক্ষেত্রে প্রথমে এটি পেতেছিল শ্রীকুঞ্জবিহারী কাঞ্জিলাল। সেই সঙ্গে অবশ্য গোষ্ঠ মামাও ছিল।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে তখন আমি তরুণ বয়স্ক। একুশ-বাইশ বছর বোধ হয় বয়স তখন আমার। একদিন বিকেলে বাইশ বিঘে পার্কে —অর্থাৎ দেশপ্রিয় পার্কে একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টেনিস খেলা দেখছি। হঠাৎ আমার নজরে পড়লো একটু দূরে দু'জন লোক আমার দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করছে। আমার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই ওর মধ্যে খর্বতর ব্যক্তিটি একপাল হেসে কাছে এসে বললে—'ভাই, তোমার হাইট্‌টা কত?'

লোকটির বয়স বোধ হয় আঠাশ-উনত্রিশ। তবু তুমি সম্বোধনে আমি কিছুটা বিরক্ত হলাম। ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললাম—'ছ ফুট এক ইঞ্চি। কিন্তু কেন?'

আমার পরের কথার কোনো উত্তর না-দিয়ে মুখে চোখে অদ্ভুত প্রশংসার ভাব ফুটিয়ে তুলে লোকটি তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বললে,—'দেখলে, তখনই আমি বলেছিলাম ছয়ের ওপরে।'—তারপর দু'পা পিছিয়ে গিয়ে অনেকটা দেওয়ালে টাঙানো শিল্পকর্ম দেখার মত নানাভাবে ঘাড় কাত করে, কখনো একটু সরে গিয়ে, কখনো এক চোখ বন্ধ করে আমাকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করতে লাগলো।

আমি তো বিস্ময়ে একেবারে অবাক। লোকটা পাগল নয় তো!

না, কুঞ্জবিহারী পাগল নয়। মিনিট দুয়েক এ'ভাবে পর্যবেক্ষণ করেই সে স্বগতোক্তি করলে,—'ওঃ, এমন সুপুরুষ চেহারা বাঙালীর মধ্যে দুর্লভ।'

বলা বাহুল্য মাত্রা একটু বেশী হলেও প্রশংসায় আমি খুশীই হলাম। অবশ্য আজ-কাল এ'কথা বললে কোনক্রমেই বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু তখন এটা বিশ্বাস করার কিছুটা কারণও ছিল। সে-সময় আমার গায়ে কিছুটা মাংস লেগেছিল। এখনকার মত শুষ্ক কাষ্ঠং ছিলাম না। আমার গায়ের রঙ এবং দৈর্ঘ্য চিরদিনই বাঙালীর পক্ষে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি। এর উপর পরিমাণমত মাংস ও মেদের আবরণ থাকায় সত্যিই আমাকে বেশ ভালো দেখাতো সে-সময়। কুঞ্জবিহারীর মত মতলববাজ ছাড়াও অনেকেই তখন আমার চেহারার প্রশংসা করতো। সুতরাং আমি সরল মনেই তার ফাঁদের দিকে পা বাড়ালাম।

অতঃপর কুঞ্জবিহারী তার বাঁ হাতের ওপর একটা সবলে ঘুঁসি মেরে তার সঙ্গীকে বললে,—'কে বলে বাঙালীর শরীরে পিওর এরিয়ান ব্লাড নেই! হিয়ার ইজ এ ফাইন স্পেসিমেন।'

খুশী আগেই হয়েছিলাম, ইংরেজি শুনে এবার ভক্তি বাড়লো। তবু স্মিতমুখে সবিনয়ে

নতুন জীবনের নতুন দাবী

পূর্ণ কর্মে নবজাতকের
তনমনীতে পুষ্টিকর
উপাদানের প্রবাহ ফিরিয়ে
আনতে হয়।
সুনিশ্চিত ও উপযোগী মিশ্রণ
ভাইনো-মল্ট
দুধ তৈরি করে, হজমশক্তি
সাহায্য করে
এবং দ্রুত স্বাস্থ্য ও শক্তি
ফিরিয়ে আনে।

ভাইনো-মল্ট

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানী লিমিটেড

বলছো 'না না', কী যে বলেন, আমার নাকটা এস্কিমোদের মত নয়।'

—'হু টোল্ড্ য়ু সো?'—কুণ্ড আমাকে একরকম ধমকই দিলে। তারপর তার সঙ্গীর দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে বললে—'গোটমামা, হোয়াট ডু য়ু সে আবাউট্—' বলে দু'বার 'দিস' ও একবার 'ইন' বলে অসমাপ্তভাবেই কথাটা শেষ করলে।

গোটমামা কিন্তু এ' ব্যাপারে মুখে কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করলে না। শুধু একটু মুচকি হেসে ঘাড়টা দুবার নাড়লে। তার মানে যে কী তা ভগবানই জানেন।

কুণ্ড আবার আমাকে আগেকার মত এগিয়ে পিছিয়ে নানাভাবে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখতে লাগলো। ভাগ্যে সে-সময় সেখানে লোকজন তেমন কেউ ছিল না! থাকলে নিশ্চয় ভিড় জমে যেতো।

আরো কিছুক্ষণ পাঁয়তারা কষে কুণ্ড আমাকে বললে,—'ভাই, তোমার মাথাটা আমার চাই।'

—'মাথা! সর্বনাশ।'—অজান্তেই আমার মুখ থেকে বার হয়ে এলো!

—হ্যাঁ, প্রথমত মাথাই। তবে আমার জন্য নয়, আমার ফাদারের জন্য। তিনি অ্যান-থ্রোপলজি ও ফ্রেনোলজি নিয়ে রিসার্চ করেন। এখন ফ্রেনোলজির দিকেই ঝোঁকটা বেশী।'

রিসার্চের ওপর বরাবরই ভক্তি আছে। অ্যানথ্রোপলজি-র অর্থটাও ভাসাভাসা জানা ছিল। কিন্তু ফ্রেনোলজি যে কী বস্তু তা' বুঝতে পারলাম না। তবে শেষে যখন লজি আছে তখন নিশ্চয়ই একটা জ্ঞানকাণ্ডের বড় শাখা-টাখা হবে।—কিন্তু মাথাটা যে চাই বলছে—কীভাবে চাই!

কুণ্ড বোধহয় আমার মনের ভাবটা বুঝতে পারলে। তাড়াতাড়ি অভয় দিয়ে বললে,—'ভয় নেই, আমি একদিন তোমাকে আমার ফাদারের কাছে নিয়ে যাবো। তিনি তোমার মাথাটা একটু পরীক্ষা করে দেখবেন।'

যাক্, নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো। এবং সেই সঙ্গে একটু উৎসাহিতও বোধ করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—'আপনার বাবা কি অধ্যাপক?'

—'ও-ইয়াস্। প্রফেসর বিরূপাক্ষ কাঞ্জি-লালের নাম শোনোনি তুমি?'

এমন একজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম জানা না-থাকায় লজ্জিত হলাম। তবু স্বীকার করতে হলো যে শুনিনি। কুণ্ড কিন্তু তাতে বিস্মিত বা ক্রুদ্ধ হলো না। বললে—'ঠিক আছে, কাল তোমাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে গিয়ে প্রফেসরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো।' কুণ্ড আমার ঠিকানা লিখে নিলে। কথা হলো সে আমার বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যাবে। অতঃপর অনেকক্ষণ তার সঙ্গে কথা-বার্তা হলো। কথায় কথায় সে আমার বাপ-পিতামহর নাম থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই জেনে নিল।

পরদিন কুণ্ডবিহারীর বাড়ি দেখে কিন্তু আমি বেশ ঘা খেলাম। টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো থেকে অনেকটা পথ হাঁটতে হলো। তখন ও'দিকটা একেবারে পাড়াগাঁ। পোটা দুয়েক এঁদো ডোবা অতিক্রম করে একটা অনেক-দিনের পুরনো ভাঙা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। একতলা বাড়ি। তবে সে-কালের বাড়ি যেমন হয় প্রায় দোতলার সমান উঁচু। চারদিকে তার পুরনো শেওলা-ধরা ভাঙা ইঁটের ধ্বংসস্তূপ। তার মধ্যে সাপ ও ব্যাঙের সহা-বস্থান অনায়াসেই সম্ভব। কুণ্ড বললে কোন নবাবের নাকি বাড়ি ছিল সেটা। তা সে

যারই হোক, সে-সময় সেটা আরকিওলজি-র বিষয়বস্তু। তবে হ্যাঁ, অ্যানথ্রোপলজির সঙ্গে আরকিওলজির একটা সংযোগ থাকতেও পারে।

ভাঙা পাঁচিল পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলেই একটি বেশ বড় উঠোন। সেখানে তখন একটি গামছা পরা কালো বেঁটে বুড়ো লোক গরুকে জাব দিচ্ছিল। আমরা দু'জন ভিতরে ঢুকতেই লোকটি ছানিপড়া চোখে আমাদের দিকে তাকালো। তারপর কৃষ্ণকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলে—'কে রা কৃষ্ণ?—ছোঁড়াটা কে?'

কণ্ঠস্বরকে যতদূর সম্ভব গদগদ করে কৃষ্ণ বললে—'বাবা, এই সেই এরিয়ান ব্লাড।'—তারপর আমার দিকে ফিরে পরিচয় করিয়ে দিলে,—'ইনিই আমার ফাদার বিরূপাক্ষ কাঞ্জিলাল।'

আমি বিস্মিত এবং স্তম্ভিত। এ-ই অধ্যাপক! লোকটিকে আমার বাড়ির চাকর বলে মনে হয়েছিল। যাই হোক, ভদ্রতা রক্ষার জন্য আমি হাত তুলে নমস্কার করলাম।

বিরূপাক্ষ কিন্তু সে-দিকে লক্ষ্য করলেন না। কৃষ্ণর মতই কিছুক্ষণ আমার দিকে ছানিপড়া চোখে কটমট করে তাকিয়ে রইলেন। তারপর এগিয়ে এসে দু'বাহু ঊর্ধ্বে তুলে বললেন,—'দেখি হে ছোকরা তোমার মাথাটা।'

ছোঁড়া শুনেই আমার পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল। এবার ছোকরা শুনে রীতিমত ক্ষুব্ধ হলাম। মাথা সোজা করেই দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু অধ্যাপকের উৎসাহ তা'তে কমলো না। ডিঙি মেরে আমার ঘাড়টা ধ'রে মাথাটা একটু নিচু ক'রে বেশ কিছুক্ষণ টিপেটাপে দেখলেন। তারপর ছেড়ে দিয়ে আপন মনে শুধু বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, 'ডক্টর গল্ রোট্ – ডক্টর গল্ রোট্—'

কৃষ্ণ আমাকে চলে আসার জন্য ইঙ্গিত করলে। ফিসফিস করে বললে—'প্রফেসর এখন গবেষণা করবেন।'

কিন্তু প্রফেসর ও তাঁর গবেষণা সম্পর্কে আমার তখন আর বিন্দুমাত্রও আগ্রহ ছিল না। পালিয়ে আসতে পারলেই বাঁচি। কিন্তু কৃষ্ণ ছাড়লে না। এক কাপ বালির মত চা খাইয়ে তবে রেহাই দিলে।

এরপর কয়েকদিন যথারীতি কাটলো। কৃষ্ণ ও তার ফাদার বিরূপাক্ষের কথা প্রায় ভুলতেই বসেছিলাম। কিন্তু কৃষ্ণ ভুলতে দিলে না। দিন সাতেক পর হঠাৎ একদিন হন্তদন্ত হয়ে এসে বললে,—'শুনেছো ভাই, প্রফেসর কী বলেছেন?'

শোনার কথা আমার নয় এবং শোনার কৌতূহলও ছিল না। কিন্তু কৌতূহল না-থাকলেও কৃষ্ণ ছাড়বে কেন? সে যা শোনাতে এসেছে তা সে শোনাবেই। একগাল হেসে বললে,—'প্রফেসর বলেছেন একেবারে পিওর এরিয়ান ব্লাড। আর মাথার যা শেপ্, তাতে মনে হয় একটি জিনিয়াস।'

কিন্তু এতেও আমাকে আর ভেজানো গেলো না। একদিনের অভিজ্ঞতাতেই তখন আমার সম্পূর্ণ নির্মোহ অবস্থা।

কৃষ্ণ তখন আসল অস্ত্র নিক্ষেপ করলে। তেমনি মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে,—'অবশ্য দেখলেই বোঝা যায়। কুন্তলাও বলছিল, এমন সুন্দর চেহারা, —এরিয়ান ব্লাড না হয়ে যায় না।'

কুন্তলা! কুন্তলা কে? আমি যেন চমকে

ইত্যাদি এই একটি কথায় বিশ্বের সমস্ত কৌতূহল যেন মুহূর্তের মধ্যে আমার মস্তিষ্কে হুড়োহুড়ি শুরু করে দিল। তবু যথাসম্ভব নিস্পৃহ কণ্ঠেই প্রশ্ন করলাম—'কুন্তলা কে? আপনার মেয়ে না কি?'

—'মেয়ে! আমি তো ব্যাচেলর।'—কুণ্ড তখন কুন্তলার পরিচয় দিলে। কুন্তলা হচ্ছে তার ছোটো বোন। সে একজন উদীয়মানা সঙ্গীতশিল্পী। দু'বার মিউজিক কনফারেন্সে চান্সিতে নাকি প্রথম হয়েছে। কালই তার সঙ্গে সে আমায় আলাপ করিয়ে দেবে। কুন্তলাও নাকি আমার সঙ্গে আলাপ করতে উৎসুক।

বলা বাহুল্য এ'কথা শোনার পর কোনো বঙ্গযুবকই স্থির থাকতে পারে না। মনের মধ্যে আমার যেন গোটা আষ্টেক ময়ূর পেখম তুলে নাচ শুরু করে দিল।

পরদিন বেশ একটু সেজেগুজেই গেলাম। কিন্তু কুন্তলার দেখা পাওয়া গেল না। কুণ্ড খুবই দুঃখ প্রকাশ করলে। বললে—'অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে এইমাত্র কুন্তলা পার্ক সার্কাসে ওস্তাদ গিয়াসুদ্দিন তোগলকের কাছে গান শিখতে গেছে।'

কুণ্ড আরো চারদিন এ'ভাবে আমাকে ঘোরালে। চতুর্থ দিনে কুন্তলার দর্শন পাওয়া গেলো। কুন্তলাকে দেখে মনে হলো আঠারো-উনিশ বছর বোধহয় বয়স হবে তার। এবং স্পষ্ট বোঝা গেলো এই বয়সটাই তার একমাত্র সম্বল। রঙটা যদিও শ্যামবর্ণ, কিন্তু বেঁটে এবং বেশ মোটা। তবু প্রথম দর্শনেই আমি তার প্রেমে পড়ে গেলাম। বস্তুত কদিন আগে থেকে কুণ্ড যে-ভাবে তার প্ল্যান অনুযায়ী আমাকে তাতাচ্ছিল তাতে তাকে দেখার পূর্বেই তার প্রেমে পড়ে গিয়াছিলাম আমি। তা' ছাড়া আমার মনে হয় সে সময়ে—সেই যুদ্ধপূর্বযুগে যে রকম হোক শুধুমাত্র একটি জলছ্যান্ত আঠারো-উনিশ বছরের মেয়েই অন্তত পক্ষে শতাধিক বঙ্গযুবককে প্রেমে পতিত করার পক্ষে যথেষ্ট। যাই হোক, দেখতে দেখতে কয়েক দিনের মধ্যে আমি একেবারে প্রেমে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। পঞ্চম দিনেই তাকে আপনি থেকে তুমি বলা শুরু করলাম এবং সপ্তম দিনে লুকিয়ে একটা আড়িই উপহার দিয়ে বসলাম। অধিকাংশ আধুনিক বাংলা সিনেমার মতই আমাদের প্রেম প্রচণ্ড বেগে অগ্রসর হতে লাগলো। শুধু বাগানে দাঁড়িয়ে হাত ধরাধরি করে হঠাৎ দ্বৈত সঙ্গীত গেয়ে ওঠাটা বাদ গেলো। এর কারণ বোধ হয় নিকটে জঙ্গল ছাড়া কোনো বাগান ছিল না, আর আমি একেবারেই গান গাইতে পারতাম না। না হলে সেটাও বাদ যেতো বলে মনে হয় না। সেজন্য পূর্বাহ্নেই বলে রাখা ভালো যদি কেউ এই কাহিনী সিনেমায় রূপান্তরিত করতে চান তাহলে অনায়াসেই তিনি গোটা কয়েক দ্বৈত-সঙ্গীত এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারেন। তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

যাই হোক, এর পর প্রায় প্রতিদিনই টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো থেকে মাইল খানেক হেঁটে সেই ধাপ্পাড়া গোবিন্দপুরে ভাঙা বাড়িতে যাতায়াত শুরু করলাম। সেই ভগ্নগৃহেই তখন আমার প্রাণ। বলা বাহুল্য প্রফেসর বিরূপাক্ষকে এড়িয়েই আমাদের মেলামেশা চালাতে হতো। কারণ তাঁর খপ্পরে একবার পড়লে মস্তিষ্ক পরীক্ষার ঠেলায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠতো।

দেখতে দেখতে একটা মাস স্বপ্নের মত কেটে গেলো। এই এক মাসে একশ' একাশিটা গদ্য কবিতা লিখে ফেললাম। সব কুন্তলাকে নিয়ে। কোনো আধুনিক কবি পূজা সংখ্যার জন্যও এত কবিতা এই অল্প সময়ের মধ্যে লিখতে পারেন বলে আমার মনে হয় না। আমিই কি পারতাম? শুধুমাত্র কুন্তলার প্রেরণাতেই এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য কুন্তলার ডাক নাম যে পুঁটি তখন তা জানা হয়ে গেছে। কিন্তু পুঁটিই হোক আর খেঁদিই হোক, তখন আর তাতে কিছু এসে যায় না। তখন আমি তার প্রেমে একেবারে অচৈতন্য।

কিন্তু যাক এ'সব কথা। এবার আসল কাহিনী বলি।

একদিন বিকেলে যথারীতি কুন্তলাদের বাড়িতে গিয়েছি। দেখি আর একজন মহিলার সঙ্গে কুন্তলা আলাপ করছে। আমাকে দেখে পরিচয় করিয়ে দিলে।—'ইনি হচ্ছেন আমার দিদি কণিকা রায়। আমার আড়াই বছর বয়সের সময় মা মারা যাওয়ার পর এই দিদিই আমাকে মানুষ করেছে।'

শুনে আমি ভক্তিভরে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। কণিকা যথারীতি আমার চিবুক স্পর্শ করে চুমু খেয়ে বললেন,—'বেঁচে থাকো ভাই,—ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক।'

মুখের ভাবটা যতদূর সম্ভব বিগলিত করে আমি আড়চোখে একবার আমার ভাবী লক্ষ্মীর দিকে তাকালাম। কিন্তু মুখ দেখে কিছু বোঝা গেলো না। কুন্তলা একটা টিনের চেয়ার এগিয়ে দিলে আমার বসার জন্য।

কণিকার সঙ্গে সামান্যমাত্র আলাপ করেই বোঝা গেলো ভদ্রমহিলা খুবই শান্ত ও অমায়িক প্রকৃতির। ত্রিশ-বত্রিশ বছর বোধ হয় বয়স হবে তাঁর। এখনো নিঃসন্তানা। আর সেইজন্যই বোধহয় অত্যন্ত স্থূল। কুন্তলাই যথেষ্ট মোটা। কিন্তু এ'যেন একেবারে গুটি তিনেক কুন্তলার একত্র সমাবেশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মনে হলো দৃঢ় শরীরে এই অস্বাভাবিক স্থূলতা ভদ্রমহিলাকে যেন এক অপরূপ বর্তুলরূপ দান করেছে। আহা, এমনটি আর দেখা যায় না। কুন্তলা সম্পর্কিত তখন যা' দেখি তাই আমার ভালো লাগে।

কথায় কথায় শুনলাম কণিকা নাকি এমন সুন্দর ঢাকাই পরোটা ও আলুর দম তৈরী করতে পারেন যা' একবার খেলেই লোক পাগল হয়ে যায়। কণিকা বললেন—'আসছে রোববার বিকেলে এবিস্তি এসো ভাই। খেয়ে দেখবে কেমন পরোটা করি।'

বলা বাহুল্য বলার প্রয়োজন ছিল না। কারণ রোজই যাচ্ছিলাম। রবিবার শুধু একটু বেশী আগে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

তখন সব কিছু হয়ে গেছে। শুধু উনুনে পরোটা ভাজা হচ্ছে। একটা চানসে গন্ধে সমস্ত বাড়ি ভরে গেছে! আমি বারে বারে নাকে রুমাল চাপা দিতে লাগলাম। শুনলাম একেবারে খাঁটি ঘিয়ের নাকি এইরকমই গন্ধ হয়। তা সে যা-ই হোক, যে-অবস্থা তাতে বাড়িতে কারো টেঁকা দায়। তবে কুন্তলা ও কণিকা ছাড়া বাড়িতে আর কেউ ছিলও না। এমন কি প্রফেসর বিরূপাক্ষও কোথায় নাকি পাশা খেলতে গিয়েছিলেন।

একটু পরে কণিকা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন। একহাতে তাঁর পরোটার গামলা আর এক হাতে বড় এক বাটি আলুর দম। তখন আর তা' থেকে কোনো দুর্গন্ধ

আসছে না। একটা টেবলের ওপর একে একে সব কিছু রাখা হলো। দেখলাম তার মধ্যে একটা বড় আনারসও আছে। কণিকা বললেন খাওয়ার পর সাহেবরা ফল খায়। তিনিও সেটা পছন্দ করেন। তাই এই ব্যবস্থা।

মিনিট তিনের চেয়ারে আমরা তিনজন সাহেবদের মতই বোধ হয় টেবিল ঘিরে বসলাম। কণিকা সযত্নে আনারসের খোসা ছাড়াতে লাগলেন।

আনারসের খোসা ছাড়ানো ও কাটা হয়ে গেছে, এইবার খাওয়া শুরু হবে,—ঠিক এমনি সময় মূর্তিমান যমের মত কণিকা দেবীর স্বামী শ্রীকালাচাঁদ রায় প্রবেশ করলেন। অবশ্য তাঁর নাম যে কালাচাঁদ এবং তিনি যে কণিকার স্বামী এবং কণিকা যে স্বামীর সঙ্গে রাগারাগি করে বাপের বাড়ি এসেছেন এ'সব পরে ধীরে ধীরে জানতে পেরেছিলাম।

তাঁকে দেখামাত্রই কণিকা একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। এমন শান্ত মানুষের হঠাৎ এই রকম পরিবর্তন সত্যিই বিস্ময়কর। স্প্রিংয়ের মত চাঙ্গিয়ে উঠে কণিকা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন, —'তুমি এখানেও এসেছো! তোমার সাহস তো কম নয়। বেরিয়ে যাও—এক্ষুনি বেরিয়ে যাও।'

কালাচাঁদ কিন্তু তাতে কর্ণপাতও করলেন না। একটা চেয়ারে বসে পড়ে নিশ্চিন্তে জামার বোতাম খুলতে খুলতে কুন্তলাকে বললেন,—'খুঁটি একটা পাখা নিয়ে আয় তো।'

সুতরাং কণিকা তাঁর কণ্ঠস্বরে যতটুকু শক্তি আছে তা' প্রয়োগ করলেন। এবং সেই সঙ্গে স্বামীর ওপর ব্যবহার করার মত সেকেলে ও একেলে স্ত্রীলোকের যত মধুর সম্বোধন আছে সব কিছুর প্রয়োগ চলতে লাগলো। কিন্তু তবু কালাচাঁদ অবিচলিত।

মিনিট কয়েক এ'ভাবে আপ্যায়িত হয়ে অতঃপর কালাচাঁদ একটু মুখ খুললেন। গম্ভীর-ভাবে শুধু বললেন,—'ছাখো, তুমি আমার বিয়ে করা স্ত্রী তা মনে রেখো। বেশী বেয়াদবি করো তো চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে যাবো।'

বলা বাহুল্য এই কথায় কণিকা একেবারে হাই-এক্সপ্লসিভ বম্-এর মতই ফেটে পড়লেন। ভাগ্যে এ'বোমার স্প্লিন্টার ছিল না। থাকলে আমরা সকলেই হয়তো নিহত হতাম।

যাই হোক, একটু পরে কণিকা তাঁর যুদ্ধ-নীতি হঠাৎ সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে ফেললেন। স্বামীর দিকে অনন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন,—'তুমি যাবে কিনা?'—এবং তার কোনো উত্তর না পেয়ে মুহূর্ত মধ্যে আনারস কাটা ছুরিটা গলার কাছে তুলে এনে চেঁচিয়ে উঠলেন—'তুমি যদি না যাও তাহলে এক্ষুনি আমি আত্মহত্যা করবো।'

সর্বনাশ! এ কি কাণ্ড। চোখের সামনে আত্মহত্যা!—আমি লাফ দিয়ে কণিকার হাতটা চেপে ধরতে গেলাম। কিন্তু আমার ভাগ্য খারাপ। তাছাড়া মনে হয় এ'ধরণের মহৎ কাজ সকলের জন্য নয়ও। ওর জন্য বিধাতার সব চিহ্নিত লোক থাকে। তাই প্রথম পদ-ক্ষেপেই আমার পা গিয়ে পড়লো একটা আনারসের বড় খোসার ওপর। ছেলেবেলা থেকেই শুনেছি স্ত্রীলোকের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলে পদস্খলনের বিশেষ আশঙ্কা থাকে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রেও যে তা হবে তা' কোনোদিন ভাবিনি। অবশ্য পদস্খলন এড়াবার জন্য আমি

যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম। কিন্তু বৃথা। আমার এক পা তখন শূন্যে এবং অন্য পা তারই সঙ্গে নির্ভুল সমকোণে প্রসারিত।

বলা-বাহুল্য পদস্খলনের সঙ্গে পতনের সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গী। কিন্তু পতন জিনিসটা কারোরই ভালো লাগে না। আমারও না। তাই কিছু একটা ধরার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম। কিন্তু শূন্য,—সব শূন্য। কিছুই তেমন হাতের কাছে নেই। তবে কালাচাঁদের চুলের ঝুঁটি কথাটা বোধ হয় আমার অবচেতন মনে তখনো রয়ে গিয়েছিল। আমি হাতের কাছে কিছু না পেয়ে তাই শেষ পর্যন্ত কোনোক্রমে কুন্তলার এক গোছা কুন্তলই ধরে ফেললাম।

কিন্তু তার প্রতিক্রিয়াটা ভয়াবহ হলো। আচমকা মাথায় দারুণ হ্যাঁচকা টান খেয়ে কুন্তলা উৎকট স্বরে চীৎকার করে উঠলো—'ওরে বাবারে মেরে ফেল্লেরে—'

অথচ কাউকে মারা তখন আমার একেবারেই ইচ্ছে নয়। নিজেকে বাঁচাবারই প্রাণপণ চেষ্টা। কিন্তু সে-কথা বোঝে কে। যাই হোক, কিছুতেই কিছু হলো না। আমার একশ আটষট্টি পাউণ্ড ওজনের দেহের পতন কুন্তলাও রোধ করতে পারলো না। অবশ্য কোনো নারী তা' কখনো করেও না। তারা শুধু পতনই ঘটিয়ে থাকে।

সুতরাং আমার পতন ঘটলো এবং আমার সঙ্গে সঙ্গে কুন্তলাও পড়লো। কিন্তু সে-ও পতনের পূর্বে তা' রোধ করার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পেলো। তারও হাতের কাছে কিছু ছিল না। বিমূঢ় মুহূর্তে তাই সে শুধুমাত্র আলুর দমের বাটিটাই ধরে ফেললো। কিন্তু তুচ্ছ আলুর দমের বাটির সাধ্য কী তখন সেই প্রণয়ী-যুগলের পতন রোধ করে! আমরা তখন পড়বোই। আদিম আকর্ষণ তখন আমাদের টেনেছে।

অতঃপর পতনদৃশ্যে দেখা গেলো প্রথমে আমি, তার ওপর কুন্তলা এবং তদোপরি আলুর দমের বাটি।

মিনিটখানেক সেইভাবে ভূমিশয্যায় পড়ে থাকতে হলো। কারণ কণ্ঠলগ্ন প্রেয়সীকে সরাতে বেশ একটু সময় লাগলো। অবশেষে আলুর দম পরিলিপ্ত অবস্থায় উঠে দাঁড়ালাম। ঘাড়টা তখন সোজা করতে পারছি না। কুন্তলা আমার ঠিক ঘাড়ের ওপরই পড়েছিল। স্ত্রীলোকের ভার ঘাড়ে নেওয়া যে কত শক্ত তা সেইদিনই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলাম। তবে আনন্দের কথা, চেয়ে দেখলাম তখনো আত্মহত্যার কাজটি কণিকা শেষ করেননি। এবং সংকল্পিত কাজে হঠাৎ এ'রকম বাগড়া পড়ার জন্যেই বোধ হয় ঐ পদ্ধতিটাই তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করলেন। ছুরিটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্বামীর দিকে তিন পা এগিয়ে তেমনি ক্রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করলেন—'কী, যাবে না তুমি?'—বলে কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করেই একেবারে অ্যাবাউট টার্ণ। অতঃপর তিনি যা করলেন তা' যেমনি বিস্ময়কর তেমনি রোমাঞ্চকর। একটা বড় বুক-সেলফ্-এর তাকের ওপর সিঁড়ির মত পা দিয়ে দিয়ে আশ্চর্য কৌশলে তিনি তার পাশের বিরাট পুরনো নড়বড়ে আলমারিটার মাথায় উঠে পড়লেন। এবং সেইখানে দাঁড়িয়ে হিন্দী সিনেমার হাণ্টার-ওয়ালীর মত আস্ফালন করতে লাগলেন। তিনি যা বললেন সংক্ষেপে তার মর্মার্থ হচ্ছে তাঁর স্বামী যদি অচিরে এই গৃহত্যাগ না-করেন তাহলে তিনি সেখান থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবেন।

জীবনে চের চের আত্মহত্যার কথা শুনেছি। কিন্তু আলমারির মাথা থেকে লাফিয়ে পড়ে কেউ যে আত্মহত্যা করেছে তা' কখনো শুনি-নি। আমি বিস্মিত, স্তব্ধ ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মনস্তত্ত্ববিদেরা যে বলেন আত্মহত্যা করার পূর্বে মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যায় সেটা আমার সত্য বলেই মনে হলো।

কালাচাঁদ কিন্তু তখনো সম্পূর্ণ অবিচলিত। খুব সম্ভব এ'রকম আত্মহত্যা তাঁর সামনে বহুবার সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু কুন্তলার সামনে বোধহয় এই প্রথম। কারণ দেখা গেলো সে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছে। গাল থেকে আঙুল এক মুহূর্তে মুহূর্তেই সে ভীত কণ্ঠে আমাকে বললে,—'কী দেখছো। ধরো, এক্ষুনি মরবে যে পড়ে।'

কিন্তু মহৎ কর্মে আর আমার কোনো আকর্ষণ ছিল না। তখনো আমি ঘাড়টা সোজা করতে পারছি না। এর ওপর কণিকা অন্ততপক্ষে কুন্তলার তিনগুণ ভারি। ওরে বাবারে—আর না। ভয়ে আমি দু'পা আরো পিছিয়ে এলাম।

কিন্তু পুরুষকে ভীরুতা থেকে চিরদিন নারী বাঁচিয়েছে। সমস্ত বীরত্বপূর্ণ কাজে নারীই তাকে প্রেরণা দিয়েছে—উত্তেজিত করেছে। আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। কুন্তলা পিছন দিক হতে নানাভাবে আমাকে অবিরত উত্তেজিত করতে লাগলো। অবশেষে নিরুপায় হয়ে সে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলে। বললে—'তুমি একটা কাপুরুষ। কাপুরুষ ছাড়া কিছুই নয়। চোখের সামনে একজন মহিলা—' কথাটা সে আর শেষ করতে পারলে না। কান্নায় কণ্ঠস্বর বুজে এলো।

এবার আমার আর অগ্রসর না হয়ে উপায় রইলো না। কিন্তু এগিয়ে গিয়ে আমি কী করবো? আলমারিটা দুটো বড় জলচৌকির ওপর বসানো। তার মাথাটা আমার মাথারও ওপরে। হাত দিয়ে আমি শুধু তাই কণিকার চরণযুগল ধরতে পারলাম। সেইভাবে চরণ ধরেই আমি তাঁকে বারবার নেমে আসার জন্য মিনতি করতে লাগলাম।

কিন্তু তিনি তা শুনবেন কেন? আমার জন্য তো আর তিনি অত কষ্ট করে ঐ টঙে ওঠেননি! বিরক্ত হয়ে তিনি তাই তীব্রস্বরে—'না না' ব'লে আমার হাত ছাড়াবার জন্য এক-পায়ের ওপর ভর রেখেই আর একটা পা ভীষণভাবে ঝাড়া দিলেন। সেই দারুণ পদা-ঘাত বহুকালের পুরনো আলমারি সহ্য করতে পারলো না। একটা করুণ আর্তনাদ করে নিমেষমধ্যে সেটা কাত হয়ে পড়লো। তারপর যা হলো তা প্রকাশের ভাষা নেই। কণিকা দেবী শূন্যে কোনো আশ্রয় না-পেয়ে সামরিক-ভাবে আমাকেই আশ্রয় করলেন। অর্থাৎ প্রথমে আমি ভূপতিত হলাম। তার ওপর সেই পুরো তিন মণ ওজনের মহীয়সী মহিলা এবং তারও ওপর পুরনো আমলের বিরাট সেই আলমারিটা। মুহূর্তমধ্যে আমি চোখে অন্ধকার দেখলাম। তারপর আর কিছু মনে নেই।

পুরো এগারো ঘণ্টা পর হাসপাতালে আমার জ্ঞান হলো। সাতদিন বাদে হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলাম।

তারপর? তারও পর কী হলো জানতে চান? কিন্তু সে-কথা আমি জানাতে পারবো না। শুনলে আপনারা ছি ছি করবেন।

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

With Best Compliments of

★

STANDARD WOODCRAFTS
PRIVATE LIMITED.

FURNITURE MAKERS & JOINERS

★

44, CHITTARANJAN AVENUE

CALCUTTA-12.

PHONE : 34-1594

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

গল্প

দ্বারিকা দোহার আমাদের পাশের গ্রাম নাটাগড়ের বাসিন্দা। এ গ্রামে আমি এসেছি খুব বেশিদিন না হলেও, লোকমুখে দ্বারিকা দোহারের নাম এবং খ্যাতির কথা এ গ্রামে এসেই আমি শুনেছি। লোকটিকে দেখতে অমন দীর্ঘকায় বাবরি-চুলওয়ালা বুড়োসুড়ো হলেও, শুনেছি গানের দলের দোহার হিসেবে ওর বেশ কিছু খ্যাতি ছড়িয়ে আছে পানিহাটি-খড়দহ-রাণাঘাট থেকে শুরু করে সেই কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপ-কাটোয়া পর্যন্ত। ও যে প্রায়ই গানের দলের সঙ্গে নাটাগড় ছেড়ে অন্যান্য জায়গায় চলে যায় তা অবশ্য আমিও জানি। আমাদের সোদপুর রেলস্টেশনে ওকে আমি খোল কাঁধে কি হারমোনিয়াম গলায়-ঝুলনো অবস্থায় আরো কয়েকজন গায়ক-বাদকের একটি ছোটখাটো দলের সঙ্গে অনেকদিন ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। দ্বারিকা দোহারও আমাকে দেখেছে। রেলস্টেশনে যেমন দেখেছে, তেমনি নাটাগড়ে কি আমাদের গ্রাম পানশিলায় কখনো-সখনো দেখেছে। আমরা পরস্পর পরস্পরকে চোখের চেনা চিনলেও মৌখিক আলাপ আগে কখনো হয় নি।

সম্প্রতি এহেন দ্বারিকা দোহারের সঙ্গেই মৌখিক আলাপও হয়ে গেল আমার।

অফিস ছুটির দিনে একদিন সকালে দ্বারিকা দোহার নিজেই এসে হাজির হল আমাদের বাড়ি। বলল, আজ্ঞে, আমার নাম দ্বারিকা দাস। আমি নাটাগড়ে থাকি।

বললুম, আমি তোমাকে চিনি দ্বারিকা। ঐ টুলটা নিয়ে বসো। তা কি ব্যাপার বলো ত?

দ্বারিকা একটা টুল টেনে বসল। সবিনয়ে বলল, একটু প্রয়োজনে এসেছি, বাবু।

বললুম, তা অমন সঙ্কোচ করছ কেন। বলো না তোমার কি প্রয়োজন।

দ্বারিকা বলল, আপনি রেলে কাজ করেন শুনে আপনার কাছে এলাম। রেলে নাকি আজকাল অনেক লোকজন নিচ্ছে! মুখ্যু মানুষ আমি, আমাকে একটা কুলিমিস্ত্রীর কাজটাজ জুটিয়ে দিতে পারেন আপনাদের রেলে?

একটু অবাক হয়েই বললুম, তোমার দোহার হিসেবে নামধাম আছে দ্বারিকা, তুমি রেলে কুলিগিরি করতে যাবে কেন! তাছাড়া রেলের আইন-কানুন আছে, এই বুড়ো বয়সে তোমাকে নেবেই বা কেন!

দ্বারিকা বলল, আজ্ঞে আইন-কানুন ত সব আপনাদের হাতে।

বললুম, সে-সব দিনকাল আর নেই হে, দ্বারিকা।

দ্বারিকা অনেকটা নিরাশ হয়েই যেন বলল, রেলে তাহলে বাবু হবে না বলছেন?

: তেমন আশা নেই দ্বারিকা। সত্যি কথাই তোমাকে বললুম।

দ্বারিকা বলল, তাহলে অন্য কোথাও? মা সরস্বতীর কৃপায় বাবু আপনাদের চেনা-পরিচিত লোকের অভাব নেই চারদিকে।

দ্বারিকার নিরাশ মুখের দিকে চেয়ে এই দুর্দিনে যে অন্য কোথাও কোনো কাজ জোগাড় করে দেওয়া আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভবই এই সত্যি কথাটা বলতে কেমন বাধো বাধো ঠেকতে লাগল। নানারকম ভেবে শেষে বললুম, কথা দিতে ঠিক পারছি না, দ্বারিকা। তবে চেষ্টা করে দেখব।

দ্বারিকা অনেক নৈরাশ্যের মধ্যেও যেন একটু আশার আলো পেল। বলল, চেষ্টা করে দেখবেন যে কথা দিলেন, তাতেই আমি অনেক ভরসা পেলাম, আজ্ঞে। এমন কথাই বা কজনে দেয়। চেষ্টা করা ছাড়া মানুষ আর কিই বা করতে পারে, বাবু।

শেষের কথাকটি বলার সময় লক্ষ্য করলুম, দ্বারিকা একটু অন্যমনস্ক হল। বুকের ভেতর থেকে একটি চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাসও যেন বেরিয়ে এলো ওর।

বললুম, তুমি ঠিকই বলেছ, দ্বারিকা। মানুষ কেবল চেষ্টাই করতে পারে। একটু চুপ্ করে থেকে বললুম, আচ্ছা দ্বারিকা, তুমি এই বয়সে হঠাৎ গান-বাজনার অমন সুন্দর লাইন ছেড়ে এসব চাকরিতে আসতে চাইছ কেন।

দ্বারিকা বলল, সে-সব দুঃখের কথা কাকে বলব, বাবু! বলতে গেলে আর এক মহাভারত হবে। শুধু শুধু আপনার সময় নষ্ট করা।

বললুম, না না তুমি বলো দ্বারিকা, আজ ছুটির দিন, সময় আর তেমন কি নষ্ট হবে আমার।

দ্বারিকা তবুও সঙ্কোচ প্রকাশ করল, আজ্ঞে সে যে অনেক কথা।

বললুম, হোক্ না অনেক কথা। অবশ্য তোমার যদি বলতে কোনো বাধা না থাকে।

দ্বারিকা বলল, বাধা আর কি বাবু! দুঃখের কথা শোনাবার মানুষ পেলে কারই বা না শোনাতে ইচ্ছে হয়। সংসারে সকলেই কেবল নিজের কথা বলতে চায়, অন্যের দুঃখের কথা শোনবার মানুষের বড় অভাব। চাষী-কৈবর্তের ঘরের ছেলে হলেও, এই ঊনপঞ্চাশ বছরের জীবনে এ কথাটা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। সে-সব কথা থাক্ গে এখন বাবু। দুঃখের কথা যখন শুনতে চাইছেন তখন সবই বলি। দশজনে আজ আমাকে, আজ্ঞে, দ্বারিকা দোহার বলেই চেনে। বলে, তোমার অনেক নামডাক হয়েছে, দ্বারিকা। নাটাগড়ের ৺কৃষ্ণচন্দ্র দাসের ছেলে আমি দ্বারিকা দাস। গানের দলের দোহার হিসেবে ভালবাসেও আমাকে অনেকে। কিন্তু বাবু ছোটবেলায় যে ঘর ছেড়ে পালিয়েছিলাম, সে কি কেবল দোহার হবার বাসনায়!

দ্বারিকা একটু থেমে আমাকেই যেন প্রশ্ন করল, বলুন আজ্ঞে, সে কি কেবল ঐ বাসনায়?

হারাণের বলল, লোকে বলে নাটাগড়ের দ্বারিকা গোঁসাই। নবদ্বীপের দ্বিজু গোঁসাই কীর্তনীয়া একবার বলেছিল, তোমার মত এমন ওস্তাদ দোহার আর দুটি দেখলুম না, দ্বারিকা। হাঁ, ঐ নামেই যা শুনতে ভালো। গালভরা নাম। দোহার গানের দলের দোহার। ঐ শুনতেই দোহার, আসলে তো ধুয়ো ধরি। মূল গায়েন নাকাগলার কপালে চন্দনতিলক পরে আসরে দাঁড়িয়ে চারদিকে মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গানের পদ গায়, আর আমরা কয়েকজন দোহার আসরের একপাশে দলবেঁধে বসে মূল গায়েনের সুর নকল করে কখনো তার গাওয়া পুরো পদটি কখনো বা শেষের দুটো তিনটে শব্দ বার বার গেয়ে ধুয়ো ধরি। সেই চৌদ্দবছর বয়স থেকে বাবু এমন ধুয়ো ধরছি। কখনো খড়দহের জটাই ঠাকুরের দলে, কখনো কাঁটোয়ার প্রভু গোঁসাইর দলে, কখনো বা বাগবাজারের সখানাথ রুদ্রের দলে। হিসেব করে দেখুন আজ্ঞে, পাকা পঁয়ত্রিশ বছর ধরে গানের দলে রাত জেগে জেগে ধুয়ো ধরে আসছি। কিন্তু আর নয়, আর কিছুতেই নয়। এবার আমার সাধ মিটেছে। বড় দুঃখেই আমার সাধ মিটেছে।

দ্বারিকা থামল। নিজের মনেই চুপ করে রইলো অনেকক্ষণ। আমি দ্বারিকার মনের কথা যেন কিছুটা বুঝতে পেরে তাকে অনেকটা সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বললুম, ধুয়ো ধরো বলে দুঃখ করছ কেন, দ্বারিকা। মূল গায়েন কি সকলেই হয়। ধুয়ো ধরার মানুষেরও মূল্য এতটুকু কম নয়। তোমরা ধুয়ো ধরো বলেই তো আসরে মূল গায়েনদের গান অমন জমে ওঠে।

দ্বারিকা বলল, আমাকে মাজনা করবেন বাবু, আমরাই কেবল সারাজীবন অমন ধুয়ো ধরবো কেন? গানের গলা কি আমার ঐ মূল গায়েনদের কারুর চেয়ে খারাপ ছিল! ছোটবেলায় নাটাগড়ে একবার বরিশালের লক্ষ্মীকান্ত গায়েনের চপ গান শুনে সেই যে গায়েন হবার নেশায় পেয়ে বসল সেই-ই আমার কাল হল। পাঠশালা পালিয়ে মুখ্যু হলাম। বাবা ভাবলেন, চাষবাসে মন দেবো। তা-ও হল না। শেষে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে সোজা নাম লেখালাম গিয়ে খড়দহের নামকরা পালা-কীর্তনীয়া জটাই ঠাকুরের গানের দলে। জটাই ঠাকুরকে পেয়ে সোনালাম লক্ষ্মীকান্তের মুখে শুনে শেখা এই জনমের অভিষ্টীয় পদাবলী কীর্তনটি: সখি, কী হবে পরিণামে গো। জটাই ঠাকুর গান শুনে তো আর চিন্তা-ভাবনার ধার দিয়েও না গিয়ে মাসিক পনেরো টাকা মাইনে, তাছাড়া গান গাইতে দলের সঙ্গে দূরে কোথাও গেলে দুবেলা পেটপুরে ভাত-ডাল-তরকারি, সকালে-সন্ধ্যায় মুড়ি-নারকেল-গুড় জলখাবার, দিনে দুকাপ চা, বিড়ি-পান খরচ ইত্যাদি দেবার চুক্তি করে তার দলে আমাকে নিয়ে নিলে। সেদিন থেকে কত জায়গায় ঘুরেছি, কত দল বদলেছি, কত জায়গায় গান গাইতে গিয়ে ধুয়ো ধরে কত আসর জমিয়েছি। বাবা দলের অধিকারীর সঙ্গে গিয়ে দেখা করে কতবার আমাকে দল ছাড়িয়ে আনবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমি দল ছাড়ি নি। শেষে তিনিও সে আশা ছেড়ে আমাকে আর কিছু বলতেন না। ছেলের অল্প নামডাক শুনে হয়তো আশা হয়েছিল, চাষবাস নাইবা করল, ছেলে তাঁর বড় গায়েন হবে একদিন। তখন কি সত্যিই জানতাম পরিণামে এমন হবে, এখানে-সেখানে ঐ

পেয়েই বেড়াতাম যা, সখি কি হবে পরিণামে গো।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, অত সুন্দর গলা থাকতেও মূল গায়েন তাহলে হতে পারলে না কেন, দ্বারিকা।

দ্বারিকা বলল, কেমন করে হবো! যে দলেই যাই, অধিকারী গান শুনে চোখ বুজে ঢুলু ঢুলু হয়ে বাহবা দেয়: বলে, আহা কী মধুর গলা করেছ দ্বারিকা—চলে এসো আমার দলে, কিছু বেশি করেই দেব'খন। দলে ঢুকে দেখি, হয় অধিকারী নিজেই মূল গায়েন, নয় তার সম্বন্ধী কি ভাগনে, নয়তো বড় জোর মামাতো ভাই মূল গায়েন সেজে বসে আছে। অগত্যা ধুয়ো ধরার দলেই মিশে গিয়ে সকলের সঙ্গে ধুয়ো ধরেছি। তবে হ্যাঁ, দু'চারবার দলের মুখরক্ষা করবার জন্যে মূল গায়েন সাজাও যে ভাগ্যে একেবারেই জোটেনি তা-ও নয়।

কৌতূহলী হয়ে বললুম, কি রকম!

দ্বারিকা বলল, রকম আর কি বাবু! অধিকারী নিজেই যে দলে মূল গায়েন, একবার কোথাও গাইতে গিয়ে হঠাৎ হয়তো তার বেদম পেটব্যথা উঠলো, কি কোথাও হয়তো সম্বন্ধী মূল গায়েন আসর বসবার ঘণ্টা দুয়েক আগে নেশার ঝোঁকে ভগ্নীপোতকে পথে বসিয়ে এক খেমটাউলীর বাড়ি গিয়ে পড়ে রইলো, ব্যস্ তখন ডাকবে আর কাকে। ডাকো দ্বারিকা দোহারকে। আসর ধরুক তো আগে। তারপর দেখা যাবে। এমন আসর ধরেছিও দু'চারবার, নিন্দা অখ্যাতিও হয় নি আজ্ঞে। কিন্তু যেমন আবার অধিকারীর পেটব্যথা সারল, কি সম্বন্ধী ভগ্নীপোতের কাছে এসে কাঁইকুট করল, অমনি আমি যা ছিলেম তাই। আবার চলল আমার সেই ধুয়ো ধরা।

বললুম, তুমি নিজে একটা দল করলে না কেন, দ্বারিকা? তাহলে তো মূল গায়েন হতে পারতে।

দ্বারিকা বলল, কথাটা আমিও অনেকবার চিন্তা করেছি বাবু। কিন্তু অত টাকা একসঙ্গে পাব কোথায়? মৃদঙ্গ-করতাল, বাঁশী-বেহালা-সানাই, পোষাক-পরিচ্ছদ কিনে কমপক্ষে বারো-চোদ্দ জনকে মাস-মাইনে খাওয়া-পরা দিয়ে একটা দল পোষা, সে কি সহজ কথা! তা আজ্ঞে, ওই আশা নিয়ে একবার কিছু টাকা জমিয়েছিলাম, সেবারই বাবা মারা গেলেন। সে টাকা দিয়ে শেষে শ্রাদ্ধশান্তি করতেই কূল পাই না। আবার একবার কিছু টাকা এলো। সেবারও আর এক বৃহৎ কাণ্ড ঘটে গেল জীবনে। আর ঐ কাণ্ড ঘটিয়েই তো আমার আসল দুঃখের বীজ আমি বুনলাম, বাবু। বলে দ্বারিকা থামল।

বললুম, কি এমন ঘটালে তোমার জীবনে দ্বারিকা যে আসল দুঃখের বীজ বোনা হল?

দ্বারিকা বলল, এবার সে কথাই বলব আজ্ঞে। ধুয়ো ধরে ধরে ধুয়ো ধরার ক্ষোভও ভুলে আসছিলাম প্রায়। কিন্তু সেবার বিধবা বুড়ো মা আমার ওপর যেন অসন্তুষ্ট হয়েই বললে এবার ঘরে বউ আন্ দ্বারিকা। আমি আর তোর সংসার দেখতে পারবো না এই বলে রাখলুম।

বললাম, না মা, বিয়ে আমার দ্বারা হবে না। তাছাড়া গানের দলে ধুয়ো ধরি, আমার কাছে মেয়ে দেবার জন্যে যেন কারুর ঘুম নেই।

মা বললে, চুপ কর। একবার মুখ ফুটে তুই বল্‌না, দেখবি কন্যে এসে ঘরে হেঁটে উঠবে।

বললাম, ঘরে এসে উঠবে বলছ, মা।

মা বলল, হাঁ। উঠবে, মেয়ে আমি দেখে রেখেছি। এ ঘরের বউ হতে পারলে ধন্যি হয়ে যাবে।

বললাম, সে কি বলছ মা, সত্যিই ধন্যি হবে!

মা হেসে বললে, হাঁ রে হাঁ। রাধা-গোবিন্দ দাসের মেয়ে। কামিনী যে কামিনী। ছোটবেলা থেকে তো চিনিস্। ভারি ভালো মেয়ে। তুই যখন আসিস্ না প্রায়ই আসে। বলে, ঠাকুমা, গানের দলে গিয়ে দ্বারিকাদা আমাকে ভুলে গিয়েছে।

তা বাবু, মায়ের কথা শুনে আবার আর এক বাঁধনে পড়লাম। আজ না হয় বয়স হয়েছে, বুড়োই হয়ে পড়েছি, সেই বয়সে ছোট বেলার কামিনীকে কি ভুলতে চাইলেই ভোলা যেত। আপনিই বলুন আজ্ঞে। সেবারেই শ্রাবণ মাসে তিনদিনের ছুটিতে রাণাঘাটে গান গেয়ে বাড়ি ফিরে একদিন বিকেলে ঘরের দাওয়ায় বসে সেই পদাবলী কীর্তনটি ধরলাম, আমারি বঁধুয়া আন্ বাড়ি যায় আমারই আঙিনা দিয়া, সখি কি বলে রাখিব হিয়া। কামিনী কখন এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিল। দোতা দাওয়ার উঠে এসে এদিক-ওদিক উঁকি মেরে দেখে নিয়ে বলল, আন বাড়ি যাবার জন্যে আমার বয়েই গেছে। সেই শ্রাবণেই কামিনীকে ঘরের বউ করে আনলাম বাবু। দল গড়ার জন্যে যে টাকা জমিয়েছিলাম সে-সব টাকা খরচ তো হয়ে গেলই, উল্টে রাণাঘাটের গানের দলের অধিকারী সখানাথ রুদ্রের কাছে পাকা একশোটি টাকা সুদে ধার নিতে হল। এরপর একে একে আমার সংসার বেড়েছে; মা মরেছে, তাঁর শ্রাদ্ধশান্তি করেছি; কামিনীরও সে কি খরচের ধুম, সংসারের জ্বালাপালায় আজ্ঞে একেবারে অস্থির হয়ে গেছি। তবু দুঃখ ছিল না। গানের দলে ঘুরো ঘরে ঘরেই সংসার চালিয়েছি এতকাল, ছেলেমেয়েগুলোকেও স্কুলে-পাঠশালায় পড়াচ্ছিলাম। বড় ছেলে-টাকে বড় আশা করে কলকাতার এক নামকরা স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলাম। বাড়ি থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করত। শেষে সেই ছেলেই কিনা দশ বারো দিন আগে স্কুল ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে এমন ব্যাপার করে বসল? আমার সব মিথ্যে হয়ে গেছে বাবু, একেবারে মিথ্যে হয়ে গেছে! এই আশাতেই কি সারাজীবন ঘুরো ধরে এসেছি? কামিনী বলে, অত রাগছ কেন! সাধে কি বলে বাবু স্ত্রীলোকের বুদ্ধি। ছেলের গানের গলা নাকি আমার চেয়েও হাজারগুণ ভালো। ভালো তো ভালো, তুমি স্ত্রীলোক তুমি বুঝবে কি। আমি বুঝছি, সারা-জীবন ঘুরো ধরে হাড়ে হাড়ে বুঝছি। তুইও ছোকরা কিনা অমন মুখ্যুর মত ঐ কাজ করলি!

দ্বারিকা কথা বলতে বলতে তার স্ত্রী এবং পুত্রকে যেন কল্পনায় সামনে বসিয়ে তাদের ওপর উত্তরোত্তর রাগে-ক্ষোভে-অভিমানে ভেঙে পড়তে লাগল।

আমি দ্বারিকাকে থামিয়ে বললাম, তা তোমার ছেলে এমন কি করেছে যে অত রাগছ দ্বারিকা?

দ্বারিকা বলল, কি করে নি আজ্ঞে বলুন! আমার সব আশা নষ্ট করে দিয়েছে। স্কুল ছেড়ে গিয়ে কলকাতার চীৎপুরের এক বড় গানের দলে নাম লিখিয়েছে।

বললুম, তাই নাকি! বলো কি হে!

দ্বারিকা বলল, বলছি আর কি বাবু। সাধে কি বলেছিলাম দুঃখের কথা কাকে শোনাবো। আমি কি এই চেয়েছিলাম? এর জন্যেই কি

নিজে এত কষ্ট করে, ওকে বড় স্কুলে ভর্তি করেছিলাম? অন্ততঃ একটা ছেলে একটু লেখা-পড়া শিখুক, মানুষ হোক্, শিক্ষিত দশজনের মত মাথা তুলে দাঁড়াক, তাই তো আমি চেয়েছিলাম। তা হল না। সে আশা আমার ফলল না। চাঁৎপুরের দলের সঙ্গে ছেলে আমার এখন জানবাজারে বড় আসর বসিয়েছে দিন সাতেক ধরে। খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছিলাম সেই আসরে। আসরে গিয়ে ছেলেকে যা দেখে এসেছি, তারপর আর আমার গান গাইবার সখ নেই। স্রেফ ঘেন্না ধরে গেছে। ছেলের ওপর, গানের দলের ওপর, সকলের ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে। আমার দলের অধিকারীকে আমি দল ছেড়ে দেবার কথা পাকাপাকি জানিয়ে দিয়ে এসেছি। কামিনীকে বলে দিয়েছি, আর আমার ধুয়ো ধরার টাকার ওপর ভরসা করো না। সামান্য জায়গা জমি আছে। ঐ চাষবাস করুক ছেলে-পেলেরা। আর আমাকে যদি পারেন আজ একটা ছোটখাটো কাজ জোগাড় করে দিন বাবু। দুঃখকষ্ট তো সারাজীবন করছিই, বাকী জীবনটাও না হয় দুঃখকষ্টেই কাটবে।

দ্বারিকা থামল। চুপ করে রইলো অনেকক্ষণ।

বললুম, জানবাজারের আসরে ছেলেকে এমন কি দেখে এলে তুমি দ্বারিকা যে মনে মনে অত ভেঙ্গে পড়েছ?

দ্বারিকা এবার উত্তেজিত হয়ে উঠলো ছেলের ওপর। বলল, কি আর দেখব, বাবু। মানলাম বাপের চেয়েও মিষ্টি গলা তোর, তা-ও মানলাম না হয় তুই স্কুল ছেড়ে গানের দলে গিয়ে নাম লিখিয়েছিস, তা বলে তুই-ও কিনা হারামজাদা শেষে আসরে বসে বসে ঐ ধুয়োই ধরছিস্?

আমাদের শারদীয় অভিবাদন
গ্রহণ করুন

এন, কে, গসেন এ্যাণ্ড কোং
প্রাইভেট লিমিটেড
ফটো-অফসেট ও লেটার প্রেস প্রিন্টার্স
৭।১, গ্রাণ্ট লেন, কলিকাতা-১২
এবং
৪৬, মেটক্যাফ্ স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

ফোন :
লেটার প্রেস বিভাগ
২২-১১১৪

ফোন :
ফটো-অফসেট বিভাগ
২৩-৪০২৩

সর্দার কাহিনী

অজিত কুমার তারণ
(রম্য রচনা)

॥ এক ॥

সর্দার দলজিৎ সিংএর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় মধ্যপ্রাচ্যে। যুদ্ধের সময়ে। লড়াই ময়দানে। বছরছয় পরে আবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় ধানবাদে। তখন তিনি বদলী হয়ে এলেন আমার একই ইউনিট এবং কমাণ্ডে। ক্যাপ্টেন দলজিৎ এসেই হলেন স্টেশান কমাণ্ডার পদমর্যাদা বলে। আমাকে আবার পেয়ে মহা খুশী। স্টেশানে যে সমস্ত কোর্ট অব এনকোয়ারী বসে তাতে তিনি হন প্রেসিডেণ্ট। আমার যোগ্যতা কম থাকা সত্ত্বেও সর্দারজী আমাকে করেন তদন্ত আদালতের অন্যতম সদস্য। আমার প্রতি তাঁর ভালোবাসার দরুণ নয় মোটেই। তাঁর স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই। একদিন বলেই ফেল্লেন, "তুমি আমার বিদ্যের দৌড়তো জানোই। ভাগ্যক্রমে ক্যাপ্টেন হয়েছি, ওহো! তোমার চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খেয়ে নাও; কলম চালাতে গেলেই তো বিপদ। তুমি কোর্টে থাকলে আর আমার চিন্তা ভাবনা থাকে না।" আমি তাঁর হুকুম নিখুঁত ভাবেই তামিল করে যাচ্ছি। এরিয়া হেড কোয়ার্টার্স থেকেও রিপোর্ট সম্বন্ধে কোনো কৈফিয়ৎ তলব করে চিঠি আসে না। বরং আসে প্রশংসাপূর্ণ চিঠিই। দলজিতের কাছ থেকে বাহবা পাচ্ছি বেশ। একদিন তিনি আমায় নির্দেশ দিলেন, "খুব সুন্দর সুন্দর বাছাই-করা ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করবে ভাই, প্রত্যেক রিপোর্টেই। তোমার প্রমোশন তো আমারই হাতে।"

আমি বেশ উৎসাহিত হয়ে একবারের রিপোর্টে লিখেছি, "হোয়াইল ইট ওয়াজ রেইনিং ক্যাটস এ্যাণ্ড ডগ্‌স।" সই করার আগে সর্দারজী টাইপ-করা রিপোর্টটি পড়তে পড়তে থ খেয়ে গেলেন, চশমা জোড়া খুলে রাখেন টেবিলের ওপর। কিছুটা উত্তেজিতভাবেই পাশের কামরা থেকেই আমায় ডাকলেন, "এ ভাইয়া তারণ, ইধে আও"—এখানে এসো। আমি অম্নি চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে মহিলা টাইপিস্টকে বল্লাম, "আমাদের বস এখন নির্ঘাৎ 'ক্যাট্‌স্ এ্যাণ্ড ডগ্‌স্'এ পৌঁছে গেলেন।..."

প্রতি ঘরে প্রতি পাঠাগারে রাখিবার মতো, প্রিয়জনকে নিঃসঙ্কোচে উপহার দিবার মতো

কয়েকখানি অনবদ্য প্রকাশন

ভ্রমণ-রসসিক্ত উপন্যাস

রম্যাণি বীক্ষ্য

দ্রাবিড় পর্ব ৭·০০

কালিন্দী পর্ব ৫·০০
(মধুরাংক)

রাজস্থান পর্ব ৭·০০

সৌরাষ্ট্র পর্ব ৬·০০

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

উপন্যাস

মধুরে মধুর ৫·৫০

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

রূপম্ ? ৩·৫০

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

ভ্রমণ

কাশ্মীর পরিক্রমা ২·০০

শ্রীনলিনীকিশোর গুহ

সৎ-সাহিত্য

বাল্মীকি রামায়ণ ১২·০০

বাংলা গদ্যে বাল্মীকি-রামায়ণের [illegible]—সহজ, সম্পূর্ণ ও [illegible]
কালোপযোগী
শিশিরকুমার নিয়োগী কর্তৃক অনূদিত

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

পড়ে আনন্দ, প্রিয়জনকে উপহার দিয়ে আনন্দ
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসুর একটি অনবদ্য গল্প-সঙ্কলন

সুভদ্রার ভিটে ৩·৫০

প্রাপ্তিস্থান :
৬এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

—"আচ্ছা এ মামলাতে তুমি মিছামিছি কতগুলো কুকুর আর বেড়ালকে কেন ডেকে আনলে? সে সময় যে দারুণ বৃষ্টি হচ্ছিল তা তুমি মোটেই উল্লেখ করো নি।

রেইনিং-এর পরেই সোজা বেড়াল আর কুকুরের কথা। একটাও বেড়াল বা কুকুর ছিল না। তবু তুমি আবার বহুবচন ব্যবহার করলে কেন বুঝতে পারলুন না।"

—"আমিও তো তাই লিখেছি। এর মানেই হ'ল, যখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিলো।"

—"এসব কারণেই আমি অংরেজী পড়া-শোনা ছেড়ে দিয়েছি ভাই। ওটা একটা যাচ্ছে-তাই বাজে ভাষা, মাথাও নেই, মুণ্ডুও নেই। তুমি যত খুশী অংরেজী পড়তে থাকো, লিখতেও থাকো। ও ভাষাটা আমার পছন্দসই নয় মোটেই। আচ্ছা আগের বারের রিপোর্টে যে দুটো শব্দ সেই 'ডিফিকাল্ট' আর 'টেরাইন' ব্যবহার করেছিলে তা খুব ভালো হয়েছিল। ইংরেজদেরও একথা দুটো ব্যবহার করতে দেখেছি, প্রায় রিপোর্টেই।"

—"সর্দারজী, সব সময়েই কি আর সব শব্দ লাগানো যায়? শুধু দুর্গম রাস্তার বিষয়ে লিখতে গেলে তা লিখতে হয়।"

॥ দুই ॥

আপনারা কেউ কেউ হয়ত বা মীরাট শহরে গিয়ে থাকবেন। অনেকেই বোধহয় সেখানে যাবারও সুযোগ পান নি, আর গিয়ে থাকলেও হয়ত বা ওখানকার 'চাচেদা পবিত্র হিন্দু হোটেল' দেখেন নি।

মীরাট রেলওয়ে স্টেসানের কাছেই রয়েছে এ হোটেলটি।

এক সময়ে লাহোরে সর্দার গুরুমোহন সিংহের ছিল বেশ প্রতিপত্তি। হবেই তো তা, ওখানে যে ওর ছিল বড়ো বড়ো কাজ কারবার। সে সব এখন আর কিছুই নেই। সর্দারজী এখন শরণার্থী বা উদ্বাস্তু। হলে কি হবে? ওরা আমাদের মতো বসে থাকবার লোক নয়। খেটে খায়। সর্দারজীর বয়েস এখন হবে প্রায় ষাটের কাছাকাছি। ওর পুরানো জাঁকজমক সবই চলে গিয়েছে; চালু আছে শুধু মদ্যপানের অভ্যেসটি।

বন্ধুবান্ধব এবং নতুন পরিচিত লোকদের পরামর্শে গুরুমোহনের হোটেলের নামকরণ করা হয়েছে 'চাচেদা পবিত্র হিন্দু হোটেল।' সর্দারজীকে সবাই ডাকে 'চাচা' বলেই। আর চাচেদার মানে হল চাচার। হোটেল-রেস্তোরাঁটার বাইরে গুরুমুখী ও হিন্দিভাষায় বেশ বড়ো বড়ো হরফে লেখা সুন্দর সাইন-বোর্ড রয়েছে। তার চাইতে মস্ত বড়ো সাইন-বোর্ড রয়েছে চাচার পাকা দাড়ি আর গোঁফ। "আইয়ে সাহেব, আপকে সেবা মেঁ ক্যা কর সক্তা হুঁ" চাচার এই দরাজ কথাগুলো খদ্দেরদের বেশ আকর্ষণ করে থাকে। তার চাইতে আরো অধিক আকর্ষণীয় বস্তু রয়েছে হোটেলে। মদ (অবশ্যি গোপনে)।

মীরাট প্রায় শুষ্ক এলাকা। চাচার হোটেল রেস্তোরাঁ চালাবার লাইসেন্স থাকলেও 'তরল-পদার্থে'র লাইসেন্স নেই। তবু চাচা কী ভাবে যে ওখানে মদের ব্যবস্থা করে থাকে তা আমার কেন অনেকেরই জানা নেই।

সকাল বা দুপুর বেলায় চাইতে পবিত্র হোটেলে সন্ধে বা রাত্রির দিকেই বেশি খদ্দের এসে থাকে, খাদ্যের জন্যে ততটা নয় যতটা পানের জন্যে। চুপচাপ কয়েকজন খদ্দেরকে

দু'এক পেগ তরল পদার্থ ঢেলে দিয়েই চাচা সুরু করে দেয়, "বাবুজী! পুলিশ আ গয়া, পু-লি-শ!" আর তক্ষুণি খদ্দেররা দেয় চম্পট। যঃ পলায়তি সঃ জীবতি। বলা বাহুল্য, যতক্ষণ সম্ভব হয় ততক্ষণ চাচা পয়সাটা আদায় করে নেয় আগাম। রোজই।

যে মদটুকু দেওয়া হয় তার জায়গায় চাচা বোতলে ঢেলে রাখে সেই পরিমাণের জল আর খদ্দেরদের ফেলে-যাওয়া মদ দিয়ে আরো কতজনকে যে ঠকায় তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

"বারহ নম্বরমে রোটি ঔর মী-ইট চৌদহ আনে, দশ নম্বরমে সব্জি ঔর রোটি আ-ট আনে" চাচা বলে আর লিখে নেয় ওর স্লেটে। পয়সা হাতে এসে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই চট্ করে মুখের থুথু দিয়ে মুছে ফেলে স্লেটের লেখা চাচা।

ফাঁকে ফাঁকে দু' তিন পেগ মদ ফোকটে নিজের মুখগহ্বরেও ঢেলে দেয় চাচা···আবার এসে যায় খদ্দের, চাচা চালায় সেই চালাকী। পয়সাটা হাতে পড়ে গেলেই, "ভাইয়া জল-দি ভাগ-গো, পুলিশ আ গয়া, পুল-ইস্, হামরা হোটেলকা লাইসিন্স চল্লা জায়েগা, লাইসিন্স," জড়িয়ে জড়িয়ে চাপা গলায় বলে চাচা। অর্ধেকও পান না করেই ওরা দেয় ছুট্। বেঁচে-যাওয়া মদটুকু চাচা আবার মিশিয়ে রেখে দেয় বোতলে। মাঝখানে, "চার নম্বরমে দা-ল, রোট-ঠী ঔর সব—সব-জী বার-হো আনে," বলতে বলতে আর চাচার স্লেট লেখা হয়ে ওঠে না, পয়সাও আদায় হয় না। চাচা আরো পান করে। এ সময়েই চাচা নেশায় বিভোর হয়ে ঝাপসা ও অস্পষ্ট দেখতে সুরু করে। কয়েকজন সুবিধেবাদী খদ্দের ঠিক এসময়টায়ই এসে থাকে। রোজই। স্লেটে চাচা ভুল বা শুদ্ধ যা-ও লিখে থাকে তার বিষয়ে একজন খদ্দের হয়তো বলল, "এটা তো আদায় হয়ে গিয়েছে।"

—"বহুৎ আচ্ছা"

স্লেটের সমস্ত লেখাটাই চাচার থুথুর মাধ্যমে হয়ে যায় মুহূর্তে লুপ্ত। চাচার হৃদয়-যমুনায় এসে পড়ে উদারতার বন্যা। "ইনকো ঔর এক পেল্-লেট মী-ইট্ দিল্-লাও, ইয়ে বাবু-উস্তীকো দো আন্-আন্, কা নাম, আনড়ে কা এক ওম্-লেট্, ও ছোটেলা-ল, কাঁহা গিয়া, জল-দী করুরো, আপ্কী পয়-পয়সে তো নাহি মিলহা।"

—"পাঁচ রূপেয়ে কা একঠু নোট দে চুকা" খদ্দের বলে দিল তাহা মিথ্যে কথা আর চাচাও বিশ্বাস করল। থলে থেকে বের করে দিল বাদ-বাকী পয়সা ফেরৎ। একজন আরেকজন খদ্দেরকে ফিস্ ফিস্ করে বলল, "কাল পুলিশের ভয় দেখিয়ে চাচা আমায় মদ পান করতে দেয় নি, তাই আজ ওয়াসুল করা চল।" এভাবে সুযোগ বুঝে ওরা অনেক পয়সাই আদায় করে থাকে। অনেকে এক টাকা দু' টাকার নোট দিয়ে পাঁচ টাকার বরাবর অথবা পাঁচ টাকার নোট দিয়ে দিয়ে বাকী দশ টাকার হিসেবে পেয়ে থাকে।

আস্তে আস্তে রাত্তির নয়টা দশটা নাগাদ খদ্দেরদের ভিড় আরো বেড়ে যায় চাচাও আরো কিছুটা ঢেলে নেয়। জৌলুস এসে যায়। মজা দেখবার জন্যে হয়তে বা কেউ চাচার অজান্তে ওর পানপাত্রে ফেলে রাখে খানিকটা সিগারেটের ছাই। এতে চাচার নেশা বেড়ে যায় আরো বেশি।

চাচা চেখে দেখে দু'তিন টুকরো মাংস।

ভুলে এবং সেলার ঘোরে রেখে দেয় হাড্ডি কয়টা (বাছাকরা) ভালো মাংসের সঙ্গেই। তাই দেখে ছোটেলাল করে মহা হৈ চৈ! সে সুযোগে হোটেলের অপর কর্মচারীরাও মুখে ঢেলে দেয় দু' এক পেগ পানীয়। ফাঁক বুঝে ছোটেলাল তো চালায় পুরোদমে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চাচা ভুলে যায় খদ্দের ও চাকরদের ভেতরের পার্থক্য, তার নিজের কর্মচারীর কাছ থেকেই পয়সা আদায় করতে গিয়ে প্রভু-ভৃত্যে বেধে যায় তুমুল ঝগড়া। আবার যদি কোনো কর্মচারীকে ভুলে পয়সা ফেরৎ দেওয়া হয় সে নিয়েনেয় বিনা বাকাব্যয়েই। চাচা মাঝে মাঝে যাকে কাছে পায় তাকেই কানে কানে আস্ফালনের ভংগীতে জানায় যে আজ অনেক সেল হয়েছে, খুব লাভ হয়েছে, মদের লাভই হবে একশ টাকার বেশি। প্রতিমাসে তিন হাজার টাকার প্রফিট্ আর কে রুখতে পারে? ইত্যাদি। অন্দর-মহলে যেয়ে সর্দারনীকেও জানিয়ে আসে লাভের বোশ খবর। চাচা খুশীর চোটে হাত মেলায় সবার সঙ্গেই। আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে, "আমাকে ঠকাতে চায় খদ্দেররা? আমিই রোজ ওদের ঠকিয়ে থাকি, হাঃ, হাঃ! ওরা বেশি চালাক না আমি?" সুরু হয় চাচার মুখ দিয়ে অকথ্য গালাগালি; পবিত্র হোটেলে সৃষ্টি হয় অপবিত্রতার ভূমিকা। গণ্ডগোল শুনে হাজির হয় পুলিশ। "চাচা আসলি পুলিশ আগিয়া আছি" বলে ছোটেলাল। পুলিশরাও আদায় করে কিছু কিছু দক্ষিণা। শেষে চাচা ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে পড়ে তার চারপাইতে।

এভাবেই কেটে যায় রজনীর পর রজনী। বছরের শেষে চাচা হিসেব-নিকেশ করে খতিয়ান টেনে দেখে সর্দারনীর অলংকার পত্রেও কুলোয় না। হোটেলকে টেঁকানোই যে মুস্কিল। লাভের চাইতে কারবারের লোকসানের অংকটাই দাঁড়ায় বেশি বড়ো আকারে।

শ্রীহাসীর বন্ধ গল্প পড়ার
মনে হোলো [illegible]
[illegible]

॥ ভূমিকা ॥

এ গল্পে নায়কের নাম নানা কারণে গোপন করা হল। কাহিনীর সূত্রধার রূপে তার দু' একটি মাত্র জানাতে চাই। বন্ধু মহলে স্পষ্ট-বক্তা বলে আমার বিশেষ নাম বা বদনাম আছে, কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো তা শিষ্টতার সীমা মানে না। কিন্তু তবুও এক্ষেত্রে আমি বন্ধুবরের নাম প্রকাশ করব না। কেননা তার মুখের দিকে চেয়ে আমার মনে হল তাঁর জীবনের সেই একমাত্র রাত্রের ঘটনা নিয়ে বোধ হয় এখনও তাঁর বিবেকের সংগে তাঁর নিজেরই একটা বিরোধ আছে।

সেদিন অমন একটা বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে অমন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোচনা উঠল কি করে সে কথা ভাবতেই অদ্ভুত লাগে। ডাক্তারের ডিসপেনসারীতে আমরা চারজন ছিলাম। বয়সের হিসাবে সকলেই চল্লিশের ডাইনে বাঁয়ে। রাত্রি দশটা বেজে গিয়েছিল। বাইরে তখন—বলা চলে—হাঁ, আকাশ ভাঙা বৃষ্টি। সেই বৃষ্টিই কি উদার উদাস করে আগল খুলে দিয়েছিল অন্তরের? হতে পারে। না-ও হতে পারে। বিশেষতঃ ডাক্তারের মন, মৃত্যুর সংগে যার নিয়ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বৃষ্টিতে কি সে ব্যাকুল হয়? তাছাড়া ব্যাকুল হবেই বা কার জন্যে? কেন? আর ব্যাপারটা তো ব্যাকুলতা আদৌ নয়, স্বীকারোক্তি? না। তাও নয়। কেবল মাত্র একটা অভিজ্ঞতা।

অথবা এও হতে পারে যে আমাদের আপ্যায়ন করার সময় ডাক্তার তার নিজের পাত্রে হুইস্কির পরিমাণ একটু বেশী নিয়েছিল। আমরা যাওয়ার আগেই সে একটু খেয়েও থাকতে পারে। মাদকের প্রচ্ছন্ন ক্রিয়াই কি তার মুখ থেকে ঘটনাটা টেনে বের করেছিল? কিন্তু—হাঁ মনে আছে- আমরা সেদিন ওর ওখানে বসে গোড়ার দিকে নিজে-দের মধ্যে একটু তর্ক করছিলাম। তর্কের উপলক্ষ্য ছিল সেদিনকার বাংলা দৈনিকের এক কোণায় প্রকাশিত মেয়েদের জীবিকা ও সতীত্বের সমস্যা শীর্ষক একটি সংবাদ। বাইরে বৃষ্টি, ভিতরে মদ ও চারপাশে আলোচনা এই সব মিলিয়েই কি—

কি ভাবে কথাটা উঠল, সে গবেষণা থাক।

সোজা সহজ করে বলি। আশা করি সকলেই এ কথা মানবেন—যে নষ্টা বা পথা মেয়ের সঙ্গে রাত্রিবাস করার জন্য রীতিমত দুঃসাহস দরকার আমাদের মত ভদ্রলোকের পক্ষে। দুঃসাহস, যাতে অভ্যস্ত হলে সেটাই হয়ে ওঠে বিকৃতি।

অবাক করল ডাক্তার। এহেন দুঃসাহসের কাজই করছে সে। কবে? কোথায়? কোন্ যুগে! কেন? এ বলে কি?

এ ভূমিকা এখানে শেষ করলেই সুন্দর হয়। কিন্তু ডাক্তারের সম্পর্কে আরো দু'চারটি কথা না জানালে এ গল্প লেখার কোন মানেই হয় না। ডাক্তারের বয়স যখন একুশ বা বাইশ তখন থেকেই তাকে জানি। আহার, নিদ্রা, ভয় ইত্যাদির চারটি জৈবিক দেওয়াল তোলা ঘরে যারা জীবন কাটায়, ডাক্তার কোনদিন সে রকম প্রাণীমাত্র নয়। বিবেক ও বিশ্লেষণ তার সাথী। সনাতন ভারতবর্ষ বলতে যা বোঝায় তা তার কাছে একটা আইডিয়া মাত্র নয়, জাগ্রত কিছু। আর তাই এ দেশের অধিকাংশ সংস্কার, প্রথা সম্পর্কে সে সশ্রদ্ধ তো বটেই, খানিকটা অন্ধও। আমি জানি, ডাক্তার আজো সকাল সন্ধ্যা আহ্নিক করে। অন্যদিকে, পাশ্চাত্যের জীবন দর্শন ও পদ্ধতি সম্পর্কেও তার অনেক আগ্রহ। এক কথায়, ডাক্তার একজন শানানো, ধারালো, জ্যান্ত মানুষ।

ডাক্তার, সেই ডাক্তার··! বোধহয় রহস্য করছে, একটা হাসির গল্প শোনাবে!

আগেই বলেছি নায়কের নাম গোপন রইল। নায়িকার নাম যথাস্থানে জানাব। তবে সে নাম সত্য নাম কিনা, ডাক্তারও তা বলতে পারে না। একমাত্র যাঁর নাম, তিনিই পারেন।

অলমিতি।

॥ মূল গল্প ॥

এক যুগই হবে। প্রায় বারো বছর আগের ঘটনা। সেই বছর দুই হল ডাক্তারী পাশ করেছি। রোগের লক্ষণ শুনে তখনো কেতাবী তত্ত্বের সংগে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করি। এইবার প্র্যাকটিস্ শুরু করব স্বাধীন ভাবে।

মাত্র কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে গিয়েছিলাম জামতাড়ায় মেসোমশাইয়ের কাছে। জায়গাটা আমার মত একজন ডাক্তারের পক্ষে উৎসাহব্যঞ্জক কিনা সেটা দেখাই ছিল উদ্দেশ্য।

সেদিন রাত প্রায় আটটার কাছাকাছি জরুরী তার এলো কলকাতা থেকে। অপ্রত্যাশিত তার। সেই তারে সেই মুহূর্তে আমায় কলকাতা রওয়ানা হবার নির্দেশ দেওয়া ছিল।

তখন কলকাতা বা পুবে যাওয়ার শেষ ট্রেন চলে গেছে। মেল এক্সপ্রেস দাঁড়ায় না জামতাড়ায়। একমাত্র কোনরকমে দূরের জংসন স্টেশন আসানসোলে গিয়ে পৌঁছতে পারলে রাত্রে পর পর গাড়ী পাওয়া যাবে। জামতাড়া থেকে আসানসোল। বেশ কয়েক মাইল পথ। শেষ বাস—তাও গেছে চলে।

অথচ আমি আর কিছুতেই বসে থাকতে প্রস্তুত নই। হঠাৎ পাওয়া টেলিগ্রামটা মনের ওপর এমনই একটা এফেক্ট সৃষ্টি করেছে যে পারলে ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে। শেষকালে স্থির হল যে পরের বাসে আসানসোলের কাছাকাছি পর্যন্ত যেতে পারব। ওখান থেকে রিক্সায় বা অন্য যে কোন ভাবে জি. টি. রোডে গিয়ে পৌঁছুলে ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাব আসানসোল।

তাই হোক।

বার হয়ে পড়লাম।

আস্তে আস্তে খালি হয়ে গেল বাসটা।

অবশিষ্ট যাত্রী একমাত্র আমি। এক জায়গায় এসে বাস তার যাত্রায় পূর্ণচ্ছেদ টানল সেদিনের মত। কাল সকালে আবার দৌড়ুবে জামতাড়ার দিকে।

নেমে পড়লাম। সুটকেশটা হাতে নিয়ে চারপাশে চাইলাম একবার। রাত প্রায় পৌনে এগারো। চারদিক থমথমে। নির্জনতা আর নীরবতা যেন তাদের ডালা উজাড় করে এখানে শয্যা পেতেছে। অনেক দূরে দূরে একপায়ে দাঁড়ান বাতিগুলো মিটমিট করে হাসছে যেন।

বাস কনডাক্টার জায়গাটার নাম বলেছিল চলবলপুর।

চলবলপুরে মানুষ দেখতে পেলাম না একটিও। সেখান থেকে জি. টি. রোড বা আসানসোল যে কতদূর তা ঠাওর করতে পারলাম না কিছুই।

অন্য উপায় নেই। পা চালালাম। খানিক দূরে মোড় ফিরতেই একটা দোকান দেখা দিল। বোধহয় চায়ের দোকান। সামনে একটা কেরোসিনের বাতি জ্বলছে।

দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দোকানী লোকটি খালি গায়ে তার ছোট্ট পুরোনো আলমারি বন্ধ করছিল তখন।

পিছন থেকে ডাকলাম, শুনুন।

ভদ্রলোক ফিরে চাইলেন। পরিপূর্ণ ভাবে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। তাঁর ভ্রূকুটি ঘনিষ্ঠ হল। কয়েকটা ভাঁজ পড়ল শীর্ণ কপালে।

—জায়গাটার নাম চলবলপুর?

—হ্যাঁ।

—এখান থেকে জি. টি. রোড কতদূরে বলতে পারেন?

—মাইল দেড়েক।

—কোন রিক্সা পাওয়া যাবে?

—অন্যদিন চলে পেতেন, কিন্তু—, ভদ্রলোক একটু থেমে বললেন, কদিন আগে রাত্রে এ'রাস্তায় আবার একটা খুন হয়ে গেছে কিনা তাই রিক্সাওয়ালারা আর যেতে চায় না।

অ!—অস্বস্তিতে আর চঞ্চলতায় সুটকেশটা রাস্তার ওপর বসতে লাগলাম।

দোকানী আত্মীয়তার সুরে বলল, ভেতরে এসে বসুন। চা খান। যদি আপনার খুবই দরকার থাকে আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।

উঠে এলাম। চারপাশে চেয়ে দেখলাম ভাল করে। মোনা ধরা ইট। বহু ব্যবহারে আর অযত্নে জীর্ণ ইটগুলো চোখ ড্যাব্ ড্যাব্ করে চেয়ে আছে। ওপাশে একটা অশ্বত্থ গাছ। তার ডালপালাগুলো বাড়ীটাকে আপ্যায়ন করার জন্য ঝুঁকে নেমে এসেছে। দোকানের মধ্যে আসবাব বড় একটা নেই। একটা কালচে বেঞ্চি। তাতেই খদ্দের বসে। মাঝারি গোছের একটা কালো কড়া। এনামেলের থালায় সকালের ভাজা মিইয়ে পড়া কুচো নিমকি। রসে ভেজান, সস্তারঙে রাঙান, হাতে পাকান বেসনের লাড্ডু।

দোকানটার কোণে কোণে ঝুল। ওপরে মাকড়সা আর মাটিতে ইঁদুরের অবাধ গতিবিধি। পেছনের দিকে দেওয়ালের মাঝখানে একটা চটের পর্দা ঝোলান। বোঝা যায়, ওটা অন্দরে যাবার রাস্তা।

ভদ্রলোক এক গাল হেসে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, একটু বসুন। দু' মিনিট। আমি সব কিছু মাজবার জন্য ভেতরে পাঠিয়ে দিয়েছি। বিশেষ দেরী হবে না। এক্ষুনিই—

Sylcoform

BRASSIERS

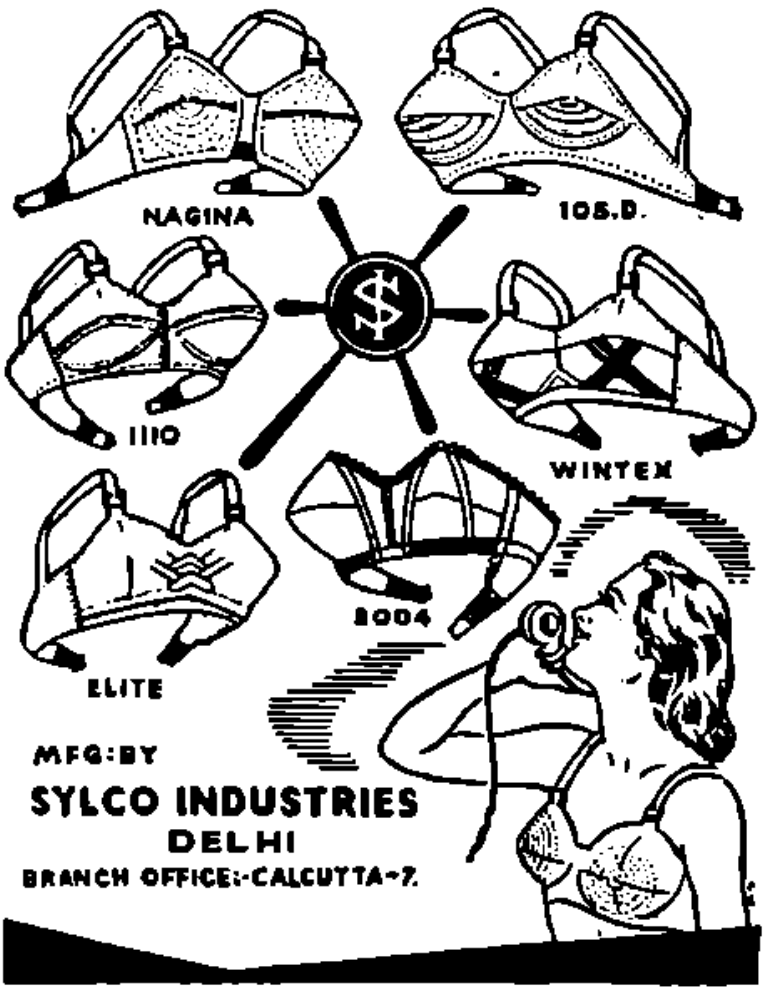

MFG:BY

SYLCO INDUSTRIES

DELHI

BRANCH OFFICE:-CALCUTTA-7.

—তাহলে থাক, উঠে দাঁড়াতে চাইলাম আমি।

—তাই কি হয়! ব্রাহ্মণের ছেলে আপনি। অসময়ে এসেছেন। এক কাপ চা দিতে পারবো না! এ' হয় না।

—আমি ব্রাহ্মণের ছেলে তা জানলেন কি করে?

—বাঃ, আপনার কলারের পাশে পৈতে দেখা যাচ্ছে যে।

এর পরও প্রশ্ন করা চলত। কিন্তু লোকটার ওপর আমার কেমন একটা তিক্তবিরক্ত এলো যে কিছুই বললাম না।

ভদ্রলোক সেই চটের পর্দা সরিয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

আমার অবস্থাটা একবার বুঝে ছাখো। তৎক্ষণে আমার মনে খটকা লেগেছে। কি করবো না করবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। ভদ্রলোকের সংগ পাবার আশায় অপেক্ষা করব না একাই চলে যাব হাঁটা পথে?

বাইরে রাত্রি কিন্তু সম্ভাষণ না জানিয়ে নিষেধই করছে যেন। কি নিবিড়, কি গভীর রাত। চারদিকে যেন ঘুমে ভিজে গেছে। যেন সর্বাংগে রহস্যের চাদর মুড়ি দিয়ে নেমেছে রাত। সে রাত্রি একটা থ্রিল। রিয়েলি…

চলবলপুরে কি মানুষ নেই? দোকানপাট? এখানে কি এমন কোন পানের দোকান নেই যেখানে ঠিক এই সময় ব্যাঙো বাজে? এখানে কি খালি মাঝে মাঝে ককিয়ে ওঠা কুকুরের ডাক আর ঝিঁঝির একটানা আওয়াজই রাতের গায়ে আঁচড় কাটে! আর কিছু নেই? জি. টি. রোড পর্যন্ত এই রাস্তার দুধারে মাঝে মাঝে দু' চারটে পানের দোকান, কয়েকটা মানুষের মুখ, সাবলীল হাসি, কথাবার্তা কি মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও পাওয়া যাবে না এখানে!

রাত্রি যেন ধূ ধূ করছে।

না, চলবলপুরে মানুষ ছিল। মানুষ ছিল সেই দোকানেই। মানুষ ছিল দোকানীর অন্দরমহলে। আর মানুষ থাকলে তার সংগে যা থাকে, সেই সবও ছিল। পঞ্চাপাবনার হাওয়া গায়ে মেখে বেড়ে ওঠা একটি ছিন্নমূল মানুষের পরিবার এই রুক্ষ কোলিয়ারী অঞ্চলে, চলবলপুরে তাদের ক্ষুধা নিয়ে, তৃষ্ণা নিয়ে, বেঁচে থাকার সবকয়টি দাবী নিয়ে সেই জীর্ণ ইটের বাড়ীর সামনের ভাগে দোকান আর চটের ব্যবধান দিয়ে ভেতরে সংসার পেতেছিল। নতুন মাটির আশায়।

সে রাত্রে চলবলপুরের সেই দোকান ছেড়ে এক পাও যাওয়া হল না আমার।

দোকানী ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ। অমায়িক। অতিথিপরায়ণ। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। পূর্ব বাংলায় পাটের কারবার ছিল তাঁর। এককালে কলেক্টার সাবুর কাছে মাশুল দিতেন, আর আজ প্রতি মুহূর্তে মাশুল দিচ্ছেন জীবনটাকে একটু সামলে নেওয়ার জন্য। তা আর হয়ে উঠছে না।

সেই চটের পর্দা সরিয়ে ভদ্রলোকের পিছু পিছু ভিতরে চলে এলাম আমিও।

খানিকটা মাটির উঠোন ভেঙে পড়া পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। উঠোনের ডানহাতি কোণটায় কয়েকটা লিচু গাছ। ডানদিকে একটা চালা-ঘর। বোধহয় রান্নাঘর। বাইরে একটা কেরোসিনের লম্ফ জ্বলছে। শিখার কালিতে কালো হয়ে গেছে দেওয়ালের খানিকটা।

সঙ্গের ভদ্রলোকটি ছাড়া দ্বিতীয় কোন প্রাণী চোখে পড়ল না।

একটা বেতের মোড়ায় বসে জুতো আর মোজা খুললাম। ভদ্রলোকেরই অনুরোধে হাত পা একটু ধোয়া দরকার। তিনিই পথ দেখিয়ে কুয়োর কাছে নিয়ে এলেন। উঠোনের মধ্যে কয়েকটা পেঁপে গাছ। কিছু দূরেই কুয়ো। পায়ের শব্দে কয়েকটা পাখী উড়ে গেল পরিচিত লঘু শব্দ তুলে। বোধহয় চড়ুই।

কুয়োটা ঘরের ভেতরে না বাইরে তা ঠাওর করা মুস্কিল। সেখানে এক বালতি জল যেন আমারই স্পর্শের অপেক্ষায় ছিল। পাশে একটি তোবড়ানো, আধময়লা মগ।

আদৌ ইচ্ছা না থাকলেও কিছু মুখে দেওয়ার জন্য বসতেই হলো আমায়। চটের ওপর সুতোর কাজ করা মলিন আসন। এক গ্লাস জল।

ঘরেতে দ্বিতীয় প্রাণীর উপস্থিতি টের পাওয়া গেল এতক্ষণে। যত্নের ত্রুটি নেই কোথাও। তাঁদের সাধ্যের তুলনায় আয়োজন প্রচুর। গরম পেঁপের তরকারী, ভাত, আর—আর? পেঁপের তরকারী। ফলবতী গাছটি বন্ধুর মত গৃহকর্তার কুণ্ঠার সমান অংশ নিয়েছে। সেই চালাঘরের দুয়ার পর্যন্ত গিয়ে ভদ্রলোক খাবার নিয়ে এলেন। ভিতর থেকে দুয়ার পর্যন্ত বাড়িয়ে দিল যে তার দর্শন মিলল না।

ভদ্রলোক নিজেই তাঁর মেয়ের কথা তুললেন। ওই মেয়েটিকেই সংগে করে নিয়ে এসেছেন তিনি। বাকী সব এখনো দুধকুণ্ডী ক্যাম্পে পড়ে আছে। একটু সামলে না নিলে কিছুতেই আনতে পারবেন না। তারা যে কেমন আছে, বেঁচে আছে কিনা ভগবানই জানেন।

দীর্ঘশ্বাস পড়ল ভদ্রলোকের।

"বিশ্বাস করুন," তিনি বললেন, "আমি আপনাকে পৌঁছে দেবার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম। কিন্তু মেয়ে বলল যে বাবা তোমাকে তো একলা ফিরতে হবে। ফিরবে কি করে?··· ভাবছেন, মেয়ে মানা করল বলে গেলাম না? না, তা নয়। যেতাম। কিন্তু এই রাত দুপহরে মেয়েটাকে রেখে যাই কার কাছে? ওই দেখুন, পাঁচিলটা ওখানটায় ভাঙা। কত কাঁটা দিয়ে ফাঁকটা ভরেছি দেখেছেন। জানোয়ার আটকানোর জন্যে নয়।

বলিহারী জায়গা এই চল্‌বল্‌পুর। মানুষ এখানে কম। কিন্তু প্রায় সবগুলিই যেন কয়লার দোসর। অভাবে, দায়ে, নিরুপায় হয়ে বাপ আর মেয়ে যে এক জায়গায় আছে তাও সইছে না ইতরদের। ভেবেছিলাম ক্যাম্পের চেয়ে মেয়ের পক্ষে এই জায়গাটাই নিরাপদ। ওঃ! মাঝে মাঝে আমাকে কেনাকাটার জন্যও তো বাজারে, দূরে যেতে হয়! কি করব? আর পারছি না! একা, বড় মেয়ে ভয়ে যেন দিনে দিনে কাঠ হয়ে যাচ্ছে।"

ভারী দীর্ঘশ্বাস পড়ল ভদ্রলোকের।

"কোন রকমে যদি একটু সিঁদুর উঠত মেয়েটার মাথায়। অনেক তো চেনাজানা আপনার কলকাতায়। আজকালকার ছেলেরা শুনেছি হৃদয়বান হয়। গরীব ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় থেকে বাঁচান। আপনার কেনা হয়ে থাকব। গোলাম হয়ে থাকব।"

"বেশ,—"বোকার মত অনর্গল বলে গেলেন ভদ্রলোক, "বিয়ে করে ঘরে নিয়ে যেতে হবে না আমার মেয়েকে। হিন্দুর ঘরে, গরীব বাপের মেয়ে। জানবো স্বামীর ঘর করা তার কপালে নেই। এই ওর ভাগ্য। তবু পাশাপাশি

লোকগুলোর মুখ বন্ধ হোক। আর কিছু চাইনে। আর কিছু না। না হলে, ওরা যে সব কথা বলে বাপ হয়ে কানে আঙুল দিয়েও তো সে সব কথা সইতে পারি না। প্রাণটা মুচড়ে ওঠে। দাংগার হাত থেকে মেয়ে বাঁচিয়েছি, এর হাত থেকে বাঁচাবো কি করে?"

ভদ্রলোকের সঙ্গে আবার দোকানে এসে বসলাম। ভাল করে চেয়ে দেখলাম তাঁর দিকে। সমস্ত শরীরের যতটুকু শক্তি সব যেন চোখ দিয়ে ঠিকরে পড়ছে।

এ'রাত কতক্ষণে শেষ হবে তার জন্য আমি মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছি।

—আপনাদের এখানে প্রথম রাস কটায় ছাড়ে।

—অন্ধকার থাকতেই। এই সাড়ে চার, পৌনে পাঁচটায়।

—প্রথম বাসটা ধরলে ছ'টা আন্দাজ আসানসোল পৌঁছতে পারবো না?

—খুব পারবেন।

রাত্রি যত বাড়ছে ততই যে আমি কত অস্বস্তি বোধ করছি আর বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে, তা তোমাদের বোঝাতে পারব না। সেই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, গাড়ী পাব কলকাতার?

—তাতো বলতে পারি না। তবে আসানসোল জংসন স্টেসন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় গাড়ী।

খানিক পরে চটের পর্দার ওপার থেকে ডাক এল, বাবা।

এই প্রথম অন্তরালবর্তিনীর কণ্ঠস্বর শুনলাম। ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে ভিতরে চলে গেলেন।

ফিরে এলেন খানিক পরেই। বিশ্রামের আয়োজন প্রস্তুত। অনেক কষ্ট হবে আমার। অনেক অসুবিধে। হয়তো রাত্রে ঘুমোতে পারব না। কুণ্ঠিত ভদ্রলোক কিন্তু ধন্য। এদেশে এসে আমিই তাঁর প্রথম অতিথি।

উঠানের একপাশে সেই চালাঘর যেটাকে রান্নাঘর বলে ঠাওর হয়েছিল সেখানেই শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছে আমার। কৌটো-বাটাগুলো এক কোণে গুছিয়ে রাখা। মেঝেয় বিছানা পাতা আছে। হাতে সেলাই করা নকশা কাঁথা। রোগা বালিস শিয়রে।

করজোড়ে আবার অজস্র কুণ্ঠা প্রকাশ করলেন ভদ্রলোক। আর যাবার আগে আবার আশ্বস্ত করে গেলেন এই বলে যে সময়ের আগেই তিনি উঠিয়ে দেবেন আমায়।

বাইরে চৌকাঠের পাশে লম্ফ জ্বলতে লাগল।

বসে রইলাম বিছানায়। তিজে স্যাঁতসেঁতে মেঝে। চারদিকে, বিছানাতেও ভ্যাপসা গন্ধ। মশার দৌরাত্ম্য। পরপর দুটো সিগারেট নিঃশেষ হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে।

বাইরে পেঁপে গাছের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে পড়া চাঁদের সবুজ আলো পাতাগুলিকে চিকন করে তুলেছে।

উঠোনের ওপর আর দোকান ঘরে বারবার খুটখাট শব্দ হচ্ছে। কখনো ভারী, কখনো হাল্কা পায়ের আওয়াজ ভেসে বেড়াচ্ছে উঠোনে, দোকানঘরে।

দোকানী ভদ্রলোক কি যেন বললেন। মেয়েটি বলল, না।

যতক্ষণ জেগেছিলাম বার কয়েকই শুনলাম মেয়েটি বলছে, না।

সেই অপরিচিত নির্জন ঘরে সত্যিই ঘেমে উঠলাম আমি। পৃথিবীর সমস্ত রহস্য যেন

আমার মাথার কাছে চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছে। একসময় ঘুমিয়েও গেলাম।

ভদ্রলোকের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল আমার।

বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম তাঁরই পিছু পিছু। উঠোনের এক কোণে আয়োজন করা হয়েছে। মাটির প্রদীপ, কোষাকুষি ইত্যাদি রাখা। আর এক পাশে একটি পিঁড়ির ওপর ঘরে কাচা পরিষ্কার শাড়ী পরে একটি মেয়ে বসে আছে। এ'সবই সত্য। স্পষ্ট দেখছি। তবু আমি আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না।

ভদ্রলোক বললেন, আমি সমস্ত কিছু শেষ করেছি। শুধু সম্প্রদানটুকু বাকী।

চমকে উঠলাম, কেঁপে উঠলাম আমি। মনে হল যেন সমস্ত আকাশখানা একটা নিঃশব্দ অট্টহাস্যে চকিতের জন্য শিউরে উঠল। পেঁপে গাছের পাতাগুলো একটা হিংস্র উল্লাসে মুহূর্তের জন্য কিলবিল করে উঠল যেন।

কাতর অনুনয়ে ককিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। পাত্র নিতে হবে না, দায়িত্ব নিতে হবে না। সংসার করতে হবে না। দিনের আলোয় স্বীকার করতে হবে না। ধর্মসাক্ষী করে বিয়ে করতে হবে শুধু। একটি রাত পাশে স্থান দিতে হবে। পৃথিবীতে কেউ জানবে না। শুধু তিনি জানবেন তাঁর মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। পারবে ও পারবে। ব্রাহ্মণের মেয়ে এই যদি ওর কপালের লিখন হয় তবে সইতে পারবে ও। আজীবন সধবা থাকবে ও। যতদিন বাঁচবে ততদিন আমারই কল্যাণ কামনা করবে সকাল সন্ধ্যায়। আর যদি ওর কপাল ফেরে তাহলে, তাহলে হয়তো ও ওর স্বামীর ঘরও করতে পারবে।

ব্রাহ্মণের চোখ দুটো অস্বাভাবিকভাবে জ্বলতে লাগল। কী হিংস্র সে দৃষ্টি!

সেই নিস্তব্ধ রাত্রিতে, চন্দ্রবলপুরের সেই দোকানঘরের পেছন দিকের মাটির উঠোনে, অগ্নিসাক্ষী করে, বাপের নির্দেশে একটিমাত্র রাতের অতিথি আমার গলায় মেয়ে বরমাল্য পরিয়ে দিল।

রাত বেড়ে চলেছে।

সেই চালাঘরের মেঝেয় কাঁথার বিছানায় পাশাপাশি আমরা দু'জন। মেয়েটির মাথায় ঘোমটা। মাঝে মাঝে কাপড় দুলছে।

ঘড়ির কাঁটা নিশ্চিত পরিক্রমায় এগিয়ে চলল। রাত্রির ভাঁজ ভাঁজ প্রতিটি মুহূর্ত যেন স্পষ্ট। কেউ কোন কথা বললাম না। আমার মাথাটা অস্বাভাবিক ভারী হয়ে গেছে। ঘোমটার আড়ালে মেয়েটি কি করছে তা সেই জানে।

ঘরের কোণে জ্বালিয়ে দেওয়া নতুন মোম বাতিটা ক্রমশঃ ছোট থেকে আরো ছোট হয়ে আসছে।

—যখনকার কথা বলছি তখন, তোমরা জানো ডাক্তারী পাশ করেও আমি রীতিমত পিউরিটান ছিলাম। সুতরাং কতকগুলি প্রশ্ন আমায় পেয়ে বসল।

আমার প্রথম প্রশ্ন নিজের কাছেই। যা ঘটল এটাতো অস্বীকার করতে পারি না। কেননা এটা ঘটনা। কিন্তু এই ঘটনায় যে আমি জড়িয়ে গেলাম, কেন জড়িয়ে গেলাম? আমার নিজের জবাবটা কি?

কিছুই না। সেই অদ্ভুত রাত্রে, ওই পরিবেশে ব্রাহ্মণকে হিংস্র ছাড়া অন্য কিছুই মনে হয় নি। তাই, আমি ভয় পেয়েছিলাম। ভয় ছাড়া আর কি?

দ্বিতীয় প্রশ্ন অনেক। যা ঘটল তার সমস্তটাই কি ছল? অভিনয়? এমনিভাবেই কি মেয়েটির আগে আরো কয়েকবার বিয়ে হয়ে গেছে? কিছুদিন আগে এই রাস্তায় খুন হওয়ার কথা কি বানানো? একটা সুচারু অভিনয় করে দারিদ্র্যের চাবুকে চাবুকে অতিষ্ঠ বাপ কি তার মেয়েকে পণ্য করে আমার ঘরে আমারই বিছানায় পাঠিয়ে দিয়েছে?

কোথায় উত্তর? কে উত্তর দেবে এ'সব কথার? সমস্ত পেঁপে গাছগুলোর চুলের মুঠি ধরে টান মারলেও এ'কথার উত্তর মিলবে না। আকাশটাকে যদি ফালিফালি করে ছিঁড়ে ফেলো তাহলেও মিলবে না কোন উত্তর। উত্তর দিতে পারে শুধু সামনে বসে থাকা মেয়েটি।

—তোমার নাম কি?

—ইন্দ্রাণী।

আর কোন কথা সরল না আমার। নাম নিয়ে এমন অদ্ভুত ব্যঙ্গ এর আগে জানতাম না। শুধু ব্যঙ্গ কেন? আরো আছে। একটু আগে এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার আগে দোকানী ভদ্রলোকের ব্যবহারে আমি যথার্থ ভদ্রতাই দেখেছি। ভদ্র গৃহস্থ বাড়ীতে মেয়ের নাম কি ইন্দ্রাণী হয় না? অনেক হয়, অনেক।

অথবা, সত্যিই কি আজকের রাতের ঘটনায় একটি গরীব বাপের অন্তর মন বোঝানোর মত তৃপ্তি পাবে? তা কি সম্ভব? ইন্দ্রাণীর বাবা বলেছে, পারবে, ও পারবে। ব্রাহ্মণের মেয়ে, এই যদি ওর কপালের লিখন হয় সইতে পারবে ও।

—ছাখো, আমরা যারা সহরে থাকি, শিক্ষিত, ও ভদ্রলোক ও কিছুটা সঙ্গতি আছে তারা নিজের বাড়ীর মেয়ের এমন একটা বিয়ে কল্পনাই করতে পারি না। কিন্তু আমরাই তো গোটা দেশ নয়। আমাদের জানার বাইরে যে দেশের বিরাট অংশ রয়েছে তাতো আমাদের অজানা। কিংবদন্তী, পুরাণের গল্প, অজস্র ধর্মকথায় ভরা আমাদের দেশ। ভাগ্য বলে, কপাল বলে, অদৃষ্ট বলে, এই ভাবে বিয়ে দেওয়া—

এই সব এলোমেলো জানা প্রশ্ন ও পাল্টা প্রশ্নে আমার সময় খানিকটা কাটতে লাগল।

আমরা আবার নীরব। বাইরে রাত তার সমস্ত সম্ভার নিয়ে পূর্ণ। পেঁপে গাছের পাতায় পাতায় পিছলে পড়েছে চাঁদ। সে রাত্রির সাক্ষী তারা আর জোনাকি জ্বলছে। কুকুর ডাকছে। মাঝে মাঝে পাখা ঝাপ্টাচ্ছে পাখীরা।

এক সময় ইন্দ্রাণী বলল, সময় হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, সময় হয়ে গেছে। রাত তখন শেষ হওয়ার মুখে। পাখী ডাকছে। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে মৃদু মৃদু।

ভোর।

ভোর হয়েছে। এখুনি ত্যাগ করতে হবে চলবলপুর। দৌড়তে হবে আসানসোলে। সেখান থেকে কলকাতা। পকেটের তারটা জরুরী।

কিন্তু আমার সমস্ত শরীর এ'রকম অদ্ভুত ক্লান্ত আর ভারী হয়ে উঠল কি করে? এই ঘরের মেঝে, মেঝের পাতা কাঁথার বিছানা যেন অদৃশ্য লক্ষ লক্ষ বাহু মেলে আমায় ধরে আছে।

তবু উঠে দাঁড়ালাম। আর ঠিক তখনই ইন্দ্রাণী পূজারিণীর ভংগীতে আমার পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করল। এইটা আমি ধারণাই করতে পারিনি। মুহূর্তে যেন আমার মনে সব প্রশ্ন, সব সংশয়ের মীমাংসা হয়ে গেল। মনে

হল, যা হয় হোক। অক্ষয় হোক আজকের রাতের মালা-বদল।

আমি ইন্দ্রাণীর শিয়রে বসে তার বাঁ হাত-খানি নিজের হাতে নিয়ে তার অনামিকায় একটি আঙটি পরিয়ে দিয়ে বললাম, মনে থাকবে।

চলবলপুর থেকে আসানসোলগামী প্রথম বাস ছেড়ে গিল। হাঁসের পালকের মত সাদা, নরম ভোরের মধ্যে দিয়ে পথ করে চলল বাসখানা।

॥ পরিশিষ্ট ॥

ডাক্তারের গল্পের এই শ্রোতা ছিলাম আমরা তিনজন। গল্প শেষ হলে তাদের একজন বললেন, তবে যে তুমি বললে নষ্টা মেয়ের সংগে রাত্রিবাস?

—তা-ই নয়?

দ্বিতীয় জনও বললেন, আমি তো কোথাও কিছু খুঁজে পেলাম না। বরং মনে হচ্ছে···

তাকে থামিয়ে দিয়ে ডাক্তার বলল, তাহলে বুঝিয়ে বলি। ছাখো মেয়েটি প্রণাম করার পর আমারও মনে হয়েছিল তোমাদের মতোই। কিন্তু, নষ্টা না হলে আমার দেওয়া আঙটি সে নেবে কেন? বিয়ের পর যার ঘরে সে যাচ্ছে না, তার আঙটি সে কেন নেবে?

গল্পের দু'জন শ্রোতা—ডাক্তারকে যাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন—তাঁরা দু'জনেই কিছু ভাবলেন। তারপর একজন বললেন, হ্যাঁ, তাই হবে।

এ গল্পের তৃতীয় শ্রোতা—অর্থাৎ আমি—এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম। কিছু কথা আমার জিভের আগায় নাচছিল। সম্পূর্ণ বিপরীত কথা। বলতে যাচ্ছিলাম, একটা কুকুরকে যদি এমনি অকারণে গুলি করে মারতে চাও—প্রবাদ আছে—মারবার আগে কুকুরটার একটা বদনাম দিও। রটিয়ে দিও যে কুকুরটা পাগলা হয়ে গেছে। নিশ্চিন্তে গুলি করো তারপর।

স্পষ্টই বলতে যাচ্ছিলাম, গুলি করার আগে, ডাক্তার, তুমি বদনামটা দিলে ভালো।

কিন্তু এসব কিছুই বললাম না। সম্পূর্ণ অন্য কিছু মনে হওয়ায় জানতে চাইলাম, কোন সালে, কোন মাসের, কোন তারিখে এ ঘটনা ঘটে তা তোমার মনে আছে?

—নিশ্চয়ই। ২৭শে আগস্ট, ১৯৪৮।

আমরা চারজনই তখন টেবল ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়েছি। সেখানে আজকের তারিখ গোটা হরফে ইংরেজীতে '২৭ আগস্ট, ১৯৬০', এই লেখাগুলি আমাদের দিকে চেয়ে আছে।

টেবল্ ক্যালেণ্ডারের দিকে চেয়ে চেয়ে আমরা বারো বছর আগের সেই রাতের সংগে আজকের তারিখের মিলনটাকে বারবার মেলাচ্ছিলাম। কেউ কিছুই বলিনি।

সেই নীরবতাকে নাড়া দেবার জন্য পানসে মুখে একটু হাসার চেষ্টা করে জবাবদিহি করার মত ডাক্তার নিজেই বলল, বলেছি তো, সে রাত একটা থ্রিল রিয়েলি।

উত্তরণ

[১৫২ পৃষ্ঠার পর]

নেই। ঝরঝরে মন শুধু হয়ে খেয়ে পড়তে চাইছে না। চলতে চাইছে, ছুটতে চাইছে। কল্যাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার জানতে ইচ্ছা হল, তারও মন এমনি ছুটতে চাইছে কিনা।

কল্যাণী বলল : অমন করে তাকিয়ে কী দেখছ ?

তোমাকে।

তবু না লজ্জা পাব, লজ্জা পাবার বয়স গেছে পেরিয়ে।

বিয়ের বয়সটা বোধ হয় পেরয় নি।

কল্যাণী হেসে বলল : মনটা যে রাঙা হচ্ছে না।

কেন হচ্ছে না! নিশ্চয়ই হচ্ছে। কল্যাণী লুকোচ্ছে সত্য কথা। লজ্জায় লুকোচ্ছে। আমি তাকে মিথ্যা বলতে দেব না। বললাম : নিজেকে আর ঠকিয়ো না কল্যাণী, এখন তোমার বয়স হয়েছে।

বয়স হয়েছে বলেই তো বলছি, আর ঠকতে চাই না। তুমি তোমার স্ত্রীকে আজও ক্ষমা করতে পার নি, কোন-দিন পারবে কি আর কাউকে ক্ষমা করতে? ঐ একটি হিংসা সারা জীবন ধরে তোমাকে পোড়াবে।

গভীর বিস্ময়ে আমি কল্যাণীর মুখের দিকে তাকালাম। বড় স্থির প্রশান্ত দৃষ্টি। কোথাও এতটুকু অস্থিরতা নেই, নেই চঞ্চলতা। মনে হল, তার জীবনটা আজ ধূপের মত পুড়ছে, আর আমি তার সৌরভে হচ্ছি মুগ্ধ। প্রদীপের শিখার মত কল্যাণীকে পবিত্র মনে হচ্ছে। গভীর ভাবে কল্যাণীকে আবেদন জানালাম : তুমি কি আমাকে পবিত্র করবে না?

মানুষকে যা পবিত্র করে, তা তোমার মনেই আছে। তার জন্যে আমার সাহায্যের দরকার হবে না।

বলবার কথা আমার ফুরিয়ে গেছে। কল্যাণীর ঘর থেকে আমি বেরিয়ে এলাম।

দশ

আহারের পর নিজের ঘরে বসে একটা চুরট ধরিয়েছিলাম। আকাশপাতাল নানা কথা মনে আসছে। অনেক এলোমেলো অগোছালো কথা। তাদের একটার সঙ্গে আর একটার কোন যোগ নেই। পর পর বলে গেলে অর্থহীন প্রলাপ মনে হবে। তবু তারা এগিয়ে আসছে, বিপর্যস্ত করছে আমার বুদ্ধিকে।

কল্যাণীর কাছে আমি আজ ছোট হয়ে গেছি। এ দুর্মতি আমার কেন হল! কেন উন্মত্ত হলাম! কেন নিজেকে এমন ছেলেমানুষের মতো হারিয়ে ফেললাম! তাকে বোধ হয় আর আমার মুখ দেখাতে পারব না।

এই চুরটগুলো বড় কড়া, বড় তেতো।

দার্জিলিঙে এসে বড় ভুল করেছি। গল্প লেখা এখানে হবে না। এমন আড়ষ্ট রাতে আঙুলগুলো সব টনটন করছে। লিখব কী করে!

কল্যাণী রাতে কী করে? ওর টেবিলে অনেক বই দেখেছি। আমার বইও এক কপি এনেছে দেখলাম। সেই বই কল্যাণী পড়ছিল। যাকে পছন্দ হয় না, তার বই কি লোকে পড়ে! কিন্তু কল্যাণী তো আমাকে অপছন্দ করে না! সে তো নিজেই আমার কাছে এসেছে, ডেকে নিয়ে গেছে বেড়াতে। বলেছে, রোজ আমার সঙ্গে বেড়াবে। এতদিন একা কাটিয়েছে। আর সে একা বেড়াবে না।

জীবনেও তো সে একা। সেখানে কেন কাউকে চায় না!

ছিছি, আবার আমি কল্যাণীর কথা ভাবছি!

শ্রীধর মণ্ডলের মামলাটা জটিল হয়ে উঠছে। লোকটা ভারি চালাক। সেই নিশ্চয়ই সমস্ত নষ্টের মূলে। এখন ভালমানুষ সাজছে। গলায় তুলসির মালা পরে কৃষ্ণনাম করলেই লোকে বৈষ্ণব হয়। একটা ভণ্ড।

ভণ্ড কে নয়! সমস্ত দুনিয়া আজ ভণ্ডামি করছে। ভেবেছিলাম কল্যাণী হয়তো ভণ্ডামি করবে না। কিন্তু সেও তো সেই রকম। আমাকেও ভণ্ড হতে বলছে। যাদের জন্য শৈলা আত্মহত্যা করল, আমি তাদের ক্ষমা করব! সাহায্য করব তাদের বেঁচে থাকতে! শৈলা

তাদের একজন ছিল বলেই কি আমাকে এই অন্যায় করতে হবে, প্রশ্রয় দিতে হবে পাপকে!

নেতাজী মরে গেলেন, লোকে তাঁকে মেরে ফেলল। দেশের জন্য যে মানুষ তাঁর প্রাণ দিলেন, এ দেশের লোক তাঁকেই বলল, সাহায্য করব না। দেশে ফিরতে দেব না, লড়াই করব তোমার সঙ্গে। এ সব কথা সত্যি কিনা কে জানে, মিথ্যাই বা লোকে বলবে কেন! নেতাজী মরে গেলেন, কিন্তু দেশটা কেন বেঁচে উঠল না! স্বার্থপরতার শেষ না হলে কি সত্য যুগ আসে না! কলির অবসান কবে হবে!

কল্যাণী বলেছিল, আমার কাছে তার সাহায্যের দরকার। অপদার্থ সংঘের খাতা থেকে পুলিস তার নাম টুকে নিয়ে গেছে। আরও যাদের নাম নিয়ে গেছে, তাদের সবাইকে একে একে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছে। কল্যাণীকেও কি কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে? কী জিজ্ঞেস করবে তাকে? সত্যিই তো, আমি যদি সাহায্য না করি, কে সাহায্য করবে তাকে। কিন্তু কল্যাণী কি এখন আমার সাহায্য নেবে! আমি তাকে অপমান করি নি তো! নিশ্চয়ই করি নি। আমি তো তাকে সম্মান দিতেই চেয়েছিলাম। সে কেন আমাকে ভুল বুঝল!

পর্দার আড়ালে কারও ছায়া দেখতে পেলাম। ও কার ছায়া! ও ছায়া তো ম্যানেজারের নয়। অনাদি-বাবুরও নয়। ও ছায়া কি কোন বেয়ারার হবে! না কল্যাণী তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে! কল্যাণীই হবে। সেই বোধ হয় কিছু বলতে আসছে। কিন্তু ঘরে এল না কেন? সঙ্কোচ! তার কোন সঙ্কোচবোধ নেই বলে সে তো অহংকার করে! ও জিনিস থাকতেই হবে। হাজার হলেও তো সে নারী!

আমি আমার চুরুটটা অ্যাশট্রের উপরে নামিয়ে রাখলাম। নিঃশব্দ পদক্ষেপে এলাম বাইরে। নাতো, বারান্দায় কেউ নেই। তবে কি আমি ভুল দেখলাম!

ভুল আমি দেখি নি। অন্ধকার থামের আড়ালে সে লুকিয়েছিল। কাছে গিয়ে বললাম: লুকোলে চলবে না। সোজা ঘরে চল।

তাকে ঘরে এনে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। এ তো কল্যাণী নয়, এ অন্য কোন মেয়ে। কালো শাড়ির উপর পাওটে রঙের ব্লাউজ পরেছে। টানা টানা চক্ষু, কিন্তু মুখে রঙ নেই। শুধু আমার মনে হল, এরই নাম মায়া। একেই আমি আজ পথের আলোয় দেখেছি।

মেয়েটি বড় জড়সড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বললাম: তোমার নাম কি মায়া?

মায়া মাথা দুলিয়ে বলল: হ্যাঁ।

বললাম: বস।

কিন্তু মায়া কেন এখানে এল! কল্যাণীর সন্দেহ যদি সত্য হয় তো নির্মল সেনের খোঁজ করতে নিশ্চয়ই আসে নি। তবে আর কী করতে সে এখানে আসবে। নির্মলের জন্য হলে কল্যাণীর সন্দেহ বলব অমূলক। আমরা দুজনেই বসলাম। মায়া কিন্তু সহজ হয়ে বসতে পারল না। খানিকক্ষণ সময় দিয়ে বললাম: কাকে চাই?

আপনাকে।

আমাকে!

আমি চমকে উঠেছিলাম তার কথা শুনে। সহসা এ কথা বিশ্বাস করতে পারলাম না। মনে হল, সে কোন সত্য গোপনের চেষ্টা করছে মিথ্যা দিয়ে। মায়া তার যুক্তি বিস্তার করল: নির্মলকে আপনি বাঁচাবেন, এই আশায় আপনার কাছে এসেছি।

মিথ্যে কথা। এত রাত্রে কেউ মামলা নিয়ে উকিলের কাছে আসে না।

মায়া এ অভিযোগের উত্তর দিল না। শুধু মাথা নিচু করে বসে রইল।

বললাম: নির্মলকে তুমিই ধরিয়ে দিয়েছ না?

মাথা না তুলেই মায়া বলল: হ্যাঁ।

কেন ধরিয়ে দিলে?

আমার কর্তব্য করেছি। আমি পুলিশের গোয়েন্দা ছিলাম।

ছিলাম মানে? এখন কি তুমি আর মাতাহারি নও?

না। চাকরিতে আমি ইস্তফা দিয়েছি।

মায়া তার পকেট থেকে একখানা কাগজ বার করল, তার পদত্যাগ-পত্র। বলল: পড়ে দেখুন।

পত্রখানি পড়ে আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হল। ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর কাছে জানিয়েছে যে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে মিথ্যাচরণ করতে বাধ্য করার জন্য সে তার চাকরিতে ইস্তফা দিতে বাধ্য হল। এই পত্র সে রেজেষ্ট্রি ডাকে পাঠিয়েছে। পোস্ট অফিসের রসিদও দেখাল। মনে হল, এও কোন ছল নয় তো! বললাম: আমি বিশ্বাস করি না।

কিসে বিশ্বাস করবেন?

সত্য কথা যুক্তি দিয়ে বিশ্বাস করতে হয় না, দিনের আলোর মত তা উপলব্ধির জিনিষ। তুমি কি নির্মলকে ভালবেসেছিলে?

জানি নে।

তবে যা জান তাই বল।

মায়া একবার ঘরের চারিদিকটা দেখল। তারপর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বলল: এই ঘরে আমি অনেকবার এসেছি, অনেক কথা বলেছি নির্মলের সঙ্গে। সে সমস্ত কথা আরও একজন শুনে গেছে। ঐ জানালার নিচে দাঁড়িয়ে সব শোনা যায়, ওটা নির্মল খুলেই রাখত, অন্যমনস্কভাবে বসে বসে কাজললতা দেখত। আমি এলেও ঐ জানালাটা বন্ধ করতে দিতাম না। বিপিনবাবু বলে যে ভদ্রলোক আমার বাবা সেজেছিলেন, তিনি ঐ জানালার নিচে দাঁড়িয়ে আমাদের সবকথা শুনতেন। আমার ওপর-ওয়ালা তিনি, কাজেই আমি বাধ্য হতাম ঐ জানালা খুলে রাখতে। একদিন খুলি নি। সেদিন ঐ দরজার পাশে এসে আমার কর্তব্যটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

মায়া একবার বন্ধ জানালা ও দরজা দুটোই পরীক্ষা করে দেখে এল। বললাম: তুমি কার কাছে এসব বলছ জান?

জানি। আমি ফৌজদারী আদালতের উকিল সজল রায়ের সাহায্য প্রার্থী। জানি তিনি পাপীর প্রতি ক্ষমাহীন নির্মম। কিন্তু গভীর অনুশোচনায় পাপ যার ধুয়ে মুছে নিষ্পাপ হয়ে গেছে, তাকেও কি আপনি ক্ষমা করবেন না।

সেই ক্ষমা! কল্যাণীও আমাকে একই কথা বলছে! মেয়েদের জন্য কি শুধু ক্ষমা করবার জন্যই! তবু আমি চুপ থাকবার চেষ্টা করলাম। বললাম: কলকাতায় আরও অনেক উকিল আছে, উকিলের অভাব তোমার হবে না।

সে কথা মানি। কিন্তু সেখানে পৌঁছতে পারব কিনা জানি না। ভূমীরের সঙ্গে লড়াই করে জলে থাকা যায় না। কাল সকালে আমার কী হবে ভগবানই জানেন।

কিছু যেন স্পষ্ট হচ্ছে, তার এই অন্ধকারের অভিধানের একটা অর্থ খুঁজে পাচ্ছি। বললাম: বল এইবারে।

ভয়ে ভয়ে মায়া বলল: কী বলব বলুন।

কেন তুমি নির্মলকে বাঁচাতে চাইছ, সেই কথা বল।

সব সত্যি বললে আপনি তাকে বাঁচাবার ভার নেবেন তো?

সর্তের কথা। মেয়েটা আমাকে দিয়ে আগে শর্ত করিয়ে নিতে চায়। সে পাপ করেছে কি করে নি, সে কথা জানাবার আগেই সে আমার সম্মতি চাইছে। কল্যাণী কিছু না জেনেই আমাকে এই অনুরোধ করেছিল। এ মেয়েটা জেনে করছে। সেই এক মন, সেই এক বাসনা। আমি কেন সমস্ত না জেনে রাজী হতে পারছি না, নির্মল অপরাধ করেছে শুনলে কি রাজী হতে পারব না। কেন পারব না! আমি উকিল, পাপ পুণ্যের বিচারের ভার তো বিচারকের উপর। আমি কেন এ সমস্ত দুর্ভাবনা ভেবে নিজের মনকে পীড়িত করি! তার চেয়ে—

না না তা হয় না। কল্যাণীকে খুশী করবার জন্যে আমি আমার মত বদলাতে পারব না। কল্যাণী তো নিজেই বলেছিল যে দেশে একটা নূতন সমাজের সৃষ্টি হয়েছে। দেশের মাটিতে এ সমাজের জন্ম নয়। জাপানীরা আকাশ থেকে কিছু ফেলেছিল, বোমার বদলে কিছু মানুষ। বাকী এসেছিল জাহাজে চেপে। আমেরিকার জাহাজ। ইংরেজ এদের এই দেশের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করে গেছে। তাদের জন্য আমার একটুও ক্ষমা নেই।

মায়া উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলল: তার যদি নাই নেন, তবে কেন আপনার কাছে নিজের মনটা মেলে ধরি।

যদি নিই ?

নেবেন !

মায়া হেসে ফেলল। অপূর্ব আবেগে উজ্জ্বল হয়ে মায়ার মুখের মুখ। বলল : তবে আমি আপনাকে সব বলব। আপনার কাছে আমি কিছু লুকোব না।

ভাল করে গুছিয়ে বসে মায়া তার কাহিনী শোনাল আমাকে। তারা লালবাজারের লোক। মায়া আর বিপিনবাবু তাদের নেওয়া নাম। আসল নাম এখন কেউই জানে না। মনোজ মিত্রের মামলায় খুনী বলে একটা লোককে পুলিশ খাড়া করিয়ে দিয়েছে। মনোজ মিত্র যে ঘরে খুন হয়েছে, তার পাশের ঘরে ঐ লোকটাকে অচেতন অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। নেশা একটু বেশি করে হয়তো ফিরতে পারে নি। কিন্তু মামলা দাঁড়াচ্ছে না, সাক্ষী প্রমাণ তার বিরুদ্ধে কিছুই নেই। মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে একটা খুনের মামলা সাজানো কঠিন কাজ।

নির্মল সেনের সঙ্গে মনোজ মিত্রের অন্তরঙ্গ ভাব ছিল। কিন্তু এই রকমের ভাব থাকলে একজন আর একজনকে খুন করতে পারে না, পুলিশ তা মনে করে না। বরং বেশি মিশে পয়লার বখরা নিয়ে এই জাতের এক বন্ধু আর এক বন্ধুকে ঠাণ্ডা মাথায় হামেশাই খুন করছে। এও যে একটা পরিকল্পিত খুন তাতে সন্দেহ ছিল না। কেন না যে খুন করেছে সে কোন বেহিসেবী হদিস রেখে যায় নি।

খুনটা একটু বেশি রাতে হয়েছিল, অথচ খোঁজ নিয়ে দেখা গেল যে প্রথম রাতের ফ্লাইটে নির্মল কলকাতা ছেড়েছে। তার বার্থ রিজার্ভড ছিল, এবং প্লেনের সময় তাকে স্টেশনেও দেখা গেছে। নির্মলের লিভারটা খারাপ হয়েছিল, এবং চিকিৎসাও করাচ্ছিল কিছুদিন থেকে। তার হাওয়া বদলের প্রয়োজনটা অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু পুলিশ শুধু তাকে সন্দেহের চোখে দেখেছে। আমাদের দেশের মেয়েরা এখনও এ ধরণের খুন করতে শেখে নি। আত্মরক্ষার জন্য, ইজ্জতের জন্য, বা ক্রোধের বশেও হয় তো তারা হত্যা করতে পারে, কিন্তু এ রকমের প্রতিহিংসা নিতে পারে না। পুরুষে পারে। মনোজ মিত্রের কাছে নির্মল সেন সমস্ত ব্যাপারে হেরে যায়। নির্মলের পয়লার মনোজ ভোজ খেয়ে এঁটোকাঁটা ফেলে দেয় নির্মলের সামনে। শুধু দিয়েছিল। ইদানীং সে বন্ধ করেছিল। একটা মেয়েকে বিয়ে করে মনোজ নাকি সংসারী হবার চেষ্টা করছিল। নির্মলের তা ভাল লাগে নি।

বিপিনবাবুর উপর ভার পড়ল নির্মলকে সাজিয়ে দেখবার। তিনি মায়াকে সঙ্গে নিলেন। পুরুষকে মেয়ে যেমন বাজাতে পারে, পুরুষে তেমন পারে না। মামলা চলছে। খুব তাড়াতাড়ি আমাদের রিপোর্ট চাই। উড়োজাহাজে আমরা উড়ে এলাম। দার্জিলিঙের পুলিশও জানল না যে আমরা দুজনে এখানে এসেছি।

বিপিনবাবু আমাকে বললেন : মাতাহারি দেখেছ ? বিদেশী মেয়ে গোয়েন্দার কাহিনী ?

দেখেছি।

কেমন লেগেছিল গ্রেটা গার্বোকে ?

আমি হেসে বলেছিলাম : মনে আছে।

বিপিনবাবু আমাকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন : তোমার মোটা পুরস্কারের ব্যবস্থা হবে, প্রমোশনও হবে।

প্রমোশন ও পুরস্কারের লোভে মায়া নির্মলের সঙ্গে ভাব করতে এগোল।

বাড়ির গভীরতা সম্বন্ধে মায়া সচেতন ছিল। বলল : আপনি যদি বিরক্ত না হন, তাহলে আমি খুঁটিনাটি কথাও বলতে পারি। সমস্ত আমার মনে আছে।

সমস্ত বলাই ভাল। সব কিছু জানবার বাসনা আমার হয়েছে।

পরিচয়ের প্রথমদিন থেকে মায়া গল্প শুরু করল।

নির্মলকে খুঁজে বার করতে তাদের বেশি সময় লাগে নি। হোটেলের নাম তারা কলকাতাতেই জেনে এসেছিল। লালবাজারের খাতায় লেখা আছে। তার ছবিও দেখেছি সেখানে। বিকেলে তারা নির্মলকে অনুসরণ করে মার্চ হিলে এল।

নির্মল একটা বেঞ্চিতে বসেছিল। পাইপ ধরিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। সামনে ছেলেমেয়েদের খেলার বিরাম নেই। কেউ স্লিপের উপর চেপে চেঁকি চেঁকি খেলছে, কেউ দোলনায় দুলছে বিপর্যস্ত ভাবে,

কেউ না মই বেয়ে উপরে উঠে সর সর করে নেমে আসছে বিপুল বেগে। নির্মলের মুখ ছিল এই খেলার দিকে, কিন্তু দৃষ্টিটা আত্মস্থ, বেশ চিন্তাগ্রস্ত। নির্মল জানত না যে এখানে কেউ তাকে লক্ষ্য করছে। টের পেলে নিশ্চয়ই সে উঠে যেত।

মায়ারা ওধারের বেঞ্চ থেকে এসে বলল। মায়া আর বিপিনবাবু! পরচুলা পরা বিপিনবাবুকে ঠিক চেনা যাচ্ছে না। মাথায় একটা ব্যাপারস্যাপার টুপি দিয়েছেন। দিনের বেলায় ধরা পড়বার ভয় কম। নির্মলের সঙ্গে কী করে আলাপ করা যায়, দশজনের শ্রবণ বাঁচিয়ে আমরা সেই কথা আলোচনা করছিলাম।

বিপিনবাবু এক সময় নির্মলের কাছে উঠে গেলেন। তার বেঞ্চির একটা ধারে বসে একটুখানি কাশলেন। এই শব্দটুকুতেই তাঁর উদ্দেশ্য সফল হল। নির্মল চমকে উঠে সোজা হয়ে বসল। চিন্তার জগৎ থেকে সে বাস্তবে ফিরে এসেছে।

বিপিনবাবু বললেন : বিরক্ত করলাম না তো?

বিরক্ত!

বিরক্তই তো, একা বসে আপনি হয়তো কত কী ভাবছিলেন—

নির্মলের দৃষ্টি হঠাৎ কঠিন হল, বলল : কে বলল আমি কত কী ভাবছি?

আমরা যে রোজ আপনাকে লক্ষ্য করছি।

রোজ?

কোন অপরিচিত ব্যক্তির এই অহেতুক কৌতূহল নির্মল সৌজন্যহীন অভদ্রতা বলে মনে করে। একটা কঠিন উত্তর দিতে গিয়েও থেমে গেল।

বিপিনবাবু বললেন : মায়ার ধারণা আপনি বাঙালী নন, আর আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

বলেই তিনি মায়াকে ডাকলেন।

মায়া এই আহ্বানের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। শাড়ির আঁচলখানা সামনের দিকে টেনে এগিয়ে এল। বিপিনবাবু বললেন : কার কথা ঠিক হল এইবারে দেখ। ভদ্রলোক একেবারে খাঁটি বাঙালী। গায়ে পড়ে কথা কইছি বলে রাগ করছেন।

দুহাত জুড়ে মায়া নির্মলকে নমস্কার করল : রাগ করবার কথাই যে।

কেন?

আপনি হয়তো কোন গুরুতর সমস্যার কথা ভাবছেন—

সেই এক কথা। নির্মল বাধা দিয়ে বলল : একা একা হাসতে শুরু করলে কি আপনারা পাগল ভাববেন না?

মায়া নির্মলের পাশেই বসে ছিল। পুলকে উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠল। বলল : সে আরও কৌতুকের হত।

এই হাসিতে নির্মলের উষ্মা অনেক নেমে গেল। বিপিনবাবু তা লক্ষ্য করে বললেন : আপনার চোখে মুখে দার্শনিকের মতো গাম্ভীর্য, তাই দেখেই আমরা আন্দাজে ভয় পেয়েছি।

মায়া বলল : বাবাকে আমিই সাহস দিয়েছি। বাবার চেহারাই বা দার্শনিকের মত নয় কিসে।

এবারে নির্মলও হাসল।

বেলা শেষের এই সোনালি রোদে বুঝি একটু নেশা আছে। মেঘে যেটুকু জল ছিল, তা ঝরে গেছে। এখন শুধু নির্জলা রোদ। পাহাড়ি পরিবেশে এই উত্তাপেই তো নেশা ধরায়।

বিপিনবাবু বললেন : এত মানুষ থাকতে বসে বসে আপনাকে কেন লক্ষ্য করেছি, তার কারণ বলি। আপনি আমাদের পাশের হোটেলেই আছেন, আর বেরোন প্রায় আমাদের সঙ্গেই। কোনদিন আগে, কোনদিন পেছনে। কোন সঙ্গী নেই, কথাও বলেন না কারও সঙ্গে।

মায়া বলে উঠল : কথা না বলে আমরা এক মুহূর্ত থাকতে পারি নে।

গভীর বিস্ময়ে নির্মল বলল : আমি আপনাদের একদিনও লক্ষ্য করি নি।

মায়া বলল : করেছি আমি।

হাসতে হাসতে বিপিনবাবু বললেন : মেয়ে আমার —

নির্মল কথাটা শেষ করল : ভাল গোয়েন্দা হতে পারতেন।

মায়া এ কথায় চমকে উঠেছিল, তারপরে সহজ হয়ে

বলল : কোন কাজ আছে কি আপনার খোঁজে, কোন ডাকাডাকি বা ঘুমের ভঙ্গ ?

এবারে নির্মল চমকাল। একান্ত অন্যমনস্কভাবে বলল : না না, এ আমার চাঁচার কথা।

বিপিনবাবুর দুটিটা যে ভেলের মত, নির্মল তা লক্ষ্য করে নি।

বাড়ি ফেরবার পথে তাদের পরিচয় হল। মায়ার বাবা বিপিনবাবু উত্তরবঙ্গের এক আদালতে ওকালতি করেন। সরকার উকিলদের অবসর নিতে বাধ্য করেন না। তাই তিনি এখনও কাজ করছেন। বক্তৃতার ক্ষমতা ফুরিয়েছে বলে এখন শুধু পরামর্শ দেন। চারিদিকে চা বাগানগুলো চলছে বলে তিনিও চলছেন। নইলে বিপদে পড়তে হত।

নির্মল আশ্চর্য হচ্ছিল। সম্পূর্ণ অপরিচিতের কাছে কি নিজের অসঙ্গলতার কথা এমন অকপটে বলা যায়! অপরিচিতের কাছেই বুঝি যায়।

বিপিনবাবু মায়ার কথাও বললেন। মায়া তাঁর একমাত্র সন্তান নয়। তাঁর শেষ সন্তান। আর সব ছেলেমেয়েরা বিয়ে-থা করে ঘোর সংসারী হয়েছে। বাপের শেষ জীবনে এ মেয়ে ছাড়ছে না, ছায়ার মতো সর্বত্র ঘুরছে। মৃত্যুর আগে কি মায়াকে পাত্রস্থ করতে পারবেন না!

বিপিনবাবুর চোখ দুটো হঠাৎ ছল ছল করে উঠল।

নির্মল বুঝি অভিভূত হল। আত্মদানে যে নারী মহিমময়ী, নির্মল কি তারই একজনকে নিজের নিকটে দেখছে! পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে সে মায়ার দিকে তাকাল। সাঁচাচের সুন্দর আকাশের মতোই কি এই মেয়েটি রূপে রঙে রচিত হয়ে আছে! মায়ার মনে হল, নির্মল তাকে শ্রদ্ধা করতে শিখল সহজ-ভাবে।

দুপুরের আহারের পর নির্মল তার নিজের ঘরে ফিরে এসেছিল। উত্তরের জানালা খুলে দিয়ে গভীর মনোযোগে পড়ছে দৈনিক সংবাদপত্র। কাগজখানা কখন তার হাত থেকে খসে পড়ে গেছে খেয়াল করেনি। দুরন্ত ভাবনায় সে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। খোলা জানালা দিয়ে নির্মল বাইরে চেয়ে ছিল। দিগন্তে জেগে আছে রৌদ্রোজ্জ্বল কাঞ্চনজঙ্ঘার উদার বিস্তার। হঠাৎ এক খণ্ড মেঘ এসে রৌদ্রকে ঢেকে দিল। একটা গাঢ় নীল ছায়া এল সামনের দিকে এগিয়ে। নির্মল চমকে উঠল, অতর্কিতে দেহটা উঠল থরথর করে কেঁপে।

মায়া কখন এসে তার পিছনে দাঁড়িয়েছিল, নির্মল খেয়াল করেনি। তার কথা শুনে আর একবার চমকে উঠল। মায়া প্রশ্ন করেছিল : কী হল, অমন চমকে উঠলেন যে ?

নির্মলকে বড় অসহায় দেখাল। যেন তার একটা গভীর অপরাধ হঠাৎ ধরা পড়ে গেছে। মুখে তার কথা যোগাল না।

মায়া বলল : স্বপ্ন দেখছিলেন বুঝি ?

নির্মল হয়তো স্বপ্নই দেখছিল, তার প্রিয়তম বন্ধু মনোজের হত্যার দুঃস্বপ্ন। মানুষ খুন হতে সে কখনও দেখেনি। খুন হবার পরেও না। শুধু কাগজে পড়েছে, আর গল্প শুনেছে। কিন্তু এখন সে চোখ বুজলেই রক্ত দেখতে পায়। দেখে তাদের সংঘের একটা ঘরে মনোজ লুটিয়ে পড়ে আছে। মাথার খুলিটা ভেঙে মগজ গড়িয়ে পড়ছে সাদা আর গোলাপী রঙের। আর রক্ত। অন্যমনস্ক হলেই নির্মল চমকে ওঠে।

মায়া তখনও তার উত্তরের অপেক্ষা করছে। কিন্তু নির্মলের কথা সব এলোমেলো হয়ে গেল : স্বপ্ন! হ্যাঁ, না, স্বপ্ন কেন দেখব!

মায়া নাছোড়বান্দা। বলল : বাইরে থেকে দরজায় টোকা দিয়ে, ডেকে আপনার সাড়া পেলাম না। ভাবলাম, অবেলায় ঘুমোচ্ছেন, জাগিয়ে দেব। কিন্তু আপনি জেগেই ছিলেন, খুব অন্যমনস্ক।

নির্মলকে এ কথা স্বীকার করতে হল। কিন্তু কথা না বলে যে শুধু মাথা নাড়ল।

মায়া এগিয়ে এসে একখানা চেয়ারে বসল। হাসতে হাসতে বলল : আমার চেহারাটাই বোধ হয় পেত্নীর মতো। তাই ছায়া দেখেই চমকে উঠেছিলেন।

মায়ার হাসিটা বোধ হয় নির্মলের ভাল লেগেছিল। বলল : প্রশংসা শোনার বাসনা মেয়েদের সনাতন।

কিন্তু এখনও সে সহজ হতে পারেনি, এখনও তার মনে চলেছে দুরন্ত চিন্তার প্রতিক্রিয়া। সুযোগ পেয়েও সে সহজ হতে পারল না। নিঃশব্দে সে হাসল, প্রাণহীন শুষ্ক হাসি।

মায়া মেঝের দিকে চেয়ে খবরের কাগজটা দেখে নিয়েছিল। খোলা পাতার উপরেই মনোজ মিত্রের হত্যার মামলা। নির্মলকেও দেখল মনস্তাত্ত্বিকের অন্তর্ভেদী গভীর দৃষ্টি দিয়ে। লোকটার আচরণ সত্যই অদ্ভুত; তা না হলে এমন গম্ভীর হয়ে থাকতে কেন ভালবাসবে!

মায়া মেঝের কাগজখানা তুলে পাট করে রাখল। তারপর ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন করল: এবারে বেড়াতে বেরবেন তো, না এমনি করে ঘরে বসেই বিকেলটা কাটাবেন?

নির্মল তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল: সত্যিই খুব দেরি হয়ে গেছে।

দেরি এমন আর কী হয়েছে! কিন্তু আপনি তো এখনও চা খাননি!

চা!

মায়া হেসে বলল: বেয়ারা চা নিয়ে ফিরে গেছে। আমার মতো বেহায়া নয়তো, সাড়া না পেয়ে ঘরে ঢোকবার সাহস পায় নি।

মায়া বোধ হয় বেয়ারাকে ডাকতে যাচ্ছিল। তার দরকার হল না। বাইরে থেকে সাড়া দিয়ে সে নিজেই ভিতরে এল।

চা খেয়ে পথে বেরতে তাদের বেশি দেরি হল না। নির্মল বলল: আজকাল আপনার বাবা আসেন না তো?

মায়া হেসে বলল: তাঁকে তালে পেয়েছে ফুতে পাবার মতন। হোটেলের ঘরেই দিনরাত ঝাঁকিয়ে আছেন। তাসের সঙ্গে যত পয়সা পড়ছে, নেশাও তত ঘনিয়ে উঠছে।

নির্মল যেন আঁতকে উঠল। তারাও যখন অপদার্থ সংঘ খুলেছিল, তখন চা আর তাস দিয়ে সংঘের উদ্বোধন হয়। তারপর এল পানা আর মেয়েমানুষ। সকলের শেষে মদ আর মেয়ে। জুয়ার আড্ডা সরগরম হল, মাতলামি ছিটিয়ে উঠল ভিতরে ও বাইরে। সুযোগ বুঝে বাজে মেয়েরাও এল যোগসাজসের লোভে। এই অতীতটাকে নির্মল ভয় পায়, ওদের বাদ দিতে পারলে তার জীবনটা আজ অন্য রকম হত।

নির্মলের এই চমকানিটা মায়া লক্ষ্য করেছিল। কিন্তু এই নির্বিকার লোকটাকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই! শুধু সময় নষ্ট করা বই তো নয়।

চলতে চলতে মায়া অন্য কথা জিজ্ঞাসা করল: কী ভাবছেন?

অন্যমনস্কভাবে নির্মল বলল: মায়া মানুষের মন্ত বড় সম্পদ!

মায়া এ কথার সূত্র খুঁজে পেল না। বলল: হঠাৎ এ কথা কেন?

এই কথাই যে এখন বার বার মনে হয়। আয়নায় আমার নিজের চেহারা দেখে আমি চমকে উঠি। এমন খারাপ মায়া আমার কোনদিন ছিল না। এখন যেন একখানা কঙ্কাল ধরে বেড়াচ্ছি।

মায়া এ সবই লক্ষ্য করেছে। কারণও জানতে চেয়েছে অনেক বার অনেক ভাবে। কিন্তু উত্তর পায় নি। এবারে আর প্রশ্ন করে নির্মলকে বাধা দিল না। বরং নীরব থেকে তাকে বলবার সুযোগ দিল।

নির্মল আজ প্রস্তুত হল, বলল: আমি এমন ছিলাম না মায়াদেবী। 'অপদার্থ সংঘে' আমার চেয়ে বড় অপদার্থ আর ছিল না। কতকগুলো অলস বিলাসী ধনী অপদার্থকে নিয়ে যখন এই সংঘটা গড়ে তুলি, তখন এর ভবিষ্যৎটা দেখতে পাই নি। পরিণতিটা যে এমন ভয়াবহ হবে, তারও দুঃস্বপ্ন দেখি নি। সেদিন উচ্ছৃঙ্খল যথেচ্ছাচারকে নির্ভীক পৌরুষ বলে শ্রদ্ধা করেছি। সামাজিক নীতি ও চারিত্রিক দৃঢ়তাকে কুসংস্কার বলে বেপরোয়া নিন্দা করেছি। পিতা পথেকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, নির্বিকার চিত্তে অর্থ জুগিয়েছেন অকুণ্ঠ হাতে।

একটু থেমে বলল: ঘরে আর কেউ ছিল না যে বাধা দিতে পারত। মাকে হারিয়েছিলাম জ্ঞান হবার আগেই। জননীর শাসনে স্নেহে প্রহারে ও প্রশ্রয়ে যার দশটা শিশুর

চরিত্র যে ভাবে গড়ে ওঠে, আমার বেলায় তা হল না। যে আদর্শ অলকে। থেকে অনাচারকে একটা আতঙ্ক দিয়ে ঘিরে রাখে, সে আদর্শ আমার জীবনে প্রতিফলিত হল না। বাবা যখন বিয়ে করতে বললেন, আমি তখন বাবার বাইরের রূপ দেখে চিনে ফেলেছি। জীবনের সঙ্গী করে নেবার মত কোন প্রলোভন তার মধ্যে খুঁজে পাই নি।

আজ তারা জলাপাহাড়ের পথ ধরেছিল। সূর্য অস্ত গেছে, কিন্তু অন্ধকার গভীর হয় নি। বাড়ি ফেরার সময় হয়ে থাকলেও মায়া আজ বলবার প্রয়োজন বোধ করল। রাস্তার ধারে একটা টিনের চালা দেখে বলল: বেঞ্চিতে একটু বসা যাক।

নির্মল দাঁড়িয়ে পড়ল, তার ধ্যান যেন ভেঙে গেছে। বলল: আমি অত্যন্ত দুঃখিত মায়াদেবী—

মায়াদেবী নয়, শুধু মায়া।

নির্মল হাসল, বলল: অন্যমনস্ক ভাবে অনেক দূর চলে এসেছি। অন্ধকারে আর এগোন উচিত হবে না।

কিন্তু মায়া তখনই ফিরতে রাজী হল না, বলল: একটু জিরিয়ে নিই, তারপর ফিরব।

মায়াকে অনুসরণ করে নির্মল এসে বেঞ্চিতে বসল। কিন্তু কথা কইল না। কিন্তু মায়া আজ সব কথা শুনতে চায়। বলল: তারপর?

নির্মল তার গল্পের সূত্র হারিয়ে ফেলেছে। বলল: কী তারপর?

আপনি বিয়ে করতে রাজী হলেন না।

নির্মল ভাবল খানিকক্ষণ, তারপর বলল: আমার অত্যাচারের জীবন আজ শেষ হয়ে গেছে। আজ ভাবি, আমিও তো খুন হতে পারতুম মনোজের হাতে!

সমস্ত স্নায়ু একত্র করে মায়া শক্ত হয়ে বসল। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দিকে চোখ পড়তেই নির্মল থেমে গেল।

অনেক প্রত্যাশা নিয়ে মায়া তাকিয়ে ছিল। তবু নির্মল উঠে দাঁড়াল, বলল: চলুন, এবারে ফেরা যাক।

দিন কয়েক পরের কথা। এই কটা দিনের কথা মায়া বলবে না, বলতে পারবে না। সে নিতান্তই তার নিজের কথা, মায়া আর নির্মলের কথা। মায়ার জীবনে তা অক্ষয় হয়ে থাকবে। উজ্জ্বল হবে, ম্লান হবে না কোনদিন।

একদিন নির্মল বলল: আমাদের হোটেলে একজন মেয়ে মাস্টার আছে। সে তোমার সম্বন্ধে কী বলতে এসেছিল জান?

মায়া তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল পরের কথাটির জন্য।

নির্মল বলল: আমাকে সাবধান করতে এসেছিল। বলেছিল, মায়া মেয়েটার আচরণ খুবই সন্দেহজনক, ওকে বিশ্বাস করবেন না।

বলে নির্মল হা-হা করে হাসল।

বেদনায় মায়ার বুকের ভিতরটা সেদিন মুচড়ে উঠেছিল।

এ সব দুর্বলতার কথা থাক। মায়া শেষ দিনের কথা বলে তার কাহিনী শেষ করবে। অনেক দিনের পুরনো কাহিনী নয়, এ ঘটনা আজ দুপুরবেলায় ঘটেছে।

আকাশে তখন মেঘের আড়ম্বর। দুপুরের রোদ মেঘে ঢাকা পড়তেই শিরশির করে উঠল মায়ার সারা দেহ। পাহাড়ের নিচে থেকে অবিরত মেঘ উঠছে। বৃদ্ধেরা জানালা বন্ধ করে দিলেন, মাফলার দিয়ে ঢাকলেন কান দুটো। লাল নীল ছাতা হাতে মেমসাহেবরা বেরিয়ে এলেন নির্জন রাস্তার উপরে। মায়ার মনটাও দুলে উঠল। কেন দুলল, সেই জানে। ভাঙলা রঙের একখানা শাড়ির উপরে এই পাতটে ক্রোকটা চাপিয়ে সেও বেরিয়ে পড়ল। তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে ঠেলে উঠল পাশের হোটেলটায়।

দরজার শার্সিতে টোকা দিয়ে নির্মলের সাড়া পাওয়া গেল না। পর্দা সরিয়ে মায়া ঘরে ঢুকে পড়ল। নির্মল ঘুমচ্ছিল। তার বুকের উপরে খবরের কাগজটা ছড়িয়ে পড়ে আছে। মায়া নির্মলকে জাগাল না, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল এই মানুষটাকে। বুঝতে পারল যে তার দৃষ্টিতে নেই ক্রূর হিংসা। শিকারের উপর লাফিয়ে পড়বার আগে জানোয়ার যে চোখে তাকায়, সে দৃষ্টি তার নিবে গেছে। এই অসহায় মানুষটার জন্যে একরকমের অদ্ভুত মায়া জাগে। নির্মলের ডান হাত দিয়ে কাগজখানা চাপা ছিল। মায়া তা মুক্ত করে নিল।

সেই মামলা। কিন্তু মায়া আজ বড় অস্থির বোধ

করছে। ঘরের কোণের আরাম চৌকিটায় বসে কাগজখানা পড়তে লাগল। কে এক গণেশ হালদার তার জবানবন্দীতে নির্মলের নাম করেছে। বলেছে, বহু বড় উপেক্ষা করেও যারা প্রতি সন্ধ্যায় সংঘে আসত, তারা দুজনেই সেদিন অনুপস্থিত ছিল। নির্মল সেন আর মনোজ মিত্র।

কাগজখানা সরিয়ে রেখে মায়া ভাবতে লাগল। এইবারে হয়তো নির্মলের ডাক পড়বে। অসুস্থ শরীর নিয়েও তাকে পুলিশ ও আদালতের সামনে দাঁড়াতে হবে, খুনের মামলায় সামান্য খবর বলে সাধারণে যা উপেক্ষা করে, পুলিশের তদন্তের জন্য সেইটেই হয়তো সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সংবাদ।

এক সময় মেঘের আড়াল থেকে একটা শব্দ ভেসে এল—উড়ো-জাহাজের পাখার শব্দ। এই বাদলার দিনে কার শখ হল ওড়বার, এই ভেবে মায়া আশ্চর্য হল। জগতে পয়লাওয়ালা পাগলের তো অভাব নেই।

মায়া জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মেঘে মেঘে কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়াগুলো আজ আড়াল হয়ে গেছে। উড়ো-জাহাজও দেখা যাচ্ছে না। কাচের জানালা খুলে দিতেই অনেকক্ষণের অবরুদ্ধ মেঘ দুরন্তভাবে ঘরে ঢুকে পড়ল। শিরশিরে ঠাণ্ডা ধোঁয়ার মত ভিজে মেঘ। মায়া তাড়াতাড়ি আবার জানালাটা বন্ধ করে নিজের জায়গায় ফিরে এল।

উদ্দেশ্যহীনভাবে মায়া বসে নেই। হয় তো কিছু ভাবছে। বিপিনবাবুর কথা ভাবছে। ভদ্রলোক বড় বেশী তাড়া দিচ্ছেন। ভয় দেখাচ্ছেন। মায়া বড় বেশী সময় নিচ্ছে বলে অসন্তোষ প্রকাশ করছেন। মায়ারও আর ভাল লাগছে না। এই লুকোচুরির জীবনে কোন স্বাদ নেই।

মায়া সোজা হয়ে বসল। বিপিনবাবু ঠিকই বলেছেন, আগুন নকল হলেও ও নিয়ে খেলা করতে নেই। প্রেম প্রেম খেলা, বড় সাংঘাতিক খেলা। যত তাড়াতাড়ি পার, ও খেলা শেষ কর।

ছি ছি, বিপিনবাবু কি মায়াকে সন্দেহ করতে শুরু করেছেন! মায়া তো আজ নতুন চাকরি করতে আসে নি। এ খেলা না হয় প্রথমই হল। আর খুনের আসামীকে কেউ কি ভালবাসে। যার জীবনের দিন গোনা হয়ে আছে! পাকা গোয়েন্দা হয়ে বিপিন বাবু এ ভুল কী করে করছেন!

যাওভাবে মায়া উঠে দাঁড়াল, উঠে গেল ঘরের আর একটা কোনায়। সেখানে নির্মলের সুটকেশ আর হোল্ড অল গোটানো আছে। তৎপর হাতে মায়া সেই সুটকেসের লেবেল পরীক্ষা করল। তারপর হোল্ড অলটা নেড়ে চেড়ে সেটারও লেবেল বার করল। গর্বে মায়ার দুচোখ উঠল ঝিকমিকিয়ে। তারপরেই চমকে উঠল নির্মলের চীৎকারে।

নির্মল ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে উঠেছে। আতঙ্কে আর্তনাদ করে ওঠবার মত। তার দেহটাও কেঁপে উঠেছিল থর থর করে। মায়া ছুটে এসে দেখল, বিন্দু বিন্দু ঘামে তার কপাল ভিজে গেছে। উত্তেজনার শ্রান্তিতে সে তখনও বেশ হাঁপাচ্ছে।

মিনিট কয়েকের জন্য মায়া বেরিয়ে গেল। একটা বেয়ারাকে কফির ফরমায়েস করে নির্মলের কাছে এসে বসল। কম্বলে তার পা দুটো ঢেকে দিয়ে নিজের ডান হাতটা রাখল তার কোলের উপর।

বাইরে তখন ঝির ঝির করে বৃষ্টি নেমেছে, তার ছিটে এসে পড়ছে কাচের জানালার উপর। নির্মল শুয়ে শুয়ে তাই দেখতে লাগল।

এক সময় মায়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল: তোমার ঘরের দরজাটাই শুধু খুলে রেখেছ নির্মলবাবু, মনেরটা কি কোনদিন খুলবে না?

নির্মলের গভীর দৃষ্টি স্থির হল মায়ার ম্লান মুখের উপর। মেয়েদের মন নিয়ে নির্মল অনেক ছিনিমিনি খেলেছে, কিন্তু এ কথা কোনদিন ভাবে নি। এ রকম প্রশ্নের জবাব তাকে কারও কাছে দিতে হয় নি। নির্মল বিচলিত হল।

হোটেলের বেয়ারা এই সময় কফির ট্রে না আনলে নির্মলকে আরও বেশী পীড়িত হতে হত। মায়া তাকে অব্যাহতি দিল। এক পেয়ালা কফি ঢেলে বলল: এই নাও।

অনেকক্ষণ পরে মায়া আবার কথা কইল। বলল: আর বোধ হয় তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।

কেন?

কলকাতা থেকে জরুরি তার এসেছে, দিদি ডেকে পাঠিয়েছে।

দিদি কেন ডেকে পাঠিয়েছে, মায়া তা বলল না। নির্মলও জানতে চাইল না। দিদি আর একবার মায়াকে ডেকেছিলেন। ভাল পাত্র আছে, তারা দেখবে। এবারেও বোধ হয় তাই। কিংবা অন্য কিছু।

মায়া বলল: পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে যেতে আমার আজকাল ভয় করে। শকরিগলি ঘাট হয়ে ঘুরে যেতে কষ্টের সীমা নেই।

নির্মল বলল: প্লেনে যাচ্ছ না কেন?

মায়া খুশিতে বলে উঠল: ঠিক বলেছ, প্লেনের কথা আমার মনেই ছিল না।

ভারত বিভক্ত হবার পর নূতন বিমানঘাঁটি খোলা হয়েছে বাগডোগরায়। পাকিস্তানের ভিতর দিয়েও যাতায়াত তখনও নিষিদ্ধ হয় নি। কিন্তু রেলে যারা ভয় পান, তাঁরা বিমানে উড়ে আসছেন। তারপর মোটরে উঠছেন দার্জিলিঙে।

কিন্তু টিকিট পেতে অসুবিধে নেই তো?

নির্মল বলল: কলকাতায় শুনেছি অসুবিধে হয় না।

তবে হয়তো ফিরেও আসতে পারব।

বলে আর এক পেয়ালা কফি ঢালল। নিজে নিল, নির্মলকেও দিল। তারপর বলল: আজ তুমি নিশ্চয়ই কোন দুঃস্বপ্ন দেখেছ। কিছুতেই অস্বীকার করতে পারবে না।

নির্মল এবারে স্বীকার করল, বলল: হ্যাঁ।

মায়া তার চোখের দিকে চেয়ে আছে। তাই দেখে নির্মল বলল: সত্যিই দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম।

মায়া আরও বেশী জানতে চায়, বলল: তুমি বড়ই চাপা স্বভাবের।

নির্মল হেসে বলল: অসুখ কিনা, কথা কইতে ভয় পাই।

কেন?

কী বলতে কী বলে ফেলব—শেষে হয়তো: অসুখটাই বেড়ে যাবে।

মায়া হাসল।

লজ্জা পেয়ে নির্মল বলল: স্বপ্নে আজ মনোজকে দেখছিলাম, সে আমার চার পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর বলছে, একা মদ খেতে তার আর ভাল লাগছে না। আমাকে কাছে পেতে চায়, যেমন আগে ছিলাম।

মায়া নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে, আর নির্মলের চোখ দুটো হঠাৎ ঘোলাটে হয়ে গেল। পাথরের চোখের মত দৃষ্টিহীন স্থির। তবু মায়া কথা কইল না।

নির্মল হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, বলল: আমি পাগলা হয়ে যাব মায়া, আমি আর সইতে পারছি না। চোখ বুজলেই আমি একটা কাঠের খুঁটি দেখতে পাই, সাদা আর কালোয় ডোরা-কাটা তার রঙ। একটা বালির বস্তা ঝুলিয়ে দড়িটা মজবুত কিনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এ একটা দিশারিকা মায়া, এর হাত থেকে নিষ্কৃতি না পেলে আমি সত্যিই পাগল হয়ে যাব।

এর পরে মায়া তার কর্তব্য শেষ করল। সদলবলে বিপিনবাবু এসে নির্মলকে ধরে নিয়ে গেলেন।

তারপর?

তারপর আর কী! নিজে হাতে নির্মলকে আমি ফাঁসি কাঠের দিকে ঠেলে দিয়েছি? লিখে দিয়েছি, নির্মল ট্রেনে আসেনি দার্জিলিঙে, এসেছে উড়োজাহাজে উড়ে। খাতা আর বিছানায় তার প্রমাণ আছে। একেবারে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে, তাইতেই ফাঁকি দিতে পেরেছে সবাইকে। সব সত্য লিখেছি। একটুও গোপন করিনি। কিন্তু—

কিন্তু কী?

সবচেয়ে বড় সত্যটাই আমি লিখতে ভুলে গেছি।

বুঝলাম। কিন্তু এত বড় পাপকে তুমি প্রশ্রয় দেবে?

দৃঢ় কণ্ঠে মায়া বলল: নির্মল তো পাপ করেনি সঞ্জয়বাবু, খুন করে সে মানুষ হয়েছে। মনোজকে হত্যা না করলে সে নিজে কোনদিন মানুষ হতে পারত না।

আমাদের পৃষ্ঠপোষকদের

শারদীয় প্রীতি-সম্ভাষণ

জানাই

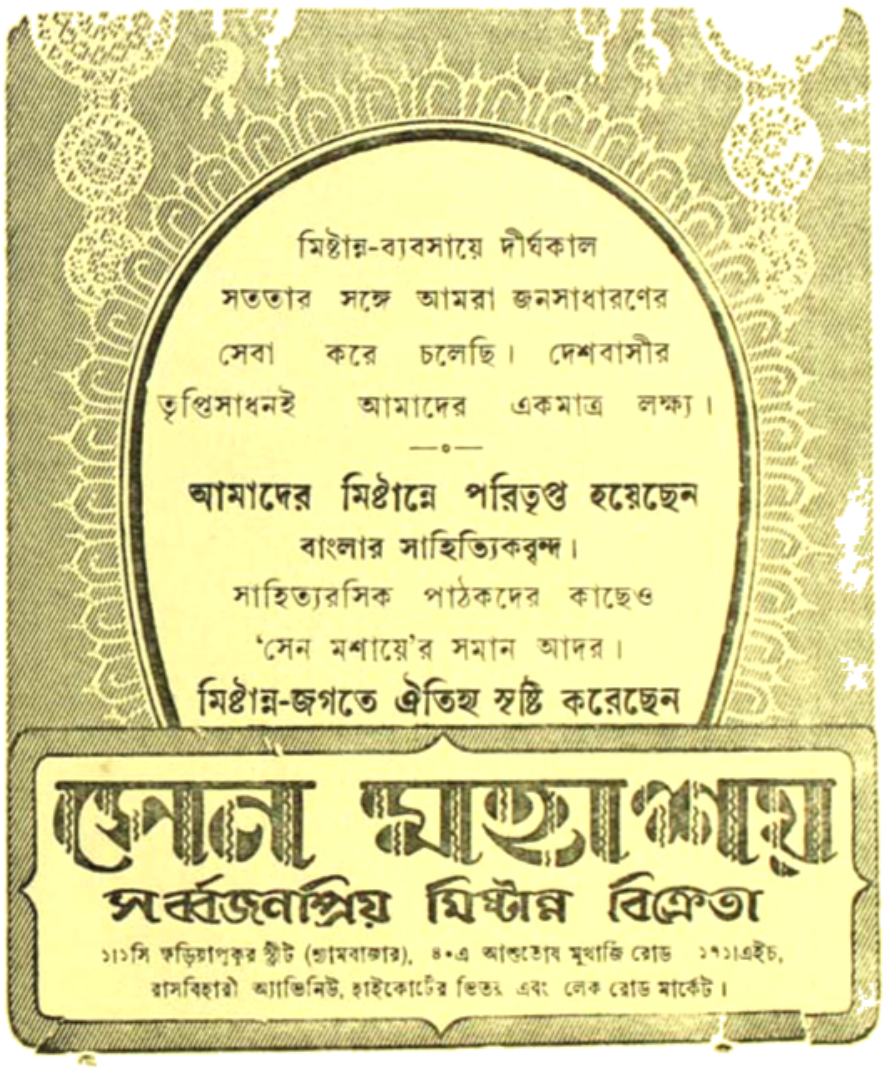

টেলিফোন : ৪৪-১-২২ , ১১-৬৪২২

আমার হাসি পেল তার কথা শুনে, কিন্তু তার বিশ্বাসের পরিমাণ দেখে হাসতে সাহস পেলাম না।

আমাদের হোটেল ঘুমিয়ে পড়েছে, হয়তো গোটা লাজিলিঙ সহরটাই পড়েছে ঘুমিয়ে। জেগে জেগে আমরা দুজন জীবনের খেই খুঁজছি।

অনেকক্ষণ পর মায়া বলল: নির্মলকে আপনি বাঁচাবেন তো?

চিন্তিতভাবে আমি বললাম: সবই তো তুমি বলে দিয়েছ।

না না সঞ্জয়বাবু, সব আমি বলিনি। বলিনি যে বিপিনবাবু জোর করে এই সব কথা লিখিয়েছেন, আর—

আর কী?

আর নির্মলের, বাঙ্ক বিছানার উপরের লেবেল আমি নিজে হাতে সেঁটে দিয়েছি। বিপিনবাবুর কথায় আমার নিজের লেবেল তুলে নিয়েছিলাম।

তারিখ?

তারিখ লেখা আছে কিনা জানিনে, নিজের ক্ষতির কথা বুঝতে পেরে খানিকটা আমি ছিঁড়ে দিয়েছি।

পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। নির্মল যে খুন করেছে তার কোন প্রমাণ নেই। খুনের কোন কারণও খুঁজে পাওয়া যায়নি। নির্মল ট্রেনে না এসে উড়োজাহাজে এসেছে প্রমাণ হলে খুনের সময় সে কলকাতায় ছিল সেইটুকুই মানতে হবে। নির্মলের আতঙ্কের কথা শুধু মায়া জানে। মায়ার জবানবন্দীর উপরই সব নির্ভর করবে। বললাম: চাকরিতে ইস্তফা কেন দিলে।

লোভের কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্য। বিপিনবাবুরা আমাকে অনেক লোভ দেখাবে।

চাকরিতে বহাল থাকলে তোমার কথার দাম বেশী হত।

কিন্তু নির্মল আমাকে বিশ্বাস করত না। আমাকে সে অবিশ্বাস করলে আমার বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা নেই। আমি এখন কী করব সঞ্জয়বাবু।

নির্মলকে একটা সংবাদ দাও। তোমার কাছে যা বলেছে, সে কথা যেন আর কাউকে না বলে।

মায়ার দৃষ্টি তখন আনন্দে ছলছল করছে। বলল: আর কিছু বলব না?

ব'লো, আমি তার ভাবনা ভাবব, সে ভাবুক তোমার কথা।

মায়া উঠে দাঁড়িয়েছিল। চোখের জল গোপন করতে সে তার মুখ ফিরিয়ে নিল। অদ্ভুত এক প্রসন্নতায় আমার মন তখন ভরে গেছে। বললাম: চল, তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি।

মায়াকে তার হোটেলে পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে আমি পৃথিবীর অন্য রূপ দেখলাম। মেঘমুক্ত নির্মল আকাশের অগণিত তারা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। পথ অন্ধকার নয়। নক্ষত্রের আলোয় দেখা যাচ্ছে প্রশস্ত রাজপথ। কিন্তু এই কি জীবনের পথ? এই পথেই কি যাত্রা সার্থক হবে? আমি কি ভুল করলাম না?

ভুল নয়, এ তুমি ভালই করেছ।

নিঃশব্দ পদক্ষেপে কল্যাণী কখন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল খেয়াল করিনি। মুগ্ধ বিস্ময়ে আমি তার মুখের দিকে তাকালাম।

কল্যাণী বলল: আর তোমাকে 'আদালতের আত্মকথা' লিখতে হবে না, এবারে তুমি মানুষের কথা লিখতে পারবে।

সেই তো পরম কথা।

সমাপ্ত

আজ অনেক দিন পরে পণ্ডিত মশাইকে মনে পড়ল। সূর্য ডুবে গিয়ে যেই সন্ধ্যাতারাটা উঠতো তখনই আসতেন তিনি। খড়মের খটখট শব্দের সঙ্গে মিলত তাঁর উদাত্ত কণ্ঠধ্বনি।

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধু নক্তম্ উতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমান্ অস্তু সূর্যঃ। ওঁ।

কি অপূর্ব কবিতাটা। মধুমতী বলত, আমার এত খারাপ লাগে সংস্কৃত জানি না বলে। কি সুন্দর!

তোমার তো ভালই লাগবে। পণ্ডিত মশাই দাওয়ায় তাঁর জন্য পেতে দেওয়া ছোট চৌকিটার ওপর বসতে বসতে বলতেন, সেইজন্যই তো তোমার নাম দিয়েছি মধুমতী।

সত্য কথা। মধুমতী নামটি পণ্ডিত মশাইয়েরই দেওয়া। নইলে বাবা বলেন সুপ্রিয়া, মা ডাকেন খুকী আর প্রতিবেশিনীরা ডাকে বুড়ি নামে। সে নাকি ছেলেবেলা থেকে খুব পাকা ছিল, তাই তার নাম বুড়ি।

কবিতাটার অর্থ কি পণ্ডিত মশাই? ওঁর কাছ ঘেঁষে মাটিতেই বসে পড়ত মধুমতী।

অর্থ? এক মিনিট চোখ বুজে থাকতেন পণ্ডিতমশাই, বোধহয় মনে মনে কবিতাটা আর একবার আউড়ে নিতেন। তারপরে বলতেন, বায়ু মধু বহন করিতেছে। নদী সিন্ধু মধু ক্ষরণ করিতেছে। ওষধি বনস্পতিসকল মধুময়, রাত্রি, উষা, পৃথিবীর ধূলি মধুর মত হোক, সূর্য মধুময়।

মধু, মধু—পণ্ডিত মশাই চোখ বুজে কি রকম টেনে টেনে উচ্চারণ করতেন যে মধুমতীর মনে হত সত্যই সমস্ত পৃথিবী মধুময়।

আর তুমি হচ্ছ মধুমতী, হেসে ওর দিকে তাকাতেন পণ্ডিত মশাই।

শুধু আমি কেন পণ্ডিত দাদু, মধুমতী উত্তর দিত, সব মেয়েরাই তো।

হ্যাঁ, সব নারীই। পণ্ডিতমশাই উত্তর দিতেন। উনি মেয়েদের উল্লেখ করতেন নারী বলে।

সব নারীই মধুময়ী, তাই পৃথিবী মধুময়। তাই দ্যুলোকে, ভূলোকে, আকাশে বাতাসে, স্থলে জলে এত মধু।

না, না, না, চাপা আর্তনাদ করে ওঠে মধুমতী, পৃথিবীতে মধু নেই, শুধু বিষের ধোঁয়া।

বায়ু বিষ বহন করিতেছে। নদী, সমুদ্র বিষ ক্ষরণ করিতেছে। রাত্রি, উষা, প্রভাত, মধ্যাহ্ন বিষময়। বিষ, বিষ, সর্বত্র বিষ। আর···

কিরে, উঠবি না! মা ঘরে ঢোকেন।

কোন উত্তর দেয় না মধুমতী। কাল রাত্রে সে যা বলেছে যদি তাই করে সেই ভয়ে মা এসেছেন খোঁজ করতে—বিষ···বিষ···সর্বত্রই বিষ। এমন কি মায়ের মনেও। আর আজকের নারীরা সকলেই বিষকন্যা।

—কি ভাবছিস রে? আবার প্রশ্ন করেন মা।

—ভাবছি, সেকালে তিল তিল বিষ খাইয়ে বিষকন্যা তৈরী করত, না মা। মা চুপ করে থাকেন।

—সেই বিষকন্যারা কি করত? অত্যাচারী, অনাচারীকে শেষ করে দিত। কিন্তু, আমরাও তো আজকাল এক একটি বিষকন্যা হয়েছি, আমরা কেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারি না।

এসব কথা পরে হবে, অস্থির কণ্ঠে মা বলেন, আমি ভাত চাপিয়ে এসেছি। ভাত ফুটতে ফুটতে আমাকে বাটনা বেটে, রুটির আটা মেখে নিতে হবে। উনুন কামাই দিতে পারব না।

মধুমতী চোখ বুজেই বলতে যাচ্ছিল, বেশ তো, যাও না। কে তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছে।

কিন্তু—বলবার আগেই সে তাকায়। আর কিছু বলা হয় না।

মায়ের মুখটা কি রকম দীন আর অসহায় দেখাচ্ছে। গাল দুটো বসে গিয়েছে বলেই বোধহয় নাকটা অত লম্বা, চোখের কোণে কালি, শীর্ণ দেহ। বিষের জ্বালায় জ্বলে জ্বলে আজ মা এমন হয়ে গেছেন।

আর, সেই বিষের জ্বালায় সবে জ্বলতে শুরু করেছে মধুমতী। সেও ঠিক এমনি হবে। আর বেশী দেরী নেই।

বেলা অনেক হল। করুণকণ্ঠে মা বলেন।

বেলা অনেক হল। সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। এখন ওঠ, উঠে চান করে খেয়ে অফিসে যা। কিন্তু জোর দিয়ে সে কথা বলতে সাহস নেই মায়ের। ভিখারিণীর মত কণ্ঠে মিনতি জানাচ্ছেন।

এ মা, সেই মা—যে মায়ের অপ্রতিহত প্রতাপে তারা সবাই এমন কি বাবাও কাঁপতেন। যাঁর কথাই ছিল হুকুম।

কিন্তু কেন? কাল সুস্পষ্ট অস্বীকৃতির পরও আবার কেন তাকে সেখানে পাঠাতে চাইছেন মা। কেন!

বিরক্তিতে ও ঘৃণায় মায়ের প্রতি মন বিমুখ হয়ে ওঠে।

এত স্বার্থপর! এত নীচ!

স্বার্থপর! সত্য কথা। নীচতাও সত্য। কিন্তু তা কি তাঁর নিজের জন্য। সমস্ত দিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর এইটুকু আলোচালের ভাত আর সেদ্ধ খান। কোন দিন কুটনোর খোসা দিয়ে একটি চচ্চড়ি। রাত্রে রুটি খেলে মায়ের অম্বল হয়, তাই—

মধুমতী আর ভাবতে পারে না। লাফিয়ে উঠে পড়ে বিছানা থেকে।

মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, মা, তোমার কি কি কাজ বাকী আছে বল, আমি করে দিচ্ছি।

মুহূর্তের মধ্যেই একটু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মায়ের সেই দীন অসহায় করুণ মুখ। হেসে বলেন, তোমাকে আর কোন কাজ করতে হবে না, চা রেখেছি, চা খাও।

চা! ভ্রূ কুঁচকে এক মিনিট ভাবে মধুমতী। টেবিলের ওপরে রাখা টাইমপীস ঘড়িটার দিকে

তাকায়। নটা বাজে। কাল রাত্রে ঘড়ি মিলিয়ে রেখেছে। তার মানে সাড়ে আটটা। রোজ রাত্রে আধঘণ্টা করে ফার্স্ট হয়।

সাড়ে আটটা বেজে গিয়েছে এবার চান করে ভাত খাব। অন্যদিকে তাকিয়ে মধুমতী বলে, অফিসে যেতে হবে তো।

এদিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে ভাবে মা চলে গিয়েছেন। তাই আর মুখ ফেরায় না। অন্যদিকেই তাকিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পরে ফিরে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন মা। দুচোখে জলের ধারা। এক মিনিট সেদিকে স্থির চোখে তাকায় মধুমতী। মায়ের চোখে জল!

সবই বুঝতে পেরেছেন মা। বুঝতে পেরেও···

ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে মাথাটা। দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

চানের ঘরে ঢুকে পড়ে। ভাগ্যে চানের ঘরটা খালি ছিল। কল খুলে মাথা পেতে অনেকক্ষণ বসে থাকে মধুমতী।

কিগো, কতক্ষণ চান করবে?

দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা। আর একটু জোরে ধাক্কা দিলেই দড়ি লাগানো ফাঁসটা খুলে যাবে।

কলটা বন্ধ করে দেয় মধুমতী। বলে, কে?

ততক্ষণে বাইরে সমানে চীৎকার চলছে, কলটা খুলে বসে আছে। কতক্ষণ লাগে এইসব মেয়েদের চান করতে। আর কেউ চান করবে সেদিকে হুঁশ নেই গা।

দোতলার গিন্নী। নিজে এক বালতি কাপড় নিয়ে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চান করবে, কিন্তু আর কেউ যদি পাঁচ মিনিট কলঘরে থাকে তাহলেই চেঁচাতে শুরু করবে। এমন কি জোরে জল পড়ার শব্দ হলেও উনি রেগে যান। যেন কলটা ওঁর। অথচ উনিও একজন ভাড়াটে মাত্র।

বাড়ির সবাই ওঁকে ভয় করে। ওঁর কাংস্য-ধ্বনি শুনলেই তাড়াতাড়ি সেরে নেয় নিজের নিজের প্রয়োজন। মধুমতীর তো অর্ধেক দিন চানই হয় না। ওর চান করবার সময়ই উনি নামবেন আর মধুমতী কোনরকমে চান সেরে বেরিয়ে আসে কলঘর থেকে।

আজও ওঁর কণ্ঠ শুনেই অভ্যাসমত কল বন্ধ করে দিয়েছিল সে। কিন্তু পরক্ষণেই ভ্রূকুটি একবার কুঁচকে সে আবার কল খুলে দেয়।

দোতলার গিন্নী নিশ্চিন্তমনে মধুমতীদের পাশের ঘরের ভাড়াটে মণির মার সঙ্গে গল্প করছিল। পুনরায় জলের শব্দে চমকে উঠে এক মিনিট কোন কথা বলতে পারেন না। পরক্ষণেই তারায় উঠে যায় তাঁর কণ্ঠ।

আবার কল খুললো কি আস্পর্দ্ধা। বেধবা মায়ের চাকরাণী মেয়ে···

হঠাৎ দরজা খুলে বেরিয়ে আসে মধুমতী। ভিজে কাপড়, চোখ দুটো জ্বলছে। দোর একটু ফাঁক করে অমৃচ্চ তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠে বলে, আস্পর্ধা আমার না আপনার। আমার চান করা হলেই আমি বেরুব, আপনি এখানে মিথ্যে চেঁচাবেন না।

চেঁচানো দূরে থাক, দোতলার গিন্নীর কথা বলবার ক্ষমতাও লোপ পেয়ে যায়। অবাক হয়ে তিনি ভাবেন, তাঁর কান খারাপ হয়ে গেছে, না মধুমতীরই মাথা খারাপ হয়ে গেল। নইলে মধুমতী তাঁকে এই কথা বলল। মধুমতী! বাড়ির সবচেয়ে গরীব ভাড়াটে। বিধবা মায়ের চাকুরী করা মেয়ে। একতলার কোণে যে ঘরটায় ওরা থাকে ওপরের সে রকম ঘরে তিনি রান্না করেন। সেই মেয়ে তাঁকে এইকথা বলল! সেদিন, সমস্ত দিনই তাঁর গলা শোনা যায় না।

অবাক হয়ে যায় অপরাপর ভাড়াটেরাও।

সকলেরই হাতের কাজ থেমে যায় একটুক্ষণ। মণির মা চট করে ঘরে ঢুকে পড়ে। দোতলার গিন্নীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস হয় না তার।

চুল মুছতে মুছতেই মধুমতী ডাকে, মা, ভাত দাও। দেরী হয়ে গেছে।

দেরী যে হয়ে গেছে তা না জানেন। তাই শুধু ভাত বেড়ে নয় ডাল দিয়ে ভাত মেখে পাশে ভাজা দিয়ে রেখেছেন। তাড়াতাড়ি খেয়ে নেয় মধুমতী।

ওর খাওয়া হয়ে গেলে মা আস্তে আস্তে বলেন, ওঁকে ওরকম বলতে গেলি কেন?

দেখলে তো কি রকম চুপ করে গেল—উত্তর দেয় মধুমতী, আজ থেকে ঐ রকম ভাবেই সবাইকে বলব।

চুল বাঁধা শেষ করে শাড়ী জড়াতে জড়াতে বলে, তুমিও বল।

মায়ের অবাক-হওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে মধুমতী—অমরদার কথা মনে আছে। অমরদাই তো বলত··· ওরে, বাস নটা। মা, চলি।

ছাতাটা হাতে নিয়ে ব্যস্তভাবে নেমে যায়।

চুপ করে বসে থাকেন মা। উনুন জ্বলে যাচ্ছে সে খেয়ালও নেই। বারবার মনে পড়তে থাকে মধুমতীর কাল রাত্রের কথাগুলি, আর আজ সকালে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওর যাওয়া।

মধুমতী তো যেতে চায় নি। সকালে তাই ও অতক্ষণ বিছানায় পড়েছিল। শুধু তাঁর দিকে তাকিয়েই শেষে যেতে রাজী হল ও। হ্যাঁ, তিনিই ওকে জোর করে পাঠিয়েছেন। দুচোখ বেয়ে সমানে জল পড়তে থাকে মায়ের। তিনিই ওকে পাঠালেন, সব বুঝে, তবুও।

হাত দুটো কোলের কাছে নিয়ে আকুল কণ্ঠে বলেন, ঠাকুর, ওকে রক্ষা করো। ঠাকুর—

ঠাকুর! তিনি কি ঈশ্বরকে মানেন। বিশ্বাস করেন সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে। কাল রাত্রেও তো তিনি বলেছিলেন, ঠিক আছে, ভগবান একভাবে চালিয়ে নেবেন, কিন্তু সকালে উঠে সে বিশ্বাস রইল কোথায়? মেয়েটাকে জোর করে ঠেলে পাঠিয়ে দিলেন।

আজ মধুমতী তাঁকে উপদেশ দিল। সেদিনের সেই ছোট্ট মধুমতী। আর কি সেই উপদেশ। বড়দের মেনো না, লোককে যা তা করে কথা শুনিয়ে দিও।

তা তো দেবেই, দুনিয়ার রং পালটে যাচ্ছে যে। তিনি মা হয়ে জেনেশুনে মেয়েকে পাঠালেন আর মেয়ে এ রকম উপদেশ দেবে না!

খুকী জিজ্ঞাসা করল, অমরের কথা মনে আছে কি না! অমরকে কি কখনও ভুলতে পারে।

হিংসা আর হিংস্রতার জন্যই পৃথিবী আজ এত উন্নত হয়েছে—অমর বলত।

ওরাই তর্ক করত—অমর, খুকী আর খুকীর বাবা। পাশে বসে বসে সুপুরী কুচুতে কুচুতে কিংবা খই বাছতে বাছতে ওদের গল্প শুনতেন তিনি। মাঝে মাঝে যোগও দিতেন।

অমরেরই বেশী আগ্রহ ছিল তাঁকে আলোচনায় টেনে নেবার। প্রত্যেক কথাতেই ও বলত, জানেন কাকীমা।

হ্যাঁ, মাকে নিজের দলে নিয়ে দল ভারী করছে—খুকী হেসে বলত। নইলে তো আর পারবে না আমাদের সঙ্গে।

তোমাদের নয়, বল তোমার সঙ্গে। তুমিও তো কাকাবাবুকে টেনে নিয়েছ নিজের দল ভারী করবার জন্য।

খুকীর বাবা চিরদিনই ছিলেন ওই একরকম।

তিনি বুঝতেন না যে এটা অমর আর খুকীর তর্ক নয়, ভাবের ঝগড়া। দুজনে এত বেশী মিল যে একটু ঝগড়া না করে পারে না।

না না, সুপ্রিয়া আমাকে টানে নি—হুম করে বলে বসতেন খুকীর বাবা, খুকীকে উনি 'সুপ্রিয়া' বলতেন তো, এই নিয়ে কত তর্ক হয়েছে। মা বলতেন, একটা মেয়ের কটা নাম। তুমি ডাকবে সুপ্রিয়া, আমি খুকী, পণ্ডিতমশাই মধুমতী।

থাক না—খুকীর বাবা হাসতেন, আমার একটা মেয়ের একশ নাম। তোমার তাতে কি। তুমি কেন হিংসে কর। আমার মেয়ে একাই একশ। জানই তো, শতপুত্র সম কন্যা।

না, না, সুপ্রিয় আমাকে টানে নি, উনি বলতেন, আমি নিজেই যোগ দিলুম। অমর, তুমি ভুল বলছ।

এবারে অমর সোজা হয়ে বসত। রুমাল বার করে মুছে নিত মুখ, বলত, কেন?

আদিম যুগ থেকে আজকের মানব—পৃথিবীর এই অপূর্ব বিবর্তন সাধিত হয়েছে প্রেমে।

প্রেম! হেসে উঠত অমর, প্রেম কোথায়? সব জায়গায়ই তো হিংসা আর হিংস্রতা। দেখুন, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। সূর্য থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এল পৃথিবী। ঘুরছে—ঘুরছে—হিংস্রভাবে ঘুরেই চলেছে। প্রেম নয়, হিংস্রতায় ঘুরছে। তার পরে, অনেকদিন পরে মনে হল বুঝি ঠাণ্ডা হল পৃথিবী। কিন্তু না, ঠাণ্ডা তো হয় নি। আবার টগবগিয়ে ফুটে উঠল পৃথিবীর নীচের জিনিসগুলি। পরস্পরকে শেষ করে দিতে চায়। ভূমিকম্প আর ঝড়—হিংসা হিংস্রতা, তার শেষে দেখা গেল মোটামুটি গড়ে উঠেছে পৃথিবী, সমুদ্র, পাহাড়, নদী, মাটি।

বাঃ, বেশ বলছ তো—হেসে বলতেন খুকীর বাবা।

বড় বড় জীব-জন্তুগুলি যারা নিজেদের দেহ নিয়েই নড়তে পারে না, অপেক্ষাকৃত ক্ষিপ্র জন্তুরা তাদের শেষ করে দিল। তারপরে এল মানুষ। হিংসা আর হিংস্রতায় সবার সেরা। হিংসার নাম সে দিল উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, হিংস্রতার নাম জীবনসংগ্রাম।

ওঃ। তুমি এইভাবে বোঝাতে চাইছ। হেসে উঠত খুকী, সেই পুরনো কথাই আধুনিক ভঙ্গীতে।

হিংসা আর হিংস্রতার যখনই বিস্ফোরণ হয় তখনই পৃথিবী এগিয়ে যায় কিছুটা। এক একটি মহাযুদ্ধ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক জিনিস দিয়েছে। আজ আমরা এটমবোমার অধিকারী।

পাশে বসে শুনতে শুনতে মা ভাবতেন, ছেলেটা যেন কি রকম। এমনিতে খুবই ভাল। অত সুন্দর চেহারা, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর। কিন্তু মতবাদগুলি যেন কি রকম। ও কি সত্যসত্যই বিশ্বাস করে পৃথিবী হিংসা আর হিংস্রতায় ভরা। ভালবাসা নেই, স্নেহ নেই, মমতা নেই।

এমনি খড়ম পায়ে আসতেন পণ্ডিতমশাই। মুখে ওঁর সেই প্রিয় কবিতা—মধু···মধু···। কি সুন্দর ধ্বনি, কি সুর। বড় ভাল লাগত পণ্ডিতমশাইকে।

মধু! মধু কোথায়—হঠাৎ হেসে উঠত মধুমতী, অমরদার মতে পৃথিবীতে শুধু বিষ। হিংসা আর হিংস্রতার বিষ।

যা বিষ তাই তো মধু রে। পণ্ডিতমশাই বলতেন।

তুমুল তর্ক বেধে যেত অমরের সঙ্গে পণ্ডিতমশাইয়ের। সবই ভাল কিন্তু ঐ একটা দোষ ছিল অমরের, বড় তর্ক করত। আর ও নিজে যা নয় তাই প্রমাণ করতে চাইত। পাশে একটা

পিঁপড়ে পড়লেও তাকে সযত্নে এড়িয়ে গেছে অমর—মারে নি, কিন্তু মুখে এমন ভাবে কথা বলত যেন দয়া মায়া স্নেহ মমতা কিছুই নেই ওর মনে।

এখন অমর কোথায় আছে কে জানে?

বাসস্টপে দাঁড়িয়ে মধুমতী ভাবছিল, এখন অমরদা কোথায় আছে কে জানে? আশ্চর্য! এই দু বছরের মধ্যে একবারও অমরদার কথা মনে হয় নি। এই পরিবেশে যেন অমরদার কথা ভাবাই যায় না।

আজ হঠাৎ মনে পড়ল। মরবার আগে না-কি পূর্বজন্মের স্মৃতি সব মনে হয়।

আজ মনে পড়ছে সেই উঁচু করে বাঁধানো তুলসীতলা—আর তার পাশের সন্ধ্যামণি ফুলগুলি। জ্যোৎস্নার আলোতে ফুলগুলি রঙীন পাথরের মত জ্বলতে থাকত। বাতাসে ভেসে আসত হাস্নাহানা, টগর, গোলাপ, গন্ধরাজের মিলিত গন্ধ। উঠোনে উঁচু করে বাঁধানো খানিকটা জায়গা—তার ওপর মাদুর বিছিয়ে বসত ওরা। বাবা, মধুমতী, মা, পণ্ডিতমশাই আর অমরদা।

অমরদা মুখে যতই বিষ আর হিংসার বক্তৃতা দিক না কেন ওকে কিন্তু ওই পরিবেশ ছাড়া মানাতো না। ওর বড় বড় চুল হাওয়ায় উড়ত, কথায় কথায় উচ্চহাসিতে সমস্ত পাড়া কেঁপে উঠত।

আশ্চর্য! ওর কথায় কেউ রাগ করত না। পণ্ডিতমশাইকে ও তো কতকিছু বলত—পণ্ডিত মশাই হাসতেন।

বাস এসে দাঁড়িয়েছে। কি ভিড়—কি ভিড়। বাসের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে চলন্ত ও ঝুলন্ত একটি লোকের পা এসে লাগল মধুমতীর গায়ে। জুতোপরা পা, বেশ জোরেই লাগল আঘাত। আঘাতের জন্য কিছু নয়—কিন্তু সাদা শাড়িটায় কালো ছোপ লাগল—এ দাগ কি সহজে যাবে।

সাদা শাড়িতে কালো ছাপ পড়লে সহজে ওঠে না। বড় বেশিরকম প্রকট হয়ে লোকের চোখে পড়ে—কিন্তু, ছাপ পড়তে পড়তে শাড়িটি যদি কালোই হয়ে যায়—তবে?

সেই ভাল। কালোই হবে সে। পড়ুক ছাপ তার দেহে মনে।

আর একটা বাস এসেছে। এতেও অসম্ভব ভিড়। কিন্তু তবু উঠতেই হবে—যেভাবেই হোক। মুখে 'সরুন সরুন' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে, পাশের লোকদের কনুইয়ের ধাক্কা দিতে দিতে এগিয়ে যায় মধুমতী। কয়েকটা লোকের কনুইয়ের ধাক্কা তার বুকে লাগে। পাদানীতে একটি পা রেখে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে কোমর থেকে বাকী অংশ কোনরকমে টেনে হিঁচড়ে ঢুকিয়ে নেয় মধুমতী। পেছনে এত চাপ যে মনে হয় কোমর থেকে পা পর্যন্ত বোধ হয় ছিঁড়ে পড়ে থাকবে।

যাক, ভেতরে ঢুকতে পেরেছে! দরজার সামনের ভিড়ের তুলনায় ভেতরটা অনেকটা ফাঁকা। তবুও পায়ের ব্যবহার করতে হচ্ছে না—লোকের চাপে চাপে এগিয়ে যেতে হচ্ছে।

একটি লোক—ময়লা জামা কাপড় পরা—বোধ হয় কারখানার শ্রমিক কিংবা মেথরও হতে পারে। মুখে বিকট গন্ধ—তারি কোণ ঘেঁষে একটুখানি জায়গায় দাঁড়ায় মধুমতী।

যতবার বাস থামছে—লোকটি ঝুঁকে পড়ছে। আর, ওর মুখটা এসে লাগছে মধুমতীর মাথায়।

দু'বছর। মাত্র দু'বছর আগেও কি নিজের জীবনের এই দৃশ্য দেখতে পেয়েছিল 'রূপশাল' গ্রামের মেয়ে মধুমতী সরকার। না সেই মধুমতীকে চিনতে পারছে আজকের বাসে দাঁড়িয়ে থাকা অফিসযাত্রী স্টেনোগ্রাফার মিস্ সরকার।

গ্রামের নাম রূপশাল; মেয়ের নাম মধুমতী।

মেয়ে কি রূপশাল গ্রামে একটিই ছিল? না। কিন্তু, মধুমতীর মত মেয়ে একটাই। এমন কি ওর সমবয়সী মেয়েরাও তাই বলত।

তুই হলি সবার সেরা। চোখ টেনে টেনে ওরা বলত।

কিসে সেরা!

রূপে, গুণে, বিদ্যেয়, বুদ্ধিতে।

রূপ, গুণ আর বুদ্ধির কথা বলতে পারছি না —কিন্তু বিদ্যে তো ম্যাট্রিক পর্যন্ত।

তাই বা কার আছে!

তা কারুর ছিল না সত্যকথা—অন্ততঃ গ্রামের আর কারুর ছিল না। আর ওদের কাছে গ্রাম মানেই তো জগৎ।

গ্রামের মধ্যে স্কুলবাড়িটাই সবচেয়ে বড় বাড়ি। আর ওইটাই একমাত্র দালান। জমিদার মশাই করে দিয়েছিলেন। একতলা দালান—'এল'-এর মত চেহারা। ছোট ছোট ঘর। প্রথম ঘরটা অফিস। প্রধান শিক্ষক ও একজন কেরানী বসেন। পাশেরটা মাস্টারমশাইদের বসবার ঘর। আর সবগুলি ঘরে ক্লাশ হয়। দালান ছাড়িয়ে একটু দূরে প্রকাণ্ড আটচালা ঘর। শিশুশ্রেণী থেকে শুরু করে ক্লাশ-টু পর্যন্ত ওখানে হয়।

মধুমতীর বাবা ছিলেন সহকারী প্রধানশিক্ষক। প্রধানশিক্ষক হবার মত ডিগ্রী তাঁর ছিল না—প্রকৃতপক্ষে প্রধানশিক্ষকের কাজ তিনিই করতেন।

এই অজ গ্রামে কেউ এসে থাকতে চায় না। থাকবার ঘর নেই, খাবার বন্দোবস্ত নেই। আর সবচেয়ে বড় কথা, মাইনের কোন স্থিরতা নেই।

গবর্নমেণ্টের সাহায্য ঠিক মত পাওয়া যায়, কিন্তু ছেলেদের বেতন অনিশ্চিত। অভিভাবকরা প্রায়ই চাষী। কাজেই, মাঠের ফসলের সঙ্গে সঙ্গে তাদের আয়ের হার ওঠানামা করে। ফসল তোলার সময় এক সঙ্গে দু'তিন মাসেরটা দিয়ে দেয়। কিন্তু, তার আগে কটা মাস মাস্টার মশাইরা কি করে চালাবেন! বেশী পীড়াপীড়ি করলে ছেলেকে নিয়ে যাবে স্কুল ছাড়িয়ে।

তাই, এই স্কুলে যাঁরা টিকেছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই এই গ্রাম ও আশেপাশের গ্রামের অধিবাসী ও প্রায়ই চাষী। একসঙ্গে থোক টাকা পেলে তাঁরা গরু, ছাগল কিনে রাখতেন, নিজেদের বাড়ির সংলগ্ন জমিতে বুনে দিতেন ফসলের বীজ। অনটনের সময় বাড়ির তৈরি বেগুন, লাউ, কুমড়োর তরকারী পেতেন, গরুর দুধ বিক্রী করতেন একটু দূরের গোয়ালার কাছে। আবার টাকা পেলে বাজার থেকে মাছ আসত, খাওয়ার পারিপাট্য শুরু হত।

এই রকম ভাবেই জীবন কাটিয়েছেন মধুমতীর বাবা প্রিয়নাথ সরকার। স্কুলের কাছেই ছিল ওদের বাড়ি। ছোট একটু বাগানের মধ্য দিয়ে পায়ে চলা পথ। তারপরেই প্রকাণ্ড উঠোন। উঠোনের শেষে উঁচু ভিটের ওপর মাটির একটি বড় ঘর। এ পাশে নীচু পোতায় ছোট রান্নাঘর। ছিটের বেড়া, ওপরে পাতলা টিনের চাল। বেশী জোরে বৃষ্টি হলে জল ঢোকে ঘরে।

এ পাশে একটা মাটির ছোট ঘর। প্রিয়নাথ বাবুর বৈঠকখানা। ঐ ঘরখানা প্রিয়নাথবাবু ছাত্রদের নিয়ে নিজে তৈরি করেছিলেন।

খুব সুখেই ছিলেন ওঁরা। একটি মাত্র মেয়ে মধুমতীকে কিছুদিন নিজে পড়িয়ে তারপর নিজেরই স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। গ্রামের আরও দু'তিনটি মেয়ে পড়ত ঐ স্কুলে।

মধুমতীর যখন প্রায় বারো বছর বয়স তখন আবার সন্তানসম্ভাবিতা হলেন ওর মা, খুশী হলেন সবাই, একটি ছেলে চাইছিলেন।

হলো ত হলো পর পর চারটি ছেলে। সবাই অবাক। বুড়ো বয়সে একি কাণ্ড।

মধুমতী সেবারে প্রবেশিকা পরীক্ষা ভালভাবে পাস করেছে। ওকে কলেজে পড়ানো যায় কিনা, এই নিয়ে জল্পনা করছেন প্রিয়নাথবাবু, এমন সময় হঠাৎ দুদিনের জ্বরে মারা গেলেন তিনি।

একটি পয়সা সঞ্চয় নেই—অকূল পাথারে পড়লেন মধুমতীর মা। তিনি আবার এই সময় সন্তানসম্ভাবিতা।

অমরের বহু দিন কোন খোঁজ খবর নেই। পণ্ডিত মশাইয়ের খাওয়া চলছিল না। তাঁকে তাঁর বড় মেয়ে এসে জোর করে নিয়ে গেছে।

ভরসার মধ্যে এক মধুমতী। মা ওর দিকে তাকান। বলেন, কিরে, কি হবে!

দেখি কি হয়? দাঁতে দাঁত চেপে বয়স্ক লোকের মতই উত্তর দেয় সে।

সত্যিই, রাতারাতি যেন অনেক বড় হয়ে গেছে সে। ভাইদের ভার তাকেই নিতে হবে।

আচ্ছা মা, আমাদের কোন আত্মীয়স্বজন নেই, যেখানে গিয়ে আমরা থাকতে পারি—এই···এই যতদিন তোমার শরীর ভাল না হয়।

মা ভাবতে বসেন, একজন আছে বটে কলকাতায়, কিন্তু সে কোন নিকট আত্মীয় নয়, বহু দূর সম্পর্ক।

দূর-ই ভাল। চেঁচিয়ে ওঠে মধুমতী। নিকট আত্মীয় তো কই একবার উঁকি দিয়ে দেখেন না।

দূর সম্পর্কের ভাই হরিবাবুর কাছেই চিঠি লেখা হয়। স্থির হয়েছিল যে, যদি উত্তর দিতে দেরি করেন হরিবাবু তবে ওখানে যাওয়া হবে না। বোঝা যাবে, তাঁর গরজ নেই।

চিঠির প্রত্যুত্তর পেতে সত্যিই দেরি হয়। তবুও না যাবার প্রশ্ন ওঠে না। ততদিনে এদের প্রায়ই অর্ধাশনে কাটছে। নিজেদের যাই হোক না, ছোট ছেলেদের না খাইয়ে রাখা যায় না।

তারপর, মধুমতীকে নিয়ে একা গ্রামে থাকাও মুস্কিল। এ বিপদ এতদিন বোঝা যায় নি। গ্রামে কোন অল্পবয়সী কাজিল ছেলেও তো নেই। কিন্তু, কোথা থেকে চিলে বাঁধা ইঙ্গিতপূর্ণ চিঠি এসে পড়ে—রাত্রে কাদের পায়ের শব্দ পাওয়া যায় উঠোনে। মধুমতীর মা জেগে রাত কাটান।

তাই হরিবাবুর চিঠি পেয়ে বেশী দেরি না করেই ওঁরা কলকাতায় চলে এলেন।

খুব ভয়ে ভয়েই এসেছিলেন। কিন্তু যা ভেবেছিলেন তার উল্টো। সাদর অভ্যর্থনা জানান হরিবাবু।

তোমার ভাইটির বুঝি দেখা হলেই যত উচ্ছ্বাস। মাকে বলে মধুমতী।

হ্যাঁ। ও ঐ এক রকম।

হরিবাবু যতই উচ্ছ্বসিত হন না কেন তাঁর ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। এতগুলি লোককে দুবেলা খাওয়াবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। নিজেরও চারটি ছেলেমেয়ে।

প্রথম মাসেই একটা টিউশনি জোগাড় করে মধুমতী। অবশ্য ওর বিদ্যে তো প্রবেশিকা পর্যন্ত। তবু প্রথম বিভাগে পাস করেছিল বলে টিউশনিটা পাওয়া সম্ভব হয়।

ইস, তোকে যদি আরও পড়াতে পারতুম। নিতান্ত দুঃখিতভাবে হরিবাবু বলেন।

আমার আর পড়বার সময় নেই। যেভাবেই হোক চাকরী জোগাড় করতেই হবে। কিন্তু এই ম্যাট্রিক পাসের বিদ্যে নিয়ে···।

তুই তো ইংরেজীতে ভাল, সর্টহ্যাণ্ড টাইপ রাইটিং শিখে নে। তাহলে তোকে আড়াইশ তিনশ টাকা মাইনে কে না দেবে! আর ভাগ্য ভাল হলে চারশ পাঁচশ টাকা।

শুনেই মধুমতীর মাথা ঘুরতে থাকে।

হরিবাবুর পরিচিত একটি টাইপের স্কুল ছিল। সেখানে ব্যবস্থা করে দেন হরিবাবু। মধুমতী শিখতে থাকে। খরচ বর্তমানে কিছুই লাগে না। শুধু সর্টহ্যাণ্ডের বইটা কিনতে হবে।

সর্টহ্যাণ্ডের কোর্স ন মাস। মধুমতী রাতদিন খেটে ছ মাসেই মোটামুটি শিখে নেয়। চাকরীর চেষ্টা শুরু করে সে।

আরও একটু ভালভাবে শিখে নাও না—টাইপ স্কুলের মালিক বলেন।

না, আর অপেক্ষা করতে পারবে না মধুমতী। বাবার মৃত্যুসময় মা অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। একটি

মেয়ে হয়েছে। গয়নাগাঁটি যা ছিল সবই শেষ হয়ে গেছে। এমন কি কাঁসার বাসন, পুরানো শাড়ীগুলি পর্যন্ত বিক্রী করতে বাধ্য হয়েছে।

চাকরী পাব না আমি? আকুল আগ্রহে প্রশ্ন করে মধুমতী।

চাকরী! কেমন যেন একটু হাসেন ভদ্রলোক, চাকরী তুমি খুব সহজেই পাবে, কিন্তু রাখতে পারবে কি?

কেন? আমি খুব ভাল কাজ জানি না বলে? তা সঙ্গে সঙ্গে শিখে নেব।

কাজ জান না। আবার হাসেন ভদ্রলোক, না সেজন্য কিছু আসে যায় না। চাকরী টিকিয়ে রাখতে হলে তোমাকে। থাক।

কি ব্যাপার বলুন তো। মধুমতী উৎকণ্ঠিত ভাবে বলত, আপনি যে হেঁয়ালী শুরু করলেন।

হেঁয়ালীই বটে। পৃথিবীটাই যে একটা প্রকাণ্ড হেঁয়ালী। তোমাকে নিজেই তা সমাধান করতে হবে।

হেঁয়ালীর অর্থ প্রথম চাকরীতেই কিছুটা বুঝেছিল মধুমতী। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে অনেক খুঁজে লোককে প্রশ্ন করে করে অফিসটা পেল। অবাক হয়ে দেখল সেটা ঠিক অফিস নয়, একটা বাড়ির নীচের তলার ঘর।

মালিক নিজেই নীচের তলার ঘরটাকে সাজিয়ে অফিস তৈরী করেছেন। নাম দিয়েছেন একটা গালভরা। আমদানীর-প্তানীর ব্যবসা।

আরও কয়েকটি মেয়ে বসে ছিল। সেখানেই অপেক্ষা করে সে। যথাসময়ে ডাক পড়ে তার।

দাঁত উঁচু, প্রায় পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি বয়সের একটি লোক। চেহারাটা যে শুধু কুৎসিত তাই নয়, এমন একটা কদর্য ভাব তার মুখে চোখে যে দেখলেই বমি আসে।

নাম, ধাম জিজ্ঞাসা করবার পর প্রশ্ন হল, কত টাকা মাইনে চায়।

ছশো। মধুমতী বলে।

আমার 'সটহ্যাণ্ডের' দরকার নেই, কাজেই শুধু একশ টাকা করে দেব। যদি রাজী থাকেন তবে আজ থেকেই কাজ শুরু করুন।

মধুমতী ভাবে, আর কোথাও এখনও কাজ পাই নি। এখন এটা শুরু করি, ভাল কাজ পেলেই ছেড়ে দেব। ও রাজী হয়।

কার্যতঃ দেখা গেল, স্টেনোগ্রাফার কেন, টাইপিষ্টেরও দরকার নেই এ আফিসে। সারাদিন সে বসেই রইল। কাজের কথা বলতে গেলে মালিক বলেন, দাঁড়ান না, দু একদিন পরেই এমন কাজ দেব যে, শেষ করতে পারবেন না। এখন বসে বসে প্র্যাকটিস করুন।

অফিস ছুটি হলে ভারাক্রান্ত মনে মধুমতী বাড়িতে ফিরল।

কি রে এত দেরী? উৎকণ্ঠিতা মা জিজ্ঞাসা করেন। যদিও তিনি কিছুটা অনুমান করতে পেরেছিলেন।

একদিন কাজে যোগ দিয়ে বাড়িতে ফিরলুম।

মা আর কোন কথা বলেন না। একটু পরে হাতপাখা এনে হাওয়া করতে থাকেন।

একি! অবাক হয় মধুমতী।

তুই ক্লান্ত হয়ে এলি—চোখমুখ বসে গেছে।

না, না, ক্লান্তি নয়, বিরক্তি বোধ হচ্ছে। এ চাকরীটা রাখতে পারব না মা।

কেন রে!

সারাদিন কোন কাজ নেই, চুপ করে বসে থাকা। ওরা আমাকে বসিয়ে টাকা দিতে চাইলেও শুধু শুধু টাকা আমি তো নিতে পারব না।

পরদিন গিয়েও ঠিক তেমনি বসে থাকা। ঐ আফিসে আর একটি লোক কাজ করে—সে একাধারে বড়বাবু, মেজবাবু, দারোয়ান, বেয়ারা। অর্থাৎ সে চিঠি লেখা, চিঠি ফাইল করা, বাইরের কাজ করা, লোকজন দেখা করতে এলে বাবুর সঙ্গে দেখা করানো সবই করে। কাজেই, তার নেই নেই করেও কিছুটা কাজ আছে।

কিন্তু, মধুমতীর সত্যিই কাজ নেই। সারাদিন একটা চিঠি টাইপ করল, সে চিঠিটা পাঠানই হল না। আবার টাইপ কর।

বিরক্ত হয়ে তিন দিনের দিন সে কর্তাকে বলে, কি ব্যাপার! কোন কাজ নেই নাকি।

কাজ! কর্তা লাল-ছোপ-ধরা দাঁত বার

করে হাসে, আমরা পনের মিনিটে পনের মাসের কাজ করি। চুপচাপ ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হবে, তারপরে চট করে কাজটা করে, আবার বসে থাকব পনের মাস। কাজের জন্য আপনার ভাবনা কি!

আরও চার পাঁচদিন পরে মধুমতীকে ডেকে বলে, নিন, কাজ চেয়েছিলেন, কাজ জুটেছে একটা। এই কুড়ি টাকা নিন। আজ বিকেলে ভাল শাড়ী ব্লাউজ কিনে কাল সকালে বেশ সেজে আসবেন আপিসে।

আপনার অপিসে কাজ হবে তা আমি সেজে আসব কেন? অবাক হয়ে মধুমতী বলে।

বা:, আপিসের একটা শোভা—

আমি আপিস শোভা করতে আসি নি, কাজ করতে এসেছি, বলতে যাচ্ছিল মধুমতী। ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল টাকাগুলি।

কিন্তু তখনই অফিসের সেই বড়বাবু প্লাস বেয়ারা এসে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে একটি লোক। নবাগতের দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে কর্তা বলেন, আচ্ছা, আপনি এখন যান। পরে সব বলছি।

বেরিয়ে আসে মধুমতী, নোট দুটো হাতেই ধরা থাকে। কি ব্যাপার না বুঝতে পেরে ধীরে ধীরে নিজের সীটের দিকে যাচ্ছিল, হঠাৎ কানের কাছে ফিসফিসিয়ে 'শুনুন' শুনে চমকে তাকায়। সেই বড়বাবু-বেয়ারা খুব কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে।

একটু অবাক হয় মধুমতী, এই কদিনে লোকটি কাছে এসে দাঁড়ান দূরে থাক কখনও নিজে থেকে একটি কথাও বলে নি। মধুমতীর প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছে যথাসম্ভব নির্লিপ্ত ভাবে। আজ হঠাৎ কি হল?

টাকাটা সব ফেরত দেবেন না। ফিসফিসিয়ে লোকটি বলে।

টাকার কথা আপনি কি করে জানলেন? বিস্ময় বিরক্তিতে বলে মধুমতী।

জানি। উত্তর দেয় লোকটি, এ ব্যাপার এই তো প্রথম নয়।

ও:।

যাক সে কথা। আপনি টাকাটা ফেরত দেবার আগে আট দিনের মাইনে কেটে নেবেন।

কেন?

আপনি বড় বোকা তো। হঠাৎ রেগে ওঠে লোকটি, নইলে মাইনে এক পয়সাও পাবেন না। আপনি ওদের কথায় রাজী না হলে কি আর আপনাকে রাখবে—তখনই জবাব দেবে—আর মাইনে দেবে না।

ও:।

হ্যাঁ। অবশ্য রাজী হলেও বেশিদিন রাখবে না—তবু কয়েকদিন।

এ অফিসটা এরকম কেন?

এ অফিস!—হেসে ওঠে লোকটি, এই কদিনের মধ্যে প্রথম ও হাসল। এ অফিস কেন—প্রায় সব অফিসই এইরকম। মেয়েদের কেউ কাজের জন্য রাখে না—রাখে আর কিছুর জন্য। নইলে, যে টাইপ করবে তার চেহারা দিয়ে কি হবে—হ্যাঃ।

মধুমতী চুপ করে থাকে।

মেয়েরাও তা জানে, জেনে শুনে আসে। লোকটি বলে, পরে ন্যাকামো করে।

জেনে শুনে আসে!

নিশ্চয়ই। নইলে ছেলেরা যে তাদের চেয়ে ভাল কাজ করে - একথা কে না সবাই জানে। তবে তারা কেন পাল্লা দিতে আসে ছেলেদের সঙ্গে।

নিরুপায় হয়েও তো আসতে পারে, বলে মধুমতী, যেমন আমি এসেছি।

লোকটি একবার মাত্র ওর দিকে তাকায়। মধুমতী বুঝতে পারে ও বিশ্বাস করে নি তার কথা। ধীরে ধীরে তার সংসারের অবস্থা বলে ও।

আপনি একটু অদ্ভুত ধরণের, লোকটি ভিন্ন কণ্ঠে বলে, যাক, এখন এর হাত থেকে তো বাঁচুন। ভবিষ্যতে চাকরীতে সাবধান হয়ে ঢুকবেন। নইলে, অপমানিতও হবেন, মাইনেও পাবেন না।

কি করে সাবধান হব?

যে অফিসে দেখবেন অনেক মেয়ে কাজ করছে, মাইনে একটু কম হলেও সেখানে ঢুকবেন। আর, প্রথম দিন-ই তো বুঝতে পারবেন—কি পরিমাণ কাজ আছে। কাজ থাকলে বিশেষ ভাবনা নেই।

সেই লোকটির নাম মধুমতী আজ জানে না। কিন্তু তার জীবনে সে মধুমতীর সবচেয়ে বড় বন্ধু। তার উপদেশ অনুসারেই এখানে কাজ নিয়েছে মধুমতী। প্রকাণ্ড অফিস—চার পাঁচটা মেয়ে কাজ করে। ছ'মাস বেশ নির্বিবাদে কেটে গিয়েছে। মধুমতী আলাদা বাড়ি নিয়েছে। ভাইদের স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে। সবদিক দিয়ে যখন নিজেকে নিশ্চিন্ত ভাবতে সুরু করেছে—তখনই···

একটা ঝাঁকুনী দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে বাস। অফিসের প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে। লোকটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে পিঠের কাছে। বড় দুর্গন্ধ ওর গায়ে, বিশেষতঃ মুখে।

শুনুন, আপনি এখানে এসে বসুন।

কে ডাকছে তাকে। মুখ ফেরায় মধুমতী। আর মুখ ফিরিয়েই···

অমরদা। চেঁচিয়ে ওঠে মধুমতী।

কে? মধুমতী। আহ্বানকারী অবাক কণ্ঠে বলে। যেন সে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। আবার বলে, মধুমতী।

বাসের সব লোক অবাক হয়ে একবার তাকায় মধুমতীর দিকে। মানায় না, ওই নামটা মানায় না এখানে। এই গাড়ির ভিড়, লোকের চীৎকার, অশ্লীল মন্তব্য, ঘামের গন্ধ, কণ্ডাকটরের টিকিট চাওয়া—এর মধ্যে মানায় না ঐ মধুমতী নাম।

কোথায় যাচ্ছ মধুমতী? প্রশ্ন করে অমর।

অফিসে।

অ-ফি-সে ··। টেনে টেনে শুধু এই তিনটি শব্দই বলতে পারে অমর। অফিসে। অফিসে যাচ্ছে মধুমতী। গত চার বছর সে এদেশে ছিল না—ফিরে এসে অনেক পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু, সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা মধুমতী ব্যাগ ঝুলিয়ে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে অফিসে যাচ্ছে।

এই মধুমতীকে সে চেনে না।

জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে উঠোন। সাদা শাড়ী কোমরে জড়িয়ে পড়েছে মধুমতী, খোঁপায় একটি মাত্র সাদা ফুল। আকাশের সন্ধ্যাতারার মতই শান্ত স্থির দুটি চোখ।

সেই অপরূপ শান্ত সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে অমর তর্ক করত হিংসা আর হিংস্রতা নিয়ে। মনের ভারসাম্য বজায় রাখবার জন্যই উল্টো তর্ক করত। নইলে যে গলে মিশে একাকার হয়ে যাবার কথা।

কিন্তু, গলে মিশে একাকার হলে কোন ক্ষতি ছিল কি! এই কবছর বিলেতে বসে বসে এই কথাই ভেবেছে অমর।

যে কথা বলবার জন্য প্রাণ তৃষিত হয়েছিল সে কথা কেন বলে নি। কোন বাধাই তো ছিল না।

সঙ্কোচ—শুধু সঙ্কোচ। সবাই বলবে এই ছেলেটি দিনের পর দিন এই উদ্দেশ্যে ও বাড়িতে আনাগোনা করেছে। তর্ক করেছে, গল্প করেছে, আড্ডা দিয়েছে কিন্তু মনে মনে তার একটি মাত্রই ইচ্ছে ছিল তা ওই মেয়েটিকে পাওয়া।

হয়তো, লোকে হেসে বলবে, ওরা প্রেম করেছিল। ছিঃ ছিঃ সে কথা শুনতে চায় না অমর।

কিন্তু, বিলেতে বসে সে কি পাঁচবছর এই দৃশ্যের কথাই ভেবেছে—বাসে ভিড়ের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মধুমতী যাচ্ছে—

বাস থেমে গেল। নেমে পড়ল মধুমতী। অমরও পেছনে পেছনে নামে।

এ কি তুমি কোথায় যাচ্ছ! অবাক হয়ে মধুমতী বলে।

তোমারি সঙ্গে।

ঃ। চোখ দুটি একটু টানে মধুমতী। আর কোন কথা না বলে এগিয়ে যায়। এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ায় অমর।

তোমার সঙ্গে দরকারী কথা ছিল। অমর ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

বল। ওর দিকে না তাকিয়েই জবাব দেয় মধুমতী।

এখন থাক। অফিসের দেরি হয়ে যাবে।

দেরি। মধুমতী দাঁড়িয়ে পড়ে। এক অদ্ভুত ধরণের হাসি হেসে বলে, কাল পর্যন্ত ঠিক সময়ে অফিসে হাজিরা দিয়েছি, প্রাণপণে ভাল ভাবে কাজ করেছি, তাতেও ভয় পেয়েছি কখন চাকরি চলে যায়। আজ দেরি করে গেলে এবং কাজ না করলেও কোন ভয় নেই।

কি সব বলছ? পাগল হয়ে গেলে নাকি?

পাগল! মধুমতী ঠিক তেমনি হেসে জবাব দেয়, পাগল হওয়ার সময় কোথায়? অনেক সময় পাগল হওয়াটাও বিলাসিতা।

আর কোন কথা না বলে ওর দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে থাকে অমর। একটু পরে বলে, চল ওদিকে, ঐ বেঞ্চটায় বসবে।

না। আমি যাই। কি হবে বসে?

তোমার কিছু না হোক, আমার হবে।

তুমি! নতুন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায় মধুমতী।

হ্যাঁ আমি। আজ থেকে আমার কাছেই তুমি সব কথা বলবে, সবচেয়ে গোপন কথা তোমার। আমার উপদেশেই তুমি চলবে।

আজ থেকে! স্বপ্নাবিষ্টের মতই বলে মধুমতী।

হ্যাঁ। আজ থেকে চিরকাল।

ছেলেবেলা থেকে তোমার কথামতই চলি, মাঝখানে ক'বছর তুমি ছিলে না।

তোমার জন্যই যোগ্যতা অর্জন করতে গিয়েছিলাম—মনে মনে বলে অমর।

আজ যদি তোমার সঙ্গে দেখাই হল, তবে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—মধুমতী বলে।

কি?

কোনটা বেশী কঠিন, আত্মহত্যা না আত্মাকে হত্যা?

শেষেরটি।

উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মধুমতীর মুখ। বলে, সেই কঠিন কাজই আমি করব। কিন্তু সে ইতিহাস লেখা থাকবে না কোন বইয়ের পাতায়।

ব্যাপারটা আমাকে খুলে বল।

ব্যাপারটা। চুপ করে থাকে মধুমতী।

মধুমতীর অফিস যদিও একটি প্রাইভেট ফার্ম তবুও তা ফাঁকিবাজী নয়। সেখানে কাজ আছে। অনেকগুলি কেরাণী, কতকগুলি মেয়ে টাইপিস্ট। এদের ওপরে দুটি বড়বাবু, আর সবার ওপরে খোদ কর্তা।

বেশ নিশ্চিন্তভাবেই অফিস করতে শুরু করেছিল মধুমতী। প্রায় এক বছর কেটে যায় নির্বিঘ্নে। নির্বিঘ্নে মানে হাজিরা দেওয়া নিয়ে একটু তিরস্কার, কাজ না পারা ইত্যাদি ছিল। কিন্তু, সে সব গায়ে মাখে নি মধুমতী।

খোদ কর্তার সঙ্গে তার দেখা হয় নি। তার নিয়োগপত্র অফিসের বড়বাবুই দিয়েছেন। সেদিন হঠাৎ কর্তা অফিস পরিদর্শনে এলেন। ঘুরে ঘুরে দেখলেন সবাইকে। পরদিনই মধুমতীর ডাক পড়ল কর্তার চিঠির ডিকটেশন নেবার।

সবাই একযোগে মধুমতীর দিকে তাকাল। ওর মনে হল, কারো চোখে বেদনা, কারো বা ঈর্ষা, আর সকলেরই নিছক কৌতূহল মিশ্রিত ব্যঙ্গ হাসি।

সেই দৃষ্টির অর্থ সে সেদিন বোঝে নি, বুঝেছিল কয়েকদিন পরে। সেদিন থেকে রোজই তার ডাক পড়ত। এবং কয়েকদিন পরেই ডাকের অর্থ সে বুঝল—আর পালাবার পথ রইল না।

কালই সে বুঝেছিল আর একদিনও পালাতে পারবে না সে। স্থির করে নিতে হবে আত্মহত্যা এবং আত্মার হত্যার মধ্যে একটি পথ। আত্মহত্যার সংকল্প নিয়েই সে গিয়েছিল বাড়িতে—মাকে বলেছিল কিছুটা।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মা বলেছিলেন, চাকরী ছাড়তে চাস ছাড়, ভগবান চালিয়ে নেবেনই একভাবে। কিন্তু, সকালে উঠে আর ভগবানের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন নি মা।

নিজের জন্য নয়—তাঁর পেছনে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে আছে আরও পাঁচটি শিশু। আত্মহত্যার অধিকার সকলের থাকে না।

তুমি ঠিকই বলেছিলে অমরদা, পৃথিবীতে শুধু হিংসা আর হিংস্রতা—কাহিনী শেষ করে অনেকক্ষণ পরে বলে মধুমতী।

না। দৃঢ়কণ্ঠে অমর উত্তর দেয়, আরও আছে, প্রেম। আর প্রেম আছে বলেই বেঁচে আছে হিংসা হিংস্রতা, সেদিন তুমি ছিলে মধুময়ী—তাই তোমার সামনে বসে হিংসার তর্ক করতে পেরেছি। আজ তুমি নিজে হিংস্রতার বিষে জর্জরিত—আজ আমার প্রেম গ্রহণ কর মধুমতী।

জীর্ণ সভ্যতার অপরাজেয় ছায়া

আলোকচিত্রী পুলিনবিহারী চক্রবর্তী

শারদীয়
প্রীতি-সম্ভাষণ

ষ্ট্যাণ্ডার্ড-ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানী

ভূস্বর্গের সরোবরে অনুপম ছন্দ (কাশ্মীর)

অঙ্গরাগে অভিনব

রুপচর্চায় বেঙ্গল কেমিক্যালের তিনটি নূতন অবদান
আপনার সৌন্দর্যকে উজ্জ্বলতর করিবে।

প্রিয়া স্নো
ত্বক কোমল ও নির্মল রাখে

প্রিয়া সেন্ট
অনন্ত পুষ্পসার

উষসী
ফেস পাউডার
অভিজাত প্রসাধন রেণু

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

জলকে চল—

আলোকচিত্র: পুলিনবিহারী চক্রবর্তী

এনামেলের বাসন

- দামে সস্তা
- ভারে লঘু
- ব্যবহারে টেকসই
- বিজ্ঞানসম্মত ও

স্বাস্থ্যকর

বেঙ্গল এনামেলের বাসন ব্যবহার করুন

সেরামিক সেলস করপোরেশন লিঃ

২৪, চিত্তরঞ্জন এভিন্যু, কলিকাতা-১২

সমুদ্রে শিকার—

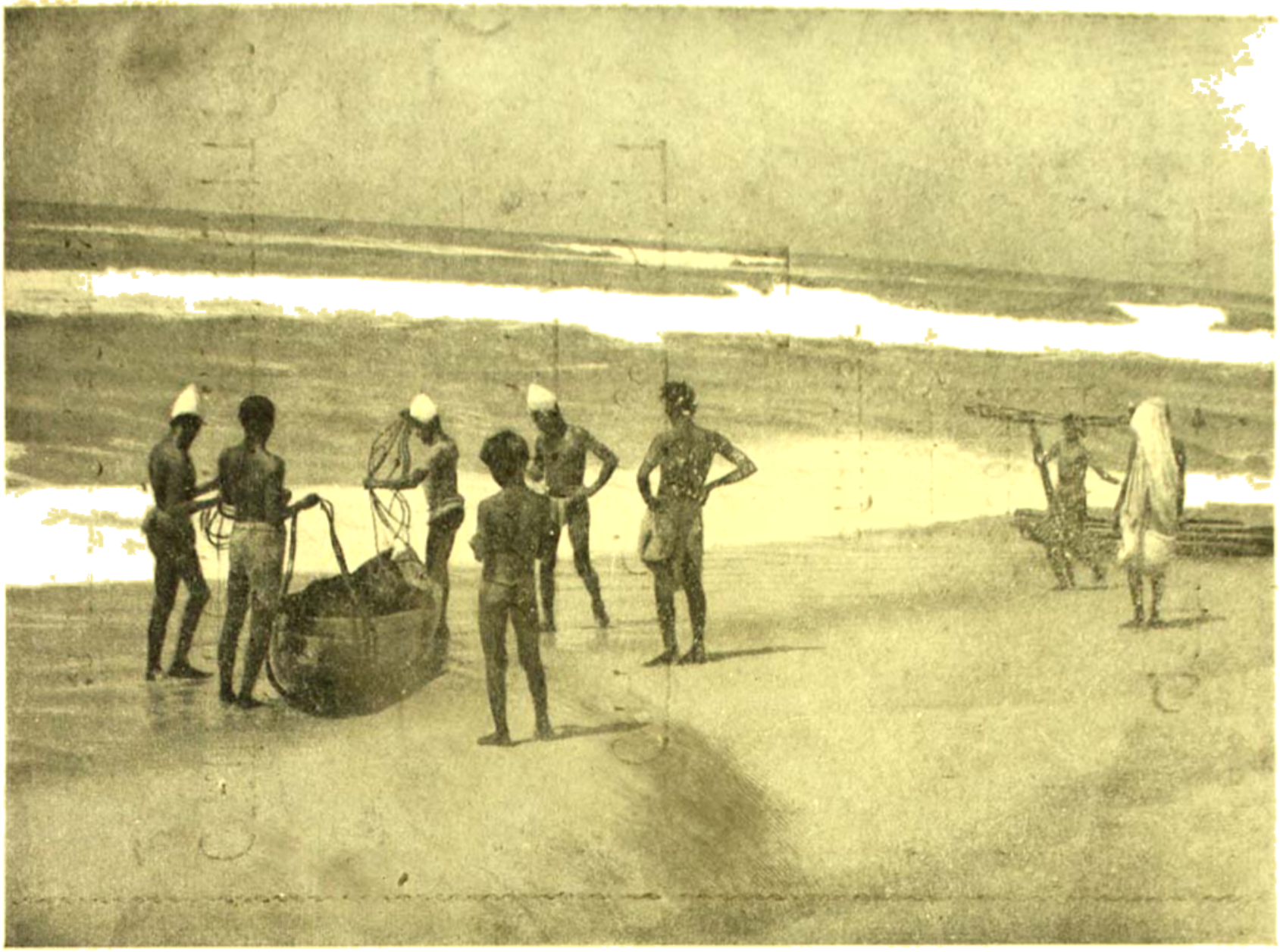

আলোকচিত্রী অরুণ সেনগুপ্ত

ভবিষ্যতের পথে

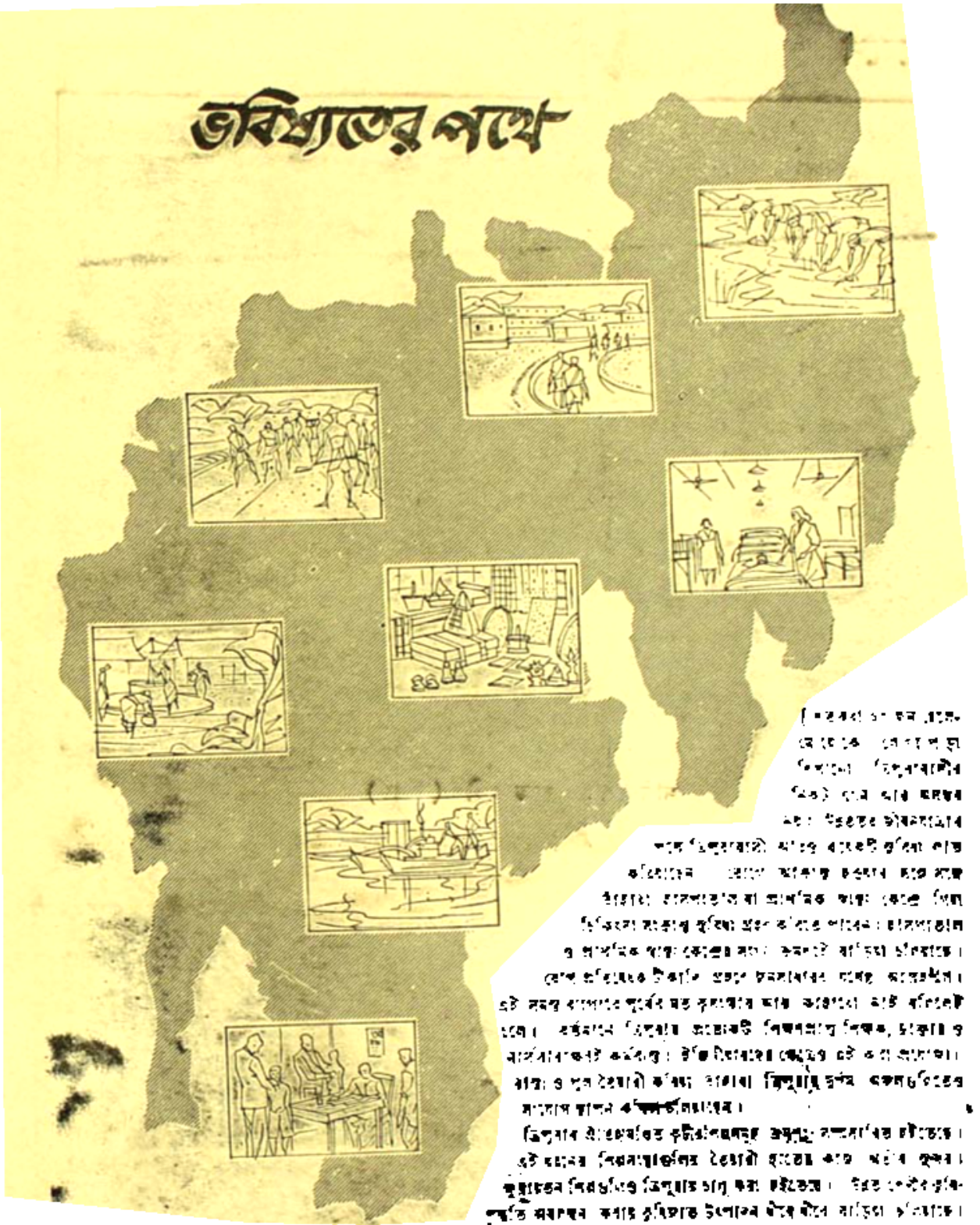

[... ত্রিপুরা ... ত্রিপুরাবাসীর ... উন্নততর জীবনযাত্রার ... ত্রিপুরাবাসী ... কর্মসংস্থান ... গ্রামাঞ্চল ... হাসপাতাল বা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ... হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা ... বাড়িয়া চলিয়াছে। ... টীকাদি ... চলমানরহিয়াছে। এই সমস্ত ব্যাপারে পূর্বের যে কোনোসময় অপেক্ষা বেশি ব্যয় করা হইতেছে। বর্তমানে ত্রিপুরার প্রত্যেকটি শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক, চাকুরী ও ব্যবসায়ীকার্যরত। ইহা বিশেষের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। রাস্তা ও পুল তৈয়ারী করিয়া রাজ্যের ত্রিপুরাদের ... যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছেন।

ত্রিপুরার ঐতিহ্যমণ্ডিত কৃষ্টিকলাসমূহ ... সংরক্ষিত হইতেছে। এই সমস্ত শিল্পসামগ্রীর তৈয়ারী হাতের কাজ অতীব সুন্দর। কুটীরশিল্পও ত্রিপুরার গর্ব করা হইতেছে। উহার ... কুটীরশিল্পের মাধ্যমে ত্রিপুরার গ্রামে ... বাড়িয়া চলিয়াছে।

পশ্চাদপদ ... উপজাতি ... জনসাধারণকে ... পদ্ধতিতে পড়শালা ... উপজাতি ... ও সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন। ... ত্রিপুরার ... অধিবাসীদের ... করিয়া ... ছাড়া চাষ ... হইতেছেন। ... উপজাতি ... করিতেছেন এবং ... লক্ষ্য ... বাড়িয়া চলিয়াছে। এইভাবে ত্রিপুরা আগাইয়া চলিয়াছে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে।]

পরিকল্পনাকে সফল করতে ত্রিপুরা বদ্ধপরিকর

ত্রিপুরা প্রশাসন কর্তৃক প্রচারিত

TT-1830

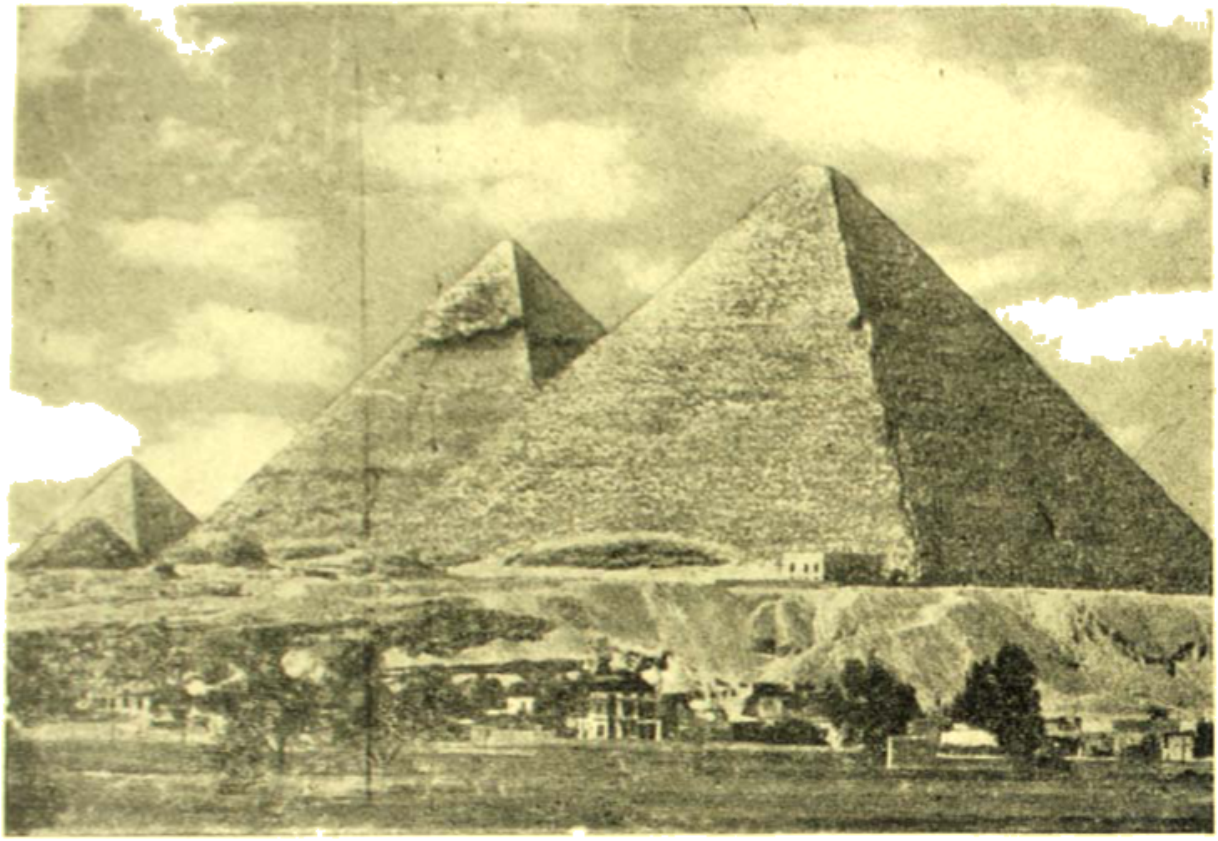

আদি-সভ্যতার দীর্ঘস্থায়ী প্রতীক (মিশর)

পূর্ব উদ্যানের প্রাকৃতিক দৃশ্য

শিল্পী কমল চৌধুরী

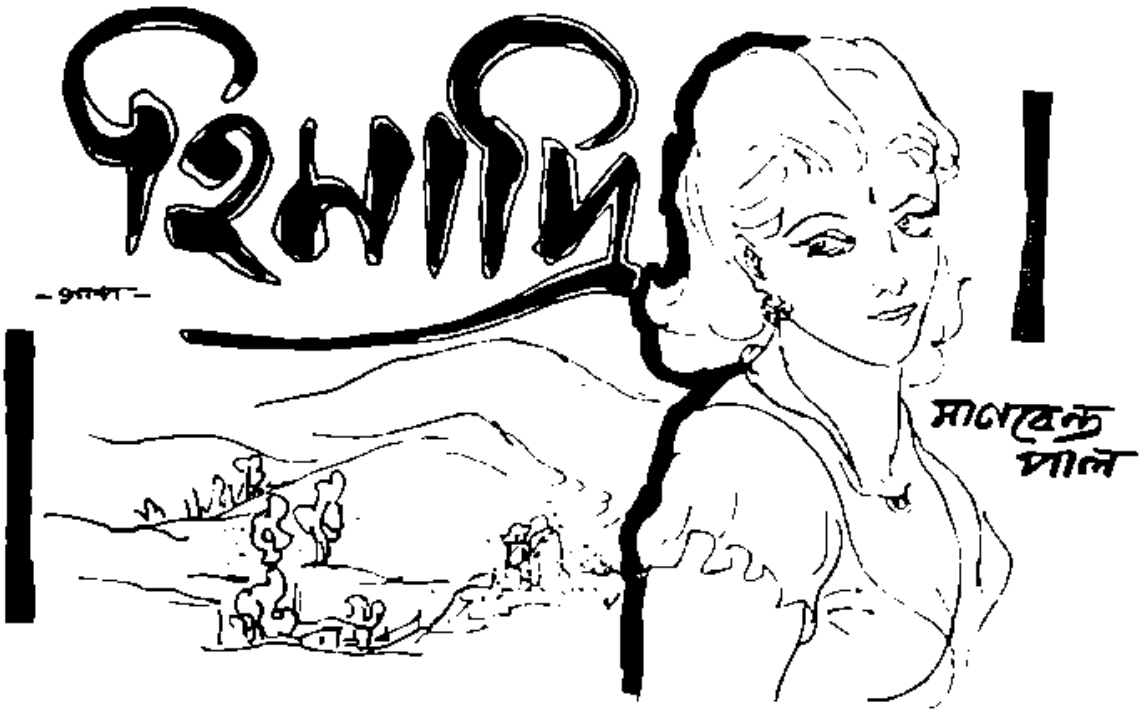

কিছুতেই বুঝতে পারছি না, হঠাৎ মাত্র চারদিন থেকেই কেন অসময়ে ফিরে যেতে হচ্ছে। আমাদের এই দার্জিলিঙ-ভ্রমণের পিছনে যাঁর উৎসাহ ছিল সবচেয়ে বেশি কটাক্ষে একবার তাঁর দিকে তাকালাম। যদিও তিনি আমার পাশেই বসে আছেন তবু যেন মাঝখানে স্বেচ্ছাকৃত একটু ব্যবধান। জানলার দিকে পিঠ করে গদিতে হেলান দিয়ে আর্থার কোনান ডোয়ালের মধ্যে ডুবে রয়েছেন। কিন্তু আমি তাঁকে কিছু-কিছু জানি। বুঝতে তাই দেরি হল না যে, বইখানি এক্ষেত্রে তাঁর কাছে তাঁর আবরণ মাত্র। আসলে পড়ার ছলে আমারই মতো নিঃশব্দে একান্ত আত্মগতভাবে এমন-কিছু চিন্তা করছেন যা আমাদের পরস্পরের আলোচনাযোগ্য নয়। তাঁর পাশে আরও একজন রয়েছেন—শান্ত গম্ভীর চেহারাটি। ফর্সা চওড়া গালে কামানো দাড়ির গোড়াগুলো সবুজ হয়ে ফুটে রয়েছে। মুখে একটা চুরুট। নিঃশব্দে ধূমপান করছেন। তাঁরও হাতে একটা বই—নভেল নয় নিতান্তই একটা টাইম-টেবল। একমনে দেখছেন আর মাঝে মাঝে দাগ দিচ্ছেন। আমি এঁকে যতদূর চিনি তাতে এই বয়সে পাহাড়ি এটা এঁর ছলনা নয়। তখন শিলিগুড়ি পৌঁছবেন, যাবেন কখনই-বা সকুরিয়ালির গাড়ি মিলবে এরই চিন্তায় তন্ময়।

বেলা তখন দুটো। ট্রেন ছাড়তে আর দেরি নেই। শিলিগুড়ি-দার্জিলিঙের বিশেষ ধরনের হালকা ছোটো ছোটো ট্রেন। তিন টুকরো হয়ে তিনটি ইঞ্জিন নিয়ে পনেরো মিনিট পর পর ছেড়ে যাবে। দুটি চলে গেছে। এবার এটির ছাড়বার পালা। এ গাড়িতে ভিড় নেই—ভিড় হবার উপায়ও নেই রিজার্ভড্ ফার্স্টক্লাস। কিন্তু আমার ইচ্ছে হচ্ছিল, এ গাড়িতে আমরা তিনজন ছাড়া আরও দু একজন অপরিচিত কেউ থাকলে ভালো হত। আলাপ জমিয়ে নেওয়া যেত।

ঘণ্টা পড়ল এই সময় ভদ্রলোকের মতো একবার দার্জিলিঙের দিকে তাকাল কিন্তু জানলা খুলি সাধ্য কী; কনকনে বাতাস। তারপর দৃষ্টি

পড়ছে। কুয়াশা—শুধু কুয়াশা চারিদিকে। তাড়াতাড়ি সা'শ টেনে অলেস্টারটায় বোতাম আকণ্ঠ এঁটে চোখ বুজিয়ে রইলাম। ট্রেন চলতে শুরু করল। দার্জিলিঙ শহরের বুক ফেঁড়ে লাইন নেমে গেছে নীচে—অনেক নীচে। মাঝখানে উঠেছে 'ঘুম'। তারপর আবার নামতে শুরু করেছে পাহাড়ের গা বেয়ে! কোথায় কত নীচে কার্শিয়াং—রংটং—সুকনা—শিলিগুড়ি! দুপাশে আকাশচুম্বী ধূম্র পাহাড়ের কঠোর প্রহরা—লাইনের তিন গজের মধ্যেই গভীর খাদ,—কোথাও বা ভয়াবহ 'গর্জ'। দার্জিলিঙ হিমালয়ান লাইট ট্রেন এঁকে বেঁকে এগিয়ে চলেছে কুক্ কুক্ করে।

কিন্তু আসবার সময় ঠিক এত তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে এমন কথা ছিল না। আমার তো আসারই কোনো কথা ছিল না। তবু যে আসতে হল তার জন্যে শচীনাথ আইচকে দায়ী করব, না স্বয়ং শ্রীমতী সুদেষ্ণাকে ভেবে পাই না।

তবে সেদিনের কথা মনে আছে। পাশেই বসেছিলেন সুদেষ্ণা আইচ। ঘরে জোরালো আলো জ্বলছিল না। ডানদিকে টেবিলের ওপর ছিল ছোট্ট শ্বেতপাথরের তাজমহল। তারই মধ্যে থেকে হালকা নীল আলো বেরিয়ে আসছিল। আমি যে কোচে বসে ছিলাম তাতেই তিনিও বসে ছিলেন। কফির পেয়ালায় ভালো করে একবার চামচটা নেড়ে দিয়ে হাতে তুলে দিলেন।

—নিন, জুড়িয়ে যাবে। ধোঁওয়া না বেরোলে আর জিব না পুড়লে তো গরম বলে মানতেই চান না।

আমি নিঃশব্দে কাপটি ওঁর হাত থেকে নিয়ে টিপয়ের ওপর রাখলাম।

উনি তা লক্ষ্য করে চুপ করে রইলেন। একটু পরে গম্ভীর ভাবেই বললেন—বেশ তো না হয় নাই গেলেন আমাদের সঙ্গে। তার জন্যে আপনার নার্ভের ওপর কোনো প্রেসার দিতে চাই না। আমরা লোক ভালোবাসি। বাড়িতে তো শুধু আমরা দুটি মানুষ। তাই আপনি সঙ্গে গেলে ভালোই হত। আর পনেরো দিনের তো প্রোগ্রাম।

শ্রীমতী সুদেষ্ণা একটু থামলেন। কফির পেয়ালায় এক চুমুক দিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে আবার বললেন—I have so many friends! তাদের কাউকে যে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি না তা নয়। তবে আপনি গেলে—

এই পর্যন্ত বলেই হঠাৎ মিসেস আইচ খপ্ করে আমার হাতটা ধরে জোরে নাড়া দিয়ে বলে উঠলেন—আপনি যাবেনই বা না কেন! আপিসের ছুটি!

আমি তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম—দেখুন, আপনাকে আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। আপনারা স্বামীস্ত্রীতে দার্জিলিঙ বেড়াতে যাচ্ছেন। সেখানে হোটেলে গিয়ে উঠবেন। আমি কী করে সেখানে আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে যাই!

—Oh dear! No no! আপনি আমার বাড়ির লোকের মতো যাবেন—আমাদের পরমাত্মীয়ের মতো যাবেন। সেখানে বাধা কী!

গা থেকে নাইলনখানা খসে পড়ছিল। নিতান্তই অবহেলায় কোনো রকমে গায়ে তুলে নিলেন একবার।—না না বলুন—প্লিজ!

রাজি হতে পারি নি। মাথা নিচু করেই শ্রীমতী আইচের সব অনুনয় প্রত্যাখ্যান করে পালিয়ে এসেছিলুম। ক্রোধে অপমানে ভদ্রমহিলা সেদিন দরোজা পর্যন্তও এগিয়ে দিতে এলেন না।

ভেবেছিলাম, লাউডন স্ট্রীটের এই বিশেষ বাড়ির সঙ্গে আজ সন্ধ্যার পর থেকেই সব সম্পর্ক শেষ করে দেব। আর ওমুখো হব না। এর কারণ ঠিক এ নয় যে, মিসেস আইচকে আমি পছন্দ করতাম না। বরঞ্চ তাঁকে আমার ভালোই লাগত। তাঁর হাবভাব চালচলন—তাঁর ঝকঝকে তুলে প্রাণখোলা হাসি—

বড় বড় নখে নখপালিশ, মাস্‌কারা পেনসিলে আঁকা দীর্ঘ নকল ভ্রূ, শ্যাম্পূকরা বব্‌ড্ হেয়ার, ক্রেপকরা দাঁতের বলমলানি—বুক-কাটা নির্লজ্জ ব্লাউজ, অ্যাম্বার রঙের নাইলন এসবেরই যেন কেমন একটা আকর্ষণ ছিল। কিন্তু তবু যে কেন খুব ঘনিষ্ঠ হতে পারতাম না তা বলতে পারি না। আমি বুঝতাম, কেন আমাকে যেতে বলছেন। তবু যেন কেমন মনে হত, এভাবে ওঁদের সঙ্গে যাওয়াটা আমার মতো অতি সাধারণ মানুষের মানায় না।

কিন্তু আমার সব মতলব উল্টে দিলে পরের দিন আপিসে একটি টেলিফোন এসে। কথা বলছেন স্বয়ং মিস্টার আইচ।

—কে নির্মল বাবু?

—হ্যাঁ।

—ওহে ব্রাদার, আজ একবার আমার আপিসে এসো না সন্ধ্যের পর। একটু বিশেষ কথা আছে।

ভারি অমায়িক সরল সুন্দর মানুষ। মনে মনে শ্রদ্ধা করি এঁকে। 'না' বলতে পারলুম না। যেতে হল।

উনি পাশের চেয়ারে বসিয়ে বিনা ভূমিকায় বললেন,—ওকে তো জান—খেয়ালী মানুষ। খেয়াল হয়েছে দার্জিলিঙ বেড়াতে যাবে। তার ওপর শরীরও ভালো নেই। তা তুমি না গেলে তো ভাই ওকে আমি ম্যানেজ করতে পারব না। ভদ্রলোক একটু থামলেন। তারপর ধীরে ধীরে চুরুটে টান দিয়ে বললেন—শুধু আজ বলে নয়, কোনোদিনই ওঁদের টেম্পারামেন্টের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারি নি। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সে আমার অক্ষমতা বৈকি। কিন্তু উপায় কী!

এই পর্যন্ত বলে তিনি আমার মুখের দিকে তাকালেন।

—তুমি বলো কিছু-একটা।

আমি মাথা নিচু করে বললাম—আমি গেলে যদি আপনাদের ভালো লাগে, আমি যাব।

মিস্টার আইচ তৎক্ষণাৎ চওড়া হাতখানা বাড়িয়ে আমার হাতটা ধরে সানন্দে ঝাঁকুনি দিলেন। হাসতে হাসতেই বললেন—তা ছাড়া তোমার প্রতি ওঁর একটু অনুরাগও আছে—তুমি সঙ্গে গেলে—

আমি বললাম—হ্যাঁ, ওর সঙ্গে আমার বন্ধুসুলভ প্রীতির সম্পর্ক আছে আমি যদি যেতে পারি, তাহলে আমিও কম খুশি হই না।

এই বলে তৎক্ষণাৎ উঠে পড়েছিলাম।

তারপর এই দার্জিলিঙ।

দার্জিলিঙ আসার এই দীর্ঘপথ ভদ্রলোক কী ভাবে যে প্রতি মুহূর্তে শ্রীমতীকে যত্নে আগলে রেখেছিলেন দেখে আমার হাসি পাচ্ছিল।—এবার একটু কফি খেয়ে নাও। খিদে পেয়েছে? পায় নি! কী সর্বনাশ! এখনো খিদে পেল না কেন? ও নির্মল—ফিস্‌ফিস্ করে বললেন—তুমি একটু বলে দেখো না। ও তোমার কথা শুনবে। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস, ওর ভেতরে ভেতরে অসুখ করছে।

—আচ্ছা, অতক্ষণ বসে আছ কেন বলো তো? একটু শুয়ে থাকো না। এই নাও, বিছানা করে দিচ্ছি—ভালো করে পা ছড়িয়ে শোও। শুয়ে শুয়ে গল্প করো। ও নির্মল, তুমি অতদূরে বসে আছ কেন, এতে কি গল্প করা চলে—চেঁচিয়ে বক্তৃতা করা চলতে পারে।

এই বলে উনি সত্যিই বেডিং খুলে বিছানা বের করে পেতে দিলেন। শ্রীমতী আইচ শুলেন না। পা দুটি তুলে আরাম করে বসলেন।

মিস্টার আইচের অনুরোধে শ্রীমতীর কাছে এসে বসেই গল্প করছিলাম। হঠাৎ মিস্টার আইচ বললেন—আচ্ছা ডক্টর বোস যে ওষুধগুলো দিয়েছিলেন সেগুলো নিয়েছ তো?

মিসেস আইচ হেসে বললেন—বেড়াতে বেরিয়ে ওভারকোট এত বাজে কেন? অসুখ না করিয়ে ছাড়বে না বুঝি!

মিস্টার আইচ অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

তারপর শিলিগুড়ি ছাড়তেই হঠাৎ দেখি মিস্টার আইচ খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন:—গরম জামা কাপড়ের টাঙ্কটা কোথায়?

সুলেখা আইচ অবাক হয়ে বললেন—কেন? ঐ তো রয়েছে।

মিস্টার আইচ তৎক্ষণাৎ নিজেই উঠে সুটকেস খুলে আলোয়ান, সোয়েটার, ওভারকোট, মাফলার বের করতে লাগলেন। তারপর একে একে প্রায় সবগুলিই মুখের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—নাও, গায়ে দিয়ে নাও। ঠাণ্ডা লাগবে।

যদিও এপ্রিল মাস এবং ট্রেনে চলতে চলতেই এসব ব্যবহার করার প্রয়োজন অনেক সময় হয়—তা বলে এখুনি নয়। অন্তত আরও ত্রিশ মাইল এগিয়ে গেলে কাঞ্চনজঙ্ঘার কাছাকাছি এলে শীত করে এসব। কিন্তু মিস্টার আইচ অত বুঝতে চান না। তাঁর মনে হচ্ছে শিলিগুড়ি ছাড়ার পর থেকেই ট্রেনটা ভেজ করে গেছে। আর বলা যায় না, কখন কোন্ ফাঁকে যদি তাঁর স্ত্রীর অনভ্যস্ত কৃশ দেহে এই পাহাড়ে ঠাণ্ডা লেগে যায়—তা হলে কি আর বাঁচাতে পারবেন এই বিদেশ বিভূঁয়ে?

শ্রীমতী সুলেখা স্বামীর এই অহেতুক ব্যস্ততায় আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। গরম জামাগুলি পাশে রেখে দিলেন, শুধু আলোয়ান দিয়ে পা দুটি ঢাকলেন।

দার্জিলিঙে এসে ওঠা হল হোটেলে। ঘর আগে থেকেই বুক করা ছিল। ওঁদের জন্যে একটি, আমার জন্যে একটি। পাহাড়ের নীচে হোটেলটি—তারও নীচে এঁকে বেঁকে রেল লাইন চলে গেছে—অল্প দূরেই দার্জিলিঙ স্টেশন। এখানে এসে যে দিকে তাকাই মুগ্ধ হয়ে যাই। পাহাড় দিয়ে ঘেরা ছোট্ট শহরটি। মানুষ কী অসাধ্য সাধনই না করেছে। শুধু পাহাড়ের নীচেই ঘর বাঁধে নি। সারা পাহাড় জুড়ে তারা প্রাসাদ গড়েছে। একটু পরেই সন্ধ্যে হল। অমনি পাহাড়ের বুকে আলোর মালা দুলে উঠল। দূরে অনেক উঁচুতেও সার সার আলো জ্বলছে। নক্ষত্রের আলো বলে ভুল হয়।

একাই দাঁড়িয়ে ছিলাম ব্যালকনিতে। হঠাৎ কাঁধের ওপর কার স্পর্শ লাগল! অমনি খিল খিল করে হাসির ঝঙ্কার!—কেমন চমকে দিলাম?

সত্যিই অপ্রস্তুতে পড়ে গিয়েছিলাম। সামলে নিয়ে বললাম—মিস্টার আইচ কোথায়?

—উনি এখন বিশ্রাম করছেন।

—তা এখানে এলেই তো পারতেন। বেশ তো বেঞ্চিপাতা আছে।

মিসেস আইচ নাক কুঁচকে প্রশ্নটার উত্তর এড়িয়ে গেলেন।

—জায়গাটা এখন ঠিক মনে হচ্ছে যেন রূপ-কথার রাজ্য! না? এই বলে সুলেখা মুগ্ধ দৃষ্টিতে অন্ধকার পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমি বললাম—আপনি ঠিকই বলেছেন। আমিও তাই ভাবছিলাম। মনে হচ্ছে যেন পাহাড়গুলো এককালে ছিল বিরাট দৈত্য। পাহাড়ের গায়ে ঐ যে আলোর ফোঁটা—মনে করুন ওগুলো তাদের অসংখ্য চোখ। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দৈত্যরা পৃথিবী-লয়ের চরম মুহূর্তটির প্রতীক্ষা করছে। তারপর যে দিন সেই শুভ লগ্ন আসবে, সেইদিনই ওরা সব জেগে উঠবে—গর্জে উঠবে—তারপরই সর্বাঙ্গে ঐ যে মানুষের ধৃষ্টতার চিহ্ন ঘরবাড়ি—ঐ সব ভেঙে গড়িয়ে পড়বে তাদের আলিঙ্গি ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে।

সুলেখা দুই চোখ বড়ো বড়ো করে আরও একটু

সান্নিধ্যে এগিয়ে এসে তিরস্কারের সুরে বললে—যত সব অনাসৃষ্টি ভাবনা!

আমি হেসে বললাম—চলুন, মিস্টার আইচ একা ঘরে রয়েছেন। ওঁর কাছে বসে একটু গল্প করা যাক।

দুজনে ঘরে ঢুকতেই মিস্টার আইচ লেপসুদ্ধু উঠে বসে সাদর অভ্যর্থনা করে বললেন,—এসো, এসো। এখানে বেজায় শীত হে! এ কি তোমরা কেউ গরম জামা গায়ে দাও নি?

এ তিরস্কারে সুদেষ্ণা আইচ আমার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে একটু হাসলেন মাত্র। হ্যাঁ, আমরা দুজনেই যুগল অপরাধী!

স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন—ইনি এলেন, তোমার সঙ্গে গল্প করতে।

মিস্টার আইচ গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে বললেন—উঁহু। আগে গায়ে কিছু দাও তোমরা, তবে গল্প করব।

অগত্যা সুদেষ্ণা গায়ের ওপর টেনে নিলেন একটা স্কার্ফ আর আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন একটি আলোয়ান। দার্জিলিঙের এখন সান্ধ্য আসর আমাদের এই তিনজনের মিলিত আনন্দে জমে উঠল।

পরের দিন ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। তাড়াতাড়ি লংকোটটা গায়ে জড়িয়ে আবার সেই ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালাম। কুয়াশা—শুধু কুয়াশা—দুহাত দূরের জিনিস দেখা যায় না। হঠাৎ সেই কুয়াশা ভেদ করে একখানি ঝক্‌ঝকে মুখ বেরিয়ে এল। চমকে উঠলাম—আপনি! এত ভোরে।

খুব সহজ কণ্ঠে সুদেষ্ণা উত্তর দিলেন—বাঃ রে, এখানে বুঝি বেলা অবধি পড়ে পড়ে ঘুমোতে এসেছি? নিন, চলুন। কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি একা মুখটি বুজে!

আমি বললাম—কোথায় যেতে বলছেন?

শ্রীমতী অবাক হয়েই বললেন—কোথায় আবার! বেড়াতে।

যদিও বেড়াতে যাব স্থির করেই ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম, তবু হঠাৎই কেমন সংকোচ হল। জিগেস করলাম—মিস্টার আইচ যাবেন না?

—উনি ভোরে উঠবেন! তা হলেই হয়েছে। ওঁর এখন মাঝরাত্রি।

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম—না, আজ থাক। অন্য দিন যাওয়া যাবে।

ঠিক এ কথায় শ্রীমতী সুদেষ্ণার মুখের ভাবের কি রকম পরিবর্তন হয়েছিল তা বলতে পারব না, কারণ ঠিক এই সময়েই এক পর্দা কুয়াশা আমাদের দুজনের ঠিক মাঝখানে ব্যবধান সৃষ্টি করে গেল।

কুয়াশা সরে গেলে দেখলাম, শ্রীমতী সেখানে নেই। ঐ যে মুখ নিচু করে নিজের ঘরে ফিরে যাচ্ছেন।

এ অপরাধের দণ্ড মিলল। ব্রেকফাস্টের সময় লক্ষ্য করে দেখলাম, শ্রীমতী আইচ মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করে অন্যদিকে তাকিয়ে রুটিতে মাখন মাখাচ্ছেন। আর মিস্টার আইচ কাছিমের মতো লেপের মধ্যে থেকে কেবলমাত্র মুখটি বার করে স্ত্রীকে উদ্দেশ করে বলছেন—না না মন খারাপ কোরো না। তাতে তোমার শরীরের তো কোনো উন্নতিই হবে না, বরঞ্চ অবনতি হবে। এই পর্যন্ত বলে তাকালেন আমার দিকে।

—কী হে, বেড়াতে যেতে চেয়েছিল, তা নিয়ে যাও নি? না না, তুমিও এখনো ছেলেমানুষ রয়ে গেছ।

সুদেষ্ণা বললেন এই সময়—তুমি সঙ্গে না থাকলে উনি বেড়াতে যাবেন না। এই বলে চকিত কটাক্ষে একবার আমার দিকে তাকালেন।

মিস্টার আইচ সরল হাসি হেসে বললেন—না না অমন কল্পনাও কোরো না। বেড়ানো আমার

ভালো লাগে না। এই ঘরে বসেই যা দেখবার দেখে নিলাম আর দেখা কেবি এই জানলা দিয়ে। দিনে ঠাণ্ডা লাগিয়ে বাইরে বেরিয়ে এর চেয়ে আর বেশি কী দেখবে বলো। না না নির্মল, তুমি অমন ছেলেমানুষী কোরো না। তোমরা বেড়িয়ে বেড়াও, আনন্দ করো—এই পনেরোটা দিনে স্বাস্থ্যটা ফিরিয়ে নাও।

এই নিরীহস্বভাব সরল উদারমনোবৃত্তি মিস্টার আইচের কোনো কথা কোনোদিন ফেলতে পারি নি। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটতে দিলাম না। তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে সেই দিন দুপুর থেকেই বেড়ানো শুরু হল: ন্যাল, অবজার-ভেটরি হিল, বোটানিক্যাল গার্ডেন ঘুরে ঘুরে দেখা আর শেষ হয় না। প্রতিদিন আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়ি আর মিস্টার আইচ ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে হাত নাড়েন—বাই—বাই! সবচেয়ে খুশিমনে হাত নাড়ে সুদেষ্ণা। ভদ্রতার খাতিরে আমাকেও একটু হাত নাড়তে হয়। মিস্টার আইচের গলা পাওয়া যায়—সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরো কিন্তু, নইলে আমি ভাবব।

সুদেষ্ণা আইচের স্টেপ-করা চুলগুলো উত্তরে শুধু মুক্তোর মতো ঝক্‌ঝক্ করে ওঠে। হাত নাড়ে দ্বিগুণ উৎসাহে।

দুপুরে বেরিয়ে যাই এমনি করে, সন্ধ্যার পর ক্লান্ত শ্রান্ত দেহে আবার আমরা ছুটিতে ফিরে আসি। আমাদের দেখে মিস্টার আইচের মুখ প্রসন্ন হাসিতে ভরে ওঠে।—এসো। কেমন বেড়ালে আজ বলো।

সুদেষ্ণা দেবী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন—চমৎকার, আর এ ভদ্রলোক এমন মজা করতে পারেন—সারা পথ একটুও কষ্ট হয় না। আজ আমায় ঘোড়ায় চাপিয়েছেন। উঃ কী ভয় করছিল! এই বলে ক্ষণিক কটাক্ষে একবার তাকালেন আমার দিকে।

মিস্টার আইচ খুশি হয়ে বললেন—এই জন্যেই তো ওকে এত রিকোয়েস্ট করে নিয়ে এলাম। কী ইয়াংম্যান, তুমি কেমন এনজয় করছ?

আমি সলজ্জিত ভাবে বললাম—ভালোই। তবে আপনি সঙ্গে থাকলে আরও আনন্দ পেতাম।

মিস্টার আইচ তীব্র প্রতিবাদের সুরে বলে উঠলেন—পাগল হয়েছ! আমি কখনো তোমাদের সঙ্গে হাঁটতে পারি! যা রাস্তা, দু'পা হাঁটলেই দম আটকে আসে। সেই দার্জিলিঙে এলাম যখন আর দার্জিলিঙ ভোগ করার সামর্থ্য নেই! এই বলে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

তিন দিন কেটে গেল এমনিভাবে ঘুরে ঘুরে। বেড়ানোর যে প্রোগ্রাম করা হয়েছে তাতে এখনো অনেক বাকি—টাইগার হিল থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর সূর্যোদয় দেখতে হবে, দেখতে হবে শিলচর লেক—'ঘুম', মনাস্টেরি। উঠতে হবে বার্চ হিলে—কাটা পাহাড় জলা পাহাড়! উঃ এত দেখবার বাকি! পনেরো দিনের মধ্যে তো তিন দিন কেটেই গেল! সুদেষ্ণা প্রোগ্রামের ওপর লাল পেন্সিলের দাগ দেন আর তাকান আমার দিকে।

—আপনার আর কি! কোনো ভাবনা নেই। যত উৎসাহ যেন আমারই!

পরের দিন অর্থাৎ চতুর্থ দিন স্থির হয়েছে, দূরে কোথাও যাওয়া হবে না, ঠিক মাথার ওপরেই যে পাহাড়টা রয়েছে, আজ দুপুরে আমরা তারই সর্বোচ্চ শিখরে উঠব। এটা তাড়াতাড়ি দেখা দরকার এই জন্যে যে, দূরের জিনিস দেখতে দেখতে কাছের জিনিসই বাদ পড়ে যায়।

আজ দুপুরে এতটুকু রোদ নেই। শুধু কুয়াশা আর কুয়াশা। রোদ তো এখানে ছিটকে আসে বিধাতার কৃপণ মুষ্টি থেকে!

আমরা হোটেলের পিছন দিয়ে পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলাম। টুটিয়াদের বস্তি পার হয়ে

গেলাম। পার হয়ে গেলাম ক্যাথলিক গির্জা। উঠছি তো উঠছিই। কোনো ক্লান্তি নেই শ্রান্তি নেই। পাশেই অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন শ্রীমতী আইচ। পরিশ্রমে তাঁর মুখখানা ভুটিয়া মেয়েদের মতো লাল হয়ে উঠেছে। মাঝে মধ্যে উঁচু জায়গায় ওঠবার সময় হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। আমাকেও হাত বাড়াতে হয়। সেই হাত অবলম্বন করে তিনি ওঠেন।

পথ চলে গিয়েছে এঁকে বেঁকে। ডুয়ে শাড়ি যেমন দেহখানিকে পাকে পাকে বাঁধে—তেমনি নানা পথ পাকে পাকে গোটা পাহাড়টাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। আমরা উঠছি তো উঠছিই, ওরালো ছাড়িয়ে উলালোর দিকে—নিচু স্তর থেকে উঁচু স্তরে। প্রতি স্তরে সারি সারি বাড়ি ঘর। কিন্তু যত ওপরে উঠতে লাগলাম ততই কমে আসতে লাগল ঘরবাড়ির চিহ্ন—মানুষের যাতায়াত। শেষে এসে পৌঁছলাম একেবারে ওপরে। এখানে উঠতেই এক অপার্থিব বিরাট মুক্তির আনন্দে মন ভরে গেল। মনে হল, এতদিনে আমি আমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পেরেছি! এই পৌঁছনই হচ্ছে বড়ো কথা! এই যেন শেষ কথা। আবার ফিরে যাওয়া মানেই—স্বেচ্ছায় পতনকে বরণ করা!

এখানে মাথার ওপর অনন্ত আকাশ—আর চারিপাশে নিষ্ঠুর পাহাড়ের কঠোর আলিঙ্গন। এখানে সূর্যালোক নেই—শুধু ধোঁওয়া। এখানে জনমানবের ভিড় নেই—শুধু আমরা দুজন। এখানে একটি পশুপক্ষীরও সাড়া নেই—শুধু আমাদের দুজনের দীর্ঘশ্বাস।

আমি বসে পড়লাম একটি পাথরের ওপর। শ্রীমতী আইচ আর এখানে কোনো সংকোচ মানলেন না, স্বচ্ছন্দে আমার পিঠে হাত রেখে কাঁধের ওপর মাথা গুঁজে বসে রইলেন। বাধা দিলাম না। থাক না একটা দিন—কয়েকটা মুহূর্ত তো।

আমরা দুজনেই চুপচাপ—এমনি কতক্ষণ।

—কী ভাবছ?

চমকে উঠলাম।

—কারও কথা মনে পড়ছে বুঝি?

মাথা নেড়ে সায় দিলাম, হাঁ।

—কার কথা?

—তাকে তো তুমি চিনবে না। সে আমার এক ছোট্ট বান্ধবী। এমনি ভাবেই এক জুলাইয়ের দুপুরে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম আমরা নিরুদ্দেশের পথে। সেদিনও রোদ ছিল না। গুড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। আর সেই বিন্দু বিন্দু জলে ওর চশমার লেন্স যাচ্ছিল ঝাপসা হয়ে। আমরা হাঁটছিলাম দুজনে—এমনিই পাশাপাশি কাছাকাছি। সেদিনও পথে লোক ছিল না—একটিও—সেদিনও মাথার ওপর এমনি মেঘলা আকাশ ছিল অনন্ত! শুধু প্রভেদ—সেটা শহর কলকাতার উপকণ্ঠ—আর এটা দেবতাত্মা হিমালয়!

শ্রীমতী সুদেষ্ণা ধীরে ধীরে আমার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। তারপর জিগ্‌গেস করলেন—তিনি এখন কোথায়?

আমি বললাম—হারিয়ে গেছে।

শ্রীমতী ভ্রূভঙ্গি করে বললে—মন থেকে নাকি?

—না। তার সংসারের নিত্য ব্যস্ততার তাগিদে। বৃহত্তর প্রয়োজন তো এমনি করেই ছোট্ট সুখগুলোকে বিনষ্ট করে দেয়। মানুষ সরে গেল। কিন্তু সেই একটি দিনের স্মৃতি একটি উজ্জ্বল বিন্দুর মতো আমার কাছে থেকে গেল। ওটা বোধ হয় মুছে দিতে পারবে না কেউ।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। শ্রীমতী সুদেষ্ণা মাথা নিচু করে পাষাণের গায়ে পাথরের টুকরো দিয়ে আঁচড় কাটছিলেন। হঠাৎ দেখতে পেলাম তাঁর দুই গাল বেয়ে নিঃশব্দে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে।

তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে বললাম—কী হল ?

উত্তর দিলেন না শুধু মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিলেন অমনি ডানদিকের ঘাড় পর্যন্ত কোঁকড়ানো চুলগুলো ঐ দিকে এসে পড়ল। আর সেই ঘুণীকৃত চুলের আড়ালে একটি অশ্রুধৌত মুখের আংখানি ফুটে উঠল সুলেখা তাকিয়ে রয়েছেন আমার দিকে একদৃষ্টিতে।

আরও কিছুক্ষণ কাটল। বেলা পড়ে আসছে। আমি বললাম—এবার উঠতে হয়।

নিঃশব্দেই উঠলেন সুলেখা আইচ। নিঃশব্দেই নেমে চললেন পাশে পাশে। তারপর এক সময় হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে আমার হাতটা ধরলেন। ভারী গলায় বললেন—নির্মল, সত্যিই তুমি ভাগ্যবান! সুখের দিনে বসে দুঃখের আগের pastএর মধ্যে ফিরে যাবার সুযোগ যাদের জীবনে আছে তারা সত্যিই ভাগ্যবান। আমার কোনো past নেই—সবই বর্তমান—নিষ্ঠুর বর্তমান। বলতে বলতে চোখের জলে আবার তাঁর দৃষ্টি রুদ্ধ হতে লাগল।

—I had so many friends. But—

আবার একটু থামলেন শ্রীমতী আইচ।—কিন্তু তারা জলের রেখায় স্বাক্ষর করে গেল। একটাও স্থায়ী হল না। তারা কেউ past তৈরি করে যেতে পারল না। এমন একটা বেদনার স্মৃতি নেই যা বুকে আগলে জীবনের সুদীর্ঘ দিন বেঁচে থাকব। Really I am unfortunate—unfortunate!

পরের দিন দুপুরে দার্জিলিঙ স্টেশনে ফিরতি ট্রেনে চড়ে বসেছি। কিছুতেই বুঝতে পারছি না, কেন মাত্র চারদিন পরই আমাদের ফিরতে হচ্ছে। শুধু গত সন্ধ্যায় স্বামী-স্ত্রীর আলোচনার টুকরো কানে এসেছিল। শ্রীমতী সুলেখা বলছেন—আর এখানে ভালো লাগছে না, কালই কলকাতা ফিরব।

মিস্টার আইচ অবাক হয়ে বললেন—সে কী!

—হ্যাঁ, এখানে ঠাণ্ডাটা যেন বড্ড বেশি! শরীর ভালো লাগছে না।

মিস্টার আইচ শঙ্কিত হয়ে বললেন—ঠিক বলেছ। তা হলে কালই চলো। একবার নির্মলের সঙ্গে পরামর্শ করেছ কি?

শ্রীমতী ঈষৎ বিরক্তির স্বরে বললেন—কেন? ও কে—যে, সব বিষয়ে ওর পরামর্শ নিয়ে চলতে হবে! আমরা সঙ্গে করে এনেছি, আমরা যখনই যাব, তখনই যাবে।

এর পর আর আমার পক্ষে শোনা সম্ভব হয় নি। সরে গিয়েছিলাম।

ট্রেন চলেছে। দার্জিলিঙ—বিদায়! বিদায় আমার এই কটি দিনের পথসঙ্গিনী—বিদায়! জানি আর কোনোদিন হিমালয়ের কোনো পাষাণ-চূড়ায় বিগতদিনের সে দুই পাখক মিলিত হবে না। কিন্তু তোমার ঐ একফোঁটা চোখের জলের ইতিহাসটুকুই আমার কাছে রইল পরম সম্পদ হয়ে।

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়
মডার্ণ ডেকরেটরস
৬৫-এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ফোন-৫৫-২৫৪৯

সতীশ চন্দ্র ঘটক ও বাংলা প্যারডি

শ্রীজয়দেব রায়

প্রবন্ধ

বাঙলাদেশে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের যেমন অভাব নাই, বিশুদ্ধ হাস্যরসেরও তেমনই কোনদিনই অভাব হয় নাই। বাঙালী স্বভাবতই কাঁদিতে ভালবাসে,—সাহিত্যেই হোক্ আর সঙ্গীতের মাধ্যমেই হোক্, অশ্রু বিগলিত বাক্যই তাহার প্রিয়তর। কবিকঙ্কণ, কীর্তনে, দেহতত্ত্বের গানে বৈরাগ্যের বাণীই বাঙালী কবিরা শুনাইয়াছেন। বাঙলা-দেশের জলবায়ু, তাহার মাটি আকাশ, তাহার সমগ্র প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীই অধিবাসীদের সংসার-বিমুখ ও দুঃখ-বিলাসী করিয়া রাখিয়াছে। প্রাচীন কাল হইতেই বিরহবিধুর আত্মিকেই সরস করিয়া সাহিত্যের মধ্য দিয়া কবিরা পরিবেশন করিয়া আসিতেছেন।

অবশ্য সাহিত্যে হাস্যরস যে একেবারেই ছিল না তাহা নয়। হাস্যরস সর্বদাই অশ্লীলতার নামান্তর হইয়া উঠিত। আদিরসবর্জিত সুরুচিসঙ্গত হাস্যরস বাংলা সাহিত্যে নাই বলিলেই হয়। যাত্রার সঙ, কবির গানের খেউড় প্রভৃতিতে যে ভাবে হাস্যরস পরিবেশিত হইত—তাহা তদ্র সমাজে রীতিমতো অচল।

সাহিত্যে হাস্যরসের ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ভারতচন্দ্রকে রঙ্গব্যঙ্গের কবি বলা হয়। বস্তুতঃ সে সময়ে নদীয়াধিপ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজসভা হাস্য-পরিহাসে সর্বক্ষণ মুখরিত থাকিত। সুবিখ্যাত গোপাল ভাঁড়ও ছিলেন তাঁহার সমসাময়িক।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এযুগের বাংলাসাহিত্যের গুরুস্থানীয় এবং ভারতচন্দ্রের শিষ্যস্থানীয়। তাঁহারই কাছে পরবর্তী সাহিত্যিকদের হাতেখড়ি হইয়াছে। বিদ্রূপাত্মক হাস্য-রস অর্থাৎ অসঙ্গতির মধ্যে কৌতুকের সন্ধান তিনিই প্রথম দেন, অবশ্য তিনিও সর্বত্র ভদ্রতার গণ্ডী রাখেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র গুপ্ত-কবির শিষ্য। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্র হাস্যরসের কষ্টিপাথরে যাচিয়া কবিতা লিখিতে সুরু করিলেন। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করিয়াছেন—"ঈশ্বর গুপ্ত সাধারণ হাস্য রচিয়াই সর্বপ্রথম বঙ্গসাহিত্যে আসন করেন। তৎপূর্বে বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসকে শুদ্ধ রসের সহিত এক পংক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না। সে নিতান্তই বসিয়া ভাঁড়-ভাঁড়ামি করিয়া মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিত।"

ইংরেজী সাহিত্য হইতে প্যারডিকে প্রথম তিনিই বাংলা সাহিত্যে আনিলেন। প্যারডির ব্যাখ্যায় একজন ইংরেজ কোষকারের উক্তি এই—"A literary composition in which the form and expression of serious writings are closely imitated and adapted to a ridiculous subject or a humorous method of treatment."

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল প্যারডির নামকরণ করিয়াছিলেন 'হাসিকা'। 'আনন্দ বিদায়ে' প্রহসনের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন—

> এটা এক অভিনব নাটিকা।
> ইংরাজী ভাষাতে বলে 'প্যারডি'—জ্ঞানেন ত পাঠক ও পাঠিকা।
> প্যারডিতে প্রহসনে লিখিবে, তুলে নিয়ে অপেরাতে মিশিবে
> কটু ও মিষ্টে (পরে) যা থাকে অদৃষ্টে—
> (বাসো) কুমীরের পৃষ্ঠে ঝাঁটিকা॥

সাধারণের ধারণা ছিল প্যারডি করিতে আসল কবির রচনাকে বুঝি অপমান করা হয়। কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়—প্যারডি কবিতায় এক ধরণের প্রশংসা, অবশ্য ব্যঙ্গ করার ইচ্ছা যে কোথাও থাকে না তাহা নয়।

এই বিষয়ে প্যারডিকার সতীশচন্দ্র ঘটক প্যারডি রচনার ভূমিকায় একটা কৈফিয়ত দিয়াছেন—

"প্রতিটি ছত্র কবিতার মূল অনুভবটিই লালিকা। এটা ইংরেজী 'লারিক' কথার প্রতিশব্দ। কবিতাটিকে যতদূর সম্ভব মধুর করার দিকে আমাদের কবিরা লালিকা লেখকের কাজ। শুকসারীদের ভিতর দিয়ে যখন রাধার অন্তর্লীন প্রেম প্রকাশ হইতে থাকে, তখন আপনা হ'তেই ভাষার ছন্দ নেচে ওঠে।"

এই ভাবেই রামপ্রসাদের প্রসিদ্ধ শ্যামাসঙ্গীতগুলির মূল ভাবকে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন আশু গোঁসাই। তিনি এ ধরণের গানের নামকরণ করেন 'পাল্টা গান'। এগুলি ঠিক প্যারডি নয়। কবিগানের 'উতোরে'র ন্যায়। রামপ্রসাদের 'মনরে আমার এই মিনতি' গানের উত্তর দিয়াছেন—

দৈত্য না মন পড়া পাবি, ওরে বন্ধী হলে হয় না মুখী।
পাবি হলে তত্ত্ব ভুলে তিন যাবে পিছনে থাকি॥

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গানের সংকলক জগদ্বন্ধু ভদ্র 'মেঘনাদ বধের প্যারডি করেন 'ছুছুন্দরীবধ কাব্য' নামে। ইহাতে মূল কবিতার প্রতি কিছু কিছু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সত্যই ছিল, মধুসূদনের বিচিত্র অলঙ্কার এবং ভাষারীতিরও অনুকরণও করা হইয়াছিল ব্যঙ্গ করিবার জন্যই। যেমন,—

অর্দ্ধরাত্রের তলে বিজন গমনে—
(অন্তরীক্ষ-অঙ্গে যথা কলঙ্ক লাঞ্ছিত,
শুধু আগুন ইসমদ গমে সন সনে)
চতুষ্পাদে ছুছুন্দরী মর্ম্মরিয়া পাতা॥

সতীশচন্দ্র ঘটক 'মদকবধ কাব্যে'র পাঁচ সর্গে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধে'র প্যারডি করিয়াছেন—

বসে যথা নভস্তলে তারাদল সাথে
শশাঙ্ক, নিভৃত কক্ষে বসিয়া একেলা
হেরিত মদকবৃন্দে আমিও তেমতি
হে দেবি ভারতি! তব উপাসনারত
নির্বাক নিশ্চল.....।

—এই ভাবেই কাব্যারম্ভ হইয়াছে।

প্যারডির মূল কবিতা সর্বজনপ্রিয় এবং সুপরিচিত না হইলে তাহার যোগ্য সমাদর হয় না। যে কবিতা বা গাথা লোকের মুখস্থ রহিয়াছে অথবা প্যারডি শোনামাত্র পাশাপাশি যাহার মূলের সহিত তুলনা করা চলিতে পারে তাহারই প্যারডি সম্ভব। তাহা না হইলে রসরস ঠিক মতো হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

প্যারডি রচনায় মৌলিকতা বিশেষ কিছু লাগে না; মূল কবিতার ভাষা, ছন্দ প্রভৃতি তো বজায় থাকেই—কেবল শব্দগুলির অল্প পরিবর্তন করিলে কিরূপ রসান্তরের সৃষ্টি হয় তাহারই কৃতিত্ব প্রদর্শন। ইহা একটি স্বতন্ত্র আর্ট—হাস্যরসের পোঙ্গিতেই ইহার স্থান। রবীন্দ্রনাথ গোবিন্দচন্দ্রের স্বদেশী গানের প্যারডি করিলেন—

কতকাল রবে বল ভারত রে, শুধু তালচাত জল পথ ক'রে।
দেশে অন্ন জলের হ'ল ঘোর অনটন—বয় হুইস্কি সোডা আর
মুর্গি মটন॥

রবীন্দ্রনাথের কবিতার সর্বপ্রথম প্যারডিকার হইলেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, কবির 'কড়ি ও কোমল'-কে ব্যঙ্গ করিয়া তিনি রচনা করিলেন 'মিঠে ও কড়া'। দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গানের প্যারডি করিয়াছিলেন। আধুনিক কালে সতীশচন্দ্র ঘটক তাঁহার পূর্বতন কবিদের যে ভাবে প্যারডি রচনা করিয়াছেন, সেগুলিতে ব্যঙ্গের নাম-গন্ধ নাই; ইহা পুরোদস্তুর রঙ্গ রচনা।

সতীশচন্দ্র সুপণ্ডিত ছিলেন। 'লালিকাগুচ্ছ' ও 'রঙ্গ ও ব্যঙ্গ' নামক তাঁহার দুইখানি রঙ্গরসের বই ছিল। প্যারডি ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য রচনাতেও হাস্যরস ফাটিয়া পড়িয়াছে।

হাসি সম্পর্কে কবিবরের নিজের উক্তি হইল—"অতএব স্থির হইল যে, মানুষের পক্ষে দিবারাত্র হাস্য করা কর্তব্য—তখন যে জাতি হাসিতে জানে না, তাহাদিগকে এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য, যেহেতু শাস্ত্রব্যতীত জনসমাজকে শিক্ষা দিবার অপর কোনও উপায় নেই। সে কারণ বঙ্গভাষায় হাস্যশাস্ত্র রচনা করা অত্যাবশ্যক হইয়াছে।"

সতীশচন্দ্রের মৌলিক হাস্যরসাত্মক কবিতাগুলিও সুপাঠ্য; ভট্টাচার্য মহাশয়ের চটি জুতা চুরি লইয়া রচিত শোকগাথার অশ্রুধারা হাস্যোচ্ছ্বাসে পরিণত হইয়াছে—

হে আমার চটি!
কিনিয়া ছিলাম তোমারে যে আমি বাঁধা দিয়ে ঘটি।
মনে নাই কি যে তালতলা গিয়া কিনিনু তোমারে এক টাকা
দিয়া।

এবে তুমি কোথা যাইলে চলিয়া মোর পরে চটি ?
কোন অপরাধে হইলে নিদয় হে আমার চটি ?

কেশ সমস্যায় বিব্রত কবি যে ভাবে কৈফিয়ৎ গবেষণা করিয়াছেন এবং শেষে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা এক কথায় অপূর্ব—

অগত্যা শেষেতে আমি করিলাম ঠিক
সম্ভাবনা বুঝে আর ভেবে চারিদিক ;
নূতন প্রকারে চুল বাঁধাই বিহিত
পিছন দিকে বড় আর সামনে বিপরীত ॥

এ সব কবিতা অপেক্ষা প্যারডিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, নজরুলের বহু প্রসিদ্ধ গানের সর্বাঙ্গসুন্দর প্যারডি তিনি রচনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাসের পদাবলী এবং প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ও কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কয়েকটি কবিতা অবলম্বনেও তিনি রঙ্গরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। বিনয়ী কবি উৎসর্গপত্রে তাঁহাদের কাছে প্রথমেই ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লইয়াছেন—"আপনাদের কবিতার ছবি লালিকার টেরা বাঁকা আয়নায় ফেলে আপনাদেরই হাতে দিচ্ছি, কেমন দেখাচ্ছে বলুন তো ? খুসী না হোন্—চটবেন না।"

রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী, হৃদয় যমুনা, দুই পাখী, সতীশচন্দ্রের সোনার ঘড়ি, ব্যথিতা যমুনা এবং দুই লাউ প্যারডিতে কি অপূর্ব রঙ্গরস লাভ করিয়াছে তাহার কিছু কিছু নিদর্শন এই—

সোনার ঘড়ি— গগনে উদিল উষা হল ফরসা,
ঘরে একা বসে আছি নাহি ভরসা ;
রাশি রাশি তারা তারা বই পড়া হ'ল সারা
শ্লোক নাই পড়ি ধারা আঁখি সরসা,
পড়িতে পড়িতে বই হ'ল ফরসা ॥

ব্যথিতা যমুনা— যদি ধরিয়া লইবে মৎস্য
এস ওগো এস মোর পুকুর ধারে,
খলবল খলবল নাড়িছে মাছেরা জল
কাতলাটি বাবে তল ফেলিলে চারে ।

দুই লাউ— মাচার লাউ ছিল বাঁশের মাচাটিতে
বনের লাউ ছিল বনে,
একদা কি করিয়া মিলন হ'ল দোঁহে
কি ছিল রাঁধুনীর মনে ।
বনের লাউ বলে, মাচার লাউ ভাই
মাচাতে কি করেই ছিলে,
মাচার লাউ বলে, বনের লাউ, হায়
বনেতে কেন গজাইলে ?

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গানগুলির সুর, ছন্দ, রীতি সমস্ত বজায় রাখিয়া ঘটকমহাশয় যে প্যারডিগুলি রচনা করিয়াছেন, সেগুলি রবীন্দ্রনাথের গানের সুরে গাওয়া

'নাভানা'র বই

প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প

বাংলা ছোটোগল্প প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখনীর জাদুতে জীবনের রহস্য, বিস্ময়, বৈচিত্র্য ও গভীরতার অনাস্বাদিত-পূর্ব রসলোকে উত্তীর্ণ। সংহত সুষমা ও শিল্পসৌকর্যের সুদুর্লভ নৈপুণ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র দেশ-বিদেশের বিরূপাক্ষ কথা-সাহিত্যিকদের সমকক্ষ। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত উৎকৃষ্ট গল্পসমূহের মনোজ্ঞ সংকলন ॥ দাম : পাঁচ টাকা ॥

প্রতিভা বসুর নতুন উপন্যাস

সমুদ্র-হৃদয়

'সমুদ্র-হৃদয়' প্রতিভা বসুর সর্বাধুনিক উপন্যাস। দুটি বিরুদ্ধ হৃদয়ের আগ্নেয়গিরি থেকে এই অগ্ন্যুদ্গিরণ কাহিনীর জন্ম। নবাব সুলতান আমেদের ভালো লাগার আলো কি ক'রে ভালোবাসার আগুনে আহুতি হ'লো আর নবাবের সবুজ মহলে বন্দিনী সুলেখা তালুকদারের চির-সঞ্চিত অশ্রু আকাশ অবশেষে কোন্ অতলান্ত মমতার আকুল উথাল, 'সমুদ্র-হৃদয়'এর নিয়তি-নির্দিষ্ট পরিসমাপ্তিতে তা সকল বিধুর বেলায় আঁকা পড়েছে ॥ দাম : চার টাকা ॥

দীপক চৌধুরীর উপন্যাস

ফরিয়াদ

'ফরিয়াদ' উপন্যাসের ব্যারিস্টার নিমাই চ্যাটার্জি ধর্ম-অধিকরণের দরবারে এক মর্মান্তিক নালিশ নিয়ে উপস্থিত। তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী, তাঁর সন্তানের জননী এলাক্ষী শয়তান সিতাংশু মিত্রের শিকার হ'য়ে পালিয়ে গেছে। মাতৃমূর্তি দেশ-বিদেশের নাইটক্লাবে ভূমিকা নিয়েছে মোহিনী নৃত্য-শিল্পীর। সুন্দরী এলাক্ষী আর দুঃখিনী প্রমীলাদের পণ্য বানিয়ে সিতাংশুর লেনদেন চলছে পৃথিবীর বন্দরে-বন্দরে। টাকা চাই, ডলার পাউণ্ড সিলেটা চাই। অঢেল টাকা ছাড়া ধমনীতে রক্ত আসে না, মাতৃত্বের নাড়ি শক্ত হয় না। টাকার জাদুতেই গায়দের মজবুত গরাদে আলগা হ'য়ে যায়, আসামী সিতাংশুরা পালিয়ে গিয়ে আরও প্রবল প্রভু হ'য়ে ওঠে। এই টাকাই আজকের পৃথিবীতে পয়লা আসামী ॥ দাম : চার টাকা ॥

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩

হইতে পারে। মূলের সহ পার্থক্যটি পাঠিলে অপূর্ব রসের অবিচ্ছেদ সৃষ্টি হইতে পারে। কথার সামান্য রূপান্তর করিয়া গানের ভাবকে সম্পূর্ণরূপে বিদেশী ও করিয়া তোলা হইয়াছে। যেমন, ছাত্রদের হোস্টেলের কাছেই গান করিয়া ভোলী না পাইবে হাওয়ান করিতেছে রবীন্দ্রনাথের 'বল দাও, মোরে বল দাও'-এর সুরে—

'ফল' দাও মোরে ফল দাও, হাতে হাত মোর চাকতি,
কখিনে লও ছুটায়ে, তোমারে করি এ মিনতি।

পরীক্ষকরা কেন-করা ছাত্রদের প্রেস দিয়া পরীক্ষা-সমূহ পার হইতে আহ্বান জানাইতেছেন—'ওগো কে যাবি পারে'-র সুরে—

ওগো, তোরা কে যাবি পারে ?
আমি 'প্রেস' দিয়ে বসে আছি ছুটি পেপারে।
ওপারেতে যাবরে ভাই ঢুকে পড় এ সুযোগে
এপারেতে রয় শুধু বড় চিবারে॥

উক্তি 'সোনার বাংলা' গানে 'সোনার মামলা'-ই চাহিয়াছে—

আহার সোনার মামলা আমি তোমায় ভালবাসি,
তিনিন তোমার আলাল, তোমায় দালাল
আমার ঘাড়ে লাগায় ফাঁসি।
ওরে আশ্বিনে তোর ছুটির দিনে ত্রাসে পাগল করে
(মরি হায়)
ওরে বৈশাখে তোর পচা ক্ষেতে সেজে 'কখিনরাজ'
কাশি॥

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, কবি নিজেই স্বয়ং ওকালতী করিতেন। ওকালতী শেষ পর্যন্ত ছাড়িয়া দিতেও বাধ্য হইয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রেমমূলক গানগুলিকে সতীশচন্দ্র কৌতুক-রসে নবরসোদ্দীপ্ত করিয়াছেন—

ধনধান্যপুষ্পে ভরা আমাদের এই বসিকাতা,
তার মাঝে এক আপিস আছে সব আপিসেরই সেরা ;
ও সে ইটপাথরে তৈরী আপিস, রেলিং দিয়ে ঘেরা।
এমন আপিস কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি,
সকল ছেলের বাবা সে যে আমার কর্মভূমি॥

তাঁহার তর্কিতসপ্রাবিত 'গঙ্গাস্তোত্র' সতীশচন্দ্রের হাতে 'টগাস্তোত্রে' পরিণত হইয়াছে—

পতিতোদ্ধারিণি টগে !
পাপ-নিবারণ-জল তব-বিতরণি, ফুল কলস-পদ !
কত পদ-পরশী সিদ্ধ হইল তব চুক্তি-কণ-গুণ পাই ;
কত বড় বাড়ী লভ্য হইল মা তব চলিলে অবগাহি॥

অতুলপ্রসাদের ওস্তাদী গানের সুর 'বাদল দিনে ঘুম ঘুম ঘোলে' শুনিয়া তাঁহার পশ্চিমবঙ্গের বাদলের আওয়াজ মনে পড়িয়া গেল। তখন তিনি গাহিলেন—

বাদল বচা বচা দোলে না জানি কি বলে,
বুঝিতে পারি না, বাধা প্রবণ ঘুমালে।
সারাটা দুপুর ধরি শুনাইছে গান ঘোরি
বিজলী-সমান তালে নাচে
গাধা কুকুরগুলি পুচ্ছ তুলি গাছে
হাবিব পরাণখানি কার নিকট গলে ?

তাঁহার হাতে রজনীকান্তের 'কাঙাল বলিয়া করিও না হেলা' সুর পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে পূর্ববঙ্গবাসীদের করুণ মিনতিতে পরিণত হইয়াছে—

বাঙাল বলিয়া করিওনা হেলা, (আমি) আহার
ব্যাপারী নহি গো।
শুধু মনের ভাবকে মিষ্ট করিয়া 'গলের বাতটি
কহি গো॥

রজনীকান্তের 'তুমি নির্মল করো মঙ্গল করে'র সুরে কবি গাহিয়াছেন 'ম্যালেরিয়া-প্রশস্তি'—

তুমি নির্মূল কর মঙ্গল করে শোষিত চর্ম শুকায়ে ;
তব কম্প ভীষণ ঘিরে যায় ঘোর ঘোর লিভারে
চুকায়ে॥

নজরুল ইসলামের গজল সুরে 'কে বিদেশী মন উদাসী' কবির লেখনীতে অপূর্বরূপ ধরিল—

কে সুকেশী মহাজনী ফাঁসের ফাঁসি লাগাও মনে ?
ঘুঘুরো ভাগে পড়া জাগে, কুসুম রাগের চুপবদনে।
ঝিমিয়ে আছে হোমরা কাকা, ঘুড়ীর চোখে আবেশ
মাখা
কাতর ঘুমে ঠাকুমা বাকা ঘোর ভবনের দরদালানে॥

সতীশচন্দ্রের এই প্যারডিগুলি আদর পায় নাই। আজ সেগুলিকে বাঙালী একরকম বিস্মৃতই হইয়াছে। ইহাতে বাঙালীর হাস্যবিমুখ চরিত্রেরই পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এধরণের আর্টের আদর করি না, ইহা যে কত বড় আর্ট তাহা বুঝি না, তাহার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই।

সতীশচন্দ্রের প্যারডি সম্বন্ধে তাঁহার পরমবন্ধু কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়ের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এ প্রসঙ্গের উপসংহার করি—"প্যারডির হাস্যরস wit শ্রেণীর বোধনন্দ-দায়ক হাস্যরস। সে জন্য এই রসের সৃষ্টি করিতে হইলে লেখককে একাধারে পণ্ডিত, রসিক এবং রসস্রষ্টা হইতে হয়—নিখিল শব্দ ভাণ্ডারের অধিকারী হইতে হয়—অন্যান্য উপকরণের জন্য বহু রঙ্গরসের রচনার পাঠক হইতে হয়, সেই সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর versifier ও হইতে হয়। সতীশচন্দ্রে এই সমস্তেরই শুভ সম্মিলন ঘটিয়াছিল……"।

ভারত-ছন্দ

শিশু রংমহল—শ্রীকলাকার

রবীন্দ্রজন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে শিশু রংমহলের প্রস্তুতি দেখিতে আসিয়াছিলাম। অতিথি ছিলেন সাংবাদিকগণ এবং বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত শ্রীমমল ঘোষ ও শ্রীশঙ্খিনাথের বন্ধু ছেলেমেয়ে। সাজের পরিবর্তে সি এস টি এর একটি ক্লাসরুমের সংলগ্ন স্থান। সমুখে শ্রোতার সংখ্যালঘুর সেখানে পরিচিত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বসে তিলক এঁকে আবহমূহূর্ত করিয়া রাখিয়াছে। প্রায় দুইশত শিশু এবং ১২ জন শিক্ষক এই প্রতিষ্ঠানের অধীনস্থ।

রবীন্দ্রনাথ ও শিশু রংমহল—একই তারিখে উভয়ের জন্ম। মনে হৈমাসে প্রতিষ্ঠিত শিশু রংমহল শত বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যপূর্ণ পদক্ষেপ। স্বভাবতই মনে হইতে পারে কি ভাবে ইহারা শতজন্মতিথি পালন করিবে। শিশু রংমহলের প্রতিষ্ঠাতা অমর চট্টোপাধ্যায় তাহার বক্তব্য করিয়া চাক্ষুষ প্রমাণ উপস্থিত করিলেন সাংবাদিকদের নিকট।

সুন্দর শোভন শিক্ষা গৃহে বিভিন্ন ঘরে ১৪০টি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে শ্রীবালকৃষ্ণ সেনের প্রমুখ নৃত্যশিল্পীর নিকট আজ তিনদিন শিক্ষা লাভ করিতেছে। কেমন শিক্ষাপদ্ধতি সেকথা বিশ্লেষণ। রবীন্দ্রনাথের নানা রচনা হইতে চয়ন করিয়া একটি সুন্দর পালা রচিত হইয়াছে। বিভিন্ন বয়সের শিশুদের মনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ইহা রচনা করা হইয়াছে যাহাতে এ উৎসবের ছোঁয়া কোন শিশু বাদ না পড়ে। আরেকটি উপভোগ্য জিনিস ব্যালে শিক্ষা পদ্ধতি। হাতের ভাব কি করিয়া ধাপে ধাপে বাড়াইতে হয় তাহাও সাংবাদিকগণ প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেন।

আরেকটি দ্রষ্টব্য—ইহাদের লাইব্রেরী ঘরে রবীন্দ্রজন্মতিথি উপলক্ষে হচ্ছে স্টেজ। একই স্টেজে তিনটি বিভিন্ন দল এবং একই সময়ে ২০০টি ছেলেমেয়ে নাচিতে ও অভিনয় করিতে পারিবে। দৃশ্যপট-পরিকল্পনা মৌলিক ও সুন্দরের সঙ্গী। শ্রীসুরেন চক্রবর্তী পরিচালকের নির্দেশটুকু সুন্দর ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ১৫ ফুট প্রস্থ এই স্টেজটি দেখিবার মত।

পোষাক পরিচ্ছদের বৈচিত্র্য ইহাদের পোষাকের ঘরে পাওয়া গেল। প্রায় তিন হাজার টুকরা পোষাক জমায়েত রহিয়াছে এবং শ্রীমতী অঞ্জলি সেনগুপ্তার নেতৃত্বে রবীন্দ্র-নাথের এই অনুষ্ঠানের জন্য প্রায় আরো ৩০০ টুকরা পোষাক ডিজাইন হইতেছে। সারা বছর ধরিয়া যে নিষ্ঠার সহিত কাজ চলিতেছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। সঙ্গীতগুরু শ্রীমতী কমলা বসু ও শ্রীদেবব্রত বিশ্বাস তাঁহাদের ছাত্রছাত্রী সহ এই বিশেষ অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করিতেছেন। এই সকলের সমন্বয়ে আগামী ডিসেম্বর মাসে সি এস টি কেন্টিডালে যে একটি অপূর্ব অনুষ্ঠান হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

সি এস টি ঘুরিয়া ঘুরিয়া আরেকটি চমকপ্রদ প্রচেষ্টা দেখিলাম। এক বৎসরের উপর সি এস টির শিক্ষক শ্রীসুরেশ সরকার নেতৃত্বে বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গের পুতুলনাচ প্রবর্তন করার চেষ্টা হইতেছিল। প্রায় ২০ মিনিট এই প্রচেষ্টার প্রথম ফলাফল দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। রাড ও বড় পাপেট আমাদের দেশের ছোট ছেলেমেয়েরা যেভাবে রপ্ত করিয়াছে তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে সুযোগ পাইলে পাপেট নাচে আমাদের ছেলেমেয়েরা অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইতে পারে। আগামী কেন্টিডালে ইহাদের পুতুলনাচ আরেকটি স্মরণীয় ঘটনা হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

সর্বশেষে সি এস টির শিক্ষাকেন্দ্র দেখিয়া এ কথাই মনে হইল যে বাংলাদেশে শিশুশিক্ষণ বিভাগে শিশু রংমহল আজ অবশ্য ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

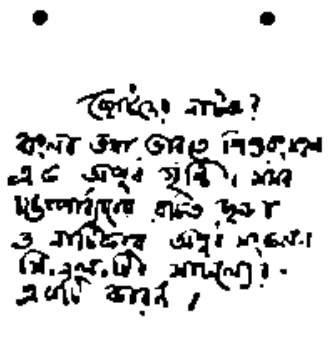

অবন পটুয়া—২·৫০
মিঠুয়া—১৲
সাতভাই চম্পা—২৲
জিজো—৭৫
হাসিখুসীর মেলা—১·৫০
যাদুকরের দেশে
একটি ঘাসের পাতা
} যন্ত্রস্থ

সর্বত্র এজেন্ট আবশ্যক।

॥ শিশু রংমহল প্রকাশনী ॥

২ তিলক রোড, কলিকাতা ২৯ : : ফোন ৪৬-১২০০

কুমারেশ ঘোষ (ব্যঙ্গরচনা)

ওহে শোনো, শোনো···

কে ?

আমি সেনেট হল।

সেনেট হল ! কী ব্যাপার ?

ব্যাপার দেখছো না ? অন্ধ নাকি ?

অন্ধ হতে যাবো কোন দুঃখে ?

দুঃখ আর বুঝবে কি ? বুঝলে অন্ধ আমাকে বাঁচাবার জন্যেও অন্তত সভা-সমিতি বা বিক্ষোভ মিছিল বার করতে। বলি, এককালে তো আমার এই সিঁড়িতে—

তা উঠেছিলাম। ঐ সিঁড়িকেই মনে করতাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকবার সিঁড়ি ! কিন্তু তাতে হয়েছে কি ?

সে কি গো ?

আমরা এখন বিদ্যের আরো উঁচু ধাপে উঠতে চাই তাই আরো অনেক সিঁড়ির দরকার। লিফট্ দরকার দেখো না, ছেলে-মেয়েরা আজকাল কত-কত বই পড়ে !

কিন্তু—

কী ? কিছুই শোন না ? শুধু মোট পড়ে আর বমি করে—?

তাই তো শুনি—

দেখুন, আপনি সেকেলে বৃদ্ধ। এসব ঠিক বুঝবেন না। আমরা আসল থেকে নকলেরই ভক্ত। এখন ঘি-এর বদলে বনস্পতিই চালু। বাইরের ভড়ংই বড় কথা।

তাই নাকি ?

হাঁ। তাই বিদ্যার বদলে বিদ্যালয়টির দিকেই ঝোঁকটা বেশী। আপনার জায়গায় আমরা স্কাই-স্ক্র্যাপার গড়াবো—ঠিক দেশলাই-বাক্সের মত।

সে কেমন দেখতে হবে ?

মানে কি ? No cornice, no pillar ! শ্রেফ plain & high. Plain living & high thinking-এর মত।

কেন ? আমার এই রোমান ডিকাইনটা আর পছন্দ হলো না ?

বড্ড পুরোনো। তাছাড়া এখন এটা রোমেও নয়, মার্কিন মুলুক। এরা-সভ্যতার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলা দরকার—

কিন্তু আমার এই অট্টালিকার একটা ঐতিহাসিক মূল্য ছিল—

থাকতে পারে। কিন্তু তা বলেই কি এরই জন্যে জড়ো হয়ে বসে থাকতে হবে ? নতুনকে জায়গা ছাড়তে হয়। নিয়ম।

কিন্তু আরো তো জায়গা ছিল ?

এ সহরে আর কোথায় জায়গা ? সেদেনমি, পাকিস্থান থেকে উদ্বাস্তু এলো, আসাম থেকে আসছে, আরো যে কোত্থেকে আসবে, কে জানে ! এখানে এসে ন স্থানে হিত-ধারেণ। কিন্তু দেখবেন, পাকাতাবাসে এরা এদের ঐতিহাসিক সব কিছুই কেমন সযত্নে রক্ষা করবে !

আরে মশায়, এটা ভারতবর্ষ ; বিশেষ করে বাংলা দেশ, এটা ভুলছেন কেন ?

হাঁ, আমারই ভুল !

কেন, বঙ্কিমচন্দ্রই তো বলেছিলেন, বাঙ্গালীর ইতিহাস নেই—

কিন্তু আমার জীবনে কত ঐতিহাসিক ঘটনাই না জড়ানো আছে ! অবশ্য আজ মরতে বসেছি—

সেটা বাঁচবার কোন qualification নয়।

নয় ?

না। শুনুন তবে। বরঞ্চ ঘড়িও মাপের কাছে আমারবাড়ির গল্প করার মতই শোনাবে—

তা হোক, বলে যখন শাবল-গাঁইতির আঘাত সহ্য করতে পারছে, তখন পারবো তাদের নির্লজ্জ হাসি শুনতে!

হাসিটাসি কি, জানেনই তো, ঐতিহাসিক মহাপুরুষরা আজ মাটির তলায়, নাস্তিক রুশদেশও মুখর তাঁদের মূর্তি-স্থাপনে, স্পেনের হিটলার-মুসোলিনীও ধূলোকাৎ, আর আপনি আমার সেনেট হল নিয়ে হাসছেন বলে হৈ-চৈ করবার কি এমন আছে?

অভ্রভেদী কৃতি না এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রত?

তাতে হয়েছে কি? বলি, বিশ্ববিদ্যালয় তো আর উঠে যাচ্ছে না আপনার হাতে। বরং আরো গজাচ্ছে অন্যান্য জেলায়—তাছাড়া আমার ছিন্নী-পত্রখানাও আর বাকি করতে পারবেন না। কাজেই ভয়টা কি?

কিন্তু—

ওটা বন্ধুর অভিধানে!

হতে পারে। কিন্তু একদিন আমি জীবন্ত ছিলাম, সমর্থিত ছিলাম। আমি বহু লোককে দেখেছি আমার সামনে দিয়ে ঘাবার সময় প্রণাম করতে—

তারা নিরোধ!

সে নিরোধরাই বা আজ গেল কোথায়?

তারা Employment Exchanges লাইন দিয়েছে হয়তো কিংবা চাকরির জন্যে অফিসে যাবা খুঁচছে।

আপনি—

বলুন—

আমার এই ইট-কাঠগুলো দিয়ে যদি নতুন কোন বিদ্যালয় কখনও তৈরি হতো, তাহলেও বোধকরি আমার আত্মার শান্তি হতো—

অর্থাৎ হরিদাসের মতো আত্মত্যাগ করে নাম কিনতে চান?

ক্ষতি কি?

কিন্তু উপায় নেই।

কেন?

কারণ আপনার ঐতিহ্যের কোন মূল্য নেই! বরং আপনার রাবিশগুলো—

রাবিশ!

চমকাবেন না। আপনার সুরুচি রাবিশের ভালো হয়। কাঁচা রাস্তা পাকা করবার পক্ষে দরকারী—

হায়, এও ছিল ভাগ্যে!

পুরুষস্য ভাগ্যং—জানেন তো, দেবা ন জানন্তি—

তা হলে আমার ইট-কাঠগুলো তো বিদ্যালয়ের জন্যেও—

এগুলোর বড় দেকেলে বিদ্যের গন্ধ। আমরা নতুন সভ্যতার সৌরভের আশায় অগ্রগামী, পেছনের বাসি দুর্গন্ধ ভুলব।

বেশ তবে তাই হোক। আগামী দিনের মানুষের পদতলেই হোক আমার পরিণতি!

আমি দুঃখিত।

এই সাধের নগরীকে শেষপর্যন্ত ছাড়তে হলো—

তাতে দুঃখ করবার কিছু নেই। আপনি আজ যাচ্ছেন, আমরাও হয়তো শীঘ্রই যাবো। দুদিন আগে আর পরে—

কেন? কেন?

আমাদের বিদ্যে-বুদ্ধি, আচার-ব্যবহার দেখে বুঝতে পারেন না?

অথচ এই বাংলা দেশেই কত মনীষীরাই না জন্মালেন—

সেটা তাঁদের দুর্ভাগ্য!

তা বটে!

আমাদের কাণ্ড দেখে তাঁরা বুঝি ভয়ে বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেছেন!

কথাটা বুঝলাম না—

কেন, ঐ যে সুরেন্দ্রনাথ, আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন, প্রফুল্লচন্দ্র—ঠিক সামনেই বিদ্যাসাগরের নির্বাক নিস্পন্দ কাক-কলঙ্কিত পাথুরে মূর্তি দেখেও বুঝতে পারেন না?

তা ঠিক।

তা, আপনার এই অবস্থা দেখে বিদ্যাসাগর মশায় কি বললেন?

উনিও তোমার কথায় 'পাথর' হয়ে গেছেন।

যাবারই তো কথা। ভদ্রলোকের বর্ণপরিচয়-টা পর্যন্ত পাঠ্যতালিকা থেকে হটিয়ে দেওয়া হয়েছে!

তাছাড়া উনিও হয়তো ভাবছেন, আমার মত ওঁকেও না জায়গাটা ছাড়তে হয়?

কেন?

তোমাদের বিশ্বাস কি? হয়তো ওঁকে তুলে দিয়ে সিনেমার কোন রূপোসী কন্যার অর্ধনগ্ন মূর্তি ওখানে বসাবে!

তা অসম্ভব নয়।

অতএব আমার জায়গায় সিনেমা হাউস হচ্ছে না, এইটুকুই সান্ত্বনা!

এই তো জ্ঞানীর মত কথা!.....আচ্ছা চলি এখন।

যাচ্ছো? যাও। কিন্তু যাবার মত একটু পায়ের ধুলোও নেবে না?

ধুলো! Old idea! আচ্ছা—ঐতিহাসিক ধুলো! কি বলুন?

[সেনেট হলের সিঁড়ির ধুলো এক মুঠো নিয়ে প্রস্থান]

[স্বগত] হায় বাঙালী!

খালাসি করে যাই হোক দু'পয়সা পায় কটিকটেনের দোকানে। দিন চলে। তা নয়, উপোসে দিন কাটাইতে হ'ত বাদুনা-ফের।' দুখন গেরো কাছে ডেকে বলে নিতাইকে, 'ওরে ও নিতা, বাপের ব্যাটা তুই—বাপের কাম দিবে লে। বাপের পেছু পেছু ঘুইরে তোর ভয় শক্ত হোক। সাহস তর হোক। হেথীন জিব্‌কা ছেইড়ে খালাসি গিরি করবি শহরে বিহেন গেরোর মত? পেতে না পেয়ে মরবি—উড়ন দেইগো? ছা বাপ, ঐ শহরের নেশা ছাড়। আর যেই হোক, জীবনে সুখাস্তি পাবি, আর তা নয়—'

বাপের সব কথা মনে না পড়লেও মোটা কথা মনে আছে নিতাইর। কিন্তু বন্ধু কি বোঝালে! না বুঝলে চোখে—চিরকালের অবিশ্বাসেই থেকে যেত। লুটতিয়া জীবনে সাতপাক খেতে খেতে জীবন গোঁয়াতো নিতাইর। বন্ধু ঠিক কথাই বলেছিল সেদিন। বলেছিল, 'বন্ধু, রাগ করিস না আমার 'পরে। হক কথা কইলে তর পাপে হয়ত লাগবে। কিন্তুন, তবু কই। তর বাপের কোন কাওজ্ঞেনই নাই শহরের নিয়া। রইলে অমন কপা তার চোপা (মুখ) দিকা যাইর হইত না। শহরের মানুষ সুখী নয়—তাদের হাতে টাকা নাই—কে কইল তরে? —দেখবি তার প্রেমাণ ভাগ, চৈখের সামনে খাড় হইছে সাত মইলা বাড়ি। ইমারত গেড়েছে তারা। টকি-বাইসকোপ-গাড়ি-ঘোড়া হরিপুরি বেবাক ত তাদের ট্যাকায়। ভোগের ত কিছুই নাই। জলা-জঙ্গল-জালপাই ঘুইর‍্যা তারা বেড়াইল। কী কাম, না লুটতিয়া। ভ্যাকাইজের কাম। কোন্ কালে কোন্ ভাল মানুষে করছিল? যারা ঘরে বুঝতে লাগব, তাদের কিছুই নাই—না ট্যাকা পয়সা, না মানজ্ঞেন।'

সেদিন আলিপুরের শহর-পটি ফেলে সুধামের দলাদারি মনটা ফিরে এসেছিল। অনুকূল হাওয়া ছিল, মেজাজে কথা বলছিল সুধাম—শহরবাজার জীবনের বিচিত্র জটিলতার কথা। নির্বাক শুনছিল নিতাই। শহরের বিজলীবাতি-ঝলকানো রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে, রেস্তোরাঁর থালের চপ মুখে দিতে দিতে, দোকানে ওটা ওটা কিনতে কিনতে অকস্মাৎ একটা আলাদা জীবনের স্বাদ নিচ্ছিল নিতাই। স্বাদ সে খুঁজে পেয়েছিল সুধামের কথায়। বড় সুগন্ধ সেই স্বাদ। সুধাম বুঝিয়ে বলছিল প্রথম ভাগ পাঠের মতো, 'আর এই যে দেখছিস এত সব সাজ-গোজ শহরের, মানুষের হাসিখুশি—এর পিছে কি আছে জানো বন্ধু, মানুষের ট্যাকা। ট্যাকাই মানুষকে উঠায়—ফের বসায়, হাসায়। আর এই যে ট্যাকা, এই ট্যাকা আইসা জমে এইসব দোকানে। কারবারী মানুষের হাতেই ট্যাকার মাচন। কাঁচা ট্যাকার কারবার।'

নিতাই শোনে আর মনটা তার চনমন করে ওঠে শহরের মানুষের এই সৌভাগ্যে। গঞ্জে গিয়ে কোথায় দোকান খুলবে নিতাই। এ জীবন বাদ দিয়ে দোকান তাকে খুলতেই হবে শহরে। কথাটা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিল সে বন্ধুকে। বুকের গোপন কথাটা খুলে বলেছিল সে সুধামকে। বন্ধু হয়তো সেদিন তাকে বিশ্বাস করতে পারে নি। আজ বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে নিতাই। দুখন গেরোর ছেলে হয়েও শহরের টানে মেতেছে। দুখন গেরোর চোখের ওপর দাল উধাও করে বেচে এলো সুধাম। তাকে নিতে ঘাটে নৌকো বেঁধে বসে আছে বন্ধু নিতাই।

বংশী আগে আগে এসে ডিঙির গলুইটা ধরলো। সুধাম উঠতেই কোন কথা না বলে ডিঙি ছেড়ে দিলে নিতাই। বংশীকে বললে, 'তুই বাড় যার বংশী, আমি এট্টু ঘিরোই।'

কোষডিঙি ছুটল সোজা গেঁয়োখালির নিশানা ধরে উত্তর-পশ্চিম। জলে ছিটিয়ে শ্রাবণ দিনের রোদ ঝকঝক করে। ঘোলা জল তেমন মানায় না। স্রোত উত্তর থেকে বইছে। সূর্য হারিয়ে গেছে থাকা থাকা মেঘের আড়ালে, নীচে স্রোতের গায়ে গায়ে।

নিতাই তাকিয়েছে সুধামের দিকে। কি বলে বন্ধু? কাল অন্ধকার রাত্রে একটা মস্ত ঝুঁকি নিয়ে মোহানা হুগলীর ঘূর্ণির দিকে একলাটাই ভেসে যেতে দেখেছে নিতাই। আজ মানুষটা ফিরে এসেছে নাগালে। কে জানে ঘটন-অঘটনের কী সংবাদ! বুকটা টিপ টিপ করছে নিতাইর। বুকের পাটা-তলের নীচে প্রায় লম্বা হয়ে শুয়েছে বড় একটা অভিপ্রায়। দোকান করতে হবে, সুধাম যা বলেছিল সেদিন লুটতিয়ার এই বেইজ্জতি কাজ ছেড়ে দিয়ে জীবনের কামনা-বাসনা সার্থক করতে হবে। নিতাই বললো, 'কাল রাতে গেচিস্। আমি ভোর দিকে ঘাটে আইসে বসছি।'

বন্ধুর দিকে চেয়ে বললো সুদাম, 'কাল রাইতের মধ্যে কাম অবশ্যি শুরু করছি। কিন্তন আসতে পারি নি ভোর ভোর। কাম ছিল, কামে আটকা পড়ছিলাম।'

'আর এদিকটার কী ব্যাপার?'—নিতাই তাকিয়েছে অপলকে সুদামের মুখের দিকে।

সুদাম একটু এগিয়ে গেল নিতাইর দিকে। বললে, 'ব্যাপার ভালই। কটিকচেঙের দোকানে মাল গছাইতে আমার বেশী বেগ পাইতে হয় নাই। দামের দামও চুইকা দিছি ঠিকঠাক। তবে সব মাল বেচি নাই। কিছুটা রাইখা আসছি তাদের আড়তেই। সাত বোচ্‌কা কাপড়, আর কিছু না। আমাগর ত মালের দরকার আছে, সেই লেইগা—'

'নগদে কত মিলল টাকাটা—' নিতাইর চোখ ঝলমল করে। বন্ধুকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বাঁধতে উঠে আসে সে।

সুদাম বাধা দেয়। বলে, 'আস্ নেতাই। বংশী আছে, ওর বাপে খবর পাইলে জান দিব আমার। তিনশ' টাকা আছে ওতে, এই লে।' কোমর থেকে নোটের গোছা বের করে খুলে দিল বন্ধুকে। নিতাই হাতটা ধরে ফেলে সুদামের। বলে, 'ওর কেছেই থাকুক সুদা। তুইই রাখ্।'

'না'—একরকম জোর করেই বন্ধুর কোলে টাকার গোছাটা ফেলে দিলে সুদাম। বললে, 'বড় দুখে বন্ধু ফকির হয়েছি। এই ছুয়াচুরির দুনিয়ায় আর ছুয়ার খেলা খেলতে রাজী নই। আমার ত ক্যাও নাই তরে কইছিলাম বন্ধু। কাইলকার রাইতে জানছি আমার বইনটা মরে নাই, আছে। ফের ছুয়ার খেলা শুরু হবে জীবনে, আমি তার টায় পাইছি। আমার ভয় সেই লেইগা, তর টাকা ক'টা ফের নাকি হারাইয়া বসি।'

নিতাই বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা। হাবলা চোখ তুলিয়ে রাখে। ভাবে, এ কেমন কথা, রাতের মধ্যে সুদাম হারানো বোনের খবর পেলো কোথা। বোন ত তার অনেকদিন থেকেই নেই।

'ও সুদা, তুই যেন হেঁয়ালি করছিস আমার কেছে। বোন কে তর?' নিতাই বললো।

সুদাম সহজ ভাবে কথাটা বলে, 'আমার বইন, নিজের বইন। সে আছে এইখেনে।'

কে জানে, বন্ধু কেমন মেজাজে আছে আজ! কথা বলছে কাটা কাটা, অসংলগ্ন। কেমন উদাস হয়ে তাকিয়েছে নদীর স্রোতের দিকে, আকাশের দিকে, দূর শহরের দিকে। বন্ধুর কি হয়েছে গো রাতারাতি।

সাহস পায় না নিতাই কথা বলতে। সব কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে। একমুহূর্ত থমকে সুদাম নিজেই বলে, 'বইনটার বিয়া হয় নাই আইজ তরি। বড় দুখে তার নেতাই। আমি তার কথাই ভাবছি।'

সুদাম ভাবে সোনার কথা। মেনকার পাড়ায় সোনা গিয়ে বয়েছে এতটা কাল। খুব সোজা পথটা বেছে নিয়েছে বটে সোনা। সুদাম ভাবে যেমন করেই হোক বোনটাকে এই পাপের মধ্যে থেকে উদ্ধার করতে হবে। বিয়ের ব্যবস্থা সে করবে। কিন্তু তার আগে যদি সোনা বেঁকে না বসে তবেই।

নিতাই তেমনি তাকায় বন্ধুর দিকে। কি হয়েছে সুদামের। কাল রাত্রে গিয়ে বোনের খবর পেয়ে এলো। এখনই এসে তার বিয়ের কথা ভাবছে। এমন ভাবনা কেমন করে ভাবে বন্ধু? নিতাই বলে, 'ক্যামন দুখ গ তার, কে করলে দুখ যাবে?'

'যাবে নেতাই আমি জানি।' সুদাম বললে।

গঞ্জের এলাকা মিলিয়ে যাচ্ছে ক্রমে। বংশী গা ঢেলে দাঁড় মারছে। ডিঙি ঝিরঝির্ করে এগিয়ে যাচ্ছে। সকালের রোদ-রঙ মুছে আকাশে ছানাছানি মেঘ। মহিষকালো মেঘ আসছে দক্ষিণ থেকে। মোহানা হুগলীর ওপর মেঘগুলি যেন থমকে দাঁড়ায়। ঘন ধুম্রো কালো মেঘগুলো। নিতাই ভাবে, বন্ধুর কথা ভাবে। বিয়ে দিলে তার বোনের দুখ যাবে, কেন এমনি যাবে না? টাকা পয়সার অভাব যদি—তবে সে দুখ মোছাতে পারে নিতাই। কিন্তু মনে যদি না পেয়ে থাকে বন্ধুর বোন—তাহলে সে দুখমোচন খুব যে তার। সংসারে সে সুখ, সে স্বস্তি মেটাতে পারে ক'জন? কিন্তু বন্ধু যে বলছে না কিছুই।

নৌকো এগিয়ে যাচ্ছে সামনে। গেরোবালিতে তারা গিয়ে নামবে। কিন্তু নিতাইর মন পড়ে থাকলো গঞ্জে। ওই গঞ্জের রেখা এখনও দেখা যায়।

॥ ৭

ভিনদিন পুরো গড়িয়ে গেল। আর ও-মুখী হতে পারে নি সুধাময়। ছবন মেয়ে আবার কাঁচা টাকা ভেঙে বাড়াবাড়ি বানাতে দিয়ে এসেছে কলকাতায়। তুমি মিস্ত্রী বসেছে বাপকে। হিমু মরলো ভুগে। তার সংসারে এ বছরে কি হবে। বড় ছেলে আর কোথায় কাজের সন্ধানে গিয়ে আসে নি। ছোট ছোট তিন ছেলে—ছোট মেয়েটা—বউটা গেছে ঢালের হোট ঘরে পাড়ালো মিস্ত্রীদের ছুরারে। তিন ছেলে এসে পা ধরলো মিস্ত্রীর, 'আমাদের কি হবে মেস্ত্রীকা, ঘরে দানাপানি নাই।' বাপার ছেলে শুনে পা ঝাড়া দিয়ে উঠে গেল ছবন বললে, 'আমি তার কি জানি—?'

মিস্ত্রীর পায়ের কাছে কটি কটি মুখের কালো কালো ছেলেগুলো জড়সড় করে। প্রাণে বড় ব্যথা লাগে মিস্ত্রীর। বাপ থাকলে তো আসত না, আসেও নি ছবন তখন। বড়

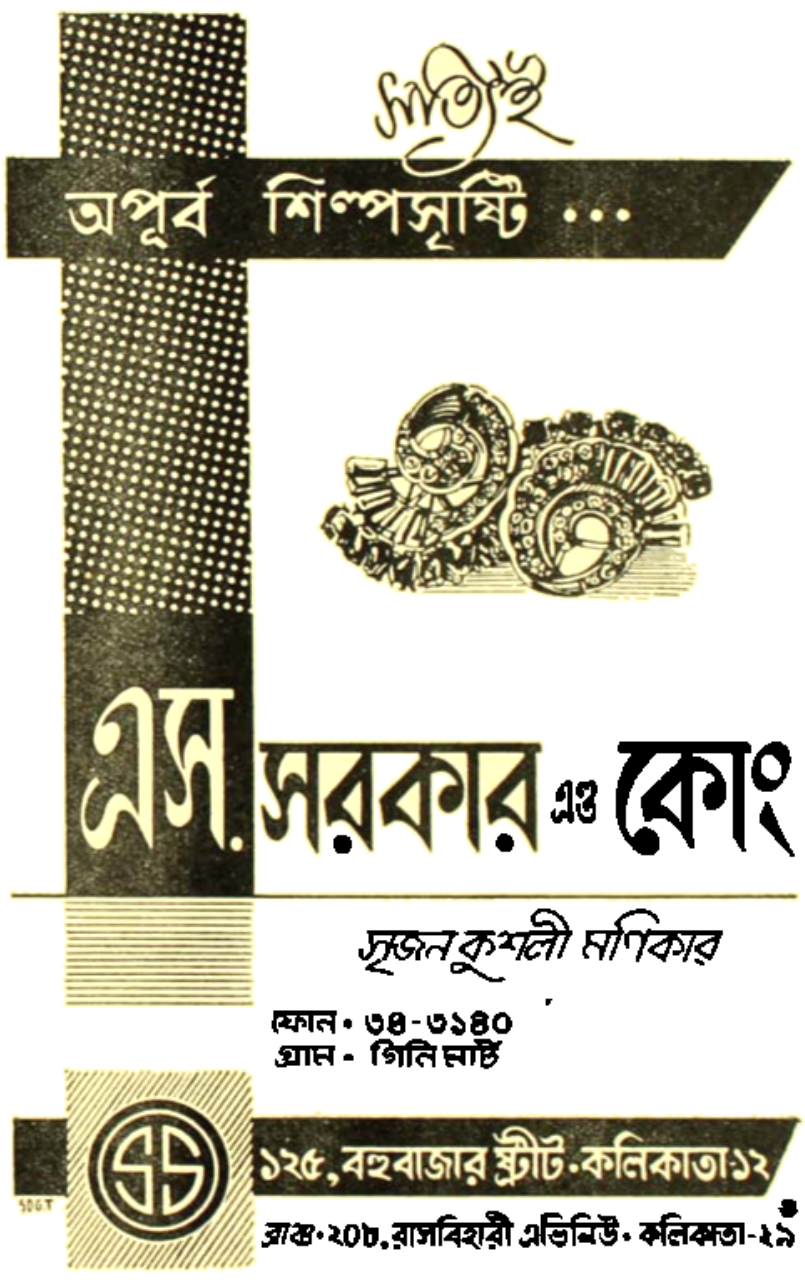

[illegible] পড়ে গেলো। হিমু বউ গলা নামিয়ে বলে, 'বাপ, [illegible] আছি। আজও বাঁচাবি বাপ তুই।'

এই চিন্তা ছিলো নিতাইয়ের। হিমুদুতো [illegible] অথচ খুড়ো, না বুঝে সুজে [illegible] শয়নের ঘুম নাশিয়ে গড়লো। বাঁচাতে [illegible] প্রাণ হারালো একমাত্র ভাইয়ের [illegible]—

রাগ আসতে সব কথা ভুলে বলতে যেয়ে উঠলো ছমন মেয়ে, 'তুই কলঙ্কের ছেলে, তুই তার কী বুঝিস?'

'কি বুঝি না বলো? হিমুখুড়ার বউ-বাচ্চারা খায় নি কদ্দিন ধরে। তাদের আমি দুটা টাকা দিছি।' নিতাই বলেছিল।

তাকে বড়চক্ষু দেখিয়ে শাসিয়েছে ছমন, 'এ্যাত যদি [illegible] তা হলে ঘরে আসে, ঘর থিকে বেইরে যা। সক্কলেশটা আর করস না।'

'সক্কলেশটা করি আমি, না কর তুমি? আমার কথন [illegible] আমি আর যাব নি ঐসব কামে—' দেখিয়ে দেখিয়ে কথা বলে নিতাই। আসল মুখ গামছে কথা বলছে। ছমন [illegible] ঘরের দাওয়ার এক পাশে শুয়ে শুয়ে বন্ধুর কাণ্ড দেখে।

দুপুরটা ছমন-দাওয়া দিয়ে কিড়মিড় করে উঠলো ছমন, 'কি হইলি? যাবি না আমার সঙ্গে?'

'না—মুখ গামছে চলে যাচ্ছিল নিতাই।

ছমন উঠে এসে বন্ধুকে সামলায়। হাত ধরে কসড়া [illegible] দেয়। বলে, 'খুড়া যদি না দেয় টাকা ত আমি দিব যে কটাকে আছে আমার কাছে, তুই ভাবিস না মেতাই।' বন্ধুর কাছে টাকা ধার করে শেষ পর্যন্ত হিমুর পরিবারকে দিয়ে এলো নিতাই।

ছমন টাকা দিয়েছে নিতাইকে। কথাটা জানতে পেরে শেষ পর্যন্ত বড় বেকায়দায় ছমনকে শোধ দিলে কয়েকটা টাকা ছমন। ছমন লক্ষ্য করে ছেলের মতিগতি। মতিগতি বোঝা চায়। শেষ পর্যন্ত মুখ গামছেই ছিল। ছমন এসে গায়ে হাত দিয়ে আদর করে ছেলেকে, 'তর কি হয়েছে মেতাই। আমি টাকা যাদচি কার লেগে। তুই ছেড়া আমার কে আছে ভাগ দেবার।'

নিতাই বাপের দিকে তাকায়, কথা বলে না। মুখের সে ভাব আর নেই ছমনের। ছমন যেন সহজ ভাবেই তাকে বলছে। লুটতিয়া বাপের মতো জালের কারবার খুলে বসে নি। প্রৌঢ় মানুষ বড় করুণ চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। কিছু একটা বলতে চায়।

মন টললো নিতাইয়ের। বললো, 'কি করতে হবে আমায়।'

'তরে কিছুই করতে লাগব নি। তুই খালি আমার সঙ্গে যাবি কলতায়। মিস্তির কেছে বাছাড়ির ধরাতি দিয়ে আসব। বাছাড়ি এট্টা বড় দরকার।'

বাপের কথার ওপর চক্ষিয়ে কথা বলে নি অবশ্য নিতাই। তবে সোজাসুজিই বললে, 'আমি বলছি বাছাড়ি অখন থাউক। পরে পশ্চাৎ আনব গিয়া, এখন যাত দিয়া দরকার নাই।'

'দরকার নাই? তুই কি কইরে জানলি?' ছমনের রক্ত চড়ে আবার।

'আমি জানি, দরকার নাই।'

'তুই জানস—আমি বুঝি না, জানি না গেরো ঘরে। এই এতটা বয়স গেরোগিরি করলম।'

তবু মুখের ওপর কথা বলে নিতাই। বলে, 'তা হলে জন গে—'

মুখ গামছে শেষ পর্যন্ত নিজেই চলে যাচ্ছিল ছমন। সুদাম দেখে আটকায়। বিনয় করে বলে, 'খুড়া যাবো, আমি বন্ধুকে বুঝাই আনে। ওর অমতে কাম করলে ওর পাপে লাগবে।'

ছমন তাকায় সুদামের দিকে। যেমন ছেলে, তার সঙ্গিটিও জুটেছে ভাল। মনে মনে বলে ছমন, হা রে ছোড়া, তুই বন্ধুর হয়ে বলতে এলি। বন্ধুর কথার দাম বাড়াতে চাস, কিন্তু আমার কথার দামটা আর রইলো কোথায়? বললে মুখ ফুটে সুদামের গায়ে লাগবে। নিতাই হয়তো কি অনর্থ বাধাবে। ছমন মেয়ে চুপ করে যায়। মা-ছাড়া ছেলে। পিসী মানুষ করেছে। ছেলেকে আগে থেকে আলাদা দিয়ে এমন মাটি করেছে। তরানক গোঁয়ার এখন। না বললে, হা আর হবে না কোন কালে। শোন, লুটতিয়া বাপ ছমন। তার এমন দুর্বল হলে চলে! কিন্তু উপায় কিছু পায় না

ছুখন। নিতাই আর ফুলমের দিকে তাকায়। কালো সাপের মতো দুটিকে দেখতে। কুচকুচে কালো। ভালমন্দ কথা বলতে নেই। গোঁ হয়ে রয়েছে সব সময়। ছুখন জানে এ বয়সের গোঁ। বড় সর্বনাশের লক্ষণ এ। কি যে হয়!

পিসী ছুটে আসে বাপছেলের ঝগড়া শুনে। এসে দেখে বাপ ছেলে দাঁড়িয়েছে কাঁকে মুখ গোমড়া করে। পিসী আদর করে নিতাইকে, 'বাপ, তর অমতে কে কি করবে? আয় নেতাই, যাওস নি পাবি আয়।'

ছুখনকেও হাত ধরে সরিয়ে দিতে যাচ্ছিল নিতাইর পিসী। বলে, 'দাদা তুমার আবার এ বয়সে হইল কি?'

কোমরের ফেরতা খুলে নোটের গোছাটা খপ করে পড়ে গেল মাটিতে। বাছাড়ি নৌকোর বরাত্তির টাকাটা নিয়ে বেরিয়েছিল ছুখন নগদে কিছু শোধ দিয়ে আসবে বলে। পড়ে যেতে কুড়িয়ে নিলো নিতাই।

'হে, আমার হে—' ঘুরে দাঁড়ালো ছুখন। ছুখন তার আগেই দেখেছে।

নিতাই বললে, 'না, এ ট্যাকা আমার কেছেই যাউক।' আশ্চর্য, কোন কথা আর না বলে ঘরে গিয়ে উঠলো নিতাই। ছুখন চাবাচাকা চোখ মেলে তাকায় তেমনি। যেন পাথর-মূর্তি ছুখনের। নিতাই যেতে যেতে বলে যায়, 'আমার বয়স হয়েছে। আমি হব বুরবক-পুরব। বয়স চালের আমি ওয়াপর।'

ছুখনের পেছনে দাঁড়িয়ে আর একটি মানুষ অবাক চোখে নিতাইকে দেখছে। বন্ধু ফুলম। ফুলম ভাবে, বন্ধু আজ আচ্ছা জিনিসটা দেখালে বটে। এত সাহস কোথায় ছিল বন্ধুর। ছুখন গেরোর কথাকে আজ বাতলে দিলে। মুহূর্তটি সময়ে জিতলে। ছুখন দেখছে, এবার বাছাড়ি চালাবে ছেলে। গেরো হবে।

মেঘ ঘনিয়ে এলো বিকেল যেতে না যেতে। বাতাস বদলে গেল। অগ্নিকোণের বাতাস আসছে। হাড় আছে বাতাসের, কেমন কড়ো কড়ো ভাব তার। ঢেকে ছিল আকাশে। এখনও পশ্চিম কিনারে চকমকি জলার মতো রঙ মেখে রয়েছে। তবু গাদাগাদি মেঘ ঢেলা দিয়েছে সেটা

এবার দুর্গত সেবায়
দুর্গোৎসব হোক

দৈনিক

জনসেবক

১০৪।৭এ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড,
কলিকাতা-১৪

[illegible] ছড়াছড়ি পলাশদির ডাব। ওরেসাঙ্গের কথন, যখন ওর হয়ে রয়েছে [illegible] মতো। বুঝতে হবে [illegible] লোকে বলে, বুড়ুলে [illegible] মেঘের ঘাল, চোখে বল দে যাঁহতে আল [illegible] এই শ্রাবণ মাসের মেঘ। ভাসিয়ে দেবে একেবারে। চোখে আসে মেঘে আল [illegible] হাসতে হয়। তবু কি [illegible] ঘোলাটে জলটার দিকে বকচরে যারা পাড়ি জমায়, জলতরঙ্গ ঘিরে ওং পেতে উত্তর দিকে তাকিয়ে বসে থাকে তেমন লুটিয়ারা তাদেরও কষে বাঁধতে হবে হাল। হালকাতের কাঁধি আলগা থাকলে ঝড়ের মুখে সামলানো [illegible] ঘাত দিয়ে দিয়ে এক ঝেকায় কেউ গেলে আর রক্ষে নেই [illegible] ঘোলাটে জলটা মুখ চাঁ করে গুষ্টি লোককে খিলাবে হাঙ্গরী জলটার মোহানা। আগুনের গোড়ে [illegible] ভাসিয়ে নিয়ে যাবে কে জানে? দাঁড়ি মেহান্-মুখ নিয়ে বসে, ছিটকিনিতে কাঁটা উঠেছে কেলে পিটিয়ে ভিড়িয়ে [illegible] হাওয়ার আগে। অকূলের কূল বাবা, ঐ সম্বল।

কিন্তু মেঘ কি কারো একলার? না ছলন গেরোর লুটিয়া বরং খাঁটি কি সহর নেই? কে কোথায় ওৎ পাতবে, ভগবানই জানেন। তবে জলবাতাসের টের পাচ্ছে সবাই। নদী-কূলের মানুষ টের পাওয়ার আগে এই মোহানা নদীর মানুষগুলি টের পেয়ে যাবে। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবে সবাই

জলতরঙ্গ মুখে বহর ভাসিয়েছে ছলন গেরো। বজবজের দিকে যাবে সেখানে থেকেই থাওয়া করবে ছলন। ঝড় শুরু পড়ার আগে ভাগে পেছু নিয়ে আরো এগিয়ে যাবে দক্ষিণে। গেরোবন্দিতে পৌঁছার আগেই সুবিধে মতো মহাজনী নৌকোর চড়াও করবে ছলন গেরো। বুদ্ধি ভালো। ঝড়ের বাতাস ফুঁড়ে দূরে শোনা যাবে না কিছুই। নির্বিবাদে মাল হাতিয়ে ফিরবে ছলন।

কিন্তু এমনি ভালো, ঝড় রাতের মধ্যে এলো না। না বৃষ্টি, না ঝড়। থম হয়ে রয়েছে গোটা আকাশ। যেন ফোলা মেঘের ভার নিয়ে আকাশ অনেক নীচে নেমে এসেছে। ঐ হয়, ঘুনী মানুষকে ছলন দেবার, 'আকাল' ভাসা ঐ হয়। আসতে আসতে ফসকে গেল। ধরতে ধরতে হাতে ধরা গেল না। লুটিয়ারা বলে 'আকাল' পড়েছে মিথ্যে।

গোটা রাত ঘুম খুবড়ে পড়ে থাকলো ছলন ছইয়ের ফাঁস তুলে। দাঁড়িরা পাটাতনে বসে প্রহর গুনছে। অন্ধকারে বন-বাঘের জোড়া চোখ ছাই চাপা আগুনের মত জ্বলছে। এলী শান্ত-স্থির। আগ্‌না নেই মোহানায়। হামড়া বান ডাকে নি। সুরসুর করে জোয়ার এলো, গেল। সব টের পাচ্ছে তারা। কিন্তু বড় নামলো না। নৌকো যে কাটা গেল খালভারা নিয়ে সব ফাঁক বেঁধে গেল। কেউ ছুটিয়ে ছিটিয়ে গেল না। যেত, যদি রাতারাতি ঝড় ওঠে পড়তো আচম্বকা।

ভোর রাতের জোয়ার এলো। মেঘের জন্যে পোয়াতি তারা দেখা গেল না। তেমনি মেঘ ঝুলে রয়েছে আকাশে। বাতাস নেই। ত্রিসংসার জুড়ে একটা আশ্চর্য কালিমী রাত্রি। রাত তিন প্রহর পেরিয়ে গেছে অনেক আগেই। দক্ষিণ পাড়ে কোথাও শেয়াল ডাকলো, হুক্কা—হুয়া। তার ফাঁকে ফাঁকে হোগলা-পয়ান-বাসকের জঙ্গল চিরে পূব-পশ্চিমে দীঘল ছাড়া খেজুরের বাগান থেকে কেউ শোনা যাচ্ছে কুকুর। গেরস্থের গোয়াল থেকে ছাগল-বাছুর দাঁড়িয়ে ভাগাড়ে কিংবা কোন জঙ্গলের চালে বসে ঘাড় মটকাচ্ছে কুক বাঘগুলো। কেউ দিচ্ছে।

কিন্তু লুটিয়া পুরুষের সাহস রাতে আলেদা। ভয় নেই তার দিগ্বিদিকে। তার গায়ে যে রক্ত আছে, তার স্বাদ বড় কেউ জানে না। ধানো-মানো-ডাইনী পায় নি। গুণ দিয়ে, মন্ত্র গুণে তাদের বশ করতে পারে লুটিয়া সর্দার অনায়াসেই। কিনারের বাছাড়ি থেকে সাড়ে সতের হাত দূরে ফেলে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে গেরো,—'ভ্যামনা, ভয় হয়ে করছে।' দেখবে একটু পরেই দেখবে অর্থাৎ অন্ধকারে ঠিক দেখবে না—কানে শুনবে, কোথাও বেড়াল ডাকছে—মেউ-উ। ঐ হলো আসল কথা। যিনি বাঘ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে এসেছিলেন তিনি বেড়াল হয়ে এখন ডাকছেন।

রাত্রির যারা মুখোস পরে আসে, তাদের তেমন ভয় নেই লুটিয়াদের। আসল ভয় অন্যদের। হামড় বানে নদীর হয়ে পড়লে, ঘূর্ণির বিপাকে পড়তে হয়। বাঘেট

THE NATIONAL ROLLING & STEEL ROPES LTD.

Manufacturers of :

STEEL WIRE ROPES—BLACK & GALVD, FOR MINING, SHIPPING AND ENGINEERING PURPOSES.

Factory :

Shamnagar, 24 Parganas,
Eastern Railway.

Head Office :

NICCO HOUSE
2, HARE STREET,
CALCUTTA-1

Tel. : STEELWIRES

Phone 23-5102

ঘাড় নুইয়ে বসে আছিল সে। কালো শরীর। হাতে পায়ে কাদা লেগে আছে। শরীরটা ধনুরা বাঁশের মতো সোজা শক্ত। মাথার লম্বা চুল জলে ভিজে এলোমেলো হয়ে আছে। ছাতাটা একটু কাত করে ধরে সামনে এগোলো। বন্ধুকে বড় শুকনো দেখায়। কাছে এগিয়ে এসে বসে বললো সুধাময়, 'মাছটা রেখব, তা না রে নিতা।'

নিতাই জবাব দেবার আগেই পুলকিত গলায় ফিস্‌ফিস করলো গোপীনাথ, 'একেবারে ভাত রেখব। ওজনে তার পাঁচের কম কি—' বলতে বলতে মাছটাকে বঁটির ওপর রেখে প্রচণ্ড চাপ দিলো গোপীনাথ। দুখণ্ড হয়ে দুপাশে পড়ে গেল মাছটা। বিরাট হাঁ-করা মুখটা কয়েকবার কাঁপতে কাঁপতে নিশ্চুপ হয়ে গেল পরক্ষণেই। ভাঙা হুকে ফুঁ দিতে গেল বঁটির।

দুপুরের ডাল আর চাল একসঙ্গে কড়াই রান্না। আনাজ-পাতির ব্যবস্থা কিছু নেই। শুধু তেল-নুন-লঙ্কা-হলুদের বাটনা দিয়ে পেঁয়াজ কুচি আর মাছের ছালুন রাঁধা হবে। তারই আয়োজন চলেছে। সুধাময় বললো, 'আমি একবার গাঙে যাব নিতা। আসতে এট্টু দেরি হবে।'

'না দেরি না। মাছের ছালুন হবে। ছালুন ছেড়া ভাত কচু না মুখে। পানচা ভালভাত খেইয়ে আর কেউ পাই না মুখে। ছালুন দিয়ে ভাত খাব আজ তুই আর আমি, কিরিস জলদি।' বন্ধুর দিকে তাকিয়ে কথা বলে।

বেঁটে মানুষ সুধাময়। গায়ে-পায়ে একটু ভারি। মুখটা গোল দেখতে। এক কালে দেহের রঙ তামাটে ছিল। এখন কড়া তামাকের রঙ জমেছে। চুলের রঙ একটু লালচে কটা। চোখগুলো আশ্চর্য গভীর। বললে, 'বড় কম ত কাম নয় রে ভাই যে যাওয়া মাত্তর ফিরমু।'

'ফিরতে চাহা করিস। আমি ভাত বেইড়ে থাকব, এইলে খাব এক পাতে, বুঝলি।'

গামছা দিয়ে গা মুছলো সুধাময়। ভাল জামা কাপড়টা তার পরনে। হেসে একটু রঙ ছড়ায় নিতাই। বলে, 'শ্যামল সাজগোজ দেখছি, মনে ত হয় না গ বোনের বাড়ি যাওয়া। কি বল বন্ধু।'

বন্ধু নিশ্চুপ। সুধাময় ভাবছে আর এক কথা। বোনটা যদি রাজী হয়, তবে নিয়ে এসে তুলবে বোধায় সুধাময়। বন্ধুর বাড়িতে যদি বন্ধু স্থান না দেয়। দুখন গেরো যদি প্রতিবাদ জানায় তবে তো ঘুচিল। অথচ বন্ধু ছাড়া নিরাপদ বন্দর আর কোথায় আছে সুধাময়ের? মুখ গম্ভীর করে ভাবে সুধাময়। নিতাইর রসিকতায় যোগ দেয় না।

নিতাইর মনটা আঁকপাক করে। ভাবে, কথাটা বলা উচিত হয় নি। একেবারে কাছে এগিয়ে এসে হাত ধরে নিতাই সুধাময়ের, 'তুই কিছু মনে করলি নাকি সুধা? আমি কিন্তু এমনি কইছিলম।'

সুধাময় গুণে গুণে এক টাকার ময়লা নোট পাঁচখানা বুক পকেটে গুঁজলে। বললে, 'না ভাই, তর উপর রাগ কইর‍্যা করমু কি? আমি জানি তুই মস্করা করছিলি। তবে মস্করা করিস না বন্ধু, বইনটা আমার বেজায় দুখী। আমি ছাড়া তার আপন আর ক্যাও নাই দুনিয়ায়। যে আসে তার কাছে ছুয়াচুরি খেলতেই আসে। খেলা শ্যাষ কইর‍্যা চইল্যা যায়। বইনটার তাই দুঃখ। তর কাছে সব কথা খুইল্যা কই নাই। কইব একদিন,—আমি যাই।'

টিনখানা ভিঠি পরপর লাগাও নিতাইদের বাছাড়ি থেকে। ভিঠিগুলি দিয়ে ঘাটের ওপর পর্যন্ত অসমান্তরাল পাঁকো যেন গড়ে উঠেছে। তরতর করে সেই ভিঠিগুলোর ওপর দিয়ে নেমে গেল সুধাময়। নিতাই তাকিয়ে থাকে। ভাবে, কি কথা বলবে বললে বন্ধু! অথচ খুলে কিছু বললে না। ছাপাছাপি আকাশের গায়ে যেমন আষাঢ়ী মেঘের বিজলী খেলে ঘনঘন, অথচ স্পষ্ট করে দেখার আগেই অলীক হয়ে যায়, বন্ধুর কথাগুলো যেন তেমনি মনে মনে ঝলসে দিয়ে গেল তার। কিন্তু তেমন কিছু বুঝলে না সে। জানলে না।

মেঘ থমকে আছে আকাশে। ঘনকালো মেঘে আকাশ লেপালেপি। বাতাস নেই, গুমোট হয়েছে, তবু বিন্দুপাত নেই। এ শুধু সম্ভাবনা—প্রস্তাবনা। কিন্তু কি যে হয়! ভাবনা দুখন গেরোর। কিন্তু নিতাই ভাবছে অন্যকথা। এই মেঘের রহস্যের মতো বন্ধুর কথাগুলোতেও রহস্য আছে। স্পষ্ট বোঝা যায় না।

কিন্তু আশ্চর্য, রান্না-বান্নার শেষ হবার আগেই ফিরে এলো সুধাময়। মুড়-মুড় ঘাট পর্যন্ত এসে উঠল ভিঠির পাটায়। ঘাটের চাতালে মেয়ে স্নান করতে নেমেছে

নিতাই। গলাগলি জলে দাঁড়িয়েছে। দূর থেকে বন্ধুকে দেখে ডাক দিয়ে বলে, 'ফিরে এলি সুধা, কম্মনে এলি? তর যে বড় কম কথা নয় গ বলবার, বলছিলি? কম্মনে এলি অত তাড়াতাড়ি।'

মুখ গামড়া করে ফিরেছে সুধাম। কোন কথা না বলে তরতর নেমে এসে উঠলো তাদের নৌকোয়। বন্ধুকে কাছে দেখে আর সাহস পায় না নিতাই কথা বলতে। মুখে জলের কুলি নিয়ে হাবলা চোখে বন্ধুর দিকে চেয়ে রেখে। পাটাতনে এসে অনেকক্ষণ দাঁড়ালে সুধাম। তারপর ভেতরে গিয়ে পরনের কাপড়-চোপড় বদলে এলো। নিতাই সাহস করে ডাকলে, 'সুধা, আয়, ছেন করবি নেইমে আয়।'

কোন কথা না বলে বাঁশের চোঙা থেকে সর্ষের তেল নিয়ে মাথায় ঘসতে ঘসতে ধীরে ধীরে গলুই ধরে নামলো সুধাম নদীতে। অন্যদিন হ'লে বন্ধুর ডাকে ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়তো সেকোর ওপর থেকে। মা জাহ্নবীর জলে সব জ্বালা জুড়িয়ে যায়। দেখতে পাচ্ছে না, জ্বালা জুড়িয়ে জুড়িয়ে তিনি আসছেন ওপর থেকে নীচে। কত লালমাটি পাথর পায়ের নীচে পলি পড়ে পচলো। মরুবালুর যন্ত্রণা মুছে জীবন্ত করলেন তিনি। কত সতী বেউলার চোখের জল ঝরাতে পদ্মা হয়ে পৃথিবীতে এসেছ মা। গুড়-গুড় কুল-কুল করে কি সান্ত্বনার গান গাস্ মা দিবানিশি।

সুধাম ভেসে এসে থমকালো নিতাইর কাছে। অনেকক্ষণ পরে বললে, 'বুঝলি নিতা, গেলাম মিছিমিছি, বইনটা ঠিক করে কিছু বলল না। বললে, দাদা, এখনও মন ঠিক করতে পারি নাই। তুমি আসো আবার।'

নিতাই বললে, 'ক্যান, কি বলেছিল ও?'

'ও কিছু বলে নি, বলছিলাম আমি।'

'কি বলছিলি?' নিতাই ঘনিয়ে এলো।

সুধাম গভীর গলায় বললে, 'বলছিলাম, চল আমার লগে বইন। আমি যেইখানে আছি, সেইখানে নিয়া তুলি। তর বিয়া দিমু আমি, সারা জেবন থইয়্যা এইখানে চুল আর পোষাইতে হব না।'

'কিসের চুল তার সুধা?' যেন অবোধ বালক নিতাই। কিছু না বুঝেই প্রশ্ন করে।

সুধাম চেনে বন্ধুকে। জীবনে বড় রকম যেন যা পায় নি নিতাই। ছদন গেরো টাকা রেখেছে, মহাজনী চালায়। নিতাইর সে ভাবনার দিন কাটে নি। জলা-জংলা রাতে-দিনে ঘুরেছে ছদন। তিন বাছাড়ি ষমদূতের মতো বারোজন দাঁড়িকে নিয়ে ঘুরেছে। মহাজনী নৌকো লুট করে টাকার মহাজনী জমিয়েছে ছদন। ছদনের এক ছেলে নিতাই। নিতাইর ভাবনা কি! ভাবনা তার জন্য নয়ও। বিয়েসাদিও কাঁচা বয়সে দেয় নি ছদন। লুটতিয়ার ঘরে হাবা-কচি বউ কি হবে। বড় মেয়ে দরকার। মাসের তিরিশ দিনের মধ্যে তেইশ দিন গতিয়ে ঘরে ফিরবে লুটতিয়া মরদ। বোয়ান মরদ তো! ঝড় বাতাসের ঝাপটা খেয়ে জলে ভিজে, রোদে পুড়ে মনটা চিড় ধরে ফেটেছে। খাঁকপাক করছে অবিরত। বউ ঘরে আছে, এলে চিড়গুলা মন জুড়িয়ে দেয়। সাত দিনে সারা-মনের আগুন-ধরা রক্ত ভিজিয়ে দেয়। একলা বিছানা পাতা, পায়ের নীচে লক্ষ জ্বলছে শিব উঁচিয়ে। তারপর বউ মাথার কাপড় নামিয়ে বুকের পাশে বসে যোয়ান স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে, চোখে তার চিকচিক বিজলী খেলে। মাথার ধমধমীর সিঁদুর লাল টকটক করছে। নাকে বেসর, কানের মাকড়ি ঝুমকো-লতার মতো লুটছে। লুটতিয়া বোয়ানের মন তাতেই মজে যায়। ময়নামতী বউকে বুকের কাছে ডেকে নেয় সে। মোহানা হগলীর তুফান যেন আটকা পড়েছে তার কোলের কাছে। ছাপাছাপি যৌবন নিয়ে বউ সেদিন চোখের সামনে নাচে, লক্ষের শিখের মতো নাচে। লুটতিয়া বোয়ানের গলের কাঁপি খুলে যায় সেদিন। কত কথা বলে—কতের কথা, মাতলা নদীতে বান ডেকেছিল, হামার ডেকেছিল, তিন বাছাড়ি ঘিরে ঘুমড়ে পাচলমণী মহাজনী নৌকোটা উজাড় করেছে তারা। সাবাস্, বুকের পাটা। বউ কাঁচা পারদের মতো একেবারে চোখাচোখি হাসে ঝিকমিক্। ছোবল দেবে সে সঙ্গীকে। কিন্তু সঙ্গীরও বুকে বিষের জ্বালা। কালশঙ্খিনীর ছোবল সে অনায়াসে সইবে।

এই কালশঙ্খিনীর বিষের জ্বালা জুড়োনোর লোক নেই ছদনের ঘরে। নিতাইর বউ এখনও এসে দেয় নি ছদন। নিতাই সবটা বুঝবে না।

নিতাই বুঝবে না মেয়েমানুষের জীবন। পেটের দানা না জুটলে সে পরের বাড়ি যায়। পরের বাড়ি তাকে পাঠায়

তার বাড়ির লোক তাকে ঠকিয়ে নেয়। কিন্তু ঠকবারও লোক না থাকলে, পেটের জ্বালায় মেয়েমানুষ ভেসে যায়। প্রথমে অভাবে পড়ে যায়, তারপর ঘুলে বসে। কল কারখানায়, বড় লোকের বাড়িতে কাজও করে। জীবিকা হয়—তাতে জীবন নিষ্ফল করে। অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়। ফুটো কলসী তখন মেয়েমানুষ,—অভাব তার মেটে না। আদর-সোহাগ-ভালবাসার নামে সে ভুল করে। ভুলের ফলশ্রুতি জীবনের ফলশ্রুতি আর হয় না। মেলা আর কাটে না কোনকালেই।

সুধাম চোখের সামনে দেখেছে কতজনকে। বিক্রিমপুরে দেখেছে, আলিপুরে গেল এলো। আর এখানকার গঞ্জের বারোয়ারির পাড়াতেও সে ঘুরে। মেনকাকে সে তো জানে। নিছক শরীর ছুঁয়োনো ছাড়া মেনকার কোন্ প্রয়োজন তার জীবনে। সুধাম ওখানকার রিবারিনি রক্তে আগুনঝরা মেয়েকে দেখেছে। সোনা যখন ঐ পাড়ায় গিয়ে উঠেছে—তখন আর বুঝতে তার বাকী নেই। কিন্তু নিতাই বুঝি সব কথা বুঝবে না, অভাবে পড়ে সোনার স্বভাব নষ্ট হয়েছে। তা নয়, বোনটাকে তো জানে সুধাম, এমনটা সে তো ছিল না।

সুধাম কিন্তু সবটা বুঝিয়ে বলতে পারলো না। কথার জবাবে কথা শুধু বললে, 'তার দুঃখ অনেক। বয়সী মাইয়া তু, বিয়া হয় নাই আইজ তরি। তাই একলা জেবনের দুখে।'

'সে ত বটে!—'

নিতাইয়ের মুখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়েছে সুধাম। আশ্চর্য, গভীর সহানুভূতির গলায় কথা বললো নিতাই, সুধাম শুনলে।

সুধাম কথা বলার আগে কথা বললে নিতাই, 'তবে তুই এক কাম কর সুধা, তর বোনরে নিয়ে আয়। আমাদের ঘরেই থাউক। বাপকে আমি বলে দেব।'

সুধাম কিন্তু কথা বলে না। ভাবে, কি বলে দেবে নিতাই বাপকে। বলে দিতে পারে কি, আর কোনদিনের জন্যই বোন তার ফিরে যাবে না, চিরদিনের জন্যই তার বাড়িতে থাকবে। থাকবে ঘরের বউ হয়ে। নিতাই কি বিয়ে করতে পারে না সোনাকে?

কিন্তু খোলাখুলি তো এসব কথা বন্ধুকে বলতে পারে না সুধাম। তাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ইংগিত দিয়ে বলে, 'কিন্তুন খুড়া যদি না শোনে?'

'শুনবে। আমি কইলে অমত করবে নি, শুনবে।'—নিতাই বললে।

'কিন্তুন—'

'কিন্তুন এতে কের কি।' বলতে বলতে নদীর জলে ডুব দিলো নিতাই। উঠে গা মাজতে মাজতে বললে, 'আমি কইছি, তুই ওরে নিয়ে আয় সুধা। আর সোধাকি দেবা-থোবার কথা ভাবিস নে বন্ধু, ওর ভাবনা আমি ভাববো। তরে ভাবতে হবে নি।'

নিতাই কি কথা বলে! পলিমাটি মেশা শ্রাবণ মাসের মোহানা হলদীর জলে গা মেজে মুখ-হাত কালো শিলা ফলকের মতো ঝকঝক করছে। ছিপছিপে শরীরটা তাঁজে তাঁজে ভেঙে যাচ্ছে। মাথার ভিজে চুল ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। অপূর্ব মানাচ্ছে বন্ধুকে। সুধাম দেখছে, বন্ধু আমার আজ অটুট সাহস নিয়ে দাঁড়িয়েছে। কালাধুপী বোনটার ভাগ্যে যদি থাকে তবে মানাবে মোটামুটি তাদের ঘর নয়। বিক্রমপুরী নয় যে গো, এসে সোজাসুজি লুটিয়ে পড়বে মাতলার মোহানায়। এ যে কালিন্দী গো বন্ধু, ঘুরি তুলে আসতে আসতে কত কূল খেয়েছে;—বড় বাঁক খেয়ে, পাঁচ দিয়ে খেয়ে ফিরবে এসে রাইমঙ্গলের বুকে। ইছামতীর মতো আটকা যেন না পড়ে গো, মজে যেন না যায়।

॥ ৮ ॥

জোয়ার এলো গেল মোহানা নদীতে। কেমন গাপটি মেরে এলো-গেল। যেন কিছু বলতে এসেছিল। বলছে না, চলে যাচ্ছে সুড়-সুড় গুড়-গুড় করে। মেঘ দাঁড়িয়েছিল তেমনি আকাশে। কালো ঝুল মেঘ। শ্রাবণের অমাবস্যে জেনে ঘুম খুললো। বাতাস হ্যাচ্‌কা পুবের। সাঁ সাঁ বাতাস। বাব্‌লা-বাদকের বনে সেই ক্রুদ্ধ মাতলা বাতাসের শাসানি। কেয়া ঝোপ, আটকিরার কাড়—কালবৈশাখের জবর ঝড়-বাতাসের ধাপাধাপিতে নুয়ে হয়ে পাদপ্রণাম করলো মা গঙ্গায়। এবড়ো-খেবড়ো গঞ্জের চালাল ভাসিয়ে গলির গা বেয়ে পচা পাঁকের মতো থাকিত

জল হড়হড় করে নামলো নদীর গড়ানে। গঞ্জের বারো-বাসর পাড়ার ছিটেবেড়ার দেয়াল ভিজে ঢেলে গেল। গোলপাতা আর খাপরার ছাউনি ছিঁড়ে যেন নদী হয়ে নামছে গঞ্জের গলির জল। যেন পাপ কলঙ্ক ধুয়ে মুছে সাফ্ করতে শ্রাবণশেষের মেঘটা তামাম ভাদরবারের গঞ্জের দোষার নেমেছে। তবু গোলবাঁধা নড়বড়ে পেটা-সার ঘরগুলো, খিত্তি ছাউনি বেঁচে গেল। বর্তে গেল। বারো-বাসর পাড়ার পুবে-পশ্চিমে মেঘটা ঝুঁকে রয়েছে। মোহানা শাসাচ্ছে পাড়কে হুম-গুম শব্দ তুলে অতলে গুমরোচ্ছে, গুমরোচ্ছে শ্রাবণের মেঘ। মজাখাল লকলকে বিজলী দিচ্ছে ডাইনে বাঁয়ে। দুর্যোগের ঘনঘটা।

তবু অমর মানুষ বর্তে যাচ্ছে। বারোবাসর পাড়ার অন্ধকারটুকুতে ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালা। টিমটিমে টিনের লন্ঠন, নয় লটকনের হেরিকেন জ্বালানো হয়েছে ঘরে ঘরে।

রাত দুই প্রহরের সময় প্রায় গঞ্জের কিনারে বহর ছেড়ালো ছুতর গেরো। কাছি টেনে এনে গঞ্জের পশ্চিম পারে যে ঘাট সেইখানে গাছের গুড়িতে বাঁধলে। তড়-বড়িতে ভিজে ভিজে মানুষগুলোর চোখ রক্তজবার মত ফুলে উঠেছে। এত রাতে তাওরা জ্বালালো বংশী। গোপী চালডাল বসালো। সারাদিনে পেটে পড়ার কথা দুবার। একবার পড়েছে বিকেল দুপুর। আর একবারের জন্য এই আগুন জ্বালা। কিন্তু তার আগে আগুন জ্বলছে এতগুলো মানুষের পেটে।

ঘাড়াড়ি থেকে নেমে গঞ্জের দিকে পা বাড়িয়ে ছিলো সুধাময়। মনটা আর মানছে না। আজ সাত-আটদিন হলো মেনকার পরবারে একবারও পরশা দিতে পারে নি সে। অথচ মেনকা সেদিন ইনিয়ে-বিনিয়ে কত বিনয় করে বলেছিল। শুধু কি পেটের দায়, মেনকা তার জন্যে বাসর পাতিয়ে রাখে। তাকে নিজের হাতে কতোবার রেঁধে খাইয়েছে সোহাগে মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়েছে, গান গেয়েছে ইনিয়ে-বিনিয়ে। আসার সময় মেনকা তাকে বলেছে, পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় রাখে। বেশী দিনের পর গেলে তার চোখের সামনে চোখের জল ফেলে দুঃখ করে। কাঁদে বিনিয়ে বিনিয়ে। ভালবাসে নিশ্চয়। তা নয় কাঁদবে কেন

"জীবনের দ্বারে দ্বারে
নবীনের সমারোহ
নিত্য চির-সুন্দরের পূজা"—

প্রাত্যহিক ঘরোয়া মিলন উৎসব পরিবেশ
ভারতীয় চায়ের পরিবেশনে মধুময় হোক।

টাটকা চায়ের বিশ্বস্ত ও সুপ্রাচীন প্রতিষ্ঠান

বি. কে. সাহা এণ্ড ব্রাদার্স (প্রাঃ) লিঃ

স্থাপিত-১৯২১

হেড আফিস
৩নং পোলক ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১

শাখা দোকান
২নং লালবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১

ফোন—২২-৪৪৭১ তার : HOLSELTI ফোন—২২-৬৪৬১

আমাদের আর কোন শাখা দোকান নাই।

ভালবাসাই হাসায় মানুষকে। দুটো মনকে এক সুতোয় বাঁধে। বাঁধন খুলে গেলে তুমি টের পাবে না। তারপর তুমি এদিক ওদিক যেতে পার, কিন্তু তোমার প্রয়োজন, আমারও। প্রয়োজন মিটলো, তবু মন চায় না ছেড়ে যেতে। তখন মানুষ মায়ায় পড়ে। যে তোমার চোখের সামনে বসেছে—সে রঙ্গিণী মায়াবিনী। তোমার দিকে চেয়ে ঝিলিমিলি বিজলী হাসছে। তুমি পুরুষ, পারবে কেন বেঈমান। তোমার চোখ বলসে গেল। কোণা বেয়ে পড়লো অশ্রুধারা। তোমার আনন্দ, তোমাকে মুছতে হলো না। মায়াবিনী আঁচল দিয়ে মুছে দেবে। তারপর মায়াবিনী কাঁদছে তোমার জন্যে। বিনিময়ে তোমাকে তার চোখ মুছে দিতে হবে। ভালবাসা এরই নাম, চোখের জলে তার বিনিময়।

কাঁপা কপাটটার ওপর আছড়ে পড়লো সুদাম।—'কে?'

'আমি গো আমি।'—

শিবিরপুরের মেয়েমানুষ মেনকা,—শহরে জন্ম না হলেও শিবিরপুরের হোটেলে থেকে মানুষ হয়েছে। তারপর আদিপুর কাটিয়ে ডায়মণ্ড হারবারের গঞ্জে গিয়ে উঠেছে বারোবাসর পাড়ায়। জীবনে মার-খাওয়া মেয়ে মেনকা। কথা বড় মাজিয়ে পেঁচিয়ে বলতে জানে। দরজা না খুলেই বললে, 'কে গ কে? কে তুমি?'

'রসকানন্দপুরের মানুষ'—সুদাম এবার ঠিক ইশারা দিয়ে বলে।

দরজা খুলে গেল। আলো জ্বালা নেই। জ্বালানো হলো না। অন্ধকারে হারিয়ে গেল না তবু মেনকা। কথা বললে বিনিয়ে, যেন রাইমঙ্গলের গড়ানে মিঠাজলের কলকলানি বাজলো সুদামের কানে, 'আমি ঠিক ধরছি গো, তুমি আসছ। আস, আস।'

হারিয়ে গেল সুদাম। কাঁপকপাট বন্ধ হলো পরক্ষণেই।

মেনকার কাঁপকপাট যখন খুললো তখন সকাল। প্রায় এক প্রহর বেলা গড়িয়ে গেছে। বারোবাসর পাড়ায় সবাই প্রায় জেগেছে। ঢেলা কলে জলের কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে —নাইবার। পাশেই নদী। ঘাট আছে। তবু বারো-বাসর পাড়ার কেউ পুণ্যির কলস বোঝাই করতে জলে নামে না গঞ্জার। কালো পড়ে যাবে তাহলে। ঘোলা জলে স্নান করলে রূপমতীর রূপ যায়, পোড়া মাটির মতো চেহারাগুলো হয়—এ বিজ্ঞান জানা আছে। পলি মাটির প্রলেপনে নেহাৎ যারা মাথা মুড়তে চায়—তারা যুবতী না, ভাগীরথী। এ পাড়ার বুড়ী নিমসে বর্ষীয়সী তারা। কেঁদে-হেসে যারা বারোবাসর পাড়ার বাতাস এককালে মাতিয়েছে—তারাই এখন নেহাৎ জবুথবু হয়ে শীতে কাঁপতে আসে, বর্ষায় ভিজতে আসে। তুলসীমালা গলায় দিয়ে মোহানা হুগলীর জলে গিয়ে হু-হু করে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। বলে, 'যাগো যেতে চাই নে গ মা, বাঁচতেও আর চাই নে। আমায় নে মা—'

সেথে পতিতপাবনী গঙ্গা তাদের মেন। মরলে কেউ পোড়ায় না। গঙ্গায় ভাসিয়ে দেয়।

বড় উচ্ছৃঙ্খল এ পাড়ার জীবন। সন্ধ্যা হতে না-হতে পোড়াবিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায় জলের চিমনি হার মানে। গন্ধ তেলের শিশি সোসবই ছড়ায়। কড়া আতরে, বেলফুলের গন্ধে, বাতাস মৌ মৌ। কথা চাপাচাপি,—হাসি খিলখিল। উঁকিঝুঁকি মুখ দেখা যায়। তারপর সকাল হতে কীর্তন আরম্ভ হয়ে যায় এ পাড়ায়। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলাবাজি—গোয়াতুমির অন্ত থাকে না। দুপুরে এদের রাস্তা দিয়ে বড় কেউ যায় না।

এখন যাচ্ছে। আকাশে মেঘ একটু কমেছে ঠিক তবে রোদ ফোটে নি আজ। ধূসর দেখাচ্ছে চারধার। সরু গলির মোড়টা পেরিয়ে এসে সুদাম দেখলো সোনার ছোট উঠানে হাট বসে গেছে। ছেলেবুড়ো কম। কাঁচাবয়সী-মাঝবয়সী-চতুর্থী সব রকমের মেয়েরাই ভিড় করেছে এসে সোনার উঠানে। সোনার পাশের ঘরে যে বুড়ী থাকে, তার তিন নাতনী আজ বুকের কাপড় নামিয়ে মাটিতে বসেছে। কোথা থেকে সাপুড়ে এসেছে এক সাপ খেলাতে। তার সঙ্গে এক সাপুড়ে মেয়ে। বয়স্কা মেয়ে। মেয়েটি ঘাঘরা পরেছে মেহেদি রঙের। হাতে কাঁচের চুড়ি থোছায় থোছায়। নীল কাঁচের চুড়ি আর লাল পল্লার মালায় অপরূপ সাজিয়েছে কালো মেয়েটিকে। লাল উড়নি দিয়ে বুক টেনে বেঁধেছে। বাইশ বছরের পরমায়ু তীব্র যৌবন যেন ছিপি-আঁটা হয়ে রয়েছে তার সারা দেহে। পুরুষটা মাঝবয়সী। ডোরা-কাটা লুঙ্গি পরেছে হাঁটুর নীচে। গোল চোখগুলো

দিয়ে সে ঘুরে ফিরে তাকালো চারপাশে। বললে, 'এইবার আমি সেপের খেলটা দেখাই।'

কাল-কেউটেটাকে ঝাঁপি-বন্দী করলে মেয়েটা। পুরুষটা আর একটা ঝাঁপি খুললো। সাঁ করে লাফিয়ে উঠে দুধের মতো সাদা শরীর, মাথা কালো সাপটা ফুঁসতে লাগলো অনেকক্ষণ। ডুগডুগি বাজাচ্ছে লোকটা। মেয়েটা তীক্ষ্ণ অথচ মধুর গলায় একটি আবিষ্ট মেয়ার গান ধরলো,

আমার পতির মরণ সাপের বিষে
আমার মরণ কিসে গো—
আমার মরণ কিসে।
সবাই মরে বাসর ঘরে, বেউলা সতী
কান্দে দেশে দেশে গো
কান্দে দেশে দেশে।

বারোবাসর পাড়ার মেয়েরা সাপের খেলা ফেলে। গান শুনতে শুনতে কালো বরণ মেয়েটির খাঁটসাট যৌবনের দিকে তাকায়। কেউ ঠোঁট ওল্টায়, গা টেপা-টেপি করে, 'আ মোর সতী বেউলা লো!'

সুদাম দূর থেকে দেখলে, সোনা হাসতে হাসতে পাশের মেয়েটির গায়ে একেবারে ঢলে পড়লো, 'বাইদ্যা মাগী কের চঙ্ করে, হি-হি—'

স্ফীতোদর লম্বা বাঁশীতে ফুঁ দিতে দিতে সাপের খেলা দেখিয়ে চললো বেদে পুরুষটা। একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুদাম সব দেখলে। মেয়েরাও এসেছে সাপ খেলানো দেখতে। আশ্চর্য হয়ে গান শুনছে। মেয়েটাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। চটুলা বেদেনীকে দেখছে।

সোনা কথা বলছে ভিড়ের ভেতর থেকে, 'ও মাগী, তুই তো সতী বেউলা,—তর ক' গণ্ডা পতি, তারা কই?'

হাসিতে সমান তালে যোগ দিলে বেদেনী। ডুগডুগি নোছাতে নোছাতে বললে, পতি শ' গণ্ডা। কিন্তুন তারা ক্যাও আসে নাই গ দিদিমণিরা।'

'তবে এ কে?' পাশের পুরুষটাকে দেখিয়ে সোনা বললে।

'ও আমার সোনার লখাই।' খিল্‌খিলিয়ে হাসলো মেয়েটি। অজস্র পান খায় বেদেনী। রাঙা ঠোঁট উল্টে হাসলে। পুরুষটাও হাসলে কসে কসে।

বারোবাসর পাড়ার মেয়েরা সবাই হাসলো। হাসতে হাসতে প্রায় ভেঙে পড়লো সোনা। যেন এই উজলা কৌতুকময়ী বেদেনীর সঙ্গে কোথায় কোন্ সূত্রে তাদের সুখ তার বাজছে। সমান ঝঙ্কার তুলেছে। কেউ কেউ বদ্দ পয়সা দিলে। দু-চার আনা।

সাপের ঝাঁপি ছাড়া অন্য সাবধানও আছে বিষ-বেদেনীর। একটা টিনের কৌটো খুলে বললে, 'কি গ দিদিমণিরা, তুমরা ক্যাও তাবিজ নিবেন না? মা মনসার মাদুলি? জরিগুটি আছে, উল-কব্বি আছে—নিবেন না? যে যার কামনা করে লাগাইবেন—মা বিষহরির দোয়ায় সেবাক সফল হবে নির্ঘাৎ!'

'তবে আমারে দিও, আমারে দিও—'

রোরোল তুললো সবাই। সোনা বললে হাসতে হাসতে, 'তোমার কাছে পিরীতের এমন মন্তর আছে বাইদ্যানী, যার গুণে পুরুষের বিষদাঁত ভাঙে, এমন তাবিজ আছে, যাতে পুরুষের মন কপাটবন্দী থাকে আমাদের ঘরে? থাকে ত দিও।'

মাতালের মত সবাই হাসলে। এক সময় সাপের ঝাঁপি, তাবিজ-মাদুলীর পসরা তুলে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল বেদে আর বেদেনী।

সোনাকে ঘিরে বারোবাসর পাড়ার মেয়েদের ভিড় ভাঙে না তবু। সুদাম নেহাৎ নিলর্জ্জের মতো সোনার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। তাকে দেখে দু-একজন যেন মুখ-টিপে হাসলো, তারপর সোনার কানে মুখটা গুঁজে দিতেই মুখ ফিরে তাকালে সোনা,—'আ মা গ, দাদা যে—'

দাদা? হাসতে হাসতে পাশের ঘরের মেয়ে দুটি পরস্পরের দিকে তাকালো। তারপর ঘরে ঢুকলো। ভাবখানা এই, ও আবার কি ডাকের ছিরি—। তার মানে ও ডাকের বিশুদ্ধতা এ পাড়ায় প্রায় অজানা। যদি কেউ ডাকে তো বুঝতে হবে ওটা নেহাৎ আটপৌরের কোঠায় দাঁড়িয়ে গেছে। পরিবর্তনের কোন উপায় নেই বলে ঐ নামে ডাকা। হ্যাঁ, তা ছাড়া বারোবাসর পাড়ার ভাই সম্বন্ধের অর্থ কি?

সোনা এগিয়ে এসে একেবারে ঘরের মেজেতে কোমর দুলিয়ে বললে। আশ্চর্য! মাথায় কাপড় নেই। বেবার

কোন চেষ্টাই করলে না সোনা। বুকের কাপড় প্রায় নেমে গেছে, তাও সরালে না। মুখ তুলে মেঘ-ভরানো গলায় বললে, 'তাহলে কী ভেবে চল—'

সুধাময় প্রায় চমকে উঠলো সোনার গলায়। ছন্নছাড়া গলায় বললে, 'আমি আইলাম তোর কাছে, আমি যে কথা কইছিলাম—তুই আমার লগে তর বিয়ার ব্যবস্থা করবু—'

সুধাময়কে বাধা দিলে সোনা। বললে, 'থামো, থামো। বিয়ে করবে কে? আমি না তুমি? তুমি বিয়া কর, আমি বহু টাকা দিমু।'

'সোনা'—প্রায় ধমকে উঠলো সুধাময়। যেন রমজান-নগরের হয়ে তিন বছরের ছোট বোন সোনাকে সুধাময় শাসাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য হলো। অমন গাঢ় গলায় কথা বললে সোনা, 'সেই ছেলে বইল তুমার বড় বিনয় কইরা কয়, তুমি আর এমন কথা কোনদিন কইও না। বিয়া-শা কইরা ঘের সংসারী হইতে আর সাধ নাই। এই এতটা কালের পাপের কোন লেখা-জোখা নাই যে, মনে কাটন দিলে শেষ হয়। ভগবান দাদু তাদের ক্ষিমা। উহঁ, কি দরকার?'

সোনা বলে যায়। বড় গম্ভীর থমথমে দেখাচ্ছে সোনাকে। সুধাময় উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপে। বোনটা তার পাপের পাঁকে ডুবে একেবারে পচে গেছে আগাগোড়া। এই গঞ্জের খোলা, বারোবাসর পাড়ার মোহ, কামনা-বাসনার প্রলোভন জানিয়ে জানিয়ে রূপ আর যৌবনকে পণ্যের মতো বিক্রি করার জীবন—এতেই মেয়েটা রক্ত হয়ে গেছে। এ থেকে তার উদ্ধার নেই। মুক্তি নেই।

পালে হাত দিয়ে ভাবছে সোনা। অনেকক্ষণ কি যেন ভাবলো। সুধাময় যেন ছুঁচ ফুটিয়ে কথা বললে, 'তা হলে—?'

'আমি যামু না দাদা। যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবের নয়। তুমি এই কালামুখী বইনটাকে ক্ষমা কর দাদা—' মাটির দিকে মুখ করে কথা বললে সোনা।

'আইচ্ছা—' উঠে যাচ্ছিল সুধাময়।

হঠাৎ সোনা ডাকে—'দাদা—'

দরজার মুখ থেকে ফিরে আসে সুধাময়।

সোনা চোখ মেলে তাকালে সোনার দিকে। সোনার চোখে বিজলী খেলছে। শয়তানী! মনে মনে একটা গাল দেয় সুধাময়। যদি রমজাননগরে হত তেমনি দিয়ে কেটে দুখণ্ড করে রাইমঙ্গলের জলে ভাসিয়ে দিতে পারতো সুধাময়। কিন্তু, কিন্তু—

একি, কাঁদছে সোনা! চিবুক ভেসে গেছে। চোখের কোণায় বিজলী বলে ভুল হয়েছিল—ওটা চোখের জল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে কথা বললো সোনা, 'দাদা, আমি মাইয়ামানুষ, আমার দুখেসুখে যামন হোক কাইট্যা যাবে গ দিন। ক্যাও জানবে না সেই কথা। কিন্তুন তোমার কি হবে দাদা? আইজ তরি ঘর বান্ধ নি তুমি। জেবনে তুমার সুখটি নাই, সে আমি জানি। তুমি ঘর বাইন্ধা বউ আন ঘরে, আমি ট্যাকা দিমু। ট্যাকা কিন্তু আছে আমার। পেরাথ হ্যাজার খানিকের উপর। মরলে পর যাবে ট্যাকা, তার চেয়ে তুমি নিও।' গলার ভাষা বেদনায় জড়িয়ে এলো সোনার। বড় নিরুপায়ের মতো বসে আছে মেয়েটি চোখের সামনে। সুধাময় স্তব্ধ চোখ মেলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলে।

সোনাই শেষ পর্যন্ত বললে, 'শুনবে দাদা, আমার ট্যাকা নিবে? নিয়ে ঘর বাঁধবা তুমি?'

'কিন্তুন সে কি কইরা হয়? তর ট্যাকা, আমার ক নয়, আমার নিলে সইবে ক্যান?'

'তা হইলে এক কাম কর—' পা করে ঘুরে বসলো সোনা। আশ্চর্য, তার বুকের নিচের অনার্য আগুনটা আবার লেলিহান হয়ে উঠেছে। সারা জীবনে বঞ্চনার বেদনাটা কাল-সরীসৃপের মতো লাফিয়ে উঠেছে তার দুটো চোখে। উন্মাদ ঝড়ের মতো দিশেহারা হয়ে যেন কথাগুলো শুনিয়ে বললো সোনা, 'কুলপীর বড় ট্যাকাওয়ালা মহাজনটা নাকি জলে ডুইব্যা মরছে শুনছি। বড় মহাজন খরিদ্দার নেই আমার। একজন ট্যাকাওয়ালা খরিদ্দার জুইট্যে দাও দাদা, নসব বহুরী হিসব। একেবারে নসব, আর কর্জের কারবার না—'

'এ্যাঁ'—সুধাময় দেখে একেবারে মুখোমুখি খাবলে-খাওয়া চোখ তুলে তাকিয়েছে সোনা। কাল রাত্রে চোখে সুর্যার দাগ এঁকেছিল—এখনও সবটা ঘুছে যায় নি, শুধু আবড়ে গেছে। মাথার চুল এলোমেলো হয়ে রয়েছে। বুকের কাঁচুলি পর্যন্ত আলুথালু। সমস্ত মুখময় একটা অকপট ক্লান্তির ছাপ।

প্রসাদ বনস্পতি

খাঁটি ভারতের এই বনস্পতির ব্যবহারে সকল গুণের

গিন্নীদের আদরের জিনিস

আমাদের পূর্বপুরুষের যুগ থেকে গিন্নীরা [illegible] ঘরে তৈরী [illegible] ব্যবহার করে আসছেন। প্রসাদ বনস্পতি খাঁটি ভারতের সম্পদকে নতুন এক আধুনিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। [illegible] বিশুদ্ধ উপাদানে তৈরী হয়। এখানে বনস্পতির উৎকর্ষতার জন্য সতর্কতার [illegible] [illegible] বনস্পতির সঙ্গে তুলনামূলক আমার, খাঁটি ঘিএর [illegible] জিনিসের [illegible] আসবে

কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা

হাসিটা বন্ বন্ করে ঘুরে গেল সুদামের। কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে সে? পদ্মের বারোমাসের পাতায় সংসারের চৌহদ্দিতে বাঁধা একটি মেয়ে। কেশবতী মেয়েরা মাথা ঘুরিয়ে ছুড়িয়ে সেও কথা বলতে পারে চোখের চাহনিতে দাঁড়িয়ে বক্রকেন্দ্রা মেয়েরা মতোই অনেকটা ঘুরতে ফিরতে। বক্রকেন্দ্রা সোনা। হাঁ, তারমও হারবারের পাঙ্কা চালাক ঠকা আনাড়ের মতো একখানা যৌবন নিয়ে পুরোর মতো ফিরতে এসেছে বটে সোনা।

অন্তর ভলিউমি করে কথা বলেছে মেয়েটা। ভলিউমি করেই জবাব দিল সুদাম, 'বেশ দিনু, বড় টাকাওয়ালা মহাজনই দিনু আমি। একেবারে কাঁচা বয়সী মহাজন তবে নগদ এক শ' টাকা বায়না আমার, দিবি তা? সেইদিনই দিনু—'

'তির আছে শ' টাকা কানি, তেমন মানুষ পাইলে ...এর উপর দিতে পারি'—ঠোঁট চিরে চিরে কথা বললো সোনা একেবারেই যেন অদৃষ্ট, ধারালো ঝজু স্পষ্ট।

'বেশ, আমি তবে যাই—' চলে গেল সুদাম।

আকাশে মেঘ ছিল। রোদ ছিল না। বাতাস ছিল না। কাপড় কাচার মতো কষ্টকা দিয়ে একেবারে নদীর কিনারে চলে এলো সুদাম। ফিরেও একটিবার তাকালে না।

৯

এই মোহানা ধরে মহাজনী নৌকো এগুচ্ছে।

আলিপুর থেকে বোঝা যাবে কোন্ নৌকো যাবে কোনদিকে। সোঁদরবনের নৌকো চাইনের হাল বেছে নেবে। যাবে যাবে কলকাতার—কুলপীর, কিন্তু মোহানা ওপারের দূর-পশ্চিমের নৌকো। সুন্দরবনের নৌকো অপেক্ষাকৃত ছোট। গলুই উঁচু। চাড় ধরে আছে কাছি বাঁধা হাল। 'চাড়' হয়ে আছে কথাটার অর্থ, হাল কাঠের মাথা নৌকোর পাটা থেকে অনেক উঁচুতে বাঁধা। মাঝিকে দাঁড়িয়ে হাল ধরতে হয়। পশ্চিম কিনারের নৌকোর গলুই তেমন উঁচু নয়। আর হালকাঠ কুলোর মতো ছেদতে। নীচু করে বাঁধা। জলের গভীরে ডুবে চলে হালের পাখনা। গভীর গাঙে এ সব নৌকো পাড়ি দেয়—এই তার লক্ষণ।

আলিপুর থেকে তিনখানা ছোট ছোট ফেরারী নৌকোর শিল্প মিরেও ছলন সেরো পারল না। বুড়োর আবার হাতের যন্ত্রণা বেড়েছে। কবিরাজী কুয়াও তেলেও যাত যায় মানে না। শেষ পর্যন্ত দুই বাছাড়ি ভাসিয়ে ধরেই ফিরলো ছলন, একেবারে শূন্য হাতে। ঘরে ফেরার পথেই একখানা ঘাট-ফিরতি ভাউলে মেরে কিছু ঘাটুয়ে মাল পেলে নিতাই।

বিকেল গেছে। আকাশে মেঘ ছিল। রোদও ছিল। মেঘ ভাঙা জাফরাণী রোদ। হোগলা পাতার বাদকের ফাঁকে, আটকিরের ফোপে সেই মেঘ ভাঙা রোদ মেন বারের মতো ঝিলমিল করছে। পশ্চিম পাড় বাঁধ দিয়ে ক্রমশ জাহাজী হালে বাছাড়িটা এসে পড়ল নিতাইয়ের। সামনে পেছনে মোটর-লঞ্চ নেই। চাপড়ি জাহাজও নেই। নিস্তরঙ্গ মোহানা হুগলীর জলে ঐ অনেক দূরে দেখা যায় জাহাজের চিমনি। সুতরাং বাছাড়ি নৌকোর মুখ বাঁকালো না ডাইনে বামে। সোজা হাল ধরে এগিয়ে গেল তুপায়ের নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে।

এক হাতে হালটা ধরেছিল নিতাই। সুদাম মুখের বিড়ি নিতাইর হাতে দিয়ে হালটা ধরলে খানিকক্ষণ। ফিসফিসিয়ে বললে, মাল কিছু আছে নৌকোয়। কিন্তন যাবে কোন্ মুখী?

'বাপ ত কইছে বিষণ গেরোর কেছে মাল পৌঁছে দিতে' —নিতাই বললে।

সুদাম মুচকি হেসে বললো, 'তা হইলেই হইছে আর কি! খালি বাপের হুকুম পাটতেছ আর লোকানটার কি হইল নিতা?'

'ট্যাকা ত আমার কেছে আছে। তিন শ টাকা'—নিতাই কলে বিড়ি টানে।

সুদাম বললে গভীর গলায়, 'ঐ তিনশ' ট্যাকায় কুলাবে কি কইয়া রে বন্ধু। ট্যাকা ত আমাগর অনেক দরকার—'

'তবে কি কইস?'

'মালের খানিকটা কটিবদলের লোকানে গতাইলে কমন হয়—? নগদে কিছু ট্যাকা আসত হাতে—' সুদাম তাকায় বন্ধুর দিকে। কি বলে বন্ধু!- নিতাই এখন ছলন মেরোর হালকাঠ ধরেছে। বহরের সমূহ কর্তাগিরি তো তারই হাতে।

রাজী হয়ে গেল মিতাই। বললে, 'এ কথার লেগে কের ভাবনা কাস। তুই নিজেই মালটা নিয়ে যাবি গঞ্জের দোকানে, আমি ত কোন দিন যাই নাই।' মিতাই গলা ছোট করলে তারপর। বললে, 'কিন্তুন আমার ভাবনা এই ব্যাটারা যদি খবর দেয় আমরা মাল দিই নাই বিষণ পেয়োর কেছে তখন এট্টা ফ্যাসাদ বাধব কের। তাই ভাবতেছি কি করি সুদা—?'

সুদাম চাপাচাপি কথা বলে, 'ব্যাটারা ট্যারই পাবে না, তুই বেসিস মিতা।'

গঞ্জ দেখা যাচ্ছে একটু দূরে। শহরের ভেতরের দিকটা ঝিকি বিজলী আলো জ্বালানো। অন্ধকার হলে দেখা যেত আকাশের দিকে শিস উঠছে সেই কয়সা আলোর। জেটির গা ঘেঁসে যে আলোগুলো জ্বলছে, কাছে দেখা যায় তাদের —দূরে দেখা যায় না। ওভারকোট পরানো বাতিগুলোর। কিন্তু লুটতিরা পেয়োর জানা আছে—অন্ধকারেও তার চোখ সমানভাবে জ্বালানো। নিভবে না ও চোখ।

মিতাই বললে, 'নৌকো কোন্ দিকে লাগাবি সুদা? জেটিতে নাকি?'

'আরে ছুঃ'—সুদাম তাকিয়েছে ওদিকের ঘাটের দিকে। গঞ্জের কিনারে যে ঘাটের শানটা বাঁধা সেই দিকে সে তাকিয়েছে।

ধকাং করে একটা শব্দ উঠলো। বাছাড়ি নৌকো ধাক্কা দিয়ে কেঁপে দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ।

'কি হলো রে সুদা?'—মিতাই হাল বাঁকায়। কিন্তু বাছাড়ি নড়ে না। পাড় থেকে বেশ দূরে আছে তারা পুবের পাড় ঘেঁসে।—'কি হলো?'

হাল ধরেছে মিতাই। কিন্তু দাঁড় ধরে নি সুদাম। তাই কোথা হতে কি হলো। দাঁড়িরা অবাক হয়ে বসে রয়েছে মিতাইর মুখের দিকে চেয়ে। তার মানে, ঐ একই প্রশ্ন, কি হলো? কি হবে উপায়?

সুদাম অনেক ভেবে বললে, 'তলাটা একবার হাতড়ে দেখতে হয়। এখানে নদী গভীর না, আইল্যা গুড়ি (জলকাঠ) থাকতে পারে।'

সবাই বললে, 'ঠিক ঠিক।' এমন দুর্যোগে তাদের কেউ কেউ পড়েছে নিশ্চয়। তবু লাফিয়ে করে নামতে চায় না। সুদাম শেষ পর্যন্ত কোমরের কাপড় গোছায়। মিতাই বলে, 'তুই যাবন যাবি, একলা যাবি কমনে, আমিও যাই।'

মিতাই আর সুদাম নামছে দেখে ইতু নামে। বংশীও নামে। শেষ পর্যন্ত সবাই নামে। সুদাম বলে, 'তরা কী? সেলা কইরার সময় আছিল না। যা নৌকার উপরে জন তুরেক যা।'

কয়েকজন ওপরে গেল। ডুব দিলো আগে সুদাম। বাছাড়ির এপারে ডুবে ওপারে গিয়ে উঠলো সে। বললে, 'ব্যাপারটা বুঝছি, সা কইছিলম—আইল্যা গুড়ি লাগছে। ঠ্যাল্ নৌকা।' ওপর থেকে লগি নিয়ে কয়েকজন ঠেললো। নীচের মানুষও ঠেললো শক্তিমতো। বাছাড়ি নৌকো আবার ভাসলো জলে।

সামনে নদীর গা ঘেঁসে প্রাচীর দেখা যাচ্ছে। ঘুটে মেরেছে, দিকে জোৎস্নায় দেখা যাচ্ছে। ঘাট থেকে ডাক এলো, 'কাদের নৌকা যায়—'

সুদাম বললো, 'কে আপনেরা?'

আর সঙ্গে সঙ্গে দপাদপ আলো ছুটে এলো। ব্যাটারি লাইট। বলে, 'আমরা—'

এবার বোঝা ব্যাপারটা। পুলিশ টর্চের আলো ফেলে তল্লাসী নিচ্ছে। ঘাট-পুলিশ। মুখে একটা সিটি বেজিয়ে গেল সুদামের—'শালারা এই ভর সইন্ধ্যায় আবার ডিউটি দিচ্ছে।' গলা চেঁচিয়ে বললে, 'সুদন মাঝির।' তার মানে ছুদন পেয়োর। পেয়ো শব্দটা বলতে নেই।

কোন্ ভোজবাজিতে বাছাড়ির পাঁচজন দাঁড়ি কোথায় যেন উধাও হয়ে গিয়েছে। পাটাতনে দাঁড়িয়ে কেবল মিতাই আর সুদাম।

'কি নৌকা?'

'হাটুয়া'—জবাব দিলে মিতাই। অর্থাৎ হাটুরে নৌকো।

দেখাটে আর নৌকো বাঁধলো না মিতাই। বাঁধলো এসে একেবারে পুব ঘাটে। ঘাটটা বড় নিরালা। গঞ্জের আলোর দেখাসাক্ষাৎ নেই। চাঁদের আলো যা পড়েছে চারদিকে। ঘাটে নৌকো বেঁধে বংশী আর গোপীকে পাহারা রেখে তারা উঠে এলো সহরের রাস্তায়। ফটিক-চাঁদের দোকানে যাবার রাস্তাটা চেনে সুদাম। হাটতে

ছুটতে এসে উঠলো দোকানে। সেদিনের সে হালদারটা সঙ্গে আরো দুজন। মোটাই কর্তা বললো লোকটি, 'আছে নাকি ভাই মদটদ ?'

সুধাম বলে, 'কতবার ভাই বলব, আমিও একজন হালদার। এই করে ত আমরা খাই দাই, আপনাকে দিলে আমার চলবে কেমনে ?'

'চলবে রে ভাই চলবে। যাও কি আছে দিয়ে যাও। মোটামুটি পাওয়া গেল—' লোকটা প্রায় কাছে ঘেঁসে এলো। সুধামের কাঁধে হাত চাপড়ায়।

নিতাই হালদারকে দেখছে না। দেখছে দোকান। এত বড় দোকান। ছেতায় কর্পা আলো ঝিকমিক করছে। তাকেই উপায়-করা জিনিসপত্র কিনে ফটিকচাঁদ আজ ধনবান হয়ে বসেছে। পুলিশ তার হাতে। হালাল আছে, কাড় কারবারী বাপারীও আছে। পাইকারী কেনার ব্যবস্থাও আছে। দোকানে বরাত খাটার লোক অনেকগুলি। একদম এ পাশে কুজ মুহুরী বসেছে। হালালদের সে সব চেনে। সুধামের সঙ্গে সেদিন রাত্রে আলাপ হয়েছিল—। আজ এগিয়ে আসতে একটা বিড়ি দিলে। বিড়ি ধরায় সুধাম।

লোকটা তখনও কিটুচ্ছে,—'কি হালা, চলবে ?'

'না না, চলবে না। আর কতবার বলব ?'

মুখ গোমড়া করে লোকটা উঠে গেল। বেচারী বাধ্য করতে পারলে না সুধামকে।

নিতাইকে কাছে ডাকলো সুধাম, 'এই নিতা শোন্।' নিতাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দোকান দেখছিল হাবলা চোখে। দোকানে আসবে বলে ধনরাজ ধুতিটা পরে এসেছে সে। ছোয়া-টানা জামা দিয়ে এসেছে গায়ে। সোনার বোতাম দোকানের আলোয় চিকচিক করছে তার। পকেটে সস্তা পেন। হাতে ঘড়িও পরে এসেছে। ঘড়িটা সুধামের। সুধাম বাঁধে না, বাঁধে নিতাই। বড় সখ নিতাইর। মাথায় তেলমাজা চুল। সরু জলে ছেঁদা চুলে চিরুনী দিয়ে এসেছে।

নিতাই কাছে আসতে কুজ মুহুরীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় সুধাম, 'এই আমাদের মহাজনের ছেলে। আমার বন্ধু নিতাই—'

কুজবিহারী একটু মুচকি হাসে নিতাইকে দেখে। তারপর নীরবে আরেকটা বিড়ি বাড়িয়ে দেয় নিতাইকে।

মাল লেনা-দেনার ব্যাপারে মেটাতে রাত একপ্রহর গড়িয়ে গেল। তোমার নগদ সেড়শ' টাকা গুঁজে বাটে ফিরলো সুধাম আর নিতাই।

আকাশের বুকে ভাঙা ভাঙা ঢেউ খেলিয়ে চক্র হয়েছে সাদা সাদা মেঘ। সারাদিনের শ্রমশ্রান্ত মনটা এমন সময় উদাস করে। ঘাটে পড়েছে বিরাট সিমেন্টের শান। এলিয়ে বসার জায়গা আছে। এসে বসলো সুধাম আর নিতাই।

নিতাই বলে, 'আমাদের দোকানটা এই মাসের মধ্যে বসাতে হবে। ঘামন করে হউক করতে হবে। তা নয় মাত্তর মাসখেড় আর বাকী পুজার। পুজার বাজারটা মার যাবে তা হলে।'

'ক্যান মার যাবে ক্যান। আমি কুজ মুহুরীরে কইছি। ঐ বেবাক ঠিক কইয়া দিবে কইছে—' সুধাম বললে।

নিতাই একেবারে ক্ষেপে এলো সুধামের দিকে। বলে, 'ও, বন্ধু যে আমার কি আমি সেই ভাবি। সুদা, তরে না পাইলে জেবনটা আমার নস্কারায়ই যেত, এ আমি জানি।'

রাত্রিটা যেন স্বপ্ন-কামনা-বাসনার কুয়াশা ছড়িয়ে চলেছে। ঝাপ্‌সা হয়ে যাচ্ছে চাঁদ। আবার ভাসতে ভাসতে মেঘের ওপারে গিয়ে উঠছে। চারিদিকে আলোয় আবছায়ার ভরা। বাতাসে বাতাসে জলো মনের নিমন্ত্রণ। নদী তরা-ভাদরের আশীর্বাদ বইছে। মানুষের মন অপূর্ণ চিরদিন। পূর্ণ হবার কত যে তার আকুলি-বিকুলি।

মেঘের দিকে, চাঁদের দিকে তাকাতে তাকাতে কি নির্বেদ খুঁজে পেল কে জানে, সুধাম বললো, 'আমার জেবনটাও বন্ধু এমনি নস্কারায় ভরা। দুনিয়ায় আপন আর ক্যাও নাই, শুধু একজন ছাড়া। কিন্তু তার উপরও জের আমার কোন জোর চলে না।'

তবে আবার কেমন আপন ? যার ওপর জোর চলে না সে আবার আপন হবে এবাকার হলো কবে ? আপন হতে গেলে আপনি ধরিয়ে নিতে হবে। ভালমন্দ আছে এ সংসারে। যার ভালমন্দ তুমি দুটোই নিতে পেরেছ, যাকে ফেলে দেবার তোমার অবসর নেই, আসকার

নেই, সেই হয় তোমার আপন। তা নয় কিছু মিলাম, মিলাম না কিছু ; অনেকটা লোকাচারি হয়ে গেল। মনের মানুষ যে, তার সঙ্গে তো লোকাচারি চলে না।

মিতাই বললে, 'তার বাও নেই কইল সুদা, তবে তার যে বোনের কথা কইছিলি, সে কই? সে তো এই শহরে কোথায় থাকে না?'

আচমকা, আচমকা সুদাম একেবারে সোজা হয়ে বসলো। মেনকাকে মনে পড়ছিল। মেনকার পাশাপাশি সোনাকেও মনে পড়ছিল। আবুধিয়ার বুকের উত্তপ্ত অনুভূতিটা থরথরিয়ে ওঠে। যেন আগুন নিশ্চিন্ত ধরে কে যেন জ্বালছে বুকের মধ্যে। সুদাম মিতাইয়ের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট বাঁকালে—, 'শহরে থাকে, না আর কিছু। থাকে ত এই গঞ্জের চালায়।'

'কামন, কামন?'—মিতাইয়ের বুকে কোন বিরহী বসে বিড়া বাজিয়েছে—পুঁ। একেবারে মুখোমুখি ঘুরে বসলো মিতাই। বললে, 'কি কইল রে সুদা, তর বোন যদি এই গঞ্জেই থাকে তো একবার দেখা কইরে আসতম। চেনাপরিচয় থাকত তর বোনের সঙ্গে। আর তা ছেড়া আমরা বাদন ফেরোন মানুষ এই পর্যন্তই—' কথাটা শেষ হলো না মিতাইয়ের গলায়।

সুদামের মনে তখন আবার ঝাউবনের লুটোপুটি। মেনকার কথা মনে পড়ছে। কিন্তু বড় ঝাপসা হয়ে আসছে, চেনা যাচ্ছে না সুদাম। সোনার, কথাও তো কথাগুলোও মনে পড়লো। মেয়েটার কি বড়-বড় চোখ সুদাম। আকাশে ছানা-ছানি মেঘের মাতামাতি। এদিকে-ওদিকে মিটমিটে দেয়ালী তারার আলোয়। কি বলছে তারা নদীর স্রোতে ঝোপে-ঝাড়ে, বা ঘাসে বা ঘাসে—মনে হচ্ছে নারিকেলের পাতায় পাতায়। সোনার চাঁপাকলা কাঁপানো এখনও যেন কানে ঘুপাক খায়। কোন্ অবসরে কথাটা বলেই ফেললো সুদাম, 'কান তুই ওখানে যাবি?'

'যেতম'—আশ্চর্য, একেবারে যে বাঙালি বলছে মিতাই।

অবাক হয়ে তাকালে সুদাম বন্ধুর দিকে। জ্যোৎস্না রাত। আলোর ঢেউ খেলে যাচ্ছে বন্ধুর মাথা গায়ে। বড় বড় কালো চোখ দুটি জ্বল জ্বল করছে। কোন

With best Greetings to you

Messrs. ORIENT TRADERS

of

161/1, MAHATMA GANDHI ROAD,

CALCUTTA-7

PHONE : 33-4879

take pleasure to invite your enquiries and indents for :—

BRASS & COPPER RODS, PIPES, WIRE, FLATS, SHEETS & semis GAS WELDING RODS (Silicon, Manganese, Bronze, Nickel, C. C. M. S., Super Silicon Cast Iron); PHOS. BRONZE RODS, SHEETS, WIRE, NONFERROUS METAL and METAL ALLOYS etc., etc., etc.

মুখোমুখি বুকে পেরেছে সেখানে সুধাময় প্রথমে ভাবলে, বন্ধুকে বরাই দেবে কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পেরে সুধাময় পকেট থেকে টাকাটা বের করে নিতাইয়ের হাতে দিলে। বৃষ্টির ফলে মাটীর রাস্তা পিছল, অন্ধকারে চারিদিকে জলের ফুল ভাসছে। কাঁকরমাটির রাস্তা ভেঙে সাবধানে ছুটতে লাগলো। রাইমঙ্গলের অপরূপ ছোট সংসার তার। হয়তো বন্ধু একটির আঘাতে পাবে, পাবে আঘাত দেবে বিস্তর। কামনা-বাসনা বলে কথা,—মেয়ের মন পেতে পুরুষের নিত্যনি বাড়িয়ে রাখে, টিকতে না।

তবু সাধনের মায়া নেই। রোকান গড়তে হবে। দুটি হয়ে জীবনের অবসাদ অন্ধকার থেকে জীবনের মুক্তপক্ষ স্বচ্ছতায় অভিনন্দিত হতে হবে। অন্ততঃ চেষ্টা করে মানুষ সুখের তাই জীবনযুদ্ধ কাকে বলে শিখেছে। তাই বড় প্রয়োজন টাকার। মাস কিস্তির টাকা কটা আছে নিতাইয়ের কাছে। টাকা কটা বাঁচানো দরকার। তা নয় মায়াবিনীর মায়াতে পুরুষমন নিজেকে বেচতেও বাকী রেখে না।

সুধাময় বললে, 'যাবি যদি, তবে টাকা রেখে আমায় দে। আমি যাচ্ছি।'

কালিন্দী ছুটছে উধাও। তাইনে বাঁয়ে তার কি লক্ষ্য আছে? এপারে নীপবনে মায়া কুটছে সদীসনে শ্রীরাধিকা। ওপারের কোনখানে কৃষ্ণ বাজিয়েছেন বিরহ-বাঁশরী। পকেট থেকে টাকাটা বের করে গুঁজে দিলে নিতাই সুধাময়ের হাতে, 'এইনে তুই রাখ।'

টাকা কটা কাপড়ের কোঁচায় শক্ত করে বাঁধলো সুধাময়। স্টেশনের ঘাটের কিনার থেকে উঠে এলো সে,—'তবে আয় ভাই, দেরী হয়ে গেল।'

নদীর কিনার বেয়ে আসতে আসতে ছোটটা পেরিয়ে চৌকা গলিটার পথ ধরে সুধাময়। ঠিক পেছনে তার নিতাই।

কয়েকটা অন্ধকার মোড় পেরিয়ে এসে এক জায়গায় বন্ধুকে দাঁড়াতে বললে সুধাময়। পাশের ঘরটায় কারা যেন ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলছে। পাশেই ঠেলা কল। সুধাময় বললে, 'মুখটা পেচ্ছাব করিয়া ধুয়ে লে নিতাই। আর রুমাল আছে?'

মুখ ধুইতে ধুইতে নিতাই বললো, 'না—।'

'হবে ত সারছিস্। এ্যাখন রুমাল কই পাই বেল?'

রুমাল যে এই ক্যাপা রাত্রিটার জন্যে না হলে চলবে না। সোনাকে বলেছে বড়বাজারই সে ঘুরিয়ে দেখে, অন্তত তার যে বাহু লক্ষণগুলি অটুট রাখা দরকার—সে কথা সঠিক বুঝবে না নিতাই। একটা আতর শিশিও দরকার। সেই দুপুরে লেটে যা পড়েছিল, এখন পর্যন্ত কিছুই পড়ে নি। নৌকোয় ফিরলে রাঁধা ভাত পেত। এখন রাঁধা ভাত পাওয়া যায় কোথায়? গলিটার একেবারে শেষ কিনারে বড়রাস্তার ধার ঘেঁসে একটা হোটেল। মাছ-ভাত যা ছিল খেয়ে এলো সুধাময় আর নিতাই। সেদিনের সেই পানের দোকানটায় পান কিনে নেবে।

বাজারের দিকে সবেমাত্র মুখ ফিরিয়েছিল সুধাময়, রুমাল আর আতরশিশি কিনে নিয়ে আসতে, দোকানীটা বললে, 'আর কিছু চাই? সিগারেট?'

'হুঁ, এক প্যাকেট দেও।' সিগারেটের দাম দিতে দিতে সুধাময় জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা দোকানী ভাই, আতর আর রুমাল আছে?'

'না আমার কেছে নেই।'

এ্যাত রাত্তে ঘনিষ্যিরী দোকান কি আর খোলা থাকে?

গলির মুখে আসতেই সোনার সঙ্গে দেখা। কোথায় ছিল, অন্ধকার ফাঁক করে ছুটে এলো আলোয়, 'কি ব্যাপার, আজ সাত দিন তোমার দেখা নাই যে দাদা? মানুষ কই, লাগেই নাকি?'

'হুঁ'—সুধাময় তাকিয়েছে সোনার দিকে। চারচোখি মাখা নড়লে শুধু।

নিতাই তাকিয়েছে সোনার দিকে। আলোর সাধনে দেখা মেয়েমানুষ। সর্বাঙ্গ তার ঝলমল করছে। সোনাকে দেখতে মোটামুটি ভালো। টানা খুত্‌নিটার জন্য আরও ভালো মানিয়েছে তাকে। পিঠের ওপর চুল ছড়ানো। তেলহীন শুকনো চুল রেশমের মতো বাধার তুলে বাতাসে উড়ছে। কানের কানবালা মেয়েদের এমন সুন্দর মানায়, চেয়ে চেয়ে দেখছে নিতাই। সুধাময়ের সঙ্গে আশ্চর্য মিল আছে গায়ের রঙের। সোনার গায়ের রঙ কর্সা। রাঙে আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। শাড়ি পরেছে ফিকা সবুজ রঙের। পাড়টি তার বড় ভাল—কেমন লতানো লতানো। কাপড়টা পরেছে আশ্চর্য কায়দায় দেহভঙ্গি দিয়ে। বুকের নীচে কেমন কোঁজ কোঁজ হয়ে রয়েছে কাপড়টা। সারা গায়ে যৌবন

আছে প্রচুর, তবে দুটিতে যে আরো বেশী। মেঘেমানুষের এমন চোখ হয়? না, টেনে বড় করা। আর কাজল মেখেই যেন চেলেছি মিতাই।

পাশের চোকোণের আলো থেকে সরে এলো ছায়া। ফোঁস করলো মিতাইর দিকে মুখ করে,'তোমার লেগে আমার ঘুম নাই রাতে। দাদারে কতবার কইছি, তুমারে নিয়া আসতে।'

ঘুমজাগানিয়ার ঘর। লোকের সামনে ঘুমনারে ছায়ায় একটু ঢেকো পরাতে চায় সোনা। তবু একেবারে ঢাকা দেওয়া যায় না। বারো-মেশালি গলায় কথা বলে সোনা। মুখে যা আসে, সমুদ্রমন্থন করে যতটা পারে মিঠে কথার অমৃত সে ঢেলে দিতে চায়। থাক, মিছুক বিধ, মিছুক গরল থাকে বলে,—সে সব তার জন্যেই থাক। বুক ফেটে রক্ত দিতে এসেছে। নিদারুণ অভাবে না পড়লে মেয়েমানুষ হয়ে দেহের বেসাতি খুলে বসতো না। হয়তো কোন কারণে বিয়ে হয়নি অথচ বিয়ের ফসল তাকে কাটতে হয়েছে তাইই হবে, নয় শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী সন্তান ছিল, সব গিয়েছে—মেয়েমানুষ ভাসতে ভাসতে অকূলে এসে পরিচয়ে পড়েছে যা তোক একটা কারণ আছে। তা নয় জন্মের পর থেকেই একেবারে চৌদ্দ বছর সেজেগুজে হয়ে শুধু বাইজীর ভাব নিয়ে বাঈজীর মতো বড় উঠে পসারী হয়েছে কাজল? সব কথার মেয়েমানুষ হওয়াটাই —একটা মেয়ে মানুষের নয়—অমরাবতীর।

মেয়েটি সুদামের বোন বটে। মনে মনে ঠিক করেছে মিতাই। কেমন, কেমন চোখ-চোখ, তাই নিয়ে কথা বলতে পারে সুদামের সঙ্গে, তার সঙ্গে। কথা বলতে পারে সুন্দর, মুখ ফেটে কথা বলে। চোখের চাউনি ভাষা উজ্জ্বল। কথা বললে মেয়েটিকে দেখায় আরো ভালই, দাঁতটা মিলিয়ে দেখতে হলে ভালই।

মিতাই ঠিক কথা বলতে পারলো না। হাসতেও ঠিক পারলো না।

মেয়েটি হেসে এলো। চোখ দুটো একেবারে যেন বিজলী বাতি হয়ে জ্বলছে। ঠোঁট আলতাপালি রঙ করে ডাকলো, 'আসেন।'

সুচিত্রিত সুমুদ্রিত সুসম্পাদিত

শারদ বসুধারা

মনোরম গল্প সমাবেশ
অন্নদাশঙ্কর রায়
কৃষ্ণকলি
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
নরেন্দ্রনাথ মিত্র
প্রবোধকুমার সান্যাল
বাণী রায়
বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়
মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য
মানবেন্দ্র পাল

তিনটি পূর্ণাংগ উপন্যাস
লীলা মজুমদার
দীপক চৌধুরী
শঙ্কর

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
সরোজকুমার রায়চৌধুরী
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
সুশীল রায়
সুলেখা দাশগুপ্ত
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

রম্য রচনা
পরশুরাম
যাযাবর
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ও
আরও অনেকে

বসুধারা প্রতিমাসেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে

কার্যালয় : ৪২, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট। কলিকাতা—৬

সোনা এগিয়ে যাচ্ছে কথা-গল্প কোলাহল-ভরা গলির ভিতরে। মাঝে নিতাই। একেবারে পেছনে সুধাম। জগতের নীলাভাসা দেখছে সুধাম। আর ভাবছে হিজিবিজি কালি কলি ভাবনা। মনকাকে পাওয়া গেলেও যেতে পারে, নৌকোর ঘাট, বাড়িটা একটা, স্টিকচাঁদের দোকানের ঐ চালাটা—একটা দোকান করবে তারা, মনিহারী-কাপড়ের মিলিয়ে দোকান—বিয়ে করে ঘরে তুলবে একটা মেয়েকে সোনার বউ—সুন্দর। সোনা ঠিক কথাই বলছিল।

সোনা তার বোন। এমন যেন ঠিক বোন নয়। শুধু মেয়ে, কোন পরিচয় তার নেই, সধবা নয়, বিধবা নয়। বলতে পার, তার চেয়ের মেয়ে, একই বাপ মায়ের। নৌকো কেটে গেলে নৌকো ঘরছাড়া। নদীর ধেয়ালে সে যায় আসে—তার মর্জি। সোনা এমন বারোমাসের পাড়ার মেয়ে—একটি স্বতন্ত্র পৃথিবী।

সোনা আর নিতাই একেবারে পাশাপাশি এবারে এগুচ্ছে। সুধাম এখানে নেহাৎ অপ্রয়োজনীয়—একান্ত অবাঞ্ছিত। আলো একটু একটু মুছে গিয়েছে আকাশ থেকে কালচে মেঘ আবার জমতে শুরু করেছে। আবছা অন্ধকার, শুধু রোশনাই জ্বলছে ও দুটি মনের। এই মুহূর্ত, এই নেশামদির রাতটা একান্তভাবে নিতাই আর সোনার। সুধামকে তারা অস্বীকার করতে পারে চূড়ান্ত ভাবেই।

গায়ে গতর আছে সুধামের। সাহসও আছে বুকের মোহনার অভ্যন্তর। ইচ্ছা করলে দুজনকে দুটো ধাক্কায় ভূমিপাত করতে পারে অক্লেশেই। কিন্তু ওটা সম্ভব নয়। একটি বোন, আর একজন বন্ধু। কাকে কি বলবে? সামলাবে কাকে?

অন্ধকার উঠান। এগিয়ে গিয়ে তালা খুললো সোনা। আলো জ্বাললো। নিতাই ঘরে ঢুকতে হেসে বললো সোনা, 'আসুন, এই বিছানায় বসুন। আমি বায়নদারের টাকাটা দিয়ে আসি।'

বায়নদার অর্থাৎ বায়নাদার। বায়নদারকে বুঝতে পারলো না নিতাই। বৈঠা মেরে যেন কথা বললো নিতাই, 'বায়নাদার কেরে কে?'

'ঐ তো তোমার সঙ্গে যে আসছিল।'—সুটকেশ থেকে টাকা বের করতে করতে কথা বললো সোনা।

নিতাই হাসলো একটু। বললো, 'সে ত আমার বন্ধু।'

'বন্ধু?' ঘমকে গেল সোনার হাত। মুখ ফিরিয়ে ঘুরে বসলো সোনা। মাথা দুলিয়ে চোখ উল্টে বললে, 'ও, তুমি তা হইলে আমার গামাগালির বর। তোমার দুয়ারেই আমাকে নিয়া রাখবার কথা কয়েছিল তোমার বন্ধু!'

নিরেট ছাতির ভেতরে ঘুণ ধরেছিল নিতাইর। তার টের সে পাওয়ার আগেই তার বন্ধু পেয়েছিল। তাই বোনের কাছে কথাটা পাকাপাকি সে বুঝি করেই রেখেছে। অবাক হয়ে ভাবিয়েছিল নিতাই। বললে, 'আমি আবার কার বর হলাম সোনা? কই আমি ত জানি না?'

চিরোল গলায় কথা বললো সোনা, 'হ গ বর। আমারেই বর। তোমার লগেই মালা বদলের ধান্দায় ছিল তোমার বন্ধু, সে আমি বুঝছি।'

হেরিকেনের আলো এসে পড়েছে মাথার চুলে, অর্ধেকটা মুখে। চোখের ভ্রূ, মাথার চুল চক্‌চক্ করছে। ঝিলমিল করছে কানের বালা। সোনার কানবালা। কিন্তু আশ্চর্য, নিতাইর মনে অপরিচয়ের বালাই জাগছে না। সোনাকে যেন চেনা মনে হয় অনেকখানি। একেবারে খোলাখুলি বললে, 'তোমার ঘরও তাহলে রেঙ্গাননগর?'

'হ গ গামাবেলে ঘর। আমি সেই রেইঙ্গান-নাগরী।'

বাইরে মেঘ ঢেকেছে চাঁদের মুখ। অন্ধকারে ভরে গেছে পৃথিবী। ঘরের অন্ধকারে হেরিকেনের আলো সর্বগ্রাসী দীপ্তি নিয়ে জ্বলছে। আর রোশনাই জ্বালানো দুটি আদিম মনের দীপান্বিতায়। পরিচয়টা পাকাপাকি করবে নিতাই? বন্ধুর নিজের বোন কিনা তাই বা কে জানে? কিন্তু কথাবার্তায় তো তাই মনে হয়। বললে, 'বন্ধু আমার, তোমার দাদা না? সুধামের নিজের বোন তুমি?'

'কে কার বইন? সহস্র-গজ জাহাজায় তার কি পরিচয়? আমি শুধু তোমার রেইঙ্গান-নাগরী গ নিতা। এ ছাড়া কার কী!'

শোন কথা? মেয়েটা ঝিলমিল ঘরে হাসলো সাদা একসারি হীরকদাঁত মেলিয়ে। মোহানা হাসনীর আগুনার তুফান হয়ে ভেঙে ভেঙে পড়লো মেয়েটা। সুটকেশ বন্ধ করলো আঁচলের চাবি দিয়ে। খুট করে শব্দ হলো। এক গোছা

অবাহত গতি

একদা মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত রচনা করিয়া ইহাকে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য একজন লেখকের খোঁজ করিতেছিলেন। কিন্তু কেহই এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হইলেন না। অবশেষে পার্বতী-তনয় গণেশ এই শর্তে রাজি হইলেন যে তাঁর লেখনী মুহূর্তের জন্যও থামিবে না।

আধুনিক যুগের লেখকরাও চান যে তাঁদের লেখার গতি কোনক্রমেই ব্যাহত না হয়। আর এই অব্যাহত গতির জন্যই সুলেখা আজ এত জনপ্রিয়।

সুলেখা ওয়ার্কস্ লিঃ
কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

নেই দিয়ে বলাইয়ের কাছে এগিয়ে এলো সোনা। বললে, 'তুমি বস, আমি টাকাটা চুকিয়ে দি বাবনদার রে।'

কিন্তু কই বাবনদার? সুধাময়কে খুঁজে পেলে না সোনা। নিতাই ভয় ভয় করে খুঁজলো এখানে ওখানে। সুধাময় সেই অন্ধকারের অতলে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে।

ভাদ্রের আকাশে ছমোছমি মেঘ ছুটেছে। ঘন কালো মেঘ। সে মেঘে তার কালো গহ্বরে দিশে হারিয়েছে। পৃথিবী অন্ধকার। বারোবাসর পাড়ার সোলপাতার ছাউনি—শঙ্করের চলা মৃত্যুখণ্ডের মতো নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে। বড় অপরিচিত বিশ্ববাহির। বারোবাসর পাড়ার কোথাও নড়বার উপায় নেই নিতাইর। অলিগলি সে চেনে না। বন্ধুকে না দেখে কাঁদিয়ে ওঠে নিতাই, 'সুধাম কই গেলা?'

সোনা এগিয়ে আসে নিতাইর পাশে, 'ক্যান তোমার ডর করে?'

'না ডরের কথা নয়। লুটতিয়া ঘরকে সে ডর লাগে না। তবে কি জানো রেজান-নাগরী, ঘাটের পথ আমি চিনি না।' নিতাই হাসলো শুকনো মুখে। অন্ধকারে হাসি দেখা গেল না।

বইরে উঠানে দাঁড়িয়েছে নিতাই। ঘরের তালায় চাবি দিলে সোনা। দিতে দিতে বললে, 'ক্যান ঘাটে কি দরকার?'

'ঘাটে নৌকা আছে।'

সোনা চোখ তুলেছে অন্ধকারে। ব্যাটারি টর্চটা নিয়ে এসেছিল। পায়ের কাছে আলো ঢাললো অকারণে। হঠাৎ খিলখিলিয়ে উঠলো, 'ক্যান তুমিই মাঝি বুঝি?'

'না, মাঝি শুধু না, মালিক।'—নিতাই বললে।

চোখে সোনার চাপা চিকুর জ্বলে। ঘুরের দিকে আলো ফেলিয়ে বললে, 'বর, আমি তা হইলে ভাগ্যবান। তুমি নিজেই মাঝি—নিজেই নৌকার মালিক। রাজা-আমীর মানুষ তুমি। তোমারে নিলে রাখতুম কোথায়?'

নিতাই হাসতে হাসতে বললে, 'কিন্তু কই আর আমার নিলে? আমার ত শাঁখে আসতে হলো।'

আসতে হলো। কথা শেষ হবার আগেই একঝাঁক ব্যাটারি-আলো ঝাঁপিয়ে পড়লো নিতাইর মুখের ওপর। সোজাসুজি টর্চটা তুলে ধরেছে সোনা। অপাঙ্গে চেয়ে কথা বললে সোনা, 'কি বললে গামালেলে বর, তুমি আমারে নিতে এসেছ।'

হঠাৎ আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে গেছিল নিতাইর। চট করে কথা বলতে পারলে না। তবে তার বুক যে মোহানা নদীর আগুনা খাচ্ছে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। ফুলুল ভাসিয়ে ভরা জোয়ার অর্থাৎ আগুনার ঝাপাঝাপি চলেছে বোঝা যায়। জলের কলকলানি হুমগুম শব্দ শুনলে বোঝা যায়, সে মাথা চাড়া দিয়েছে। বড় সর্বনাশী তার মূর্তিখানি, বড় উত্তাল।

আর সোনা তো অভ্যস্ত মেয়ে। ঠারে-বেঠারে কথা বলতে সে জানে। কেমন করে বিবাগী পুরুষের মনকে মোহ-ভাবনার কুয়াশাবেরা দ্বীপান্তরে ডেকে নিতে হয়—কথার জালি-রাতি সে জানে, বৃষ্টি যার বার সে দিচ্ছে। লুটতিয়া পুরুষের ঠোঁট কতদূর সে পরীক্ষা করতে চায়। সোনা বললে, 'কিন্তন আমার কি ভ্যামন কপাল আছে গ, যা হবে আর কোনদিন?'

'কপালে যে কার কি আছে, ক্যাও বুঝতে পারে? কপালে বোঝে। তুমি আসে থিকে কমনে বুঝবে রেজান-নাগরী?'

আশ্চর্য, কেমন গভীরে তলিয়ে গেল সোনা। কথার কথায় কি বলছে নিতাই। সত্যিই ঠিক বলেছে নিতাই। বললে, 'না, বুঝি না গ বর। কপালে কি আছে তা বুঝি না।'

নিতাই বললে, 'আর তুমি যে বললে রেজান-নাগরী, তোমারে নিতে এসেছি স্যাকি? কি করে বলি সেই মনের কথা? নদীর সোতে নোঙর ছেঁড়া নৌকা ভেইসে যায়, মানুষের মন যদি ভ্যামন কিছু হয় ত ভেইসে যাবে। তাতে কার কী? তাকে আটকেবার নিদ্দেশ করাটাই বেকুল।'

সোনা স্তব্ধ চোখে শুধু তাকিয়েছে নিতাইর দিকে। আকাশের চাঁদ আবার এতটুকু মুখ খুলেছে। পাতলা আলো হয়েছে চারদিক। নিতাইকে দেখা যাচ্ছে। নিতাই দাঁড়িয়েছে গলির দিকে মুখ করে।

হঠাৎ নিতাই ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বললে, 'আমারে এট্টু, ঘাটের দিকের পথটা চিনিয়ে দাও, আমি যাই রেজান-নাগরী।'

সোনা তাকিয়েছে নিতাইর দিকে। কালো চুলে জোৎস্না খেলছে। সারা অবয়বে তার এবপ্রকার আগুন আছে। কালো চোখে মুখে সেই আগুন ঝাপাতে খেয়েছে সোনা। সোনার বুকের বেদনা-যৌবনের জ্বালা যেন সে আগুনে একাকার হয়ে মিশে যায়। পুড়িয়ে ছারখার করে না। এমন

আগুন আছে নাকি যার দহনক্ষমতা বিশগুণ বেশী। এমন নেশা আছে নাকি, যাতে আর পাঁচ রকম নেশা টেঁকে না।

গলা নামিয়ে বললে সোনা, 'ঘাটে যেতে ঘরের যে ঘড় তাড়া।'

'হুঁ, তাড়া আছে এটুস্। আমি যাই।'

আগে আগে নদীর ঘাটে এলো সোনা। টর্চের আলো দিলো নিতাইকে। বললে, 'সাবধানে যাবা গ গামাখেলে বর, বর্ষার দিনের খানা আছে এ গলিতে মোটা দুই।—'

নিতাই বললে, 'অকুল পাথার না ত?'

'না'—হাসলো সোনা।

'তবে ভয় নাই।'—নিতাই আলো ফেলে ফেলে এগিয়ে এলো ঘাটে।

ঘাটে এসে নিতাই বললে, 'তবে আমি যাই রেজান-নগরী।'

সাঁ করে ঘুরে দাঁড়ালো সোনা। বললে, 'আমারে ফাঁকি দিবে যাও কান গামাখেলে বর? তুমি আমার মহাজন, ট্যাকা যাও।'

'ট্যাকা আমার নাই। আমি ত তুমার মহাজন না, বর—গামাখেলে বর। গামাখেলে বর রেজান-নাগরীরে ট্যাকা দিয়ে অপমান করে না। মানুষের দালাল সে নয়, মনের কাঙাল।' মাড়া দিয়ে কথা বলে নিতাই।

নদীর স্রোত সরে গেছে—কালি কাকড়া বালুর মতো সমুদ্রের। মাঝি নিজের প্রয়োজনে তার নৌকো চালায়। স্রোতের কথায়ও না, বাতাসের মিনতিও সে মানে না। কিন্তু দক্ষিণে আগুনী এলো অলক্ষণে, বাসকের জঙ্গল চিরে লুটতিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ে সর্বনাশ করলো তার। তার সহজ গতি হারিয়ে গেছে। এতবড় যে স্বাধীন জীব বারো-বাসর পাড়ার বাসিন্দারা, তারা লুটতিয়াকে চেনে না। কিন্তু বাজারের আর দশটা মানুষের মত সাজ-পোষাক পরে সেও ঘুরছে। কার মনে যে সিঁধ চালাবে, প্রাণে মারে কাকে, কে তার হিসেব রাখে।

সোনা দাঁড়িয়ে গেল অনেকক্ষণ। আকাশের ঘোলা চাঁদ—পশ্চিমে হেলে গেছে। শেষবারের মতো আলো ঢালছে নিতাইর গায়। পরিপাটি সাজ-গোজ মানুষটিকে কি যে অপূর্ব মানিয়েছে। সোনা শুধু বললে, 'মনের কাঙাল তুমি। বেশ দেখা যাবে—। কাল আসে।'

চলে গেল সোনা। ভাবতে ভাবতে গেল, এ কথাটা সম্পূর্ণ নতুন। গা যে পেয়েছে, মনের খুশি দিয়ে গেছে। কিন্তু মুক্তহাত ফেলে এমন করে মনটা ভরিয়ে দিতে কেউ তো পারে নি। সে জানছে প্রাণে মনে; বাবা এলো, তারা প্রাণভয়। আগুন নিয়েই এলো, দিয়ে গেল তাকে আগুনই। একবিন্দু শান্তি তো দিতে পারে নি। তার কামনা-বাসনাকে মাতিয়ে মাতিয়ে কেবল চিতাই সাজিয়েছে তারা, টাকার লোভ দেখিয়ে জয় করেছে দেহকে। কিন্তু মনের বেদনা বোঝে নি। কিন্তু নিতাই! মানুষটা নতুন বটে। নেশাটাও যে বড় নতুন। এ আবার কোন্ রসিক এলো রঙ্গিণীকে রাঙাতে।

॥ ১০ ॥

কটিকচাঁদের দোকানের আড়ম্বরটা বেশ মন মজেছে নিতাইর। সুদামকে নিয়ে এসে উঠলো আবার দোকানে। কটিকচাঁদের দোকানে কুঞ্জ মুহুরী বসে ঢুলছিল। খালাসটা বাজার ফেরতি আসবে। ঠিক দুপুরে গঞ্জের দোকান তো আড়-কপাট ভেজিয়ে রাখে। পরিদ-বিক্রি তেমন নেই বলে মাল-দেবার লোকগুলো ঘুমায়। মালিকও ঘুমায়, মুহুরীও ঢোলে। এখন দুপুর।

ভাঙ্গ-কপাটের ফাঁক দিয়ে নুন বাতাসে সুদাম। বাইরে প্রচণ্ড গরম পড়েছে। আকাশে মেঘ আছে পাতলা রকমের। রোদ কড়া। গা পুড়ে যাওয়া রোদ। রোদ না, বৃষ্টি। বোকা যাচ্ছে রাত-বিতে যখন তখন বৃষ্টি নামবে। তুমুল বৃষ্টি নামবে।

বাইরে থেকে ডাকলো সুদাম, 'ও মুহুরী মশায়, মুহুরী মশায়—'

কুঞ্জ মুহুরী মুখ তুলে তাকিয়ে কাপড়ে মুখ পুঁছলো। গিয়ে পাশে বললে, 'এখন তো দোকান বন্ধ, বাবু ওঠেন নি। তোমরা এখন যাও।'

'না কাম আছে। আপনি এট্টু বেইরে আসেন।' সুদাম ডাকলো।

মানুষ মাত্রেই স্বার্থের সন্ধানে ফেরে। নিঃস্বার্থ হয়ে

পৃথিবীতে এসেছে ক'জন। স্বার্থের কথাটা না ভেবে কুঞ্জ মুহুরী বাইরে আসবে না। বললে, 'কিসের দরকার? মাসটাস আছে?'

সুধাম বললে, বিউয়ে, 'না মাসটাস নয়। দিনে মালের খবর যা দি কেমনে যদি বা থেকে থাকে। আমরা আসছি অপর এট্টা কামে। যে কথাটা সেদিন রাতে কইছিলাম, তারই লেইগা।'

আর ইংগিত দিয়ে বলবার প্রয়োজন নেই। স্বার্থের কথা একটু সাবধানে বলা সহাই। অনেক চালিয়াতি ছলে স্বার্থরক্ষা হয়, এ কি আর মানুষকে শেখানো বুলি? মানুষ জন্মের সঙ্গেই পায় এ শিক্ষা।

সামনে বারান্দায় সিমেন্ট-করা। হেলান দেওয়া বেঞ্চিও আছে একটা। বহিরাগতদের হঠাৎ অভ্যর্থনার ব্যবস্থা কটিক-চাঁদের দোকানে আছে। কুঞ্জ মুহুরী এসে বসলো তার ওপর।

সুধাম বললে, 'টাকা পয়সা আমাদের হাতে আসছে। দোকানঘরের কি ব্যবস্থা করলেন আপনি? সামনে পুজার মাস। কারবারের মুরসমটা কলকালে ত চলবে না?'

লুইতিয়া হয়ে কাল কাটায় বটে সুধাম। কিন্তু আর হলটা জীবনকেও দেখেছে। খবর রাখে। লোকটা ধাতে আলেয়া কিনা। ধকাবার ছিল আগে।

কুঞ্জ মুহুরী চোখ রাখলে সুধামের চোখের ওপর। তাকিয়ে দেখলো নিতাইকেও। বললে, 'কিন্তু আমার ঐ কথা। টাকা আমার চাই। টাকা হাতে এলে আমি ঘরের ব্যবস্থায় মন দেব।'

শহরের পাকা মুহুরী। সুধাম ভাবে এমন সেয়ানা লোক আর কে আপন হয়ে কাজ করবে? সুতরাং বিশ্বাস করে পঞ্চাশ টাকা নগদ গুণে দিলে সে কুঞ্জ মুহুরীর হাতে। বললে, 'ঘর একখানা মাসের মইধ্যে যেমন হউক কইরা দিবেন মুহুরী মশায়। শুধু ও না, আপনের সেলামীও দিমু।'

মুখ মুড়ে দাঁড়ালে কুঞ্জ। বলে, 'না, আমি ঘর বাড়ীর কারবার করি না। দেখ, আমার পাওনা মনে রেখো।'

নিতাই এবারে মুখ খুললো, 'মুহুরী মশায়, আমরা আপনাদের দোকানের যোগানদার। আপনার দোকানে আমাদের মাল উঠে, টাকা কটা বাকী থাক,—আপনার পাওনা আমরা মেরে দেব না।'

কিন্তু লুইতিয়া যে, তার কথায় সাধারণে বিশ্বাস করবে না। নদীতে ঘুরে ঘুরে যাদের নৌকো বাওয়া অভ্যাস, পুলিসের পলক এড়িয়ে যাদের দিবারাত্রি যাতায়াত—তাদের ওপর সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করতে পারে না। কুঞ্জ মুহুরীর দোষ নেই। সেও পারে নি। বললে, 'না না, পাওনা টাকা আমি রাখি না।'

সুধাম আর কথা বাড়ালে না। শেষ পর্যন্ত আরো পঞ্চাশ টাকা দিলো কুঞ্জ মুহুরীকে। কুঞ্জ মুহুরী দুজনকে দুটো বিড়ি দিল। বিড়ি টেনে বললে নিতাই, 'বিশ্বাস এট্টা কথা মুহুরী মশায়, যত তাড়াতাড়ি পারেন—কারণ, আর্থিক মাল তো আপনের গোদামে জমা আছে।'

কুঞ্জ মুহুরী কথাটা বেমালুম চেপে গেল। ও কথায় যেন কানই দিলে না। সুধাম হাসে। বলে, 'তুই কি পাগল হইটস নাকি নেতাই? বেশি কথার কাম কি? ও তো আছেই।'

নিতাই হাসলো না সুধামের হাসির প্রত্যুত্তরে। শুধু তাকালে দুজনের দিকে। কুঞ্জ মুহুরী মুখ গোমড়া করে রয়েছে। একটু পরেই দোকানে গিয়ে ঢুকলো কুঞ্জ মুহুরী। রাস্তায় বেরিয়ে এলো সুধাম আর নিতাই।

গলি পেরিয়ে, সোনার উঠানের সামনে থমকে দাঁড়ালে নিতাই। এগিয়ে গেল খানিক। ডাকলো, 'রেজান-নাগরী আছ?'

এক ডাকে দরজার কাছে ছুটে এলো সোনা। সঙ্গে আরও কয়েকজন পাশের বাড়ির মেয়ে এসে জুটেছে। বসে তাস খেলছিল বারোয়ারির পাড়ার মেয়েরা। দরজার ওপারের উঠানে একজন লোক শুয়েছে। কাঁকড়া চুল, কালো গুঁইসের মতো দেখতে। তাকে জ্রুক্ষেপ দিলে না। নিশ্চুপ সে শুয়েই থাকলো। হঠাৎ ব্যস্ততা ছড়িয়ে ছুটে এলো সোনা। উঁকি দিলো আরো কয়েকজন।—একেবারে মুখোমুখি এলো সোনা,—'তুমি কি মনে করে গামাখেলে বর?'

'এয়েছি রেজান-নাগরী, কথা রক্ষা করতে। আজকে যে আসতে তুমি বলছিলে কাল, তুলতে পারি নি গ, তাই এনু।' নিতাই বললে।

খিলখিল করে হেসে উঠলো সোনা, 'ও তাই বুঝি? কী ভাগ্যি আমার!' চোখে চোখে যেন চকমকি ঘসলে।

বারোমাসের পাড়ায় মেয়ে সোনা। কথা একটা বলতে হয় এমন, না হয় বাসছে। একেবারে গুণ গুণ তো ঠেঁটা মারে কি চাঁদ ফেরায়? কিন্তু কাইবঙ্গল আর ঠাকরানের জলে আওকাল জোয়ার আসে ঠিক হাত দিন গুণে গুণে। মহা কোটাল আর ভরা কোটাল। অমাবস্যে থেকে পুর্ণিমে, যে যেন পাঁজির পাতায় হিসেবে বাঁধা।

মিতাই বললে, 'শুনবে সোজন-মাঝী? আজ রাতে আসতে পারব না, ভর সাইঝায় বুবুবাড়ি যাব। নীতে ভাসতে হবে সারারাত। তুমি ভেবে যে বেকল পাবে।'

কেমন চমে গেল সোনা। বারোমাসের পাড়ায় মেয়ে সোনার কাছে কথাগুলো কে-ন নতুন ঠেকে। হাসি যেমন মেজকে যায়। গভীরে তলিয়ে গেল যেন সোনার মন। বললে, 'তুমি আমার বেকল বুঝেছ?'

মিতাই মুখ তোলে সোনার দিকে। মাথায় কাপড় নেই, গায়ে জামা নেই সোনার। কাল রাতে কি যেন সব মেখেছিল মুখে, মুখটা অন্যদিন যাদা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল, আজ তা নেই। সর্বাঙ্গে যৌবন বাঁধ-বাঁধা নদীর মতো আটকা পড়েছে। মুখের তিলটা অপূর্ব মানায়। বললে, 'যতটা পারি বুঝি।'

'বোঝ?'

'হাঁ বুঝি। মেয়েমানুষের মনে ঘাঁচড়ের ঘা দিলেও ঘেন্নার ঘাই লাগে—আমি সেটা বুঝি।' কালো গভীর চোখ সোনার। যেন সমুদ্র। বিষ আর অমৃত মিলে একত্র টলমল করছে সেখানে। উত্তাল হচ্ছে, উতরোলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ইশারা পেয়ে মাতলো নর-নদী। কিন্তু একি তাণ্ডব শুরু হলো? গরল-অমৃত আজ আলাদা হলো এ কোন্ মহে? সোনা ভাবছে, আর যাই হোক, আর ছলনা নয়। এমন লোকের কাছে নিজেকে আর লুকিয়ে রাখা পাপ। কিন্তু ধরা দিতে গেলে কাঁদতে হবে। অশ্রুরাগের জোয়ার-জল মানে যে চোখের জল তা কি বোঝে না সোনা?

কাছে একেবারে সেঁপে এলো সোনা। বললে, 'আমার ঘরে আইতে তুমার বসবে না বর? এইখানে শুধু শুধু দাঁড়াবে?' মুখখানি তার বড় ভার-ভার। থমথমে দেখাচ্ছে। চোখের কোণা বুঝি ভিজে আসে।

নিজে পড়বার ও অপরকে উপহার দেবার মত কয়েকখানি বই

দক্ষিণারঞ্জন বসুর
রোদ জল ঝড় (উপন্যাস) ৪·৫০
ছেড়ে আসা গ্রাম (২য় খণ্ড) ৩·৫০
শেফালি নন্দীর
সাগরে হাওরে (উপন্যাস) ৩·৫০
গীতিমুখর ভিয়েনা ২·০০
পান্নাদ্বীপ ১·০০
সন্ধানীর চোখে পশ্চিম ২·৭৫
সিস্টার মিস্ মিত্র (উপন্যাস) ২·২৫
উৎপল দত্তের
অঙ্গার (নাটক) ৩·২৫
ছায়ানট (নাটক) ২·৫০
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
ডিকম নদীর দলং ২·২৫

ডাঃ অমিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যের
ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা ৪·০০
ত্রিপুরাশঙ্কর সেনের
উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য ৫·০০
যোগেশ বাগলের
ভারতের মুক্তিসন্ধানী ৫·০০
অজিত তারণের
ইন্দোচীনের কথা ২·৫০
নারায়ণ চৌধুরীর
সাহিত্যের সমস্যা ৩·০০
অশোক গুহের
আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ২·০০

পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫।১বি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

নিতাই বললে, 'কিছুন উপায় যে নাই খরেজান-নাগরী! লড়ু খেইতে হাসায়, কামে জোড় হবে যে না—'

'তবে কাল আসবে?'

'না গ খরেজান-নাগরী। আবে ত অমন কথা দিতে পারি না। তবে আবার আসব এই বলছু।'

চলে গেল নিতাই। কপাটের গোড়ায় পা ছড়িয়ে বসে ঠাকুর দিকে চেয়ে থাকলো সোনা।

বিষণ গেরো এখন গরীব হয়েছে বটে, তবে গেরো একদিনে ছিল যেমন আছে। বড়ো বড়ো দুই চোখ। সাজগোজ হয়ে কোথায় যেন বেরিয়ে যাচ্ছিল। বিষণ বসে আছে টালি-ছাওয়া ঘরের দোলায়। বসে বসে দেখলো, কিছুই বললে না।

সব শুনে বললো বিষণ, 'খুব সুন্দরীরে আমি চিনি। এতটা বয়স কারবের করনু কাঁটিকাটলের দোকানে, ও লোকটারে চিনি না? তবে দাদা, এতগুলি টাকা ও লোকটার হাতে দেওয়া তোর উচিত হয় নি।'

শুনে ঘুমরে গেল কেমন। নিতাই বললে, 'এখন উপায় কন্তু?'

'উপায় আর কি? ও লোকটার খালে পেরে যদি আদায় কর, কে জানে? তা নয় কুন উপায় দেখি না।'

বুড়োর লোলচর্ম কোটরে মিটমিটে চোখ জ্বলছে। বয়সকালে পুরো সাড়ে চার হাত লম্বা মানুষটার গায়ে খানোর জোর ছিল। চোখে আগুন ঠিকরে বেরুতো। মাথার চুলে লোহর তুলেছিল বিষণ গেরো, এমন কথাও শোনা যায়। কিন্তু এমন মানুষ বয়সের টানে ধরা দিয়েছে একথা বাপের মুখে শোনা নিতাইর। নিতাই যতবার এসেছে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে বিষণ গেরোকে। আজও দেখছিল। আশী বছরের ভাঙা শরীরেও গেরো হবার শক্তি আছে বিষণের।

নিতাই বললে বুড়োর দিকে তাকিয়ে, 'বাপে আমি পাব ওরে। টাকা আমি আদায় করে ছাড়ব। বাধা-জঙ্গলে ঘোরা সেমাসেলে লুটতিয়ার চোখে আঙুল মারে শয়তান, আমরা একবার দেখব।'

'দেখস মরদ মানুষের কথা এই। বয়সকালে আমরা করছি।' কোটরেগত চোখ বিষণের বাপসে ওঠে। বেশী দূরে না, মোহানা গুলীর জলে রক্তের মত রাঙা জল ছড়িয়েছেন রক্তলজ্জা ভাগীরথী। তেতো ঠোঁটে মৃদু হাসছেন রাসকেড়ে হাসি। বাতাসে ঐ মোহানার ওপার থেকে ক্রুদ্ধ গানো ভাসছে।

সুধাময় চাপায় নিতাইকে। বলে, 'টাকা যখন বিশ্বাসে দিয়েইছ, তাখন খাম দু-দিন। আমি মতিগতিটা তার দেখি। কি বলেন—বিশু দাদু—'

বিষণ গেরো ভালুক যেন হাপাচ্ছে। বললে নিতাইর দিকে চেয়ে, 'এইটা কে নিতাই?' অবজ্ঞা ভালো বিষণের কথায়।

নিতাই কথা বলে না। সুধাময় হাসিমুখে বলে, 'এইটা মানুষ। ক্যান কী? ভদ্দর লোকের লগে আপনি মারপিট করতে কন? ধাক্কা বাধাব আমরা। আর সুবুদ্ধে-খোর মানুষ তার উদল (লাভ) যাবে?'

নিতাই চাপায় বন্ধুকে। বলে, 'তুই ঠিকই কইচিস্! আমরা মারপিট ক্যান করব। ও যদি কামটা হাসিল করে ত ভালই। তা নয় বিশু দাদু আছে, দোকানের ব্যবস্থা ও করে নেবে।'

বিষণ গলা গলায় হা-হা করে হাসলো। বললো, 'তর ভাবনা নাই নেতাই, আমি আছি। তুই টাকা আদায় কর তার কাছ থিকে, বুঝলি।'

পরিশ্রমের ওপরও লোকার মার আছে। এ সব ক্ষয়-ক্ষতি বাদে যা তোমার পাওয়া—সেইটাই আসল। বাকীটা উদল। সেটা যায়।

লুটতিয়া যারা, তারা রাতে মারে। মহাজনী নৌকো থাকে মালভরা নিয়ে। তার ওপর তার লোভ। কিন্তু লুটতিয়ার ওপরও লস্কর পাঁড়া খুলছে। তারা আরেক-জন। তারা রাতে মারে না, দিনে মারে। মানুষ-মারার কল মানুষের হাতে। এ কথা কাকে কি বলবে। তবে দোষ নেই লুটতিয়াদের। তারা লাট সাহেব সাজে নি, লুট করে। ভাতের ভাবনা তাদের সবারই। যখন এ ভাবনা ঘুচে যাবে তখন তারা ভদ্দরমানুষ। ভাতের ভাবনা নিয়ে তত্ত্ব হওয়া যায় না।

সুধাময়কে দেখিয়ে নিতাই বললে, 'বিশু দাদু, এ আমার বন্ধু। আমাদের বহরেরই মানুষ। এর বড় জিদ এটা

দোকান করে। দোকানটা ঠিক আমার না, আমাদের দুজনেরই ; প্রয়োজন হলে আমরা দুজনেই কাজ যাবব। তুমি এট্ মাথা গুঁজার ব্যবস্থা করে দিও বিশু দাদু, আর কিছু না।'

ঘাটে নৌকো বাঁধা ছিল। ছদন আগে নি বলে আপ্ বাছাড়ি ছাড়া আর কোন নৌকো নিয়ে আসতে পারে নি নিতাই। বিকেলের আলো ফিনিয়েছিল। পশ্চিম আকাশে কালো মেঘ উঠেছে। বাতাস বয়ে গেছে। সন্ধ্যার পর বাদলা নামতে পারে। ফুলাম বাস হাতে দাঁড় ধরলো। বংশী ফাছি খুলে দিতে নৌকোয় গিয়ে উঠলো নিতাই। নৌকো ছুটল পশ্চিমে—গেরোপালি।

॥ ১১ ॥

রাত এক প্রহর গড়িয়েছে। আকাশের মেঘ ঘন হয়ে জমেছে আজ। যেমন ঘন গাঢ় হয়েছে, মনে হচ্ছে এই নামলো বৃষ্টি। ভাদ্রমাসের হাত ঝিকমিক করে বিভীষিকায়। দু-পাড়ের বনে বাদাড়ে ডাইনীরা বড় আজকাল চলাফেরা করে। ঝিকমিক বিজলী দিলে দেখা যায় সুরানগর-কুকড়াহাটির সোজার সার সার আলো জলছে, নিবছে। ত্রিসংসারে এমন লোকও আছে নাকি, যে সেই শ্মশানঘাটে যাবার তখনই গিয়ে দাঁড়াতে পারবে ? ছদন পারে। কিন্তু পা কাঁপে নিতাইর। বলে, 'ভূতোর লুটেরেগিরি। ওর নিকুচি করেছে। আমি মরে গেলেও যাব নি এমন জায়গায়।'

'কি, যাবি নে, ওলেনে, কালী আছেন, মা কালী। ওঁয়ার সাঙ্গ-পাঙ্গরা আছেন। ছেদিস নি আলো জলে ?—মা প্রণাম করে আয়, কামে যাচ্ছিস।' ছদন ছেলেকে শেখায়, বাধ্য করে নিজের মতের।

কিন্তু পনের বছরের ছেলে নিতাই, হঠাৎ ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জলে। বলে উঠেছিল চিৎকার করে, 'বাবা, এই আমার জ্বাব যাওয়া। আমি পারব নি।'

সঙ্গে সঙ্গে তিন বাছাড়ির দাঁড়ি মাঝি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জলে। হাতড়ে তুলেছিল নিতাইকে। ছেলের সামনে নাক-কান মুড়ে শপথ নিয়েছিল সেদিন ছদন, 'আর জীবনে এমন কাম করব নি। তরে নিয়ে এই কামে আর আসব নি।'

ধরেই ছিল নিতাই। পুরো পাঁচ বছর আসে নি আর। তার পর নিজে এসেছিল বছরে। অনেকটা যেন সখ করে আসা। মেজাজী ছেলেকে আর বেশী কোন জিদ ধরে কথা বলতো না ছদন। কিন্তু এখন দেখছে তেমনি মেজাজ আবার ছেলের খুলেছে। আর তেমনি বন্ধুটিও জুটেছে। ছদন সইতে পারে না এই কারণে ফুলামকে। কি মন্ত্র দিচ্ছে ছেলেকে কে জানে ?

এ পনের দিন রাতের জন্য আসতে পারে নি ছদন। ছেলে নিজেই বহর চালিয়েছে। কত টাকা উড়িয়েছে কুড়িয়েছে, কে জানে। জিজ্ঞেস করে কোনদিন সহজের পায় নি ছদন। বুদ্ধ ভেড়ে তাই আর জিজ্ঞেস করে নি। তবে বিষণ গেরো বিশারদ লোক। নিতাইকে সে চেনে। খবরটা —পাঁচি হিসেবটা তারই কাছে পাওয়া যাবে।

ভাদ্রমাস ছাড়বারের গঞ্জের ঘাটে এসে নোঙর করলো ছদন। মাত্র একটা মাঝিন কাপড়ের গাঁট পেয়েছে ছদন ; সেটার খবর দিতে পালাদের বাড়ি যাওয়া দরকার। বাঁধা-বাড়ার যোগাড় বংশীকে করতে বলে সাঁকো কোমর নিয়ে বিষণ গেরোর বাড়ি উঠে গেল ছদন। যেতে যেতে বললো,

জনসেবায়

মার্টিনস্ লাইট রেলওয়েজ

অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল আমাদের দেশের এই ছোট ছোট রেলপথগুলি জাতির সেবায় নিয়োজিত। শহরতলী ও সন্নিহিত গ্রামাঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষায় এবং গ্রামাঞ্চলের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিধানে এই রেলপথের অবদান অনস্বীকার্য্য। হাজার হাজার যাত্রীকে প্রতিদিন বহন করছে এই রেলপথ। এঁদের মধ্যে আছেন কলকারখানার শ্রমিক, অফিস যাত্রী, শিক্ষাব্রতী ও ব্যবসায়ী।

আপনার পণ্যের সমাচার এঁদের কাছে পৌঁছে দিতে হলে ছোট রেলপথে প্রচার ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করুন।

দেশের সেবায় মার্টিনস্ লাইট রেলওয়েজ জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতা কামনা করে।

'হয় সেইদিন হয় সেদিন হয়ে থাকবি, মরবি তোরা মনে হচ্ছে। আসল, তুলসি দিয়ে একেবারে কলাবার।'

কাল রেডিটা যেন ডিগডিগ ডিগ বের করে চৌদিকার ছেলেমি বিজলী মেলেছে আকাশে। পুবে হানেছে ইশারা। তারা তাদের মনিকক্ষ বাঁধিয়ে আকাশে। আলো নেই একেবারে। গঞ্জের আলো অনেক দূরে। শুধু ছলন গেরোর আলো জ্বলছে চোখে। নিশুপ মেরে গেল সে ঘাটে।

কানের নিচে গুড়-গুড় করে কোথায় বাজছে। ছলন এখনও আসে নি, সুতরাং ইঁদো ডাক হয়েছে ছাড়িতে। শুটোনো পড়িয়ে পড়েছে বন্ধুর পাশে নিতাই। আকাশে মেঘ, একটি তারাও নেই, নিশ্চিহ্ন মুছে গেছে। হঠাৎ নৌকোর গলুইয়ের ওপর ঝুঁকড়ির জঙ্গলে অগ্নিকোণের বাতাস হয়ে কাঁপিয়ে পড়ল ছলন। ছলন এইমাত্র দিয়ে গেরোর ওপর থেকে ফিরে এসেছে।

বলছে কাঁকনা দিয়ে, 'এই নেতাই, এই সুদামিয়া—তোরা করিস কী। আমার সর্বনাশ করচিস ভিতর ভিতর শয়তান দুইটা,—এ্যাঁ?'

রপ ডাকছে, বুঝেছে নিতাই। তন্ত্রার মতো এসেছিল, চোখ মুছতে মুছতে উঠে বসল সে। সুদাম তখনও ওঠে নি।

ছই-এর মুখে আলো জ্বেলানো ছিল না। ভেতরে মেজবালো ছিল। উনুকে হেরিকেনটা নিয়ে এসে বসল ছলন ছই-এর মুখে। বললো, 'আয়, তুই আয়। আয় ডাক তর সে ছুড়িটারে ডাক। কমন ছোঁড়া সেইটা আমি দেখব?'

'ক্যান, কি হইচে?' ধপ করে বসে পড়লো নিতাই পাটাতনে।

'কি হইচে? শয়তান, তুই ঐ ছোঁকা বাঙালের সঙ্গে পড়চিস, হারে শুয়ার? কই, কোন্ পাটায় বুদ্ধিতে পইড়ে তুই অমন করচিস? দোকান করবি শহরে? কুড় মুহুরীরে টাকা দিচিস ক'শওা?'

'ক্যান?'

'ক্যান, তরে আর ডুবাইব ঐ ছোঁড়া। ঐটা সাতঘাটের জল খাওয়া মানুষ, একটা আস্ত ইবলিশ। শহরের গ্যাসার মাতাইছে ঐ ব্যাটা। ক্যান, আমি বাপ তর, আমি ছিলাম না, কি রে নবাবের নাতি—কইতে পারিস নাই মুখ খুলে? বিলম গেরোর কেন্দ্রে কলি পাতুতে গিছিলি, সেই সন্ধানেরে কেন্দ্রে—জাত-বেওসা ছেড়েছে সেইটা।'

কোন জবাব দিলো না নিতাই। আলোয় বসেছিল, নীরবে উঠে গেল অন্ধকারে।

কিন্তু নৌকো চকিয়ে গলা কাটায় ছলন মেয়ো, 'যাউক, সে শয়তানটা এখনই বেইরে যাউক আমার ঘরের থিকে, হা নয় ঘাড় ধরে তাড়ায় আমি নিজে? কুড় মুহুরীরে কত টাকা দিয়েছে, ডাক শয়তানটার, এখনই হিসাব দিক।'

'ক্যান হিসাবের কি সময় পাকিয়ে যাচ্ছে?' গজরালো নিতাই।

ছলন যেন ঘর হয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠল। গর্জালো, 'ক্যান, বন্ধু পীরতী দেখাচিস তুই, হ্যা রে গাড়ল ছোঁড়া। চুপ মার তুই, সেইটা আসুক।'

'না, আসবে নি সে, তবে হিসাব আছে তার। শ টাকাই দিয়েছি কুড় মুহুরিকে।' ওরে ওরেই অন্ধকারে জবাব দিলো নিতাই। উঠবার কোন চেষ্টাই করলো না।

'কী এক শ' টাকা? খাব, খাব তর কলিজা কেইড়ে খাব আমি।'

ছলন গজরালে রাত দুপুর পর্যন্ত। খাওয়া দাওয়ার পর পাশাপাশি ঘুমালে নিতাই আর সুদাম।

দেখে চোখ টাটায় ছলনের, 'শয়তান দুটার দেখি জোড় বেঁধেইছে। ভাঙব, আমি তদের মাণিক জোড় ভাঙব?' মনে মনে কসম খায় ছলন।

ছলনের অধীনে সুদাম যেন ইস্তকী খাটে—ঠিক জনমজুরী নয়। নিতাইর বন্ধু, খায় নৌকোতেই—ডাঙায় উঠলে ওঠে নিতাইর বাড়িতে। একটা সহজ সম্বন্ধে ব্যাপারটা যেন দাঁড়িয়ে গেছিল। কিন্তু বন্ধুকে নিয়ে যত ভাবনা সুদামের। আলিপুরের বাজার দেখে বন্ধুর হলো ব্যামো। শহরের টানে মজলে অসুখের ব্যামোয় ভুগতে হয়। বয়স হয়েছে, পরচের কথা ভেবে বউ এনে দেয় নি বাপ। ছেলে শহর ঘুরে দেখতে চেয়েছে,—না যেয়ো না ওখানে, ওখানে ভাইনীরা আছে, বড় স্থান-অস্থান বিস্ময়ের জায়গা। দেখছ না, ওখানে সমাজ বলতে কিছু আছে, না শুচি বলতে কিছু আছে? আপনজন নেই, বড় গলিঘিঞ্জি, গাড়ি-ঘোড়ার বড় উপদ্রব, তার চেয়ে উপদ্রব, মানুষ না পেয়ে মরে, ভাইনীরা আছে

LARGEST
RAYON FACTORY
IN EASTERN INDIA
Offers you
CONTINUOUS FILAMENT
RAYON YARN
by Viscose
Process
KESORAM RAYON
(Prop. Kesoram Cotton Mills Ltd.)
8, India Exchange Place, Calcutta-1.

[illegible] ওখানে [illegible] না, গেলে হারিয়ে যাবে

ছন্নর ভয়, আর কুলের ভয়—ছেলে বলে, আমি যাব সেইখানে। কই কিছু তো তেমন বলছি না তোমায় কথা। ঐ তো গঙ্গার এপারে ওপারে শহর দাঁড়িয়েছে। বড় বড় বলকাতাকে বাদ দাও—কলকাতার এপারের কথা ভাবো। বজবজের পর থেকে এপার ওপার দেখে এসো তুমি—কুলডাঙা শীরামপুর-সুরানগর-কাশীপুর। কত চালের কারখানা, ইটের কারখানা, চটের কারখানা, কাঠ কারখানা—ঝিঁ ঝিঁ হাজিজারি লোহা-লক্কড়ের কল। নৌকো চলছে, লঞ্চ ভাসছে, গাধাবোট চাপরি-জাহাজ ইস্টিমার যাচ্ছে আসছে। জমায়েত হয়েছে এখানে ওখানে তো একটা জাহাজ। কত রহস্য এই মোহানা নদীর। বোম্বাই-ডায়মণ্ড হারবার, কুলপী-কাকদ্বীপের ভাঙন, রসুলপুরের চর পেরিয়ে গঙ্গাসাগর—এসব দেখ। তা নয় নিতাই বলে, শহর দেখব। ছন্ন বলে, 'আর কখনো শহর দেখনি যে শহরের! তাই ছাওয়ালে না ছাওয়ালে ছিষ্ট জমতে কোন কালে?'

কটাক্ষের ওপর ওপর যেন কাল-কেউটে ফুঁসছে নিতাই। বলে, 'তোর কথার জবাব কি? জান, আমাদের আধ-উপারের টাকা ন হয় আমরা কুঞ্জ মুহুরীকে দিয়েছি এটা দোকানের ঘর বাবদ্বার লেগে। কী হয়েছে তাতে?'

'জান, দোকান জান? বাছাড়ি চালাবে কে?'

ফস্ করে জবাব দেয় নিতাই, 'সুঁদরবনের ডাকাইত, আর কে? আমি শহরে দোকান করব। জানো, শহরে কত টাকা! দোকান করলে সেই টাকা আপনি এসে উঠে দোচার খুঁটে। মানুষ গেলে তখানে বেবাক ভদ্দর হয়ে যায়ে। জানন মুখের জীবন তাদের, আমি দেইখছি আপন চোখে—'

আকাশ-কাটা চোখ মেলে তাকায় ছন্ন অন্ধকারে। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ছক-কেটে জীবন গড়েছিল ছন্ন। কলকাতার এ পারের মোহানা হুগলীর জল কোনদিন শুকোয় নি, নদী বয়েছে, তবে মজে যায় নি কোনদিন। কপালও একেবারে মজে যায় নি ছন্নের। মরসুমের আগে বড়র কেটেছে, বছরের শেষে হাতে বেশ কিছু জমেছেও। ঘটিবাটির দোকান আছে, বিষণ পেরোও আছে, বাজারে মাল কাটেও ভাল, মন্দা বাজারেও মুখের ভাত পরনের কাপড় জুটেছে। বিপদ-আপদ অবশ্য গিয়েছে, মোহানা নদীতে ডুবে বাছাড়ি বাঁচাতে গিয়েছে ক'বার, মরা নৌকোর কামড় বাঁচিয়ে এসেছে,—জলপুলিশের, থানাহাজাসীর ফোপেও পড়তে হয়েছে। এ সব আপদ অবশ্য আছে। কিন্তু পৃথিবীতে জীবন বাঁচাতে গেলে তা হয়। আপদ আসে, আবার যায়। ছন্ন ভাবে, কোন ও সুখ না? হ্যাঁ, সুখে পেয়েছে ছেলেকে। বাড়িয়া হয়েছে শহরের টানে। শহরে গিয়ে ভদ্দর হয়ে দোকান খুলে বসতে চায়। ছন্ন জানে, এ ভুল না। আসলে কোন্ ডাইনীতে পেয়েছে। মায়াবিনীর ফাঁদে পড়েছে নিতাই। ঘরে মন বসে না,—বাছাড়ি নিয়ে বাপের চোদে চোদে থাকতে মন নেই। যাবে শহরের ডাইনীদের সঙ্গে ছোক্ দিতে। বড় ভাল লাগছে ছেলের এই ছোক ছোক ছোঁ-কারী মরণাদের। ছন্ন জানে, নিজের জীবনেও ও ব্যামোটা সে সারিয়ে উঠতে পারে নি। এখনও গা জুড়াতে যেতে হয়। কিন্তু সে নেহাৎ গাঁয়ের ব্যাপার। শরীরের গা-গতর মাড়ায় না তারা। কিন্তু শহরের যে সব ব্যাপারই আলেদা। ডাইনীরা একেবারেই মানুষ-খেগো রক্ষিণী। ফাঁদে পড়লে আর উপায় যে নেই।

হা-হা করে উঠে ছন্ন, 'না, ওরা আমাদের প্যাটে জন্মাইনি, আমরা জন্মাইছি ওদের প্যাটে। বেশী জানিস তুই, আমার থিকে শহরবেনের বুজ্জন ভর বেশী!'

নিতাই আর কথা বলে না। সারা নৌকোর লোক উঠে বসেছে। গলা ভাঙে শুনিয়ে শুনিয়ে ছন্ন, 'কই গেল সেই বন্ধু ভর। এখন জবাব নাই মুখে। জবাবটা যে বড় তড়পা শুনি বাড়ালের। যাউক আজ, রেতে আর কি বেশী কই,—কাল দিনে যাব আমি ঐ কুঞ্জ মুহুরীর কেছে, জমন বাপের ব্যাটা সে, কি জবাব দেয় আমায়?'

নিতাই নিশ্চুপ। অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। শুধু দুটি চোখ জ্বলছে। নদীর স্রোতে স্রোতে সে চোখ তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসছে। চকচক করে নদীর জল। সোনার চোখ ভাসছে সেই জলে। দোকান করবে শহরে, সোনাকে নিয়ে ঘর বাঁধবে সে। স্বপ্ন হয়ে সব কথা ভাসছে।' কুঞ্জ মুহুরীকে টাকা দেওয়া হয়ে গেছে। মাল কিছু মজুত

আছে। সোনার চোখে মুখে মেঘ ভাসছে। বেলনায় গুমরে মরছে সেই মেঘ। আষাঢ়ে মেঘ হয়ে সোনা আকাশ ছিঁড়ে ভরিয়ে ভাসিয়ে দেবার। বড় ভাল লাগে সোনাকে। সমস্ত হৃদয় দিয়ে তার ঘুড়ার গৌরব, সঙ্কোচের সজ্জা সে ভাসিয়ে দেবে। জুড়িয়ে দেবে তার জ্বালা। তার দুর্বার মন আজ সকল সংস্কার কাটিয়ে একান্ত হয়ে উঠেছে ঐ মেয়েটির জন্য। শহরে যে অনেক সুখ। দোকান করে ডাঙায় বসলে অনেক টাকা। ভাদ্রের আকাশে মেঘ। অতিকায় স্বপ্নের মতো মেঘ ভাসছে। হীরকবন্দর দুলিয়েছে। বিজলী বাতি জ্বলছে। হীরার মালা তার গলায়।

সকাল হয়ে আটটা কি নটা। ছখন নেমে গেল গঞ্জের বাজারে। ফটিকচাঁদের দোকানে যাবে সে।

কিন্তু যেতে বড় বাধে। গঞ্জের দোকান বলে কথা। ছখন গেরোকে চেনে না বিশেষ কেউ-ই। ফটিকচাঁদের মুহুরীরা তাকে চেনে, ফটিকচাঁদ নিজে চেনে। চিনবে বৈকি, এতবড় একজন যোগদার আর পাইকার ফটিক নিজে। লাভ খায় কত ফটিক! এই সব লুটতরাজের মালেই তো দ্বিগুণের বেশী লাভ। তাই মুখের মেলামিটা ঠিক মেলে ওখানে। কিন্তু পরিবেশটা বড় অচেনা—গোলা-খুলি মনে হয়।

দোকান খোলা হয়েছে। ব্যাপারীরা সকালে আগে আসে। ছোট ছোট ব্যাপারীরা মাল নিয়ে যায় গাঁয়ের হাটবোলায়। তারাই ফটিকের পাইকারি পরিষ্কার। ভাবা জমেছে। কুঞ্জ মুহুরী আসে নি তখনও। উঠোনের ওপর পা গুটিয়ে চুপ করে বসলো ছখন। চাটুর ওপরে কাপড় পরেছে। গেঞ্জিটাও ময়লা। গিরানটা কাঁধেই থাকে, পরে না ছখন।

কুঞ্জ মুহুরী এলো। দরজার ওপাশে দিয়ে ঢুকে মাদুর পাতালো। ছখন এগিয়ে গিয়ে পায়ের ধুলো নিলো কুঞ্জর। কুঞ্জ চাঁ চাঁ করে ওঠে, 'তুমি বয়সে যে-আমার চেইয়ে অনেক বড় ছখন।'

'কিজন আপনে বেরাহ্মণ।'—ছখন হাঁকপাক করে।

কুঞ্জ মুহুরী কিন্তু সেরেস্তার খাতা আর চৌকিসমেত কলমটা তার সমুখে। ও ছুটোর সামনে মুহুরীকে মানায়। চশমার তেজ বেশী। আড় করে তাকায় কুঞ্জ মুহুরী। চশমা নীচে নেমে যায়। বললে, 'কি মনে করে মাঝির পো?'

'হেঁ হেঁ বাবা,' পাকলে হাসে ছখন। আশকা ঘনায় মনের মধ্যে। টাকা কটা কম না, একশ'। একশ' টাকার ব্যাপারে হাঁ-নার প্রশ্ন বলে কথা। বুকটা ওঠে পড়ে। দুরুদ দুরুদ করে।

কৌটো থেকে বের করে বিড়ি দেয় কুঞ্জ মুহুরী। একটা ধরায়। সিগার-লাইটে আগুন জেলে বলে—'লেও।'

বটে, বটে। খাতির করছে কুঞ্জ মুহুরী। সম্মানে বলে কথা, টাকা দিয়েও ক'জন পায়।

ঢোক গিটগিটিয়ে অনেকক্ষণ বিড়ি টানলো ছখন। বিড়ি পুড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত কাঁচুমাঁচু হয়ে মুখ খুললো ছখন, 'আমি এইসে ছিনু ঠাকুরমশা এট্টা কামে—'

কুঞ্জ মুহুরী তাকায়। বলে, 'হুঁ, বল।'

'বলনু কী, আমার ছেইলেটা আর তার সাঙ্গের—' ছখনের গলা থেমে আসে।

'হুঁ তারা দুজনেই আসেছিল আমার কাছে—' কথা বললে কুঞ্জ মুহুরী।—'সে আর তার বন্ধু সুধাম। সুধামই পরিচয় করে দিল তার। দোকানের জন্যে আসছিল।'

বুড়ো যেন কঁকিয়ে উঠলো,—'আঁ, আঁ, ঠাকুরমশা

ছোড়াগুলার কমন রেজাল্টের সখ আছে। আমি কিকির ছইরে টাকা কামাই, আর কমন কন্সি এইডে আমার সর্বনাশের ব্যাপার করেছে আছে।'

'ক্যান এতো ভাল কন্সিই'—কুঞ্জ মুহুরী বললে।

'ভাল কন্সি—এ্যাঁ?'—অবাক হয়ে তাকায় ছমন। ভাবে, সব বদল, সব বদল। এই মানুষগুলো সব বদলে গেছে। জীবনটাকে কি যে ভেবেছে। কি এদের অভিপ্রায়। ছমন বুঝতে পারে না।

কুঞ্জ মুহুরী বলে গেল, 'চ' ভালই। দোকান করবার কথা আমায় বলেছিল, আমিও তাতে না বলব ক্যান? আমাকে ঘরের কথা বলেছিল—'

'ঘরের কথা বলেছিল'—ছমন সোজা হয়ে বসলো, 'হাঁ ঠাকুরমশা কত টাকা দিয়েছে?'

কুঞ্জ মুহুরী একেবারে তরল ভাষায় বললে, 'পঞ্চাশ। এতে দু মাসের ঘর ভাড়া দিয়েছি। আরো সেলামী লাগবে। তা মাঝি তোমার ছেলে কই?'

বুকে পেটনা পেটে কে যেন অস্ত্র কারণে। ছমন ভাবে অন্য কথা। কালই শুনেছে একশ' টাকা তারা দিয়েছে। কুঞ্জ ঠাকুর বলছে এখন পঞ্চাশ। কিন্তু কিন্তু করে শেষ পর্যন্ত কথা বললো ছমন, 'একশ' টাকার কথা আমি যখন শুনেছি তাদের মুখে।'

'কই আমি জানি না।' মুখ গামড়া করলো কুঞ্জ মুহুরী। বললো, 'তোমরা ফড়েমি করে মাল নিয়ে আস বলে, আমি মিথ্যা বলবো, একথা নয় বাবু। টাকা দি, মাল নি—এখন ত নি না। তা ধরলো যখন তোমার ছেলে, তার বন্ধু—করে দিয়েছি একখানা ঘর। দু মাসের ভাড়া নিয়েছি আগাম পঁচিশ পঁচিশ করে পঞ্চাশ। আর সেলামী পঞ্চাশ টাকা লাগবে। নিতে হলে আমার সঙ্গে তারা যখন দেখা করে টাকা নিয়ে। তা নয় ঘর আমি অন্য বিলি করছ, বলে দিও।'

সব শুনলো। তারপর কস করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে উঠে গেল ছমন। কিকির বুঝেছে সে। কারুর কিকির আর বুঝতে বাকি নেই ছমনের। সুলাম, ঐ সুলামটাই মাথা খেয়েছে তার ছেলের। মাথা বলতে যদি কিছু থাকে ত ওটা আর কোথাও পড়েছে বাঁধা। নিজের বলতে তার ত কিছুই আর নেই। এ গতিক ত বড় সুবিধের নয়।

নৌকোয় এসে নিতাইকে ঠেলে বুক চাপড়ালে ছমন, 'আমার মন যাই গইনে ছিল, তাইরে ছোড়া তাই। কই গেল সেই হারামজাদটা, পাশে মারব আমি তারে।' সুলামকে নিতাইর পাশে ঠেলে লগিবাঁশ নিয়ে ছুটে গেল ছমন। পাটাতন থেকে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো সুলাম। ছমন নজর ঠিক করতে পারে নি। মারলো, ঝনাৎ ঝনাৎ করে নদীর জলে মারলো। কিন্তু আদল মানুষটা এক ডুবে ঘাটের কাছে গিয়ে উঠেছে।

নিতাই দেখলো, বন্ধু তার নদীর স্রোতে ভেসে যায়। তাকতে তাকতে গিয়ে ঘাটে উঠলো। ছমনের লগির ঘা লাগে নি, তবু তাদেরের নদী তাকে ডুবিয়ে মারতে পারে নি। সুগভীর নীলাম্বু সমুদ্র ডিঙিয়ে বন্ধু যেন হাতছানি দিচ্ছে চোখে চোখে আনুপায়ে। কি দারুণ, কি করুণ সে চাউনি!

॥ ১২ ॥

সজনী সজনী গো, চল যাই নদীয়ায়—
সাপের বিষে যেমন তেমন
প্রেমের বিষে অধিক ধায়।
আর গৌরাঙ্গ ভুজঙ্গ হয়ে
দংশিয়াছে আমার গায়।
সজনী গো, আমার বাঁচা বিষম দায়॥

নদীর বাঁক থেকে গানটা ভেসে এসে গঞ্জের ঘাটকিনারে থামলো। গঞ্জের আজ বাজারের দিন। কারা যেন এসে নামলো গঞ্জের ঘাটে। এক মাল্লাইখানা আবার ছেড়ে দিল। জল কাটার শব্দ পাওয়া গেল ছপ্-ছপ্। মেঘ ভাদ্রের আকাশ। তাতে ভাঙা ভাঙা মেঘের কোলে সামান্য ধোয়া চাঁদ ভাসছে। সামনে দু-এক দিনের পর পূর্ণিমে। ঝিকমিক জ্যোৎস্না, সাদা শরতের মেঘ তরঙ্গিত হচ্ছে নদীর জলে। পরিষ্কার দেখা যায় মাল্লাইখানাতে যারা বসেছে তাদের মাথায় বাবরী চুল। গায়ে ধামোলি উড়ুনি। কালো কালো মানুষ। একজন তখনও গান ভাঁজছে গুনগুনিয়ে। কয়েকজন মেয়েও রয়েছে। ঢোল-তবলা পাশেই রয়েছে গোটাচারেক উবুড় করে। খেয়েদেয়ে আরেকজনের হাতে হুঁকো পাচ্ছে। হরিসভা, তা নয় আরি-কীর্তনের দল কোথায় চলছে, বুঝতে বাকি থাকে না।

পাটাতন থেকে হাঁকাহাঁকি শুরু করে দিয়েছে নিতাই, 'এ কোথাকের কেত্তন প. ও মাঝি ভাই—'

একটা বেদিশা উল্লাস যেন ঝরলো এক মাল্লাইখানা থেকে, 'নবদ্বীপের।'

'হবে কোথাকে?'

'কাকদ্বীপ বাজার।'

চলে গেল কীর্তন যাত্রার দল।

কানের মধ্যে সুরের তরঙ্গ বাজছে নিতাইর। বন্ধু নেই, স্বজন তাকে সেই যে তাড়িয়ে দিয়েছিল। আর আসে নি। অনেকবার বারোবাসর পাড়ায় খোঁজ নিয়েছে, না কেউ খোঁজ দিতে পারলো না। আর কে বা কার খোঁজ রাখে শহরে? মানুষ তার নিজের জ্বালা নিয়ে বাঁচে। পোড়া পেটের জ্বালা—প্রাণের জ্বালা—মনের জ্বালা। এ জ্বালা জুড়োনোর অবসর আর হোল না মানুষের। এমনি বরাত নিয়ে সে পৃথিবীতে আসে। যাকে পাওয়া যায় না তাকেই পেতে মন চায়। বন্ধু কোথায় হারিয়ে গেছে। জীবনের মৌকো ছুটো হয়ে গেছে নিতাইর। বড় উদাস, বড় বিভ্রম। বড় জ্বালায় জ্বলছে তার মন।

দোকান ঘর হয়েছে। সব ঠিকঠাক। মাল রয়েছে ফটিকচাঁদের দোকানে। কে চালাবে? কেমন করে দোকান চালাতে হয় শহরে সেই বিদ্যি তার জানা। জানতে পারতো। জেনে কি হবে, সুহাস তার বুকের হাড়-মাংস খামচি কেটে একাকার করেছে। আসে নি সুহাস। সুহাসের খোঁজে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল নিতাই। স্বজন জড়িয়ে ধরেছিল, 'তুই আমার বুক ছেঁদা করিয়ে দিয়ে যা, আমার আর কে আছে? তোর মা ত নাই নেতাই!'

যেতে পারলে না নিতাই। বড় দুঃখ, বড় বেদনা। মনে শান্তি নেই। সুহাসকে যে কেমন ভালবাসত নিতাই সে কেউ বুঝবে না। এক জ্বালার পৃথিবীর সংবাদ নিয়ে এসেছিল বন্ধু তার। কিন্তু টিকলো না।

সারাক্ষণ সোনার কাছে থাকতে ভাল লাগে। সুহাসের কথা শুনে বুকের করে চোখের জল ফেলেছিল সোনা। ফুলে ফুলে কেঁদেছিল। কিন্তু কেন কাঁদলো সবটা খুলে বললো না। সোনাকে ছেড়ে এলে এই পৃথিবীতে আর দাঁড়াবার স্থান খুঁজে পায় না নিতাই। কেবল একা মনে হয়। ভীষণ একা। ঘাড়াদি ছুটিয়ে এসে নোঙর করে ডায়মণ্ড হারবারের গঞ্জের ঘাটে। আর কোথাও ভাল লাগে না। সব রাতে যায় না সোনার কাছে। সোনা নিজেই কতবার ঘাটে আসে। তবু নিতাই বসে থাকে নিরুদ্বেগ। তাকে শোনে, চেয়ে চেয়ে দেখে—কিন্তু যায় না।

বুড়ো বাল ঝাঁকায় বাতের বহরায় কোমর হলে সে আর বংশী আবার হাত মিলন হলে এবাই সোনার উটোতে দিয়ে চড়ায় আর বাস করে না ছলন। ছলন শিখেছে চরে পড়ে। একবড় আমান লোমশ ছেলেকে হালকাঠের সামনে বসতে দেখেছিল সে একবারে। বুকটা তার কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু চুপসে গেছে, হালকাঠ আর ধরে না নিতাই। বুড়ো জিজ্ঞেস করতে বলেছিল, বন্ধু নাই, ও হাত না ধরলে আমার হাল মানবে নি. ভেইসে যাবে।

হাঁস করে একটা চড় কসে দিয়েছিল ছলন মেয়ে। বলেছিল, 'তর মাথা খেয়েছে ঐ পাজি বন্ধুটা তর। গায়ে তর গতর নাই এক ছেলাম।'

'না, আমার গায়ে গতর নাই। আর তার দরকারও নাই, আমি মরব, নিশ্চয় মরব।' গল করে ছই-এর ভেতর থেকে ছেলেটা নিয়ে এসে গলা বরাবর দিয়ে করছিল সে। হা-হা করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বংশী, ইদু, শুকদেবরা। ছলন ছুটে এসে মাথা কুড়লে পটাতলে, 'তুই আর আমারে জিয়ান্তে কোতল করিস না নেতাই, লক্ষীবাপ, তুই যাদন তর মন না চায়, তাই কর। আমি আর আসব না বহরে। আমার কথাটা মনে নেতাই।'

বুড়ো ছলন আর আসে না বহরে। বাতের প্রকোপ বেড়েছে। ছেলের মেজাজ হয়েছে আলেপা। মুলাম চলে যাবার পর কেমন যেন হয়ে গেছে ছেলেটা। বুড়ো ছলন ঘরে শুয়ে প্রহর গোণে মৃত্যুর। বংশী এসে খবর দেয়, শুনে মনে মনে খুশি হয় বুড়ো। বলে, 'সেখানে থাকিস, তুই বেইচে থাকিসরে বাপ, আমি শুধু ওই চাই'—টপ্ টপ্ করে চোখের জল ফেলে ছলন মেয়ে।

রাত এক প্রহর গড়িয়ে গেছে। হাটুরে নৌকোর ভিড় কমলো একটু একটু করে গঞ্জের ঘাটকিনার থেকে। রাত নিশুত হয়েছে তার লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে। অনেক দূরের জাহাজের বাঁশি শোনা যাচ্ছে—হুই-হুইস্। চাঁদ একটু উঠেছে কালের কিনারে। মেঘও জমলো আকাশের এখানে ওখানে।

বংশী বললো, 'নিতেন, এইবারে একবার জেগলে হত। যাবে?'

'চল।'

বহর চালায় নিতাই। দুটো বাচাড়ি নিয়ে এসেছে বটে। তবে মনখানা যেন কোন্ দেশে পাখা মেলে ভেসে গেছে। বাচাড়িগুলো খামালে এ মানুষগুলোর এ বছর চলবে না। ভাতের ভাবনা তেমন ভাবতো না নিতাই, যদি কোন রকমে দোকানের কাজটা তাদের জুটিয়ে নিতে পারতো। কিন্তু তা তো প্রায় বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। তাই আসে নিতাই। বাচাড়ি এখনও চালায়।

বংশী বলে, 'যাবে কোন্‌দিকে, পুবে না উত্তরে?'

'চল সেই দিকে তলের মুখিরে—'

নৌকো ভালো উত্তরে। হাটের পসরা নিয়ে হাটুরে নৌকোরা চলেছে। বংশী তাদের পেছু নিলো। নিতাই চিৎকার করলো, 'আ:, হেরকিন জ্বালাইস ক্যান, নিব্‌বে যে।'

ছই-এর মুখে আলো জ্বালা ছিল। নিবল হেরিকেন।

নিতাই হাল ধরলো জাহাজের। জাহাজী এলাকা পেরিয়ে গেল তারা।

ইদু হাল ধরেছে। অক্ষম হাতের হাল। ঝেঁকে যাচ্ছে। সামনে ধরেছে আগ্-বাচাড়ির নিতাই। নিতাই হাঁকে, 'হাল ধরসে ঠিক কইরে।'

'গায়ে কি আর তেমন জোরবল আছে রে মেতাই? দানপানি ধরে নাই। আধালেটে আসি।'—ইদু বললো।

মিতাই কিউরে ওঠে, 'আমার মোকানটা চালা না তবা? নগদে কারবার, নুনাকা তবেও হত, আমারও কিছুটা।'

'তুই কইলে ত পারি মিতা। আমি মোকানের কথা ত বেবাক শুনছি—'

সামনে দুটো নৌকো যাচ্ছিল। দুটোই কেরায়া। উত্তরের কোন গঞ্জের হবে। পাটাতনে মাল আছে, জোংড়াতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বাতাস দিচ্ছে ঈশানের দিকে, পুবের বাতাস। ঈশানের বেশ আসে বাতাসে। মাঝল দেওয়েছে ঈশানের: একটাতে পাল টাঙানো, আর একটা গোটানো। পাল লম্বা হয়ে ঝুলছে। বড় আস্তীর হয়ে চলেছে কেরায়া দুটি।

হঠাৎ কড় উঠলেন পালিয়ে। ছাড়ল বাতাস, ঈশানের মতেন।

দু নৌকো কোলাকুলি হলো। পেছনের পালতোলা নৌকোটা গিয়ে ধাক্কা মারলো হঠাৎ সামনেরটাকে। ধক্কা ধক্কাং করে মারলো। বাপরে বলে মাঝি পড়লো জলে। আর তক্ষ ছিল পড়ে গেছে। মালগুলো সব জল সই। নৌকা কাৎ হয়ে উলটে গেছে।

পাশের নৌকোর মাঝি চালকণ্ঠে ধরে চিৎকার করছে, 'হাবে হাবে গ ডুবলো, সব গেল।'

পাড়িয়া যেমনি পাড়িয়েছে। ভয়ে কাঁপছে তারা। বাকটা ভাসছে তাদের, তারা উঠাতে পারে না।

কিন্তু প্রাণের মায়া নেই মিতাইর। মাঝির শক্তি তার গায়ে। ঝাঁপিয়ে পড়লো মিতাই।

'কে মিতাই? দেখেন—' কাঁপিয়ে পড়লো বাপী। ইদু তখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি। গিয়ে মাল ধরে নিয়ে এসে বাড়াভিতে তুলেছে।

বাঁধের গঞ্জ। তার মহিমা আলেপা। ডুবে ভেসে যাচ্ছে। ঘাড় ধরে ডুবিয়ে দিচ্ছে, আবার ভাসিয়ে দিচ্ছে। মিতাই সাঁ সাঁ করে ছুটে গিয়ে ধরলো মাঝিকে। ঠিক তার পাশেই আরও দুজন জড়াজড়ি করে ভেসে যাচ্ছে। বাপের চুল ধরলো মিতাই এঁটে। এক হাতে সাঁতার কেটে বাড়াভিতে উঠলো।

With the compliments

of

শ্রীকাশীর চন্দ্র বসু এণ্ড কোং
১৫নং এণ্টালিরোড কলিকাতা-১৩

STEWARTS AND LLOYDS OF INDIA,
PRIVATE LIMITED.

41, CHOWRINGHEE ROAD, CALCUTTA-16

কিন্তু ইতুরও কি একজন মোহনের পাওয়া যাচ্ছে না। অন্ধকারটাই ছুটলো ওদের দিকে। ওই—ওই—ভেসে যাচ্ছে কালো চুল—ওই চলা যাওয়া দেখা যায়। নিতাই ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে নিয়ে এলো। মেয়েটি জ্ঞান হারিয়েছে। কথা বলতে পারছে না। মুখ উবু করে পিঠে চাপ দিলো নিতাই গড় গড় করে জল বেরিয়ে গেল। চোখ মেলে চাইলো মেয়েটি।

সোনাই পুকুরটা মোটা বকশিস দিতে চাইলো। নিলো না নিতাই। জিরিসপত্র মাঝিকে বুঝিয়ে দিলো। তুলটে হাতে উঠে দিয়ে বললো ভয় ইতুকে, বংশী আর শুকতারাকে।

ইচ্ছে করলে মালগুলো তুলে রাখতে পারতো নিতাই। বললো না। না, লুটতিয়াগিরি সে ছেড়ে দেবে বন্ধুর কাছে সে কথা খুলে বলেছে নিতাই। ওকে বাঁচতে হবে—অন্যভাবে বাঁচতে হবে।

হয়ে গেল সেদিন রাতের মতো কাজ। নিতাই গান ধরেছে গুনগুনিয়ে। বড় ভাল কাজ একটা করা হয়েছে মানুষ কাটা বড় বিপদে পড়ে গিয়েছিল। সে না থাকলে উদ্ধার পেত না লুটতিয়া মানুষ মারে না। মাল মারে মালের ওপর তার লোভ। দানাপানি জুটবে ওই মাল গুটিয়ে। নিতাই ভেবেছে, দানাপানি জুটবে তোমার অন্য উপায়ে। তুমি মাল মেরো না। অন্যায় হচ্ছে, পাপ হচ্ছে—এটা শাস্ত্রকথা। বেআইনী করছ তুমি—এটাও মানুষের আইনে। আসলে এ সব তুমি ডিঙিয়ে যেতে পারো। তুমি শাস্ত্র না মানতে পার, আইনকেও ফাঁকি দিতে পার অনেকে। কিন্তু নিতাই ভাবে অন্য কথা। এ জন্য সে লুটতিয়াগিরি ছাড়ে নি। ছাড়বে সে, মনে শান্তি পাচ্ছে না বলে। শান্তি পাচ্ছে না বলে। জগতে ন্যায়-অন্যায় আছে, কিন্তু জীবিকা করে জীবনধারণ করে জীব। কিন্তু মনের শান্তি না থাকলে, তৃপ্তি-তৃষ্ণা না থাকলে জীবন বাঁচে না।

নিতাই হালকাঠে পাক দিল। ক্যাচ-র-ক্যাঁ—শব্দ উঠলো। থমকে গেল আগে-বাড়াড়ি।

'কি হলো নিতেদা?' বংশী ও নৌকো থেকে চাকলো।

'মুখ ঘুরাস নায়ের। গয়ে যাব।'

'যাবি না?' ইতু মুখ তুলে তাকিয়েছে। তার গলার স্বরে ঘনীভূত উদ্বেগ।

'না—'।

নিতাই বললো। অনেকক্ষণ কেটে গেল। বাঁক দিয়ে বাড়াড়িগুলো আবার পুবে ঘুরলো। ডাঙাও হারবার যাবে। সবাইকে ডেকে বললো, 'তোমাদের হাতে গরিদ্দার থাকলে বলবে। আমি বাড়াড়ি এটা বেচে দেব। এই মালের মইধ্যে।'

গঞ্জের ঘাটে নৌকো নোঙর করলে নিতাই। আকাশের রঙ মুছে গেছে। চাঁদ নেই—পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের ঘোমটায় লুকিয়েছে। রুপা-গলা জ্যোৎস্নার বদলে নিঝুম অন্ধকার এলো। ঝাপাঝাপি করে এলো পুবালি বাতাস। গঞ্জ ছাড়িয়ে কিছু দূরে সাড়া পড়েছে বাবলার বনে। অন্ধকারে কান্নার ঘোর লেগেছে বন-ঝাউ আর বালকের অরণ্যে। অরণ্য আর আমনের বিল ঘুমে ঢুলছে রিমঝিমানি আওয়াজ উঠলো বৃষ্টির মহড়ায়।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ঘাটে গিয়ে নামলো নিতাই। গিয়ে উঠলো সোনার উঠোনে। অলিগলি আর আশপাশ

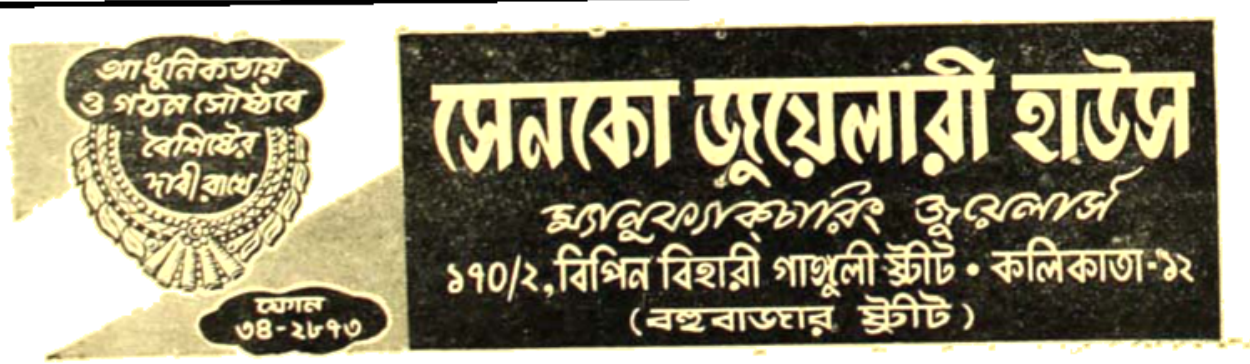

নয় নিতাইর। ধারোবাসর পাড়ার সোজা গলিটা তার একেবারে চেনা।

মাথার কাছে হেরিকেন জ্বালিয়ে শুয়েছে সোনা। একলা ঘরে লঘনা-পরা মেয়ে। সেজেগুজে শুয়েছে। দরজায় খড়া পড়তে লাফিয়ে উঠলো সোনা, 'কে গ গামাহেলে বর এয়েছ ?'

'ও এছু।' নিতাই বললো।

সোনা দরজা খুলে দিল, 'এই বুঝি মনে পড়লো অভাগিরে ?'

অন্ধকারে তখনও দাঁড়িয়ে ছিল নিতাই। ঘরের মধ্যে এসে বলল, 'কই আর অভাগী, এমন ভাগ্য ক'জনের, বৃষ্টিতে ভেইজে ভেইজে আসতে হয়।'

সোনা লেপে এলো অন্তরঙ্গ হয়ে, '—এ মা গ, তুমি ভেইজা এয়েছ বর্ষায় ? আস, আস, কাপড় ছাড় আগে।'

নিতাই তাকিয়েছে সোনার দিকে। ভিজে বাতাসে সোনার খোপাহীন চুল আউলো হয়ে উড়ছে। সোনার তন্দ্রা ভরা চোখে মুখে নিতাই দেখছে জোয়ার এসেছে নদীতে। নিতাই বললো, 'না গ রেজান-নাগরী এইটুন বর্ষায় আমার শরীরের চ্যামড়া ভ্যাজে না, কাপড়টা ভিজেছে শুধু।'

কিন্তু শুনলে না সোনা। নিজের শাড়ী দিয়ে গা মুছে দিলে নিতাইর। বললে, 'বর, এ্যামন শাস্তি তুমি দেও না। জেবনের এতটা কাল জুয়াচুরির খেলাই খেলেছি। হাত পেকেছে, কিন্তুন হিদয় মানে নি। এইবার ভেবেছি হিদয়খানি জুড়াবু। হিদয়ের মিসেনই মানবু। আমাকে তোমার সেবা করতে দেও। তোমার শরীর মনের কথা ভাবতে আমার ভাল লাগে।' ধীরে ধীরে নিতাইর সমস্ত শরীর মুছলো সোনা। তারপর বললে, 'বর, আমার কাপড়খানা ওইটা পর, কাউ দেখবে না, অবশ্যি যদি আমার প্রিতি বিশেষ না থাকে।'

'বিশেষ কানে রেজান-নাগরী ? বিশেষ কথা ত উঠে নি—' নিতাই বললো।

কেমন তলিয়ে গেল সোনা। গভীর বেদনায় স্বর ভেঙে ভেঙে গেল সোনার। বললে, 'না উঠলে ত ভাল গ। কিন্তুন বয়সটারে এম্নি চুইক্যা খেয়েছি কিনা। ঘৃণা হয় নিজের প্রিতি। তোমার কি দোষ বর ?' কাঁদলো সোনা। ঝর ঝর করে কাঁদলো।

এই পাপ থেকে, এই নরকের জীবন থেকে মানুষ মুক্তি চায়। এ তার সহজ ইচ্ছা। কিন্তু নদীর দুকূলে কার বাঁধে কারা ? নদী যখন মরে অর্থাৎ তার সহজ গতি হারিয়ে ফেলে কুলে এসেছিল এই মুক্তির বার্তা নিয়ে। কিন্তু জীবনের টানাপোড়েনের ভয়ে সোনা পেছিয়ে গেছিল। আজ শক্তি অনেকটা ফিরে পেয়েছে যেন।

সোনার হাতখানা নিতাইর হাতে। হাতে সোনার বালা অটুট মানিয়েছে। হাত টেনে নিলো না সোনা। ধরাই থাকলো।

আকাশ থেকে মেঘ সরে গেছে কিছু কিছু। সামনের

সুলভে উৎকৃষ্ট মূলা, কপি, বেগুন প্রভৃতি বীজ ও নানাজাতীয় চারাগাছের বিপুল আয়োজন।

সত্বর যোগাযোগ করুন

ফার্মার্স নার্শারী
৫, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা—১৩

খাপরা-ছাওয়া চালটার মাথায় আর পেছে গাছটার পাশে পশ্চিমের চাঁদ দেখা যাচ্ছে। ঘরে এসে আলো পড়েছে দুধ।

নিতাই বললে, 'এইবারে যাই রেজান-নাগরী।'

'আর একটু থাকবে না ঘর, আমার ঘরে?' সোনার চোখে তন্দ্রার কাজল পড়েছে। তাকিয়েছে সে।

নিতাই বললে, 'কিন্তুন উপায় নাই রেজান-নাগরী, ভোর রাতে নৌকা ছাড়ব, ঘরে বাপের অসুখ।'

সোনা বাইরে বেরিয়ে এলো। দাঁড়ালো বুকের কাছে। নিতাইয়ের উষ্ণ নিশ্বাস পড়ছে সোনার গায়। আরও জড়িয়ে এলো সোনা। বললে, 'দোকানের কি হলো ঘর, কবে খুলবে?'

মুগ্ধ চোখে সোনার গভীর চোখের দিকে তাকিয়ে বললে নিতাই, 'তোমাকে না জানিয়ে কিছুই করব না রেজান-নাগরী। দোকানের কথা আমার মনে আছে।'

বুকে সোনার জল-তরঙ্গ বাজছে। একটা ভাবনা বড় গ্রন্থিহীন। বস্ত্রসজ্জার আবরণ দিয়ে, শাঁখা-সিঁদুর-আলতার কুহক দিয়ে দুর্জয় পুরুষ মনকে পাওয়া যায়, না এমনি একান্ত প্রেমের মধু স্পর্শ দিয়ে তাকে বাঁধা যায়? জীবনে কোনটিই নিষেধ নেই, কোনটিই আজ দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায় নি। কিন্তু কোন্ রূপাবরণে আজ বাঁধবে পুরুষকে রঙ্গিণী? আবদ্ধা আলো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ভাবছে সোনা।

নিতাইয়ের ছায়া মিলিয়ে গেল অন্ধকারের দিকটায়।

॥ ১৩ ॥

ভাদ্র মাস গেল। আশ্বিন এলো।

সোনা আর নিতাই গঞ্জের ধন্বন্তরী পুরন্দরঠাকুরের কাছে গিয়ে দিন স্থির করে এলো। শুক্লপক্ষের বিশেষ একদিনে দোকানের দরজা খুলবে। শুভদিন দেখে নতুন খাতা করবে।

নিতাই বলে, 'এ কথা তুমি ভাব্‌বে রেজান-নাগরী, এ দোকান শুধু আমার না, তোমারও।'

সোনা বলেছিল, 'দোকান আমার কি দরকার ঘর? দোকানের লোভ আমায় আর দেখাইও না। আমার কামন যেন ভয় করে। ভাবি, আবার এ লোভে পায় বুঝি আমায়। এ লোভ ধরলে যে মরণ, ছাড়তে চায় না। কলঙ্কের কথা কে কামন বোঝে, সাহস দেখাইতে দেখাইতে একদিন সাহস বলে জিনিসটা মনের থাকে না। তখন মাইয়ামানুষ ভাবে, আমি ত বিকিয়ে গ্যাসন, তখন আর এই জীবনে কি? ডোর ছাড়া মাছ যখন লটকায় তখনি মাইয়ামানুষ লটকায়। বুঝলে ঘর। দোহাই তোমার, আমায় আর ওই লোভটা দেখাইও না।'

একেবারে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছিল নিতাই সোনাকে। বলেছিল, 'না, না দোকান কারুর একলার না, আমাদের দুজনেরই। খুটিগিরির কাম ছেইড়ে দিইছি। দোকান করেছি এইসে সহরে। যা মুনাফা সেটা আমাদেরই। বন্ধু হইলে আমার পাশে পাশে থাকত। বন্ধু আমায় ছেইড়ে গেছে, তুমি ছেইড়ে যেও না

'রেজান-নাগরী। তোমার কথা আমায় ভাবতে দাও। তাতেই আমার সুখ, আমার দোয়াত্তি জেবনের।'

'ক্যামনে তুমি সুখ-দুয়াত্তি পাবে বর, আমি সেই কথা ভাবি।' নিতাইর শক্ত বুকের মধ্যে ছোট্ট একটা বন্যারি পাখীর মতো ডুবে থাকতে থাকতে কথা বলেছিল সোনা।

হেসে উঠেছিল নিতাই, 'তা হলে আমি ত বাঁচি গ রেজান-নাগরী। সব দুখ আমার যায়।'

শুভদিন এগিয়ে এলো।

দোকান খুললো নিতাই কাপড়ের, মনিহারী মালের মেশামেশ। বাসন-কোসনও কিছু রাখবে বিয়ের বড় গরিস্থার ধরবে বলে। পাশের দোকানের যারা, তারা চোখ মটকে ব্যাপার দেখছে। কেউ পাশে ভিড়ছে না। নিতাই বুঝেছে তাদের ঈর্ষা। তাদের বড় অসুবিধে হয়ে গেল। দোকান বাড়ল আরও একটা। নেহাৎ যারা পরিচিত তারাই এলো। কুঞ্জ মুহুরী-শিবনাথ-পিতেম্বররা নিমন্ত্রিত। বাছাড়িতে যারা থাকতো তারা এসেছে। ইতু-শুকদেব-বংশী-নিমাই-গোপীরা সবাই এসেছে। কিন্তু হিমু খুড়ো নেই, মনটা বাদিষে উঠলো নিতাইর। আর যার জন্যে মনটা আজ পুরো এক মাস ধরে কাঁদছে—সে সুধাম। বন্ধুর কথা মনে পড়তে মোহানা নদীর সব উৎসবের জোয়ার থমকে যায় নিতাইর। এমন দিনে মনটা গুর-গুর করে কাঁদে। সব করে পুয়ে দিয়ে বন্ধু তার কোথায় চলে গেল! নেই।

দোকানের দরজার দুপাশে আমপাতা আর মঙ্গল ঘট বসানো। চারাধানের ওপর ঘট বসেছে, গণেশ ঠাকুরের পুজো করার বিধি আছে। সিদ্ধিদাতা ঠাকুরটির পুজো হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। ফুল-দুর্বা-শ্বেতচন্দনের বটুয়া পড়েছে। গন্ধধূপ পুড়ছে। একটা মনোরম গন্ধে দোকান ঘর ভরে গেছে। সোনা এসেছিল তার পাড়ার মেয়ে বৌ পিসী ও বেনুবালাকে নিয়ে। বেনুবালার বয়স একটু কম। দেখতে কালো—কিন্তু যৌবন আছে অটুট মেয়েটার। ছাপ-মারা নীলরঙের শাড়ি পরে এসেছে। টিয়া রঙ সবুজ পাড় শাড়ি পরে মাথায় চুল ছেড়ে এসেছে সোনা। বড় কেমন উতলা উতলা ভাব। তার পাশে বেনু মেয়েটিকে মানায়। অসুস্থতা সইকে যেমন মানায় শকুন্তলার পাশে। বেনু তবু সোনাদি বলে তাকে সোনাকে। সোনাকে জড়িয়ে ধরে কালো সামদোলা পাখীটির মতো। কোথায় জন্মেছিল তার ঠিক ঠিকানা হয়তো নেই বেনুবালার। মোহানানদীতে জোয়ার জলের ঝটকা হয়ে আছড়ে পড়েছে পায়ের তাতায়। তারপর যৌবনের কলস বুকে থেকে গেছে। বারোমাসের পাড়ায় এমনি তো কতজন আছে। আবার যায়ও। সব মানুষ কেন তার খোঁজ রাখবে।

সোনা এগিয়ে এলো নিতাইর পাশে। একটা নতুন মাদুর পেতে বসেছে নিতাই। শিবনাথ আর কুঞ্জ মুহুরী এসেছিল চলে গেছে। সোনা বললো, 'শুনবে বর, আমার এট্টা কথা?'

'কি কথা রেজান-নাগরী?'

'আমাদের পাড়াটার ঘর দশেক, কুলো জন চল্লিশ-পঞ্চাশ লোক হবে। তাদের এই সব এট্টা ভোজ কইরো খাওয়ে দিলে কমন হয়? আমি ট্যাকা দিতম।'

নিতাই তাকিয়ে হাসলে সোনার দিকে। বললে, 'ক্যান, এ্যাসন ক্যান?'

'তবে কাদম'—সোনা মুখটিপে হাসলো। বললে, 'ব্যাপারটা এপাড়া গোটা জানে, আমি তাদের নিজেই কইছি।'

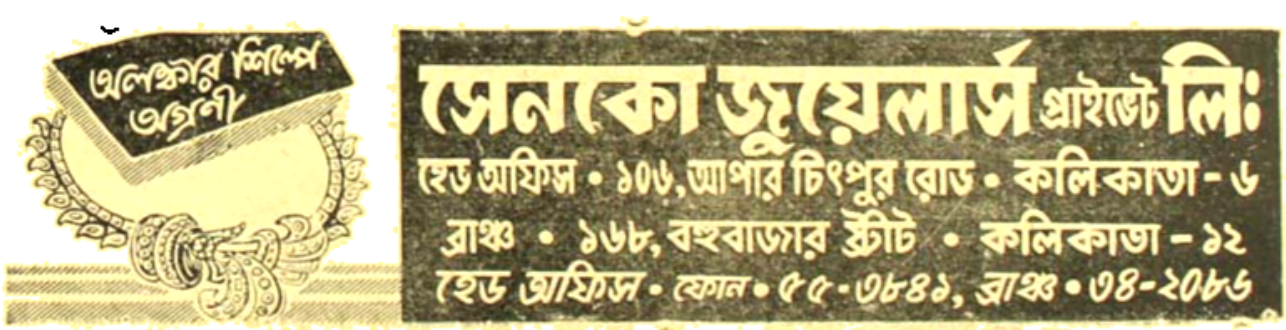

মুখ তোলে নিতাই দেখলো সোনাকে। কোন কুণ্ঠা নেই, সঙ্কোচ নেই। উৎসুকও নেই বিশেষ। মোহানা নদীর মুখে জাহাজের বেগ যখন-তখন গতিয়ে উত্তরে বাতাস বইলে যেমন জোয়ারের কথা মুখে থাকে, এ যেন তেমনি। গলায় সোনার সোনা-হারের ঝিকিমিকি। প্রথম দিন রাত্রে হারটাকে যেন কটি সাপ বা উপনোগা নদি বলে ভুল হয়েছিল। এখন অন্যরকমের মতন বলে মনে হচ্ছে।

নিতাই বললে, 'তা যদি বলো, রেঙ্গুন-নাগরী, আমার দুখ কিছু আছে?'

'কি দুখ শুনি—' অবাক হয়ে তাকালে সোনা।

'টাকা আমি দেব। আমি দিলেও সেটা ত তোমারই তুমি রাগ করো না।'

সোনা হাসিখুশি মুখখানি নিয়ে তাকালে নিতাইর দিকে। যেন কড়ি খুকির চোখ নিয়ে সে তাকিয়েছে। নিতাইর সারা মনে সোনা-রঙের মেখামেখি। কোথাও ভিল নেই, ফাঁক নেই। সোনা ছেয়ে ফেলে।

বারোয়ারির পাড়ায় হিড়িক পড়ে গেছে। সবাইকে জানা হয়েছে। সোনার সামান্য উঠানটুকুতে কুলোয় নি। পাশাপাশি ছুটো উঠানে পাড়ার মেয়েপুরুষ বুড়ো ছেলে জমেছে। সবাই লোক গিয়ে বিয়েটা দেখলেও ধন্যি—বেলুনী কড়াইতে করে রেঁধে বেড়ে দেবে। একথা সবাই জানে, সোনা আর ঐ মেয়েন ছেলে নিতাই মিলে দোকান করেছে। তারা সবাই নিতাইর দোকানের বড় খরিদ্দার। মনিহারী মাল, প্রসাধনের পঞ্চাশ রকমের জিনিস—কাপড়-চোপড় তারা তার দোকান থেকেই নেবে। তারা হলো বাঁধা খরিদ্দার।

সবাই প্রায় এসেছে। সোনা দেখলো, একা মেনকাই আসে নি। রাজীলিসী মেনকার কথায় হাসলো খিলখিলিয়ে। বললো, 'সে ত গেছে গিয়া। মরণী, এয়েছিল দুদিন এপাড়ায়। তারপরে পীরিতের জোয়ারে একেবারে গেছে ভেসে। ওর কথা বাদ দাও। হি-হি-হি।' অর্থ হাসি হাসলো রাজী বুড়ী।

এত কাছে থেকেও ব্যাপারটা শোনে নি সোনা। কথাটায় অবাক হলো সে, বললে, 'ক্যামনে কথা কইল পেত্নী এট্টা। ব্যাপারটা আমায় বুইলে ক' কি হয়েছে পিসী।'

রাজীলিসীর আর হাসি থামে না। হাসছে সে হুখ-ভরে। শুধু আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলে সে পিতেম্বরকে। বললে শুধু, 'ওরেই ক, ও জানে সঠিক।'

পিতেম্বর কথা বললো দুখের গলায়। বললে, 'কে জানে মাসী, আমি সে লোককে চিনতাম নি বেনেকালে। কি সুদাম বকসী নাম। আমারে ধরতে আলিপুরের কারখানায় এট্টা কাম জুটাইয়া দিইছি এই কয়েকটা দিন। শয়তানী মাগী, সেই মরদটার সঙ্গে একেবারে বাউরা হয়ে ভাগছে কের আলিপুর। আমার উপকারের দামটা দিয়েছে সে ভাল কইরে। এখন শুনচি, ত্যাদের নাকি বে' হয়েছে সেইখানে।' পিতেম্বর সত্যি দুঃখী মানুষ। দু'দুবার বিয়ে করেছিল পিতেম্বর, বউ পালিয়েছে। তার কথায় দুখ হলো সোনার।

কিন্তু একটা কথা। সুদাম শেষ পর্যন্ত মেনকাকে বিয়ে করেছে। সংসারী হয়েছে,—আলিপুরের কারখানায় চাকরিও করে। বড় প্রয়োজন ছিল সোনার এই খবরটার। দাদাকে তার মনে পড়লো। তার প্রতি অপার মমবেদনা বোধ করেছিল প্রথমত দাদাই। নিতাইকে তার হাতে এনে পৌঁছে

দিয়েছে সে। তারপর ঐহরে পেছিয়ে গেছে। আর আসা সম্ভব নয় বলে আসে নি। কিন্তু সুধাম যদি এমন অসময়ের দিনে যোগ দিতো এসে! ফস্ করে একটা নিশ্বাস ফেললো সোনা।

রাত গভীর হলো। সকলে চলে গিয়েছে। আকাশে মেঘ ছেঁড়া ছিন্নভিন্ন, পরিষ্কার হয়েছে। শরতের আকাশ। ঝিমু পাতলা গোছের পড়তে সুরু করেছে। কুয়াশা-কুয়াশা ভাব মোহনা নদীর তীরচর গুলোতে। কুয়াশাকে ছাপিয়ে চাঁদের আলো মাখনের মত রঙ নিয়ে হাসছে। বড় স্নিগ্ধ, বড় নিরেল।

সোনা আর নিতাই এলো ঘাটে। অনেকক্ষণ বসলো তারা পাশাপাশি। নিতাই বললে, 'ঘর থেকে আসছি আজ দুদিন। ঘরে ফিরতে হবে যে রেঙ্গান-নাগরী।'

'কেনে, আমায় নিয়ে যাবে না বর, তুমি একলা ঘরে ফিরবে?'—নিতাইর বুক জড়িয়ে ধরলো সোনা। মুখ তুলে তাকালে নিতাইর দিকে।

নিতাই বললে, 'তোমার নিজের ইচ্ছায় যদি যাও রেঙ্গুন-নাগরী, আমার জোর ত খাটে না।'

'খাটে না, কী বলছে বর,' ছাট্-খাওয়া সাপের মতো উঠে বসলো সোনা। অভিমানে থরথর করে কাঁপলো সে। বললে, 'আমার উপর জোরবল কিছুই তোমার নাই? এই তোমার ভালবাসা?'

নিতাই দিগুণ জোরে জড়িয়ে ধরলো সোনাকে। সারা-দেহে তার উদ্ধত পৌরুষের ঘোষণা। বললে, 'ভালবাসা আমার ঠিক আছে রেঙ্গান-নাগরী। তা নয়, ঘরে মন বসে না, তোমারে দেখে পান ছুড়াতে আসি আমি। শহরের টানে জাত-বেওসা ছেইড়ছি, সে ত আমার তোমারেই কারণে গ—'

সোনা আবার নেতিয়ে পড়লো নিতাইর বিশাল বুকে। হৃদ্পিণ্ড বড় উদ্বেগে দিগ্বিদিক উঠছিল, ধীরে ধীরে শান্ত হলো। বললে, 'তবে বর, আমার ভুল। আমার মৌকাডুবি হইয়া গেছে। তা নাহে আমি আর ডরাবে নি কোনকালেই। স্রোতের ঠেলায় আমাকে নিয়ে পারবে না কোনখানে। আমি যেইখানে ডুবিছি, সেইখানেই থাকব, তোমার ভয় নাই। শুনছে, যে আমায় চিরকাল বেঁধে রাখতে পারবে সে তুমিই।'

With the compliments
of the season

SETT & COMPANY
TIMBER MERCHANTS

STOCKISTS OF C. P. & BURMA TEAKWOOD,
SAL & MAHOGNY WOOD.

7, SANTOSH MITRA SQ.
CALCUTTA-12

PHONE 34-5082

জোয়ার এলো নদীর। মাঝেমাঝে কাছাকাছি বসে কাকুতি বেশী। জোয়ার হয়ে গেলে বাতাস আসে ঘাটলা। যেন মহলেখী ছুটিয়ে আসছে, কী সংবাদ! বড় ত্রস্ত—বড় ত্রাস। পায়ের কাছে নদীর জল খেলছে। আকাশের চাঁদ-সোনা-রঙ চালছে ছলছল জলে। বড় ঝিকিমিকি।

সোনা শক্ত করে হাত ধরলো নিতাইর। গড়ানে পড়ে যেন না যায়।

নিতাই বললে ক্ষুণ্ণ গলায়,—'তবে আমি কার ঘরে যাব? তুমিও আমার ঘরে চলো বেজান-বাপরী।

উৎকণ্ঠায় গলা, ক্ষোভে গলা আছড়ে পড়লো সোনার। বললে, 'ক্ষেপেন বড় ঠ্যালাটা খেয়েছি। ভালবাসার নামে জানিয়াডি আমার আর ভাল লাগে না। সারা জেবন বইয়া পাপের বোঝা আর বাড়াইয়া কাম নাই। ট্যাকা—ট্যাকাই একদিন মানুষকে পাপের কামে নামায়। আমিও নামিছিলম একদিন। কিন্তু তার আর দরকার নাই। যা আছে, বাকীটা কাল চলতে পারে দুলে-দুলে। তোমার বন্ধু, আমার দাদা—উঁর কথা মনে আছে। ওঁয়ার লগে আমার চোদ্দ পুরুষ। দাদা আমার এই জেবন দিকা বাঁচাইতেই আসছিল। আমি ভাবেরও বুঝি নাই বড় ছুপে। ভাগ্যের তোমার দেখা পেয়েছি। আমার আর দুঃখ নাই বর। তোমার ঘরে আমি নিশ্চয় যামু।'

'তবে এখনি চল।' নিতাই উঠে পড়লো।

তিন প্রহর রাত্রি পেরিয়ে গেছে। চাঁদ চলে গেছে পশ্চিমে। নিস্তব্ধ তারারা ঝিমিয়েছে। সোনা নিজের ঘরে এলো। ডাকলো রেণুবালাকে। সইকে না জানিয়ে কোথাও যেতে পারে না সোনা। রাজীপিসী, পিসীমণিদি সোনার পাশের বাড়িতে থাকে। তারা ঘর থেকে গড়াচ্ছে, আসতে পারলো না। রেণুবালা এলো আলুথালু কাপড় ছাড়িয়ে। সারা দেহে তার নিঘুম রাত্রিবাসের ছাপ।

গোলাপী রঙের একখানা পাতলা শাড়ি খুলে পরলো সোনা। বিশেষ কিছু নিল না। একটি সায়া পরল, ব্লাউজ পরলো। তারপর ঘাট পর্যন্ত এলো। নৌকোতে উঠলো সোনা। রেণুবালা কাঁদলো। তাকে সান্ত্বনা দিল সোনা, 'তুই কাঁদিস নি সই, আমি যাচ্ছি আমার বয়ের বাড়ি। আমি আবার আসব যেমন করে বাপের বাড়ি যেয়ে আসে।'

স্থির হয়ে নৌকোর গলুইয়ে বসেছে নিতাই। তাকিয়েছে সে সোনার দিকে, না ওই মোহানা নদীর স্রোতের দিকে। স্রোত উজানে বইছে। জোয়ারের টেলায় উত্তরে ছুটছে। কতদূর যাবে কে জানে?

দুই বাছাড়ি উত্তরে ছুটলো। বাতাস অনুকূলে আছে, নদী অনুকূলে। বাছাড়ি নৌকো বিজলীগতি ছুটলো।

ঘাটে যখন পৌঁছলো নৌকো পুব আকাশের চক্রবেণায় তখন ছায়া ছায়া রঙের ছোপ লেগেছে। বনঝাউ আর

বেতসের ঝোপে টুনি পাখীর কাঁক পাখা ঝাঁপিয়েছে। আকাশে চক্র দিচ্ছে মাছ-খেগো ভোরের চিল।

অকূল বাতাসে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো নদীর বুকে। পিসী ছুটে এলো, 'ও দাদা, কারা যায় এইখেছে?'

ছখন চোখে উঠলো বাতাস মধুর। নিজে কেমনে। আর মালোপাড়ার সবাই দেখলো নিতাই এসেছে শহরের এক মেয়েকে সঙ্গে করে। ঘাটেঘাটে বাড়াবাড়ি ছুটে গেল মধুপক্ষী হয়ে ভাসছে।

ছখন ভাবছে, আকাশ-পাতাল। ভোরের পাখী, ভোরের আকাশ-বাতাস বড় নতুন মনে হচ্ছে না। পুরনো মনে বড় আসে নি। চোখে এখনও লেগেছে, নদীতে জোয়ার এসেছে। আসে যায় জোয়ার। সংসারে কারোর জন্য তার অপেক্ষা নেই। সে একলা যায় আসে রাতদিন কলকল করে। ছেলেকে দেখে সে সুখী হয় নি। নদীতে ছেলে এখনও ভাসছে।

বাপ-ছেলের চোখাচোখি হলো। সোনা গিয়ে প্রণাম করলো বুড়ো ছখনকে। প্রণাম করলো পিসীকে। পিসী ডেকে নিয়ে গেল তাকে ঘরে।

'এ কে?' প্রশ্ন করলো ছখন।

নিতাই জবাব দিলো, 'এ আমার ঘরে থাকবে বাবা।'

নিতাই এমনি জবাব দেয়। কোন কথার স্পষ্ট জবাব কোনদিন দেয় না নিতাই। আপসোস বুড়োর। তিনকুড়ি দুই বছরের লুটিয়ে জীবনে ছখনের এই বড় আপসোস।

বুড়োর হাতে পঞ্চাশটা টাকা দিলো নিতাই। বললো, 'পেথম দিনকার রোজের বিক্রির টাকা তোমার হাতে দিয়ু বাবা। খুশি তো?'

ছখনের চোখে জল এলো। টাকা ফেলে দিতে পারলো না ছখন। নিতাইর পায়ে লুটিয়ে পড়তে পারলো। বড় কষ্টে। বুকে হাতে লুটছে হাপাহাপি। তার বুকের দিকে তাকিয়ে টাকা ফেলে দিতে পারলো না ছখন।

নিতাই গিয়ে ঘরে ঢুকলো।

॥ ১৪ ॥

পুরো সাতদিন গড়িয়ে গেল পূর্ণিমা গেল। নদীর পারে ঘর বেঁধেছে ছখন মালো। মন-মাছুয়া বাজনা বাজিয়ে মোহনা নদী ঘরে যায় কাঁকন বাজায় নদীর জল—জোয়ারের জল।

কথাটা ঠাকে কাবা, তবু এ কথা সত্যি হলো একদিন। সেদিনটা রবিবার। সোনাকে ঘরে রেখে গঞ্জের দোকানে গিয়েছিল নিতাই। পুরো একটা হপ্তার কাবার চুকিয়ে ঘরে এসে উঠলো শনিবারের বিকেলে। পুরো রবিবারটা এক আপন অবসর মন সোনাকে নিয়ে। ওটা নতুন জাতে—নতুন পরিবেশে মুক্তির বাতাসে পুষ্ট সোনা—তাই তা নিতাই জানে। নিতাই এসে থাকলো রবিবারে।

বিকেল হচ্ছে। আশ্বিনের রোদ ঝিলমিল করছিল সমুদ্রের ফেনায়িত জলে। কাশফুলের মৌমাছিরা এই মালোপাড়া ছেড়ে বাড়াবাড়িতলো ঘর ছেড়ে জলে

রোকোকাশ্মীর
ফেস পাউডার
মুখের সৌন্দর্য্য
বৃদ্ধি করে
রেডা কেমিক্যাল • কলিকাতা-১

লুকিয়ে আছে। টের পায় না জলদিপি। মাছ ধরে লাজ নাচায়। সোনা আর নিতাই খোকার ঘরে মুখোমুখি বসেছিল।

বাসী এসে খবর দিল, 'সুখন ভাই এয়েছে নদীর ঘাটে। আরও জনে কে এয়েছে।'

সোনা কথা। নিতাই যেন বাতাসের আগে ছুটে এলো। তার পেছনে সোনা।

ঘাটে একটা বড় কোষাডিঙি ভিড়েছে। একজন লোক বসে আছে তাতে। লোকটা ভিড়িয়ে নাবি। আর পাড়ে নেমেছে সুখন। সঙ্গে তার একটি সিঁদুর-আলতা পরা মেয়ে। দেখতে খারাপ না; একটু মাজা কালো রঙের। পাতাবাহারের শাড়ি পরেছে মেয়েটি।

নিতাই এসে জড়িয়ে ধরলো বন্ধুকে, 'কামনে ছিলি সুখা এদ্দিন বন্ধুকে ভুইলে। আর আমি যে কি করিচি তর লেগে—' কণ্ঠরোধ হলো নিতাইর।

সুখনের মুখে বকুল হাসি। বন্ধুকে ধরে নিয়ে এলো সে। পেছনে পেছনে এলো মেয়েটি। আসতে আসতে বললে সুখন, 'বন্ধু আমি এনু তর লাগে চাইলুস করতে। আমি ত তরে ভুলতে পারি নে নেতাই। বন্ধুকে কি জেবনে ভুলা যায়?'

'তবে কামনে ছিলি বন্ধু এত ক'টা দিন?'

'ছিনু, বড় দুখে ছিনু রে নেতাই। কিন্তন তুই ত জানিস এখানে ত আর থাকা যায় না।'—সুখনের গলায় বেদনা বাজলো।

সোনা বেরিয়ে এসে মেনকাকে দেখে কিন্তু মোটেই আশ্চর্য হোলো না। শুধু হাত ধরে বললো, 'রাতারাতি কামটা খালাস করছিস ত মেনকা। রাতারাতি আমার মাথায় উঠিচিস বউদিদি হইয়া।'

মেনকা সোনার মুখ চেপে ধরলো। বললো, 'সোনা, লক্ষী দি আমার অমন কথা কওস না ভাই। তর মাথায় উঠবার আগে আমার মরণ যান হয়।'

মেনকা বড় করে সিঁদুরের টিপ পরেছে কপালে। সিঁথিতে সিঁদুরের আলপনা কেটেছে বড় করে। শাঁখা নোয়া পরেছে নতুন। পায়ের আলতা অটুট রয়েছে এখনও। আবেক ঘোমটা দিয়ে শাড়ি পরেছে মেনকা। চেয়ে চেয়ে দেখলো সোনা। বধূজনোচিত অপরূপ গৌরব নিয়ে মেনকা যেন গল্পের বারোবাসর পাড়ার মেনকা আজ নয়। সম্পূর্ণ নতুন অপরূপ শ্রীময়ী বধূ। পাপের ভারা নদীতে ভেসে গেছে? মন ক্ষয়কার না মেনকার? সোনা অবাক হয়ে তাকিয়েছে, মেনকার মধ্যে কোন শরমবতী উঁকি দিয়ে হাসছে। শাঁখা-সিঁদুরের পুণ্যে মেয়েমানুষ স্বর্গের আশীর্বাদ কুড়িয়ে পায়— এটি এই নতুন দেখলে সোনা।

একটি নতুন সত্য আবিষ্কার করলে, তার মাথায় সিঁদুর

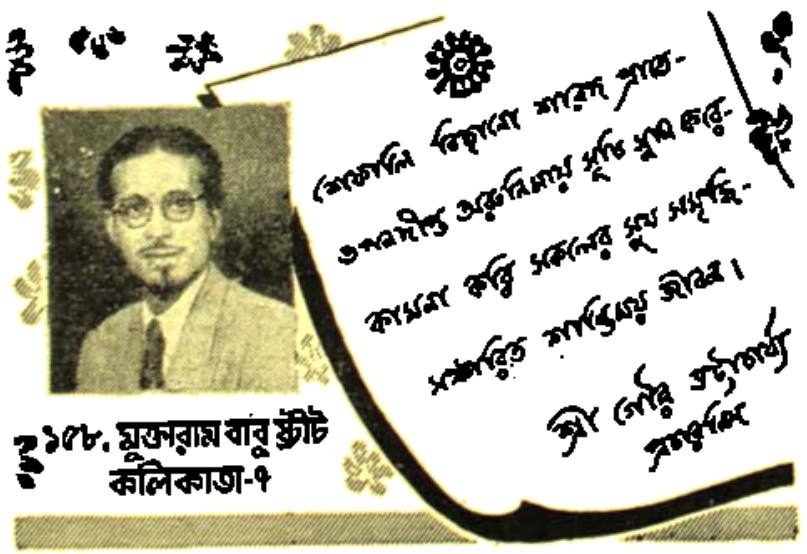

মেই, শাঁখা নোয়া নেই। না, বউ সাজতে বাইরে ভেতরে এখনও সম্পূর্ণ পারে নি সোনা।

বাহেবোসর পাড়ার মেয়ে সোনার মনে উজ্জ্বল একটা চিন্তা ঢেউ হয়ে আছড়ে পড়লো। বউ সাজতে হবে। জীবনের সাধ-স্বপ্ন যদি চরিতার্থ করতে হয় মেনকার মতই চরিতার্থ করতে হবে। প্রেম, সে যদি দুরেশ্বরে অনেক দিনের পর এসেছে, জীবনে তাকে গ্রহণ করতে হবে সাগরের আর দশটা মেয়েমানুষ যেমন গ্রহণ করে। নিতাইকে ভালবাসে যদি সে তবে ছলনার কি আছে? ভালবাসা যার নাম, তাতে ছলনা নেই, বঞ্চনা নেই। বাইরে ভেতরে ফাঁকি জমলে জীবনের সাধ আসে পাপ হয়ে। তাহলে হয় তো একদিন ঠিক, প্রেম হলো কামনার তৃপ্তি না, কামনার তৃপ্তি প্রেম হলে প্রায়শ্চিত্ত গলাগলি করে আসে।

টেনে কাছে বসালো মেনকাকে। বলল, 'আমার ভয় আমারও তাই মনের অবস্থা মেনকা। এই নরক-পুরীতে থাকতে আর ভাল লাগে না। তাই আমি চলে এলুম এখানে।'

দীর্ঘ শ্বাস ফেলল মেনকা। বললে, 'কি জানি নরক-ফরক বুঝি না ভাই, যে খেতে-পরতে দেবে—তার ঘর করতে আমি রাজী। তা তার ভাইটা ভালবাসে আমায় খুবই। ওর চাকরি ছুটতে তবে যে আমি মত দিইছি।'

তারপর গলা নীচু করে মেনকা তার বিয়ের কথা বললে। তার মত খুব ছিল না। বিদেশের লোকটা তাকে ভালবাসতো। তাকে ভাসিয়ে হারবারে এনে বসতি দেয় এরকম সেই। সুধাময়ের চাকরিও না কী করে দিয়েছিল। কিন্তু একদিনের ধাক্কায় তাদের বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। সুধাময় তাকে প্রথম থেকেই ভালবাসতো। যখন খিদিরপুরে ছিল তখন থেকেই। তারপর শেষ পর্যন্ত কালীঘাটে গিয়ে তাদের রেজিষ্ট্রী করে বিয়ে হয়েছে। গলার হার, কাঁচি চুড়ি হাতের, কানবালা সেই গড়িয়ে দিয়েছে। সব সিনি সোনার। নিজে গিয়ে সে পছন্দ করে কিনেছে। নিতাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে সুধাময়, প্রায় জোর করে তাকে নিয়ে এসেছে।

সব শুনলো সোনা। এক সময় নিতাইকে জড়িয়ে ঘাটে এলো সুধাময়। বললে, 'থাকবার ত উপায় নাই ভাই। ওর অনতে এসেছি, না ফিরলে ওর মনে দুখ হবে।'

শোন কথা। নিতাই সুধাময়ের দিকে তাকিয়েছে অভিমানাহত চোখ মেলে। এরই মধ্যে এতখানি পালটে গেল তার বন্ধু!

প্রায় নির্লিপ্ত গলায় বললো নিতাই, 'তা হলে আজ রাতটার জন্যও তোরা থাকবি না?'

'কোন উপায় নাই বন্ধু, আবার আসি।'—সুধাময় বললে।

'হুঁ'—

আর কোন কথা বললে না নিতাই। সোনাও তাদের কিছু বলেনি। শুধু মাথা নুয়ে পায়ের ধুলো নিলে।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত। ঘাটে নৌকো বাঁধা ছিল। তারা উঠে আসতে নৌকো ছেড়ে দিল মাঝি।

মালীপাড়ার যারা এসেছিল, তারা চলে গেল। কেবল গেল না সোনা আর নিতাই। ঘাটে এসে কোন একটা গুঁড়ি কাঠে লেগেছিল। তাতই ওপর দুজনে বসলো।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। রাত ঘন হলো। নীচেরের পথিক মেয়াল ছেকে গেল। কোড়াল পাখী কোথায় ডাকলো। তারপর মুখ উঁচু করে তৃতীয়ার চাঁদ উঠলো। সামান্য সোনা চাঁদ। রক্তচন্দনের মতো তার রঙ। নীচে সাপ হয়ে শুয়েছে রক্তশিরা নদী।

সেইদিকে নিশ্চুপ চেয়ে বসে রইলো সোনা। অনেকক্ষণ বসে রইলো। এই রঙ সারা মনে প্রাণে আজ আগুন হয়ে জলতে দেখেছে সোনা। মেনকাকে আলতা সিঁদুর পরতে দেখেছে। প্রচণ্ড ঈর্ষা ফুলে উঠলো সোনার

মনে। শাঁখারিটুর আলতার চমক দেখিয়ে যেমন তাকে বিভ্রান্ত করতেই চেয়েছিল। নিশ্চয়, নিশ্চয়ই তাই।

একেবারে নিতাইর গায়ে লেপে এলো সোনা, 'ও গ বর, শুনচ ?'

'কী'—

'তুমি গল্প যাবে কালন ?'

'আজ ভোর রাতে।'

'ক্যান অসনই যাওয়া যায় না ?'

নিতাই আলো অন্ধকারে তাকিয়েছে সোনার দিকে। সোনার চোখে চিক্‌চিক্ করছে। বললে, 'উঃ। যাওয়া যায় রেঙ্গান-নাগরী।'

বড় চঞ্চল মনে হলো সোনাকে। বললে, 'তবে আমায় নিয়া চল একবার। আমি তোমার লগেই যাই।'

'ক্যান গ ক্যান ?' প্রায় ভেঙে পড়লো নিতাই। ভয় পেলো বুঝি জলডুবি হয় তার। শহরের টানে মেতেছে পুরুষ। এমনিতে মেয়েমানুষ, তাতে শহরের মেয়ে সোনা। কত যে দুর্গম তার মন, বোঝা ভার। বড় রহস্য সে, নিবিড় গহীন অতলতা তাতে। পই পাইনা নিতাইর মন। বুকের দুক দুক কেবলই বাড়ে।— 'ও গ রেঙ্গান-নাগরী, ক্যান ?'

'বলব সব পুইল্যে। চল আগে—'

রাত দুইপ্রহর গড়িয়ে গেল। রাওয়া-রাওয়ার পর বাঁধাছাঁদা চুকলো। গরুদুটোকে। বাঁশী আজ ভাল ধরেছে। পাটাতনে পাশাপাশি বসেছে নিতাই আর সোনা।

'এবার বল ক্যান ? ক্যান আমার লগে যাবের চেইলে রেঙ্গান-নাগরী ?' নিতাই সোনাকে প্রশ্ন করে।

নিতাইকে জড়িয়ে ধরে রেঙ্গান-নাগরী সোনা। বলে, 'তোমায় আমার কাছে পাব বলে, একেবারে কাছে-কাছে'

'ক্যান আমরা কি কাছে নাই ?'—

সোনা আরো জোরে চাপ দিয়ে লেপে এলো নিতাইর বুকে। বললে, 'ওই আর তামন কাছে ? ওই মনকা আর তার সোয়ামীরে ছাড় দি ? কামন পাশাপাশি ঘুমিয়ে থাকে তারা। আমরা এইবার তামন কইরা থাকুম, বুঝলে ?'

'বুঝচি, রেঙ্গান-নাগরী।'

সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ছাপার জন্য

দীপক প্রিন্টিং

(৯৩।৩।১ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা)

সর্বপ্রকার ছাপার কাজ নির্দিষ্ট সময়ের
মধ্যে যত্ন সহকারে সরবরাহ করা হয়

ব্লক প্রিন্টিং
আমাদের বৈশিষ্ট্য

সবার উপরে উৎকর্ষই
আমাদের আদর্শ

'এ বেলেনি এখনও তুমি। চল।'—হঠাৎ খিলখিলিয়ে হেসে সোনা। মোহনা ঝিনুকটা যেন খিলখিল হাসছে সোনার গলায়। বড় দুরন্ত মনে হলো সেই হাসি।

তৃতীয়ার চাঁদ মাথার উঠলো। আকাশে মেঘ জমেছে বিস্তর। তবু জোৎস্নার তরল করছে। নদীর পাশেই আলো দেখা যাচ্ছে। অনেকগুলি আলো, অনেকগুলি ঘর, গায়েগায়েলি মেশামেশি।

চোখে আগুন জ্বলছে সোনার। ঈর্ষার আগুন। মেনকা আগুনটা ধরিয়ে দিয়ে গেছে। শাঁখা-সিঁদুর-নোয়া পরে মেনকা বউ সেজেছে। সোনা পারেনি। এ কি অক্ষমতা সোনার? একি তার পাপক্ষয়ের শেষ—

না-না, কোন কারসাজি নয়। কোন জালিয়াতি সে খেলবে না। যৌবনের দম্ভে-আলায় পুরুষপ্রাণ আর কখনও অবজ্ঞা করবে না। কোনদিনই অবহেলা করবে না। মন নিয়ে জুয়াখেলা? না এ জীবনে আর নয়। একটিমাত্র মনকে লালিত করে তাকেই একান্ত করে সে পাবে। নিতাই, বাঞ্ছিত মানুষ তার বসে আছে পাশে। সোনা ভালবাসে যদি, তবে লুকোচুরি সাজে না। মেনকা ত লুকোয় নি। সব পেয়েছে সে।

ঠেঙনাটা দুলছে সোনার। উত্তাল ঝড় হয়ে সে যেন আছড়ে পড়লো, 'ও গ বর, আমি আর পারি না গ, পারি না—'

সোনার আউলো চুলে হাত দিলো নিতাই।— বললে, 'কী পার না রেজান-নাগরী?'

'আমি আর ভাবতে পারি না বর, আমার মনে ক্যামন ধান ধন্দ লাগে বড়। আমার ধন্দটা মিটো দেবে বর?' বড় ভাঙা-বিলার গলা সোনার। বড় করুণ চাউনি।

বাচাড়ি নৌকো ছুটছে। দূরন্ত গেরোর আগ্-বাছাড়ি বাতাসের উজানেও কথা শোনে। গুনগুনিয়ে গানে ধরেছে বংশী। হাল ধরেছে।

নিতাই বললো, 'কী ধন্দ রেজান-নাগরী? আমি আপন জন, তুমি বলো—'

'মেইয়ে মানুষ ক্যামনে সুখী হয় বলতে পার? ক্যামনে সোয়াস্তি পায়?'

নিতাই দেখলো, সামনে নদীর জলে ঘূর্ণি উঠেছে বেপরোয়া। অপরিচিত বার পাক খাচ্ছে বাছাড়িখানা। যেন মেঘের নাও পক্ষী। মেঘ ভেসেছে আকাশে। সাদা শরতের মেঘ। চাঁদ আকাশে ভাসছে। ছুটছে পুব থেকে পশ্চিমে। সোনা চাঁদের সঙ্গে সাদা মেঘের রেশারেশি। আজ দুজনেই ছুটছে, কে আগে যায়। সোনার সিঁথিতে সিঁদুর নেই, হাতে শাঁখা নেই, দেখলে নিতাই। পারের আলো ওই দেখা যায়।

'এই বংশী'—প্রায় ছুটে এলো নিতাই। হালকাঠ চেপে ধরলো—'থামা, নৌকা থামা—'

'ক্যান?' কে যেন প্রশ্ন করলো।

'বড় কামের কাম আছে এইখানে।'

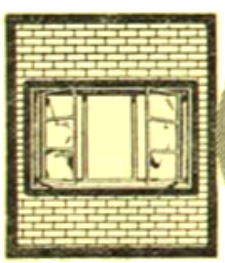
RING UP: 22-5257 GRAM: CECIGATECO
FOR STEEL ROLLING SHUTTERS, GRILLES, RAILINGS, W.I.GATES, STEEL DOORS & WINDOWS
THE CALCUTTA COLLAPSIBLE GATE CO., PRIVATE LTD.
77, NETAJI SUBHAS ROAD. CALCUTTA-1

...লিক
...৩১-১৩

দেশে দেশে :-

পূর্ব বার্লিনের প্রবেশমুখে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ

হাল ধরলো বংশী। বাদাড়ি থামলো। ঠিক থামলো না, পাক খেয়ে একেবারে পারে গিয়ে ধাক্কা করে লাগলো।

'ঘা গ—' প্রায় কঁকিয়ে উঠেছিল সোনা।

কাঁধে হাত দিয়ে সোনার হেঁটকে উত্তাল দুলিয়ে দিলে নিতাই। বললে, 'ও গ ছেবে, তুমি এই বলো, আমি আসি।'

প্রায় টলতে টলতে পারে নেমে গেল নিতাই। ছুকড়া-হাটির বাজার। ঠিক বাজার না, হাট। নৌকো এসে থামে। দু-চারটে মুদীর দোকান আছে।

রাত দ্বিপ্রহর প্রায় পেরিয়ে গেছে। মুদী ঘুমিয়েছে ঝাঁপ ফেলে।

'দোকানী ভাই—ও দোকানী ভাই'—ঝাঁপ ধরে নাড়াচাড়ি সুরু করে দিলে নিতাই। সাড়া পাওয়া গেল না। কোন শব্দ পাওয়া গেল না। শাঁখা-সিঁদুর কোথাও পেলে না নিতাই। পাবে না?

বন্ বন্ করে মাথাটা ঘুরে গেল আচমকা। আর থমকে দাঁড়ালে না নিতাই, ছুটে এলো নৌকোয়। গলুইতে রাখিকৃত সিঁদুর লেগে আছে। পুজোর সিঁদুর। ঘসে ঘসে আঙুলে হাই পাঁচিটই নিয়ে এলো নিতাই। পরিয়ে দিলে সোনার সিঁথিতে।

'ও গ—'

'সিঁদুর।'

'সিঁদুর?'—প্রায় চিৎকার করে উঠলো সোনা।

নিতাই বসলো পাশে। বললে, 'তুমি যে ধনের কথা বলেছিলে রেজান-নাগরী, আমি তাই মিটাছু। এইটা বাইরের জিনিস, কিন্তুন জানো, অকূলে মেয়েমানুষকে কূল দেবায় এইটাই।'

সোনার বুক ভেঙে কিন্তু হাসি ফুটলো না। রাশি রাশি উৎকণ্ঠা যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো তার গলায়, বললে, 'এত রাতে সিঁদুর কোথা পেলে বল?'

'কান, এই নৌকার গলুইতে ত ছিল।'

নিতাইর গলা জড়িয়ে ধরলো সোনা। কান্না-ভাঙা গলায় বললে, 'ও গ বর, করেছ কী? নাও-এর সিঁদুর দিলে আমার মাথায়! ও শয়তানী অকূলে ভেসেছে গ, আমায় অকূলে ভাসালে?'

উপর কোন জবাব দিলো না নিতাই। আচমকা শক্ত হয়ে তাকিয়ে আছে সোনার দিকে। এই ক্যাপা রাত্রির সমস্ত উত্তেজনা, তন্ময় বিভোরতা একটা নেশার মতো তার অপলক চোখে ভাসছে। স্বপ্নঘোরের মত লেগেছে সে চোখে। সিঁদুরে-মোমটায় সোনার সারা অবয়বে আজ এক কল্যাণী বধূর ছায়া ফেলেছে নিতাই। চেয়ে চেয়ে তাই দেখছে। সোনার কথায় গাঢ় গলায় শুধু বললে, 'তুমি কাঁদ না রেজান-নাগরী, আমি তোমায় অকূলে ভাসাই নি। আমার ঘাটে এনে কবে ধেঁধেছি। ওই নামের সিঁদুর পরিয়ে তোমার মাথায়, তোমায় বাঁধবার সাহস আমি পেইছি।'

আর কোন কথা বললো না সোনা। মেনকাকে মনে পড়লো তার। আচমকা, গঞ্জের বারোয়ারির পাড়ার বেদে বালাকেও মনে পড়লো। মনে পড়লো, সেদিন যে উচ্ছল বেদেনী মেয়েটি গান গাইতে এসেছিল, তাকে।

আকাশে কৃষ্ণ পক্ষের ঘোলা চাঁদ ভাসছে। পাশে নিতাই বসেছে।

সোনা দেখলো, নৌকো তখনও ছুটছে। গঞ্জে এসে নৌকো পৌঁছয় নি।

নদীতে জোয়ার এসেছে। মোহানা-ভরণী বড় উদ্দাম। বড় উত্তাল!

॥ শেষ ॥

MENDED-2008

Editor : DAKSHINA RANJAN BASU
Published by : AMIYA RANJAN MUKHERJEE
2, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12 and Printed by R. C. Roy, at Printsmith,
116, Vivekananda Road, Calcutta-6.